রাহুল সাংকৃত্যায়ন

আমার জীবন-যাত্রা

প্রথম খণ্ড

অনুবাদ

প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী

ইনা সেনগুপ্ত

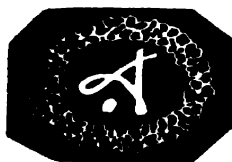
সৈকত রক্ষিত

সতীশ মিশ্র

সম্পাদনা

ডঃ রামবহাল তেওয়ারি

ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার



রাহুল সাংকৃত্যায়ন জন্মশতবর্ষ কমিটি

Amár Jiban-Yatra, **Bengali Translation of Rahul Sankrityayana's *Meri Jiban-Yatra***

প্রচ্ছদ
স্বপন রুদ্র

প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল, ১৯৫০

ফটোটাইপসেটিং
আই· ই· আর· ই
২০৯ এ, বিধান সরণি
কলকাতা ৭০০ ০০৬

মুদ্রক
দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রকাশনা
ভুবন ভট্টাচার্য
রাহুল সাংকৃত্যায়ন জন্মশতবর্ষ কমিটি
৬বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুখবন্ধ

রাহুল সাংকৃত্যায়ন বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মনীষীদের অন্যতম। জীবনচর্যার বৈচিত্র্যে, ভারহীন পাণ্ডিত্যের উজ্জ্বলতায় এই স্বয়ংশিক্ষিত পরিব্রাজকের জীবন ও কীর্তি মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক বিরল দৃষ্টান্ত। বিচিত্র, গতিশীল বহুবর্ণময় পরিব্রাজকের জীবন, জ্ঞানার্জনের অদম্য স্পৃহা, অভাবনীয় মনীষা, বহুমুখী প্রতিভার সার্থক বিকাশ রাহুলের জীবন ও মননকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যায় যার তুলনা নেই।

স্বচ্ছ চিন্তা প্রবাহের সাবলীল সক্রিয়তা, ভাষার ওপর অসামান্য অধিকার, বিশিষ্ট রচনাশৈলী তাঁকে হিন্দী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখকের প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। বহু ভাষা লিখতে ও পড়তে পারতেন। স্বরচিত, অনূদিত ও সম্পাদিত সব মিলিয়ে প্রায় দেড়শো বই লিখেছেন নানা বিষয়ে। সংস্কৃত, পালিতে বৌদ্ধশাস্ত্রের আকরগ্রন্থের টীকা থেকে শুরু করে হাল্কা ভ্রমণ কাহিনী, ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাস, মনীষীদের জীবনী, গল্প, নাটক, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, ধর্ম সব বিষয়েই তাঁর অবাধ সঞ্চরণ।

রাহুলের গ্রন্থাবলীর মধ্যে তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা *'মেরী জীবনযাত্রা'* অতি স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করে আছে। ভারতীয় সাহিত্যে এই অনন্য গ্রন্থের কোন তুলনা নেই। পাঁচখণ্ডে বিধৃত ২৭৭০ পৃষ্ঠার এমন অসামান্য জীবনযাত্রার কাহিনী ভারতীয় ভাষায় অদ্বিতীয়। এই গ্রন্থকে রাহুল আত্মজীবনী বলেন নি, বলেছেন জীবনযাত্রা। নিজেই লিখেছেন—*"পথে পথে ঘুরে বেড়ানোর সময় আমার মনে হয়েছে যদি কোন যাত্রী তাঁর পথের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতেন, তবে আমার খুব সুবিধা হতো। যদিও একথা ঠিক যে দুজনের জীবনযাত্রা পুরোপুরি একরকম হতে পারে না। তবু প্রশ্ন থেকে যায়, কেন জীবনী না লিখে জীবনযাত্রা লিখতে গেলাম। পাঠক তার উত্তর এই বই পড়লেই পেয়ে যাবেন। আমি আমার কলম দিয়ে এই জগতের গতিপ্রকৃতি ও বৈচিত্র্যকে আঁকতে চেয়েছি। আমার তৃতীয় প্রজন্মের পক্ষে হয়তো তা জানা দুঃসাধ্য হবে।"*

রাহুলের মনে ধারণা হয়েছিলো যে গুছিয়ে জীবনী লেখার নৈপুণ্য তিনি আয়ত্ত করতে পারেন নি। সময়ও ছিল না। ১৯৪০ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত হাজারিবাগ জেলে বন্দী ছিলেন। তখন পুরনো স্মৃতির রোমন্থন করার সুযোগ পেয়েছিলেন। জেলে বসে যখন তিনি তাঁর বিগত ৪১ বছরের জীবনের কথা লেখেন (১৮৯৩ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ *'মেরী জীবনযাত্রা'*র প্রথম খণ্ডের ৫২০ পৃষ্ঠা ও দ্বিতীয় খণ্ডের ৪০০ পৃষ্ঠা) তখন তাঁর কাছে কোনো বই ছিল না—ছিল না ম্যাপ, বই-পুঁথি, বা এ-বিষয়ে আলোচনা করার মতো উপযুক্ত সঙ্গী। অথচ *'মেরী জীবনযাত্রা'* পড়লে মনে হয় চলচ্চিত্রের ছবির মিছিলের মতো ৪১ বছরের পুরনো সব স্মৃতি সার বেঁধে আসছে। যেন অনুগত ভৃত্যের মতো শব্দেরা আসে, কাগজে এঁকে দিয়ে যায় এক বিচিত্র জগৎ ও জীবনের ছবি।

এই কারাবাস পর্বের ২৯ মাসে মেরী জীবনযাত্রার ৯০০ পৃষ্ঠা ছাড়া আর ছয়টি বই যথা বিশ্ব কী রূপরেখা, দর্শন-দিগ্‌দর্শন, বৈজ্ঞানিক ভৌতিকবাদ, সিংহ সেনাপতি, ভোলগা সে গঙ্গা আর ভোজপুরী ভাষায় আটটি নাটক লেখেন। লেখনীর বিস্ময়কর গতির পিছনে প্রচণ্ড ক্রিয়াশীল মস্তিষ্কের ধূসর কোষ। দুর্ধর্ষ ধাবমান জীবনের সঙ্গে উপযুক্ত সঙ্গতি রেখেই তাঁর লেখনীর স্ফূর্তি।

বহমান নদীর মতোই রাহুলের জীবন। আর এই নদীরই প্রতিবিম্ব *'মেরী জীবনযাত্রা'*। রাহুলের জীবনের মর্মবস্তু যেন তাঁর অজ্ঞাতসারেই এই জীবনযাত্রার অন্তর্গত হয়েছে। নিত্যনতুন ঘটনা পরম্পরা, নিরন্তর পরিবর্তনশীল প্রকৃতি যা সতত ভ্রাম্যমাণ মানুষটির জীবনকে উপভোগ্য করে তোলে—তার সবই জীবনযাত্রায় স্থান পেয়েছে। ঘটনা ও দৃশ্য ক্রমানুযায়ী লিপিবদ্ধ হয়েছে। *'জীবনযাত্রা'* য় কোন সচেতন শিল্পকর্মের প্রয়াস নেই। ঘটনা ও দৃশ্যের অহেতুক ঝাড়াই-বাছাই নেই। তিনি যা দেখেছেন, শুনেছেন সবই তিনি গ্রহণ করেছেন অনায়াসে। সব দৃশ্য, সব ঘটনা যেভাবে এসেছে, ঠিক সেভাবেই তারা জীবনযাত্রায় স্থান পেয়েছে। হয়তো এর ফলে অনেকসময় ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়েছে। অনেক ঘটনা মাঝপথে পরিত্যক্ত হয়েছে। পাঠকের ঔৎসুক্য তৃপ্ত হয় নি। কিন্তু জীবন তো এইরকমই। অনেক কথা আছে, যা বলতে বলতে থেমে যেতে হয়, অনেক ঘটনা আছে যা নিটোল, নিখুঁতভাবে ঘটে না। অনেক ঘটনা এমন ভীড় করে আসে, আমাদের খেই হারিয়ে যায়। কখনো কিছুই ঘটে না। জীবনে নিঃসীম প্রান্তরের স্তব্ধতা নেমে আসে। আবার ভেঙে যায় স্তব্ধতা, কোলাহলে ভরে ওঠে জীবন। প্রায় তিন হাজার পৃষ্ঠার *'জীবনযাত্রা'* য় এক ধরনের নিরাবেগ, নৈর্ব্যক্তিকতা আছে, যা নতুন মাত্রা যোগ করেছে এই রচনায়।

জীবনযাত্রা কথাটি রাহুল একেবারে আক্ষরিক অর্থে ব্যবহার করেছেন। কারণ তাঁর জীবন তো শুধু যাত্রারই কাহিনী। তিনি আন্তর জীবনের কাহিনীকে বেশী জোর দেন নি, যদিও তা একেবারে অনুপস্থিত নয়। একাধিক মহাদেশব্যাপী *'জীবনযাত্রা'* র প্রায় ৫২ বছরের অবিরাম পর্যটন—অন্বেষণের বৃত্তান্তে তাঁর পাণ্ডিত্যের বিস্তার, সত্যনিষ্ঠা, সংবেদনশীল মন ও হৃদয়ের উষ্ণতা স্পষ্টভাবে ধরা দেয়। এই বিপুলায়তন গ্রন্থে যে অসংখ্য ঘটনা ও মানুষের বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন, তার ভালোমন্দ তিনি বিচার করতে বসেন নি। দুর্বল, ভঙ্গুর, সৎ, অসৎ, নিষ্ঠুর, উচ্ছৃঙ্খল, সংযত অথবা খাঁটি সাধু, ভেকধারী প্রতারক সব রকমের মানুষের মিছিল তাঁর জীবনযাত্রায়। তিনি তাঁদের দেখেছেন নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে।

জীবনের নিরাবেগ, নিরুত্তাপ দর্শকের ভূমিকায় থেকেও দুটি বিশেষ ক্ষেত্রে রাহুলের উন্মাদনা চোখে পড়েই। দেশে-দেশান্তরে অবিরাম ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা আর মানুষের সমস্ত জ্ঞান ভাণ্ডারের নিঃশেষে আত্তীকরণ। তিনি যেখানেই যাচ্ছেন, সেখানকার ভাষা শিখে নিচ্ছেন। যা কিছু জানার আছে জেনে নিচ্ছেন। এভাবে সারা দুনিয়ায় ঘুমক্কড়ী, জীবনব্যাপী অধ্যয়ন, গবেষণা, গ্রন্থরচনা—মনে হয় মানুষের ভাষা, ধর্ম, সমাজ ও সভ্যতার বিকাশ সম্পর্কে তিনি প্রায় সর্বজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁর নিজস্ব সত্তাটি প্রায় অপরিবর্তিতই থেকে গিয়েছিল। এই সহজ, সরল, অকপট, উৎসাহী রাহুলকে প্রৌঢ়ত্ব স্পর্শ করতে পারে নি। তার কারণ হয়তো বুদ্ধের সেই বাণী যাকে তিনি তাঁর জীবনযাত্রার আদর্শ হিসেবে নিয়েছিলেন—*"আমার জীবনযাত্রায় জ্ঞানকে আমি নৌকার মত ব্যবহার করেছি, মাথায় বোঝার মতো নয়।"*

রাহুলের লেখায় কোন ব্যাসকূট নেই। অনাবশ্যক ভঙ্গিমা, জটিলতা কিছুই নেই। তাঁর রচনাশৈলী সম্পূর্ণভাবে তাঁর নিজস্ব। নিজের পথ কেটে তিনি অগ্রসর হয়েছেন। নতুন নতুন চিন্তাধারাকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য নতুন রচনাশৈলীর প্রয়োজন ছিল। গুরু গম্ভীর বিষয়কে সহজবোধ্য করে তোলাকে তিনি অত্যন্ত জরুরী মনে করতেন। হিন্দী সাহিত্যের প্রধানতঃ হালকা কাহিনীর আঙিনায় তিনি ধর্ম-দর্শন, ঐতিহাসিক কাহিনী, সভ্যতার উত্থান-পতনের বিবরণ, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, বুদ্ধের জীবন ও দর্শন কত বিচিত্র বিষয় অনায়াস দক্ষতায় উপস্থিত করেছেন। কৃষকের ঘরে জন্মেছিলেন রাহুল। গ্রামের রাখাল বালকদের সঙ্গে কেটেছে তাঁর শৈশব। তারপর বিপুল বিশ্ব টেনে নিলো এই যাযাবর জ্ঞানপিপাসু কিশোরকে।

পাণ্ডিত্যের উচ্চতম শিখরে যখন শ্চেরবাৎস্কি, সিলভাঁ লেভি, অনাগরিক ধর্মপালের মতো পণ্ডিতদের বৃত্তের মধ্যে তাঁর সম্মানিত অবস্থান, তখনো তৃণমূল থেকে উঠে আসা এই মানুষটি তাঁর শরীর থেকে ঘামের গন্ধ মুছে ফেলতে পারেন নি। কখনও ভুলতে পারেন নি *'কচালু'* বিক্রি করতো ও সাট্টা খেলতো যে *'নবাব'* অথবা যে সাধু গাঁজার কলকেতে দম দিয়ে হাঁক দিতো *'আ জা কৈলাশকে রাজা'* তাঁদেরকে। এঁরা উচ্চবর্গের অন্যান্য মানুষের সঙ্গে সমান মর্যাদার আসন পেয়েছে জীবনযাত্রায়। আর ধরা পড়েছে ভারতীয় জীবনস্রোতের অন্তঃশীল রহস্যের ইঙ্গিত। একটুকরো গেরুয়া বা সাদা কাপড়, গামছা আর লোটা সম্বল করে মানুষ অবিশ্রান্ত পথ চলছে, ঈশ্বর বা পুণ্যলাভের আশায় অথবা নিছক পথচলার আনন্দে। সমগ্র ভারত পরিব্রাজনের অনুপুঙ্খ বিবরণ, এশিয়া ও ইউরোপ পর্যটনের কাহিনী *'মেরী জীবনযাত্রায়'* বিধৃত।

সত্তর বছর বয়সে রাহুলের দেহাবসান হয়। তেষট্টি বছরের সমাপ্তি পর্যন্ত তিনি তাঁর জীবনযাত্রার কাহিনী লিখেছেন পাঁচটি খণ্ডে। প্রথম খণ্ডের বাংলা অনুবাদ আমরা পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আনন্দিত ও কৃতার্থ। এই খণ্ডে আছে ১৮৯৩ সাল থেকে ১৯২৬ পর্যন্ত তাঁর জীবনযাত্রার কথা। তাছাড়া পরিশিষ্টে আছে তাঁর হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষায় লেখা ডায়েরি, সাংকৃত্যায়ন বংশের কুলুজি এবং মাতামহ ও পিতার চরিত্রের বর্ণনা।

উত্তর প্রদেশের আজমগড় জেলার অখ্যাত গ্রাম পন্দহা। সেখানে ১৮৯৩ সালের ৯ই এপ্রিল কৃষক পরিবারে তাঁর জন্ম। কিশোর বয়স থেকেই গৃহত্যাগী। ভ্রমণ ও অধ্যয়ন তাঁকে অবিরত উৎসাহ দিয়েছে প্রকৃত মানবধর্মের গভীর অন্বেষণে।

তাঁর জন্মশতবর্ষে আমরা জীবন ও মনীষার বিচিত্র মিশ্রণে চিরভাস্বর এই বিরল ব্যতিক্রমী প্রতিভাকে তুলে ধরতে চাই তাঁরই কথার মধ্য দিয়ে। সাময়িক বিস্মৃতির আবরণ উন্মোচন করে নতুন আলোকে উদ্ঘাটিত হোক তাঁর জীবনযাত্রা।

—তুষারকান্তি তালুকদার
সভাপতি
রাহুল সাংকৃত্যায়ন জন্মশতবর্ষ কমিটি

পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে

এই বছরের এপ্রিলে প্রথম প্রকাশিত হওয়ার পর ডিসেম্বরেই 'আমার জীবন-যাত্রা' পুনর্মুদ্রিত হলো। এই স্বল্প সময়ের ব্যবধানে এমন একটি গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ, প্রকৃত অর্থেই, আমাদের উদ্দেশ্য ও প্রয়াসের পক্ষে উৎসাহজনক। কেবল হিন্দি সাহিত্যে নয়, বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের মাধ্যমেও যে রাহুল সাংকৃত্যায়নের এক বিস্তৃত পাঠকবর্গ আছে, তা প্রথম খণ্ড প্রকাশের সময়েই আমরা অনুমান করেছিলাম। এই পুনর্মুদ্রণ অনুমানকেই বাস্তব করেছে।

বলা বাহুল্য, পুনর্মুদ্রিত খণ্ডে গ্রন্থটির কোথাও কোথাও আমরা পরিমার্জনা করেছি। মুদ্রণ-প্রমাদ, বানান ও তার অসামঞ্জস্য, বাক্যবিন্যাস এসবের প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। কোথাও আবার ঈষৎ আলংকারিক পরিবর্তনও ঘটেছে। তবুও ছোটখাটো ত্রুটি যে এখনও থাকতে পারে না, তা বোধ হয় কখনোই বলা সম্ভব নয়। অনুবাদকর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে যা সম্ভব, তা হলো, ক্রমশ নির্ভুলের দিকে এগিয়ে যাওয়া।

যে সচেতন পাঠকশ্রেণী বইটিকে সাদরে গ্রহণ করেছেন ও পরিহারযোগ্য ভুলত্রুটিগুলি সংশোধন করে নেওয়ার জন্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তাঁদের সকলকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

—তুষারকান্তি তালুকদার
সভাপতি
রাহুল সাংকৃত্যায়ন জন্মশতবর্ষ কমিটি

বিষয়-সূচি

প্রথম পর্ব

দ্বিতীয় পর্ব

তৃতীয় পর্ব

চতুর্থ পর্ব

প্রাক্কথন

'আমার জীবন-যাত্রা' আমি কেন লিখলাম? আমি সব সময় এটা অনুভব করে এসেছি যে এ রকমই পথ দিয়ে যাত্রা করে আসা অন্য কোনো পথিক যদি নিজের জীবনযাত্রা লিখে রেখে যেতেন তো আমার খুব উপকার হত—শুধু জ্ঞানের দিক দিয়েই নয়, সময়ের পরিমাণ দিয়েও। আমি মানছি যে, কোনো দুটি জীবন-যাত্রা সম্পূর্ণ একরকম হতে পারে না। তবু এতে কোনো সন্দেহ নেই যে সমস্ত জীবনকেই সেই অন্তর আর বহির্বিশ্বের তরঙ্গে সাঁতার দিতেই হয়।

আমি আমার জীবনী না লিখে জীবন-যাত্রা লিখেছি—কেন? পাঠক বইটি পড়ে তবেই এর উত্তর পেতে পারেন। আমার লেখনী দিয়ে আমি সেই জগতের ভিন্ন ভিন্ন গতি আর বৈচিত্র্যকে আঁকতে চেষ্টা করেছি যা অনুমান করতে আমাদের তৃতীয় প্রজন্মের বেশ অসুবিধে হবে। অন্য কোনো বিষয় নিয়ে লেখার আগে আমি যেমন কলম ধরার শিল্পটিকে যথাযথভাবে শিখে নিইনি, তেমনই জীবনী রচনার শিল্পকর্মেও আমি হচ্ছি অশিক্ষিত। নিয়মমাফিক শিক্ষার গুরুত্ব কম নয় কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে সে সুযোগ আমার মেলেনি।

আগেও আমার অনেক বন্ধু আমাকে জীবনী লেখার জন্য বলেছিল। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল এখন সেটার সময় নয়। ১৯৪০-এর ১৪ মার্চ সরকার আমাকে গ্রেপ্তার করে হাজারীবাগ জেলে নজরবন্দী করে রেখে দেয়। ২৯ মাস পরে আমি জেল থেকে বেরোব—এটা জানার জন্য কোনো দিব্যদৃষ্টি অতোই আমার ছিল না তবে এটা নিশ্চয় জানতাম যে আমি বেশ কয়েক বছরের জন্য এই চার দেয়ালের ভিতর এসে পড়লাম। তখন আমার অনেক সময় ছিল। হাজারীবাগে আমরা মাত্র দুজন নজরবন্দী ছিলাম। আমাদের কাছে বইপত্রও ছিল না আর অন্য কোনো বই লেখার ভাবনাও আমার মাথায় ছিল না। আমি দিন কাটানোর জন্য ভাবলাম—যাই, পুরনো স্মৃতিগুলোকেই এঁকে ফেলি। ১৯৪০-এর ১৬ এপ্রিল আমি লেখা আরম্ভ করি আর ১৪ জুন পর্যন্ত লিখে যাই। এই দু'মাসে আমি ১৮৯৩ থেকে ১৯৩৪ পর্যন্ত যাত্রার কথা স্মৃতি থেকে কাগজে তুলে ফেলি। সামনে এগোতে এগোতে ১৯৪০ পর্যন্ত চলে আসা সম্ভব ছিল কিন্তু ১৯২৬-এর পর এগোতে গিয়েই আমার কলম থেমে যাচ্ছিল—তখনকার বছর-বছরের ডায়েরী লেখা আছে, তাই আমার মনে হল শুধু স্মৃতি থেকে লেখা ঠিক নয়। ডায়েরীর সঙ্গে মেলালে হয়ত অনেক পরিবর্তন করতে হত।

১৯৪২ -এর ২৩ জুলাই আমি যখন জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বাইরে এলাম, তখন কয়েক জন বন্ধু জীবন-যাত্রা ছাপিয়ে দেবার জন্য জোর দিল। কিন্তু আমার মনে হ'ল, জেলে লেখা অন্য ছ'টি বই আগে ছাপানোটা বেশি জরুরী। আর এখন 'বিশ্বের রূপরেখা', 'মানবসমাজ', 'দর্শন দিগ্‌দর্শন', 'বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ', 'সিংহ সেনাপতি' এবং 'ভোল্‌গা থেকে গঙ্গা' ছাপা হওয়ার পরই 'আমার জীবন-যাত্রা' পাঠকের হাতে পৌঁছচ্ছে।

আমি আশা করি নি যে নিকট-ভবিষ্যতে দ্বিতীয় খণ্ড লেখার জন্য আমি কলম ধরতে পারব। তৃতীয়বার রাশিয়া যাত্রার জন্য আমি প্রস্তুত হয়ে বসে আছি—শুধু ইরান সরকারের অনুমতি আসার অপেক্ষা। যুদ্ধের আগে এরকম অনুমতি তথা 'ভিসা' পাওয়াটা ছিল, মাত্র এক ঘণ্টার ব্যাপার কিন্তু দরখাস্ত দেওয়ার পর আজ পাঁচ মাস শেষ হতে চলল তবু এখনো জানি না তা কবে আসবে। আমি এই প্রতীক্ষার সময়টা পরবর্তী অংশ লেখার কাজে ব্যবহার করাটা ভাল মনে করেছি।

প্রয়াগ
২·৯·১৯৪৪

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

পুনশ্চ

রাশিয়া যাওয়ার আগেই আমি দ্বিতীয় খণ্ডও সমাপ্ত করে প্রকাশককে দিয়ে দিয়েছি।

পুনশ্চ

দ্বিতীয় খণ্ড ছাপা হয়ে প্রকাশক আর মুদ্রকের ঝগড়ার ফলে তা ঠোঁটের গোড়ায় ঝুলছে। প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণ তার অনেক আগে থেকেই নিঃশেষিত ছিল। এই দ্বিতীয় মুদ্রণে পরিবর্তন প্রায় হয়নি বললেই চলে।

মসুরী
৬-৬-৫১

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

সমর্পণ

ছুটে চলা সেইসব মানুষদের স্মৃতির উদ্দেশে যাঁরা আমাকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিয়ে নিজেরা পিছনে রয়ে গেছেন।

আমার জীবন-যাত্রা

আমার জীবন-যাত্রা

প্রথম পর্ব

ছেলেবেলা

১

মা-বাবা

আমার মা কুলওয়ন্তী মা-বাবার একমাত্র সন্তান ছিলেন। আমার মাতামহ দশ-বার বছরের সৈন্যবাহিনীর চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে আসার পরই আমার মার জন্ম হয়েছিল। বিয়ে হওয়ার পরও মা অধিকাংশ সময় বাপের বাড়ি পন্দহাতেই থাকতেন। আর সেইখানেই (রবিবার ৯ই এপ্রিল ১৮৯৩ খৃঃ)[১] আমার জন্ম হয়েছিল।

মাতামহ রামশরণ পাঠকের[২] তিন সাড়েতিন একরের মত বেলে জমি নানা জায়গায় ছড়ানো ছিল। তা ছাড়াও ছিল দুটো বলদ ও একটা মোষ। দাদু যখন পন্দহা থেকে পালিয়ে হায়দরাবাদে পল্টনে যোগ দিতে যান তখন তাঁর কাজ ছিল মোষ চরানো, দুধ খাওয়া আর ব্যায়াম করা। দাদুর প্রথম যে চেহারাটা আমার মনে পড়ে, তখন তাঁর বয়স ছিল ৫৫ বছরের মতো। লম্বায় ছয় ফুট, চওড়া বুক, সবল বাহু, লম্বা টিকাল নাক, সব চুল সাদা, গায়ের রঙ বাদামী। তিনি কাজটাজ বিশেষ কিছু করতেন না। সকালে ঘাস কাটতেন, গরু মোষের জাব কেটে দিতেন আর ঘানির চারপাশে, ফসল মাড়াইয়ের জায়গায় অথবা বাগানে কোমর ও হাঁটুতে গামছা বেঁধে বসে শিকার অথবা ভিন্‌দেশে বেড়ানোর গল্প করতেন। রান্না করা ছাড়া গরুকে জাবনা ও জল দেওয়ার কাজ দিদিমাকেই করতে হতো।

১· বৈশাখ কৃষ্ণ অষ্টমী রবিবার সংবত ১৯৫০ বিক্রমী

২· মাতামহ-র বিষয়ে পড়ুন পরিশিষ্ট ৪

দোহারা চেহারা ও সাধারণ স্বাস্থ্য ছিল দিদিমার। অধিকাংশ চুল সাদা হয়ে গেলেও শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর একটিও দাঁত পড়েনি। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে শুনেছি মা দিদিমাকে মা ডাকছেন তাই আমিও তাঁকে মা বলতাম। দিদিমার দাদুর উপর দাপট ছিল এ কথা বলা চলে না। দুজনকে আমি কখনো ঝগড়া করতে দেখিনি। দিদিমার কথা দাদু বেশ মেনে চলতেন, আর ঘরকন্নার ব্যাপারে দিদিমার একছত্র আধিপত্য ছিল। তিনি গালগল্প বিশেষ কিছু করতেন না। সংসারের ছোট বড় কাজ ছাড়া গান-বাজনা বা মেলা-তামাসা দেখাতে তাঁর রুচি ছিল না। দু ঘণ্টা রাত থাকতে তিনি ঘুম থেকে উঠতেন। তাঁর দু-তিনটি পেটেন্ট ভজন ছিল যা সুরতাল ছাড়াই তিনি ভক্তিভরে গাইতেন। এই ভজনের একটি ছিল—'গুরু মোকে দে গইলে জ্ঞান-গুদরিয়া।' আমি চিরকাল দিদিমার কাছেই শুয়েছি। বুকের দুধ ছেড়ে দেবার পর থেকে মার কাছ থেকে আমাকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছিল। আর বস্তুতঃ দিদিমাকে আমি যতটা ভালবাসতাম, মাকে ততটা বাসতাম না। আসলে মার ভালবাসা আমি কিই বা পেয়েছি? ভোর হতে দিদিমা সংসারের কাজে নেমে যেতেন রাত দশটা এগারোটা নাগাদ তাঁর শুতে আসার অবকাশ মিলত। তিনি গল্প গুজব করতেন না। তাঁর কড়া মেজাজ ছিল না; তাঁর হৃদয় ছিল অত্যন্ত কোমল। এমনকি পশু-পাখিও তাঁর স্নেহে বঞ্চিত ছিল না। উঠান সহ তিনটি ঘর দাদু পৈতৃক সূত্রে পেয়েছিলেন। তিনি তা বাড়িয়ে নয়টি ঘর করেছিলেন; বাড়ির সামনের উঠানটি বেশ বড় ছিল, যার মাঝখানে দাদুর আনা পাথরের একটি ঘানি বসানো ছিল। তাঁর বড় ভাইয়ের ঘর ছিল উত্তর দিকে। পুবদিকে ছিল একটি পাকা কুয়ো যা দাদুই খনন করিয়ে ছিলেন। এছাড়া একটা ঘরও ছিল। দক্ষিণ দিকের দুইটি ঘরের মধ্যে একটিকে বৈঠকখানা হিসাবে ব্যবহার করা হত। এই ঘরের দেওয়াল ছিল ইঁটের। শুধু আত্মীয়-স্বজনরাই দিদিমার আতিথ্য পেত তাই নয়, পথ-চলা পথিক ও ভিখিরীরা হামেশাই তাঁর আতিথেয়তা লাভ করত।

জীবনের প্রথম পাঁচ বছর দিদিমা আমাকে কেবল লালনই করেননি, আমাকে তৈরীও করেছিলেন।

দশ-বার বছর বয়সে পিতা গোবর্ধন পান্ডেকে আমার জানার সুযোগ হয়েছিল। বছরে এক সপ্তাহ কি দেড় সপ্তাহের জন্য যখন 'কনৈলা' যেতাম, তখন দূর থেকে তাঁকে ভালভাবে দেখতে পেতাম। তাঁর রঙ ঘনশ্যাম যাকে প্রায় কালোই বলা চলে। লম্বায় ছ-ফুটের কম ছিলেন না। এবং ক্ষীণকায় হওয়া সত্ত্বেও তিনি স্বাস্থ্যবান ছিলেন। অসুখ বিসুখ বিশেষ ছিল না। ক্ষীণকায় হওয়ার কারণ খাওয়া দাওয়ার অনিয়ম ও পূজাপাঠের কড়াকড়ি। স্নান-পূজার আগে তিনি জল পর্য্যন্ত খেতেন না। কাছারিতে মকদ্দমা থাকলে তো বহুবার বিকেল চারটা পাঁচটার সময় তাঁর সকালের জলখাবার খাওয়ার সময় হত। নাক তিনি ঠিকই টিপতেন কিন্তু আহ্নিক তিনি করতে পারতেন কিনা আমার সন্দেহ আছে। আহ্নিককে আমাদের গ্রামে সংস্কৃতের পণ্ডিতদের জিনিস বলেই মনে করা হত। আমার পিতা সংস্কৃতের পণ্ডিত ছিলেন না। তাঁর পাঠের মধ্যে ছিল হনুমান—বাহুক ও রামায়ণ। কনৈলাতে কোন পাহাড়ী নদী থেকে নিয়ে আসা পাঁচ-ছয়টি মসৃণ পাথর একটি পুরানো বটগাছের গোড়ায় রেখে দেওয়া হয়েছিল। স্নানের পর আমার বাবা বেলপাতা সহ জল সেই শিবের মাথায় দিতেন। তারপর গুড়, ঘি ও দেবতার কাঠের আগুনে ধূপ দিয়ে তিনি পাঠ শুরু করতেন। পূজার নিয়মের এই কড়া-কড়ির জন্য গাঁয়ের লোকেরা তাঁকে পূজারী বলত। আরো কিছুকাল পরে তিনি গঙ্গাতীরে গিয়ে চুল-দাড়ি কাটার নিয়ম করেছিলেন। সেই জন্য কখনো কখনো তিন-চার মাস পর্য্যন্ত তাঁর চুল-দাড়ি থেকে যেত। তিনি অত্যন্ত প্রতিভাশালী ছিলেন। মাত্র একমাস তিনি এক ভবঘুরে মুন্সীর কাছ থেকে ক, খ শেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু আমি জানি না কিভাবে তিনি শুধু রামায়ণই নয়, ভগ্নাংশ,

গুণ, ভাগ, সুদকষা এবং জমি জরীপেরও হিসাব শিখে নিয়েছিলেন। খাঁটি আস্তিক হয়েও 'বাবা বাক্যং প্রমাণং' এই বাক্যকে না মানার সাহস ছিল তাঁর। ব্রাহ্মণের নিয়ম লঙ্ঘন করে তিনি তাঁর চাষী নিঃসন্তান 'চিন্‌গী' চামারের মৃত্যুর পর তাকে দাহ করতে গঙ্গাতীরে নিয়ে গিয়েছিলেন। কূপ খননের জন্য তিনি প্রথাসিদ্ধ পদ্ধতি মানেন নি। তিনি নতুন কূপ খননের জন্য বিচিত্র আকারের লম্বা-চওড়া ইঁট তৈরি করিয়ে ছিলেন। প্রচলিত প্রথাকে না মেনে তিনি কূপের নিচের দিকটা চওড়া ও ওপরের দিকটা সংকীর্ণ করেছিলেন। সাধু-সন্তদের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও তিনি গাঁজা-ভাঙখোর সাধুদের পছন্দ করতেন না।

মায়ের দৈহিক আকৃতির সাদৃশ্য ছিল তাঁর পিতার চেহারার সঙ্গে। একই রকম লম্বা, একই রকম হৃষ্টপুষ্ট ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল শরীর এবং ফর্সা রঙ। দুবার সুতিকা জ্বর ছাড়া তাঁর কখনো কোন অসুখ করেনি। দ্বিতীয় বারের জ্বরে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। মায়ের প্রকৃতি সম্পর্কে জানার আমার বিশেষ সুযোগ হয়নি। তবে নিজের মায়ের মতো তিনিও ঝগড়া-ঝঞ্ঝাট থেকে দূরে থাকতেন। তার প্রমাণ মেলে এই থেকে যে গ্রামের সবচেয়ে রুক্ষ ও কড়া মেজাজের শাশুড়ী থাকা সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে কখনো মায়ের ঝগড়া হতে দেখিনি। গীত ও ভজন তাঁর মনে ছিল কিনা বলতে পারি না। কিন্তু একথা অবশ্য মনে আছে, যে-বছর তিনি গোধন পরবের দিন ও তার পরদিন পন্দহা থাকতেন, সেবার আমাদেরই ঘরের দেয়ালে গোবরের প্রলেপের ওপর চিত্র (পিঁড়িয়া) আঁকা হত। মায়ের সইরা পিঁড়িয়া জাগতে আসতেন। দেওয়ালির পরদিন গোধন পূজা হত। ঐদিন আমার মা যখন থাকতেন তখনকার কথা আমার স্মরণ নেই; কিন্তু শুধু দিদিমা থাকলে আমাদের বাড়ির গোধনে যোগ দেওয়া হত না। যার ফলে গোধনে যে চিনির মঠ ও অন্যান্য মিঠাই ভোগ দেওয়া হত তা থেকে আমি বঞ্চিত হতাম। আমার আপসোস থেকে যেত। হ্যাঁ, এক আধবার মা যখন থাকতেন তখনকার 'পিঁড়িয়া জাগরণের' মধুর স্মৃতি আজও মনে পড়ে। যারা রাত জাগত তারা সবাই ছিল তরুণী। তাদের সঙ্গে অনেক ছোট ছোট বাচ্চাও থাকত। কোদোর খড়-বিছানো মেজের ওপর বড় সড় বিছানা পাতা হত। মাথার দিকের দেয়ালে সিঁদুর দেওয়া ছোট ছোট গোবরের টিপ্ লেপটে থাকত। একটি ছোট তেলের প্রদীপ জ্বলত। অর্ধেক রাত পর্যন্ত মা ও তাঁর সইরা গান গাইত। মেয়েদের গান যে আমার বিশেষ ভাল লাগত তা নয়; তবে মিষ্টি ঠেকুয়া (মিঠা পুরী) আমার বিশেষ প্রিয় ছিল। ঠেকুয়া খেতে খেতে আমি ঘুমিয়ে পড়তাম। এই সব গানের মধ্যে কোন গান মা শুরু করতেন, আমার মনে নেই। কিন্তু সকালে এক বা একাধিক পদ্যময় গল্প শোনানোর কাজ মাকে করতে দেখেছি। যে সব মেয়েরা পিঁড়িয়া জাগতে আসত তাদের ধর্মভয়ে এসব গল্প শুনতে হত। আমার খুড়তুত মাসী যখন জলভরা ও বাসনমাজার কাজে যেতেন, তখন তিনি তাঁর আংটি রেখে যেতেন। মা অন্যের সঙ্গে এই আংটিকেও গল্প শোনাতেন।। উপস্থিত সইরা কানে শুনতেন। আর মাসীর অনুপস্থিতিতে আংটিটি গোটা গল্পটা শুনে নিত। এই আংটি আঙ্গুলে পরলেই মাসী গল্প শোনার অংশীদার হয়ে যেত। এই সব গল্পে বারবার 'চেরিয়া' 'চেরিয়া' (ক্রীতদাসী) শব্দটি শুনতে পেতাম যা থেকে বোঝা যেত যে, যে সময়ের পুরানো গল্প শোনানো হত সে যুগে ক্রীতদাস প্রথা ছিল।

আমার দাদু-দিদিমা দীর্ঘজীবী ছিলেন। তাঁদের স্বাস্থ্য ভাল ছিল। বংশানুক্রমে পাওয়া কোন রোগও ছিল না। আমার বাবা-মারও স্বাস্থ্য ভাল ছিল। তাঁদেরও পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া কোন ব্যাধি ছিল না। কিন্তু তাঁরা বেশী দিন বাঁচেন নি। আটাশ উনত্রিশ বছর বয়সে আমার মার মৃত্যু হয়েছিল। বাবার পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ-এ। আমার ঠাকুরমা দীর্ঘজীবী হয়েছিলেন কিন্তু ঠাকুরদার মৃত্যু হয়েছিল চল্লিশ বছরের আগেই। আমার বাবার বংশগতি মজবুত, লম্বা, শালপ্রাংশু জোয়ানের জন্ম দেওয়ার জন্য বিখ্যাত ছিল। কিন্তু দাদুর বংশ সম্পর্কে

এ ধরনের কোন কথা শুনিনি। তবে দাদু ও তাঁর ভাইদের ও প্রমাতামহের কথা মনে রাখলে বলা চলে যে, তাঁরা মজবুত ও লম্বা-চওড়া মানুষ ছিলেন।

২

প্রথম স্মৃতি (১৮৯৬-৯৭)

সবচেয়ে পুরানো স্মৃতি আমাকে সন ৪ (১৩০৪ ফসলী অথবা ১৮৯৭ খৃঃ)-এর আকালের দিনের আগে নিয়ে যায়। পন্দহাতে এই আকালের কি প্রভাব পড়েছিল তা আমার মনে পড়ে না। কনৈলার (বাবার গ্রাম) লোকেদের ওপর কি কি ঘটেছিল তাও আমার মনে নেই। আকালের আগে জীতা ভরের পাড়ায় পঞ্চাশ ষাট জন ছিল। আকালের পর তাদের মধ্যে অবশিষ্ট ছিল মাত্র ছয় সাত জন। ওদের সজীব পরিবার আমি দেখেছি। পরিবারের ছোট ছোট ছেলেগুলো শুওরের বাচ্চার পেছনে ছুটত তাও আমার স্পষ্ট মনে আছে। চার সনের ভীষণ আকালে এই সব লোক ঘর ছেড়ে আসাম অথবা অন্য জায়গায় পালিয়ে যায়। কয়েক বছর তাদের ঝুপড়ির বেড়া দাঁড়িয়ে ছিল। ওদের নিম, মহুয়া ও তালগাছ জমিদার দখল করে নেয়। জীতার ছেলে টিভোলূ গাঁয়ে ফিরে আসে পাড়া উজাড় হওয়ার কিছুদিন পর। ধ্বংসস্তূপ খুঁড়ে আমার খুড়তুত ভাই বিরজু খড়ি নিয়ে আসত।

ঐ আকাল বা তার পরের বছরের কথা। আমাদের ঘরের অন্ধকার কোণে দুটো নতুন কাঁসার থালা পড়েছিল। আমি ঐ থালা দুটিকে ছুঁয়ে দিয়েছিলাম। মা ও পিসিমা তা জানতে পেরে রাগ করেছিলেন এবং আমার হাত ধুয়ে দিয়েছিলেন। এতে বুঝতে পেরেছিলাম যে আকালের সময়ে কয়েক সের আনাজের জন্য কোন চামার তার থালা বন্ধক রেখেছিল।

পুরানো স্মৃতির আর একটি হল—একদিন মার সঙ্গে মামাবাড়ি থেকে কনৈলা আসছিলাম। যখন রওনা হই, তখন আকাশ পরিষ্কার ছিল। কিন্তু রাস্তায় বৃষ্টি নামল। আমি কারু কোলে ছিলাম। আমার হাতে ছিল গুড় মাখানো ছাতুর লাড্ডু। জলে ঐ লাড্ডু ভিজে গিয়েছিল। কিন্তু ঐ লাড্ডুকে সযত্নে হাতের মুঠোয় রেখেছিলাম। আমাদের পরিবারের যে অবস্থা ছিল তাতে আমাদের বাড়ির বৌ-রা পালকিতে বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুর বাড়ি দু-একবারই যাতায়াত করতেন। পরে বউরা লাল চাদরের ঘোমটা দিয়ে হেঁটেই যাতায়াত করতেন। এ ভাবে লাল চাদরের ঘোমটা দিয়ে মা দশ মাইল রাস্তা হেঁটে গিয়েছিলেন। মনে হয় সারা রাস্তায় বৃষ্টি ছিল না।

আকালের সময় পন্দহা অথবা কনৈলার মানুষ কিভাবে ক্ষুধায় মরেছিল, পশুদেরই বা কি হাল হয়েছিল, ধরিত্রী ও বনস্পতি কি ভাবে ঝলসে গিয়েছিল—এই সবের কোনো কিছুই আমার মনে পড়ে না, যদিও ঐ সময়ে আমার বয়েস চার বছরেরও বেশী ছিল। কিন্তু আকালের পরে (১৮৯৮) বর্ষার আরম্ভ আমার ভালভাবেই মনে পড়ে। আমাকে ঐ সময়েই কনৈলা থেকে পন্দহা নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। যখন কনৈলার জনবসতির চারদিকে গাছপালা শূন্য বিস্তৃত উষর জমি, তখন পন্দহার চারদিক গাছপালা ও বাঁশ-ঝাড়ের ছায়ায় ঢাকা ছিল। কিন্তু তখনই আমার মনে হয়েছিল যে ঐ অসামান্য সবুজ নিজের ছায়ায় অন্ধকারকে লুকিয়ে রেখেছিল।

আমার দাদু অথবা বাবা কারু ঘরেই আকালের প্রভাব পড়েনি। বাবার দশ-বার একর জমি ছিল। দাদুর চেয়েও বাবার অবস্থা ভাল ছিল। এই দুই পরিবারেরই আয়ের চেয়ে ব্যয় কম ছিল। বরং যদি আমার স্মৃতির বিভ্রম না হয়ে থাকে তবে বলতে পারি যে এই আকালের সময় আনাজের মূল্য বৃদ্ধির ফলে বাবার যে লাভ হয় তা থেকে তাঁর প্রথম পুঁজি সঞ্চিত হয় যা বেড়ে ক্রমে চার-পাঁচ হাজারে পৌঁছয়।

৩

অক্ষরারম্ভ (১৮৯৮)

সম্ভবত আমার জ্ঞান হওয়ার আগে মার সঙ্গে কনৈলা থাকার সুযোগ মিলত। কিন্তু পরে দাদুর কাছেই আমাকে স্থায়ী ভাবে থাকতে হয়েছিল। দাদুর বাড়িতে আমার মতো নাতি থাকলে সে আদুরে গোপাল হয়ে যায়। কিন্তু আমি তা হয়েছিলাম বলে কেউ কখনো অভিযোগ করেনি। পন্দহাতে আমি ভাল ছেলে বলেই গণ্য হয়েছিলাম। আমার প্রতি দিদিমার ভালবাসার কোনো সীমা ছিল না। দাদুর ভালবাসাও কম ছিল না। কিন্তু দাদু ছিলেন পল্টনের সিপাহী। তিনি নিয়মানুবর্তিতা পছন্দ করতেন। শুধু একবার—তাও লোকদেখানোর ব্যাপার ছিল–তাছাড়া দাদু কখনো আমাকে একটা থাপ্পড়ও মারেননি। কিন্তু দাদুর একটি হুমকি আমার কাছে পঞ্চাশ লাঠির ঘায়ের চেয়ে কম ছিল না। দাদু খেলাধূলা পছন্দ করতেন না। সেই কারণে সারা জীবনই গাছে চড়া হয়ে ওঠেনি। ওঁর কথা শুনলে আমার সাঁতার শেখাও হয়ে উঠত না। কিন্তু মামা বাড়ির পুকুরে একবার ডুবতে ডুবতে বেঁচে গিয়ে কনৈলাতে আমি সাঁতার শিখে নিলাম। দাদু আপ্রাণ চেষ্টায় আমার জীবনকে জেলখানা বানিয়ে দিয়েছিলেন।

ছেলেবেলার সঙ্গীদের মধ্যে আমার দুজনেরই নাম মনে আছে। এই দুজনই আমার সমবয়স্ক ছিল। একজন আমার দাদুর ছোট ভাই-এর ছেলে নরসিংহ। আরেকজন গরীব সতমীর[১] ছেলে মদ্‌ধু। দেহ লম্বা হওয়া সত্ত্বেও আমি দুর্বল এবং ক্ষীণকায় ছিলাম এবং অপেক্ষাকৃতভাবে গায়ের জোরও কম ছিল। দাদুর অতিরিক্ত সাবধানী হওয়াই হয়তো আমার গায়ের জোর কম হওয়ার কারণ। যার জন্য আমার অতিরিক্ত পরিশ্রম হয় এমন কোন খেলার সুযোগ মেলেনি। তখন বর্ষার শুরু অথবা শেষ। সব ডোবা জলভর্তি ছিল। আমার মনে নেই, আমার ধাক্কায় অথবা নিজেই অসাবধানী হয়ে একটা ছেলে একটা ছোট ডোবায় পড়ে গিয়েছিল। কাছাকাছি কোনো লোক ছুটে এসে ওকে সেখান থেকে তুলে আনে।

আমার কোন দোষ ছিল না। কিন্তু দাদু ভেবেছিলেন, আমি জেনেশুনে দুষ্টুমি করেছি। এই সময়ই দিদিমার সঙ্গে পরামর্শ হল—ছেলেকে পাঠশালাতে বসিয়ে দেওয়া হোক। দাদু ঠিক করেন যে আমাকে পাঠশালায় পাঠিয়ে দেবেন। পন্দহা থেকে রানীকিসরাই এর মাদ্রাসা মাত্র এক মাইল। তাই দূরে পাঠানোর জন্য দিদিমার অভিযোগের কোন কারণ ছিল না। একলা যেতে হবে তাই মদ্‌ধুকে সঙ্গে পাঠাবার কথা বললেন দাদু। দুপুরে খিদে লাগতে পারে এই কথা বলায় তিনি শিক্ষক মুন্সী মহাবীর সিংহের নিজের ঘরে আমার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। অল্প বয়স, কি পড়বে—একথা বলায় দাদু বললেন—বসে থাকতে তো শিখবে। অতএব দিদিমাকেও পাঠশালায় পাঠাবার কথা মেনে নিতে হল।

১· দেখ "সতমীর বাচ্চা"

ভাল দিন দেখে (হয়ত নভেম্বরের, ১৮৯৮) এক দিন আমাকে বামদীন মামার সঙ্গে[১] রানীকিসরাইয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হল। দাদুর ধারণা ছিল যে হিন্দীর চেয়ে উর্দুর কদর বেশী। ওঁর এক পিসতুতো ভাই মুনসেফ হয়ে অল্প বয়সেই মরে গিয়েছিলেন। আমার জন্যও দাদু ঐ রকম একটা সরকারী চাকরির কথা ভেবেছিলেন। উর্দু পড়িয়ে আজমগড়ের মিশন স্কুলে আমাকে ইংরেজী পড়াবার ইচ্ছা ছিল তাঁর। তাঁর এই ইচ্ছা কেন ব্যর্থ হল, তা পরের কথা। সময়টা ছিল শীতকাল। রানীকিসরাইয়ের মাদ্রাসা চারদিকে কাঁচা দেয়াল দিয়ে ঘেরা ছিল। সেখানে ছিল গাঁদাফুলের মেলা। রোদ্দুরে আমি চটের ওপর বসে থাকতাম। মদ্ধুও আমার পাশে বসে থাকত। কি ভাবে আমার দিন কাটত মনে পড়ে না। দাদু ঠিকই বলেছিলেন, আমি বসে থাকাটাই শিখছিলাম।

সম্ভবত বেশীদিন আমি রানীকিসরাইয়ে যেতে পারিনি। বাবু মহাবীর (অথবা ভগবান) সিংহ নিজের ঘরের কোনো মারপিটে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তাতে ওঁর শাস্তি হয়েছিল। তাই মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে যায়।

এরপর আমি কোথায় থেকেছি, কি করেছি, তা আমার স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেছে। ১৮৯৯ এর শেষ দিকে আবার রানীকিসরাইয়ের মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়ার আগে একবার কনৈলা থেকে বডৌরা গিয়েছিলাম। গ্রামের সাত-আটটা ছেলে সেখানে পড়তে যেত। ওদের মধ্যে হয়তো আমিই ছিলাম সবচেয়ে ছোট। আমার চেয়ে বয়সে কিঞ্চিৎ বড় আমার কাকা বিরজু আমাকে খুব ভালবাসত। বডৌরাতে উর্দু নয়, হিন্দীর ক-খ শেখানো শুরু হয়েছিল। বিরজু খড়ির কালি তৈরী করে আমাকে শেখাত। গ্রামের জয়করণ আহীরের এক শিংভাঙ্গা গরুকে গ্রামের সব ছোট ছেলেরাই ভয় পেত। গরুটা দৌড়ে গুঁতোতে আসত। সকালে বেলা হওয়ার পর আমাদের দল বডৌরা যাচ্ছিল। উত্তর দিকের বেলে জমির গরুদের মধ্যে সেই শিংভাঙ্গা গরুটাও ছিল। এটা আমাদের কারুরই খেয়াল ছিল না। আমাদের দেখে সেই গরুটা তেড়ে এল। আমরা এদিকে-ওদিকে ছুটে পালালাম। গরুটা যখন আমাদের চার কদমের মধ্যে এসে গেল, তখন বিরজু ওর নতুন হলুদ রঙের ধুতির কাছা খুলে বসে পড়ল। তাতে আমার ভয় ও বিস্ময়ের সীমা রইল না। গরুটা বিরজুর দিকে না গিয়ে আমাদের দিকে তেড়ে এল। কিন্তু আমরা ওর আওতার বাইরে চলে গিয়েছিলাম। বিরজু মুচকি হেসে আমাদের কাছে এল। আমরা প্রশ্ন করায় ও বলল, বসে থাকা মানুষকে গরু বা বলদ গুঁতোয় না। যা প্রত্যক্ষ তাতে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? কিন্তু একথা পরীক্ষা করার জন্য আমার কোনো শিংভাঙ্গা গরুর মুখোমুখি হওয়ার সাহস কখনো হয় নি।

বডৌরাতে হয়তো এক-আধ মাস পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। যাঁরা শিক্ষক ছিলেন, তাঁদের চেহারা পর্যন্ত আমার মনে নেই। তবে একথা মনে আছে যে বর্ণ পরিচয়ের যে বই আমাদের সঙ্গীদের হাতে ছিল তা খড়গবিলাস প্রেসে ছাপা হয়েছিল এবং তাতে সরস্বতীর দাঁড়ানো ছবি ছিল। বডৌরা ও বর্ণমালা শেখার দিনগুলির সবচেয়ে উজ্জ্বল স্মৃতি হচ্ছে বিরজুর। বিরজু আমার খুড়তুতো কাকার ছেলে—একথা বললে মনে হবে আমাদের সম্বন্ধ ছিল অনেকটা দূরের। তা কিন্তু ঠিক নয়, আমার পিতামহ জানকী পাণ্ডের তিন খুড়তুতো ভাই তাঁর সহোদর ভাইয়ের মতোই ছিল। এঁদের মধ্যে বিরজুর বাবা মহাদেব ছিলেন সব চেয়ে ছোট এবং এঁকে জানকী পাণ্ডে অত্যন্ত ভালবাসতেন। সারা পরিবার একই সঙ্গে থাকত। যখন একান্নবর্তী পরিবার ছিল, তখন আমার ও বিরজুর জন্ম হয়েছিল। যদি পিতামহ বেঁচে থাকতেন এবং পিতামহীর স্বভাব

১· দাদুর বড়ভাই শিবনন্দন পাঠকের কনিষ্ঠ পুত্র। দেখ পরি· ৪

অত্যন্ত রুক্ষ না হত, তাহলে আমাদের পরিবার আজও এক সঙ্গেই থাকত। ছেলে বেলাতেই পরিবারের এভাবে ভাগ হয়ে যাওয়াটা আমার বিশ্রী লেগেছিল। তবে শিংভাঙ্গা গরুর সঙ্গে সংগ্রামের বীর বিরজু, এবং নিজে খড়ি এনে আমার অক্ষর পরিচয় করিয়েছিল যে বিরজু তার জন্য আমার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দুইই ছিল। ১৯০০-তে কনৈলায় জোর কলেরা দেখা দেয়। আমিও ঐ সময়ে ওখানেই ছিলাম। আমাদের বাড়ির প্রত্যেকেরই কলেরা হয়েছিল। আমাকে কর্পূরের জল খেতে দিত। ভগবতীর কাছে মানসিকের পর মানসিক করা হতে লাগল। বাড়িতে কলেরা হয়নি এমন কেউ ছিল কিনা বলতে পারব না। তবে আমাদের পরিবারের কেউ মরেনি। কিন্তু তারপর বিরজুর পরিচিত চেহারা আর কখনো দেখিনি। এই আপসোস আমার থেকে গিয়েছিল।

সেরে ওঠার পর পুরানো চালের ভাত ও তেঁতুলের চাটনীর পথ্য আমার অত্যন্ত স্বাদু মনে হয়েছিল।

* * *

১৮৯৯-এর শেষ ভাগে শীতের সময় আমি পন্দহাতে ছিলাম। কিন্তু এ সময় মদ্‌ধু ছিল না। আমি নতুন সহপাঠী দলসিংগারের সঙ্গে রানীকিসরাইয়ের পাঠশালায় ভর্তি হই। নতুন শিক্ষক বাবু দ্বারিকা প্রসাদ সিংহ বেঁটে ও গাট্টা-গোট্টা চেহারার তরুণ। তিনি আমাদের খাতায় ইংরেজীতে সই করতেন। তিনি দু-একখানা ইংরেজী বই পড়েছিলেন কিনা, বলতে পারব না। কিন্তু তিনি নর্মাল পাস করেছিলেন। গোরক্ষপুর শহরে থাকার প্রভাব তাঁর মধ্যে যথেষ্ট ছিল। কথাবার্তা ও পোশাকে তাঁকে বেশ শহুরে মনে হত। তিনি তাঁর পোশাক—সার্ট, কোট, ধুতি—সব সময় পরিষ্কার ঝকঝকে রাখতেন। ব্যায়াম করতেন কিনা আমার মনে নেই। কিন্তু সন্ধ্যার মলত্যাগ করার জন্য লোটা নিয়ে অনেক দূরে চলে যেতেন। ঐ সময় 'বেত ছাড়া শিক্ষা হয় না' শিক্ষাদান সম্পর্কেই এই সিদ্ধান্ত সবাই মানতেন। কিন্তু আমার যতদূর মনে পড়ে, দ্বারিকা সিংহ বিশেষ ঠ্যাঙ্গাতেন না। তবু ছাত্রদের ওপর তাঁর বিশেষ প্রভাব ছিল। তিনি পান খেতে ও সিটি বাজাতে বাজাতে হাঁটতে খুব ভালবাসতেন। কোথাও থেকে তিনি একটা বিলাতী কুত্তীকে এনে পুষেছিলেন। জানিনা, কি ভাবে কুত্তীটার কোমর ভেঙ্গে গিয়েছিল। একমাস ধরে আমাদের মাষ্টারমশাই মেথর লাগিয়ে ওকে শুওরের তেল মালিশ করিয়েছিলেন।

এ সময়ে রানীকিসরাইয়ের জনবসতি ছিল কম। তখনো ওখানে রেলপথ হয়নি। মারোয়াড়ী বা অন্য কোনো ব্যাপারীর দোকানও হয়নি। আজমগড় থেকে জৌনপুর ও বারাণসী যাওয়ার এবং ঘোড়ার গাড়িতে ডাক নিয়ে যাওয়ার রাস্তা রানীকিসরাইয়ের ওপর দিয়ে যাওয়ায় এই জায়গাটার কিছু গুরুত্ব তো নিশ্চয়ই ছিল। আর হয়তো কিছু দিন আগে ওখানে চিনির কারখানাও ছিল। কিন্তু আমি ওখানে যাওয়ার প্রথম দিকে ওখানে পাঁচ-সাতটা মিষ্টির দোকান ছিল যেখানে দুটো বাদ দিলে বাকী সব দোকানে কলাই ও গুড়ের লাড্ডু পাওয়া যেত। পাঁচ-সাতটা দোকানে লবঙ্গ ও হলদে রঙের কাপড়ও বিক্রী হত। ঐ সময় সেলাইয়ের কলও সেখানে পৌঁছতে পারেনি। দাদু আমার কুর্তা নিজের খানদানী দরজি বসইয়ের বুড়ো সলিমকে দিয়ে সেলাই করাতেন। কিন্তু একদিন দেখলাম তিনি জামার মাপ নেওয়ার জন্য আমাকে সরাইয়ে নিয়ে গেলেন। সেখানে এক ক্ষীণকায় সাদা পোশাক পরা মিঞা থাকতেন, যিনি হাড় বেচাকেনার ব্যাপারী ছিলেন। তাঁর বাড়িতে কঠিন পর্দাপ্রথা ছিল। দরজায় চটের পর্দা ঝুলত। দারিদ্র্যের জন্য ওঁর বিবিকে সেলাইয়ের কাজও করতে হত। এই সরাই মেঁহনগরের রাজার রাণী তৈরী করেছিলেন। সেই কারণেই এই জনপদের নাম হয়েছিল রানীকিসরাই। তিনি রাণীসাগর

নামে দীঘি কাটিয়েছিলেন। আমাদের মাদ্রাসা তৈরী হয়েছিল ঐ রাণীসাগরের এক কোণে। মেঁহনগরের রাজা গৌতম রাজপুত হিন্দু ছিলেন। কিন্তু তিনি মুসলমান হয়ে যান এবং ঐ সময়ে অথবা তার কিছু পরে তিনি মেঁহনগর ছেড়ে আজমগড়ে চলে যান।

সরাইয়ের বড় দরজা ও অনেক কক্ষ ঐ সময়েও ছিল। যদিও মেরামত না করার প্রভাব দেখা যেত। সদর দরজার দুইদিকে ইঁটের বড় কক্ষে পায়রার আস্তানা হয়েছিল। সেখানে আমি অন্য ছেলেদের সঙ্গে পায়রা ধরতে যেতাম। সরাইয়ে এক ভবঘুরে পাগলী আশ্রয় নিয়েছিল। সে আমাদের দেখে বিড়বিড় করত। ডাকের ঘোড়াগাড়ি ছাড়া রানীকিসরাইয়ের সড়ক দিয়ে উটের গাড়িও চলত। রাজার পুরনো ধরনের কিছু এক্কাও ছিল। এ সবই রেলপথ হওয়ার আগেকার কথা।

দলসিংগার সম্পর্কে আমার দাদু হত। কিন্তু সমবয়স্কদের মধ্যে শুধু ভাই সম্পর্কই চলতে পারে। আমাদের দুজনের মধ্যে খুব ভালবাসা ছিল। তার কারণ হয়তো এই যে আমাদের দুজনের কেউই ঝগড়াটে ছিলাম না। সকালে বাসি খাবার খেয়ে এক ঘণ্টা বেলা বাড়ার আগেই আমরা মাদ্রাসা পৌঁছে যেতাম। দুপুরে খাওয়ার জন্য ছোলাভাজা বা গুড়মাখা ছাতু আমার গামছায় বাঁধা থাকত। রানীকিসরাইয়ের বাঁদরের বিরাট দলের হাত থেকে তা বাঁচানো সহজ ছিল না। এই বাঁদরের দল রানীসাগরের পাড়ের ওপর বসে থাকত। ঐ দিক দিয়েই ছিল আমাদের যাতায়াতের রাস্তা। রানীসাগরের একদিকে ইঁটের পাকা ঘাট ছিল। সেই ঘাট অনেক জায়গায় ভেঙেচুরে গিয়েছিল। পাশেই ছিল মহাবীরজীর মন্দির। বাঁদরেরা মহাবীরজীর সেনা একথা শুনতে শুনতে আমাদের এই ধারণা হয়েছিল যে এই মন্দিরের জন্যই বাঁদরেরা এখানে থাকে। লালমুখো বাঁদরেরা অত্যন্ত দুষ্টু হয়। বিশেষ করে ওদের দুষ্টুমিটা ছোট ছেলেদের সঙ্গে। একদিন উত্তরপাড়ে মহাবীরের সেনাদের হাত থেকে প্রাণ বাঁচানোর জন্য আমরা দুজন পুকুরের দক্ষিণদিকে যাচ্ছিলাম। একটা শয়তান ছেলে যাকে আমরা দেখিওনি, সে পাড়ের ওপরে বাঁদরদের ঢিল মারে। সঙ্গে সঙ্গে ডজন খানেক বাঁদর খাও খাও করতে করতে আমাদের ওপর চড়াও হয়। দলসিংগার এক দিকে পালিয়ে যায়। আমি পালিয়ে এক বুড়ীর পেছনে লুকোই। বুড়ি যদি না থাকত তাহলে বাঁদরগুলো আমার অবস্থা কাহিল করে দিত।

হিন্দিওলা ছেলেদেরকে ভূপৃষ্ঠের ওপরে মাটির ঢ্যালা দিয়ে লিখে বর্ণমালা শিখতে হত। কিন্তু আমরা যারা উর্দুওলা ছেলে তাদেরকে প্রথম থেকেই সাদা কাঠের পাটার ওপরে গম অথবা চালের লেই থেকে বানানো কালিতে লিখতে হত। সবার সঙ্গে জোরে জোরে চেঁচিয়ে নামতা বলতে হত। দুপুরে খাওয়ার জন্য ছুটি হত — শীতের দিনে এক ঘণ্টার জন্যই, কিন্তু গরমের দিনে সেটা তিন ঘণ্টা কিংবা আরো বেশি, আর আমরা খাবার খেতে বাড়ি চলে আসতাম। শীতে রানীসাগরের ঘাটে কিংবা মহাবীরজির মন্দিরের পাশে আমরা নিজের ছাতু-ভুজা খেতে যেতাম। বাঁদরের ভয় ছিল। কিন্তু এখন আমরাও এক-দেড় ডজন ছেলে এক সঙ্গে।

১৮৯৯ এর শেষদিকে আমি মাদ্রাসায় গিয়েছিলাম। সেই কারণে ঐ বছর জুজবে (প্রাথমিক শ্রেণী) পাস করার প্রশ্ন ছিল না। তবে পরের বছর আমি ও দলসিংগার দুজনেই বে পাস করেছিলাম। তখন প্রাইমারি স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা হত ডিসেম্বর মাসে। নতুন বছরে আমরা নতুন বই পেতাম।

৪

দুই বন্ধু (১৯০১-২)

বয়েসে দলসিংগার আমার চেয়ে কিছুটা বড় ছিল। কিন্তু লম্বায় আমি ওর চেয়ে বড় ছিলাম। দাদুর আদরে ও খেলাধুলা না করতে দেওয়ায় আমি দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। অথচ দলসিংগার ঐ আট-নয় বছর বয়সেই মাথায় মোট নিয়ে ও ছোট খাট কাজ করে আমার চেয়ে অনেক মজবুত হয়েছিল। সকালবেলা যে প্রথম জলখাবার খেত, সে অন্যের বাড়িতে যেত তাকে নিয়ে আসতে। আমি যদি দলসিংগারের বাড়ি যেতাম, তাহলে আমরা দুজন বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়া নিজামাবাদের কাঁচা রাস্তা ধরতাম। দলসিংগার যখন আমার বাড়ি আসত, তখন আমরা পাকদণ্ডীর সোজা রাস্তা ধরতাম। সকালের দিকে সময় মতো গেলেও বিকেলে ঘরে ফিরতে আমাদের হামেশাই দেরী হয়ে যেত। পাঠশালায় ছুটি হতে বিশেষ দেরি হত না। দেরি হত আমরা রাস্তায় ডাংগুলি ও অন্যান্য খেলা খেলতাম বলে। ঘরে ফেরার সময় আমরা নিজামাবাদের রাস্তা ধরতাম কারণ দলসিংগারের পক্ষে ঐটেই ছিল সোজা পথ। তা ছাড়া পাকদণ্ডীর রাস্তা জঙ্গলের ভূতুড়ে-পুকুরের পাশ দিয়ে গেছে। ঐ নির্জন পুকুরে দিন দুপুরেই ভূত নাচত। ওখানে বয়স্ক লোকদেরও একা একা যাওয়ার সাহস ছিল না। সকালের দিকে ওখানে গরু ও রাখালেরা থাকায় আমরা সাহস করে ঐদিক দিয়ে যেতাম। কিন্তু সন্ধ্যায় কোন ভরসায় ঐ দিক দিয়ে যাব? যখন দিদিমার সঙ্গে ওদিক দিয়ে যেতাম, তখন ওখানে পৌঁছবার পর তিনি খুব শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে বলতেন, 'জয় ঠৈয়া-ভুইয়াঁকে বাবা সাহেব। জহা রহৈ বাল গোপালকো নিকে বনায়ে রাখা,' এই বলে প্রার্থনা করতেন। আমিও 'বাবা সাহেবের' নাম নিতাম কিন্তু পুরোপুরি ভরসা হতনা। বড় রাস্তায়ও ঠুঁটো অশ্বত্থের 'বাবা সাহেব' ছিলেন। কিন্তু ঐটে বড় রাস্তা। দ্বিতীয়ত, বাবা একলা ও আমরা দুজন। তাছাড়া আমরা এও ভেবে রেখেছিলাম যে 'বাবা' যদি প্রকট হন, তবে আমরা ঝট করে তাঁকে মামা বলে ডেকে উঠব। আর ভাগ্নের ওপর মামার হাত ওঠাবার সাহস থোড়াই হবে?

শ্রাবণ মাসে গ্রামের বেশ কয়েক জায়গায় গাছের ওপর দোলনা ঝোলানো হত। গ্রামের বউ ও তরুণীরা রাত্রিতে সেই দোলনায় দুলত। কাজরী গাইত। আমরা ছেলেরা তো সারাদিনই দোলনায় দুলতাম। শুনে অথবা নিজেরা বানিয়ে এক আধ পদ কাজরী গাইতাম, 'রুনঝুন খোলা হো কেবড়িয়া, হাম বিদেশওয়া জইবে না।' এই পদ আমার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। কিন্তু আমি এই পদের শেষ দিকের অর্থই বুঝতাম।

গ্রামের ছেলেরা বর্ষায় কাবাডি ও শীতের দিনে অন্য খেলা খেলত। কিন্তু দাদুর ভয়ে আমার খেলা প্রথম দিকেই শেষ করে ফেলতে হত। পয়সাঅলা পরিবারের মর্যাদা জাহির করার জন্য একদিন দাদু আমার হাতেপায়ে রুপোর মোটা মোটা বালা ও কানে সোনার মাকড়ি পরিয়ে দেন। গহণার জন্য ছোট ছোট ছেলেদের মৃত্যুর অনেক গল্প তিনিও জানতেন। কিন্তু ঐতিহ্যকে কে ভাঙতে পারে? মনে হয় সেদিন দাদু গ্রামে ছিলেন না। আমি ও দলসিংগার গ্রামে কাবাডি খেলায় যোগ দিয়েছিলাম। আমরা দুজন দুই পক্ষে পড়ে গিয়েছিলাম। আমি যখন কাবাডির হানা দিচ্ছিলাম, তখন দলসিংগার আমাকে পাকড়ায়, ধস্তাধস্তিতে আমার হাতের বালা ওর সামনের দাঁতে এত জোরে লাগে যে ওর দাঁতের এককোণা ভেঙে পড়ে যায়। ভাগ্যিস, ঠোঁটগুলো খোলা ছিল বলে বেঁচে গেল। এই জন্য দলসিংগার আমার ওপর একটুও রাগ করেনি। কিন্তু আমি ঘাবড়ে গেছিলাম। ভাঙা দাঁত ওর একটি স্থায়ী চিহ্নে পরিণত হয়েছিল।

খাস পন্দহা থেকে আমরা দুজনেই পাঠশালায় যেতাম, যদিও পন্দহার কাছাকাছি থেকে যারা যেত তাদের সংখ্যা বেড়েও ছিল। গ্রামের দক্ষিণ দিকে বেশ কিছু দীঘি ও পুকুর ছিল। যেগুলো বসই আর অন্য গ্রামগুলো পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল। পন্দহায় চারটি ছোট পুকুর ছিল। তার মধ্যে মহামাইকি পুকুর গ্রামের লোকের স্নানের কাজে আসত। এই পুকুর-সমষ্টির পশ্চিম পাড়ে বসই ছিল মুসলমানদের গ্রাম। বসই-এর গোরস্থানে অনেক পাকা কবর ছিল, যেগুলো বলে দিচ্ছিল ঐ গ্রামের সৈয়দ পরিবারের অবস্থা একদা ভাল ছিল। ঐ সময়ে বসইএর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ইতিহাসের কোনো গবেষকের মত ছিল না। বসইয়ের সৈয়দদের চারজন আর কোইরীদের ছেলে হীরা আমার মাদ্রাসার বন্ধু ছিল। হীরা তো আমার ক্লাসেই পড়ত। সৈয়দ আর কোইরী ছাড়া বসইয়ে মুসলমান দরজি, ধুনুরি ও জোলাদের অনেক ঘর থাকত। আশেপাশের অনেক গ্রামেই বসইয়ের তাজিয়া বিখ্যাত ছিল। তাজিয়া দেখা ছাড়াও আমি কতবার বসই গ্রামে পৌছে গেছি। বসইয়ের পুরনো ধ্বংসাবশেষের ওপর বসে আতা খেতাম। আমার বন্ধু সৈয়দজাদাদের মধ্যে দুজনের বয়স ছিল আমার চেয়ে বেশী। দুজন ছিল আমার সমবয়সী। ওদের মধ্যে দুজন আনোয়ার হোসেনের ছেলে; আর দুজন কাকা-ভাইপো তার প্রতিবেশী। এই সৈয়দদের জমি প্রায় সবই বিক্রী হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় মনে হত, এরপরও এরা ফর্সা কুর্তা-পায়জামা পরে কি করে! আনোয়ার মিঞা তো ঘরেই থাকত। কিন্তু তার প্রতিবেশীর ঘরের একজন সিংহাপুর পিলাঙে—হ্যাঁ, লোকে তো পিলাঙ (পিনাঙ)-ই উচ্চারণ করত—চাকরি করত। হাঁ, সৈয়দদের যে সব ঘর টিকে ছিল তার চেয়ে ভেঙে যাওয়া ঘরের সংখ্যা ছিল বেশী। এই সব ঘরে যারা বাস করত তাদের সুদিনের সাক্ষ্য দিত জোড়া দেওয়া ইট, দরজা ও জানালা। অন্য জাতির মুসলমান বসইয়ের হয়তো আদি বাসিন্দা ছিল। সৈয়দরা বাইরে থেকে এসেছিল তাতে সন্দেহ নেই। সৈয়দরা ছিল শিয়া। মুসলমান জমানায়, বিশেষত জৌনপুরের শর্কী বাদশাহদের সময় বর্তমান সৈয়দদের পূর্বপুরুষদের বসইয়ে এসে বসাটা কিছু তাজ্জব ব্যাপার ছিল না। ওদের ঘরে কঠিন পর্দাপ্রথা ছিল। কিন্তু আমাদের মতো ছোটো ছেলেরা বন্ধুদের সঙ্গে বিনা বাধায় অন্দরে চলে যেতে পারতাম।

আশপাশের আরো কিছু শিয়া-সৈয়দদের সঙ্গে আমার দাদুর ঘনিষ্ঠতা ছিল। আনোয়ার মিঞার ব্যাপারে তো বলছি না, তবে অন্যেরা যখন আমাদের ঘরে আসত, তখন তারা নিজের হাতে জল গড়িয়ে খেত। হিন্দুদের হাতে ছোঁয়া—তা তারা ব্রাহ্মণই হোক না কেন—কোনো জিনিস ওরা খেত না। গ্রামবাসীরা এই কট্টরতা খুব প্রশংসা করত। মির্জা সলিম উকিলের মুহুরী একবার আমার জন্য মখমলের ফুলতোলা টুপি এনেছিল। ছেলেবেলার সংস্কার খুব স্থায়ী হয়; হয়ত ওই সময়ের কিছু শিয়া ব্যক্তিদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল বলে আমার মনে শিয়া সমাজের জন্য একটা বিশেষ স্থায়ী স্নেহ ও সম্মানের ভাব গড়ে উঠেছে।

* * *

দাদুর আদর ভালবাসা খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও আমার বিশেষ রুচি জন্মে দিয়েছিল। আমি ডাল ভালবাসতাম না। কেননা দুধ-দই, চিনি-গুড়ের পিঠা ও মাছ তরকারি দিয়ে রুটী খাওয়া আমার অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। হয়তো আমার জ্ঞান হওয়ার আগেই আমার এই রুচি অন্যেরা মেনে নিয়েছিল। সেইজন্য আমাকে ডাল খাওয়াবার জন্য কেউ পীড়াপীড়ি করত না। পন্দহাতে ধানের খেত ছিল না। তবে 'সাঠী' ধান হত, কিন্তু ভাত আমার একেবারে ভাল লাগত না। আমার জন্মের আগেই দাদু-দিদিমা বৈষ্ণব দীক্ষা ও তুলসীর কণ্ঠী নিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে তাঁরা গয়ার মন্দির হয়ে এসেছিলেন। তাই তাদের সঙ্গে মাছ-মাংসের কোনো সংশ্রব ছিল না। কিন্তু আমার জন্য মাছ-মাংসের ব্যবস্থা করতে তাদের কোনো সংকোচ ছিলনা। আমার দুর্বল,

ক্ষীণ শরীরের জন্যও দাদুকে এই ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। গ্রামে মাংস নমাসে-ছমাসে পাওয়া যেত যখন গাঁয়ের কোনো সৌখীন লোক খাসী কিনে তা ভাগাভাগি করে নিত। কিন্তু মাছ খাওয়ার সুযোগ হামেশাই মিলত। শিঙ্গি, গড়ুই-এর মতো মাছ জ্যান্ত পাওয়া গেলে দুই-চার সের এনে বলদের জাবনা খাওয়ার বড় মাটির গামলায় জিইয়ে রাখা হত। এই গামলায় জল আর মাটি ছাড়া আর কিছু দিতে দেখিনি। তা থেকে আমার এই মনে হয়েছিল যে মাছ মাটি ও জল খায়। ওদের আর কিছুর দরকার নেই। যখন খুব ছোট ছিলাম তখন কি ভাবে মাছ রান্না হত, আমার মনে নেই। কিন্তু জ্ঞান হওয়ার পরে দেখেছি উঠানে অথবা গোয়ালে মাছ রান্না হত। দিদিমা মশলা বেঁটে দিতেন আর কিভাবে রান্না করতে হবে তা বলে দিতেন। আমের মরশুমে মাছে অবশ্যই আম দেওয়া হত। আকাশের আম আর পাতালের মাছের সমাবেশ পুণ্যের ব্যাপার বলেই ধরে নেওয়া হত। যতদিন মাছ মজুত থাকত, আমি দুধ-তরকারির কথা ভুলে যেতাম। সাধারণত সকালে দই রুটি, দুপুরে দুধ রুটি ও রাত্রিতে দুধ অথবা তরকারীর সঙ্গে রুটি খাওয়া হত। দইয়ের সঙ্গে গুড় চিনি পিষে শেষ বার যে সীরা ('ঠোসারী') বেরুত, তা জরুরী ছিল। 'ঠোসারী' সীরা আমি অত্যন্ত ভালবাসতাম। গুড় দুবার জাল দেওয়ার জন্য তাতে এক ধরণের সোঁদা গন্ধ হত এবং তার সঙ্গে কিছু চিনির তলানিও ওতে থেকে যেত। দাদু কোনো কারখানার লোককে দু-একশ টাকা ধার দিয়ে রেখেছিলেন। তারই সুদ থেকে সীরা আসত।

পোশাকের প্রয়োজনীয়তা আমার খুব কম ছিল। মামুলি দুটো পাতলা ধুতি, একটা গামছা —যা প্রথম প্রথম লাল-('কিরৌঞ্জী') মাটি দিয়ে রঙ করা পাওয়া যেত। অন্য দিন-গুলোতে সুতির পাঞ্জাবী, কিন্তু শীতে উলের অথবা আধা-উলের কাপড়ের বোতাম বসানো আংরাখা থাকত। টুপী হারিয়ে ফেলতে আমি খুব ওস্তাদ ছিলাম। অনেক-বার কুর্তার গলার সঙ্গে টুপী সেলাই করে দেওয়া হত। খালি মাথায় মাদ্রাসা যাওয়া রীতিবিরুদ্ধ ছিল। নয়তো টুপী হারানোতে আমি ও আমার বাড়ির লোক যে রকম হয়রান হত, তাতে মাথাখালি থাকা ভাল ছিল। একবার দাদু কোনো রেশমী কাপড়ের দু-পরতের টুপী আমার জন্য সেলাই করিয়েছিলেন। দু-চার দিনও আমি ওটাকে ঠিক রাখতে পারিনি। সন্ধ্যায় মাদ্রাসা থেকে বাড়ি যাওয়ার সময় দেখলাম টুপী হাওয়া। দাদু বকবে এই ভয়ে পন্দহা যাওয়ার নাম কি করে করি? এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করতেই অন্ধকার হয়ে গেল। মাদ্রাসার কাছে দাদুর পরিচিত এক ছুতার ছিল। সে বলদের গাড়ির চাকা ও অন্যান্য জিনিষ তৈরী করে বেচত। নানা অজুহাত দেখিয়ে আমি সেখানে রাত কাটাতে চাইলাম। শীতের দিন। পরনের জামা কাপড় ছাড়া আমার কাছে আর কিছু ছিল না। ছুতারও গরীব। সে আমাকে একটা বস্তা দিল। মাথা বাইরে রেখে আমি বস্তার ভেতর ঢুকে শুয়ে রইলাম। দুঘণ্টা যেতে না যেতে, দাদু খুঁজে হয়রান হয়ে ওখানে পৌঁছান। জিগ্যেস করায় ছুতার বলল 'ওখানে শুয়ে আছে।' বস্তার ভেতর আমাকে দেখে দাদুর রাগ কোথায় পালাল জানি না। ওঁর মনের ভিতর কি হচ্ছিল, তা আমি বলতে পারব না। কিন্তু কিছুক্ষণ দেখে খুব মিষ্টি করে বললেন, 'টুপী হারিয়েছিস সেজন্য ভয় পাওয়ার কি আছে। তোর দিদিমা তোর খাবার অপেক্ষায় কাঁদছে।'

আমরা বাড়ি পৌঁছালাম। হয়তো ঐ সময়ই কুর্তার সঙ্গে টুপী সেলাই করে দেওয়ার ব্যবস্থা হল। আর কিছুদিন পর্যন্ত সেরকমই চলল।

গ্রামের অন্যান্য ছেলেদের মতো আমার জন্যও জুতা অনাবশ্যক বলেই ধরে নেওয়া হত। যাগেশের বিয়ের (১৯০৪ অথবা ৫) সময় আমার জন্য প্রথম জুতা কেনা হয়। জুতা আমার পায়ের চেয়ে বেশ ছোট ছিল। কিন্তু মুচী কাঠের টুকরো ঠুকেঠুকে ঐ জুতা বড় করে দেয়। ওর কাছে আর কোনো জুতা ছিল না। তাই দাদু ঐ জুতা নিতে বাধ্য হয়েছিল। বরযাত্রীদের মধ্যে

এক পাটি জুতা কোথাও হারিয়ে গিয়েছিল অথবা হয়তো কুকুরে নিয়ে গিয়েছিল। তাই দ্বিতীয় পাটি ফেলে দিয়ে কয়েকদিন পর্যন্ত আমাকে মিছিমিছি কেটে-যাওয়া খালি পায়ের শুশ্রূষা করতে হয়। বর্ষার দিনে ফিতে-ওয়ালা খড়ম গ্রামের জন্য অত্যন্ত জরুরী ছিল। এই খড়ম শুধু কাদাই নয়, পশুর মল ও মূত্র মিশ্রিত কাদায় পায়ের আঙুলে যে ঘা হয়, তা থেকেও বাঁচাত।

বর্ষাতে মাদ্রাসায় যেতে হত। বই বোধ হয় বিদ্যালয়েই রেখে আসতাম। কেননা কোনো দিনই আমার কাপড়ের ছাতা ছিল না। বাঁশের ছাতা বেশ মজবুত হত, আর সস্তায়ও পাওয়া যেত। কিন্তু আমি খুব কমই তা ব্যবহার করেছি। কতবার রানীকিসরাই থেকে ভিজেই আমাকে বাড়ি আসতে হয়েছে। কিন্তু ছেলেবেলায় বৃষ্টিতে ভেজাটা খারাপ লাগত না। তবে বিদ্যুতের চমক ও গুড়গুড় আওয়াজ-এ বুক কাঁপত। এ সময়ে ঘরে থাকলে দিদিমা 'ভগবান তুমহারি শরণ' বলতেন। কিন্তু রাস্তায় আমার বেশ ভয় ভয় করত। টোস নদী পন্দহা থেকে দুই মাইল উত্তরে ছিল। কিন্তু বন্যা হলে এই নদীর জল গ্রামের সীমানা পর্যন্ত এসে যেত। ঐ সময়ে গ্রামের নারী-পুরুষ ঘরে গঙ্গা চলে এসেছে মনে করে তাতে স্নান করতে যেত। আমার ধারণা ছিল, বোধহয় গঙ্গার জল বন্যায় এখানে চলে আসে, এই জল তো এখন এখান থেকে নিচে গিয়ে গঙ্গায় মিশবে—এ নিয়ে চিন্তা করার কষ্ট স্বীকার করতে আমি রাজী ছিলাম না।

* * *

১৯০১-এর শীত। আমার বয়স তখন আট বছর। মৌলবী ইসমাইলের 'অলিফ'-এ যে বই পড়ানো হত, তা 'পানা-জানা-খানা' (আরম্ভ) থেকে শেষ পর্যন্ত আমার মনে ছিল। আসলে যা পড়ানো হত তা আমার পক্ষে তিন চার মাসের কাজ ছিল। বাকী সময়টাতো ছিল দিন কাটানো। কত যে সময়ের অপব্যয় হত। কিন্তু ঐ সময়ে তার খেয়াল বিশেষ ছিল না। এতো আমি সনাতন নিয়ম বলেই মনে করতাম। ঐ বছরের শীতকালে পন্দহায় জমি জরীপের আমিন আসে। আমাদের দুই দরজা ছিল ওদের আস্তানা। আমার গল্প শোনার বড় শখ ছিল। দিদিমার গল্প বলা তো কবেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। একবার শোনা গল্পকে আমি দ্বিতীয়বার শুনতে পছন্দ করতাম না। সতমী ও তার মেয়ে সুখিয়ার গল্পের ঝুলিও ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। যখন কোনো নতুন লোক, বিশেষত স্ত্রীলোক, আমাদের বাড়িতে রাত্রে থাকতে আসত, তখন আমি সবচেয়ে খুশী হতাম। আমি তার কাছ থেকে দুয়েকটা গল্প শুনতামই। কিন্তু মুশকিল ছিল এই, অন্য ছেলেরা গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ত, অথচ গল্প শুনে আমার ঘুম পালিয়ে যেত। আমিনের লোকজন ওরা একাধিক ছিল—জরীপের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক ছিল না আর আমিনের কাগজপত্র-এ নিজের নাম লিখিয়ে নেওয়ার জন্য দিদিমার মতো আমার কোনো মাথাব্যথা ছিল না। দাদু নিজের নামের সঙ্গে কাগজপত্রে আমার নামও লিখিয়ে নিয়েছিলেন যার বিরুদ্ধে আত্মীয়রা আপত্তি করেছিল। জমির বিলি ব্যবস্থার জন্য যে ডেপুটি এসেছিলেন (আমার ও তাঁর নাম একই ছিল) সেই পণ্ডিত কেদারনাথ আমার পিঠ ঠুকে দাদুকে বলেছিলেন—নাম লিখিয়ে কি করবে, ছেলেটাকে খুব লেখাপড়া শেখাও। আমার মনে হয়েছিল, আমিও কি ডেপুটি হয়ে ওদের মতো চেয়ারে বসে মকদ্দমার বিচার করতে পারব। আমিনের লোকজনের সঙ্গে আমার খুব মেলামেশা হয়ে গিয়েছিল কেননা, ওরা আমাকে গল্প শোনাত যার অধিকাংশই ছিল বইয়ের গল্প। ওদের গল্পের মধ্যে একটি ছিল কাঠের উড়ন্ত ঘোড়ার গল্প।

ডিসেম্বরে বার্ষিক পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পর দু-এক সপ্তাহের ছুটি মিলত। আমি কনৈলা চলে যেতাম। পন্দহাতে যতটা পিঞ্জরে বদ্ধ থাকতাম, কনৈলাতে ততটাই স্বাধীন। সকাল থেকে এক প্রহর রাত পর্যন্ত আমি খেলায় মশগুল থাকতাম। শুধু খেতে যেতাম ঘরে। কখনো কখনো

কোনো ঠাকুরমার ঘরে খাওয়া হয়ে যেত। বছরে একবার আসতাম বলে কাছাকাছি অন্যান্য পরিবারের লোকেরাও আমাকে ভালবাসত। হয়তো আমি ঝগড়াটে স্বভাবের ছিলাম না বলেই তা সম্ভব হয়েছিল। ঐ সময় কনৈলার ধান কাটা হত। কনৈলার ধান ও রবি ফসলের খেত সমান সমান ছিল। লম্বা-চওড়া পতিত জমি ছিল 'হাপড়' (দেহাতী-হকী) খেলার চমৎকার মাঠ। অজ্ঞাত কাল থেকে কয়েক শ' প্রজন্ম ওখানে হাপড় খেলছে। আজও লোকেরা খেলা করে। ছেলেরা তো খেলতই কিন্তু খিচড়ী (মকর সংক্রান্তি)-র কাছাকাছি সময়ে যুবক ও প্রৌঢ়রাও হাপড় খেলত। আমি হাপড়,ডাংগুলি সব খেলাতেই থাকতাম। কিন্তু আমি যে দলে থাকতাম সে দলের ক্ষতিই হত। পন্দহাতে সারাবছরের লাগাম আমাকে দৌড়ঝাঁপের অযোগ্য করে রাখত, তাহলে এখানে কি আর বাহাদুরি দেখাতাম। বিরজু আর এখন নেই। কিন্তু আমার দ্বিতীয় কাকা 'কৃষ্ণা'—যাকে আমি কিন্না বলে ডাকতাম—আমার খেলার সাথী ছিল। আমরা দুজন সমবয়স্ক ছিলাম। ওর তীর-ধনু দেখে আমিও তীর-ধনু বানিয়ে আঠা দিয়ে তীরের মুখে কাঁটা আটকে রাখতাম এবং দুজনে পাখি শিকার করতে যেতাম। কিন্না কোনো পাখি শিকার করেছিল কিনা আমার মনে নেই। বোধহয় ঐ তীর-ধনু শিকারের উপযুক্তও ছিল না। কিন্তু আমি তো কোনোদিন একবারও লক্ষ্যভেদ করতে পারিনি। গ্রামের পুকুর অথবা ডোবাতে—যাদের সংখ্যা বেশ ছিল—আমরা দুজন মাঝে মাঝে মাছ মারতে যেতাম। সেখানেও, কিন্না যেখানেই হাত দিত সেখান থেকেই সে গড়ুই, ট্যাংরা,অমোয় ও শিঙ্গী মাছ তুলত। আমি হাত দিলে পুঁটি বা কুঁচো চিংড়ীও পেতাম না। কিন্তু শিঙ্গী ও ট্যাংরার কাঁটা হাতে ফোটার সুযোগ হয়েছিল বহুবার। কিন্তু মাছ যে-ই মারুক না কেন, পাতার আগুনে পুড়িয়ে তা আমরা দুজনেই খেতাম।

কনৈলাতে হামেশাই মাংস পাওয়া যেত। ওখানে অনেক মুসলমান পরিবার ছিল যারা চুড়ি বেচত। ওরা ক্ষার, ক্ষার মেশানো মাটি ও অন্যান্য মশলা দিয়ে নিজেরাই চুড়ি বানাত। তখনও দেহাতে ফ্যান্সি কাঁচের চুড়ির প্রচলন হয়নি। সেজন্য ঐ চুড়ির খুব চাহিদা ছিল। সব মজুরদের মতো এই চুড়ি যারা বানাত তারা কোনও রকমে দিন গুজরান করতে পারলেই সুখী হত। প্রত্যেক মাসে ওদের ওখানে এক আধটা খাসী কাটা হত। আমিও ওদের কাছ থেকে মাংস নিতাম। ওদের অনেক লোকই আমাদের বাড়ি থেকে ধার নিত। এজন্য ওরা আমার ওপর বিশেষ খেয়াল রাখত। আমাদের বাড়িতে বেশির ভাগ ভক্ত লোক ছিল। সে জন্য বাইরে গোয়ালে আমাকে মাংস রান্না করতে হত।

যারা উর্দু পড়ত, তারা কালি দিয়ে কাগজে লিখত। কিন্তু যারা হিন্দী পড়ত, তারা নিজেদের কাগজ লণ্ঠনের কালি মাখিয়ে তা কাঁচে ঘসে ঝকঝকে করত এবং সাদা খড়ির কালি দিয়ে লিখত। কনৈলা থেকে আমি অনেকগুলি মোটা কাঠের কলম বানিয়ে এনে আমার হিন্দী-অলা বন্ধুদের ভালবেসে উপহার দিতাম। চুড়ি-অলাদের অধিকাংশের সঙ্গেই আমার কাকা, দাদা সম্পর্ক ছিল। (গ্রামে এই সম্পর্ক মেনে চলার খুব কড়াকড়ি ছিল।) তারা আমার এই দাবি অস্বীকার করত না।

কিন্না ও অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে আমি মাঝে মাঝে কড়ি খেলতেও যেতাম। কিন্তু এই খেলাতেও আমি সব সময় হেরে যেতাম।

পন্দহার জীবন থেকে কনৈলার এই স্বাধীনতা আমাকে খুব টানত। পরীক্ষার পর ছুটির জন্য সারা বছর অপেক্ষা করতাম। পন্দহাতে গরমের সময় পুরানো অন্ধকার গোলাঘরে যেখানে মাছি ও গরম কম হত, দাদু সেখানে ঘুমোতেন। তখন দিদিমার কাছ থেকে কোনো না কোনো অজুহাতে আমি বাইরে বেরিয়ে যেতাম। বাগানে রোদ ও লু'কে পরোয়া না করে অনেক খেলোয়াড় জড় হত। বেশীর ভাগ সময়ই চিভী-ডাণ্ডী, চীকা অথবা উল্‌হাপাতীর খেলা হত।

উল্হাপাতীর খেলা আমার আয়ত্তের বাইরে ছিল। কারণ আমি গাছে চড়তে জানতাম না। তবে চিভী-ডাণ্ডী অথবা চীকা খেলায় আমি যোগ দিতাম। দুজনের দল হলে কোন ব্যাপার ছিল না। কিন্তু পাঁচ জন করে অথবা ছয় জন করে চিভী দলে থাকলে আমার জোড়ার উপর লক্ষ ঠিক রাখা আয়ত্তের বাইরে ছিল। কিন্তু অন্য জোড়ার চিভীকে ছুঁয়ে দিলে যা কিছু জেতা হত তা জলে যেত। আমাকে এও খেয়াল রাখতে হত যে দাদু ঘুম থেকে ওঠার আগেই আমাকে বাড়ি পৌছতে হবে। দাদুর গরম লু'র জন্য খুব দুশ্চিন্তা ছিল। কিন্তু লু'র চেয়েও দিদিমার বেশী ভয় ছিল দুপুরের ছোট বড় ধুলোর ঘূর্ণির ভেতরের ভূত ও পেত্নীর। তবে ওঁর ভরসা ছিল এই যে ঐ সময়ে বাগানে আরও অনেক ছেলে খেলা করত।

* * *

প্রথম শ্রেণীতে (১৯০২ খৃঃ) পৌছতে পৌছতেই বাবু দ্বারিকা প্রসাদ সিংহ বদলি হয়ে যান এবং তাঁর জায়গায় রানীকিসরাইয়ের শিক্ষক হয়ে আসেন বাবু পত্তর সিংহ। এই শিক্ষকের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি ছিল। মাঝখান দিয়ে টেরিকাটা ওঁর মাথার অনেক চুলই সাদা হয়ে গিয়েছিল। উপরের দিকে তুলে তিনি গোঁফে তা দিতেন। ওঁর এক পায়ে গোদ ছিল। হয়তো সেই কারণেই ধুতির একদিক পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত নেমে আসত, অন্য দিক হাঁটু পর্যন্ত নেমে এসেই থেমে যেত। বাবু দ্বারিকা প্রসাদ সিংহকে আমি পূজা—পাঠ করতে দেখিনি। 'রাজপুত' (!) পত্রিকা তিনি অবশ্যই আনাতেন। বাবু পত্তর সিংহ খুব পূজা করতেন। এসেই তিনি চার দেয়ালের কিনারে সদর দরজার কাছে তুলসীর মঞ্চ বেঁধে দিয়েছিলেন। গাঁদা, বেল ও অন্যান্য ফুল লাগানোর দিকেও তাঁর খুব নজর ছিল। তুলসী মঞ্চের কাছেই চৌরাই শাক ও করলার কেয়ারী হয়েছিল। কিন্তু ওঁর সম্পর্কে আমাদের যে আসল কথাটা জানার ছিল, তা হল ওঁর রাগ, নির্মমভাবে ছেলেদের পেটানো। এই কারণেই আমাদের চোখে তাঁর পূজা-পাঠের কোনো গুরুত্ব ছিল না। সবচেয়ে বুদ্ধিমান হওয়ার দরুণ স্কুলে আমারই সবচেয়ে কম মার খাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু বাবু পত্তর সিংহ আসার দু সপ্তাহও তখনো হয় নি, একদিন সকালে যখন আমি আমার পড়া বলছিলাম, তখন কি ভুল হয়েছিল জানি না, উনি ওঁর খাটিয়ার নিচ থেকে খড়ম তুলে আমাকে মারলেন। ওটা এসে আমার হাঁটুর নিচের হাড়ে লাগল। আর রক্ত বেরতে লাগল। সবচেয়ে বুদ্ধিমান ছেলেরই যখন এই অবস্থা তখন মন্দ আর সাধারণ ছেলেদের তো কথাই নেই। ছেলেরা তাঁর ভয়ে কাঁপত। আমরা ধীরে ধীরে তাঁর নানা মুদ্রার সঙ্গে পরিচিত হয়ে গেলাম। বেশীর ভাগ সময়ই তিনি চেয়ারে বসতেন না; খাটিয়াতে বসে পড়াতেন। আর পড়াতে পড়াতে ঘুমিয়ে পড়তেন। ঘুমোবার পর মাথার চুল এলোমেলো হয়ে যেত। তখন আমরা বুঝতে পারতাম যে তাঁর রাগের পারা সবচেয়ে চড়ে যাওয়ার সময় হয়েছে। তার ওষুধও আমাদের জানা হয়ে গিয়েছিল। তাঁর ঐ অবস্থা দেখে কারুর জন্য অপেক্ষা না করে স্বেচ্ছায় যে কোনো দুটি ছেলে (কেননা ওর যখন হাত ছুটত তখন কে অপরাধ করেছে, কে করেনি তার কোনো প্রশ্ন ছিল না) ছুটে যেত। একজন থেলোর জল পাল্টাতো, আর একজন কল্কেতে অঙ্গার দিয়ে নতুন ছিলিম তৈরী করে আনত। আর বাবু পত্তর সিংহ মৃদু হেসে এক হাত দিয়ে মাথার চুলে হাত বোলাতেন, অন্য হাতে নারকেলের হুঁকো ধরতেন।

তাঁর স্মৃতিতে শ'খানেক প্রবচন ছিল, আর তা বলার চমৎকার সুযোগও ছিল। হাত যখন ছড়ির মার বর্ষণ করত তখন ওঁর মুখ থেকে প্রবাদের ঝড় বইত। দুখনাথ রায় আমার ক্লাসেরই ছেলে ছিল। লেখাপড়ায় ও বেশ দুর্বল ছিল। আর তাই মাদ্রাসায় আসতে তার খুব আপত্তি

ছিল। বেচারীর মার খাওয়া অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। তার জন্য ওর শরীরে বেশ মাংসও ছিল। বেশ কয়েক দিন গরহাজির থাকার পর ওকে ধরে মাদ্রাসায় পৌছে দিয়ে ওর বাড়ির লোক ঘরে ফিরে যায়। দুধনাথের কানে নতুন বড় বড় সোনার মাকড়ি ছিল। বাবু পত্তর সিংহ ওর শরীরে একটি সবুজ বাঁশের ছড়ি ভাঙ্গতেন। আর বলতেন, 'একে তো বানর নোনা, তার ওপরে কানে সোনা'। আমার মনে হয়েছিল, দুধনাথের জন্য তিনি তখনই এই প্রবচন তৈরী করেছিলেন। ওঁর অনেক প্রবচন ছিল যা শুনলে হাসি পেত। কিন্তু মার খাওয়ার সময় বলে যাওয়া প্রবচন নিয়ে হাসার সাহস কার? কাউকে হাসতে দেখা মাত্রই তিনি বলে উঠতেন 'হাসছ, এদিকে এসো তো, কী, এখানে রেণ্ডী নাচ হচ্ছে? আচ্ছা, হাস।' আর ছড়ির বর্ষণ শুরু হত।

যখন প্রসন্ন থাকতেন, তখন তিনি খাটিয়ায় শুয়ে পড়তেন। ছেলেরা ওঁর সারা শরীর টিপে দিত। তিনি ব্রাহ্মণ ছেলেদের পা ছুঁতে দিতেন না। তখন তিনি গল্প বলতে শুরু করতেন। যখন তিনি জেলার দক্ষিণ সীমানায় চঁদওয়কের পাশে স্কুলে পড়াতেন, তখন তিনি প্রত্যেক রবিবার গঙ্গাস্নান করতে যেতেন। তিনি একদিনের কথা বলছিলেন, "স্নান করে ফিরছিলাম, অন্ধকার হয়ে আসছিল, আমি লম্বা লম্বা পা ফেলে পাকা বড় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। একবার পেছন ফিরে দেখি, বড় রাস্তার নিচ দিয়ে কেউ চুপচাপ যাচ্ছে। এক মাইল এগিয়ে দেখলাম, সেই লোকটা তখনো আমার সঙ্গে সঙ্গে চলছে। আমি জিগ্যেস করায় জবাব মিলল, 'এঁস, এঁদিক দিয়েই চঁল নাঁ।' নাকী সুর শুনে আমি তো চমকে উঠলাম। কিন্তু আমি বড় রাস্তার নিচে কেন নামতে যাব? জান তো, পাকা বড় রাস্তা সরকার বাহাদুরের খাস রাস্তা। সেখানে এসে কোনো ভূত-প্রেতের কথা বলার হিম্মত ছিল না। গোটা সময়টা ও আমাকে নিচে ডাকতে লাগল। কিন্তু আমি সড়কের মাঝখান দিয়ে চলতে লাগলাম। আরো এক-আধ মাইল আমার পেছন পেছন এসে সে বলে চলে গেল, 'আঁচ্ছা, যাঁ, খুঁব বেঁচে গেঁলি।"

বাবু পত্তর সিংহের কথা মনে করে আমার মনে হত, হায়। আমাদের পন্দহার রাস্তা কাঁচা না হয়ে যদি পাকা হত, তবে 'ঠুঁটো অশ্বত্থের বাবা'কে অনায়াসে বুড়ো আঙ্গুল দেখানো যেত।

* * *

আষাঢ় (জুন অথবা জুলাই, ১৯০২) মাস। তখনো বর্ষা শুরু হয় নি। আজ মাদ্রাসাতে সারাদিন চট সাফ করা, গোবর দিয়ে ঘর লেপা এবং গাঁদার চারা রোপণের কাজ হচ্ছিল। দলসিংগারও কাজ করছিল। দুপুরের দিকে দলসিংগার কাজ ছেড়ে বসে রইল। বলতে লাগল, ওর শরীরে ব্যথা হচ্ছে। দুপুরের পর দু-একবার বমি হল। আজ আগে ছুটি হয়ে গিয়েছিল। কারণ পড়া বন্ধ করে সব ছেলেই সাফাই-এর কাজে লেগে গিয়েছিল। আমি দেখলাম, দলসিংগারের চোখ লাল, শরীর গরম। ও বলতে লাগল,—শরীর ফেটে যাচ্ছে। আমরা দুজন বাড়ির দিকে রওনা হলাম। কোনো রকমে আমরা রানীসাগরের ঢিবি পার হলাম। যখন দলসিংগারের এক পা হাঁটাও কঠিন হয়ে উঠল, অন্য কোনো উপায় না দেখে, ওকে আমার পিঠে নিয়ে চললাম। এমনিতেই আমার শরীর দুর্বল; তার ওপর মেহনত করা আর বোঝা বওয়ার অভ্যাস ছিল না আমার, এক-একবারে দশ-পনের পা'র বেশী চলার ক্ষমতা ছিল না। বসে পড়লে দলসিংগার পায়ের ব্যথায় কাঁদতে শুরু করত। আমি ওর পা টিপতাম আর কাঁদতাম। রাত হয়ে যাবে এই ভয়ে জোর করে ওকে তুলতাম, আর একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হত। জানি না, কত শত বার ওঠ-বস করে আমরা সন্ধ্যা পর্যন্ত পন্দহাতে পৌছলাম।

সকাল বেলা দিদিমা বলছিলেন,—'আমরা তো আগুনে আছিই, ছেলেটাকে কনৈলা পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। প্রচুর কলেরা হচ্ছে।'

দাদু রাজী হয়ে গেলেন। একজন লোকের সঙ্গে আমাকে কনৈলা পাঠিয়ে দেওয়া হল।

৫

রানীকিসরাইয়ে পড়াশোনা (১)

কনৈলার কলেরায় আমাদের পরিবারের কেউ মরেনি, একথা বলেছি। মনে হয় রোগের সময় আমার ঠাকুরমা শতচণ্ডীপাঠ (একশবার চণ্ডীপাঠ) মানসিক করেছিলেন। তখন চণ্ডীপাঠ চলছিল। চণ্ডীপাঠ করছিলেন আমার পিসামশাই পণ্ডিত মহাদেব পাণ্ডে ও তাঁর মাসতুতো ভাই মহাবীর তেওয়ারী। মহাবীর তেওয়ারী এক একটা অক্ষর ঠেকে ঠেকে পড়তেন। কিন্তু পিসামশাই তরতর করে পড়ে যেতেন। ওঁর কাছে নস্যের কৌটো ছিল। মাঝে মাঝে তিনি নস্য নিতেন। সন্ধ্যায় নস্য ভর্তি রুমাল সাফ করা হত। সকালে পাঠ শেষ করার পর ঘরের সুগন্ধী চালের চিড়া গরম দুধে ভিজিয়ে জল খাবার প্রস্তুত থাকত। মনে হয় তারপরে আবার পাঠ চলত। পাঠ হত সংস্কৃতে। চণ্ডীপাঠের সহজ ভাষায় অর্থ করা হয় না। দুপুরের ভোজনের পর আবার বিশ্রাম। বিকালে তিনটে চারটে নাগাদ পিসামশাইকে অন্দরে ডেকে আনা হত। মেজেতে অনেকে বসতেন। সামনে বসতেন আমার মা, সম্ভবত কাকীমা ও আমার কোনো পিসিমা, কুটুম্বদের মধ্যে হয়তো আরো দুইতিন জন কাকীমা-পিসিমা। জামাইকে স্বাগত জানানোর জন্য এই ধরনের পারিবারিক সম্মেলনের প্রথা ছিল। তাতে ওঁর মনোরঞ্জন হত। কথাবার্তার বিষয় ছিল পারিবারিক হালচাল ও কিছু খোশ গল্প। পিসামশাইয়ের সঙ্গে খুব তাড়াতাড়ি আমার বেশ ভাব হয়ে গেল এবং এক-আধবার ওঁর এই পারিবারিক সম্মেলনে আমিও হাজির ছিলাম। শ্রাবণের বর্ষণ শেষ হয়েছিল এবং কনৈলার পুকুর ডোবা, নালা সব জলে ভরে গিয়েছিল। সন্ধ্যায় পিসামশাই পুবদিকে অনেক দূরে চলে যেতেন এবং সেখানে শৌচস্নান করে ফিরতেন।

পিসামশাই মহাদেব পণ্ডিত সম্পর্কে আমি অনেক কথা শুনেছিলাম। তিনি বিরাট পণ্ডিত,—এতবড় যে কাছাকাছি দশ বিশ ক্রোশের মধ্যে তাঁর মতো কেউ ছিল না। এত পড়াশোনা করার জন্য তিনি একবার একটা গোটা বছর পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। ঐ সময়ে আমার এই বিশ্বাস হয়েছিল যে, যেমন বেশী খেলে ভোজনের অজীর্ণ হয় তেমনি বেশী পড়াশোনা করলে বিদ্যার অজীর্ণ হয়। কিন্তু সংস্কৃতে শতচণ্ডী পাঠ শেষ হতে সম্ভবত এক মাস লেগেছিল। এরপর পিসামশাই নিজের গ্রামে যাওয়ার সময় আমাকেও সঙ্গে নিয়ে গেলেন। মনে হয় তিনি আমার পরিবারের কাছ থেকে আমাকে সংস্কৃত পড়াবার সম্মতি নিয়েছিলেন। কনৈলা থেকে বছওয়ল তিন মাইলের বেশী নয়। আমি পিসামশাইয়ের সঙ্গে তাঁর ঘোড়ায় চড়ে গেলাম। রাস্তায় মঙ্গই নদীতে প্রচুর জল ছিল। আমাকে কাঁধে নিয়ে তিনি নদী পার হলেন।

বছওয়াল-এ এই আমি প্রথম গেলাম। পিসিমাকে আমি এ পর্যন্ত দেখিনি। কয়েক বছর ধরে তিনি কনৈলা আসেনই নি। ওখানে চার পাঁচ জন স্ত্রীলোক ছিলেন,যাঁদের মধ্যে দুজনের পোশাক-আশাক গয়না-গাঁটির বিশেষত্ব ছিল। আমি এটা বুঝেছিলাম যে, এঁদের মধ্যে একজন আমার পিসিমা। কিন্তু আমার পিসিমার বড় জা যাগেশের মাকেই আমি পিসিমা ভেবেছিলাম। বছওয়ল-এ আমার বয়সী অনেক ছেলেমেয়ে ছিল। তাদের মধ্যে যাগেশ আমার সমবয়স্ক হওয়ায় আমার সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা হয়েছিল। পরের বছরগুলোতে আমার নিজের পিসিমার ছেলে নয় বরং তার খুড়তুত ভাই যাগেশই আমার ঘনিষ্ঠ মিত্র ও বন্ধু হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে আমার সম্বন্ধে অন্যান্যদের কৌতূহল কেটে গেল। পিসামশাই মহাদেব পণ্ডিতের সংস্কৃত ব্যাকরণে বিশেষ অধিকার ছিল। তিনি মহাভাষ্যান্ত ব্যাকরণ পড়েছিলেন এবং যে বই তিনি পড়েছেন তা তাঁর বেশ কণ্ঠস্থ ছিল। তাঁর কাছে অনেক জমি-জমা আর অন্ন-ধন ছিল। অতএব তাঁর পক্ষে বিদ্যাকে অন্য কোনোভাবে ব্যবহার করার প্রয়োজন ছিল না। তিনি ওখানেই নিজের ঘরে ছাত্রদের সংস্কৃত পড়াতেন। অধিকাংশ ছাত্রই হত সারস্বত, চন্দ্রিকা, আর মুহূর্ত চিন্তামণির, কিন্তু অনেকেই সিদ্ধান্তকৌমুদীও। পড়ত। আশেপাশের গ্রাম থেকে ছাত্ররা যাতে মুষ্টিভিক্ষার অন্ন পায় পিসামশাই সেই ব্যবস্থা করে দিতেন। কিন্তু সিদ্ধান্তকৌমুদীর অর্ধেক বা এক চতুর্থাংশ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছাত্ররা বারাণসী দৌড় দিত। বারাণসীর কাছাকাছি হওয়াটা মহাদেব পণ্ডিতের পাঠশালার উন্নতির পথে বড় বাধা ছিল।

এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই পিসামশাই আমাকে সারস্বত পড়াতে শুরু করে দিলেন। 'নত্বা সরস্বতীং দেবীং' ও তার পরের পাতাও আমি কণ্ঠস্থ করে ফেলেছিলাম। আমার ভীষণ তীব্র স্মরণশক্তি ছিল। পিসামশাই চাইতেন যে আমি সংস্কৃত পড়ি। আমি ভাবি, হায়, যদি আমাকে পিসামশাই-এর কাছে পড়ার জন্য রেখে দেওয়া হত। সংস্কৃত খুব পড়তাম। সারা বই কণ্ঠস্থ করে ফেলতাম। কারণ তখনো আমার এই ধারণা হয়নি যে মুখস্থ করা খুব খারাপ। শুধু সংস্কৃত পড়লে আমি কি চিন্তার স্বাধীনতা হারাতাম না? বলতে পারিনা। বারাণসীতে তো যেতামই; হয়তো সেখানে কোনো চৌরাস্তার ওপরে পড়ে থাকতাম। বছওয়লএ খেলাধূলার স্বাধীনতা ছিল। পিসামশাইয়ের বাড়ির পুবদিকে একটা কুয়া ছিল, যার জল একসঙ্গে দুটো ডোঙা দিয়ে তুললেও কমে যেত না। আমার ছেলেবেলার বন্ধুরা গম্ভীরভাবে আমাকে বোঝাতো যে, 'ঐ কুয়ার মাটি যখন কাটা হচ্ছিল, তখন কুয়ার নিচে থেকে এত জল আসছিল যে যারা কুয়া কাটছিল তাদের যখন দড়ি বেঁধে টেনে ওপরে নিয়ে আসা হল, তখন জল বেড়ে কুয়ার মুখ পর্যন্ত এসে গিয়েছিল।' আমি দম বন্ধ করে বললাম, 'কুয়ার মুখ পর্যন্ত!' বন্ধুরা বুঝিয়ে দিল, 'তারপর পূজা করা হল। উৎসের মুখ লেপ ও জাঁতা দিয়ে বন্ধ করা হল। তবে গিয়ে জল বন্ধ হল।' আমরা ভাবতাম, এই সব ব্যবস্থা না করা হলে কুয়ার মুখ থেকে জল উপচে পড়ে খেত-খামার ডুবিয়ে দিত এবং শেষ পর্যন্ত বন্যা হয়ে গোটা গ্রামের সর্বনাশ করত।

এক মাস যেতে না যেতেই পন্দহার খবর কনৈলা হয়ে বছওয়ল পৌঁছল; দিদিমার লোক অপেক্ষা করছে, পন্দহা যেতে হবে। নতুন বন্ধুদের ছেড়ে যেতে মন খারাপ হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু পন্দহাতে দিদিমার শীতল কোল ও মধুর স্নেহ অপেক্ষা করছিল। আর সেখানেও দলসিংগারের মতো বন্ধু ছিল।

পন্দহা পৌঁছে বুঝতে পারলাম যে আগের কলেরায় গ্রামের দশ-বার জন মারা গেছে। কিন্তু দলসিংগার বেঁচে গিয়েছিল। দেবী একজন স্ত্রীলোকের উপর ভর করে বলেছিলেন, 'আমি তো রাস্তায় রাস্তায় চলে যাচ্ছিলাম। এই দুই ছেলে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। যাক্, একে ছেড়ে দেব, কিন্তু গ্রাম থেকে কিছু না নিয়ে যাব না।' সম্ভবত ঐ অসুখের সময় দলসিংগারের কাকা ভগবতীর মন্দির স্থাপনার মানসিক করেছিলেন।

দলসিংগারের সঙ্গে আমি দেখা করে এলাম। ও তখনো বেশ দুর্বল ছিল। দু'চারদিন পরে আমাকে মাদ্রাসায় যেতে হল। কিন্তু মাদ্রাসায় যাওয়ায় আগের উৎসাহ ছিল না আমার। কারণ দলসিংগারের মা একটা কথা বলে ওর পড়া ছাড়িয়ে দিলেন—'আমার দুই বড় ভাসুর এই ঘর থেকে এক খাটে উঠে চলে গেছে। ওরা যে বই পড়ত তার স্তূপ আজও এই ঘরে আছে। বুঝলে

বাবা, আমার ঘরের ছেলেদের লেখাপড়া সহ্য হয় না; তুমি বেঁচে থাক—এই যথেষ্ট।'

দলসিংগারকে জবরদস্তি আটকানো হয়েছিল। আমি ওকে কি সাহায্যই বা করতে পারতাম। মাঝে মাঝে দুজনের দেখাশোনা হত। কিন্তু তখন আর ওর সঙ্গে পড়া, খেলা ও চলার আনন্দ ছিল না।

মাদ্রাসায় আমার এক সহপাঠী ছিল শোভিতলাল। আমার ক্লাসে ও ছাড়া আর কেউ উর্দু পড়ত না। দলসিংগার স্কুল ছেড়ে দেওয়ার পর রাজদেও পাঠক আর গ্রামের পাটোয়ারীর ছেলে বসন্তলালকে আমার স্কুলের সঙ্গী হিসাবে কিছুদিনের জন্য পেয়েছিলাম। দুজনই লেখাপড়ায় দুর্বল ছিল, তার ওপর বাবু পত্তর সিংহের ছড়ির কথা মনে হতেই সবাইয়ের প্রাণ কেঁপে উঠত। একবার রাজদেও এক সপ্তাহ নিজেও স্কুলে যায়নি, আমাকেও যেতে দেয়নি। রাজদেও আমার চেয়ে বেশ বড় ছিল। প্রথম দিন খেলতে খেলতে দেরি করে রাজদেও বলল,—এখন গেলে মুন্সীজী মারবে। ও ঠিকই বলেছিল। আমরা যাইনি। দ্বিতীয় দিন তো ডবল মার নিশ্চিত ছিল। এভাবে প্রতিদিন আমরা রানীকিসরাইয়ে পড়ার নাম করে বেরোতাম; আর বিকেলে ঠিক সময়ে বাড়ি ফিরে যেতাম। কয়েকদিন পর দাদু আত্মীয় বাড়ি থেকে ফিরছিলেন। তিনি ভাবলেন, ছেলেটাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাই। মাদ্রাসায় গিয়ে মাস্টার মশাইকে জিগ্যেস করে জানতে পারলেন, ও তো এক সপ্তাহ ধরে স্কুলে আসেইনি। বাড়ি ফিরে তিনি দিদিমাকে জিগ্যেস করে জবাব পেলেন—,ও তো রোজ নিয়ম করে পড়তে যায়। দাদু খোঁজ করতে বেরোলেন। ওদিকে আমার খেলার সঙ্গীদের কাছে আমি আগেই সব খবর পেয়ে গিয়েছিলাম। আমি দিদিমার কোলে এসে লুকোলাম। দাদু বাঁশের সবুজ ছড়ি নিয়ে এলেন। তাঁর চিৎকারেই ভয়ে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। তার ওপর তিনি দেয়ালে চার-পাঁচ ঘা মারলেন। পরদিন বাবু পত্তর সিংহের দরবারে আমাকে পৌঁছে দেওয়া হল। দাদু ফিরে আসার পর তাঁর পাঁচ-সাত ছড়ির ঘা ঠিক আমার শরীরে পড়েছিল।

পরে গ্রামের পাটোয়ারীর ছেলে বসন্তলাল বোধহয় আমার সঙ্গী হল। ওর ও সেই একই মন্ত্র ছিল। প্রথম দিন দেরি করল। তারপর বাড়ি থেকে স্কুলের জন্য বেরিয়ে, রানীসাগরের কিছু দূরে এক ভাঙ্গা নীলের গুদামের ভেতর লুকিয়ে রইলাম। জানাজানি হয়ে গেল। মার খেলাম। কিন্তু এরপর থেকে এই ধরণের সঙ্গীদের পরামর্শের ব্যাপারে সতর্ক হয়ে গেলাম।

একা স্কুলে যাওয়ার সময়ের একটা ঘটনা। কুকুরকে আমি খুব ভয় করতাম। আমাদের রাস্তা থেকে কিছু দূরে চামারদের পল্লী ছিল। সেখানকার এক জবরদস্ত কুকুর ছিল, যাকে আমি প্রচণ্ড ভয় পেতাম। অন্যান্য দিন সে অন্য কোনো যাত্রীর সঙ্গে বেরিয়ে যেত। ঘটনাক্রমে আমি একদিন এক দিক থেকে আসছিলাম। আর অন্য দিক থেকে আসছিল সেই কুকুর। রাস্তার মোড় ও আখের খেতের জন্য আমরা একে অন্যকে দেখিনি। আমার মনে নেই, আমাকে দেখে কুকুরটা ডেকে উঠেছিল কিনা। আমার তো মনে হয়েছিল, আমি সাক্ষাৎ যমের মুখে এসে পড়েছি। তাই প্রাণ হাতে করে আমি কুকুরকে আক্রমণ করে বসলাম। বস্তুত আক্রমণ করার জন্য আমার হাতে না ছিল ডাণ্ডা না ঢিল আমি তার ওপর চড়ে বসলাম। মনে হয় ওর মুখ আমার হাতে ছিল। যাই হোক, দুয়েকবার আমাকেও সে পটকে দিল, দুয়েকবার তাকেও আমি পটকে দিলাম। বুঝলাম কুকুরটা আমার চেয়েও বেশী ভয় পেয়েছিল। আর আমার হাত একটু আলগা হতেই ও দৌড়ে পালাল। কুকুরকে এভাবে পরাস্ত করায় গর্ব হবে কি, আমার কলজে তো এখনো ধড়ফড় করছিল। ফল হয়েছিল এই যে, কুকুর আমাকে কোথাও কামড়াতে পারেনি।

তখনো রানীকিসরাইয়ের স্কুল লোয়ার প্রাইমারি ছিল। বাবু পত্তর সিংহের সময় ছেলে বেড়েছিল। যার সব কৃতিত্ব লোকে তাঁকেই দিত। বস্তুত এই সময় গ্রামগুলোতে শিক্ষা বাড়ছিল। রানীকিসরাইয়ে বালমুকুন্দ নামে এক সজ্জন ব্যক্তি থাকতেন। বড় রাস্তার ওপরেই তাঁর বাড়ি ছিল। প্রথম থেকেই রেষারেষির জন্য তিনি নিজের এক আলাদা স্কুল খুলেছিলেন। এই স্কুল খোলার জন্য বাবু পত্তর সিংহের সঙ্গে তাঁর রেষারেষি বেড়ে যায়। বালমুকুন্দ পণ্ডিতের স্কুলে পঁচিশ ত্রিশটি ছেলে পড়ত। এ থেকে মনে হয়, ছাত্র বেড়ে যাওয়ার কারণ হল শিক্ষার জন্য বেশী আগ্রহ। আমাদের স্কুল ছিল জেলা বোর্ডের। এর ওপরে সরকারের দাক্ষিণ্য ছিল। কিন্তু মুকুন্দের স্কুল চলত তাঁর নিজস্ব সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করে। বালমুকুন্দ পণ্ডিত কিছু ইংরিজিও জানতেন। এই কারণেও তাঁর ছাত্র পাওয়ার সুবিধা ছিল। সম্ভবত এই স্কুল বাবু পত্তর সিংহের মৃত্যু পর্যন্ত চলেছিল।

যা হোক, বাবু পত্তর সিংহ আসাতে একটা সুবিধা হল, মাদ্রাসা আপার প্রাইমারি স্কুল হয়ে গেল। অন্য একজন শিক্ষক মুন্সী আবদুল কাদির সহ-শিক্ষক হয়ে এলেন।

৬

প্রথম যাত্রা

পড়াশোনার কাজ আমার পক্ষে একেবারে কোনো মুস্‌কিলের ছিল না। বস্তুত চারমাসের পড়াশোনার জন্য আমার বার মাস নষ্ট হত। আগেই বলেছি দাদুর গালগল্প করার অভ্যাস ছিল। বাড়িতে থাকার সময়ও যখন অবসর হত—আর দাদুর অবসরের অভাব ছিল না, তাঁকে স্রেফ শ্রোতার কথা ভাবতে হত কারণ শ্রোতা ছাড়া গল্প বলা যায় না—তখন তাঁর পুরনো অভিজ্ঞতার কথা শুরু হত। যেমন নিদ্রিত মূর্ছিত অবস্থায় শব্দেরা ভিড় করে আসে, খেয়াল থাকে না কোন কথা কখন শুরু হয়েছে সেই রকম আমারও জ্ঞান হওয়ার আগেই দাদুর গল্প বলা শুরু হয়েছিল। কিন্তু কোন সময় থেকে আমি দাদুর গল্প শুনতে শুরু করেছিলাম, তা আমার মনে নেই। শীতকালের রাত্রিতে খাওয়া-দাওয়ার পর আগুনের সামনে অনেক রাত পর্যন্ত গল্প হত। ঘুমোবার সময়ও দাদুর গল্প বলার সময় ছিল। এই দুই সময়ই দাদুর কাঁখে অথবা কোলে বসে থাকতাম। গল্প শুনতে যত ভাল লাগত, দাদুর শিকার অথবা ভ্রমণের গল্প তার চেয়ে কম ভাল লাগত না। পরে আমি ভারতের ভূগোল পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। কিন্তু কামঠী-অকোলা-বুলভানা-ঔরঙ্গাবাদ- বোম্বাই-শিমলাই নয়, কোচিন বন্দর—আরো গোটা পঞ্চাশেক নাম দাদুর কাছে শুনে নিয়েছিলাম। এই সবই আমার মনে আছে। বস্তুত দাদুর এই গল্পই আমার ভূগোল পড়া ভাল লাগার কারণ ছিল। তাঁর গল্পে যেমন নানা ব্যক্তির, দেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রান্ত ও সেখানকার ভাষার উল্লেখ থাকত তেমনি সঙ্গে সঙ্গে ভূমির প্রাকৃতিক স্বরূপের কথাও থাকত। বাঘ শিকারের সময় দাদু আর্দালি হয়ে তাঁর কর্নেলের সঙ্গে সর্বদাই থাকতেন। পাহাড়ে ও জংগলে কিভাবে বাঘ থাকে? কিভাবে বাঘ পরিবার খেলা করে? বাঘ শিকারে কতটা সাবধান হতে হয়, ঝুঁকি নিতে হয়?—এই সবকিছু জানার অনেক উপাদান থাকত দাদুর গল্পে।

দাদুর রেজিমেন্ট থাকত হায়দরাবাদের জালনা ছাউনিতে। দাদু অনেকবার অন্য নামে অজন্তা, এলোরা, আর ঔরঙ্গাবাদের গুহাগুলির বর্ণনা করতেন। অজন্তা ও এলোরার গুহার মূর্তিগুলি সম্পর্কে তাঁর ব্যাখ্যা ছিল; রামজী বনবাসে যাবেন, এই কথা মনে রেখে বিশ্বকর্মা পাহাড় কেটে এই সব মহল তৈরী করিয়েছিলেন। এখানে দেবতারা বাস করবেন, তাই রামজীর বনবাসের কষ্ট হবে না। কিন্তু মহল বানিয়ে যখন বিশ্বকর্মা ব্রহ্মাকে খবর দিতে গেলেন, তখন রাক্ষসেরা ওখানে এসে বাস করতে লাগল। ফিরে এসে তা দেখে বিশ্বকর্মার ভীষণ রাগ হল; তিনি শাপ দিলেন—তোমরা সব পাথর হয়ে যাও। দাদুর ধারণা অনুযায়ী অজন্তা এলোরার গুহার প্রতিমা আসলে পাথর হয়ে যাওয়া রাক্ষস। তিনি খুব গম্ভীরভাবে ভ্রূ-কুঁচকে দিদিমাকে বলতেন—'রাক্ষস যে যেখানে ছিল, সে সেইখানে পাথর হয়ে গেল। যে মদ খাচ্ছিল তার বোতল তার হাতে ও মুখে সেভাবেই লেগে রইল। যে নাচছিল সে সেইভাবেই নাচতে থাকল, যে শুয়েছিল অথবা যে বসেছিল, সে ওইভাবেই শুয়ে বসে রইল। আজও দেখলে মনে হবে, এখনই উঠে কথা বলবে।' দিদিমা প্রোৎসাহিত করে বলতেন—'কে জানে শাপ ছুটে গেলে, ওরা আবার বেঁচে উঠতে পারে।'

পন্দহাতে আরো এক ব্যক্তি ছিলেন যার কথা শুনতে আমার বড় মজা লাগত। তিনি ছিলেন জৈসিরী (জয়শ্রী পাঠক)। তিনি কানা ছিলেন এবং এই ধরনের মানুষকে অল্পেতেই 'কানা' বলে ব্যঙ্গ করা সহজ মনে হতে পারে। কিন্তু কাউকে জৈসিরীকে[১] ঐ কথা বলতে শুনিনি। হাঁটু পর্যন্ত ফর্সা ধুতি, দেহে বা মাথায় ঐ রকম সাফ গামছা, পায়ে ফিতে বাঁধা খড়ম, হাতে বাঁশের ছাতা বা লাঠি। এই মানুষটির কৃশ কিন্তু সবল মূর্ত্তি এখনো আমার চোখের সামনে ভাসে। যে সময়ের কথা বলছি, তখন তাঁর বয়স চল্লিশের বেশী। কিন্তু ছেলেবেলায় তিনি বরাবর রাখালের কাজ করেছেন, পরেও তাই করেছেন। তাই সর্বত্রই আমি তাঁকে রাখাল ছেলেদের মধ্যেই দেখেছি। অনেক গল্প মনে ছিল তাঁর। আর সারা বছর যে সব শ্রোতাকে তিনি গল্প শোনাতেন, তাদের প্রত্যেকেরই চিত্ত বিনোদন করতেন তিনি। দাদু তো আমাকে সদরআলা বা ডেপুটি কালেক্টর করতে চেয়েছিলেন। তাই ঘাস কাটা বা মোষ চরানোর সুযোগ তিনি আমাকে কেন দেবেন? তবু কোনো না কোনো অছিলায় আমি জৈসিরীর মণ্ডলীতে হাজির থাকার সুযোগ করে নিতাম। গোচরণে ছুটি থাকলে জৈসিরীকে কখনো কখনো রামায়ণের অর্থ করতে শুনেছি। ঘানির কাছে আগুন পোয়ানোর সময়ও তাঁর কথা আমি শুনেছি। এ সময়ে ঐ অসাধারণ প্রতিভাবান কিন্তু সুযোগ থেকে বঞ্চিত মানুষটাকে আমি এক চিত্তবিনোদনকারী ব্যক্তি বলেই জানতাম। কিন্তু ও যদি সুযোগ পেত তা হলে ও কি হত সে বিষয়ে আমার চৈতন্য ও আপসোস হয়েছিল সারা দুনিয়া ঘুরে আসার পর।

সম্ভবত ১৯০২-এর এপ্রিলে আমার উপনয়ন হয়েছিল। সাধারণত আমাদের পরিবারে ধূমধাম করে উপনয়ন হত। মণ্ডপ বানানো হত। কলসি সাজানো হত; আম কাঠের নতুন পিঁড়ি ও লেখার জন্য কাঠের পাটা তৈরী করা হত; পণ্ডিতেরা আসতেন। অনেক বেলা পর্য্যন্ত পূজা ও মন্ত্রোচ্চারণ হত; ছেলেকে ধুতি ল্যাঙ্গট পরানো হত; কাঁধে মৃগচর্ম্ম বাঁধা হত; হাতে পলাশের দণ্ড দিয়ে 'পড়াশোনার জন্য কাশীতে পাঠানো হত'; তবে পনের মিনিট পরেই 'ফিরে চল, তোমার বিয়ে দেব'—এই বলে মণ্ডপের এক কোণ থেকে ওকে ফিরিয়ে আনা হত।

১· দেখ আমার গল্প "জৈসিরী" ("সতমীকে বাচ্চে")

যখন আমি শুনলাম যে আমার উপনয়ন গান-বাজনা, ধূমধামের সঙ্গে বাড়িতে হবে না, হবে বিন্ধ্যাচলে, তখন আমার খুব অসন্তোষ হয়েছিল। মা বা অন্য কেউ আমার দীর্ঘায়ুর জন্য এই মানসিক করেছিলেন। তা না মেনে অন্যরকম করে কে বিন্ধ্যাচলের জাগ্রত দেবীর কোপে পড়তে চায়? তাই নিরুপায়। একদিন বাবার অনুজ আমার কাকা প্রতাপ পাণ্ডে আমাকে পন্দহা থেকে নিয়ে যেতে এলেন। মাসটা ছিল এপ্রিল। কিছুটা গরম পড়েছিল। প্রথম কনৈলা গেলাম। সেখান থেকে ১৪ মাইল হেঁটে গেলাম সাদাত স্টেশনে। ঐ সময়ে রানীকিসরাইয়ে রেল পৌছেছিল কি না বলতে পারব না। সম্ভবত রেলের জন্য জমি মাপা হয়ে গিয়েছিল। আমি তখন পর্যন্ত রেলে চড়িনি। বেলা দু-তিনটা নাগাদ আমরা সাদাত পৌছাই। ট্রেন আসবে সূর্য অস্ত গেলে। গাঁটরি কম্বল, ঘটী ও দড়ি ছাড়া কাকার হাতে ছিল মাটির ভাঁড়ে সের দেড়েক গাওয়া ঘি। বিন্ধ্যাচলে পুরী তৈরী করে ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য ঘি আনা হয়েছিল। সন্ধ্যায় সাদাত স্টেশনের কাছে পুকুরের পাড়ে কাকা ডাল-বাটি, হয়তো আলুর ভর্তাও বানিয়েছিলেন। খাওয়া-দাওয়া হল। গাড়ি আসার পর আমরা গাড়িতে উঠলাম। ভিড় ছিল কিনা বলতে পারব না। এও মনে নেই রেলের চলন্ত ঘরে আমার কি মনে হয়েছিল।

অলইপুর (বেনারস শহর) স্টেশনে যখন নামলাম, তখন রাত। শহরে ঢোকার আগে চুঙ্গীওয়ালারা আমাদের ঘিরে ফেলল। আরও অনেক দেহাতী মুসাফির ছিল। কিছুটা অপেক্ষা করার পর আমাদের পালা এল; গাঁটরি খুলে দেখল। হয়তো ঘির ওপর কিছুটা চুঙ্গী লেগেছিল। বাবার মামা ঈসরগঙ্গীর এক ছোট বৈরাগী মঠে থাকতেন। আমরা ওখানেই উঠলাম।

বারাণসী থেকে বিন্ধ্যাচল পর্যন্ত সব কথা আগাগোড়া মনে নেই। যাওয়া ও আসার সময় আমরা দুবারই ঈসরগঙ্গীর মঠে ছিলাম। তখন পর্য্যন্ত রানীকিসরাই-ই আমার কাছে শহর ছিল। সেখানকার ছেলেদের ধুতির খুঁট এক পায়ের গোড়ালি পর্য্যন্ত অন্য খুঁট হাঁটু পর্য্যন্ত এবং কাজকরা বুটিদার টুপী পরতে দেখে তাদেরই শহুরেয়ানার চরম নমুনা ভাবতাম। আমরা দেহাতের লোকেরা যাকে 'ধরণা' (ধরা) বলতাম, তাকে রানীকিসরাইয়ে আমার বন্ধুরা 'পকড় না' (পাকড়ান) বলত। একে আমরা পুরো শহুরে ভাষার নমুনা বলে ধরে নিতাম। কিন্তু এখন ছোট-খাট শহরে না ঘুরে একেবারে সোজা বারাণসীর মতো বড় শহরে চলে আসা আমার পক্ষে বড় বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল। এই শহরের মাইলের পর মাইল লম্বা বড় রাস্তা ও গলি আর তার পাশে বিরাট বাড়ি—যার ছাদ দেখতে হলে, বাবু পত্তর সিংহের ভাষায়, মাথার পাগড়ী খসে পড়ে যায়—আমার কাছে ছিল একেবারে আলাদা দুনিয়া। সকালে কাকা আমাকে নিয়ে পঞ্চগঙ্গা ঘাটে স্নান করতে গিয়েছিলেন। গঙ্গার মতো বড় নদী এই প্রথম দেখলাম। আর গঙ্গার পাড়ের পাথরের ঘাট দিয়ে নামার সময় সিঁড়ির শেষ নেই বলে মনে হত। মনে হয় আমাদের সঙ্গে মঠের কোনো সাধুও ছিল। কেননা, কাকার মত নিখাদ দেহাতীর সঙ্গে ঘাটের লোকদের জোরজবরদস্তির কথা আমার মনে নেই। কাকা হাত ধরে আমাকে গঙ্গায় ডুব দেওয়ালেন। বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার দর্শন হল। তারপর চকবাজারের রাস্তা দিয়ে যখন আমরা ফিরছিলাম, তখন সেখানে এক ফেরিঅলার চাদরে আয়না, চিরুনী ও অন্যান্য জিনিষের সঙ্গে লিথোগ্রাফে ছাপা কিছু উর্দু বইও দেখেছিলাম। হয়তো কাকাও ওখান থেকে কিছু জিনিষ কিনেছিলেন। আমি দেখলাম ঐ সব বইয়ে কিছু গল্প আর উর্দু হরফে ছাপা তুলসীদাসের রামায়ণের ভিন্ন ভিন্ন কাণ্ড ছিল। কাকা দুচার পয়সা দিয়ে আমাকে দু-একটা বই কিনে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে আমার আশ মেটেনি।

পরদিন সকালবেলা কাকা মুখ ধুচ্ছিলেন অথবা কারু সঙ্গে কথা বলছিলেন। এই সুযোগে

আমি চুপি চুপি বেরিয়ে গেলাম। মঠের দরজার বাইরে এক পাথরের সিংহ ছিল যার জন্য আগের বছর হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়া হয়েছিল। তাই তা কাঠের রেলিঙে ঘেরা চত্বরে রাখা হয়েছিল। তখন ঐ সিংহকে আর কেউ আমল দিত না, রাস্তার ধারে অর্ধেকটা মাটিতে গাঁথা এবং অর্ধেকটা উপরে হয়ে পড়েছিল। ওখান থেকে বড় রাস্তায় চলে এলাম, তারপর সোজা চকবাজার। রাস্তায় কয়েক জায়গায় মোড় ছিল। কিন্তু আমার মনে হয় এই সব মোড় আমার মাথায় ছবির মতো ছিল। আমি কোনো খেলনা কিংবা মিঠাই কিনিনি। সোজা ফেরিঅলার কাছে গিয়ে দুপয়সার পাঁচ-সাতটা বই কিনে ফিরছিলাম। দুই-তৃতীয়াংশ রাস্তা পেরিয়ে এসেছি, এমন সময় কাকা হয়রান হয়ে আমাকে পেলেন। আমাদের বাড়ির লোকেরা বেশ শংকিত হয়ে উঠেছিলেন। বারাণসীর মতো 'রাঢ়-ষাঁঢ়-সিঁড়ি সন্ন্যাসীঅলা' শহরে এক দেহাতী ঘরছাড়া ছেলের জন্য আর অন্য কোন ভাবনা হতে পারে? মার পড়েনি, শুধু বকুনির ওপর দিয়েই গিয়েছিল। হারানো ছেলেকে ফিরে পাওয়াটাই কাকার পক্ষে খুব খুশীর ব্যাপার ছিল।

এক অর্থে আমার সাহসপূর্ণ যাত্রার ক-খ এখান থেকেই শুরু হয়েছিল।

রাজঘাটের সেতু পার হওয়া আমার মনে নেই। মোগল সরাইয়ে গাড়ি বদলানোর কথা কিছুটা মনে পড়ে। বিন্ধ্যাচল স্টেশন থেকে বেরিয়ে আমরা নিজেদের পাণ্ডার কাছে গিয়েছিলাম। সেখানকার বাসস্থান সম্পর্কে আমার এইটুকু মনে পড়ে যে, অনেক দেয়াল মাটির বদলে পাথর ও ইঁটের ছিল। বিন্ধ্যাচলের ভগবতী দিনে তিনরূপ ধারণ করেন—সকালে বালিকা, দুপুরে তরুণী, সন্ধ্যায় বৃদ্ধা। ভগবতীর কোন রূপের দর্শন পেয়েছিলাম মনে নেই। মন্দিরে উৎকীর্ণ অক্ষরযুক্ত অনেক বড় বড় ঘণ্টা টাঙানো ছিল। পাশের উঠোনে বলি দেওয়া ছাগলের রক্ত পাঁকের মতো পড়েছিল।

ভগবতীর মূর্তির কাছ থেকে জল পড়ে যে নালা তৈরী হয়েছিল তাতে নতুন পৈতা ডুবানো হল, তা আমার গলায় দেওয়া হল। ব্যস, পৈতা হয়ে গেল।

ফেরার পথে আমরা আবার বারাণসীতে ঈসরগঙ্গী মঠে ছিলাম। মঠে একটি গুহা ছিল। লোকেরা বলত, ওটা পাতালপুরীর গুহা। ঐ রাস্তা ধরে মানুষ পাতালপুরীতে পৌঁছে যায়। কিন্তু আজকাল সরকার ভেতর থেকে রাস্তাটা বন্ধ করে দিয়েছে, কেবল বাইরে থেকে দর্শন হয়। বাইরে থেকে দর্শন আমিও করি। মঠের একটা ঘরে ১৪-১৫ বছর বয়সের একজন সংস্কৃতের ছাত্র থাকত। সে ওখানকার ঘটনার পরিচয় দেওয়াতে আমার খুব সহায়তা করে। মঠে তো জলের কল দেখিনি, কিন্তু রাস্তার সিংহমুখী কল আমি দেখেছিলাম। আমার সাথী বলছিল, জলটা তো গঙ্গারই, কিন্তু ওর জলে ধর্ম চলে যায়; কেননা, ওর ভেতরে চামড়া লাগানো রয়েছে। সে 'ওলে'-এর সরবৎ খাওয়ালো, সত্যিই সেটা খুব মিষ্টি আর ঠাণ্ডা বোধ হল। মঠের প্রাঙ্গণের পিছনের দিকে তেঁতুল গাছের নিচে কয়েকজন স্ত্রী-পুরুষ রেশমের সুতো পাকাতো। ওরা কিছু ছেঁড়া সুতো আমাকে দিয়েছিল, আর সেই রঙীন চকচকে সুতো আমি ঘরে নিয়ে এসেছিলাম। মঠের পাশে জগেসরনাথের মন্দির ছিল। তাঁর বিশাল পিণ্ডিকে দর্শন করার মুহূর্তে আমাকে বলা হল, যে বাবা প্রতি বছর একদানা যবের সমান মোটা হয়ে যান।

বেনারস থেকে আমরা দিনের গাড়িতে ফিরেছিলাম। এজন্য সারনাথ পার হওয়ার সময় লোকের ইশারা করার মুহূর্তে আমিও "লোরিককী ধমাক" (ধমাক স্তূপ) দেখি। লোরিক অহীর-এর নাম সম্ভবত আমি শুনেছিলাম। লোকে বলছিল, লোরিক দুহাতে দুটো কলসীতে মোষের দুধ দুইয়ে নিয়ে এক ধমাক (চৌখণ্ডী) থেকে অন্যটাতে ঝাঁপ দিত।

ফিরে এসে আমি ইস্কুলের আমার পরের ক্লাসের ছেলে রাজারামকে—যে রানীকিসরাইয়ের ডাক-মুন্সির ছেলে ছিল আর ইংরেজি অক্ষর লিখতে পারত—জিগ্যেস করলাম, যে ঈসরগঙ্গীর ছাত্র-বন্ধুকে আমি কিভাবে চিঠি পাঠাতে পারি? সে খুব গম্ভীরভাবে জিগ্যেস করল—ঠিকানা বেনারস ছাউনি না শহর? আমার মনে নেই আমি তার কি জবাব দিয়েছি। তার কথামত একটা পোস্টকার্ড—যার দাম সে-সময় এক পয়সা ছিল—আমি পাঠিয়েছিলাম নিশ্চয়, কিন্তু তার জবাব কখনো আসেনি, হয়ত সেটা পৌঁছায়ওনি।

৭

রানীকিসরাইয়ে পড়াশোনা (২)

সম্ভবত ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে রানীকিসরাইয়ে রেল এসে গিয়েছিল। আমার সহপাঠী সেঠবলের শোভিতলালের অনেকগুলো খেত রেলে চলে গিয়েছিল। নীলের শূন্য গুদাম, ছোট পুকুর, তার ধারে আমের গাছ আরো কত কত খেত এখনও ওদের কাছে ছিল। শোভিতের দাদা আমের সময় তার দেখাশোনা করত। মাদ্রাসা ছাড়ার পর ওই পর্যন্ত প্রায় আমি আর শোভিত একসঙ্গে যেতাম। শীতের দিনে বড় সুন্দর লাগত। আখ, শাক, মটরশুঁটি খেতে থাকত। রানীসাগরের ভিটের লাগোয়া রেলের সড়কের পাশে রানীকিসরাইয়ালাদের মটরের খেত ছিল। শুঁটিগুলো খাওয়ার উপযুক্ত হয়েছিল। আমাদেরই বয়সী দুটি মেয়ে খেত পাহারা দিত। আমরা ভিটের আড়াল থেকে প্রথমে উঁকি মারতাম, তারপর আলগা পেয়ে খেতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তাম আর দৌড় দিতাম। শুঁটি ছিঁড়তে গিয়ে খেতে অনেকগুলো পাক কাটতাম। মেয়েরা আমাদের পেছনে পেছনে দৌড়ত কিন্তু আমাদের ধরতে পারত না, ওরা কৃত্রিম রাগ দেখাত। ফসল কাটার পর মেয়েরা খেতে আসত না, কিন্তু ঘরের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় ওরা চিনতে পারত আর খুশি হত। সেলাম, কুর্নিশ, হাত তোলা বা টুপি তোলার কোনো প্রথা তো ছিল না, দেখে মুখের ওপর হাসির রেখা আনাই ছিল অভিবাদন-প্রত্যভিবাদন।

আশ্বিন-কার্তিকের মাস ছিল ম্যালেরিয়ার মাস। ছেলেবেলায় প্রায় প্রতিবছর আমার জ্বর হত। কুইনাইনকে লোকে খারাপ ভাবত, এজন্য দিদিমা ভটবাঁশের শিকড় পিষে গরম জলের সঙ্গে দিতেন। জ্বরের জন্য এমনিতেই মুখের স্বাদ খারাপ থাকে, তার ওপর অড়হরের ডালের 'জুস' (রস) পান করতে দেওয়া হত। ডাল আমার সুস্থ থাকা অবস্থাতেই বিষ মনে হত, তাহলে অসুস্থ অবস্থায় কি করে পছন্দ হবে? আমিও একটা উপায় বের করে নিয়েছিলাম। পেট ব্যথার ভান করে ছটপটাতে থাকতাম, দিদিমা ঘাবড়ে গিয়ে শুশ্রূষা করতে আসতেন। তাঁর কাছ থেকে ভিনিগারে ডোবানো রসুন চাইতাম। দিদিমা ভুলে যেতেন যে পেটের ব্যথায় ভিনিগারে ডোবানো রসুন ভালো হলেও সেটা শীতজ্বরের পক্ষে হানিকারক। ফল হত, জ্বর চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্লীহা বেড়ে যেত। জ্বর চলে যেতেই আবার ইস্কুলে। তখন দুপুরে খাওয়ার জন্য ভাজা চানা অথবা অন্য কোনো দানা দেওয়া হত না, বরঞ্চ ঘরের তৈরি লুচি পাওয়া যেত, যা প্রায়ই মিষ্টি হত। দিদিমার এটুকুই জানা ছিল যে, ঘিয়ের লুচিতে বল হয় আর বল এলে প্লীহা খাটো হয়ে যায়। পন্দহাতে পিলে কম বিপজ্জনক রোগ ছিল না। সতমীর ছেলে সুদ্ধু আর আমার কিছুদিনের ইস্কুলের সঙ্গী সম্পত পিলেতেই মারা গিয়েছিল।

দাদু আমাকে নিজের উত্তরাধিকারী করে রেখেছিলেন, এজন্য তাঁর ভাইপোদের বিশেষ করে বড় ভাই-এর ছেলেদের এটা খারাপ লাগা স্বাভাবিক ছিল। কখনো কখনো দু-ঘরে বলাবলিও হয়ে যেত। আমার এ ব্যাপারটা কিছুটা বিচিত্র লাগত, আর এজন্য দুঃখ হত যে, বড় দাদুর ঘরে যাওয়া কিছুদিনের জন্য থেমে যেত। ওখানে আমার পাঁচজন মামী ছিল, যাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট রামদীন মামার প্রথম স্ত্রী আমাকে খুব স্নেহ করত। আমি প্রায় এই মামী সাহেবার দরবারে হাজির হয়ে যেতাম। তখন আমার এটাও জানা ছিল না যে, মামীর সঙ্গে রসিকতা করার অধিকার ভাগ্নের আছে। এটা তো পরে ছোট দিদিমার কাছ থেকে জানতে পারি, যখন ফাগুনের দিনে আমি তার উঠোনে সুরজবলী মামার স্ত্রীর পাশে চুপচাপ বসে ছিলাম। ছোট দিদিমা বলল—'আধি মামী আধি জোয়। পদ লাগে তো সবরো হোয়।'

৮

রানীকিসরাইয়ে পড়াশোনা (৩)

১৯০৩-এ দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে পাস করে তৃতীয় শ্রেণীর নতুন বই পেয়ে আমার বড় আনন্দ হল। কেননা আগের ক্লাস থেকে বইয়ের সংখ্যা অনেক বেশী ছিল। বইও অনেক মোটা ছিল।

এই বছরের পাঠ্যপুস্তকে (মৌলবী ইসমাইলের চতুর্থ বই) আমি নওয়াজিন্দা-বাজিন্দার গল্প (খুদ্‌রাইকা নতীজা) পড়ি। এই গল্পে বাজিন্দার মুখ থেকে বার হওয়া,—'সৈর কর দুনিয়াকি গাফিল জিন্দগানী ফির কাঁহা/ জিন্দগী গর কুছ রহী তো নৌজবানী ফির কঁহা'—হে অবুঝ মানুষ দুনিয়া ভ্রমণ কর, জীবন আর ফিরে পাবে না। জীবন যদিও কিছুটা থাকে, যৌবন তো আর থাকবে না। এই শেরের গভীর প্রভাব পড়েছিল আমার মন ও ভবিষ্যতের ওপর। অথচ তা ঐ লেখকের অভিপ্রায়ের একেবারে বিপরীত ছিল।

১৯০৪-এর জানুয়ারিতে আমি আবার আগের মতো রানীকিসরাইয়ে পড়তে গেলাম। দুই বছর প্রতীক্ষার পর হয়তো এই বছর দলসিংগার আবার পড়াশোনা করার অনুমতি পায়। দলসিংগার এখন আমার চেয়ে দুই ক্লাস নিচে ছিল। ও আর আমি চটের ওপর দুই জায়গায় বসতাম। তবে রাস্তায় আসা-যাওয়ার সময় ও বাড়িতে আমাদের বেশী সময় একসঙ্গে থাকার সুযোগ হত। এতে আমরা দুজনেই খুব খুশি ছিলাম। কিন্তু আমাদের এই খুশি বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। কয়েকমাস পরে, হয়তো বর্ষার শেষদিকে, দলসিংগার কঠিন অসুখে পড়ে। আমি প্রতিদিন ওকে দেখতে যেতাম। কি অসুখ করেছিল তা আমি জানিনা। শেষ দিকে ওর মুখ খুব ফুলে গিয়েছিল। আর চোখ ফোলাতে ঢেকে গিয়েছিল। আমি যখন দরজায় যেতাম তখন দলসিংগারের মা ছুটে এসে আমাকে ভেতরে নিয়ে যেতেন। হয়তো তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, দলসিংগারের কঠিন অসুখ করেছে। সম্ভবত তাঁর বিশ্বাস হয়েছিল যে তাঁর ঘরে বিদ্যা 'সহ্য' হয় না এবং তাঁর লেখাপড়া জানা দুই ভাশুরের যে গতি হয়েছিল, দলসিংগারের তাই হতে

যাচ্ছে। তিনি জানতেন যে যতক্ষণ আমি দলসিংগারের পাশে থাকব , ততক্ষণ ও নিজের ব্যথা বেদনা ভুলে থাকবে।

শেষ পর্যন্ত দলসিংগার মারা গেল। এই সময় প্রথম আমি মৃত্যুর আঘাত অনুভব করেছিলাম। আমি কাঁদিনি। কিন্তু আমার হৃদয়ে এক ধরণের অসহ্য নিঃসঙ্গতার বোধ হয়েছিল। মৃত্যু সম্পর্কে নানা ধরণের খেয়াল হচ্ছিল আমার মনে। মৃত্যুর পর দলসিংগার কোথায় গেল? আর যদি কোথাও গিয়ে থাকে তবে আমি কি ওর কাছে যেতে পারি না?

রেল আর প্লেগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে এই ধারণা সাধারণ গাঁয়ের লোকের জন্মেছিল। এই ধারণা আরো দৃঢ় হল যখন ১৯০৪-এর অক্টোবর-নভেম্বরে রানীকিসরাই-এ ইঁদুর মরতে থাকে। ইঁদুর পুড়িয়ে ফেল, বাড়ি ছেড়ে চলে যাও—এই ধরনের বাণ্ডিল বাণ্ডিল ছাপা সরকারী নির্দেশ আমাদের স্কুলের সবাইকে ভাগ করে দেওয়ার জন্য আসত। বাবু পত্তর সিংহের স্কুলকে সরিয়ে দুই মাইল উত্তরে রেল পথের কাছে মৈনী গ্রামে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু এত ছেলের বসার মতো ঘর ওখানে কি করে পাওয়া যাবে? শীতের দিন। পড়াশোনা হত খোলা আকাশের নিচে। সেই সময় রমজান পড়ে, আর আমাদের সহ-শিক্ষক মুন্সী আবদুল কাদিরকে সূর্যাস্তের সময় দাঁতন করতে দেখা যেত। পন্দহাতেও প্লেগ এসে গিয়েছিল। সেজন্য আমাকে মৈনীতেই থাকতে হত। এখানেই সর্বপ্রথম আমার নিজের হাতে রান্না করতে ও ডাল খেতে হল। আমার ডাল কখনো গলত না। কিন্তু জানিনা কেন এই ডাল আমার খুব মিঠে লাগত।

বিয়েতে বড় ভাইয়ের প্রয়োজন হয়। কেননা বিয়ের বিধিতে বড় ভাইয়ের দ্বারা কনের গলায় লাল সুতো (তাগ-পাট) দেওয়ার দরকার হয়। যাগেশ আমার চেয়ে কয়েকমাসের ছোট ছিল। তাই ওর বিয়েতে এই প্রথা আমারই পালন করার কথা। বরযাত্রী তো আমি অবশ্যই দেখেছিলাম। কিন্তু বরযাত্রী হওয়ার এই ছিল আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। যখন আমি মৈনীতে পড়ছিলাম, তখনই বছওয়ল-এ যাগেশের 'তিলক' হয়। ওর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাদের ঐশ্বর্য দেখাবার জন্য সঙ্গে দুটো হাতী এনেছিল। যারা বরের মিছিল নিয়ে যাবে তাদের পক্ষে এর জবাব দেওয়া অত্যন্ত জরুরী ছিল। মহাদেব পণ্ডিত নিজের ভাইপোর বিয়ের মিছিলে যত হাতী নেওয়া সম্ভব সব নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর আত্মীয়দের কাছে খবর পাঠান। কনৈলা থেকে যখন খবর পন্দহায় পৌঁছয়. তখন দাদু দুটো হাতী ঠিক করেন। আমার পরীক্ষা শেষ হয়ে গিয়েছিল। দাদুর সঙ্গেই আমি প্রথম কনৈলা ও তারপর জখনিয়ার কাছে বরযাত্রীর গ্রাম পণ্ডরী যাই। একুশ-বাইশটা হাতী জমা হয়েছিল। বরযাত্রীর মিছিলে খুব ধূম হয়েছিল। মেয়ের বাড়ির লোকেরা খুব উল্লাস দেখিয়েছিল এবং বরযাত্রীদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও কোনো অভিযোগ ছিল না। হাতীদের সমাবেশ, এক ডজন ঘোড়ার দৌড়, ধুমধাম করে দ্বারপূজা, দুই রাত নাচগান দেখা ও শোনা আমার পক্ষে বেশ মজার ব্যাপার ছিল। জীবনে প্রথম আমি এই সময় পরার জন্য জুতো পেয়েছিলাম। ঠুকেঠুকে এই জুতোকে আমার পা'র দেড়গুণ বড় পায়ের জন্য বানানো হয়েছিল। আর ঐ জুতো পরে দশ মিনিট চলার পরই পায়ের ডজনখানেক জায়গায় কেটে গেল। বরযাত্রীদের মধ্যে খালি পায়ে ঘুরলে ইজ্জত থাকে না। তাই কাটার আরো যা বাকী ছিল, তা পুরো হয়ে গেল! সবকিছু হয়ে যাওয়ার পর তৃতীয় দিন যখন বরযাত্রীর বিদায় হয়ে যাওয়ার দিন এল, তখন এক পাটি জুতা গায়েব হয়ে গেল। যাগেশের খুড়তুতো ভাই আর আমার পিসিমার বড় ছেলে রামেশ নিতবর হয়ে গিয়েছিল। রেন্ডির নাচ-গান বিশেষ করে 'মিলনের' দিনে তার বীভৎস গালি তো আমিও শুনেছিলাম কিন্তু রামেশ তার এক-আধ কলি

মুখস্থ করে ফেলল। আর বড় তৎপরতার সঙ্গে সে বাড়ির স্ত্রীলোকদের সামনে তা সুর করে গাইছিল। আমি তো লজ্জায় মরে যাচ্ছিলাম।

বরের মিছিল থেকে ফিরে আসার পর জানতে পারলাম যে প্লেগে বাবু পত্তর সিংহের দেহান্ত হয়েছে, সহ-শিক্ষকও সম্ভবত বদলে গিয়েছিলেন। এখন আমাদের স্কুলে দুজন নতুন যুবক শিক্ষক এসেছেন। প্রধান শিক্ষক বাবু লালবাহাদুর সিংহ নগরার (বালিয়া) লোক। আর ওঁর বালিয়ার 'রওআঁ'র বুলি আমাদের কাছে আলাদা দ্বীপের ভাষা বলে মনে হত। বাবু পত্তর সিংহ যেমন রাগী ছিলেন, বাবু লাল বাহাদুর সিংহ তেমনি ঠাণ্ডা ছিলেন। ওঁর মুখে সর্বদাই হাসি লেগেছিল। আমাদের আপসোস ছিল এই যে, তিনি স্থায়ী শিক্ষক হয়ে আসেননি। কেননা তিনি নর্মাল পাস ছিলেন না। অন্য শিক্ষকটির নাম আমার মনে নেই। তিনি করহার বাসিন্দা যোগী (মুসলমান) ছিলেন। ওঁর মামাবাড়ি নিজামাবাদের পাশে ছিল। পন্দহার রাস্তা ধরে নিজামাবাদ যেতে হত, তাই তিনি প্রায়ই দাদুর ঘরে আসতেন। তিনিও খুব কম ছড়ি চালাতেন। এরপর একথা বলার নিশ্চয়ই দরকার নেই যে, ছেলেরা এই যুগল মূর্তি যাতে সর্বদা থেকে যান সেজন্য প্রার্থনা করত।

১৯০৪-এর গরমকাল। স্কুলে গরমের ছুটি হয়ে গিয়েছিল। প্লেগ তখনো চলছিল। আমাকে কনৈলা যেতে হল এক আধ মাসের জন্য। তখন বছওয়েল-এর পিসিমা কনৈলা এসেছিলেন। আমি ও রামেশ বাড়ি থেকে তিন মাইল দূরে ধব্‌বারা প্রতিদিন পড়তে যেতাম। কিন্তু এই ব্যবস্থা বেশী দিন চলেনি। আমাকে পন্দহা ফিরে যেতে হল। কিন্তু ওখানে আর এক মুশকিল হল। আমার বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে দাদুর শ্বশুর বাড়ির এক সজ্জন ব্যক্তি একবার এসেছিলেন। তিনি দাদু ও দিদিমার আধা সম্মতি আদায় করেছিলেন। তাই তিনি সাহস করে হঠাৎ—আমার পক্ষে হঠাৎ বটেই—আশীর্বাদের জন্য এসে হাজির হলেন। দাদুর হয় এই বিয়েতে মত ছিল না অথবা আমার বাবার অমতকে তিনি ভয় পেতেন। তিনি চুপিচুপি আমাকে কনৈলা পাঠিয়ে দিলেন। আশীর্বাদের লোকেরা পরের দিন সেখানে এসে হাজির। তর্কবিতর্কের পর বেশ কয়েক ঘণ্টা বাদে রাত্রিতে আশীর্বাদ হল। সেই গরমে এক ছোটখাট বিয়ের মিছিল গেল, আর আমার বিয়ে হয়ে গেল। এগার বছর বয়সে এই ব্যাপারটা আমার পক্ষে ছিল তামাশা মাত্র। যখন আমি আমার সারা জীবনকে বিচার করি, তখন বুঝতে পারি যে সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রথম অংকুর এই ঘটনা থেকেই প্রথম জন্মেছিল। ১৯০৮-এ যখন আমার পনের বছর বয়স, তখন থেকেই আমি এই বিয়ে ব্যাপারটাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করি। ১৯০৯-এর পর আমি তো গৃহত্যাগের নিয়মিত অভ্যাস করছিলাম তাতেও এই তামাসার বিয়ে নিশ্চয়ই কিছুটা কাজ করেছিল। ১৯১০-১৯১১ থেকে এই বিয়েকে আমি নিশ্চিতভাবেই বিয়ে বলতাম না। এগার বছরের অবোধ অবস্থায় আমার জীবনকে বেচে দেওয়ার কোনো অধিকার আমার পরিবারের ছিল না। আমার গুরুজনরা যখন বিয়ে সম্পর্কে আমার কর্তব্য বোঝাতে আসতেন, তখন তাদের আমি এই উত্তরই দিতাম। আমার ঐ সময়ের জ্ঞান সীমিত ছিল। তা সত্ত্বেও আমি এই বিয়েকে আমার পরিবার ও সমাজের অন্যায় বলেই বুঝেছিলাম। এই অন্যায় বরদাস্ত করতে আমি রাজী ছিলাম না। ১৯০৯-এর পর হয়তো কখনো কখনো বাড়ি যেতাম। ১৯১৩-এর পর তাও প্রায় শেষ হয়ে যায়। ১৯১৭-এর প্রতিজ্ঞার পর তো আমি আজমগড় জেলার মাটিতে পা পর্যন্ত রাখিনি (১৯৪৩-এর আগে) সাধারণ নিয়মমত বিবাহবিচ্ছেদের চেয়ে আমার এই বিবাহ-বিচ্ছেদ—কিছুটা বাড়তি ছিল। বস্তুত অস্বীকৃত বাল্যবিবাহের জন্য যা জরুরি ছিল না। আমি এই বিয়েকে এইভাবেই দেখেছিলাম। তাই আমার মনে হয়, এই বিয়ের জন্য সমাজের

বদলে আমাকে দায়ী করা ঠিক নয়। আমি একে কখনো বিয়ে বলে মনে করিনি, আর এর দায়িত্ব আমার বলে মেনে নিতে পারিনি।

জুন জুলাই নাগাদ রানীকিসরাইয়ের পড়াশোনা কিছুটা অনিয়মিতভাবে হচ্ছিল। কারণ প্রধান শিক্ষক লাল বাহাদুর সিংহ ছিলেন অস্থায়ী। আর তাঁকেও হয়তো ছুটিতে যেতে হয়েছিল। বর্ষার প্রথম দিকে নতুন প্রধান শিক্ষক মুন্সী জগন্নাথরাম আসেন। তিনি রানীকিসরাইয়ের লোকই ছিলেন। যদিও প্রথম ও পরের দিকে গোঁফে তা দিতে দেখে ও ধুতির একদিক পায়ের বুড়ো আঙুল পর্যন্ত চলে যেতে দেখে আমাদের বাবু পত্তর সিংহের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। পরে বুঝেছিলাম তিনি অত্যন্ত কোমল প্রকৃতির মানুষ।

রানীকিসরাইয়ের মাদ্রাসার আশেপাশের এলাকায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। বিশেষত রেল স্টেশন হওয়ার পর এইস্থানের মাহাত্ম্য আরো বেড়ে যায়। উচাগাও, আঁওয়ক-এর লোয়ার প্রাইমারি মাদ্রাসা এই জায়গার সীমানার মধ্যে ছিল। আর সেখানকার শিক্ষক তাঁর রিপোর্ট রানীকিসরাইয়ের প্রধান শিক্ষকের মাধ্যমে ওপরে পাঠাতেন। সময়টা ঠিক মনে নেই, তবে বাবু দ্বারিকা সিংহের সময় আঁওক-এর অনুদান পাওয়া মাদ্রাসার শিক্ষক ছিলেন এক বেশী বয়সের মৌলবী। তাঁর ছিল বকের পালকের মতো সাদা ও হাতীর পায়ের মতো ঢিলে পায়জামা, একই রকমের ফর্সা আচকান, বুটীদার সাদা ও দুপরতওলা লখনৌ-এর টুপী। দিল্লীর লাল নাগরা জুতো এই সব দামী জিনিষ তো ছিলই। তাছাড়াও ছিল টুপীর বাইরে মাথার পেছনে তিনটি ঢেউ খেলানো শণের মতো সাদা চুল আর চোখে পাতলা সুর্মা। এই সব আমাদের গেঁয়ো ছেলেদের মনে বিস্ময় উদ্রেক না করে পারত না। আঁওয়ক-এ কার্তিক শুক্ল ষষ্ঠীতে (?) মেলা বসত। মনে হয় সূর্যের। এক বড় পুকুরে সব লোক স্নান করত। মন্দির আর পূজার কথা আমার মনে নেই, সম্ভবত মন্দির ছিলই না। গ্রামে অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবার থাকত। তাদেরই এক পরিবারে ঐ মৌলবী সাহেব থাকতেন এবং ছেলেদের পড়াতেন।

উচ্চ প্রাইমারি খোলার পর আশেপাশের স্কুলের বেশ কিছু ছেলে রানীকিসরাইয়ে পৌঁছতে থাকে। চতুর্থ শ্রেণীতে তের চৌদ্দ জনের মতো ছাত্র ছিল। তাদের মধ্যে উর্দু পড়তাম একা আমি। মনে হয় শোভিত আমার পেছনে পড়ে গিয়েছিল। সব ক্লাসেই উর্দু পড়ত এমন ছাত্রের সংখ্যা ছিল খুব কম। দ্বারিকা সিংহ, পত্তর সিংহ, লাল বাহাদুর অথবা জগন্নাথ রায় যেই হোক না কেন প্রত্যেকের ক্লাসেই হিন্দীওয়ালা ছেলেরা যখন পড়ত, তখন আমাকে বসে থাকতে হত আর আমার ওদের পড়া শোনার সুযোগ হত। লেখার সুযোগ হত না কিন্তু শুনতে শুনতে হিন্দী বইও আমি উর্দুর মতোই বুঝতে পারতাম। হিন্দী বই আমি আরো ভাল করে বুঝতাম, এইজন্যে যে আমার বন্ধুরা প্রায় সবাই হিন্দী পড়ত। উর্দু ওরা সামান্যই জানত।

বার্ষিক পরীক্ষা হলে রানীকিসরাইয়ের কিছু উত্তরে পাকা বড় রাস্তার পুবে বাগানে স্কুলের ইন্‌সপেকটরের সামিয়ানা টানানো হত। কখনো কখনো কোনো এ্যাসিস্ট্যান্ট ইন্‌সপেকটরও আসতেন। নয়তো ডেপুটি ইন্‌সপেকটর পরীক্ষা নিতেন। আশেপাশের কয়েকটি স্কুলের দ্বিতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্ররা পরীক্ষা দিতে আসত। ওরা ওদের ইচ্ছেমতো পোশাক পরে আসতে পারত কিন্তু নৌকোর আকারের টুপীর একটা বিশেষ রঙ হত। আর তাতে ছাত্রের নম্বর ঝকঝকে সাদা কাগজে হিন্দী অথবা উর্দু সংখ্যায় লিখে ওদের টুপীতে এঁটে দেওয়া হত। যে বছর আমি চতুর্থ শ্রেণীর (উচ্চ প্রাইমারি) পরীক্ষা দিয়েছিলাম, সেই বছর সামিয়ানা টানানো হয়নি। সম্ভবত রেলের সুবিধা পাওয়ার জন্য এই পরিবর্তন করা হয়েছিল। জেলার ডেপুটী ইন্‌সপেকটর ও

আরো দুই তিন জন সাব-ইন্‌সপেকটর আগের দিন বিকেলে পৌঁছে গিয়েছিলেন। এ্যাসিস্ট্যান্ট ইন্‌সপেকটরবাবু ব্রজবাসী লালের আসার কথা ছিল। দশটার গাড়ি চলে যাওয়ার পর ডেপুটি ইন্‌সপেকটররা মনে করলেন যে, তিনি আর আসবেন না। তাই ওঁরাই আমাদের পরীক্ষা নেওয়া শুরু করে দিলেন। দুইটি ছেলে ছাড়া আর সবাই পাশ করল। আর বেশীর ভাগ ছেলেই 'কণ্ডই' (পূর্ণ) পাশ করল।

ব্রজবাসী লাল আসলে গাড়িতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। দুই স্টেশন এগিয়ে যাওয়ার পর ওঁর ঘুম ভাঙে এবং তিনি গাড়ি থেকে নেমে পড়েন। তিনি অন্য গাড়িতে তিনটা নাগাদ আমাদের স্কুলে পৌঁছে যান। কড়াকড়ির জন্য ব্রজবাসী লালের অত্যন্ত বদনাম ছিল। কিন্তু কেউই ভাবেননি যে, তিনি আবার পরীক্ষা নিতে আগ্রহী হবেন। এসেই তিনি আগের পরীক্ষার ফল বাতিল করে দিয়ে নতুন করে পরীক্ষা নিতে শুরু করলেন। ফল হল একেবারে বিপরীত। গোটা ক্লাসে শুধু দুইজন পাস হল। আমি ও গিরিধারী লাল পাস করলাম। তার মধ্যে গিরিধারীলালকে শর্তাধীনে পাস করানো হল। বলা বাহুল্য ছাত্রদের মধ্যে কান্নার রোল পড়ে গেল। হিন্দি-শিক্ষাবলী (চতুর্থ ভাগ) সম্ভবত সেই সময় আমাদের ক্লাসের পাঠ্যপুস্তক ছিল। ব্রজবাসী লালের প্রশ্ন শব্দের মুখস্থ করা অর্থ সম্বন্ধে ততটা ছিল না, যতটা ছিল ছাত্রদের বুদ্ধি পরীক্ষা করার জন্য। আমার ক্লাসের ছেলেরা যে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি, তার উত্তর দিতে আমি আগ্রহী ছিলাম, যদিও আমি হিন্দীর ছাত্র ছিলাম না। এতে সন্দেহ নেই যে, আমাকে যদি হিন্দীতে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হত, তাহলে আমি ভালোভাবেই পাশ করে যেতাম।

যাহোক, পরীক্ষা তো শেষ হল। আমি বেশ ভাল নম্বর পেয়ে পাশ করেছি শুনে দাদু-দিদিমা খুব খুশি হয়েছিলেন। পরের মঙ্গলবারে মহাবীরজীকে সওয়া সের লাড্ডু ভোগ দেওয়া হল। ঐ মহাবীরজী যাঁর স্থান ছিল রানীসাগরের উত্তরের ঘাটে। সেখানে দূরদূরান্তের সাধুসন্তদের দেখেছিলাম। আর মৃদঙ্গ বাজিয়ে রেলের আওয়াজ যিনি বের করতেন, সেই ওস্তাদ মদন মোহনকে দর্শনের সৌভাগ্যও আমার হয়েছিল।

সারা জেলার উচ্চ প্রাইমারি পাশছেলেদের ছাত্রবৃত্তির প্রতিযোগিতার পরীক্ষা আমাকে তখনই দিতে হবে, সেই জন্য পরীক্ষার পর ছুটিতে কনৈলা যাওয়ার অবকাশ পাইনি। ছয় সাত মাস ধরে মায়ের অসুখ চলছিল। প্রথম আমার সবচেয়ে ছোটভাই শ্রীনাথকে জন্ম দেওয়ার সময় মায়ের সূতিকা জ্বর হয়। তাই বাড়তে বাড়তে পাণ্ডুরোগে পরিণত হয়। অসুখের সময় একবার আমি অবশ্যই মাকে দেখতে গিয়েছিলাম। কিন্তু তখন অবস্থা ততটা খারাপ ছিল না। আমার বাবার স্বভাব ছিল—যেটার দরকার তখন তার জ্ঞান অন্বেষণের জন্য লেগে পড়তেন। এখন তিনি রসরাজমহোদধি নিয়ে মেতে ছিলেন। আর হয়ত মাকে যদি তিনি নিজের তৈরী দুয়েকটা ওষুধ খাইয়ে থাকেন, তাহলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

জানুয়ারি (১৯০৬ খ্রীঃ) মাস। প্লেগের জন্য এবার স্কুল রায়পুর স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। আমি সেখানে পড়াশোনা করে বাড়ি ফিরছিলাম। আমাদের ঘর উঠোনওলা ঘরের অন্তরালে ছিল। কিন্তু আমার মার সই দিলাসীকে কুয়া থেকে জল ভরতে দেখি। আমাকে দেখেই সে ঘড়া রেখে একটু চমকে গেল। তারপর নিজেকে সংযত রাখতে না পেরে ঝরঝর করে কেঁদে বলে উঠল—'খোকা আর আমার বোনের মুখ দেখতে পাবে না।'

একদিন আগে খবর এসেছিল। আর দাদ সঙ্গে সঙ্গেই কনৈলা চলে গিয়েছিলেন। দিলাসীর

কথা শুনে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, মা মারা গেছেন। আহীর দিলাসী আমার মার সই ছিল। ছেলেবেলায় মেয়েরা মিষ্টি অথবা অন্য কোনো জিনিষ দুজনের দাঁত দিয়ে কেটে খেয়ে সই হত। এক সই অন্য সইয়ের নাম নিতে পারত না। আপোষে ঝগড়াও করতে পারত না। বিয়ের পর যার যার শ্বশুরবাড়ি চলে যেত। তাই এদের সখীত্ব অটুট থাকত। কারণ এতে পারস্পরিক মনকষাকষির সুযোগ কম থাকত। দিলাসী আমার মার এই ধরনের সই ছিল। ওর বিয়ে হয়েছিল কিন্তু আমি ওকে হামেশা ওর ভাইয়ের বাড়িতেই দেখতাম। সম্ভবত স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া ছিল। দিলাসী আমাকে নিজের ছেলের মতো দেখত। ও গরীব, তাই ওর ভালবাসা ওর মুখ দেখেই বোঝা যেত। আমি ভয় পেয়ে যাব এই ভেবে দিলাসী নিজেকে পুরোপুরি সংযত রেখেও তার অন্তরের কথা বলে ফেলছিল।

বাড়ি গিয়ে দেখলাম দিদিমা বিহ্বল হয়ে কাঁদছেন। দাদুও অন্যদিকে চোখের জল ফেলছিলেন। আমার হৃদয়েও শীতল দমকা হাওয়া ধাক্কা দিচ্ছিল। মনে এক অদ্ভুত অবসন্নতা আসছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও চেঁচিয়ে কাঁদিনি, চোখেও জল আসেনি। আমি গভীর একটা উদ্বেগের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম। থেকে থেকে মার চেহারা আমার মানস নেত্রের সম্মুখে আসছিল। মা মরে গেছে শুনে আমার মন ব্যাকুল হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তারপর মনে হল, মায়ের সঙ্গে আমার নিশ্চয়ই দেখা হবে, হয়তো মা আবার বেঁচে উঠবেন—মরার বেঁচে ওঠাও শোনা গেছে। হয়তো যমরাজের ওখান থেকে ফিরে আসবেন, মরা মানুষ চিতা থেকে বেঁচে উঠতে দেখা গেছে। কিন্তু যদি মাকে আগুনে পুড়িয়ে থাকে, দাদুতো বলেছেন, মাকে গঙ্গাজীতে পোড়াবার জন্য নিয়ে গেছে, তাহলে? তাতেও আমি নিরাশ হইনি। আমার বিশ্বাসই হয়নি, যে মা আবার ফিরে আসবেন না। এগার বছর বয়সের ছেলেদেরও বেশ বুদ্ধিশুদ্ধি থাকে এমন দেখা গেছে। কিন্তু আমার অবস্থা ঐ সব ছেলেদের মতো ছিল না। আমার জন্ম হয়েছিল গ্রামে, আর এমন দাদুর ঘরে যিনি টিপছাপ দেওয়ার ভয়ে শুধু দস্তখত করতে শিখেছিলেন। আমার চেয়ে বেশী লেখাপড়া করেছে এমন কেউ আমার দাদুর গ্রামে বা কনৈলাতে ছিল না। কোনো বহুশ্রুত, বহুবিদ ও বহুদর্শী পুরুষের দর্শন ও সঙ্গ পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ধর্মীয় কথাবার্তা শোনারও সুযোগ হত না আমার। তাই আমার যে চোখে জল আসেনি তার কারণ ব্রহ্মজ্ঞান নয় অথবা অন্য কোনো তত্ত্বের জ্ঞান নয়। আমার সান্ত্বনা ও ধৈর্যের কারণ এক সরল গ্রাম্য বালকের সাদাসিধা বিশ্বাস। শ্রাদ্ধের সময় কনৈলা যাওয়ার পর মা ফিরে আসবেন এই বিশ্বাস যদিও কমে গেল, তবু আমি কাতর হইনি। হয়ত তার কারণ আমার মধ্যে ভালবাসার ভাগ-হয়ে যাওয়া। শেষমেশ বছরে সাড়ে এগার মাস তো দিদিমাই আমার মা ছিলেন। আর দিদিমাকেই তো আমি মা ডাকতাম।

৯

এক পা আগে

রানীকিসরাই-এ পড়াশোনা শেষ হয়ে গিয়েছিল। পন্দহার কাছে তিন-চার মাইলের মধ্যেই নিজামাবাদের মিডল স্কুল ছিল। দাদু আমাকে সেখানে পাঠানোই ঠিক করেছিলেন। যদিও মার্চ (?) মাসে আমার ছাত্রবৃত্তি প্রতিযোগিতা পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ফেব্রুয়ারিতেই

(১৯০৬ খৃঃ) দাদু নিজামাবাদে পৌঁছে দেন। তখন ওখানেও প্লেগ হচ্ছিল এবং স্কুল সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল টৌস নদীর ওপারে এক নীলের গুদামে। যদিও ঐ সময়ে নীল চাষ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সাধারণভাবে নীলের পুরোনো কারখানাটা ভেঙে গিয়েছিল কিন্তু এই কারখানার সব ঘর তখনও ঠিক ছিল। ঘরের ভেতরে নীলের বড়ি শুকানোর জন্য বাখারির তাক তখনো ছিল। এই তাকের ওপরই আমরা রাতে ঘুমোতাম। এখন পর্যন্ত আমি নিজের ক্লাসে উর্দুর দুটি-একটি ছাত্রের মধ্যে একজন ছিলাম। কিন্তু এখানে হিন্দীওয়ালারা সংখ্যাধিক্য হওয়া সত্ত্বেও উর্দুওয়ালারাও যথেষ্ট ছিল। এখানকার পরিমণ্ডল গ্রাম থেকে আলাদা মনে হত। আমার ক্লাসে জনক সিংহ, দ্বারিকাপ্রসাদ ও আরো দুই তিনজন নিজামাবাদের মফঃস্বল শহরের ছেলে ছিল। এরা সবাই উর্দু পড়ত। এইজন্য আমাদের সবার ওঠা-বসা একসঙ্গে হত। মফঃস্বল শহরের ছেলেরা তাদের শহুরেয়ানার অহংকারে আমাদের সবাইকে দেহাতী বলে খেপাত এবং আমরাও ওদের কোনো না কোনো নাম নিয়ে ডাকতাম। শহুরে ও দেহাতী ছেলেদের এই ঝগড়া বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। কয়েক মাসের মধ্যেই দেহাতী ছেলেরাও শহুরে সংস্কৃতিতে দীক্ষিত হয়ে গেল। তবে আমাদের নিজামাবাদের গৌড়-কায়স্থরা 'আইস'-'গইন' দিয়ে যে অওয়ধী বলত, তা আমরা শিখতে পারতাম না।'

তখন সুশৃঙ্খলভাবে পড়াশোনা হচ্ছিল না। বাইরের নতুন ছেলেও খুব কমই আসতে পেরেছিল। মিডল-দেশী ভাষার পরীক্ষা মার্চ অথবা এপ্রিলে হত। সেই জন্য নতুন ক্লাসের পড়া তার পরে শুরু হত। আমাদের মফঃস্বল শহরের ছেলেরা ছাত্রবৃত্তি প্রতিযোগিতা পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছিল। তাই আমিও ওদের সঙ্গে যোগ দিলাম। আমি গণিতের ভাল ছাত্র ছিলাম। অন্য সব বিষয়েও আমি ভালই ছিলাম। আমার রানীকিসরাইয়ের শিক্ষকরা বলতেন যে আমি নিশ্চয়ই ছাত্রবৃত্তি পাব। কিন্তু ওখানে যখন আমি সঙ্গীদের সময়ের ও অন্যান্য অঙ্ক কষতে দেখলাম এবং ওদের জিগ্যেস করে যখন জানতে পারলাম যে এই সব অঙ্কও চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্য তখন আমি নিরাশ হয়ে গেলাম। রানীকিসরাইয়ে পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞতা ও আলস্যের জন্য অনেক বিষয়ই পড়ানো হয়নি। সেখানকার উর্দু পড়ানোর শিক্ষক দ্বারিকা সিংহ, পত্তর সিংহ, লালবাহাদুর সিংহ ও জগন্নাথ রাম—সবাই জবরদস্তি করে উর্দু পড়াতেন। সেইজন্য নিজামাবাদের বন্ধুদের উর্দুর তুলনায় আমার উর্দু দুর্বল মনে হত। তখন প্রতিযোগিতার জন্য সময়ও কম ছিল। তাই আমার যে ঘাটতি ছিল তা মেটাবার সম্ভাবনা ছিল না। আর এরই মধ্যে রানীকিসরাইয়ের শিক্ষকের ডাকের পর ডাক আসতে লাগল। প্রতিযোগিতায় সাফল্যের দায় তাঁর প্রাপ্য। এজন্য তিনি আমাকে পরীক্ষায় তৈরী করাবার জন্য উতলা হয়ে আছেন। রানীকিসরাইয়ে পৌঁছে যখন আমি নিজামাবাদের সময় ও অন্য অঙ্ক করানোর কথা বললাম, তখন তিনি আমার কথা উড়িয়ে দিলেন এই বলে,—ওরা আগামী বছরের অঙ্ক কষছে। আজমগড়ের উত্তরে মন্দুরিতে পুকুরের পাশে বড় বাগানে সারা আজমগড় জেলায় চতুর্থ শ্রেণীতে সব বিষয়ে পাস করা ছেলেরা পরীক্ষা দিতে এসেছিল। আমার শিক্ষক পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্য বলে যা মনে করতেন তা থেকেই অর্ধেক অঙ্কের প্রশ্ন পাওয়া গেল। এর পর অন্তত পরীক্ষার ফলের জন্য প্রতীক্ষা করার আবশ্যকতা ছিল না।

মার্চ অথবা এপ্রিলে, যখন থেকে নিজামাবাদে আমার আনুষ্ঠানিক পড়া শুরু হয়েছিল তখন প্লেগ চলে গিয়েছিল। আর স্কুল তার নিজস্ব বাড়িতে চলে এসেছিল। মিডল স্কুলের বাড়িও আকারে-প্রকারে রানীকিসরাইয়ের বাড়ির মতোই ছিল। তেমনি মাঝখানে হলঘর, চারদিকে বারান্দা, টালির ছাউনি। তবে রানীকিসরাইয়ের বারান্দার কোণে শুধু দুইটি ঘর ছিল, আর এখানে

চার কোণে চারটি ঘর। হলঘরও ছিল বেশ বড়। হলের দক্ষিণ দিকে প্রধান শিক্ষক মৌলবী গুলাম গৌস খাঁ, মাঝখানে দ্বিতীয় শিক্ষক পণ্ডিত সীতারাম শ্রোত্রীয় আর উত্তরের সীমানায় তৃতীয় শিক্ষক বাবু জগন্নাথ রায়ের চেয়ার। তিন দিকে তিন টেবিলকে ঘিরে তিনটি বেঞ্চি ছিল। তৃতীয় শিক্ষকের জায়গায় প্রথম দিকে এক মৌলবী ছিলেন। উত্তর আর দক্ষিণ দিকের শিক্ষকেরা বসতেন যথাক্রমে দক্ষিণ ও উত্তরমুখী হয়ে, আর শ্রোত্রীয়জী পুবমুখী। শিক্ষকদের চেয়ারের পিছনে কিছুটা বাঁয়ে থাকত ব্ল্যাক বোর্ড। ছাত্র যখন পড়া দিত তখন শিক্ষকের সামনের বেঞ্চিতে এসে বসত। নয়ত বসত পুব দিকের দেয়ালের গোড়ায় বিছানো দু-ফুট চওড়া চটের আসনে। হলঘরের পশ্চিমের বারান্দায় ছিল ব্রাঞ্চ স্কুল। যেখানে লোয়ার ও আপার প্রাইমারীর ছেলেরা পড়ত। পণ্ডিত গঙ্গা পাণ্ডে ছিলেন তার প্রধান শিক্ষক। তাঁর সঙ্গে আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয়তা ছিল। তাই বেশ কিছুদিন পর্যন্ত ওঁর সঙ্গে আমার খাবার ও রান্না হত। এই বারান্দার পিছনে কিছু খালি জমি ছিল যেখানে হরাইজেন্টাল বার, প্যারালেল বার ও লাফানোর জন্য একটা আখড়া ছিল। এই দুটি বার ব্যবহার করতে আমি দেখিনি বলেই মনে হয়। কিন্তু কখনো কখনো আখড়াতে লাফানোর সুযোগ পেতাম। লম্বা ও উঁচু লাফানোতে অনেকটা যেতে পারতাম, যদিও প্রথম হত আমাদের সহপাঠী সরযূ সিংহ। কোণের ঘর থেকে আখড়া কাছে ছিল। তারপরেই ছিল একটা কামরাঙ্গা গাছ। এই গাছের ছোট ছোট টক ফল খেতে আমাদের খুব ভাল লাগত। স্কুলের পুবের বারান্দার বাইরে এক লম্বামতো পাকা প্ল্যাটফর্ম ছিল। যা প্ল্যাটফর্মের কথা ভেবে ততটা তৈরি হয়নি, যতটা চার-পাঁচ ফুট নিচের সড়কের জলের ধারা থেকে স্কুলের দালানকে রক্ষা করার কথা ভাবা হয়েছিল। সন্ধেবেলায় কখনো কখনো আমাদের ক্লাস এই প্ল্যাটফর্মেও বসত।

সড়কের অন্যদিকে দুজায়গায় বোর্ডিংয়ের ঘরের সারি ছিল যা ছিল স্থানীয় এক বড় জমিদার সরদার নান্হক সিংহের (?) সম্পত্তি। এই সব ঘরের বারান্দায় রান্না করার উনান ছিল।

দাদু আমার থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন বাজারে এক ঠাকুরবাড়িতে। সম্ভবত শহরের এক ব্যবসাদার মহংগী সাহু শহরের ঠাকুরবাড়ি বানিয়েছিল। পূজারী বৃদ্ধ ও বেঁটে হলেও কাজে বেশ চটপটে ও আচারী সাধু ছিলেন, যিনি যখন তখন সাহুকে দশটি কথা শুনিয়ে দিতেন। বোঝাই যেত না ঠাকুরবাড়ির মালিক কে—পূজারী না সাধু? যদিও পূজারীর কথা অনুসারে ঠাকুরবাড়িতে কি লেগেছিল?—মরা মানুষের কবর খুড়ে আনা লাখৌরী ইঁট ও কিছু চুণ, সুরকি। আসলে কিন্তু ঠাকুরবাড়ি এতটা খারাপ ছিল না। ঠাকুরজী (হয়তো রাম-লক্ষ্মণ-সীতা)-এর ঘরের তিনদিকে পরিক্রমার পথ, আরো দুটি কুঠী, সামনের ঝাড়লণ্ঠন ও ফানুসে সুসজ্জিত সভামণ্ডপ, যার উত্তর-দক্ষিণে কামরাঅলা ছোটমতো পাকা উঠান, যার এক কোণে মিঠা জলের পাকা কুয়া, উঠানের উত্তর ও দক্ষিণে দুইটি কামরা। বাইরের দরজা বাজারের সড়কের দিকে খুলত।

যদিও মৈনীতে আমি এক-আধ মাস কোনো রকমে রান্না করেছি, কিন্তু তা আমার ও দাদু-দিদিমার বিচারে সন্তোষজনক ছিল না। এই কারণে এবং ছেলেকে নিয়মানুবর্তী করার জন্যও আমার থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল ঠাকুরবাড়িতে। পূজারী পাকা আচারী ছিলেন। তাই রান্নাঘরে খাওয়ার অনুমতিই বা মিলত কি করে? জল ভরা, বাসন মাজার কাজও ওঁর এক শিষ্য করত। পূজারী চট করে রেগে যেতেন কিন্তু আমার প্রতি ওর ব্যবহার খুব ভাল ছিল। রানীকিসরাইয়ের মতো এখানে সারাদিন ক্লাস হত না। ক্লাস শুরু হত বেলা দশটায়। বিকেলে ক্লাস ছুটি হত। এই সময়ের মধ্যে লাফানো-ঝাঁপানোও ছিল। স্কুল ঠাকুরবাড়ি থেকে কিছু দূরে

ছিল। পূজারী এক মিনিটও চুপচাপ বসে থাকতে পারতেন না। স্নান, পূজা, রান্না, ঝাড়পোঁছ, আলো-জ্বালানো, পুঁথি-পাঠ—কোনো না কোনো কাজে তিনি সর্বদাই ব্যস্ত থাকতেন। ধর্মস্থানে ছিলাম একথা বলতেই হয় কিন্তু আমি আগের মতোই আন্‌কোরা ছিলাম। ভক্তিভাবের ছিটেফোঁটাও আমার মধ্যে আসেনি। পূজারীজী শেখানো-পড়ানোরও কোনো চেষ্টা করতেন না। কিছুদিন পরে আমার ক্লাসের এক রাজপুত ছেলেও ঠাকুরবাড়িতে থাকতে আসে। তারপর থেকে আমাদের দুনিয়াই আলাদা হয়ে গেল।

তিন চার মাস থাকার পরই আমার মন ঠাকুরবাড়ির ওপর বিরূপ হয়ে গেল। কারণ হয়তো পূজারীর খিটখিটে মেজাজ। দাদু আমাকে বোর্ডিঙে থাকার অনুমতি দেন। উত্তরের বোর্ডিঙে দক্ষিণ প্রান্তের কামরায় আমি ও আরো দুই-তিন জন ছাত্র থাকতাম। রান্না হত শিক্ষক গঙ্গা পাণ্ডের সঙ্গে। ডাল, ভাত, তরকারি আমি রান্না করতে পারতাম। কিন্তু রুটি সেঁকতে হত পাণ্ডেজীকে। ঐ কাজটা আমার ওপর ছেড়ে দিলে হয়তো ওঁর রোজ ভাস্কর লবণের প্রয়োজন হত।

নিজামাবাদ পুরানো মফঃস্বল শহর। বলা হয়ে থাকে যে, ঔরঙ্গজেবের এক ছেলে আজম শাহের নামে আজমগড়ের পত্তন হয়। অন্য এক ছেলে নিজাম শাহের নামে হয় নিজামাবাদ। এতো আমার সেই সময়ের শোনা কথা। হতে পারে, নিজামাবাদ আরো আগে থেকেই ছিল। এখানকার জনবসতি মুসলমানী সময়ের আগেও হয়তো ছিল। ওখানকার কিছু স্থানে রজভরোঁ-এর রাজ্যের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল বলা হয়। কোনো সময় নিজামাবাদের বসতি আরো অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেই সময়ের প্রাচীন জনগোষ্ঠীর হদিশ মেলে এমন অনেক দেয়াল এখনো দাঁড়িয়ে ছিল। তা থেকে এই শহরের ছোট পাতলা লাখৌরী ইঁটের ইমারত। ধনুকাকৃতি খিলান জায়গায় জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল অথবা ভেঙে পড়ছিল। ভূগর্ভস্থ কত ঘর, আলাদিনের মহলের মতো মহল, দীঘির গল্প তখনো সুপরিচিত ছিল। পূজারীজী যা বলতেন, তার মধ্যে কিছু সত্যও ছিল। ওঁর ঠাকুরবাড়িই শুধু নয়, নিজামাবাদের আরো অনেক বাড়ি এই সব পুরানো দালানের ইঁট দিয়ে তৈরী হয়েছিল।

শহরে মুসলমানের সংখ্যা অনেক ছিল। যদিও পশ্চিমদিকের কাজীসাহেবের জমিদারীর অনেক কিছু বিক্রী হয়ে গেছে, তবুও তাঁর বিশেষ মর্যাদা ছিল। এই লোকেরা শিয়া ছিলেন এবং নিজামাবাদের অলম (ঝাণ্ডা) গাড়িতে রাখা বড় বড় ঢোল বাজিয়ে খুব ধুমধামের সঙ্গে বেরোত। কাজী পরিবারের কোনো প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এ সময়ে ছিলেন না। এই পরিবারের মহল আর পাকা চার দেয়ালের মধ্যে জায়গায় জায়গায় ফলের বাগান আমার চোখে ঐ সময়ের দুনিয়ার অদ্ভুত বিস্ময় বলে মনে হত। কাজী পরিবারের সম্পত্তি কিভাবে নষ্ট হয়েছিল, সে বিষয়ে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। কেউ বলে ওদের পায়খানার দেয়ালে আতর রেখে দেওয়া হত, কেউ বলে ঝাঁক ঝাঁক বাইজী ওদের ওখানে ইন্দ্রসভা রচনা করত। আমার সামনে দিয়ে ওদের বাড়ি জৌনপুর থেকে এক বরের মিছিল এসেছিল। অনেক কাগজের ফুল, বাজনা-টাজনা, গ্যাসের আলো নিয়ে মিছিল বেরিয়েছিল। নামকরা বাইজীরা নাচতে এসেছিল। বিয়ের পর জামাইসাহেব বোধহয় মাসখানেক শ্বশুর বাড়িতে থেকে গিয়েছিল। কাজী পরিবার বাদশাহী জমানায় শহরের কাজী (বিচারপতি) ছিল একথা নিশ্চয় বলে দিতে হবে না। হতে পারে এঁরা জৌনপুরের বাদশাহী জমানায় ওখানে এসেছিল এবং নিজামাবাদও ঐ সময় উন্নতির শিখরে পৌঁছেছিল। টৌস নদীর তীরে অবস্থিত নিজামাবাদে ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুকূল অবস্থান ছিল। হতে পারে

প্রথম দিকে নিজামাবাদ ছিল সমৃদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র। যদিও রেলপথ হওয়ার পর রানীকিসরাইয়ের ভাগ্য খুলে গেল। ওখানকার দোকান আমার চোখের সামনেই সংখ্যায় এবং ধনে বেড়ে গিয়েছিল। নতুন আসা মারোয়াড়ি ব্যবসায়ীরা কাপড়ের পাইকারী বিক্রীর কারবার শুরু করে রানীকিসরাইকে আশেপাশের এলাকার বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলেছিল। নিজামাবাদ রেল স্টেশন রানীকিসরাই ও করিহা থেকে চার পাঁচ মাইল দূরে ছিল। সেইজন্যে ওখানে বাণিজ্যিক উন্নতির বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু নিজামাবাদ তার খোদাই করা কালো মাটির বাসনের জন্য শুধু ঐ জেলাতেই নয়, তার বাইরেও বিখ্যাত ছিল। নিজামাবাদের কুমোরদের মধ্যে অধিকাংশই দাদুর কাকার যজমান ছিল। ব্রতকথা হলে ভোজে আমাকে অবশ্যই নেমন্তন্ন করা হত। আমার প্রমাতামহের শালীকে গ্রামের সব লোক মাসী বলে ডাকত। তাঁর হাতের তৈরী পটলের তরকারি আমার খুব ভাল লাগত।

নিজামাবাদের পুবের সীমানায় আর এক সুভ্রান্ত মুসলমান পরিবার ছিল। এই পরিবারের তখনো বড় জমিদারি ছিল। এদের এক গ্রাম রানীকিসরাইয়ের পুবদিকে ছিল। এই পরিবারের এক তরুণকে ভুটিয়া (নেপালী?) ছোট ঘোড়া ছুটিয়ে রানীকিসরাই ও পন্দহার মাঝখান দিয়ে প্রায়ই যেতে দেখতাম। যখন রানীকিসরাইয়ে থাকতাম তখন ওকে ঘোড়ায় সওয়ার হতে দেখে কতবার ইচ্ছা হয়েছে আমার একটা ঘোড়া ও বিলিতি কুকুর থাকলে (এই ইচ্ছা সম্ভবত বাবু দ্বারিকা সিংহের কুত্তীকে দেখেই হয়েছিল) আমিও ঘোড়ায় চেপে যেতাম আর কুকুর পিছু পিছু ছুটত।

শহরের তিন নম্বর বড় রইস ছিলেন সরদার নানহক সিংহ (?)। পুরানো বাদশাহী আমলেই গৌড়-কায়স্থ ও তার ব্রাহ্মণ পুরোহিত বাস করতে শুরু করেছিল। এরা জেলার সাধারণ মানুষের মধ্যে দ্বীপের মতো ছিল। এই সব পরিবারের নিজেদের বিয়ের জন্য দূরের দূরের জেলায় পাড়ি দিতে হত। এদের মধ্যে কেশধারী শিখ কমই ছিল, কিন্তু সবাই শিখই ছিল। শহরের ভেতরে ছিল একটা সঙ্গত (গুরুদ্বার) বাইরে নদীর ঘাটেও একটা মন্দিরের মতো ছিল। সঙ্গতের মোহন্ত ছিলেন বাবা সুমের সিংহ। সঙ্গত কখনো কখনো কড়া-প্রসাদ (হালুয়া) দিত। তা নেওয়ার জন্য স্কুলের ছেলেরা সেখানে সর্বদা চলে যেত। আমার ক্লাসেই ছিল পাঁচজন গৌড় ছেলে। তাদের মধ্যে জনক সিংহ ও আর একজন চুল রেখেছিল। আর বাকী তিনজনের চুল কাটা ছিল। প্রথম দিকে আমি শিখদের আলাদা জাতি বলে ভাবতাম। কিন্তু যখন জানতে পারলাম যে আমার এক চুল কাটা বন্ধুর মামাবাড়ি সরদার নান্‌হক সিংহের ওখানে, এবং আমার দুই শিখ বন্ধুর মধ্যে একজনের মামা চুলবিহীন, তখন বড় আশ্চর্য লাগল। পণ্ডিত অযোধ্যা সিংহ উপাধ্যায়ের জন্মস্থান হওয়ায় নিজামাবাদ একটি সাহিত্যিক স্থান। কিন্তু তখন আমি এ বিষয়ে কিছু জানতাম না। আমি শুধু জানতাম, পণ্ডিত অযোধ্যা সিংহ কানুনগো প্রথম নিজামাবাদে প্রধান শিক্ষক ছিলেন এবং আমাদের অঙ্কের শিক্ষক পণ্ডিত সীতারাম শ্রোত্রীয় তাঁর ছাত্র ও স্বজাতীয়। পণ্ডিত অযোধ্যা সিংহ কবি, তাঁর ছদ্মনাম 'হরিঔধ', এসব আমি একেবারেই জানতাম না। তবে আমার এক বন্ধুকে তার বাবার কবিতা পড়তে দেখে আমি সরৈয়া ছন্দে কিছু কবিতা লিখে ফেলি। তাতে আমার অন্যান্য বন্ধুরা বলল, কবিতা লেখা বড় বিপদের কাজ, ছন্দে একটা মাত্রা বাদ পড়লেও বড় পাপ হয়। উদাহরণ স্বরূপ ওরা বলেছিল, আগে সীতারামজী কবিতা লিখতেন কিন্তু মাত্রা ভুলের জন্য ওঁর ছেলেগুলি মরে যেত। এখন কবিতা লেখা ছেড়ে দেওয়ায় ওঁর দুই তিন বছরের ছেলে বেঁচে আছে। যাহোক, কবিতা লেখায় আমার অন্তরের কোনো প্রেরণা ছিল না। তাই ভয়ে তা ছেড়ে দেওয়ার প্রশ্ন ছিল না। আমি দেখাদেখি কবিতা লিখেছিলাম। আর তখনই তা শেষ হয়ে গিয়েছিল।

নিজামাবাদে চিত্তবিনোদনের অনেক ব্যাপার ছিল। শীতলার মেলা এবং নদীর তীরে আরো একটি মেলা হত। শীতলার মেলা তো শ্রাবণের প্রত্যেক সোমবার হত। সেখানে দূরদূরান্তের স্ত্রীলোকেরা শীতলা দেবীর পুরী-হালুয়া ভোগ দিতে আসতেন। নিজামাবাদে পড়তে আসার আগেও একবার আমি দিদিমার সঙ্গে এসেছিলাম। মন্দিরের কথা মনে নেই,' একটি বাগান ছিল যেখানে কড়াই বসত। বোধহয় ছোট ছেলেদের চুলকাটা হত এবং শূকর ছানা বলি দেওয়া হত। নাচুনে ছেলেরা থাকত। যে সব মায়েরা মানসিক করতেন, তারা মাটিতে নিজেদের আঁচল বিছিয়ে তার ওপর নাচাতেন। নিজামাবাদে রামলীলাও হত এবং তার ভরত মিলন তো আমাদের বোর্ডিঙের পেছনের ঠাকুরবাড়ির উঠোনে হত। মফঃস্বল শহরের কায়স্থদের নাচগানেরও শখ ছিল। তাঁরা নিজেরা নাচতেন না। কিন্তু বাইরে থেকে বাঈজীদের প্রায়ই মুজরা করাতে নিয়ে আসতেন। ছাত্রদের পক্ষে এই নাচ দেখতে যাওয়া সহজ ছিল না। গেলেও তা জেনে ফেললে পরদিন সীতারামজীর ছড়ির বর্ষণ হত। মফঃস্বল শহরের ছেলেদের কাছ থেকে খবর পাওয়া যেত। মনে হয় আমি দুয়েকবার দেয়াল টপকে ভেতরে গিয়েছি এবং দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের ভিড়ের পেছনে থেকে চুপিচুপি বাঈজীর নাচ দেখেছি। রানীকিসরাইয়ে থাকার সময় দুয়েকবার জেলা বোর্ডের ড্রিল মাস্টার আমাদের স্কুলেও এসেছিলেন। তিনি কিছু দণ্ড কসরত শিখিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি চলে যাওয়ার পরই কোথায় দণ্ড আর কোথায়ই-বা কসরত। নিজামাবাদে ঐ রকম কোনো ড্রিল-মাস্টারের দর্শনও পাইনি। সারা জেলায় সব স্কুলের দড়ি টানাটানি, ড্রিল, লাফ ও দৌড়ের টুর্নামেন্ট প্রতি বছর আজমগড়েই হত। সে-বছর আমাদেরও চৌদ্দ পনেরটা ছেলে যোগ দিয়েছিল। এর জন্য ওদের কালো গল্‌তার (আধা রেশমী ও আধা সূতির কাপড়) কোট বানাতে হয়েছিল। দরজি আমাদের স্কুলেরই প্রাক্তন ছাত্র ছিল। সে জাতিতে দরজি ছিল না বরং খানদানী অভিজাতদের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল। সে বাইরেও ঘুরেছে। সেখানেই সে মেসিন চালানো ও দরজির কাজ শিখেছে। সে বলেছিল, যে দরজির কাজে সে পুরোপুরি ওস্তাদ। কিন্তু কোটগুলি তৈরী হয়ে আসার পর সবাই পস্তাতে লাগল। ওর লম্বা লম্বা ইংরেজী-চুল ও চটকদার পোশাকের সঙ্গে ছোট হিলওলা লেডী-সুও ছিল। ঐ সময় আমার চোখে তা বেমানান বলে মনে হয়নি। টুর্নামেন্টে আমাদের স্কুলের কেউ পুরস্কার পায়নি। আর পাবেই বা কেন? শুধু গল্‌তার কোট সেলাই করিয়ে নেওয়ার জন্য!

প্রথম প্রথম মফঃস্বল শহরের ছেলেদের কাছে নিজেকে নগণ্য বলে মনে হত। ওদের তরতর করে কথা বলার ধরণ তাও 'আইন রহা', 'গাইন রহা'-র মতো এক বিদেশী ভাষাতে কি করে আমাদের মতো গেঁয়ো ছেলেদের সম্ভ্রম না জাগিয়ে পারে? জনক, দ্বারিকাপ্রসাদ ও অন্যান্য মফঃস্বল ছেলেদেরকে আমি খুব বুদ্ধিমান ছাত্র বলে মনে করেছিলাম। কিন্তু এই সম্ভ্রম বেশী দিন রইল না। তিন চার মাস যেতে না যেতেই আমি সারা ক্লাসে সেরা হয়ে গেলাম। গণিতে অন্য ছেলেদের প্রাণ কেঁপে উঠত। কিন্তু আমার কাছে তা ছিল বাঁ হাতের খেলা। সন-তারিখ বাদ দিলে ইতিহাসের অন্যান্য ব্যাপার তো আমি পাঠ সমাপ্ত হওয়ার পরই পুনরাবৃত্তি করে দিতাম। ভূগোলের অধ্যাপক বাবু জগন্নাথ রায় তো পড়া ধরার কাজ অনেকবার আমার ওপরই ছেড়ে দিতেন। বাবু জগন্নাথ রায়ের আগে এক অল্প বয়সী মৌলবী কিছুদিনের জন্য শিক্ষক ছিলেন। আমরা শুনেছিলাম তিনি আরবী ফারসীও জানতেন। কিন্তু আমাদের তো শুধু বাহারিস্তানও উর্দু ব্যাকরণ পড়ার ব্যাপার। তিনি চলে যাওয়ার পর ভাষা পড়ানোর ভার পড়েছিল বৃদ্ধ মৌলবী গুলামগৌস খাঁয়ের ওপর।

মৌলবী গুলামগৌস খাঁ ছোটখাট ও কৃশ। ষাট বছরের বৃদ্ধ। ওর মাথার ও দাড়ির সব চুলই

সাদা হয়ে গিয়েছিল। একবার কেউ গুজব ছড়িয়ে দেয় যে ৫৬ সালে সব শিক্ষককেই সরিয়ে দেওয়া হবে। তখন বহু মাস যাবৎ প্রত্যেক সপ্তাহ ধরে তাঁর চুলে কলপ লেগে থাকত। বেচারীর মাসিক বেতন ছিল ত্রিশ টাকা। ওই টাকা দিয়েই তাঁকে তিন ছেলে ও পরিবারের অন্যান্য মানুষকে লালন-পালন করতে হত। ওঁর মেজছেলে ইব্রাহিম আমার সহপাঠী ছিল। সে এবং তার ছোটভাই বাবার সঙ্গে থাকত। বড় ছেলে ইয়াসীন (?) ম্যাট্রিকে ফেল হতে থাকে। তাই মৌলবী সাহেব বড়ছেলেকে ড্রাফটম্যানের কাজ শেখার জন্য গোরখপুর পাঠিয়ে দেন। বড় ছেলেকে পঁচিশ টাকা পাঠিয়ে দিতে হত। বাকী পাঁচ টাকায় তিনি কিভাবে দিন গুজরান করতেন তা আমার কাছে এক ধাঁধার মতো ছিল। মৌলবী সাহেব বিশেষ রাগী ছিলেন না। যখন রেগে যেতেন তখন সাঁইসাঁই করে ছড়ি ভাঙতেন। আমাদের বইয়ে ইতস্তত পুরানো পয়গম্বর, মুসা, দাউদ প্রভৃতিদের উল্লেখ ছিল। সেগুলো এলেই মৌলবী সাহেব 'কস'সুলে-অম্বিয়া' নিয়ে বসে যেতেন আর পড়ানোর সবটা সময় ওতেই কেটে যেত।

পণ্ডিত সীতারাম শ্রোত্রিয় গুরুগম্ভীর মেজাজের মানুষ ছিলেন। ছাত্রদের ওপর ওঁর প্রভাব সবচেয়ে বেশী ছিল। গণিত ও হিন্দী শেখাতেন তিনি। উর্দুর ছাত্র হয়েও গণিতের জন্য আমাকে ওঁর কাছে যেতে হত। গণিতে আমার ব্যুৎপত্তি ছিল। তাই মার খাওয়ার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হতনা। একবার শীতের দিনের কথা। পরীক্ষা ঘনিয়ে আসায় ছাত্রদের দ্বিগুণ পরিশ্রম করতে হত। দিনে তো পড়াশোনা হতই, রাত্রিতেও খাওয়ার পর লণ্ঠনের কাছে বসে আমরা পড়া তৈরী করতাম। অন্য সকলের মতো আমিও ওখানে পড়তে যেতাম কিন্তু শত শত মণ ওজনের ঘুম আমার চোখের পাতায় বসে থাকত। পণ্ডিতজী ও তৃতীয় শিক্ষক আমাদের পাশেই খাটিয়ায় বসতেন যাতে কেউ ঘুমোতে না পারে। যে মুহূর্তে ওঁরা ওখান থেকে সরে যেতেন, তৎক্ষণাৎ এই বান্দা বাহাদুর চম্পট দিত। বোর্ডিঙে খুঁজে আমাকে ধরে নিয়ে এলে, জল খেতে গিয়েছিলাম এই অজুহাত দেখাতাম। প্রায়ই দুই করতলে গাল রেখে মাটির দিকে ঝুঁকে আমি এমনভাবে পড়তাম যে বোঝা যেতনা, আমি ঘুমিয়ে আছি অথবা পড়ছি। শিক্ষকদের হুকুম ছিল, যে ছেলে ঘুমোবে তাকে যে দেখবে, সে তার নাক মলে দেবে। কিন্তু আমার নাক মলার সাহস কারুর ছিল না, এই জন্যে নয় যে আমার শরীর বলিষ্ঠ ছিল এবং পরে এর শোধ নিতাম, বরঞ্চ আমি ক্লাসের সেরা ছেলে ছিলাম বলে। শিক্ষকেরা অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকায় পড়া আদায় করা ও প্রশ্ন করার কাজ অনেকবার আমার মিলে যেত। ইতিহাস, ভূগোল ও অন্যান্য ভাষা প্রভৃতি বিষয় যা জগন্নাথ রায় পড়াতেন, তা প্রায় প্রতিদিনই আমার হাতে আসত। যে আমার নাক মুলত তাকে আমি দুমদাম কয়েকটা কঠিন কঠিন প্রশ্ন করতাম। প্রথম প্রশ্নের জবাব না দিতে পারলে বেঞ্চির ওপর দাঁড়াতে হত। দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব না দিতে পারলে বেঁচে গেলেও তৃতীয় প্রশ্ন না পারলে শিক্ষকের দৃঢ় ধারণা হত যে ছেলে পড়া মুখস্থ করেনি এবং জগন্নাথ রায়ের মতো শান্ত স্বভাবের শিক্ষককেও ছড়ি ওঠাতে হত। এই কারণেই কোনো সহপাঠী আমাকে চটাতে চাইত না। পণ্ডিত সীতারাম ও অন্যান্য শিক্ষকেরা বুঝে গিয়েছিলেন যে আমি রাত্রিতে পড়তাম না। কিন্তু ওঁরা কি করবেন। ইতিহাস, ভূগোলের মতো মুখস্থ করার বিষয়তো পড়ানোর সময়ই আমার মুখস্থ হয়ে যেত। প্রশ্নের উত্তর দিতে ভুল হলেই তো বেত মারবেন। একদিন পণ্ডিতজী গণিতের এমন প্রশ্ন দিলেন, যা আমরা দুতিন মাস আগে পড়ে ছেড়ে দিয়েছিলাম। অনুশীলন করতাম কিন্তু সব প্রশ্নের রোজ রোজ অনুশীলন থোড়াই হতে পারে। উত্তরে ভুল হল। অন্য সব ছেলেরা তো বেঁচে গেল। 'বেশী পণ্ডিত হয়েছ' এই বলে তিনি আমার উপর দুই-তিনবার ছড়ি চালালেন। নিজামাবাদে পড়াশোনার জন্য বেত খাওয়ার এই এক সুযোগ হয়েছিল।

মৌলবী গুলামগৌস খাঁ কখনো কখনো রেগে যেতেন। কিন্তু এই রাগ বেশীক্ষণ স্থায়ী হত না। পণ্ডিত সীতারামের রাগ অনেকক্ষণ থাকত। হাসিমুখে ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলতে তো ওঁকে দেখাই যেতনা। বাবু জগন্নাথ রায় একেবারে সাধু পুরুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন বৈষ্ণব। ওঁর গলায় হালকা তুলসীর কণ্ঠী ছিল। রোজ স্নান পূজা ও সাধু-সন্তদের সঙ্গ দিতেন। ঐ সময়ে টৌস-এর ঘাটে ছোট শিবলিঙ্গের সামনে এক বিভূতি-মাখা জটাধারী সাধু এসেছিলেন। বাবুসাহেব সকাল সন্ধ্যায় প্রতিদিন ওখানে পৌছতেন, মহাত্মার সৎসঙ্গ করতেন আর গাঁজার মণ্ডলীতে যোগ দিতেন। ওঁর রাগ প্রায় ছিল না বললেই চলে। কখনো কোনো ছেলেকে মারতে হলে অনিচ্ছায় অল্পস্বল্প মারতেন। তিনি বিচারে অত্যন্ত সহিষ্ণু ছিলেন যা বহু দেবদেবীর ভক্তজনের মধ্যে খুব কম মেলে। রবিবার তো বাবুসাহেবের আলুনি খাওয়ার ব্রত ছিল। ঐ দিন তিনি একবার পুরী-হালুয়া অথবা রুটি-হালুয়া খেতেন। আমার ঐ দিন মাংস রান্না করে খাওয়ার নিয়ম, তাও বাবু সাহেবের উনুনের তিন হাত দূরের তৃতীয় উনুনে। তিনি কখনো কখনো সহৃদয়তার সঙ্গেই বলতেন—'আরে কেদারনাথ, অন্তত রবিবার মাংস খেয়ো না।' আমি বলতাম—'কি করব, বাবুসাহেব, অন্যদিন মাংস কিনে আনা, মশলা বাঁটা ও রান্নার জন্য ছুটি পাব কি করে।' আমার কথায় কিছু সত্য ছিল, তাই তিনি আর কিছু বলতেন না। অন্য বিষয়ের সঙ্গে আমার দ্বিতীয় ভাষা হিন্দী ও ভূগোলের ম্যাপ-আঁকাও বাবু জগন্নাথ রায়ের হাতে ছিল। উর্দুর চেয়ে আমার হিন্দী হাতের লেখা অনেক সুন্দর হত। সুতরাং তার জন্য তারিফ করলে আমার বিশেষ কিছু মনে হত না। কিন্তু ম্যাপ আঁকার জন্যও আমার যে প্রশংসা মিলত তা আমার কাছেও অনুচিত মনে হত। জল-স্থল, প্রদেশ ও রাজ্যের ওপর নানা রঙের পেন্‌সিলের দাগ দিয়ে আমি স্রেফ চোখে ধূলা দিতাম। আমার সীমারেখা পুরোপুরি ভুল হত। এই ভুল আমি নিজেই বুঝতে পারতাম। বস্তুত দাদুর যত গল্প শুনেছিলাম, তারপর তাঁর গল্পের শহর ও স্থান যখন ম্যাপে পেতে লাগলাম, তখন ঐ সব শহর ও স্থানের ওপর আমার এক অদ্ভুত ধরণের মুগ্ধতা জন্মাল। ম্যাপে কোন জায়গা কোথায় আছে, তা আমি কখনো কখনো সত্যিই চোখ বুজে বলে দিতে পারতাম। হতে পারে এই জন্যেই শিক্ষক ও অন্য ছেলেরা তারিফ করা সত্ত্বেও আমি যে ম্যাপ তৈরী করতাম, তা আমার কাছে পুরোপুরি ত্রুটিপূর্ণ মনে হত।

যখন বছর শেষ হয়ে এল, তখন অনেক দিন পণ্ডিত সীতারামজী ষষ্ঠ শ্রেণী (যা মিডল স্কুলের শেষ শ্রেণী) ও পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রদের একত্র বসিয়ে গণিতের প্রশ্ন দিতেন। ষষ্ঠ শ্রেণীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান ছেলে ছিল নরসিংহ রায়। পরে মিডল পরীক্ষায় ও সরকারি ছাত্রবৃত্তি পেয়েছিল। কিন্তু এক ক্লাস নিচে থাকা সত্ত্বেও আমি বহুবার ওর সমান নম্বর পেয়েছি। নিজামাবাদের অধিকতর বিস্তৃত ক্ষেত্রে (বিশেষ করে বাছাই করা ছাত্র মহলে) আমার প্রতিভার প্রতিযোগিতার সুযোগ ঘটে ছিল। তাতে নিশ্চয়ই আমার অনেকটা লাভ হয়েছিল। কিন্তু তাও যথেষ্ট ছিল না। খবরের কাগজের কথা আমরা জানতাম না। পাঠ্য পুস্তকের অতিরিক্ত যদি কখনো 'হাতিমতাই' অথবা 'আরাইশ-মহফিল' কেউ পেয়ে গেল, তো সেটাই ঢের; তবে শিক্ষা বিভাগের নিষেধ সত্ত্বেও পাঠ্য পুস্তকের 'নোটবই' আমাদের কাছে অবশ্যই পৌছে যেত।

বর্ষার পর স্কুলের টালি ছাওয়া ও হয়তো নতুন কড়িও লাগানো দরকার হয়ে পড়ত। সেই জন্য স্কুল সরিয়ে এক বড় বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। কোনো সময়ে নিজামাবাদের কায়স্থদের খুব ভাল অবস্থা ছিল। এ সময়ে অনেকেরই জমিদারী বিক্রী হয়ে গিয়েছিল। তবে তাদের মধ্যে কিছু লোক সাধারণ কেরানি অথবা পাটোয়ারীর মত চাকরী করত। পণ্ডিত অযোধ্যা সিংহের ছোটভাই পণ্ডিত গুরুসেবক সিংহ উপাধ্যায় ডেপুটি কালেকটার ছিলেন। কিন্তু পুরানো পাকা

বাড়ি ও ভেতরের আসবাব থেকে বোঝা যেত যে আগের মতো অবস্থা আর নেই। যে ঘরে আমরা গিয়েছিলাম তা কোনো হাকিম সাহেবের ছিল। আজকাল তিনি হাকিমী করতেন রুজি রুটি কামানোর জন্য নয়। বিনে পয়সায় মানুষের সেবার জন্য। বাড়িটি ছিল এক বিশাল ইমারত। তাতে উঠোন, দালান ও কামরা-কোঠাও অনেক। আমাদের পড়াশোনা হত দোতলার কয়েকটি কামরায়।

মার্চ (১৯০৭ খৃঃ)-এর কাছাকাছি আমাদের বার্ষিক পরীক্ষা সমাপ্ত হয় এবং ছুটিতে আমি দাদুর বাড়ি যাই। ওখানে ঐ সময়ে প্লেগ চলছিল। পরদিনই দিদিমা আমাকে কনৈলায় রওনা করলেন। এ সময়ে আমার সংস্কৃতির স্তরও কিছুটা বেড়েছিল। আমার কাছে কনৈলা এখন নেহাৎ অজ পাড়াগাঁ বলে মনে হত। যখন থেকে এই গ্রামের পত্তন হয়েছে, তখন থেকে বোধহয় আজ পর্যন্ত এই গ্রামে আমার চেয়ে বেশী লেখাপড়া জানা মানুষ জন্মায়নি। আমার তিন ছোটভাই শ্যামলাল, রামধারী ও শ্রীনাথ পড়াশোনা করছিল। কিন্তু ওরা তখনো নিচের ক্লাসে। গ্রামে আরো দুয়েকজন ছিলেন যারা কোনো মাদ্রাসায় শিক্ষা পেয়েছেন। তাই শিক্ষিত লোকের চিত্ত বিনোদনের কোনো ব্যবস্থা গ্রামে ছিল না। কনৈলাতে তখনো ব্যায়াম ও আখড়ার প্রচলন ছিল। আখড়া বেশী হত বর্ষার সময়। অবশ্য আখড়া হত যদি কোনো নট এসে তা শুরু করত। কিন্তু এই বিষয়ে আমার রুচি ছিল না। আমের দিনে গেলে ভরোসা পাণ্ডের কাছে বাগান দীঘি পুকুর ও উষরের একলা অশ্বত্থ গাছের ভূতের গল্প শুনতাম। আশ্বিনের নব রাত্রিতে পৌঁছলে কিন্নার বাবার দেবস্থানে ভূত খেলানো মেয়েদেরকে 'ছেড়ে দে' 'কেন ধরেছিস' 'তোর কি পুজো চাই' ইত্যাদি জিগ্যেস করতাম এবং অনেক রাত পর্যন্ত মজা করতাম। এখন এই মজা কিছুটা ফিকে লাগছিল।

কনৈলায় একদিন থেকে আমি বছওয়ল-এ চলে গেলাম। বছওয়ল আমার চোখে একটু বেশী সভ্য মনে হত। এই কারণেই পরে আমার থাকার সময়ের অর্ধেক কাটত কনৈলায়, অর্ধেক বছওয়ল-এ। পিসামশাই মহাদেব পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য থেকে লাভবান হওয়ার জন্য ওখানে যেতাম না, তাছাড়া সেই জন্য তাঁর অবসরও ছিল না। আমার অধিকাংশ সময় কাটত যাগেশ ও অন্যান্য সমবয়স্ক ছাত্রদের সঙ্গে খেলাধূলায় ও গল্পসল্পে। এই খেলাধূলার মধ্যে ছিল দীঘির কাছে চরে বেড়ানো ঘোড়া ধরে তাতে সওয়ার হওয়া। একদিন আমি ও যাগেশ দীঘি থেকে ঘোড়া ধরতে গিয়েছিলাম। লাগামের বদলে আমাদের হাতে বোধহয় দড়ি ছিল। যাগেশ প্রথম ঘোড়ায় চড়ে, আমি আমার ঘোড়ায় পেছনে ছিলাম। যাগেশের ঘোড়াকে দৌড়তে দেখে আমার ঘোড়াও দৌড়তে থাকে। ওকে রুখতে হত কিন্তু রুখবে কে? এক জায়গায় একটা ঢিবি লাফিয়ে পেরোবার সময় আমি নিচে পড়ে গেলাম। ঘোড়ার একটা ক্ষুর মাথার পিছনের দিকে একটু ছুঁয়ে চলে গেল। শক্ত আঘাত লাগেনি কিন্তু রক্ত বেরতে লাগল। পরদিন পিসি যখন জিগ্যেস করলেন, তখন বললাম, দালানের কড়িতে লেগেছে।

বছওয়ল-এ থাকার সময়ই জানতে পারলাম যে প্লেগে দিদিমা মারা গেছেন। মিডল পরীক্ষার ফল বেরোবার পর নিজামাবাদে যেতে হল। কিন্তু সেখানে বেশীদিন থাকিনি। দাদুর শিকারের গল্প এবং নওয়াজিন্দা-বাজিন্দার আনন্দ ভ্রমণ মনে রঙ ধরাতে শুরু করেছিল। খাওয়া-দাওয়ার জন্য এ সময় আমার কাছে কিছু আটা ও চাল ছিল। বাজারে তা বেচে দিলাম। মোট দেড়-দুই টাকা পেলাম। তা নিয়েই ফরিয়া স্টেশনে পৌঁছে গেলাম। মনে আর জিভে ছিল বাজিন্দার সোনালি বাক্য;

'সৈর কর দুনিয়াকি গাফিল জিন্দগানী ফির কঁহা?
জিন্দগী গর কুছ রহী তো নৌজবানী ফির কঁহা?'

ফরিহা স্টেশনে টিকিট নেওয়ার সময় বারাণসীই চোখের সামনে ছিল। কেননা সেখানে আমি একবার গিয়েছিলাম। টিকিট নিয়ে গাড়িতে বসলাম। দিন থাকতেই এক সময় বারাণসী পৌঁছলাম। সেখানে মামার মঠের কথা মনে ছিল। কিন্তু একা গেলে নানা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হত। তাই সেখানে যাইনি। অনেক ভেবেচিন্তে ঐ মঠের কাছেই জগেসরনাথের একটা মন্দিরে গেলাম। সেখানে অনেক সংস্কৃত ছাত্র থাকত। আমাকে প্রশ্ন করায় বললাম, সংস্কৃত পড়তে এসেছি। আমাদের মধ্যে অর্থাৎ সরযূপারিয়া ব্রাহ্মণদের মধ্যে আত্মীয়ের বাইরে অন্য কোথাও রান্না করা খাবার খাওয়ার রেওয়াজ নেই। তাই আমি নিজেই রুটি তৈরী করলাম। স্টেশনে নামার পর থেকেই আমার মনে একটা গোলমেলে ব্যাপার ঘটছিল। নওয়াজিন্দা-বাজিন্দা দুনিয়া ঘুরে বেড়ানোর জন্য এ পর্যন্ত নিয়ে আসতে পেরেছে। কিন্তু এরপর ডানাকাটা মনে হল। হাতের পয়সাও শেষ হয়ে যাওয়ার অবস্থা। শীগ্‌গিরই একটা কিছু স্থির করতে হবে নয়তো ফিরে যাওয়ার ট্রেন ভাড়াও থাকবে না। সব ভেবেচিন্তে দেখার পর সন্ধ্যা নাগাদ মন পরের উড়ানকে অনুচিত আখ্যা দিল এবং বলল, রানীকিসরাইয়ের টিকিট কেটে ফিরে চল।

রাতের গাড়ি ধরলাম। মনে হয় মউ-এ ট্রেন পালটেছিলাম। কিন্তু এমন ঘুমে ধরল যে রানীকিসরাই পেরিয়ে গাড়ি যখন ফরিহা পৌঁছল, তখন চোখ খুললাম। নেমে পড়লাম। কিন্তু এক স্টেশন বেশী চলে এসেছিলাম। পকেটে পয়সাও ছিল না। সম্ভবত স্টেশন মাস্টার কোনো ঝামেলা করেনি।

স্টেশনে রাত কাটল। ভয় হল। পন্দহা গেলে দাদু নানা প্রশ্ন করবেন। তাই আমি কনৈলার রাস্তা ধরলাম।

১০

প্রথম উড়ান

প্রথম প্রয়াস বিফল হয়েছিল। এতে অসফল হলাম। মন বলল, ওয়াজিন্দা-বাজিন্দা হওয়ার যোগ্যতা নেই তোমার। কিন্তু পরে কিছু এমন ঘটনা ঘটল যা আমাকে আবার সাহসী হতে বাধ্য করল।

দিদিমার মৃত্যুর পর পন্দহাতে দাদু একা থাকতেন। আম পাকার মরশুমে মে মাসের মাঝামাঝি অথবা শেষভাগে আমি আমার বোন রামপ্যারীকে নিয়ে পন্দহা পৌঁছলাম। আমরা ভাই-বোনে মিলে রান্নাবান্না করতাম এবং ঘরবাড়ির দেখাশোনা করতাম। দাদুর টাকা পয়সারও আমি খাজাঞ্চি ছিলাম। একদিন মাখন গলিয়ে ঘি বানিয়েছি। বিড়ালের ভয়ে তরল ঘিকে একটা মাটির গামলার নিচে চাপা দিতে গেলাম। ঘি চাপা দেওয়ার সময় অন্ধকার ঘরে ঘিয়ের বয়ম কোথায় দেখতে পাইনি। গামলার কিনারা বয়মের ওপর পড়ল। আমি তো গামলা চাপা দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলাম। কিন্তু পরদিন দেখলাম, সবটা ঘি প্রায় দুই সেরের মতো—পড়ে সারা মেঝেতে ছড়িয়ে গেছে। দাদু রাগ করবেন, এই ভয়ে আমার আতংক হল। আমি বলদ বিক্রীর বাইশ টাকা নিয়ে রানীকিসরাইয়ের স্টেশনের দিকে কেটে পড়লাম। রাস্তায় শোভিতের বাগান। লাল-হলুদ আম গাছের ওপর পেকে ঝুলছিল। হয়তো শোভিতের ইচ্ছা হয়েছিল যে, আমি দুচারটে আম

খেয়ে যাই। আঁকশি নিলাম আর আম পেড়ে পেড়ে খেতে লাগলাম। ট্রেনের সময় আমি স্টেশনে গেলাম। আমার ধারণা হয়েছিল যে, দাদু শীগগির খবর পাবেন না। কেননা আমি আমার বোনের কাছেও আমার উদ্দেশ্য প্রকাশ করিনি। যে সাধারণ পোশাক পরেছিলাম, তাই পরেই বেড়িয়ে এসেছিলাম। স্টেশনে পৌছলাম, লাইন ক্লিয়ার হয়ে গেছে। এমন সময় দেখলাম দাদুর বিশাল মূর্তি অতি দ্রুত স্টেশনের দিকে ছুটে আসছে। হয়তো শোভিতের কাছে তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, আমি স্টেশনের দিকে এসেছি। আমি স্টেশন থেকে বাজারে যাওয়ার রাস্তা ধরলাম। তারপর পাক্কা সড়ক ধরে সারা বাজার পর্যন্ত ধীরে ধীরে গেলাম। কিন্তু পরে দ্রুত ছুটে আজমগড় স্টেশনের রাস্তা ধরলাম। স্টেশনে আমাকে না পেয়ে দাদু কি ভেবেছিলেন জানিনা। হয়তো তিনি ভেবে থাকবেন, শোভিত তাঁকে ধোঁকা দিয়েছে। হয়তো স্টেশনে এসে তিনি ঠিক করতে পারেন নি আমি পুবদিকে অথবা পশ্চিমদিকে গিয়েছি। যদি তিনি ঐ ট্রেনে চলে আসতেন, তবে আমাকে ধরে ফেলার পুরো সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তিনি তা করেন নি।

আজমগড় স্টেশন শহর থেকে অনেক দূরে। আশেপাশের লোকেরা তাকে আজমগড় না বলে পাশের গ্রাম পল্‌হনী অনুসারে পল্‌হনী বলত। সাধারণ মানুষের ধারণা অনুসারে রানীকিসরাই থেকে এই স্টেশন চার মাইলেরও কম। যখন আমি রেলওয়ে ক্রসিঙে পৌছলাম, তখন সিগন্যাল দিয়ে দিয়েছিল। স্টেশনে পৌছে যাওয়াতে আমার ধড়ে প্রাণ এল। ট্রেনে চেপে দেখলাম সূর্য অস্ত গেছে। টিকিট নিয়েছিলাম বারাণসীর। কারণ ঐ রাস্তা জানা ছিল। বারাণসীতে এক-আধ দিন ছিলাম অথবা আগে চলে গিয়েছিলাম, তা আমার মনে নেই। ওখান থেকে মোগলসরাই ও তারপর বিন্ধ্যাচল নিশ্চয়ই গিয়েছিলাম। এই সবগুলো আগের দেখা জায়গা ছিল। বিন্ধ্যাচলে পুরানো পরিচিত পাণ্ডার কাছে হয়ত গিয়েছিলাম। বারাণসী-মোগলসরাই-বিন্ধ্যাচল-মোগলসরাইয়ের মধ্যেই আমি ষোল-সতের টাকা খরচ করে ফেলেছিলাম। এই যাতায়াতে আমার কয়েকটা দিন অবশ্যই কেটে গিয়েছিল। গুলবকাবলীর (হিন্দী) বই, লোটা-দড়ি ও একটা গামছা ছাড়া আমি সব পয়সা খেতেই খরচা করেছিলাম। মন জলদি কোনো সিদ্ধান্তে পৌছতে পারেনি, দ্বিধা ছিল। কিন্তু ঘরে ফিরে যাওয়া অসম্ভব ছিল। সেখানে দুই সের ঘি বরবাদ করার অপরাধই শুধু নয়, বাইশ টাকা নিয়ে পালানো এবং তা খরচ করে ফেলার বিশ্রী অভিযোগও আমার মাথার ওপরে ছিল। শেষ পর্যন্ত আফশোস করে মনকে সিদ্ধান্ত নিতে হল, চলো কলকাতা।

ট্রেন যাত্রীতে একেবারে কানায় কানায় ভর্তি ছিল। কোনো রকমে আমি তাতে উঠলাম। কি ট্রেন ছিল, তা আমার মনে নেই কিন্তু এইটুকু মনে আছে যে সন্ধ্যা থেকে সারারাত চলে ট্রেন সকালে হাওড়া পৌছেছিল। লিলুয়াতে আমার টিকিট নিয়ে নিয়েছিল। কলকাতায় কোথায় যাব, রাস্তায় তা আমার মাথায় আসেনি। কেননা আমার মনে হয়েছিল যে কলকাতাও বারাণসীর মতো শহরই হবে। কিন্তু যখন হাওড়ার বিশাল স্টেশনে নামলাম তখন ওখানকার অন্তহীন ভিড় দেখে মনে হল এটাই একটা শহর কিংবা বড় মেলা। ঐ সময় তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের যে প্রতীক্ষালয় ছিল, তা অন্য ধরনের ছিল। মেঝে এখনকার মতো সাদা সিমেন্টের ছিল না। সিগন্যালের মতো জোড়া-দেওয়া লোহার তৈরী স্তম্ভের ওপর হয়তো টিনের ছাদ ছিল। এই মেলাতে আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গিয়েছিল। কোথায় যাবো আগে স্থির করিনি। এখানে নানা রকমের ভাষা, বিচিত্র বেশভূষা চোখে পড়ছিল। বড় রাস্তায় গিয়ে দেখলাম, গঙ্গার পাকা ঘাট, পুলের ওপর অপার জনসমুদ্র। নদীর অন্যপারে শহরের অট্টালিকা দেখা যাচ্ছিল। এই সব দেখে আতংকিত হয়ে উঠলাম। কোথায় যাব, কার কাছে যাব? বাচ্চা মামা অথবা জওয়াহির মামার

কাছে যাব, একথা কাউকে জিগ্যেস করা নিজের কাছেই আহম্মকের কাজ বলে মনে হল। নিরুপায় হয়ে ফিরে এসে প্রতীক্ষালয়ে একটি থামের পাশে চুপচাপ বসে পড়লাম।

বোধহয় এইভাবে চুপচাপ বসে থেকে আর নিজে যে কাজ করেছি তার জন্য অনুতাপ করে এক যুগ কেটে গেল। আমি অথৈ সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছিলাম। সমস্যা সমাধানের কোনো পথ আমার চোখে পড়ছিল না। হয়তো এখনো আমি সংঘর্ষে লিপ্ত ছিলাম অথবা হাল ছেড়ে দিয়ে ভাবছিলাম— 'কশ্তী খোদা পে ছোড় দে—লংগরকো তোড় দে'। এই সময় এক ফর্সা পাতলা ছেলে আমার কাছে এল। আমার চেয়ে ওর বয়স হয়তো কিছু বেশী ছিল। ওর পরনে ধুতি, কুর্তা ছাড়া মাথায় বোধহয় টুপীও ছিল। ও ভুক্তভোগী। তাই কোনো দ্বিধা না করে আমার কাছে চলে এল। কিভাবে কথা শুরু করল তা আমার মনে নেই। ও নিশ্চয়ই আমাকে জিগ্যেস করেছিল—কোথা থেকে এসেছ। আমাদের মতো মাদ্রাসায়-পড়া ছেলেদের কুর্তার আস্তিন ব্লটিং পেপারের কাজ করত। হয়তো তা থেকে ওর এই অনুমান হয়েছিল যে আমি স্কুলের ছাত্র। তাছাড়া দেহাতী রাখাল ও দেহাতী ছাত্রের মধ্যে একটা পার্থক্য তো থাকেই। কথাবার্তার পর বুঝতে পারলাম যে আমার সহযোগী বাবু মহাদেব প্রসাদ আমারই মতো হাণ্ডিয়া তহশীলী স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীর উর্দুর ছাত্র ছিল। আর এবারই ও পঞ্চম শ্রেণী থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীতে উঠেছিল। মনে নেই, নওয়াজিন্দা-বাজিন্দার প্রেরণার মার ওর ওপর পড়েছিল কিনা। কি কারণে ও এত তাড়াতাড়ি পালিয়ে এল, তাও আমার মনে নেই। এইটুকু জানা গেল যে ও আমার কয়েকদিন আগে কলকাতা পৌছেছিল। আমি তো দুচার আনায় কেনা এক গুলবকাবলীর মালিক হয়েছিলাম। কিন্তু আমার সহযোগী মহাদেব প্রসাদ পুরো থলিই নিয়ে এসেছিল। আমার কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা দেখে ও আমার সাহস বাড়ানোর জন্য বলল—আমারও এই অবস্থাই হয়েছিল। কিন্তু এখন মাসিক আট আনায় আমি একটা বাসা ভাড়া করে রেখেছি। আমাদেরই মতো পালিয়ে আসা আর এক তরুণ আমার সঙ্গে থাকে। মহাদেব প্রসাদ আমার জন্য ঘোর অন্ধকারে বিজলীর আলো হয়ে এসেছিল। নওয়াজিন্দা-বাজিন্দা যে আগুন জ্বালিয়েছিল তা তখনো নিভে যায়নি, ছাই চাপা পড়েছিল মাত্র। ওর কথায় আমি আবার সাহস ফিরে পেলাম।

ওখান থেকে উঠে আমরা হাওড়া পুল পার হলাম। গঙ্গার তীরের সড়ক ধরে আমরা জগন্নাথ ঘাটের দিকে গেলাম। সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি কলকাতার দিক ঠিক করতে পারিনি। টাকশালের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মহাপ্রসাদজী বলল—এখানেই টাকা-পয়সা বানানো হয়। এতে আমার মন ঐ দিকে আকৃষ্ট হল। কারণ আমরা রোজগারের সুযোগ খুঁজছিলাম। মনে হল এখানে কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। টাকশাল ছাড়িয়ে জোড়াসাঁকোর একটা গলিতে পৌছলাম। আশেপাশে বেশীরভাগই 'খোলাবাড়ি' (বাঁশের ফালির দেয়াল আর খাপরার ছাদের ঘর) ছিল। কলকাতায় মাসে আট আনা ভাড়ার ঘরের কথা শুনে আমি আশ্চর্য হইনি। কেননা তখন পর্যন্ত ভাড়াটাড়া নিয়ে আমাকে কোনোদিন মাথা ঘামাতে হয়নি। আশ্চর্য হলেও বাসা দেখার পর বিস্ময়ের কোনো সুযোগ ছিল না। বাসা তো নয়, বড়সড় খোলা মাচান। শালের থাম পোঁতা ছিল, তার মাথার কড়ির ওপর ছিল বাখারি বিছানো। নিচে খুব নোংরা ছিল। কিন্তু নিচে তো আমাদের থাকার কথা নয়, ওখানে বাঁশ আর শালের খুঁটি ছিল। হয়তো ওপরেও কিছু বাঁশের বাখারি ছিল। বাঁশের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার রাস্তা ছিল—এক অথবা দেড় দিকে শুধু বাখারির বেড়া ছিল। নয়তো চার দিকেই 'কোঠা' খোলা। মেঝেতে মাটিও ছিল না। শ্রেফ রান্নার জায়গায় কিছু মাটি দেওয়া ছিল, যাতে চুলার আগুনে সব জ্বলে না যায়। বস্তুত বাড়িঅলার আমাদের কাছ থেকে আট আনাও নেওয়া উচিত ছিল না, ওই পয়সায় তো আমরা ওর

মালপত্রর দেখাশোনাই করে দিতাম। ওখানে পৌঁছবার পর এক শ্যামলা-রোগা-বিশ-বাইশ বছরের লম্বা জোয়ানের সঙ্গে দেখা হল। মহাদেবপ্রসাদ আমাদের পরিচয় করিয়ে দিল। আমাদের মধ্যে ওই ছিল বড়, বয়সের হিসেবে, নয়তো ওর কাছে কালো অক্ষর আর মোষের কোনো পার্থক্য ছিল না। ও বস্তী জেলার ব্রাহ্মণের ছেলে। ঘরে অনেক গরু-মোষ ছিল। আমাদের বন্ধু সম্ভবত ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট, ওর কাজ ছিল গবাদি চরানো। গ্রীষ্ম অথবা শীতের সময় ও নিজের পশুগুলিকে নিয়ে নেপাল-তরাইয়ের জঙ্গলে চলে যেত। ওখানকার দৃশ্যকে ও সোৎসাহে আমাদের কাছে বর্ণনা করত। বাঘ অথবা হাতীর মুখোমুখি হওয়ার কথা তো ও আমাদের বলেনি। কিন্তু ঝোপে আটকে যাওয়া মোষের শিশু ওকে দা দিয়ে কেটে দিতে হত। মাঝে মাঝে ওর যুবতী স্ত্রীর কথা মনে হত। যে সারাদিনের পর ক্লান্ত ও গোয়ালে শোয়া পতিদেবতার পায়ে তেল মালিশ করত।

রান্না কে করবে, এই প্রশ্ন যখন উঠল তখন মহাদেব প্রসাদজী কায়স্থ হওয়ায় তার কথা ওঠেই নি। বাকী রইলাম আমরা দুজন। রান্নায় আমি কাঁচা ছিলাম। সেই সঙ্গে বস্তীর ব্রাহ্মণ দেবতা কারু হাতে পাকানো খানা খেতে প্রস্তুত ছিল না। স্কুলের আবহাওয়া আমাতে নিশ্চয় কিছু হেরফের ঘটিয়েছিল। তাই আমি অনায়াসে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্রাহ্মণের রান্না খেতে রাজী হলাম।

আমাদের পয়সা খরচ হয়ে যাচ্ছিল। সেই জন্য সবচেয়ে জরুরী ছিল আমাদের কাজ খোঁজা। আমাদের মতো চৌদ্দ-পনের বছর বয়সের ছেলের চাকরি পাওয়া সহজ ছিল না। তবু আমাদের বেশীর ভাগ সময় কাজ খুঁজতেই কেটে যেত। আমার পরিচিত কাউকে আমি দেখতে পাইনি। কিন্তু মহাদেবপ্রসাদ আমাকে ওর পরিচিত রেলম্যান বা কুলিদের কাছে নিয়ে গেল। কখনো কখনো আমরা জগন্নাথ ঘাটে এসে বসতাম। ঐ সময় ওখানে এক মধ্য বয়সী সাধু এসেছিল, যে ইংরেজ সরকার ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে খুব কড়াকড়া শব্দ প্রয়োগ করত। আমাদের মতো অনেক বেকার লোক ওর চারপাশে জমা হত ও ওর কথা শুনত। ঐ সময় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হয়ে গিয়েছিল। আমার মতো মানুষের কাছে সেই দুনিয়া তখন অজানা ছিল। যারা শুনত তাদের কাউকে কাউকে বলতে শুনতাম এ নিশ্চয়ই গোয়েন্দা। হ্যাঁ, গোয়েন্দা অথবা পাগল ছাড়া ও নিশ্চয়ই তৃতীয় ব্যক্তি হতেই পারত না। দিনে একবার আমরা অবশ্যই হাওড়া স্টেশনে যেতাম। দুচার দিনের মধ্যেই আমার মতো কিংকর্তব্যবিমূঢ় দুই ব্যক্তিকে আমাদের গোষ্ঠীর মধ্যে ভর্তি করতে সফল হয়েছিলাম। এই দুজনের মধ্যে একজন আরা থেকে এসেছিল। বয়স ত্রিশ বছর। অন্যজন আমাদের সমবয়স্ক। অল্পসল্প লেখাপড়া করেছে। জৌনপুর জেলার এক ক্ষত্রিয়ের ছেলে। সম্ভবত ষষ্ঠ একজনও ছিল।

আমরা আমাদের এক কমিউন (সাম্যবাদী সমাজ) তৈরী করে নিয়েছিলাম। 'আমি' এবং 'আমার'—এই ধারণা আমরা ভুলে গিয়েছিলাম। যার কাছে যা পয়সা ছিল তা সকলের খরচের জন্য থাকত। স্থির করা হল যারই চাকরি হোক না কেন, তার রোজগার সকলের খরচার কাজে লাগবে। সকাল বেলা আমরা মুড়ি-ভুজা খেয়েই কাজ সারতাম। বিকেলে একবার বেলা থাকতেই রুটি বানিয়ে খেতাম। দিনে দুজন দুজন করে চাকরির খোঁজে আমরা ঘুরতাম। কখনো খিদিরপুর ডকে যেতাম জাহাজের বস্তা উঠানোর কাজের খোঁজে, কখনো যেতাম কয়লার ডিপোতে কয়লা কুলির কাজের জন্যে। আমাদের লেখাপড়া কোনো কাজে লাগতে পারে এমন আশা আমাদের আর ছিল না। এই জন্য শরীর খাটিয়ে রোজগারের আশা ছিল। কিন্তু জাহাজ-কয়লা-মাল গুদামের কুলির কোনো কাজ হয়নি। আর কাজ পেলেও মহাদেব ও আমার

মতো ছেলে যাদের মুখ থেকে দুধের গন্ধ যায়নি, যারা লেখাপড়া করা ছাড়া হাত দিয়ে কোনো কাজ করেনি, তাদের পক্ষে ঐ কাজ করা কি সম্ভব ছিল? বেশীরভাগ সময়ই মহাদেব আমার সঙ্গে থাকত। আমাদের দুজনের খুব মিল ছিল। মনে হয়, কখনো কখনো আমি একাই ঘুরতে চলে যেতাম। একবার হাওড়ায় বার্ন কোম্পানিতে কাজের খোঁজ পেলাম। ঠিকাদারেরা কুলিদের কাজে ভর্তি করত। ঠিকাদার আমাকে কাজ দেয়। কাজ ছিল যেখানে গাড়ি রাখা হত সেখানে মালগাড়ির চক্রনেমির এধার ওধার তেল ও ছেঁড়া কাপড় দিয়ে রগড়ে ঝকঝকে করা। ঐখানে টিনের ছাদের নিচে কয়েকশ' লোহার মজুর কাজ করত। জায়গায় জায়গায় পাইপ থেকে হাওয়া বেরিয়ে আসত যাতে পাথর কয়লার উনুন জ্বলত। ছোট হাতুড়ী আর বড় হাতুড়ীর আওয়াজে টিনের ছাদ ঝনঝন করত। মহাদেবপ্রসাদ ঐ সময় আমার সঙ্গে ছিল কিনা আমার মনে নেই। চক্রনেমি কিছুটা রগড়াবার ও মোছার পরই হাতে ব্যথা হত। কাছাকাছি সর্দারকে না দেখলে কিছুটা জিরিয়ে নিতাম। আবার রগড়াতাম। যখন তাতেও হত না, তখন পাঁচ-সাত বার প্রস্রাব করতে যেতাম। দুদিন কি চারদিন কাজ করেছিলাম, আমার মনে নেই। থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল এক মিস্ত্রীর সঙ্গে। মিস্ত্রীর স্ত্রী খাওয়া-দাওয়ার দিকে খুব নজর দিত। রান্না আমি নিজেই করতাম। পরিশ্রম যাই হোক না কেন, ভয়ে নয়, বরং ওখান থেকে জোড়াসাঁকোতে সঙ্গীদের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি, এই ভেবে আমি **গুলবকাবলী** এবং লোটা-দড়ি ঐ মিস্ত্রীর ওখানে ফেলে চলে এসেছিলাম।

জোড়াসাঁকো এসে ফিরে যেতে ভুলে গেলাম। সঙ্গীদের ছেড়ে যেতে হবে, তাও একটা কারণ হতে পারে। আবার চাকরির খোঁজে উদ্দেশ্যহীন চক্কর দেওয়া শুরু হল। কখনো চিৎপুর, কখনো ধর্মতলা, কখনো খিদিরপুর, আবার কখনো নিমতলা। দিনে কম করেও দশ ঘণ্টা ঘুরে বেড়াতাম। দেয়ালে আঁটা বাংলা ইশতাহার দেখতে দেখতে জানি না কখন আমি বাংলা বর্ণমালা শিখে গেলাম। আমাদের বাসার পাশেই এক বাঙালি গৃহস্থ থাকত। ওর ঘরের স্ত্রীলোকেরা কখনো কখনো আমার সঙ্গে কথাও বলত কিন্তু আমার বেশ ভয় করত। আমি শুনেছিলাম, বাংলার বড় জাদু আছে। এখানকার মেয়েরা জাদু দিয়ে পুরুষকে ম্যাড়া বানিয়ে দেয়। ঐ সময় আমি এই কথায় পুরো বিশ্বাস করতাম। আর আমি ম্যাড়া হয়ে যেতে প্রস্তুত ছিলাম না।

একদিন আমি একা ধর্মতলা থেকে কিছুটা এগিয়ে গিয়েছিলাম। একজন ডাক পিওনও ঐ দিকেই যাচ্ছিল। প্রশ্নোত্তর হল। চাকরির খোঁজ করছি বলায় সে বলল, 'চাকরির কি অভাব আছে। বস্তা বইতে পারবে?' 'কেন পারব না। আমার আরো সঙ্গীও আছে।' 'আচ্ছা, তবে সন্ধ্যায় কুলি বাজারে আমার বাসায় এসো।' 'আমি নিজে আমার সঙ্গীদের নিয়ে আজই যাব। আমরা সব এক জায়গায় কাজ করব। এক জায়গায় থাকব।' 'আচ্ছা', বলে ডাক পিওন চলে গেল। আমি ফিরে এলাম আমাদের বাসায়। ওখানে তখন জৌনপুরী সঙ্গী ছিল, অন্যরা রোজগারের খোঁজে গিয়েছিল। সন্ধ্যা হয় হয়, ডাক পিওনের সঙ্গে দেখা করাও খুব জরুরী ছিল। তাই আমি আর বেশী অপেক্ষা করতে পারলাম না। জৌনপুরীকে সঙ্গে নিয়ে আমি রওনা হলাম। খিদিরপুর অনেক দূর। সেখানে গিয়ে কুলিবাজার খুঁজে বার করতে মুশকিল হল না। তখন হয়তো সূর্য ডুবে গেছে। আমরা দুজন ডাক পিওনকে খুঁজতে শুরু করলাম। মহল্লায় অনেক দেশোয়ালি লোক ছিল। সেখানে দেশোয়ালি ডাক পিওনকে খুঁজে বার করা মুশকিল ছিল না। কিন্তু যদি সে সেখানে থাকে, তবেই না তার খোঁজ পাওয়া যাবে। আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করছিলাম। ইতিমধ্যে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হল। আমাদের কাপড় জামা ভিজে জবজবে হয়ে গেল। তার ওপর দুই ঘণ্টা রাত হয়ে গেছে। এসময় জোড়াসাঁকো ফিরে যাওয়া অনেক দূরের কথা। শেষ পর্যন্ত

আমরা আশেপাশের কোনো বাড়িতে রাতটা কাটাবার অনুমতি চাইলাম। বেশ কয়েকটা পরিবার 'অজ্ঞাত কুলশীলদের' থাকতে দিতে অস্বীকার করল। কিন্তু অবশেষে বৃষ্টি, রাত ও আমাদের বয়স দেখে একটা বাড়ির লোকের দয়া হল আমাদের ওপর। ওরা আমাদের ভেতরে ডেকে নিল। সম্ভবত ওখানে চার পাঁচ জন মানুষ ছিল। সবাই পূর্ব সংযুক্তপ্রদেশের লোক। হয়তো ওরা কুলির কাজই করত। আমাদের প্রশ্ন করায় প্রথম আমরা বললাম ডাক পিওন আমাদের নেমন্তন্ন করেছে। বাড়ি ঘরের কথা জিগ্যেস করায় আমার জৌনপুরী সঙ্গী বলল, আমাদের দুজনেরই এক গ্রামে বাড়ি। এরপর আমাকে বলতে হল আমরা পুরোহিত-যজমানের ছেলে। পালিয়ে আসা-আমাদের বয়সের ছেলেদের কলকাতা আসার সর্বপ্রসিদ্ধ কারণ ছিল। পরের দিন এই বাড়ির লোকেরা আগের দিনের উপদেশের খেই ধরে বলল, 'ভিনদেশে কষ্ট হবে। তোমাদের বয়সী ছেলেদের কাজ মিলবে না। বাড়ি ফিরে যাও। ঘরে চিঠি লিখে দাও, টাকা এসে যাবে তো?'

আমরা দুজনেই বলে উঠলাম 'জরুর।'

'তাহলে এখানেই থাক। খাওয়া-দাওয়ার চিন্তা করো না। চিঠি লিখে দাও। টাকা এলে বাড়ি চলে যাবে।'

ভদ্রতা সংকোচ ঝেড়ে ফেলে 'না' বলে ওখান থেকে চলে আসার সাহস ছিল না আমাদের। একবার মুখ থেকে মিথ্যা কথা বেরিয়ে এসেছিল—আমরা দুজন এক গ্রামেরই—এটা ফিরিয়ে নেবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। থেকে তো গেলাম। জৌনপুরীর ভাইয়ের ঘরে চিঠিও লিখে দেওয়া হল। কিন্তু আমার বড় অস্বস্তি হতে লাগল। যদি এখানকার লোকেরা প্রকৃত ঘটনা জেনে যায়, তবে ওরা কি বলবে। চিঠির উত্তর আসার সময় যতই কাছে আসতে লাগল, ততই আমার সঙ্গীকে কেটে পড়ার জন্য জোর করতে লাগলাম। কিন্তু ও কেটে পড়তে রাজী নয়। নিরুপায় হয়ে আমি একদিন ওকে বলে একা কেটে পড়লাম। বলে গেলাম, আমি যাচ্ছি, তুমি ঝামেলা চাও তো থাক। এরপর ওর সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি। তাই বলতে পারি না, ও কি করেছিল।

আমি ফেরার সময় হ্যারিসন রোড দিয়ে যাচ্ছিলাম। ঐ সময় যাতায়াতের ব্যাপারে আমার কোনো তাড়াহুড়া ছিল না। দেখার কিছু থাকলে আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখতাম। ঐখানেই ফরসা ধুতি, কোট, গোল ফেল্টের টুপী পরা, হাতে ছাতা একজন বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা হল। তিনি আমার বাড়ি ও পরিবার সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। তারপর আমার অসহায় অবস্থা জানার পর বললেন,—চল, আমি তোমাকে আমার বাড়ি দেখিয়ে দিচ্ছি। প্রয়োজন হলে এসো। আমার পক্ষে তোমার জন্য যদি কিছু করা সম্ভব হয়, তবে তা করব। তাঁর ঘর বর্ধমানের রাজার কাটরার তিনতলায়। পাঠকজীর—বিন্দা প্রসাদ পাঠক এই তাঁর নাম ছিল—কথায় আমার বিশ্বাস হল এবং তিনি কলকাতায় আমার এক অবলম্বনের মতো দেখা দিলেন। কিন্তু আগে আমার সঙ্গীদের খবর নেওয়া প্রয়োজন ছিল। জোড়াসাঁকোর খোলার বাড়িতে কারু দেখা পেলাম না। জৌনপুরী হয়তো কুলি বাজারেই থেকে গেছে মহাদেব প্রসাদ ও অন্য সঙ্গীটি রোজগারের খোঁজে গিয়েছে। সন্ধ্যা পর্যন্ত কেউ এল না দেখে আমি পাঠকজীর ঘরে চলে গেলাম।

তিনতলায় সিঁড়ির পাশে সম্ভবত ৬৪ নম্বর ঘর ছিল। ঘরটা ছ-হাত লম্বা চার-হাত চওড়া হয়ে থাকবে। পাশে সিঁড়ির ওপর কিছুটা স্থান নিচের ঘর থেকে দুহাত উঁচুতে ছিল। ওখানে কখনো কোন মালপত্র রাখা হত। দরজার পাশে দুই হাত জায়গা জল ফেলা ও জুতা রাখার জন্য ছিল। তাছাড়া এক হাত উঁচু ছিল ঘরের অবশিষ্ট মেঝে। ঘরের অন্যদিকে জানালা ছিল।

কলকাতার গরমে ঐ জানালা দিয়ে যে শীতল হাওয়া আসত, তা বড় ভাল লাগত। পাঠকজী খেতেন মারোয়াড়ী হোটেলে। তাই ঘরে কয়লা বা ধোঁয়ার ঝামেলা ছিল না। ওঁর হুকা খাওয়ার বেশ অভ্যাস ছিল।। তার জন্যে টিকাতেই কাজ চলে যেত। হুকা ছিল মোরাদাবাদী। আমার কাজ ছিল ঘর পরিষ্কার রাখা, নিচে কল থেকে জল ভরে আনা। সারা দিনের জন্য এক ঘড়া জলই যথেষ্ট ছিল। যখন পাঠকজী ঘরে থাকতেন, তখন দুচার ছিলিম তামাক সেজে দিতাম। ছিলিমের ব্যাপারটা প্রথম আমার অসহ্য মনে হত। কারণ আমাদের সরবরিয়া ব্রাহ্মণদের মধ্যে একে ঘোর পাপ বলে মনে করা হত। আমার তো এই জন্য পাঠকজী ব্রাহ্মণ কিনা সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু একবার রানীকিসরাইয়ে এক ব্রাহ্মণ এ্যাসিসট্যান্ট ইন্সপেকটরকে গড়গড়া টানতে দেখে এই সন্দেহের সমাধান হয়ে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে আমার কুলশীল, লেখাপড়া ইত্যাদি ও অন্যান্য কথাও পাঠকজী জানতে পারলেন। পাঠকজীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক চাকর নয়, ছেলের মতো হতে লাগল। তিনি আমার পড়ার ঝোঁক দেখে আমাকে ইংরেজী পড়াতে লাগলেন।

ডাইরেকটরিতে ও চিঠিপত্রে পণ্ডিত বিন্দাপ্রসাদ পাঠককে এম্. বি. পাঠক লেখা হত। তিনি সারস্বত ব্রাহ্মণ ছিলেন। বাড়ি ছিল মোরাদাবাদের মিঞাসাহেবের গলিতে। ১৯০৭-এ তাঁর বয়স ছিল পঞ্চান্নের কিছু বেশী। হিন্দী-উর্দু ছাড়া তিনি ইংরাজীও জানতেন। তিনি ফৌজী কমিশারিয়েটে কাজ করেছেন। এই কাজে তিনি পেশোয়ার ও আসামে থেকে এসেছেন। পরে কলকাতায় তিনি দালালীর কাজ শুরু করেন। কয়েক বছর তিনি খুব সাফল্য লাভ করেছিলেন। বাংলো, ফিটন, চাকর-বাকর সবই তাঁর ছিল। লাখ লাখ টাকার কারবার করতেন। কিন্তু ঐ সময়ে ওঁর কথা অনুযায়ী নক্ষত্র ঘুরে যায় এবং কারবারও গণেশ ওলটায়। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর ফিটন-বাংলো, চাকব-বাকর সব বিলীন হয়ে গেল। একমাত্র তিনিই থেকে গেলেন। আজ কয়েক বছর ধরে তার নক্ষত্র উল্টে রয়েছে। পুরনো ব্যবসার সময় চেনাজানা মারোয়াড়ী শেঠ অথবা ইংরেজ কোম্পানীর কোনো সাহেব তাঁকে কখনো-সখনো ছোটখাট কাজ দিত যাতে তিনি মাসে ত্রিশ চল্লিশ টাকা পেয়ে যেতেন। ঐ থেকে মাসিক ঘরভাড়া দিতেন পাঁচ টাকা, বাকী টাকা থেকে মাসিক খাওয়া-দাওয়ার খরচ চালাতেন। ওঁর ছেলে মোরাদাবাদে রেলের কেরানী। তিনি তাঁর পরিবারের খরচ কষ্টে সৃষ্টে চালাতেন। বাবাকেও বাড়ি চলে যাওয়ার জন্য বিশেষ জোর করতেন। কিন্তু পাঠকজী বলতেন—এখানে সমুদ্রের কিনারায় পড়ে আছি, জানি না কখনো লক্ষ্মীর ঢেউ চলে আসবে। মোরাদাবাদে গেলে তো ভবিষ্যৎকে ইস্তফা দিয়ে যেতে হবে।

বস্তীর ব্রাহ্মণের সঙ্গে মিশে একমাত্র আত্মীয় স্বজনের সঙ্গেই রান্না করা খাবার খেতে হয় এই পারিবারিক নিয়মকে লঙ্ঘন করেছিলাম। পাঠকজীর ছোঁয়া এবং তাঁর গৌড় ব্রাহ্মণের হোটেলের ভোজনও আমি সামান্য মানসিক দ্বিধার সঙ্গে স্বীকার করে নিলাম। কিন্তু একটা কথা শুনে আমার মনে বড় আঘাত লেগেছিল। যখন আমি বুঝতে পারলাম যে সারামাস যা আমি রাবড়ি মনে করে খুব খুশী হয়ে খেয়েছি, তা আসলে দুধে ভেজানো পাউরুটি। পাউরুটিকে আমি পুরো খ্রীস্টানী খানা বলে মনে করতাম। পাঠকজী আমাকে হাওড়ার পুলের কাছে নিয়ে গিয়ে পাউরুটির ঐ দোকান দেখান যেখানে মোটা মোটা পৈতা পরা বাঙালি ব্রাহ্মণেরা অনায়াসে পাউরুটি বেচছে। প্রথমদিকে আমি বাঙালিদের ব্রাহ্মণ বলে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলাম না। তবে আশ্বস্ত হয়েছিলাম এই ভেবে ধর্ম তো খুইয়েই বসেছি, আর কলকাতায় খানদানী ঘরের আছেই বা কে যে এসব জানে। এরপর অনেকবার পাঠকজীর সঙ্গে এবং একাও আমি হাওড়া স্টেশনের পাশে এক সংকীর্ণ রাস্তায় শিখদের তন্দুরীর দোকানে চলে যেতাম এবং গরমাগরম তন্দুরী রুটি 'মহাপ্রসাদের' সঙ্গে তৃপ্তিতে খেতাম। পাঠকজীর সঙ্গে এক সাহেবের বাংলোতে যেতে হয়েছিল।

সেখানে বেয়ারা লেমনেডের দুই বোতল এনে সামনে রাখে। আমি তা খেতে অস্বীকার করিনি। বাঙালি হিন্দু হোটেলে গিয়ে তো হামেশাই খেয়ে আসতাম। কোনো মুসলমান অথবা খ্রীষ্টান হোটেলে খেতে যাইনি। কিন্তু পাঠকজী সেজন্যও আমাকে তৈরী করে দিয়েছিলেন। খাইনি সুযোগ হয়নি বলে।

দুপুরের কিছু সময় ছাড়া পাঠকজী বাইরে বাইরেই বেড়াতেন। এদিকে আমার ইংরাজী পড়ার ইচ্ছে বেড়ে যাচ্ছিল। তাই পাঠকজী একদিন আমাকে বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিলেন। পড়ার জন্য পেলাম ফার্স্ট বুক। আমার ক্লাসে বেশীর ভাগ ছিল মারোয়াড়ী ছেলে। এক সহপাঠীকে সরবরিয়া ব্রাহ্মণ বলতে শুনে আমি জানতে পারলাম যে, মারোওয়াড়েও সরবরিয়া ব্রাহ্মণ আছে। আমাদের শিক্ষক বালিয়া জেলার এক দুবলা-পাতলা সজ্জন মানুষ ছিলেন।

ধীরে ধীরে কলকাতার নতুনত্ব চলে যেতে লাগল। রাজার-চকের নিচের দোকানীদের মশলা, হলুদ, পেঁয়াজের গন্ধের বিচিত্রতা মুছে গেল। দোতলার এক বাঙালির বাসার ঝি আমাকে অপাঙ্গে দেখে বড় বড় চোখে হেসে লবঙ্গ বেঁধানো পানের খিলি যখন আমার দিকে বাড়িয়ে দিত, তখন জাদুর ভয়ে আমি তা আর ফিরিয়ে দিতাম না। ইতিমধ্যে বাড়ির সঙ্গে চিঠিপত্র চালাচালি হয়ে গিয়েছিল। ফিরে যাওয়ার জন্য দাদু বারবার তাগাদা দিচ্ছিলেন। আমার মনও ঘরে ফেরার জন্য উতলা হয়ে উঠল। দাদু টাকা পাঠিয়ে দিলেন। পাঠকজী একদিন আমাকে হাওড়া নিয়ে এসে গাড়িতে তুলে দিলেন।

১১

অন্যমনস্কতা

রাত্রিতে রানীকিসরাইয়ে নামলাম। তাই রাত্রিতে স্টেশনেই থাকতে হল। সকাল বেলা রানীকিসরাইয়ের কিছু সহপাঠীর সঙ্গে দেখা করি। আমার দৃষ্টিতে তখন ওদের একেবারে আলাদা মনে হল। প্রথম প্রথম যখন আমি পন্দহা থেকে ওখানে পড়াশোনা করতে গিয়েছিলাম, তখন ওখানকার ছেলেদের সামান্য পার্থক্যকে ওদের শহুরেআনা বলেই মনে হয়েছিল। আর আজ চারমাস বাদে কলকাতা থেকে ফেরার পরে তাদের আমার নিতান্ত অসংস্কৃত ও অনাগরিক মনে হল। আমি পরেছিলাম সাদা ধুতি, সাদা কুর্তা, ফেল্টের টুপী ও বুট জুতা। রোদ্দুরে না থাকায় এবং সাবান ও তেল লাগিয়ে সাফ-সুতরো থাকায় আমার গায়ের রঙ ও চেহারায় ওপর তার কিছু প্রভাব অবশ্যই পড়ে থাকবে। তাও পুরনো সঙ্গীদের সঙ্গে দেখা করে আমার খুব ভাল লেগেছিল। মাদ্রাসা দেখতে যাইনি কিন্তু রানীসাগরের মহাবীরজীর ঘরের আগের মতো জাঁকজমক নেই। রেলপথ হওয়ার আগে ওখানে এক ছোটখাট মন্দির আর পাশে একটি ঘর ছিল। এখনো তাই আছে কিন্তু মাঝখানে ওই ঘর বেশ জমজমাট হয়েছিল। সব সময়ই ওখানে পাঁচ-সাত জন সাধু থাকত। বাজারের লোকেরা ওদের রসদ ও জল যোগাতে খুব তৎপর ছিল। সম্ভবত এই তৎপরতা এখনো কমেনি কিন্তু মনে হয় এই পরিবর্তন কোনো যোগ্য সাধু ওখানে না থাকার জন্য হয়েছে। ওখানে তখন লেখাপড়া না জানা একজন খোঁড়া সাধু থেকে গিয়েছে। আগের মতোই বাঁদরের সংখ্যা ছিল অনেক।

দাদুর কাছে যেতে আমার আর সংকোচ ছিল না। কেননা এই চার মাস ও তার মধ্যেকার ঘটনাগুলি তার মন থেকে দুই সের ঘি ফেলে দেওয়া ও বাইশ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার কথা মুছে দিয়েছে, ভালভাবেই জানতাম। দাদু আমাকে দেখে খুব খুশী হলেন। আমাকে পড়ানোর তাঁর খুব ইচ্ছে ছিল। কিন্তু এখন তিনি আর আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জবরদস্তি করে কিছু করাতে চাননি। যদিও আমি সেপ্টেম্বর মাসে ফিরে ছিলাম, তথাপি তখনো যদি আমি দ্রুত লেখাপড়ায় লেগে যেতাম, তাহলে আমার অনুপস্থিতির ওপর জোর না দিলে আমি আগামী মিডল পরীক্ষায় বসতে পারতাম। কিন্তু না দাদু বললেন,, না আমিই পড়াশোনার নাম নিলাম। আমার বেশীর ভাগ সময়ই পন্দহাতে কাটত। কনৈলা ও বছওয়াল-এও এক আধবার গিয়েছিলাম। এই সময়ই উমরপুরের পরমহংসের দর্শনের সুযোগ মেলে। ডিসেম্বর অথবা জানুআরি (১৯০৮ খৃঃ) আমি একবার নিজামাবাদে গিয়েছিলাম। ঐ সময় আমার সঙ্গীরা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। আমার মনে দুঃখ হয়েছিল। কিন্তু তখন আর কি করা যেত?

দাদু জরিপের সময় গ্রামের সরকারী কাগজে নিজের সঙ্গে আমার নাম লিখিয়ে দিয়েছিলেন। তাতে আপত্তি হয়েছিল। ডেপুটি বুঝতে পেরে বাতিল করে দিয়েছিলেন। একথা আমি আগেই লিখেছি। দিদিমা তাঁর শেষ সময়ে জোর দিয়েছিলেন যে নাতিদের নামে লেখাপড়া হয়ে যাক। জীবনের তো কিছু ঠিক নেই। তিনি বেঁচে থাকতে থাকতেই দাদু নিজের সব স্থাবর সম্পত্তি আমাদের চার ভাইয়ের নামে দানপত্র করে দেন। এই কাজ করে তিনি নিজের ভাইপো, বিশেষ করে বড় ভাইয়ের ছেলেদের যুদ্ধের আলটিমেটাম দিয়েছিলেন। ঐ সময় কানা-ঘুষা হচ্ছিল, খোলা সংঘর্ষ হয়নি। তাহলেও ভবিষ্যৎ যে সংকটাপন্ন তা বোঝা যেত। তাছাড়া দাদুর সম্পত্তির ওপর বড় ভাইয়ের ছেলেদের যতটা দাবি ছিল, তাঁর ছোট ভাইয়ের দুই ছেলে—সুরজবল্লী ও নরসিংহেরও ততটাই ছিল। তা সত্ত্বেও ওরা নিজেদের দুর্বল মনে করত। তাই ওদের সঙ্গে খটমট হয়নি। নরসিংহ মামা তো আমার সমবয়স্ক ছিল। আর এখন মৃত ছোট দিদিমার ইঙ্গিতে ওর ভাজ ও নিজের মামীর সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করা আমার মনোরঞ্জনের একটা ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

* * *

ধীরে ধীরে শীত কেটে গেল। গরমের মাস আর তার সঙ্গে আমের ফসল শেষ হয়ে গেল। বেকার থাকায় মন উচাটন হতে লাগল। তাই আমি আবার লেখাপড়া শুরু করার সিদ্ধান্ত নিলাম। নিজামাবাদে ভর্তি হয়ে দেখলাম যে, আমার পুরনো সঙ্গীদের অধিকাংশ পাস করে চলে গেছে। নতুন সঙ্গীদের অধিকাংশ বাইরের স্কুল থেকে এসেছে। ওদের চেহারা আমার অপরিচিত। কিছু এই বছরের ফেল করা ও স্থানীয় স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর পাস করা পরিচিত ছেলেও ছিল। শিক্ষকদের কোনো পরিবর্তন হয়নি। আমার মন কি রকম উদাসী হয়ে রইল। আমি নিজের এক বছর নষ্ট হয়ে যাওয়াকে যেভাবে দেখতাম, তাতে আমার মনে হত যেন দৌড়ে আমার ঘোর পরাজয় হয়েছে। ক্লাসে যেতেই পুরনো পরিচিত ছেলেরা আমার যোগ্যতাকে বেশ বাড়িয়ে বলেছিল। কিন্তু আমার যোগ্যতার প্রমাণ দিতে কিছু দেরি হল। শুধু তাই নয়, আগের সওয়া বছর লেখাপড়া ছেড়ে দেওয়ায় আমি অনেক কিছু ভুলে গিয়েছিলাম, তাছাড়া এই বছর পাঠ্য পুস্তকেরও কিছু বদল হয়েছিল। বাহারিস্তানের জায়গায় অন্য এক বই পাঠ্য হয়েছিল। উক্লৈদিস (রেখা গণিত)-এর জায়গায় জ্যামিতি এসেছিল, ইতিহাসেও হয়তো কিছু পরিবর্তন হয়েছিল। আর ঐ সব বইয়ের বেশ কিছুটা পড়া হয়ে গিয়েছিল, যখন

আমি আবার ভর্তি হলাম। রাত্রিতে না পড়ার 'প্রতিজ্ঞা' আমার এখনো ছিল। তা সত্ত্বেও দুই-তিন মাসেই আবার ক্লাসের ও ইস্কুলের সবচেয়ে বুদ্ধিমান ছেলে হিসেবে আমি গণ্য হলাম।

গত দুতিন বছর থেকে আমি ম্যালেরিয়ার হাত থেকে বেঁচে ছিলাম—। একদিন পূজারীর ওখানে গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে বাতাসা দেওয়া তরমুজ খেতে দিয়েছিলেন। বোর্ডিঙে সেইদিন রাব (পাতলা গুড়) দিয়ে ভুট্টার খই খেলাম। খেতে দুটোই ভাল লেগেছিল। কিন্তু সন্ধ্যায় বমি হল, তারপর কাঁপিয়ে জ্বর। মনে হল, জ্বর বা দুর্বলতা এখন কিছুদিন থাকবে। তাই আমি পন্দহায় না থেকে কনৈলায় চলে এলাম। আমার বোন মারা গেছে এটা শুনে আমার খুব মনস্তাপ হল। ওর মৃত্যুর পর আমার যে শোক হল, তা থেকে বুঝলাম ওকে আমি কত ভালবাসতাম। দিদিমা থাকার ফলে আমি মার মৃত্যু সহ্য করতে পেরেছিলাম। আর দিদিমা বুড়ো হয়ে যাওয়ায় তাঁর মৃত্যুও অবশ্যম্ভাবী বলে সহ্য করেছি। কিন্তু বোনের ব্যাপারে তেমন কোন কারণ ছিল না। তাই ওর মৃত্যুকে আমি বেশী অনুভব করেছিলাম। ওর চেহারা-টেহারা মায়ের সঙ্গে কিছুটা মিলত। হাঁ, ওর চুল কালো নয়, কিছুটা বাদামী ছিল। ও কারু সঙ্গে ঝগড়া করতে জানত না। লজ্জাশীলা ছিল। একবার দিদিমার মৃত্যুর পর আমরা দুজন পন্দহাতে ছিলাম। কোনো ব্যাপারে আমি ওকে বকেছিলাম। ছোটদের ওপর কিছু কর্তৃত্ব না করলে কি রকম বড় ভাই। রামপ্যারী চুপচাপ উঠে কনৈলা চলে যায়। এতে আমার বড় আপসোস হয়েছিল, দাদু তো খোঁজ করতে দশ মাইল দৌড় দিয়ে কনৈলায় গেলেন। ঠাকুরমা বলছিলেন—কোনো ভারী অসুখ করেনি। অল্প অল্প জ্বর হত, তাও সেরে যাচ্ছে মনে হত। আমাকে বলল, 'বড় মা, দালান থেকে একটু বাইরে যাচ্ছি।' শীগগিরই ফিরে এসে বিছানার ওপর বসেই পড়ে গেল। আমি ছুটে গেলাম। দেখলাম দুই তিন বার হিক্কা হল, কিছুটা রক্ত মেশানো কফ বেরোল। আর ওর শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

রামপ্যারীর মৃত্যুর পর এক সপ্তাহও কাটেনি। সাধারণত অবিবাহিত ছোট বাচ্চার শ্রাদ্ধ হয় না। কিন্তু বাবা তা মানেননি। তিনি তাঁর রামপ্যারীর ওপর ভালবাসা ও শ্রদ্ধা কোনো ভাবে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন।

দুই তিন সপ্তাহের মধ্যেই ভাল হয়ে আমি আবার নিজামাবাদে চলে গেলাম। এ বছর শুরু হতেই দাদু আর ওঁর ভাইপোর মধ্যে দানপত্র নিয়ে ঝগড়া হতে লাগল।। ওরা দেওয়ানি আদালতে এক মকদ্দমা দায়ের করে দিল। কিন্তু উকীল ওদের বলে দিয়েছিল যে আইন নাতির অধিকার মেনে নেয়। ওরা এও প্রমাণ করতে পারত না যে দাদু ও ওদের একান্নবর্তী পরিবার ছিল। কারণ ছোট দাদু দাদুর নামে বিক্রয়পত্র করে দিয়েছিলেন। দেওয়ানি মামলায় দুর্বল হওয়ায় ওরা ফৌজদারি শুরু করে। জবরদস্তি খেতের ফসল কেটে নেয়। দাদু একা তার ওপর বুড়ো। বেচারী, কত কাল লড়বে। বাবাকেও তাঁকে সাহায্য করতে আসতে হয়। ফলে ওঁর নিজের কাজ ক্ষতি হতে থাকে। আমি এই সব খবর শুনতাম কিন্তু অন্যমনস্কের মতো থাকতাম।

পরীক্ষার তিন চারমাস আগেই সারা জেলার তহসীলী স্কুল ষষ্ঠ শ্রেণীর (মিডল-এর অন্তিম ক্লাস) ছাত্রদের একসঙ্গে মাসিক পরীক্ষা নিত। আজমগড়ের কোনো প্রেসে সব বিষয়ের প্রশ্নপত্র ছাপা হয়ে আমাদের কাছে আসত। এই পরীক্ষা থেকেই জানা যেত, কোন স্কুল কত ভাল, কোন ছাত্র কত মেধাবী। গোটা জেলার ছাত্রদের মধ্যে আমার ও মকবুলের (?) মধ্যে প্রতিযোগিতা হত। আর সেটাও ভাষা নিয়ে। যেখানে আমার উর্দুর ভিত শুরু থেকে তৈরি হতে পারেনি, সেখানে মকবুল উর্দু শেখার ভাল সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বেশী বার প্রথম হতাম আমি। মকবুলের বাড়ি কোথায় ছিল জানি না। কিন্তু ও আজমগড়ের মিডল স্কুলে পড়ত।

জানুয়ারি (১৯০৯ খৃঃ) পর্যন্ত নানা ধরনের ঝঞ্ঝাটের ফলে বাবাকে আমার খুড়তুতো মামাদের সঙ্গে আপোষ করতে হয়। তিনি দেখলেন, পাঁচ ক্রোশ দূরে অন্য গ্রামে গিয়ে লাঠালাঠি অথবা আইনের লড়াই ঠিকমতো করতে পারবেন না। তিনি এও দেখলেন যে হাজার দেড়েক টাকার সম্পত্তির জন্য ইতিমধ্যেই পাঁচ ছয় শো টাকা খরচ হয়ে গেছে। মামারাও লাভ-ক্ষতির হিসেব করে দেখলেন এবং শেষ পর্যন্ত পিসামশাইকে মধ্যস্থ মানলেন। তিনি ফয়সালা করলেন যে সম্পত্তির জন্য মামারা ভাগ্নেদের এগার শ' (?) টাকা দেবেন। দাদুর কথা খেয়াল করে তাঁকে নিজের সঙ্গে পাথরের ঘানি কনৈলাতে নিয়ে যাওয়ার অধিকার দেওয়া হল। ভাইপোদের মধ্যে বাচ্চা পাঠক ও জওয়াহর তো চাকরি নিয়ে বরাবর কলকাতায়ই থাকত। ভাইদের সঙ্গে রামদীহলের বিশেষ মিল ছিল না। সীতারাম বড় ভাই; তার বেশী মুখের জোর ছিল। কিন্তু প্রকৃত বুদ্ধি ছিল ছোট ভাই রামদীন মামার। ঝগড়াতে রামদীন মামারই সবচেয়ে বেশী হাত ছিল। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক সর্বদাই সম্মান ও ভালবাসার ছিল। তার কারণও ছিল। তিনি আমাকে রানীকিসরাইয়ে নিয়ে এসে বিদ্যারম্ভ করিয়েছিলেন। তিনি লোয়ার প্রাইমারী পাস করে কয়েক মাস নিজামাবাদে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়তে গিয়েছিলেন। ঐ সময়ে রানীকিসরাইয়ে আপার প্রাইমারির ক্লাস ছিল না। কিন্তু তিনি কোনো জায়গা থেকে উর্দু শিখে নিয়েছিলেন। বইয়ের সাহায্যে তিনি রোমান অক্ষরও লিখতে পারতেন। ঐ সময়ে রোমান লেখা আমাদের দৃষ্টিতে ছিল ইংরেজি সাহিত্যে পারঙ্গম হওয়া। দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ার সময় যখন আমি বাড়ি ফিরে আসতাম, তখন রামদীন-মামা টেনে উর্দু লিখে আমার পড়া পরীক্ষা করতেন। আমি তা পড়ে দিলে তিনি বাহবা দিয়ে দাদুকে বলতেন—কাকা, এখন কেদারনাথের পড়ায় কোনো বাধা নেই। এ কথা শুনে আমি খুব খুশী হতাম। সত্যি বলতে কি, রামদীন মামা আমার ছেলেবেলার প্রথম আদর্শ ছিলেন। হয়তো এজন্যই মাঝখানে ঝগড়া-ঝাঁটির সময়ও আমার মনের ভাব আগের মতোই থাকল। এটাও হতে পারে যে, পন্দহার সম্পত্তির প্রতি আমার কোনো আকর্ষণ ছিল না।

সম্ভবত জানুয়ারি মাসই ছিল, যখন কোনো ছুটিতে আমি পন্দহাতে এসেছিলাম। দু-বাড়িতে আবার মিল হয়ে গিয়েছিল। দাদুর ভ্রাতুষ্পুত্রদের আর বিশেষ করে তাদের বউদের ইচ্ছে ছিল দাদু ওখানেই থাকুন। রামদীন মামার স্ত্রীর (যিনি আমার বাল্যকালের ভালবাসা ও শ্রদ্ধার আরাধ্য দেবী ছিলেন) ওপরও দাদু বেশ প্রসন্ন ছিলেন। কিন্তু তাঁর ভয় ছিল কোনোদিন কেউ খোঁটা না দিয়ে বসে—জমি তো বেচেবুচে নাতিদের দিয়ে দিয়েছেন। এখন কনৈলায় পড়ে আছেন ঘাড়ে বসে খাওয়ার জন্য। দাদু কনৈলা যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে বসেছিলেন, কিন্তু এখনও যাননি। একদিক দিয়ে তাঁর ঘর ভাইপোদের দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আর দাদু তাদের ঘরেই খাওয়া-দাওয়া করতেন। এবার আমিও সেখানে উঠলাম। আখের মরশুম ছিল। যদিও পাথরের ঘানির বদলে লোহার ঘানির প্রচলন হওয়ায় আখের সবরত আর আগের মতো মিষ্টি লাগত না, আর দলবদ্ধভাবে কাজ করার আনন্দও ছিল না। তবে এ সময়ে আমাকে একটা কাজ করতে হয়েছিল যা আমাকে সেই দিনের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলো, যেদিন রামদীন মামা আমাকে রানীকিসরাইয়ে নিয়ে গিয়ে আমার বিদ্যারম্ভ করিয়েছিলেন। বড় দাদু তাঁর নাতি রামদীন মামার ছেলে দীপচন্দ্রকে নিয়ে গিয়ে বিদ্যারম্ভ করানোর আদেশ দেন আমাকেই। আমি আনন্দে এই আদেশ পালন করেছিলাম। আমার মনে হয়েছিল, এই আদেশ পালন করে আমি এক বড় ঋণ থেকে মুক্ত হলাম।

ছোটবেলা থেকেই একান্নবর্তী বড় পরিবার আমার খুব ভাল লাগত। আমি তখন সাত-আট বছরের ছিলাম, তখন—মাঝগাঁওয়াঁর এক রাজপুত পরিবারের রামফল, বাঁকে ইত্যাদি

পাঁচ-ছয়টি ছেলে রানীকিসরাইয়ে পড়তে আসত। মাঝগাঁওয়াঁ পন্দহ্য থেকেও এক-দেড় মাইল দূরে। প্রতিদিন ওদের যাতায়াত করতে হত ছয় মাইল। যখন ঐ পাঁচ-ছয়টি ছেলে এক গামছায় বেঁধে-আনা ভূজা অথবা মাখা ছাতু খেত, তখন আমার দেখে হিংসা হত। মাঝগাঁওয়াঁতে আমি গিয়েছিলাম কেবল একবার। কিন্তু কাছে থেকে ওদের বাড়ি দেখার সুযোগ বোধহয় পাইনি। আমার খুব ভাল লেগেছিল যখন আমি শুনলাম যে ওদের বাড়িতে চল্লিশ পঞ্চাশ জন লোক এবং ওদের দিনে একমন চাল লাগে। আমার মতে এই রকমের পরিবারই আদর্শ পরিবার। আমার সামনে এই পরিবার আলাদা হয়ে যায়নি। এই ধরনের এক রাজপুত পরিবার কনৈলার কাছে এক গ্রামে ছিল। আমাদের কনৈলায় যজমানী হত না। এই রাজপুত পরিবারের সঙ্গেই আমাদের যজমানীর সম্পর্ক ছিল। যখন আমি খুব ছোট, তখন এই পরিবারের শেষ বড় কর্তার মৃত্যু হয়। পরিবারের জীবিত লোকদের মধ্যে আস্থাভাজন কোনো ব্যক্তি ছিল না। আমার খুড়তুতো ঠাকুর্দা মহাদেব পাণ্ডে—যাকে আমার ঠাকুর্দা জানকী পাণ্ডে খুব স্নেহ করতেন—বড় ভাইয়ের মৃত্যুর পর বড় কর্তা হয়ে গোটা পরিবারকে একত্র রেখে পরিচালনা করতে পারেননি। হয়তো তার বেশীর ভাগ দোষ আমার ঠাকুরমার। সংকীর্ণ মন ও নিমের মতো তেতো মুখ ছিল তার। কিন্তু মহাদেব ঠাকুর্দা গ্রামের আশেপাশের এলাকায় সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হতেন এবং গ্রামের অনেক ঝগড়া-ঝামেলায় তাঁকে মধ্যস্থতা করতেও ডাকা হত। ঐ রাজপুত পরিবারের লোকেরা সেই সময় পরিবারের ভাগ-বাঁটোয়ারার জন্য দৌড়-ঝাঁপ করছিলেন। মহাদেব ঠাকুর্দা তাদের একত্র থাকার জন্য অনেক বুঝিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাতে সফল হননি। আমার মনে হয় একান্নবর্তী পরিবারের সুবিধার কথাগুলি শোনার যদি কখনো সুযোগ হয়ে থাকে তো তা হয়েছিল এই সময়। মনে হয় বড় একান্নবর্তী পরিবার ভাল লাগাটা আমার প্রকৃতির মধ্যে ছিল। এটা আজ আমি আমার সাম্যবাদী মনোভাবের জন্য বলছি না। ডাল আমার কাছে খুব খারাপ লাগত, ভাতও আমি খেতে পারতাম না। কিন্তু কনৈলার সামাজিক ভোজে মটরের ডাল এমন স্বাদু লাগত কেন, তা ভেবে আমার আশ্চর্য লাগত। সাঠীর মোটা ভাত কেন আমি বারবার চেয়ে খেতাম? হতে পারে বড় একান্নবর্তী পরিবার ও সম্মিলিত বড় ভোজে আমি বেশী আকৃষ্ট হতাম এইজন্যই যে, আমার দাদুর বাড়িতে দুই বৃদ্ধ আর ছেলেমানুষ আমি একা থাকতাম। তার ওপর খেলাধূলার ব্যাপারে আমাকে কড়া শাসনে রাখা হত, তাই এক পরিবারে অনেক ছেলেপিলেদের দেখার জন্য আমার মন উতলা হত।

যাই হোক না কেন, দাদুর ওখানে ঝগড়া মিটে যাওয়ায় আমি খুব খুশি হয়েছিলাম। অনেক বছর থেকেই আমাকে দেখেই রামদীন মামার ঘরের লোকের মুখে অপ্রসন্নতার যে ভাব দেখা দিত, এখন সেখানে এক ধরনের স্নেহ দেখা যাচ্ছিল। বলতে পারি না সেবার রামদীন মামার সঙ্গে দেখা হল কিনা। পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়ার পর কিছুকাল তিনি বাড়িতে ছিলেন। তারপর তিনি পিওনের কাজ পেয়ে যান। জেলাতেই ছিলেন কিন্তু থাকতে হত বাড়ি থেকে দূরে। আমি যখন রানীকিসরাইয়ে পড়তাম, তখন রবিবার ছুটির দিনে দেখা হত। কিন্তু নিজামাবাদে চলে যাওয়ার পর ওঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার খুব কম সুযোগ মিলেছিল।

* * *

নিজামাবাদে পড়াশোনার দিন শেষ হয়ে আসছিল। নয় মাস আগে সহপাঠীদের মধ্যে যারা অপরিচিত ছিল, তারা সবাই এখন সুপরিচিত। আজ (২১·৪·৪০ খৃঃ) একত্রিশ বছর পরে যদি সব নাম মনে না থাকে তবে স্মৃতিশক্তিকে বেশী দোষ দেওয়া চলে না। তাও আবার তেইশ বছর

তো আমি জেলাতেই আসিনি। তাদের মধ্যে অনেকেরই মুখ স্মৃতিপটে স্পষ্ট দেখতে পাই, যদিও ঐ সব মুখ একত্রিশ বছর আগেকার ওদের ছেলেবেলার। আর তার ওপর ভরসা করে আমার পক্ষে আমার ঐ সব সহপাঠীদের চেনা সম্ভব নয়। যখন খুব ছোট ছিলাম, তখন পন্দহা থেকে কনৈলা যাতায়াতের সময় সোজা রাস্তা থেকে কিছুটা দূরে 'নয়ী' গ্রাম দেখতাম। সেখানকার তিনটি ছেলে আমার সঙ্গে পড়ত। তিনটিই খুড়তুতো ভাই। ওদের পরিবার ছিল একান্নবর্তী। তিনজনই দুবলা-পাতলা। বড় ভাই শ্যাম নারায়ণ পাণ্ডে ছিল সবচেয়ে দুবলা। হয়তো আমার এই ধারণা ও সবচেয়ে লম্বা হওয়ার জন্যও হতে পারে। সে আর তার সবচেয়ে ছোট ভাই লেখাপড়ায় ভাল ছিল। মেজভাই বিশেষ ভাল ছিল না। কিন্তু ও হামেশাই আমার রবিবারের 'ব্রতে' (মাংসভোজনে) যোগ দিত। আমার মনে নেই, কোনদিন এই তিন ভাইয়ের সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়েছে বলে। কিন্তু বাকী দুই ভাই আমাকে এই বলে ঠাট্টা করত, কেদারনাথ তো আমাদের ভাইকে আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নিচ্ছে।

মেঁহনগরের দুই মহাব্রাহ্মণের ছেলে আমাদের সঙ্গে পড়ত। তারা কাকা-ভাইপো। ভাইপো আমার বয়সী ছিল। ক্লাসে বুদ্ধিমান হিসাবে আমার পরেই ওর স্থান ছিল। ওর স্বাস্থ্য ভাল ছিল। লম্বায় ও বয়সে আমার সমান হয়েও ও ছিল খুব মজবুত। মিডল পাশ করার পর একবার আমার সঙ্গে বারাণসীতে দেখা হয়েছিল, ও সেখানে কোতোয়ালির কন্‌স্টাবল ছিল।

সারা জেলার মিডল স্কুলের ছেলেদের পরীক্ষা আজমগড়ের মিশন স্কুলে হত। এটা সেই মিশন স্কুল, যার সম্পর্কে রানীকিসরাইয়ের আরম্ভের দিনগুলিতে দাদু বলতেন—উর্দু পড়ে নিক, তারপর যেই আমি পাদ্রী সাহেবকে (মিশন স্কুলের হেডমাস্টার) ফৌজী সেলাম দেব, অমনি ওকে ভর্তি করিয়েই ছাড়ব। দাদুর পিসতুতো ভাই এই স্কুলেই পড়েছিলেন। যিনি পরে সাব-জজ হয়ে যৌবনেই মারা যান। স্কুলের পাশেই একটা ঘর ভাড়া করা হয়েছিল। তাতে আমরা নিজামাবাদী পরীক্ষার্থীরা থাকতাম। মনে নেই আমাদের সঙ্গে কোন একজন শিক্ষক গিয়েছিলেন। দশটায় আমরা পরীক্ষার হলে পৌঁছতাম। সব পরীক্ষার্থীর জন্য এক রকমের প্রশ্নপত্র ছাপা হয়ে আসত। আমাদের উর্দুঅলাদের প্রশ্নপত্র নস্‌তালিকে ছাপা হত না, হত কাঁটাঅলা টাইপে। এই টাইপ তো দেখতে বিশ্রী হতই, তাছাড়া ছাত্রদের তা পড়াও মুসকিল হত। যে সব বই আমরা পড়তাম তাঁর সবই নস্‌তালিকে ছাপা হত। তাই আমাদের মুসকিল হত আরো বেশী। আমার পক্ষে এই কাঁটাওয়ালা টাইপের গুণ ভুলে যাওয়া আরো শক্ত। কারণ আমার জীবনপ্রবাহকে অন্য ধারায় প্রবাহিত করায় এর বিশেষ হাত ছিল। আমার ফেল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল না; তবে সওয়া বছর পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়া ও পাঠ্যপুস্তকের পরিবর্তন সত্ত্বেও প্রত্যেকেরই এই ধারণা ছিল যে আমার সরকারী ছাত্রবৃত্তি মিলবে। কিন্তু এই কাঁটাওয়ালা টাইপে অনুবাদের প্রশ্নপত্রে 'ইলাহাবাদ' অথবা 'আল্লাহ-তাল্লা'র জায়গায় একের বদলে অন্যটা পড়ে আমি গোটা অনুবাদেরই বিপরীত অর্থ করেছিলাম। তাই আমার এই বিষয়ে পুরোপুরি সন্দেহ থেকে গিয়েছিল।

পরীক্ষা দিয়ে আমি কনৈলা চলে গেলাম। এই সময়ে একাধিক বার আমি উমরপুরের পরমহংস বাবার কুঠীরে গিয়েছিলাম। পরমহংস বাবা সম্পর্কে সর্বত্র এই খ্যাতি ছিল যে তাঁর ১২০ বছর বয়স। আশেপাশের অনেক বৃদ্ধ গঙ্গাজল ও তুলসী হাতে নিয়ে বলতে প্রস্তুত ছিলেন যে বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে তারা ওঁর একই চেহারা দেখছেন। পরমহংস বাবা তাঁর জন্মস্থান পোখরা (নেপাল) থেকে কাশীতে লেখাপড়া করতে আসেন। সেখানে তাঁর বৈরাগ্য আসে এবং

তিনি সন্ন্যাসী হয়ে যান। বারাণসীতে যখন রেলপথ হয়, তখন তিনি রাজঘাটের এক গুহায় যোগাভ্যাস করতেন। কোন এক ভক্তকে তিনি রেল থেকে দূরে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন তাতে এই ভক্ত তাঁকে কটহন থেকে দক্ষিণে তার নিজের গ্রামে নিয়ে আসে। কয়েকটি জায়গায় কুটীর পালটে আশেপাশের গ্রাম থেকে মাইলখানেক দূরে মংগই নদীর ডানদিকের তীর তিনি নিজের জন্য পছন্দ করেন। ওখানে শীগগিরই ওর কুটীর তৈরী হয়ে যায়। মূল কুটীরছিল টালি দিয়ে ছাওয়া। তাতে দুয়েকটা কামরা ও বারান্দা। এর চারদিকে টালিতে ছাওয়া কাঁচা দেয়াল। এই চৌহদ্দির বাইরে আরো একটি বড় জায়গা মাটির উঁচু পরিখা ঘেরা ছিল। এর ভেতর দুইটি পুকুর। একটি ঝুপড়ি ও অনেকটা খোলা জায়গা ছিল। উত্তরের পুকুরে পাকা সিঁড়ি ছিল। এখানে পরমহংস বাবা ছাড়া অন্য কারুর নাওয়া-ধোয়ার তো কথাই ছিল না। কেউ আচমনও করতে পারত না। পুবদিকের পুকুর সর্বজনীন সম্পত্তি ছিল। ভেতরে দেয়ালের দরজার বাইরে একটা পুবমুখী খড়ের ঝুপড়ি ছিল যেখানে সহ্য-ভক্তেরা বসত। সহ্য এই জন্য বলছি যে, পরমহংস বাবা ভক্তদেরও অসহ্য মনে করতেন। কুটীরের বাইরের প্রাঙ্গণে কেউ ঘুরলেও তার ওপর মার পড়ত। রাখালেরাও মারের ভয়ে পশুদের দূরে রাখত। অবশ্য মারের ভয় ততটা নয়, যতটা পরমহংস বাবার সিদ্ধাইয়ের ভয়ে। আশেপাশের সাধারণ লোকই শুধু নয়, পিসামশাই মহাদেব পাণ্ডের মতো সংস্কৃতের ধুরন্ধর পণ্ডিত এবং অনেক ইংরেজী লেখাপড়া জানা অফিসারও তাঁকে অগাধ পণ্ডিত, জীবন্মুক্ত যোগী ও সিদ্ধপুরুষ বলে মানতেন। লোকেরা যখন সুখে-দুঃখে তাঁর আশীর্বাদ চাইতে আসত তিনি তা দিতে অস্বীকার করতেন এবং চলে যেতে বলতেন। তা সত্ত্বেও যখন তারা যেত না তখন কখনো কখনো তিনি ডাণ্ডাও মেরে দিতেন। কিন্তু যার ওপর ডাণ্ডা পড়ত, সে মনে করত যে তার মনোরথ পূর্ণ হবে।

পরমহংস বাবার মধ্যে লোক দেখানো কিছু ছিল না। তিনি নির্জনতাপ্রিয় ছিলেন। আর ভিতরের চার দেয়ালের বাইরে খুব কমই আসতেন। চারদিকের দেয়ালের ভেতরে অনেক তেঁতুলের গাছ হয়েছিল এবং সেখানে অনেক পাখি বাসা করেছিল। হয়তো তা ওর অপছন্দ ছিল না। কারণ কখনো কখনো পাখিদের কিচিরমিচির করতে দেখে, তিনিও ওদের নকল করে বলতেন, 'চুঁ-চুঁ' করছ।' একবার সেখানে হাজার হাজার পাখি নিজেদের শহর বসিয়ে নিয়মিত বাদ-বিতণ্ডা শুরু করে দিল। পরমহংস বাবা তেঁতুল গাছের সব ডাল কেটে দেন এবং পাখিদের তলপি-তলপা গুটিয়ে পালাতে বাধ্য করেন।

পরমহংস বাবার সেবায় দুই ব্যক্তি বিশেষ তৎপর ছিলেন। এক হরিকরণ দাস। এ তার সন্ন্যাসের 'নাম নয়। হরিকরণ সিংহ পাশের গ্রামের এক জোয়ান রাজপুত। পরমহংস বাবার সেবার জন্য প্রথমে সে বাড়ির কাজ-কারবার ছেড়ে দেয়। কিন্তু তাঁকেও কুঠী থেকে দূরে থাকতে হত। কারণ পরমহংস বাবা তাঁর অনন্য সেবককেও তাঁর পাশে থাকতে দিতেন না। বাবা কাউকে তাঁর চেলা বানাতেন না। তাই হরিকরণ সিংহ নিজেই গেরুয়া নিয়ে নেন। টিকি ও পৈতা ফেলে দেন এবং হরিকরণ দাস হয়ে কুঠীর তিন চার শ' গজ দূরে দক্ষিণ দিকে এক টালির ঘরে থাকতে শুরু করেন। পরমহংসজীর আহার ও ভেতরের কুটীর পরিষ্কার করা ও অন্যান্য কাজের ভার তার ওপর ছিল। আর এক ভক্ত ছিলেন বালদত্ত সিংহ। তিনি বুড়ি মা, স্ত্রী ও ঘরবাড়ি ছেড়ে সাধু সেবার জন্য পরমহংস বাবার কুঠীতে আস্তানা গেড়েছিলেন। বালদত্ত সিংহ কাপড়ে গেরুয়া রঙ দেননি। বাড়িতে থাকাকালীনও তিনি ধার্মিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। আমার বাবার সঙ্গেও তার বেশ ভাব ছিল। দুজনের মধ্যে পুরোহিত-যজমানের সম্পর্কও ছিল। পরমহংস বাবা প্রথমদিকে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের ঘরে রান্না খেয়ে নিতেন। কিন্তু একবার এক প্রগল্‌ভা স্ত্রীলোক

পরমহংসজীকে খাইয়ে প্রতিবেশীদের কাছে টোকা দিয়ে বলেছিল,—'তোরা কি বলছিস আমার হাতের রান্না তো পরমহংসবাবা খেয়েছেন।' এরপর তিনি কারুর বাড়ির রান্না খাওয়া ছেড়ে দেন। এই সব অনেক আগেকার কথা। তখনো তিনি এই নতুন জায়গায় আসেননি। সাধারণ ফলমূলের কথা বাদ দিলে তিনি শুধু এক ব্যক্তির কাছে খাওয়া-দাওয়া করতে রাজী ছিলেন। সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি খজুরীর এক রাজপুত জমিদার। তাঁর কাছ থেকে এক দুগ্ধবতী মোষ সর্বদা আসত। বালদত্ত মোষের সেবা করে পরমহংসজীর সেবা করতেন। আলু কপির মাখামাখি তরকারি তিনি রুটির সঙ্গে খেতেন না, এমনি খেতেন। পরমহংসবাবার প্রধান খাদ্য ছিল দুধে ভেজান চিড়া। আখের রসও তিনি ভালবাসতেন। সেজন্য বাইরের খালি জায়গায় কাঠের ঘানি বসানো হয়েছিল।

আমার বাবা ধার্মিক ছিলেন। কিন্তু, অন্ধ শ্রদ্ধা তাঁর বিশেষ ছিল না। কনৈলা ও আশেপাশের গ্রামে সিসওয়ারের পৌহারী বাবার পূজা হত। কিন্তু বাবা তার সঙ্গে শুধু সাধারণ শিষ্টাচারের সম্পর্ক রাখতেন। এইরকম আজমগড়ের কাছাকাছি এক কবীর পন্থী সাধুও দুই তিনজন অনুগামী প্রতিবছর সঙ্গে নিয়ে গ্রামে শস্য সংগ্রহ করতে আসতেন। গ্রামের মাঝামাঝি এক পুরনো অশ্বত্থ গাছ ছিল। বলা হত যে এই গ্রাম যখন প্রথম স্থাপনা হয় তখন এই অশ্বত্থ গাছ রোপন করা হয়েছিল। গ্রামের পাশের পুকুরও তখনই কাটা হয়েছিল। কিন্তু জল বেরোয়নি। শোনা যায় ঐ সময় এক সিদ্ধ ফকির গোবিন্দ সাহেব কনৈলা আসেন। তিনি বর দেওয়াতেই পুকুরে জল আসে। তিনি নিজের হাতে এই অশ্বত্থ গাছ লাগিয়ে ছিলেন। এই অশ্বত্থ গাছকেও 'গোবিন্দ সাহেব' বলা হত। এই বিশাল গাছের ঘন ছায়া গরমের সময় খুব শীতল মনে হত। সারা গ্রামের অনেক লোক ঐ গাছের নিচে অথবা তার পাশে সুখদেব পাণ্ডের বৈঠকখানায় বসে থাকত। রামায়ণ আর হোলির মণ্ডলী একত্র হত এই জায়গাতেই। কবীরপন্থী মহাত্মাও এসে ঐখানেই থাকতেন। পরমহংস বাবার কথা আলাদা। অন্যান্য মহাত্মারা উদারভাবে প্রসাদ দিলে গ্রামের লোকেরা তাদের ওপর প্রসন্ন থাকত। পৌহারী বাবা মিহি চালের ভাতে ঘি, শাক, তরকারি ইত্যাদি মিলিয়ে মোরব্বা প্রসাদ দিতেন। কবীরপন্থী মহাত্মা নারকেলের টুকরো দিতেন। আমার বাবার অনুরাগ এই মহাত্মাদের প্রতি ছিল না। কিন্তু তিনি পরমহংসজীর বড় ভক্ত ছিলেন। বালদত্ত ও বাবার জন্য আমিও সেখানে যাতায়াত করতে লাগলাম। হয়তো হরিকরণ দাসের সঙ্গে এক আধবার কথা বলার সুযোগও হয়েছিল। আর আমার সাধু জীবনের প্রতি অল্প-স্বল্প আকর্ষণও হয়েছিল। কিন্তু ভবিষ্যতের গর্ভে যা ছিল তার আভাস এখনো কিছু পাওয়া যায়নি।

পরীক্ষা দিয়ে আসার পর দু সপ্তাহের বেশী বাড়িতে থাকতে পারিনি। ভাল লাগছিল না।

১২

দ্বিতীয় উড়ান

"সৈর কর দুনিয়াঁকি গাফিল" এই মন্ত্র আমাকে শান্তিতে থাকতে দিচ্ছিল না। প্রথম উড়ানের কারণ ছিল ঘি পড়ে যাওয়া ও দাদুর ধমকের ভয়। কিন্তু এই বারের জন্য তার কোনো প্রয়োজন ছিল না। রাস্তার জন্য পয়সার দরকার, এতো আমি বাল্যকাল থেকেই জানতাম। তখনই আমি শুনেছিলাম যে দাদু তাঁর বাবার একশ টাকা নিয়ে সুদূর দক্ষিণ হায়দরাবাদের দিকে চম্পট

দিয়েছিলেন। এবার দু-একটা টাকা আর টাকা দিয়ে গাঁথা মালার গয়নাতে আমার হাত পড়েছিল। নানা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ভয়ে মালা বেচতে পারিনি। আট মাস পরে ঐ মালাকে ঐ ভাবেই ফিরিয়ে এনেছিলাম। কিন্তু টাকা কলকাতা যেতে সাহায্যে করেছিল। সম্ভবত মোগলসরাই পর্যন্তই রেলের টিকিট কিনেছিলাম। বাকী সফর করেছিলাম বিনা টিকিটে। কিন্তু রাস্তায় কোনো টিকিট চেকার দেখতে পাইনি। লিলুয়ায় কিভাবে রক্ষা পেয়েছিলাম, তাও আজ মনে নেই। দুই বছর আগে কলকাতা আসা আর এখন আসায় অনেক তফাৎ। এখন আর আমি সেই পুরনো সাদাসিধা চৌদ্দ বছরের গেঁয়ো ছেলে ছিলাম না, হাওড়ার প্রতীক্ষালয় দেখেই যার আক্কেল গুড়ুম হয়ে যেত। আমার পুরনো যাত্রার অভিজ্ঞতা ছাড়া আমি এটাও জানতাম যে আমার দয়ালু পাঠকজী কলকাতাতেই আছেন।

পাঠকজী এখনো সেই ঘরেই থাকতেন। তখন পর্যন্তও লক্ষ্মীর ঢেউয়ের কোনো পাত্তা ছিল না। তবে নিজের খরচ কোনো না কোনো ভাবে চলে যেত। আজমগড়ে কাঁচা আম দেখে এসেছি কিন্তু কলকাতায় পাকা আম বিক্রী হচ্ছিল। এসময়ে পাঠকজী গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলের চাটনি মোরব্বার জন্য আম সরবরাহের ঠিকা নিয়েছিলেন। আমি আসার সঙ্গে সঙ্গেই কাজ মিলে গেল। বাজারে আম গুণে নেওয়া ও হোটেলে তা ঠিকঠাক করে রাখতে আমিও তাঁকে সাহায্য করতাম। আমের কাজ শেষ হল। হাওড়ায় রেলওয়ের কোনো পদস্থ কর্মচারী পেনসন নিয়ে বিলেত যাচ্ছিলেন। পাঠকজী তাঁর বাড়ির মালপত্র নিলামে কিনে নেন। কিন্তু পাঠকজীর কাছে ঐসব কেনার টাকা ছিল না। টাকাটা ছিল কোনো মারোয়াড়ী শেঠের। লাভের কিছু কমিশন পাঠকজীর পাওয়ার কথা ছিল। ঐ বাড়ি থেকে মালপত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাকেও সাহায্য করতে হয়েছিল। ঐ সময়েই আমি বুঝতে পেরেছিলাম ইংরেজদের মতো থাকতে হলে কত জিনিষপত্রের দরকার হয়। ছুরিই তো ছিল কয়েক ডজন। কাঁটা চামচ ও ছোট বড় আরো চামচ, পেয়ালা, টিপট, প্লেট, বড় প্লেট ও অন্যান্য খাওয়ার সরঞ্জাম না জানি কত ছিল। সূতি ও পশমের পোশাক ছিল কয়েক কুড়ি। চেয়ার ও টেবিলের সঙ্গে একটা কুলফি বরফ জমানোর মেশিনও ছিল। মালপত্র বোঝাই করে নিয়ে আসা হল। কোনো কোনো জিনিষ তো থোক বেচে দেওয়া হল। ফেরি করে বেচার জন্য পাঠকজী আমার জন্য কিছু কাপড় জামা রেখে দিয়েছিলেন। কয়েক দিন আমি ঐ কাপড় ফেরি করেছিলাম। কলেজ স্কোয়ারের লোহার রেলিঙে কোট, সার্ট ও পাতলুন ঝুলিয়ে দিতাম এবং গ্রাহকের প্রতীক্ষা করতাম। গ্রাহক আমার কাছে কদাচিৎ আসত। আমার ধারণা ছিল বিক্রি করাটা হাতের ব্যাপার। কিন্নার মাছ ধরা ও আম পাড়ায় অধিকতর সাফল্য দেখে আমার এই রকম মনে হয়েছিল। ঐ সময় আমার খেয়াল হয়নি যেসব লোকদের সামনে জীনের সুট টাঙিয়ে রেখেছিলাম, তাদের মধ্যে একজনও পুরস্কার দিলেও তা পরে বাজারে চার পা হাঁটতে রাজী হবে না। অবশেষে হার মেনে ফেরি করার কাজ বন্ধ করতে হল।

মারোয়াড়ী শেঠদের কাজে পাঠকজীকে প্রায়ই সাহেবদের কাছে যাতায়াত করতে হত। হাওড়া স্টেশনের মাল গুদামের সুপারিন্টেনডেন্ট অথবা এ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেনডেন্টের সঙ্গে পাঠকজীর পরিচয় ছিল। সে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছিল। পাঠকজী বলায় আমাকে সে মার্কামেনের কাজ দেয়। আমার তখন কাজ শেখার সুযোগ হল। অনেক বাঙালি তরুণ বিনা মাইনেতে এই কাজ করত অথবা শিখতে লালায়িত ছিল। চাকরি প্রার্থীদেরও দৈনিক কিছু না কিছু আমদানি হত। আর চাকরি পেলে তো এই চাকরিকে পুরোপুরি আমদানির চাকরি বলেই মনে করা হত। কাজ ছিল রেলের পার্সেলের রসিদ দেখে সাদা অথবা কালো কালিতে মালের ওপর যে স্টেশন থেকে মাল পাঠানো হচ্ছে ও যে স্টেশনে মাল যাচ্ছে তা সাংকেতিক অক্ষরে ইংরেজিতে লিখে

দেওয়া। এর জন্য বেশী ইংরেজী জানার প্রয়োজন ছিলনা। মাল অনেক পড়ে থাকত। মালে মার্কা না দেওয়া পর্যন্ত মাল পাঠানো হত না। সেই জন্য যে মার্কাবাবুটি মাল পাঠাতেন, তাঁর জন্য ভেট তৈরী থাকত। আমি ছাড়া আর সব মার্কাবাবুই বাঙালি ছিল। ওরা পুরনো লোক ও বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড়। যে সব মালে মার্কা দিলে পয়সা পাওয়া যেত, তা কখনো আমার কাছে আসেনি। আমদানির জন্য আমার বিশেষ ভাবনাও ছিল না কেননা খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। পাঁচ-সাতদিন পরে জানতে পারলাম, আমার নিকট আত্মীয় কাকা জয়মঙ্গল এই গুদামেই কুলির কাজ করেন। তিনি কখনো কখনো আমাকে চিনির সরবত খাওয়াতেন। যখন লাখ লাখ মন চিনি যাচ্ছে, তখন সরবতের দুঃখ কি? এক-আধটি বস্তা ফেটে চিনি বেরিয়ে গেল লাখপতি চিনির ব্যাপারীরা থোড়াই দেউলিয়া হয়ে যেত।

দুই তিন সপ্তাহ যেতে যেতেই ওখান থেকে আমার মন উঠে গেল। আমি ভালভাবেই কাজ করছিলাম। কিন্তু ওখানে মন বসার জন্য কোনো সঙ্গী ছিল না। আলাদা ভাবা হওয়ার জন্য অন্যান্য বাবুদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হতে পারেনি। কিন্তু তার চেয়েও বড় কারণ ছিল এই যে, ওরা মনে মনে আমার ওখানে থাকাটা পছন্দ করছিলনা। সাহেব আমাকে পাঠিয়েছিল বলে ওরা আমার কিছু করতেও পারতনা। কিন্তু ওদের আলাদা আলাদা ভাবটা আমার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছিল। যদি জীবিকা ও পয়সা কামানোর ব্যাপার হত, তাহলে একাকীত্ব সহ্য করে নিতাম। আর কয়েক মাস থাকার পর হয়তো কিছু বন্ধুও মিলে যেত। এভাবে হাওড়ার মাল গুদামের মার্কামেনের কাজ স্থায়ী হয়ে যেত। কিন্তু কি করব, আমার প্রকৃতির কাছে আমি ছিলাম অসহায়। কাজ ছেড়ে চলে গেলাম। এরপরও সাহেব পাঠকজীকে আমাকে পাঠাতে বলেছিলেন। কিন্তু আমি যাইনি।

পাঠকজী মোরাদাবাদের বাসিন্দা ছিলেন, তা আমি আগেই বলেছি। ওঁর আর ওঁর শহরের অন্য সঙ্গীদের ভাষা শুনে বুঝতে পারলাম যে বইয়ে পড়া হিন্দি ও মায়ের দুধের সঙ্গে বলা হিন্দীর মধ্যে কত ফারাক। বলতে পারিনা আগেকার চারমাস ও এখনকার আটমাস একসঙ্গে থাকায় আমিও পাঠকজীর হিন্দী (যা উর্দু বলা যেতে পারে) বলতে শুরু করেছিলাম কিনা। এই দুয়ের উচ্চারণ এবং বাক্যাংশের রূঢ়তা ও জটিলতা আমি নিশ্চিতভাবেই বুঝতে পারতাম। পাঠকজীর হাতে বিশেষ কিছুই ছিল না। কিন্তু পয়সা হাতে থাকলে সঙ্গীদের সহায়তার ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত উদার ছিলেন। আমি তো তাঁর পোষ্যপুত্রের মতো হয়ে গিয়েছিলাম। পাঠকজীর দেশের একটি কানা লোক কলকাতায় থাকত। সবাই তাকে 'নবাব' বলে ডাকত। হয়তো তার অন্য কোন নাম ছিল। তাকে পাঠকজী ক্রমাগতই সাহায্য করতেন। 'নবাব' সাহেব দশ বার বছর কলকাতায় আছেন। ফার্স্ট ক্লাস, 'কচালু' বানাতেন। কচালু বানাতে এক টাকা চার আনার লাউ, আলু, কলা, পেয়ারা ও মশলা ইত্যাদি লাগত। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত এই খাবার তৈরীতে কেটে যেত। বারটা নাগাদ নবাব সাহেব নিজের ফেরি করার বাক্স নিয়ে বেরিয়ে যেতেন। সন্ধ্যা নাগাদ তিন সাড়ে তিন টাকা এসে যেত। দৈনিক দেড় দুই টাকা কামানো 'নবাবে'র পক্ষে বাঁ হাতের খেলা ছিল। কিন্তু নবাবের পুরো নবাবী মেজাজই ছিল। হাতে টাকা এলেই তা ওকে কামড়াতো। সে সাট্টার পিছে ছুটত। শুধু আফিঙ, রূপো নয় কলকাতায় বৃষ্টির জুয়াও হত। তুলাপট্টির কোনো মারোয়াড়ী শেঠের ছাদের নালা থেকে জল পড়ত আর জলের খেলায় যারা পয়সা লাগাত তাদের পোয়া বার হয়ে যেত। হাতে টাকা আছে, অথচ নবাব সাট্টা খেলতে যায়নি, এতো অসম্ভব ব্যাপার। যখন সাট্টা খেলতেন, তখন ওঁর এই কথাও মনে থাকত না যে তাঁর বাক্সের জন্য যে মাল কিনতে হবে অন্তত তার পয়সা রেখে দিতে হবে। পাঁচ-দশ দিন

বাক্স নিয়ে বেরোতেন, কিছু পয়সা জমা হত। তারপর মূলধন সমেত সবটাকা স্যাট্টা খেলায় চলে যেত। দু চার দিন না খেয়ে পড়ে থাকতেন। কষ্টে সৃষ্টে কাটাতেন। কোনো সঙ্গী এক টাকা চার আনার ব্যবস্থা করে দিলে আবার বাক্স নিয়ে বেরোতেন। দুই তিন সপ্তাহ পরে আবার সেই পুরনো ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি। পাঠকজী সর্বদা তাঁর দিকে লক্ষ রাখতেন। পয়সা দিয়ে সাহায্য করে কোনো স্থায়ী ফল না হতে দেখে তিনি এক আধবার তো নবাবকে নিজের কাছে নিয়ে এসেছিলেন। কয়লার চুলার ওপরে কুলুঙ্গির মতো কুঠুরীতে নবাব 'কচালু' তৈরী করতেন। জিরা, ধনে, এবং আরো নানা মশলা ভাজতেন ও পিষতেন যার সোঁদা গন্ধ বড় ভাল লাগত। বিনা পয়সায় মাত্রাতিরিক্ত খাওয়া মিলে যাওয়ায় আমি ঐ 'কচালু' খেয়ে সেই মজা পেতাম না যা গুণে গুণে পয়সা দিয়ে ঠোঙ্গায় খেলে পাওয়া যেত। নবাবের আর এক বন্ধু ছিলেন। সম্ভবত মথুরিয়া চৌবে, মেছুয়া বাজারে তাঁর মিষ্টির দোকান ছিল। ভাল মিষ্টি বানাতেন। কিন্তু যখন সাট্টার পাগলামি তাঁকে পেয়ে বসত তখন পুঁজি সমেত সব কিছু উড়িয়ে দিতেন। ভালর মধ্যে ছিল এই যে, তিনি এক উপপত্নী রেখেছিলেন, যে কোনোক্রমে দোকানকে একেবারে উজাড় করে দেওয়া থেকে রক্ষা করত।

নবাবের বন্ধুদের মধ্যে মোরাদাবাদেরই এক নওজোয়ান ব্রাহ্মণ ছিল। দুজন এক সঙ্গেই কলকাতা এসেছিল। চেহারা ও কথাবার্তায় এই নওজোয়ানকে বাঙালী মনে হত। সে বাঙলার কোনো জেলার ছোটখাট মেলাও বাদ দিতনা। যে কোন ছোটখাট জিনিষ বেচে সে নিজের রাস্তার খরচটা অন্তত উশুল করে নিত। আর সেই জিনিষ কখনো কখনো সে নিজে আবিষ্কার করত। ঐ সময় সে চার পয়সার মোহিনী হার বেচত। তামার ঝকঝকে পাতলা তার বাজার থেকে কিনে তা চরকার টাকুতে পেচিয়ে বাইরে থেকে টানত। তারপর যতটা লম্বা দরকার তা হয়ে যাওয়ার পর সেই তার ছিড়ে তাতে সুতো বেঁধে দিত। ব্যস, মোহিনী হার হয়ে গেল। তাঁর ঘাম না লাগলে শীতের দিনে পাঁচ সাত দিনের জন্য, তা সত্যি সত্যিই গিণি সোনার মতো হয়ে যেত। হার বানাতে এক সিকিরও কম খরচ হত। আর চার পয়সায় হার বেচলে লাভই থাকত। ও যখন মেলা থেকে ঘুরে আসত তখন পাঠকজীর ওখানে নিশ্চয়ই আসত। ওর টাটকা ঘোরা-ফেরার বিবরণ শোনাত।

মার্কামেনি-এর কাজ ছেড়ে দেওয়ার পর দুই তিন সপ্তাহের বেশী আমি বেকার থাকিনি। এরপর আমি বারাণসীর সুঁঘনী সাহুর কলকাতার দোকানে চাকরি পেয়ে গেলাম। 'প্রসাদ'জীর পরিবার নিজেদের বেনারসী নস্যির খ্যাতির জন্য অনেক বছর ধরে সুঁঘনি সাহুর নামে সুপরিচিত। তাঁর কাকা গিরিজাশংকর সাহু নিজের দোকানের এক শাখা তুলাপট্টীর চিৎপুর রোডের মোড়ের কাছে খুলেছিলেন। তাঁর দুই ছেলের নামে দোকানের নাম দিয়েছিলেন—ভোলানাথ-অমরনাথ। যে সময় আমাকে চাকরি দেওয়া হয়েছিল, তখন মালিকদের মধ্যে কেউ এখানে ছিলেন না। আমাকে কাজ দেওয়া হয়েছিল চিঠিপত্র লেখার ও হপ্তায় হপ্তায় জমা খরচ বার করে বারাণসীতে পাঠানোর। খাতা লিখত অধের মুন্সীজী। দোকানে যেখানে এক টাকা থেকে আশী টাকা সেরের নস্যি বিক্রী হত, সেখানে নানা ধরনের জর্দা, কিমাম ও সূর্তির গুলিও ছিল। এছাড়া গড়গড়ার সুগন্ধময় তামাক ওখানকার বিশেষ জিনিষ ছিল। দোকানে বিক্রির কাজে তিন-চারজন আরো কর্মচারী ছিল। হিন্দী উর্দু চিঠি ছাড়া পাঠকজী একটা ইংরেজী চিঠির মুসাবিদা করে দিয়েছিলেন যা যন্ত্রের মতো নকল করে আমি প্রতিদিন ২৫-৩০ টি ঠিকানা পুরনো ডাইরেকটরি দেখে ভিন্ন ভিন্ন রাজা-রইসের কাছে পাঠাতাম। ঐ সময়ে আমার মনে হওয়া দূরের কথা, অন্য কারও এবিষয়ে খেয়াল হয়নি যে কোনো শিক্ষানবিশের দ্বারা চিঠি না লিখিয়ে যদি লেটার হেডে ছেপে চিঠি পাঠানো হত তবে তা আরো প্রতিষ্ঠিত ও আকর্ষণীয় হত।

তা সত্ত্বেও সব তীরই লক্ষভ্রষ্ট হত না। কিছু অর্ডার আসতই। কখনো কখনো অভিযোগ আসত, যে সুর্তীর গুলি ও কালা জর্দা প্রথম কিছুদিন খেতে ভাল লাগে কিন্তু পরে স্বাদ জোলো হয়ে যায়। আমরা জানতাম, যতদিন আতরের ভেজাভাবটা থাকবে ততদিন স্বাদ ঠিক থাকবে। পরে আমরা মোটা কাচের শিশিতে ঠাণ্ডা জায়গায় তা রাখার নির্দেশ দিয়ে পাঠাতাম।

কিছুদিন পরে বৃদ্ধ সাহু গিরিজাশংকরজীও এসে গেলেন। তাঁর রঙ বাদামী। বেঁটে ও মোটাসোটা দেহ। বয়স পঞ্চান্নর কাছাকাছি। ওঁর কপালে আমলকির মতো একটা আব ছিল। এক চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে তিনি তার ওপর টিঞ্চার আয়োডিন লাগাতেন। হাঁটু পর্যন্ত ধুতি, মাথায় সাদা দু-পরতের টুপী। শরীরে সাদা চাদর ছাড়া এক লালখোপ-কাটা গামছা তিনি কাঁধ থেকে ঝুলিয়ে রাখতেন। দুপুরের পর সাহুজী দোকানে আসতেন। সন্ধ্যা হতেই তিনি বেড়াতে বেরোতেন। ঐ সময় আমি প্রায়ই ওঁর সঙ্গে থাকতাম। বেড়ানোর জায়গাও ওর বেশ সীমিত ছিল। বেশী দূরে গেলে বড় ডাকঘর পর্যন্ত যেতেন। ওর হাঁপানির অসুখ ছিল। কোনো না কোনো ভাবে আমি জানতে পেরেছিলাম যে হাঁপানির এক ধরণের সিগারেট আছে। আমি সাহুজীকে তা খেতে পরামর্শ দিয়েছিলাম এবং বি·কে· পালের দোকান থেকে এক প্যাকেট কিনেও দিয়েছিলাম। তা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভাল বোধ করতেন। তিনি আমাকে খুব সাবধানী ও প্রভুভক্ত ভৃত্য বলে মনে করতেন। বেড়ানোর পর তিনি প্রায়ই তাঁর এক আত্মীয়—যার আফিঙ চৌরাস্তায় মিষ্টির দোকান ছিল— তার বাড়ি চলে যেতেন। সেখানেই ওঁর শৌচ হত। কিছু বৈঠক দিতেন, গদা ঘোরাতেন। তারপর দোকানে আসতেন। তারপর দোকানের পাশের চত্বরে আসন পেতে বসতেন। বাজার থেকে কিনে তাঁর জন্য খাবার নিয়ে আসা হত। রাত্রিতে খেতে বিশ-চব্বিশ গণ্ডা পয়সা লাগত—তাতে থাকত রাবড়ী, দুধ, মিষ্টি, লুচি ও ফল। একটা কথা তো বলতে ভুলেই গিয়েছিলাম। গিরিজাশংকর সাহুর জন্য সন্ধ্যায় আধুলিওজনের আফিঙ জরুরী ছিল।

প্রতি দিনের এই নিয়ম থেকে ছুটি হলে রাত্রিতে যখন তিনি নটা অথবা দশটায় নিজের বাড়ি যেতেন, তখনো আমি তাঁর সঙ্গে থাকতাম। চিৎপুর রোড থেকে অনেক দূরে গিয়ে ছোট বড় অনেক রাস্তা পেরিয়ে তাঁর বাসায় যেতে হত। দোকান ও বাসা দুইই ভাড়া করা ছিল। কিন্তু সাহু গোটা দোকানের বাড়িটা মালিকের কাছ থেকে ভাড়া নিয়ে রেখেছিলেন এবং তার কিছুটা আবার তিনি অন্যকে ভাড়া দিয়েছিলেন। এতে তাঁকে ভাড়ার বোঝা বইতে হত সামান্যই। তাঁর ভাড়াটেদের মধ্যে একটা বেশ্যাও ছিল যে দোকানের কোঠায় থাকত।

চিৎপুর রোডের যে দিকটা আমাদের দোকানের সম্মুখ দিয়ে গেছে, তা বেশ্যাদের কুঠীতে ভরা ছিল। গুণ্ডার জন্যও এই মহল্লা কুখ্যাত ছিল। একবার অন্ধকার হতেই গুণ্ডাদের দুই দলে মারপিট হয়ে গেল। মারপিটের সময় পুলিশের পাত্তা পাওয়া যায়নি। ছুরি ও লাঠি চলছিল। আমরা দোকান থেকে দেখছিলাম। কেউ মারা যায়নি। কিন্তু অনেকে আহত হয়েছিল। লড়াই শেষ হওয়ার পর এক গুণ্ডা আমাদের একজন সঙ্গীকে যাকে ওদেরই স্বজাতীয় বলে মনে হচ্ছিল— বলছিল, 'কি বলছ গুরু, মানুষ হলে তবেই না লড়া যায়, জানিনা শালা কোথা থেকে দৈত্য নিয়ে এসেছে।' দুই দলের মধ্যে এক দলের সর্দার ছিল মুসলমান আর অন্য দলের এক গোয়ালা। সর্দার মুসলমান হলেও ওর দলে হিন্দুও ছিল। ওর দল কয়েকবার গোয়ালার দলকে মেরে ভাগিয়ে দিয়েছে। সেই জন্য এই বার সে মির্জাপুর-অকোলীর লড়াকু নিয়ে এসেছিল।

একদিন বেড়ানোর সময় সিদ্ধির বরফি সাহুজীর চোখে পড়ে। তিনি তা কিনে নিজে খেলেন এবং আমাকেও এক টুকরো দিলেন। কালাকান্দের সুগন্ধী বরফি আমার খুব মিঠে লেগেছিল। ঐ

ছোট টুকরাতে আমার সাধ মেটেনি। তাই সাহু যখন কিছু দূরে কোনো পরিচিতের সঙ্গে কথা বলছিল, তখন আমি গিয়ে একটা কিংবা দুটো আস্ত বরফি কিনে খেলাম। আর ভাঙের নেশা আমাকে পেয়ে বসল। তবু কোনো রকমে সাহুজীকে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দিলাম। ফেরার সময় আমার তালু শুকিয়ে যেতে লাগল। এ সময়ে এক কুলফি বরফওয়ালাকে পেয়ে গেলাম। আমি একটা কুলফি খেলাম, দুটো খেলাম। কিন্তু তালুর শুকনো ভাবটা তবু কমলনা। শেষ পর্যন্ত ওর হাঁড়িতে যত কুলফি ছিল সব খেয়ে ফেললাম। তারপর বাসার দিকে চললাম।

এরপর আমার সব স্মৃতি খুব ক্ষীণ, কিছু লোক আমাকে তুলে সিঁড়ি দিয়ে নামাচ্ছে। প্রায় এক যুগ পরে মনে হল, আমি এক স্বপ্নের জগতে চলে এসেছি। চমৎকার পরিচ্ছন্ন ও হাওয়া খেলছে এমন কামরা, যার সিলিঙে ঝোলানো বিজলীর ল্যাম্প জ্বলছে, ছাদ থেকে ঝুলন্ত অনেক পাখা মাঝামাঝি গতিতে চলছে, দরজায় কাঁচ লাগানো, দেয়াল কর্পূরের মতো সাদা। আমার থেকে দূরে কামরার মধ্যিখানে দেয়ালের এক ধার ঘেঁসে একটা টেবিল। তার পাশে দুই তিনটা চেয়ার, তারই একটায় এক স্বর্ণকেশী মহাশ্বেতা অপ্সরা মাথায় সাদামতো রুমাল জড়িয়ে চুপচাপ বসে আছে, এই স্বপ্ন আমার ভাল লাগল কিন্তু কিছুটা জাগরণের ভাব হতেই নানা প্রশ্নের ঢেউ উঠতে লাগল। তারপর আবার এই স্বপ্ন গভীর নিদ্রায় পরিণত হল।

পরদিন এই সব কিছু, স্বপ্ন নয়, বাস্তব জগৎ হয়ে দেখা দিল। বুঝতে পারলাম আমি মেডিক্যাল কলেজের হাসপাতালে আছি। আমার সারি ও আমার সামনের সারিতে আরো খাট ছিল যেখানে রোগীরা শুয়ে ছিল। কিছুটা বেলা বাড়লে আমার খাটের চারপাশে পর্দা ঘিরে দেওয়া হল। এক অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান নার্স স্পঞ্জ ও সাবান দিয়ে শরীরের কিছু অংশ ধুয়ে পাউডার লাগাল। আমি চোখ মেললাম। আমার জ্ঞান ফিরেছে দেখে নার্স মৃদু হেসে বলল, 'বাবু, ভাল হয়ে যাবে।'

বিকেলে পাঠকজী আসার পর জানতে পারলাম আমি ঐ রাতে বাড়ি পৌঁছেই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর বারবার পায়খানা হতে থাকে। সকাল বেলা অজ্ঞান অবস্থায়ই আমাকে মেডিক্যাল কলেজের হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া হয়। আমার মনে নেই কতদিন পরে আমার জ্ঞান ফিরেছিল। সবাই আমার জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছিল। হাসপাতালে ভর্তি করার কিছুক্ষণ পরে সাহু গিরিজাশংকরও এসেছিলেন। তারপর পাঠকজী প্রতিদিন ও সাহুজী দুতিন দিন পর পর আমাকে দেখতে আসতেন।

সব নার্সই ছিল এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। যখন অজ্ঞান ছিলাম তখন যে ওষুধ-বিষুধ দেওয়া হচ্ছিল, তা তো চলছিলই। এখন জ্ঞান হওয়ার পরও তারা প্রথমে দুধ ও পরে দুধ-পাউরুটি খাওয়াতে লাগল। পাঠকজী আগেই রাস্তা দেখিয়েছিলেন। তাই সেখানে আপত্তির কোনো প্রশ্নই ছিল না। নার্সদের একটির সঙ্গে আমার ধীরে ধীরে বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়ে গিয়েছিল। অতএব হাসপাতাল ছেড়ে আসার সময় আমার কিছুটা আপসোস হয়েছিল।

আমার পাশে এক চীনা রোগী ছিল। ওকে বড় প্লেটে ছুরি কাঁটা দিয়ে ইংরেজী খানা খেতে দেখে আমার জিভও চুলবুল* করছিল। কিন্তু ডাক্তার তখন ভারি খাবার খেতে বারণ করেছিলেন। কিন্তু যখন তা খাওয়ার মতো অবস্থা হল, তখন ছুরি কাঁটার কথা মন থেকে মুছে গিয়েছিল। তার বদলে হাসপাতালের পাচক ব্রাহ্মণ আমাকে মাছ ভাত দিয়ে যেত। দুই সপ্তাহ অথবা তার কিছু বেশী হাসপাতালে থেকে আমি ছাড়া পাই।

শরীরে কিছু শক্তি ফিরে পাওয়ার পর বাড়ির কথা মনে হতে লাগল। অক্টোবর অথবা নভেম্বর মাসে আমি কনৈলা চলে এলাম। আবার আসার জন্য সুঁঘনী সাহুর কয়েকটা চিঠি আসে। কিন্তু তখন আমি অন্য রাস্তায় গড়িয়ে যাচ্ছিলাম।

দ্বিতীয় পর্ব

তারুণ্য

১

বৈরাগ্যের ভূত

কনৈলা পৌঁছবার পর দাদুর সঙ্গেও এখানে দেখা হল। তিনি পন্দহা থেকে পাথরের ঘানি নিয়ে এসেছিলেন। আমার জন্য তাঁর খুব দুশ্চিন্তা ছিল। কিন্তু তিনি বলতেন, 'ছ মহীনকা কুত্তা, বারহ্ বরসকা পুত্তা। হুয়া সো হুয়া গয়া সো গয়া।' (ছ-মাসের কুকুর, বার বছরের ছেলে। যা হওয়ার তা হয়েছে, যা যাওয়ার তা গেছে।) আর আমার বয়স তো সতের। কনৈলা থাকাটা দাদুর পক্ষে অনুকূল হয়নি দেখে আমার আপসোস হয়েছিল। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও তাঁর আগের স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না। সঙ্গে এই বোধও তাঁর ছিল যে, জীবনের অন্তিম কাল মেয়ের শ্বশুরালয়ে কাটাতে হচ্ছে—অথচ কোনো ধর্মভীরু পিতা মেয়ের শ্বশুর বাড়ির গ্রামের সীমায় জল পর্যন্ত খায় না।

কলকাতায় রওনা হওয়ার আগে পরমহংসজীকে দর্শন করে মনে এক ধরনের ভাব জন্মেছিল। যা এসময় পর্যন্ত সুপ্ত ছিল। কিন্তু এখন তা জেগে উঠেছিল। আমি আবার পরমহংসবাবার কুটীরে যেতে শুরু করলাম। তিনি আমাকে তো নয়ই কাউকেই কোনো উপদেশ দিতেন না। মহাদেব পণ্ডিতের মতো বিদ্বানও গেলে উপনিষদের কোনো বাণী তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এল তো এল, নয়তো যে কথা তাঁর মুখে আসত তাই তিনি ছেলেমানুষের মতো পুনরাবৃত্তি করতেন। হ্যাঁ, হরিকিরণ দাস জ্ঞান দিতে শুরু করেছিল। সে সংস্কৃত জানত না, তার হিন্দীও ছিল অতি সাধারণ। কিন্তু দীর্ঘকাল লেগে থাকায় বিচার সাগর, বিচার চন্দ্রোদয়, অষ্টাবক্রগীতার মতো গ্রন্থের হিন্দী টীকা পড়ে সে অনেক কিছু বুঝে নিত। আমিও তার কাছে বসে ঐ সব গ্রন্থ পড়তাম এবং তার সঙ্গে কথাবার্তা বলতাম। ধীরে ধীরে আমার 'চোখের আবরণ' কেটে যেতে লাগল। 'একশ্লোকেন বক্ষ্যামি, যদুক্তং গ্রন্থকোটিভি ঃ। ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মের নাপরঃ।' (এক শ্লোকে বলব, যা কোটি গ্রন্থে বলা হয়েছে। জীব ব্রহ্মই, অপর কিছু নয়।) আমার কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছিল। ঐ সময়ের যে সব শ্লোক মনে আছে, তাঁর মধ্যে আছে —

'তাবদ্ গর্জন্তি শাস্ত্রাণি জম্বুকা বিপিনে যথা।
ন গর্জতি মহাশক্তির্যাবদ্ বেদান্ত কেশরী।।'

বেদান্তের হিন্দী গ্রন্থ সমাপ্ত হয়ে গেল। হরিকরণবাবা বলে দিলেন যে অন্য গ্রন্থ পড়ার জন্য আমাকে সংস্কৃত পড়তে হবে। ওঁর এই উপদেশ আমার মনে বাসা বাঁধল। আমি বাড়ির লোকদের কাছে আমার নিজের অভিমত প্রকাশ করলাম। বাবা ও দাদু তখনো ইংরাজী পড়ানোর পক্ষপাতী ছিলেন। তখনো আমার ব্যাপারে তাঁদের পুরানো ইচ্ছার অবসান হয়নি। অন্যদিকে আমার কয়েক মাসের চাল-চলন ওঁদের শংকিত করে তুলছিল। আমি আহ্নিক শিখে নিলাম। দিনে তিনবার স্নান করে আহ্নিক করতাম। কুশের আসন সর্বদা সঙ্গে রাখতাম। নিজের হাতে রান্না করে শুধু একবার খেতাম। ধর্মগ্রন্থ পড়ে অথবা পরমহংসবাবার দর্শন ও হরিকরণবাবার সৎসঙ্গে দিন কাটাতাম। হাসি-ঠাট্টা তো দূরের কথা কারও সঙ্গে কথা বলতেও আমার ইচ্ছা হতনা। এই ধরনের আচরণ দেখে বাড়ির লোকের বড় দুশ্চিন্তা হল। ওঁদের কাছে সংস্কৃত পড়ার অর্থ ছিল বৈরাগ্যের চারাগাছে জল দেওয়া। মাঝে মাঝে আমি বছওয়ল-এ যেতাম। সেখানে যাগেশ, অন্য পুরানো বন্ধু এবং সাধু কালিকাদাস আমাকে কিছু সহানুভূতি দেখাত। আমি পিসামশাইয়ের কাছে সংস্কৃত পড়ার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করলাম। কিন্তু তিনি আমার বাড়ির লোকের মনোভাব জানতেন। তিনি টালবাহানা করতে লাগলেন। তাঁর পেছনে লেগে থাকার পর তিনি বললেন — সংস্কৃত পড়া ক্ষতিকর বলে আমার মনে হয় না। কিন্তু তোমার বাড়ির লোক তা চাননা। ভাল হয় যদি তুমি বারাণসীতে গিয়ে পড়। আমি অমুক দিন ওখানে যাচ্ছি। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব। আমার এক সহপাঠী পণ্ডিতের কাছে তোমাকে রেখে আসব। তাঁর পরামর্শ আমার খুব পছন্দ হল।

যাওয়ার যে দিন স্থির হয়েছিল, তার একদিন আগে আমি বছওয়ল - এ পৌঁছে গেলাম। কিন্তু পরদিন রওনা হওয়ার আগেই কাকাবাবু (প্রতাপ পাণ্ডে) ওখানে চলে এলেন। তিনি পিসামশাইকে বাবা ও দাদুর ইচ্ছা এবং আমার উগ্র বৈরাগ্যের কথা জানিয়ে বললেন যে, আমাকে তিনি যেন বারাণসীতে না নিয়ে যান। উপরন্তু তিনি যেন আমাকে আজমগড়ে ইংরেজী পড়ার জন্য বুঝিয়ে বলেন। পিসামশাইও তাদের সঙ্গে একমত হয়ে এ বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত আমাকে বললেন। এতে আমার মনে বড় আঘাত লাগল।

আমার চিত্তবৃত্তি এসময়ে অন্তর্মুখী ছিল। বেদান্ত ও ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থের স্বাধ্যায় ও সৎসঙ্গ এই ছিল আমার কাজ। সারাদিনে স্রেফ একবার খেতাম এবং খাওয়ার সময় ছাড়া বাকী সময়

কাটাতাম পরমহংসবাবার কুটীরে। বইয়ের বড় অভাব ছিল। আগে আমাদের বাড়িতে লেখাপড়ার রেওয়াজ ছিল না। বাবা বিনয় পত্রিকা ও রামায়ণ জমা করে রেখেছিলেন। বৈদান্তিক হওয়ায় আমার তাতে তেমন অনুরাগ ছিল না। একদিন ঘরের ভেতর এক বাক্সে কিছু পুরানো বই পেয়েছিলাম। আমার ধারণা এই সব বই আমার বাবার পিসেমশাইয়ের। কিন্তু এই বইয়ের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিল ফলিত জ্যোতিষের ছোট ছোট বই ও দুর্গাসপ্তসতীর মতো কিছু স্তোত্র। এই সব স্তোত্রের মধ্যে দালভ্যস্তোত্র আমি অনেকদিন পড়েছি, চাণক্যনীতি ও ভর্তৃহরির বৈরাগ্যশতকও কিছুদিন পড়েছিলাম। এই সব শ্লোক আমি একটা খাতায় লিখে ফেললাম। এবং ভাষাটীকার সাহায্যে অনেকগুলির অর্থ বুঝতে পেরেছিলাম।

দুই তিন বছর আগে হরিকরণবাবা বদ্রীনাথ হয়ে এসেছিলেন। বৈরাগ্য ও অরণ্যবাসের কথা প্রতিদিন হত। একদিন তিনি তাঁর বদরীনাথ যাত্রার বর্ণনা দিয়েছিলেন। উঁচু পাহাড়, সবুজ দেবদারু, সাদা বরফ ও শীতল জলের ঝর্ণা এই সব কিছুর প্রতি আমার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। কারণ তা আমার ভেতরে সব সময় যে ভ্রমণ তৃষ্ণা ছিল, তাকে তীব্র করে তুলত। যে কথা আমাকে সবচেয়ে বেশী টেনেছিল তা ছিল এক বালকরূপী যোগীর। দেবপ্রয়াগের আগের পাহাড় থেকে নেমে আসার সময় কোনো নির্জন স্থানে তাঁর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন হরিকরণবাবা। তিনি বলেছিলেন, মহাপুরুষের শান্ত রূপ দিব্য ললাট ও ছোট ছোট পিংগল জটা ছিল। মনে হয়েছিল যেন দ্বিতীয় ধ্রুব। ওঁর কাছে এক কমণ্ডলু, এক মৃগচর্ম ও এক ল্যাঙ্গট ছাড়া আর কিছু ছিল না। ওঁর মুখ থেকে বেদান্তবাক্য ফুলকির মত বেরোত। ওঁর কমণ্ডলুর হাতলে একটা গোল মত জিনিষ ছিল। তার কিনারায় একটা হাত লাগলেই একটা দেড় হাত লম্বা তলোয়ার লকলক করে বেরিয়ে আসত। বৈরাগ্য ও বেদান্তের প্রসঙ্গে এই তলোয়ারের কোনো প্রকৃত সম্বন্ধ ছিল না। কিন্তু ঐ সময় আমার তা অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়নি।

হোলির সময় আমি বিষণ্ণ মুখে ঘুরে বেড়ালাম। চৈত্র মাস এসে গেল (১৯১০খৃঃ) শীতের অবসান হয়েছে। সামান্য কাপড়জামা নিয়েই এখন ঘুরে বেড়ানো চলে। সদ্য শোনা বদ্রীনাথ যাত্রার কাহিনী ও হরিকরণবাবার 'তপস্বী ধ্রুবের' কথা আমাকে রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছে। আমি ভেবে দেখলাম ম্লেচ্ছ ইংরেজী ভাষা আমি পড়ব না। সংস্কৃত পড়ার জন্য বছওয়ল ও বারাণসীর রাস্তা আমার বন্ধ হয়েছে। তা হলে কোথায় যাওয়া যায়। শেষ পর্যন্ত একদিন আমি হরিকরণবাবাকে আমার উত্তরাখণ্ডের দিকে যাওয়ার ইচ্ছার কথা বললাম। তিনি আমাকে সমর্থন করলেন। কালিকাদাসও একই কথা বললেন। আমার বৈরাগ্য ও বেদান্ত নিয়ে যাগেশের কোনো মাথাব্যথা ছিল না। ও আমাকে ভালবাসত আর দেশ ভ্রমণের আকর্ষণও ওর ছিল।

বৈরাগ্যের আঁধি যখন চলছিল তখন আমার শিক্ষক মৌলবী গুলামগৌস খাঁ মেঁহনগর থেকে কনৈলায় আমাদের বাড়ি এসেছিলেন। বার্ধক্যের জন্য তাঁকে চাকরি থেকে অবসর নিতে হয়েছিল। আমার বাড়ির লোকদের অভিযোগ শুনে তিনি আমার কর্তব্য সম্পর্কে উপদেশ দিতে শুরু করেন। শিষ্টাচারের জন্য আমার তা বরদাস্ত করতে হয়েছিল। নয়তো আমার বৈরাগ্য ও বেদান্তের পারদ যেরকম চড়ে গিয়েছিল তাতে ওঁর সব কথা অর্থহীন ও অসহ্য মনে হয়েছিল। মৌলবী সাহেব আমার মিডল পাসের সার্টিফিকেট দিতে এসেছিলেন। এতে দুয়েক টাকা পাওয়ার আশাও ছিল। তা তিনি পেয়েছিলেন।

প্রত্যেক মাসেই মাঝে মাঝে দুয়েকদিনের জন্য পরমহংসবাবার কুটীরে অর্থাৎ হরিকরণবাবার কুটীরে অথবা বছওয়ল-এ থেকে যেতাম। তাই আমার এক-আধ দিনের অনুপস্থিতির জন্য বাড়ির লোকেরা ভয় পেতনা। কনৈলাতে এই বছরই প্রথম প্লেগ হল। এতে সারা গ্রামের লোক

বাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেছল এবং শংকাতুর হয়ে কাটাচ্ছিল। কিন্তু আমার কিছু ভাবনা ছিল না। অন্যান্য দিনের মতো আমি একদিন দক্ষিণে পরমহংসবাবার কুটীরের দিকে যাচ্ছিলাম। পরনে ছিল একটি ধুতি ও কোট আর ছিল একটি গামছা ও বগলে আমার নিজের হাতে বোনা একটি কুশাসন। আমার বাড়ির লোকেরা এই যাত্রার কোনো বিশেষত্ব ছিল বলে ভাবেনি। ঐ দিন সন্ধ্যায়ই আমি বহুওয়ল-এ চলে যাই। বহুওয়ল-এ পিসেমশাইয়ের বাড়ি যাইনি। গিয়েছিলাম কুটীরে কালিকাদাসের কাছে। ঐ সন্ধ্যায় যাগেশও চলে আসে। পিসেমশাইয়ের ছাত্ররা হামেশাই কুটীরে আসত। মনে নেই কিভাবে আমি ওদের দৃষ্টি এড়িয়েছিলাম। আমি দুজনের কাছেই আমার সংকল্পের কথা বলেছিলাম। দুজনেই আমাকে উৎসাহ দিয়েছিল। আগেকার দুই উড়ানের পাখা ছিল টাকা। টাকা ছাড়া আমি নিজেকে পঙ্গু মনে করতাম। কিন্তু এবার বৈরাগ্যের সম্বল আমার সঙ্গে ছিল। সর্বদা মুখে এই শ্লোকাংশ ছিল। 'কা চিন্তা মম জীবনে যদি হরির্বিশ্বম্ভরো গীয়তে।' জলের জন্য আমার কাছে কোনো পাত্র ছিল না। কালিকাদাস নিজের লাউয়ের সুন্দর ছোট কমণ্ডুল দিয়ে দিলেন। ভোরবেলা অন্ধকার থাকতে যখন আমি রওনা দিলাম, তখন মাত্র আধপোয়া গুড়ের ডেলা সঙ্গে নিয়ে যেতে রাজি হলাম। সঙ্গে সম্বল নিয়ে চলা তখন আমার নিজের বৈরাগ্যকে পরিহাস করার মতোই মনে হত।

আমি পায়ে হেঁটেই অযোধ্যা হয়ে হরিদ্বার যাব, এই ইচ্ছা করেছিলাম। আমার ইচ্ছা না ছিল রাতারাতি সাধু হয়ে যাওয়ার, না ছিল দ্রুত যোগাভ্যাস করতে লেগে যাওয়ার আমি স্থির করেছিলাম, আগে সংস্কৃত ও বেদান্তের গ্রন্থ খুব ভালভাবে পড়ব। তারপর সন্ন্যাসী হব। ৯টা-১০টা নাগাদ আমি সিধারীর পুল (আজমগড়ের কাছে টৌস নদীর ওপর) পার হচ্ছিলাম, দেখলাম পুলের নিচে নদীর কিনারে বসে আমার ভিতিহরার দাদু (প্রতাপ কাকার শ্বশুর) দাঁতন করছেন। আমি ঈশ্বরকে হাজার ধন্যবাদ দিলাম। ভাগ্যিস বড় রাস্তায় ওর সঙ্গে দেখা হয়নি,নয়তো ওঁর কি-কেন-র জবাব দেওয়া সহজ হতনা। তিনি কনৈলাতেই যাচ্ছিলেন। তাঁর অনেক বয়স হয়েছিল। তাই দূর থেকে পুলের ওপর দিয়ে আমাকে যেতে দেখে আমাকে চিনতে পারেননি। আজমগড়ে শহর দিয়ে সোজা চলে গেলাম। চৈত্রের শুক্লা অষ্টমী। বেশ গরম পড়েছিল। তাই রাস্তার ওপর কোনো বাগানে অথবা কুয়ার ধারে অবশ্যই কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম করেছিলাম। আধপো গুড় খেয়ে তাও চব্বিশ ঘণ্টা অনাহারের পর পায়ে হেঁটে গন্তব্য স্থলে যেতে হচ্ছে, তাই খিদে পেলে দোষ কি? রাস্তার ধারের গাছে পাকা ডুমুর ছিল। ডুমুর ফল খেয়েই দুপুরের আহার হয়ে গেল।

যখন আমি মঁদুরীর দিঘীর কাছে পৌঁছলাম, তখনও এক ঘণ্টা বেলা ছিল। এ সেই পুকুর যেখানে চার বছর আগে ছাত্রবৃত্তি প্রতিযোগিতার পরীক্ষা দিতে এসেছিলাম। তখন এখানে ডেপুটিদের তাঁবু ছিল। শিক্ষক ও ছাত্রদের ভিড়ের জন্য মেলা বসেছিল। আজ এখানে শুধু ঐ বিশাল পাকা দিঘী ও গাছপালায় ভরা বাগান। এই গাছপালায় ভরা বাগানের অন্ধকারে পৌঁছে আমার মনে কিছুটা চঞ্চলতা, কিছুটা আলোড়ন দেখা দিল। আমি দিঘীর ধারে কিছুক্ষণ বসে রইলাম। সারা দিনের খিদে ও ডুমুরের পানসে ফলের কথা মনে হতে লাগল। মাথার ওপরে ঘিরে-আসা রাত্রি ও অপরিচিত স্থানের চিত্র চোখের সামনে এল। মন ধমকাতে লাগল—পয়সা কড়ি ছাড়া অচেনা দেশে এভাবে পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ানো ঠাট্টা-ইয়ার্কির ব্যাপার নয়। বৈরাগ্য কিছু বলতে চাইল কিন্তু তাঁকে এই কথা বলে থামিয়ে দেওয়া হল—'তাহলে জল-হাওয়া খেয়ে কেন থাকলে না, ডুমুরের গাছে ঢিল মেরেছিলে কেন?' মন ঠাণ্ডা মাথায় বোঝাল, ভিতিহরা কাছাকাছিই হবে, ওখানেই চল, এখনও তেমন কিছু ক্ষতি হয়নি। 'ভিতিহরা কখনও যাওয়া

হয়নি,' বৈরাগ্য আপত্তি করায় তাকে এই বলে চুপ করানো হল—'নিজের কাকার শ্বশুরবাড়ি। দাদু সেখানে নেই কিন্তু মামা তো পরিচিত।'

আমার ওপর দিয়ে সারাদিন যা গেছে, তা আমাকে আচ্ছন্ন করেছিল। তাই ভিতিহরা যাওয়ার পরামর্শ আমাকে মেনে নিতে হল। এখান থেকে ভিতিহরা মাইল দেড়েক দূর। রবি ফসল কাটা হয়ে গেছে। জায়গায় জায়গায় খামারে লোক ছিল। তাদের জিগ্যেস করে মামার বাড়ি পৌঁছতে কোনো অসুবিধা হল না। মামার গ্রামে পৌঁছনোর আগে একটা ছোটখাট পুকুর ছিল। সেখানে পৌঁছে নিজের কমণ্ডলুর কথা আমার মনে হল। কমণ্ডলু সঙ্গে নিয়ে মামার বাড়ি যাওয়া তো অনর্থক ঝামেলায় পড়া। তখনও বৈরাগ্যকে শেষ উত্তর দেওয়া হয়নি। মঁদুরী দিঘীর সিদ্ধান্ত স্থায়ী ছিল না। শেষ উত্তরটা রামনবমীর দিন ও ভিতিহরাতে থাকার ওপর ছেড়ে দিয়েছিলাম। কমণ্ডলু এই ভেবে পুকুরে ফেলে দিলাম যে প্রয়োজন হলে আবার ওটাকে নিয়ে যাওয়া যাবে।

আমার আসাতে মামা খুব প্রসন্ন হলেন। একটু পরেই ঘরের মত হয়ে গেল। বাড়িতে মামা ও মামী এই দুজনই ছিলেন, দাদু কনৈলায় চলে গিয়েছিলেন। কোথায় কিভাবে-র প্রশ্ন হল না। কেননা মামার এখানে আসাও তো এক জরুরী কর্তব্য। পরের দিন ছিল রামনবমী। সাধারণ হিন্দু গৃহস্থের বাড়িতেও ঐদিন লুচি ও হালুয়া হত। নিজে রান্না করে খাওয়া ও অন্যান্য নিয়ম কানুন ছেড়ে আমি মামীর হাতের রান্নাই মেনে নিলাম।

আহার ও বিশ্রাম বৈরাগ্যকে আবার শক্তি ফিরিয়ে দিল। রাত্রিতেই আমি স্থির করলাম 'পথচলা জারি থাকবে।' পরদিন গল্প-সল্প করতে করতে মামার কাছ থেকে পাট চেয়ে নিয়ে শেখার ভান করে দড়ি পাকাতে লাগলাম। কারণ পথে কমণ্ডলুর সঙ্গে দড়িরও দরকার হয়। মামা আমার দড়ি পাকানোর আজব নমুনা দেখে হাসতেন এবং নিজেই দড়ি পাকিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করতেন। কিন্তু দড়ি পাকানো শেখার অজুহাতে মামাকে তা করতে দিতাম না। সন্ধ্যায় আমি বলে দিলাম আমি আগামীকাল বাড়ি ফিরে যাব।

আমার সতের বছর পূর্ণ হয়েছে। এখন আর আমি খোকা নই। তবু সকালে যাওয়ার সময় মামা একজন লোক সঙ্গে দিয়ে দিলেন। আমার গতিবিধি সম্পর্কে ওর কিছু সন্দেহ হয়ে থাকবে। পাথেয় হিসেবে দিলেন গুড় মেশানো ছাতু ও ভুজা। মামা আমাকে এগিয়ে দিতে এলেন। কিন্তু গ্রামের বাইরে আসার পর অনেক বলে-কয়ে আমি ওঁকে বাড়ি ফিরিয়ে দিলাম। বাকি রইল অন্য লোকটি যাতে আমার পেছনে না আসে তার ব্যবস্থা করা। কনৈলা যাওয়ার জন্য সতের আঠার মাইল বেগার খাটা ওর পক্ষেও মজার ব্যাপার ছিল না। তাই যখন আমি তার কাছে ফিরে যাওয়ার প্রস্তাব করলাম, তখন সে তাতে সঙ্গে সঙ্গেই রাজী হল। আমি খুশী হয়ে আমার পাথেয় থেকে কিছু ছাতু রেখে বাকীটা ওকে দিয়ে দিলাম। পুকুরে গিয়ে ত কমণ্ডলু ভাসতে দেখতে পেলাম না। পুকুরের চারধারে ঘুরে হন্যে হয়ে খুঁজলাম। কিন্তু কোথাও কমণ্ডলু পেলাম না। আমি ভেবেছিলাম কমণ্ডলু সাধুদের জিনিষ, ওটাকে চোর টোর ছোঁবে না। কিন্তু আমার ছোট ছেলেদের কথা মনে হয়নি, যাদের কাছে লাউয়ের কমণ্ডলু ফুটবল অথবা নিশানার কাজে লাগতে পারে। আমি পসতাতে লাগলাম—কাদায় পুঁতে রাখিনি কেন। সারাদিন ধরে পরিশ্রম করে যে দড়ি বানালাম, তা এখন বেকার। কিন্তু দড়িটা আমি ফেলে দিইনি।

আমি আবার পশ্চিম দিকে চলতে লাগলাম। আবার আজমগড় থেকে অযোধ্যা (ফৈজাবাদ) যাওয়ার পাকা সড়কে চলে এলাম। দুপুরে স্নান ও আহ্নিকের দরকার হল। রাস্তার ধারে একটা স্কুল দেখতে পেলাম। সেখানের শিক্ষকের কাছ থেকে লোটা ও দড়ি নিয়ে স্নান করলাম। এক

ধুতিতে স্নান করা যায়না। সুতরাং ধুতি ছিঁড়ে দুটো লুঙ্গী বানালাম। ছাতু খেয়ে আবার চললাম। এখন তো আর অযোধ্যায় রামনবমী করার প্রশ্ন ছিল না। তাই দূরের গন্তব্যস্থলে পৌঁছবার জন্য আর দ্রুত চালে চলিনি। দুপুরের গরমে বিশ্রাম নিয়ে এবং সহযাত্রীর অভাবে আপনমনে কথাবার্তা বলতে বলতে চলতে লাগলাম।

সূর্যাস্ত হচ্ছে দেখে রাত্রিতে থাকার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরী ছিল। আর তার চেয়েও জরুরী ছিল লোটা-দড়ি চেয়ে স্নান আহ্নিক করা। রাস্তার কাছে এক ছোট গ্রাম ছিল। সেখানে কয়েকটা ঘর পেরিয়ে যাওয়ার পর দেখলাম একটা কুয়া থেকে কিছু স্ত্রীলোক জল তুলছিল। ওদের ঘাঘরা ও ওড়না দেখে বুঝতে পারলাম, আমি ফৈজাবাদ জেলায় এসে গেছি। কুয়ার কাছাকাছি বাড়ি থেকে লোটা ও ঘড়া পেতে অসুবিধা হল না। স্নানের পর কুশাসনে বসে আমি আহ্নিক করতে লাগলাম। কিছু মুখস্ত স্তোত্র উচ্চারণ করলাম। তারপর কুয়া থেকে কিছু দূরে গিয়ে কুশাসন বিছিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসলাম। ধীরে ধীরে পশ্চিমের সূর্যের লালিমা অন্ধকারের কালোয় পরিণত হতে লাগল। যারা জল ভরতে এসেছিল, তাদের মধ্যে কয়েকজন স্ত্রীলোক বেশ মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করছিল। আমার বয়স, চেহারা, পূজা-প্রার্থনা সবই আমার দিকে মন আকৃষ্ট করার মতো ছিল। এদের মধ্যে দুজন স্ত্রীলোক এসে আমার বাড়ি ঘর, কোথায় যাচ্ছি, এই সব প্রশ্ন করল। তারপর বলল,—রান্না করবে না? আমি ঠিক করেছিলাম, আমি যা বলতে চাইবনা সে বিষয়ে নীরব থাকব। কিন্তু যখন কথা বলব তখন সত্য কথাই বলব। যখন ওরা দেখল যে আমার কাছে খাওয়ার মতো কোনো জিনিষ নেই, বাসন ও আগুন জ্বালাবার কোনো সরঞ্জাম নেই, তখন তিনচার জন স্ত্রীলোক নিজেদের ঘর থেকে আটা, ডাল, নুন, উনুন, হাড়ি নিয়ে এল। উনুন ধরানো আমি জানতাম না। তাই একজন স্ত্রীলোক তা ধরিয়ে দিল। উনুনে আগুন জ্বলার পর আমি চাল-আটা-নুন একত্র করে হাড়িতে ঢেলে দিলাম। ওরা আশ্চর্য হয়ে গেল। আমি এই বলে ওদের আশ্বস্ত করলাম যে শেষ পর্যন্ত পেটের ভেতর গিয়ে তো সব একই হয়ে যাবে। জিনিষ কিছু বেশীই এসেছিল। তা ডালায় পড়ে রইল। ওরা আমাকে তা বেঁধে নিয়ে যেতে বলল। আমি বললাম, 'আমি জিনিষপত্র বেঁধে নিয়ে যাইনা।'

'কাল কাজে লাগবে।'

'আজ এখানে আমি কি বেঁধে নিয়ে এসেছিলাম।'

যতদূর মনে আছে, স্ত্রীলোক ছাড়া কোনো পুরুষের সঙ্গে ওখানে আমার কথাবার্তা হয়নি। আমার ধারণা কোনো বাপ-মার অল্পবয়সী ছেলেকে দেখে ওদের মায়া হয়েছিল।

পরদিন ঊষাকালে রাস্তা দিয়ে যাত্রীদের যাওয়ার শব্দ আসতে লাগল। লোকজন অযোধ্যার রামনবমী মেলা থেকে ফিরছিল। রাত্রিতে 'বিশ্বম্ভরের কৃপা' দেখে বৈরাগ্যের ধারণা আরো দৃঢ় হল। মনে হল, প্রথম দুর্গ জয় করেছি। কতদিন পরে অযোধ্যা পৌঁছেছিলাম মনে নেই। কিভাবে খাওয়া দাওয়া জুটেছিল, তাও মনে নেই। একদিন দুপুরে এক গ্রামে পৌঁছলাম। সেখানে দুজন কুয়ায় ঢেঁকি চালিয়ে জল তুলছিল। আমার স্নান আহ্নিক হয়ে যাওয়ার পর ওরা ছাতু আর নুন এনে সামনে রেখেছিল। আমি ভিক্ষা চাইতে পারতাম না আর তা শেখার হিম্মতও আমার ছিল না।

দর্শন নগরের আগে বড় দিঘীতে আমার একজন সাধুর সঙ্গে দেখা হয়। সেও অযোধ্যা যাচ্ছিল। ওর সঙ্গে আমিও বাবা রামপ্রসাদের ছাউনিতে রাত কাটালাম।

পরদিন সরযূতে স্নান ও অযোধ্যা দেখার কথা। বৈদান্তিক হওয়ায় আমার দেবতাদের প্রতি তেমন ভক্তি ছিল না। সকালে স্নান করে যখন আমি সরযূর তীরে বেড়াচ্ছিলাম, তখন এক চটপটে সাধু এসে কথাবার্তা বলল। তারপর চেলা-হওয়ার পরামর্শ দিল। আমি বললাম,—আমি

আগে সংস্কৃত ও বেদান্ত পড়তে চাই। পড়াশোনা করে আমি সাধু হওয়ার সিদ্ধান্ত নেব। সাধু নিজে সংস্কৃত পড়েনি। তাই আমার ওপর ওর কোনো প্রভাব পড়েনি। অযোধ্যাকে আমি বাড়ি থেকে খুব দূরের মনে করতাম না, তাই কাশীর মতো এখানে থাকাও আমার পক্ষে বিপজ্জনক বলে মনে হয়েছিল।

অযোধ্যায় কোন কোন জায়গা দর্শন করেছিলাম মনে নেই। গোণ্ডা জেলার যাত্রীদের সঙ্গে এক রাত জন্মস্থানের কাছাকাছি কোনো মঠে ছিলাম। যাত্রীদের মধ্যে দুয়েকজন দেহাতী সাধু ও কিছু গৃহস্থ ছিল। পরদিন বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য যখন ওরা ফৈজাবাদের দিকে যাত্রা করল, তখন আমিও ওদের সঙ্গে যেতে লাগলাম। ফৈজাবাদে এক শেঠের সদাব্রত চলছিল। তখন ঐ মণ্ডলীর সঙ্গে সেখানে অপেক্ষা করছিলাম। এক বৃদ্ধ সাধু সদাব্রতের অন্ন নিয়ে আমারও আহারের ব্যবস্থা করে দিল। আমার সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ছিল একটি জলের পাত্রের। বৃদ্ধ সাধু আমাকে বলল, আমার কুঠিয়াতে অনেক কমণ্ডলু আছে, যদি ওখানে যাও তবে আমি তোমাকে একটা নয় দুটো কমণ্ডলু দেব। কমণ্ডলুর ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়ার ইচ্ছা ছিল আমার। তাহলে বারবার লোক-জনের কাছে লোটা ও দড়ি চাওয়ার ঝামেলা থেকে বাঁচতাম। আমি বৃদ্ধ সাধুর কথা মেনে নিলাম এবং তাঁর কুঠিয়াতে যেতে রাজী হলাম।

নৌকোয় সরযূ পার হতে হল। পার হতে হতে রোদের তাপ খুব বেড়ে গেল। দুপুরে খালি পায়ে উত্তপ্ত বালির ওপর দিয়ে চলা বড় কষ্টের ব্যাপার ছিল। সরযূর তীরের কাছাকাছি কোনো গ্রাম ছিল না। তীরে ইতস্তত ঝাউগাছ ছিল এবং কোথাও কোথাও গরু-মোষ চরছিল। বেলা একটা নাগাদ এক গোয়ালার ঝুপড়িতে যখন যাত্রীর দল এসে থামল, তখন আমার খুব ভাল লাগল। গোয়ালা ছিল বুড়াবাবার 'সেবক।' বসার সঙ্গে সঙ্গেই ঘন ঘোল এল। আর কথা নেই—পেটভরে তা খেলাম। বুড়াবাবা বৈষ্ণব সাধু ও ব্রাহ্মণ দুইই ছিলেন। তিনি অপরের হাতের রান্না খেতেন না। 'পাকা' সাধুদের ভাষায় তো তাঁকে সাধুই বলা চলে না। কেননা তিনি নিজের গ্রাম ও নিজের বাড়িতেই থাকতেন। তাঁর স্ত্রী ও ছেলেপিলে সব মরে গেছে। শুধু এক বিধবা পুত্রবধূ ছিল। হয়তো বিধবা পুত্রবধূর রক্ষার জন্যই তিনি ঘর ছাড়তে চাননি।

রান্না হল, আহার হল, কিছুটা বিশ্রামও হল। তারপর আমরা আবার রওনা হলাম। এবারের যাত্রা বেশ আরামেই হতে লাগল। প্রতি তিন-চার মাইল পরপর বুড়া বাবার পরিচিত সাধুদের কুঠিয়া ছিল। আমাদের তিন চার জনের দল পৌঁছত। দণ্ডবত প্রণাম হত। বুড়াবাবা যব অথবা গমের রুটি, ঘিয়ের সম্বরা দেওয়া অড়হরের ডাল, আলুর তরকারি আমের চাটনি বানাতেন। আহার খুব স্বাদু হত। আমি এসময়ে কি করতাম মনে নেই। নিজের বই ও চিন্তার জাল ছাড়া সাধুদের সঙ্গে কথাবার্তা নিশ্চয়ই বলতাম। এখানকার গ্রামের ঘরবাড়ির দেয়াল ছিল বাখারি বাঁধা খড়ের ও ছাদ শুধু খড়ের। কারণ জিগ্যেস করায় স্থানীয় সাধু বললেন, বর্ষার সময় এখানে বন্যা হয়, সরযূর জলে পাঁচ-দশ মাইল ভেসে যায়। মাটির দেয়াল তো তাতে গলে যায়। বন্যার সময় সবাই কোথায় থাকে জিগ্যেস করায় উনি বললেন, 'গাছে মাচান বেঁধে।'

'আর খাওয়া-দাওয়া?'

'ছাতু, ওখানে আগুন জ্বালাবে কি করে?'

'আর পায়খানা?'

'জলেই। আপৎ ধর্ম বলা যেতে পারে।'

আরো জানতে পারলাম যে, বন্যা গোটা বর্ষাকাল থাকে না। দশ-পাঁচ দিনের মধ্যেই চলে যায়। বন্যার অভিজ্ঞতার জন্য আমার মন লালায়িত হয়েছিল। কিন্তু আমি তো অন্য লক্ষ্য নিয়ে বেরিয়েছি।

বুড়াবাবার গ্রামের আগের গ্রামে (শূকরক্ষেত্র) পৌঁছলাম। বরাহদেবের মন্দিরেই আমরা ডেরা বাঁধলাম। বরাহদেবের মন্দিরের স্মৃতি খুব অস্পষ্ট। সম্ভবত মন্দিরের চারিদিকে দেয়াল দিয়ে ঘেরা ছিল। বরাহক্ষেত্র থেকে এগিয়ে যাওয়ার সময় সরযূ নদী—ঘাঘরা নয়—আমরা পায়ে হেঁটেই পার হয়েছিলাম। ধুতি ভিজে গিয়েছিল। বুড়াবাবার গ্রাম কেমন ছিল, বাড়ি কেমন ছিল ওঁর পুত্রবধূই বা কেমন ছিল, তার কোনো ছবি আমার স্মৃতিপটে এখন আর আঁকা নেই। সেখানে পৌঁছবার পরদিন অথবা দুয়েক দিন পরে আমি যখন রওনা হচ্ছিলাম, তখন বুড়াবাবা আমাকে একটা গোল লাউয়ের কমণ্ডলু দিলেন। ওটা দেখতে কেমন ছিল, তা নিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যথা ছিল না, ওতে বেশ ভালই কাজ চলে যেত। রাস্তার কথা বলতে গেলে বলা চলে যে সংযুক্ত প্রদেশের প্রধান প্রধান সড়কগুলির কথা আমার মনে ছিল। আমি সেখান থেকে বহরম ঘাট রেলওয়ে পুল পার হই। স্মরণ নেই কখন, কবে। কিন্তু জগজীবন সাহেব কা কোটোয়া ও লোধেশ্বর নিশ্চয়ই আমার রাস্তায় পড়েছিল। নিত্য নতুন গ্রাম, নিত্য নতুন অতিথি-সৎকারক চোখে পড়ত। ভিক্ষা করতে জানতাম না এবং প্রয়োজনও ছিল না। কোনো না কোনো গৃহস্থ খাওয়ার কথা নিশ্চয়ই জিগ্যেস করত এবং 'বিশ্বম্ভরের কৃপা' মনে করে দাতার উপকারের জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন বোধ করতাম না। কোনো কোনো দিন দুপুরে সড়কের কিনারের কাঁচা আম খেয়েই কাটিয়ে দিতাম। কমণ্ডলু হাতে থাকায় এখন স্নানের জন্য গ্রামে যাওয়ার দরকার হত না। তবে রাত্রিতে অবশ্যই কোনো সাধুর কুঠিয়া অথবা গৃহস্থের দরজায় পৌঁছতাম।

মোরাদাবাদ পর্যন্ত পায়ে হেঁটেই গিয়েছিলাম। তাতে বিশ-পঁচিশ দিন লেগেছিল। কিন্তু রাস্তার ঘটনা এমনই সাধারণ যে তা খুব অল্পই মনে আছে। বিসওয়াঁ আমার রাস্তায় পড়েছিল। সেখানে সম্ভবত এক বড় মোহন্তের মঠে ছিলাম। সন্ধ্যায় মাহমুদাবাদ পৌঁছেছিলাম। সেখানে এক উদাসী সাধুর আশ্রমে রাত্রিতে ছিলাম। সেই রাত্রিতে পুব দিকের পুকুরের ধারে লিট্টি খেলাম। পুকুরে জল অনেক কম ছিল। তার এক কোণে একটা কুয়া ছিল। নীমসারের কুণ্ড সম্পর্কে বলা হত যে তার জলের তল নেই, জল পাতাললোক পর্যন্ত চলে গেছে। তার একদিক থেকে অল্প অল্প জল বয়ে যাচ্ছিল। হরদোইয়ের কাছারির পাশে বিলিতী গাছে লাল ফুল ফুটেছিল। শাহজাহানপুরের কয়েক মাইল আগে বারাণসী জেলার এক তীর্থযাত্রী ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা হয়। এক সঙ্গে কয়েক মাইল চলার পর পরামর্শ করে ঠিক হল, আমরা একসঙ্গেই যাব। তিনিও হরিদ্বার ও বদরীনাথ যাচ্ছিলেন। মোরাদাবাদ পর্যন্ত আমরা দুজনে এক সঙ্গেই গেলাম। ব্রাহ্মণের সঙ্গে ছোঁয়া-ছুঁয়ির কথা আমার একেবারেই মনে হতনা। ব্রাহ্মণ রান্না করতেন, খাওয়া-দাওয়ার জিনিষ চেয়ে চিন্তে আনতেন। বেরিলিতে সম্রাট এডোয়ার্ডের মৃত্যুর জন্য সেদিন বাজার বন্ধ ছিল। রামপুরে পাঠকজীর শালা থাকতেন। আমি তাঁকে কলকাতায় দেখেছিলাম। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। আমাকে বৈরাগ্যের পথ থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আমি এখন সে অবস্থা থেকে অনেক এগিয়ে গেছি। তাঁর কাছেই জানতে পারলাম যে পাঠকজী কলকাতা থেকে বাড়ি চলে এসেছেন এবং তিনি মোরাদাবাদেই আছেন।

মোরাদাবাদে আমরা সোজা মিঞাসাহেবের গলিতে গেলাম। পাঠকজী আমাকে দেখে খুব খুশি হলেন। কিন্তু আমার পোশাক-আশাক ও সঙ্গের তিলকধারীকে দেখে তাঁর দুশ্চিন্তা হল।

রাত ভোর হওয়ার পর দেখলাম আমার বারাণসীর বন্ধু গায়েব হয়ে গেছেন। তাঁকে এদিকে ওদিকে খুঁজে আমাকে হয়রান হতে দেখে পাঠকজীর ছেলে মুচকি হেসে বলল,—আমরা ওকে রওনা করিয়ে দিয়েছি। প্রথম দিকে সে দ্বিধা করছিল কিন্তু যখন বললাম,—'অন্যের ছেলেকে ভাগিয়ে নিয়ে যাচ্ছ। আমি পুলিশে রিপোর্ট করতে যাচ্ছি।' ব্যাস, এতেই লোকটার হুঁশ হল। আপনি এখানেই থাকুন এবং আমাদেরও জ্ঞান বৈরাগ্য শেখান। যা হোক্, তখন আমার তাড়াহুড়া করে পালাবার কোনো দরকার ছিল না। পাঠকজীর পরিবার সভ্য শহুরে পরিবার। পাঠকজীর আগ্রহকেও আমি ঠেলে ফেলে চলে যেতে পারিনি। শহরে এক বড় ধনী শেঠ ছিলেন। পাঠকজী তাঁর দরবারে যাতায়াত করতেন। তাঁর ভাইদের মধ্যে বড় ভাইয়েরও জ্ঞান-বৈরাগ্যের ব্যামোর ছোঁয়া লেগেছিল। আমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় তাঁর আনন্দের কথা বললেন। তিনি আমাকে তাঁর বাড়িতে থাকার কথা বললেন। মোরাদাবাদে বেশী হলে দশ-পনের দিন আমি তাঁর বাড়িতে ছিলাম। সংসারে অনাসক্ত শেঠ নারকেল জমা করে রেখেছিলেন। তিনি বলতেন, 'দেখুন দশটা নারকেল আছে। আমি ভাবছি দশ সন্ন্যাসী হয়ে গেলে তবে আমরা একসঙ্গেই বেরবো। দুজন তো হয়েই গেছে, আরো আটজন এসে যাবে।' খুব গরম পড়েছিল। কিন্তু শেঠের (সাহুজীর) বৈঠকখানায় খসখসের পর্দা ছিল। আমার খাওয়া-দাওয়া ও থাকার খুব ভাল ব্যবস্থা হয়েছিল। শেঠ বোধহয় ভেবে থাকবে, এখন এ যাবার নয়। মাত্র আরো আটটি সাধু চাই।

শেঠজীর ছোট ভাই ও বিশেষ করে তাঁর মা, বড় ছেলের হালচাল দেখে আগে থেকেই হয়রান হয়েছিলেন। তার ওপর আমাকে জমিয়ে সৎসঙ্গ করতে দেখে তাদের ভয় আরো বেড়ে গিয়েছিল। আমি অধৈর্য্য হয়ে পড়ছিলাম। শেঠজীর দশ জন সাধুর পরিকল্পনা আমার বিস্বাদ মনে হচ্ছিল। তাছাড়া জ্ঞান-বেদান্তের ব্যাপারে শেঠজীর থেকে আমার পাল্লা অনেক ভারী ছিল। আমার খুব আনন্দ হল যখন একদিন শেঠজীর ছোট ভাই ও মা অনেক অনুনয়-বিনয় করে আমার কাছে প্রস্তাব করলেন—'আপনি এখান থেকে হরিদ্বার চলে যান। সেখানে খাবার ও থাকার জন্য যা কিছু দরকার হবে আমরা তার ব্যবস্থা করে দেব।' আমি দেখলাম এতে শেঠজী ও পাঠকজী দুজনের হাত থেকেই আমি বেরিয়ে যেতে পারব। যার জন্য এই কিছুদিন ধরে আমি খুব ভাবনায় পড়েছিলাম। আমি বললাম, একটা লোটা (লাউয়ের কমণ্ডলু এরই মধ্যে পচে যাচ্ছিল) আর হরিদ্বার পর্যন্ত টিকিট হলেই চলবে। আর কিছু লাগবে না।

২

হিমালয় (১)

হরিদ্বার স্টেশনে যখন নামলাম তখন আমার কাছে দুচার আনা পয়সার বেশী ছিল না। কিন্তু আমার এখন পয়সা কড়ি ছাড়া অচেনা জায়গায় যেতে কোনো দুশ্চিন্তা হত না। গঙ্গায় স্নান করতে গেলাম। সেই গরমে মন বলছিল, জলে কিছুক্ষণ থাক। কিন্তু জলে নামলে ঠাণ্ডার দরুণ তা যেন কামড় দিচ্ছিল। হরিকি পৈড়ির কাছে কোনো জায়গায় কিছুটা পেট-পূজা করে নিলাম। তারপর চললাম সংস্কৃতের পণ্ডিতের খোঁজে। শেষ পর্যন্ত শুধু তীর্থ ও তপস্যা করা আমার

হরিদ্বার আসার উদ্দেশ্যে ছিল না। আমি এখানে এসেছিলাম সংস্কৃত পড়ার জন্য। দুয়েক জায়গায় আমি লোকজনদের পড়াশোনা ও পণ্ডিত সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। কিন্তু যখন আমি বললাম, আমার বাড়ি বারাণসীর কাছে, তখন তারা বলল, হরিদ্বারে সংস্কৃত পড়তে এসেছে। সারা দুনিয়া সংস্কৃত পড়তে যায় বারাণসীতে, আর এর উলটো ব্যাপার। পাশের অন্য একজন বলল, আরে ভাই, এ পড়াশোনা করতে আসেনি, এসেছে ছত্রে ছত্রে রুটি গিলতে। একজন বিষ্ণুতীর্থের (?) বিষ্ণুদত্ত (?) পণ্ডিতের নাম বলে দিল। খুঁজে খুঁজে সেখানে গেলাম। ডাকলাম। কোঠাঘর থেকে একজন মধ্যবয়সী মানুষ উত্তর দিল—'কে, কাকে চাই?'

'আমি পণ্ডিত বিষ্ণুদত্তের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'ওপরে চলে এসো, আমারই নাম বিষ্ণুদত্ত।'

পণ্ডিতজী বেশ ভালভাবেই সাক্ষাত করলেন। আমার এবং তাঁর বয়সী একজন মানুষের মধ্যে যতটা শিষ্টাচার দেখানো দরকার, পণ্ডিতজী তার চেয়ে বেশী শিষ্টাচারই দেখালেন। পড়াশোনা করার কথায় তিনি বললেন— কোনো পরোয়া নেই। আমি পড়াব। তুমি দূরের ছাত্র, খাওয়া-দাওয়ার জন্য চিন্তা করো না। তুমি আমার এখানেই খাবে।

এই ধরনের সাফল্যে আমার আনন্দের সীমা ছিল না। দুই তিন ঘণ্টা পরে পণ্ডিতজী কলম, দোয়াত, খাতা ও একটা মোটামতো বই এনে আমার সামনে রাখলেন। বললেন— 'এই বইয়ের জন্য খেমরাজ শ্রীকৃষ্ণদাসের প্রেস থেকে বারবার তাগিদ আসছে। এই বইকে তুমি রোজ নকল কর।'

আমার আরো আনন্দ হল এই ভেবে যে, মাগনা খাওয়ার চেয়ে কাজ করে খাওয়া আরো ভাল। দুয়েকদিন আমি সংকোচে চুপ করে রইলাম। আমি ভেবেছিলাম পণ্ডিতজী নিজেই আমাকে পড়ার কথা বলবেন। যখন এই ব্যাপারে তিনি কোনো কথাই বললেন না, তখন আমিই পড়ার কথা বললাম। 'হ্যাঁ, খুব ভাল কথা' বলে আরো দুদিন কাটিয়ে দিলেন। এদিকে দিনে আট ঘণ্টা আমি কলম পিষতে লাগলাম। পড়ার কথা আবার বলায় তিনি মিষ্টি করে বললেন—'তাড়াতাড়ির কি আছে, বইটা শীগগির পাঠাতে হবে, এটা লিখে শেষ করে ফেল, তারপর পড়াশোনা শুরু করবে। ততদিন আমার বইয়ের মধ্যে যা তোমার ভাল লাগে, পড়তে থাক।'

পণ্ডিতজীর বইগুলোর মধ্যে আমার কাজের কোনো বই ছিল না। ছুটি পাওয়ার পর দুয়েক ঘণ্টা বাইরে ঘুরতে যেতাম। এই চেষ্টাও করতাম যে যদি অন্য কোথাও পড়াশোনার ব্যবস্থা করা যায়, তবে সেখানে চলে যাব। দুয়েক জায়গার সন্ধানও পেয়েছিলাম। কিন্তু বারাণসীর কাছ থেকে এসেছি, তাই আমি যে ভবঘুরে তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ ছিল। সুতরাং কেউই আমাকে ছাত্র হিসেবে স্বীকার করতে রাজী ছিলেন না। আগেই সাধু হয়ে যাওয়ার পুরোপুরি বিরুদ্ধে ছিলাম আমি। সেইজন্য আমি কোনো মঠে যাইনি, কোনো সাধুর দিকে আমার চোখও পড়েনি। খবরের কাগজ সম্পর্কে আমি তো একেবারে আনকোরা ছিলাম। নিজামাবাদের শেষ বছর আমি 'সরস্বতীর' কয়েকটি সংস্করণ দেখেছিলাম, পড়েছিলাম কিনা তাতে সন্দেহ আছে।

সাত-আট দিন থাকার পর পণ্ডিতজীর রহস্য স্পষ্ট হতে লাগল। সংস্কৃতের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্কই ছিল না। 'ব্রতার্ক' (এই ছিল বইটির নাম) ছাপিয়ে প্রেসের মালিকের কাছ থেকে কিছু টাকা ও তীর্থে আসা ভক্তদের নিজের পাণ্ডিত্যে প্রভাবিত করা এই ছিল তাঁর কাজ। পাচক কাঁদছিল—ছমাস হয়ে গেছে, একটি পয়সাও বেতন পায়নি। খাওয়া-দাওয়ার এমন অবস্থা ছিল যে তাঁর আট-নয় বছরের মেয়েই পেটভরে খেতে পেত। কারণ সে বয়সে ছোট। মেয়ে ছাড়া

পণ্ডিতজীর আর কেউ ছিল না। সন্ধ্যায় ছাদে বসে খেতে ও রাত্রিতে সেখানেই শুতে আমার ঘৃণা করত, যখন আমি দেখতাম যে ছাদেই কিছুদূরে কয়েক মাসের পুরানো মল শুকোচ্ছে।

নিজের সাফল্যের আনন্দে হরিদ্বারে পৌঁছনোর পরদিন আমি যাগেশকে পোস্টকার্ডে 'গদ্যকাব্যে' একটি চিঠি লিখেছিলাম। আনন্দাতিশয্যে পত্রে যদি কবিত্ব এসে গিয়ে থাকে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না। পত্র যাগেশের না কালিকাদাসের ঠিকানায় লিখেছিলাম মনে নেই। অন্য কেউ যাতে চিঠি পড়তে না পারে, সেইজন্য পুরো চিঠিটি লিখে তারপর তাকে শেষ থেকে শুরুর দিকে উল্টে দিয়েছিলাম। যতদূর মনে পড়ে চলে আসার সময় আমি যাগেশকে বলে আসিনি যে আমি এই ধরনের সাংকেতিক চিঠি লিখব। বাক্যকে উলটো করে বলা—দেহাতী স্কুলে এই চল ছিল। হয়তো তাই যাগেশের চিঠি পড়তে অসুবিধা হয়নি। চিঠিতে আমি ভ্রমণের আনন্দের আকর্ষণ বর্ণনা করে, ওকেও এই আনন্দের অংশীদার হওয়ার নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম।

আমার চিঠি যাগেশের হাতে এসেছে—এই রহস্য ধীরে ধীরে প্রকাশ হয়ে গেল। যাগেশের হাত থেকে ওর কাকা মহাদেব পণ্ডিত চিঠিটা নিতে পেরেছিলেন। প্রথমদিকে তিনি এই চিঠির কোনো অর্থ করতে পারেননি। কিন্তু পরে তিনি সাংকেতিক চিঠির অর্থ খুঁজে পেয়েছিলেন। এরপর তিনি যাগেশের ওপর নজর রাখেন। যাগেশ আমার চিঠি পেয়ে চলে আসার ব্যাপারে অনেকটা নিশ্চিত করেছিল। যখন ও টের পেল ওর ওপর নজর রাখা হচ্ছে, তখন এই ইচ্ছা আরো দৃঢ় হল। ও পালিয়ে আসার চেষ্টা করতে থাকে।

পণ্ডিতজী নিজের রোজগারের জন্য আমাকে লেখার কাজে লাগিয়ে রেখেও যদি কারু কাছে আমার পড়াশোনার ব্যবস্থা করে দিতেন, তাহলেও আমি ওঁর কাছে লেগে থাকতাম। কিন্তু যে অবস্থায় বোকা বানিয়ে তিনি আমাকে রাখতে চাচ্ছিলেন, তা আমার সহ্য হল না। ঐ সময় বদ্রীনাথের যাত্রীরা আসতে শুরু করেছিল। হরিদ্বারে পড়াশোনার আশা নেই দেখে আমি ভাবলাম, পড়াশোনার জন্য আমার বারাণসীতেই ফিরে যেতে হবে। কিন্তু এখন যখন এখানে এসে গেছি, তখন বদ্রীনাথও হয়ে আসা চাই।

একদিন সকালে আমি পণ্ডিতজীর কাছে বিদায় নিলাম। ভীমগোড়া হয়ে হৃষিকেশ পৌঁছলাম। অযোধ্যা থেকে মোরাদাবাদের সফরে সদাব্রত ও ধর্মশালার সঙ্গে পরিচিত হয়ে গিয়েছিলাম। ভিক্ষা করাটা আমার আয়ত্তাধীন ছিল বলে মনে হয়নি। কিন্তু সদাব্রত হলে ভিক্ষা করার দরকার হয় না। সব ভিক্ষুক সেখানে নিয়মিত অন্ন ও পয়সা পাওয়া নিজের অধিকার বলে মনে করে। রাস্তায় মালবার এক সাধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। যাত্রায় একজনের চেয়ে দুজন ভাল। একথা বারাণসীর তীর্থযাত্রীর সঙ্গে থেকে আমি বুঝতে পেরেছিলাম। দুজনে কথা বলতে বলতে গেলাম। হৃষিকেশে গিয়ে কালীকমলীঅলার ধর্মশালায় উঠলাম। আগেই আমি কালীকমলীঅলা বাবার 'পক্ষপাতরহিত অনুভব প্রকাশ' পড়েছিলাম। কিন্তু আমার এই ধারণা হয়নি যে কালীকমলীঅলার এত ধর্মশালা ও এত সদাব্রত উত্তরাখণ্ডে ছড়িয়ে আছে।

আমার সঙ্গী মালবীবাবা দেখতে দুবলা-পাতলা তথা পঞ্চাশের ওপর বয়সের ছিলেন। কিন্তু চলা-ফেরা ও কাজ করার ব্যাপারে তিনি আমার চেয়ে অনেক বেশী মজবুত ছিলেন। দুয়েকটা চড়াই-উৎরাইয়ের পর যখন আমার দম বেরিয়ে যেত, তখন তিনি হাতে লাঠি, পিঠে বিছানা, বগলে ঝোলা নিয়ে ধীরে ধীরে চলতেই থাকতেন। দিনের গন্তব্য স্থলে পৌঁছবার পরে যখন আমরা কোনো ধর্মশালা বা চটীতে উঠতাম, তখন আমি শুয়ে পড়তাম, নড়াচড়ারও ইচ্ছা হত না। কিন্তু তিনি কাঠ যোগাড় করতেন, আগুন জ্বালাতেন ও রান্না করতে লেগে যেতেন। কিছুটা

বিশ্রামের পর লজ্জিত হয়ে আমি উঠে দাঁড়িয়ে পড়তাম এবং তাঁর কাজে সাহায্য করতাম। আমরা হৃষিকেশের কালীকমলীঅলার চটী থেকে সামনের ছত্রে থাকার জন্য দুটো চিঠি নিয়ে ছিলাম যাতে একজন দুইবার সদাব্রতের অন্ন না নিতে পারে, সেইজন্য কালীকমলীঅলা পেছনের চটী বা ধর্মশালা থেকে ছাপানো চিঠি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। চিঠিতে ছাপার অক্ষরে যেসব জিনিষের কথা থাকত, তা সদাব্রত থেকে পাওয়া যেত। সদাব্রত আছে এমন জায়গা প্রতিদিন পাওয়া যেত না। এই পরিস্থিতিতে আমাদের তীর্থযাত্রীদের দানের ওপর নির্ভর করতে হত। বহু সংখ্যক তীর্থযাত্রী আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই যাচ্ছিল। ভিক্ষা ও চাওয়ার কাজটা আমাকে দিয়ে হত না। তার জন্য মালবীবাবার মতো একস্‌পার্ট সেখানে মজুত ছিলেন।

দেবপ্রয়াগ পৌঁছতে পৌঁছতে আমার পা ও ফুসফুস বেশ মজবুত হচ্ছিল। দেবপ্রয়াগে অলকনন্দার পারে আমরা একদিন এক অথবা দুইদিন ছিলাম। ভাগীরথীর এক পাড় থেকে অন্য পাড়ের গ্রামে যাওয়ার জন্য দড়ির ঝুলা ছিল। একবার আমি এক পাড় থেকে অন্য পাড়ে গিয়ে আবার ফিরে এসেছিলাম। সেই সময় এই কাজ সাধারণ বাহাদুরীর ব্যাপার ছিল না।

দেবপ্রয়াগে আলোচনা হল সোজা কেদার-বদরী হয়ে ফিরে যাব কেন। যখন এসেই পড়েছি তখন যমুনেত্রী, গঙ্গোত্রী হয়েই যাই। প্রস্তাব করেছিলেন মালবীবাবা। এবং আমি হাঁ করেছিলাম। দেবপ্রয়াগ ছাড়ার পর যখন প্রথম চড়াই শুরু হল এবং ওঠ-বস করে চলতে চলতে বেলা গেল অথচ চড়াই শেষ হল না, তখন আমি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, তাতে পস্‌তাতে হল। কিন্তু তখন পস্‌তালে হবে কি।' ১৯১০-এর কথা বলছি। তখন দেবপ্রয়াগ থেকে টেহ্‌রীর রাস্তা ছিল পাকদণ্ডীর।

চড়াই এত কঠিন মনে হয়েছিল। কিন্তু তা শেষ হওয়ার পর ইন্দ্রিয় শান্ত হয়ে গেল। ইতিমধ্যে আমার কিছুটা অভ্যাস হয়ে গেছে। তাই পথ চলার পর চব্বিশ ঘণ্টা শরীরে ব্যাথা থাকত না। ওপরে ডাঁড়ের ঠাণ্ডা হাওয়া আর পাকা করৌন্দা ও তুঁতের মতো সোনালী ফল—যার গাছে কাঁটা ছিল—খেতে দারুণ লাগছিল। সেখানকার প্রকৃতির সৌন্দর্য পয়েরে ঝলমলে ব্যাপারের জন্য ভুলে গেলাম। মনে আছে যে, সেখানে জংলী ডালিম ছিল, যা খেতে খুব টক লাগত। অনেকটা দূর যাওয়ার পর উৎরাইয়ের সময় বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। আমরা এক জলচাকরীঘরে ঢুকে গেলাম। সেখানে বৃষ্টি থেকে বাঁচবার জন্য ঘর এবং রান্নার জন্য জলও ছিল। ইন্ধনেরও অভাব ছিল না। আমি তো রান্না করে খেয়ে হাঁড়ি ভেঙে ফেলে দিতাম। কিন্তু মালবীবাবার দেশ ভ্রমণে যুগ কেটে গেছে। তিনি তিন ধাম ঘুরে এসেছেন এবং তাদের মধ্যে এক অথবা দুই ধাম একাধিকবার ঘুরেছেন। তিনি ভাল করেই জানতেন যে, প্রয়োজন মতো গাঁটের গুড় যতটা কাজ দেয়, বেদান্ত বৈরাগ্য ততটা নয়। দুয়েক সন্ধ্যার জন্য আটা, আলু, মরিচ, মশলা তাঁর ঝোলায় সর্বদা থাকত। আশেপাশের এক মাইল আধ মাইলের চড়াই-উৎরাইয়ের মধ্যে কোনো জনবসতি ছিল না, তবু আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম। মালবীবাবা নিজের ছোট তাওয়া, থালা, ডেক্‌চি বার করলেন। জল ভরার ও বাসন মাজার কাজে এখন আমি তাঁকে সাহায্য করতাম। রুটি ভাল করে সেঁকতে পারতাম না। কিন্তু ডাল তরকারি রান্নায় আমার কোনো ত্রুটি ছিল না। মালবীবাবা কোন জাতির ছিলেন, তা আমি কখনো জিগ্যেস করিনি, জিগ্যেস করার কোনো প্রয়োজনও মনে করিনি। যদিও বেদান্তের 'খাওয়ার দাঁত এক ও দেখানোর দাঁত আরেক' অনুসারে ব্যবহারিক হাজার ভণ্ডামি পালন করা অন্তঃকরণ শুদ্ধির জন্য আবশ্যক মনে করা হয়। কিন্তু বেদান্তের আগে কলকাতার পাঠকজীর মন্ত্রও তো আমাকে ছুঁয়েছিল।

কতদিন পরে টেহ্‌রী পৌঁছলাম, সেখানের জনবসতি কেমন ছিল, মনে নেই। রাজকীয় ধর্মশালায় আমরা উঠেছিলাম। মালবীবাবা বলতে লাগলেন,—সেখানকার রাজার সঙ্গে যতক্ষণ দেখা না হচ্ছে, ততক্ষণ তীর্থের ফল পাওয়া যাবে না। তীর্থের ফল আমার কাছে এঁকেবারে তুচ্ছ মনে হত, তা তো বলতে পারি না। কিন্তু তাতে দেশভ্রমণের বাসনা খুব বেশী মাত্রায় ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে রাজদর্শন আবশ্যক ছিল। আমরা জনবসতির বাইরে একটা বাগানের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম।—আমাদের মতো আরো কিছু তীর্থযাত্রী ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল। রাজাসাহেব সামনের পাহাড়ের ওপর নিজের গ্রীষ্মাবাস থেকে এলেন। ওঁর দুই ঘোড়ার গাড়ি আমাদের কাছ থেকে চার কদম দূরে দাঁড়াল। আমাদের সবাইয়ের রাজদর্শন হল। রাজার কত বয়স ছিল, তিনি দেখতে কেমন ছিলেন, তা আমি একেবারেই ভুলে গেছি। তবে ফেরার পথে সঙ্গীরা বলছিল যে মহারাজার বিয়ে-শাদি নেপালের রাজবংশের সঙ্গে।

টেহ্‌রী থেকে ধরাসুর যাত্রায় কোনো স্মরণীয় ঘটনা ঘটেনি। কিছু সদাব্রত থেকে ও কিছু চেয়ে-চিন্তে আমাদের দুবেলার আহারের কাজ হয়ে যেত। এখন ঠাণ্ডা পড়ছিল। আর পরের ঠাণ্ডার জন্য আমাদের কাছে কম্বল নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু আমার যতদূর মনে পড়ে, নিচে থেকে আমি কম্বল নিয়ে আসিনি। কম্বল পেয়ে থাকব হৃষিকেশ অথবা টেহ্‌রীতে। ধরাসু পৌঁছতে পৌঁছতেই বুঝতে পারলাম, মালবী বাবার সঙ্গে আর বেশীদিন থাকলে তিক্ততার সঙ্গে আলাদা হতে হবে। ধরাসু থেকে যমুনার তীর পর্যন্ত পৌঁছনোর রাস্তার দৃশ্য কেমন ছিল, তাতো বলতে পারব না। কিন্তু যমুনার কিনারে পৌঁছনোর পর মনে হল এক নতুন দৃশ্যের ওপর যবনিকা উঠল। উপত্যকা বেশ চওড়া। যমুনার নীল জল কলকল করতে করতে অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত সবুজে মোড়া বিশাল পর্বত নিজের ছায়ায় উপত্যকাকে ঢেকে রেখেছে। তাতে প্রকৃতিকে বড় স্নিগ্ধ লাগছিল, যদিও তখনও কিছু বেলা ছিল। এখানে, বিশেষ করে ধরাসুর এই দিকে, যমুনোত্রীর যাত্রী বেশ কম ছিল। রাস্তা মেরামত ও চটীর অভাব ছিল। তাই আমরা বন বিভাগের কুলীদের ডেরার কাছাকাছি থাকাই স্থির করলাম।

আমরা সেখানে ডেরা বাঁধবার কিছু পরে আর এক মূর্তি আমাদের পাশে এসে থামল। তাঁর চেহারা ও কথাবার্তা খুব তাড়াতাড়ি আমার মনকে তাঁর দিকে আকর্ষণ করল। তাঁর রঙ ফর্সা, মুখে মাংস কম, নাক টিকালো, উজ্জ্বল চোখ, মুখে ঘন কালো মাঝারি মাপের দাড়ি, মাথায় কালো চুলের ছোট জটা। তাঁর কাছে মালপত্র খুব কম ছিল; একটা পশমিনার কমলা রঙের লম্বা কুর্তা, এক কম্বল, ছোটমতো ঝোলা, পিতলের কমণ্ডলু (বালতির মতো), একটা গামছা ও দুটো ল্যাঙট ছাড়া তাঁর কাছে একটা 'রোজ' কাঠের লাল ডাণ্ডা কাছে ছিল। তাঁর আসার সঙ্গে সঙ্গেই এক বড় বড় লোমঅলা নোংরা সাদা কুকুর ইতস্তত শুঁকতে শুঁকতে প্রভুর কাছ থেকে পাঁচ কদম দূরে বসল।

ব্রহ্মচারীর (এই ব্যক্তির নাম মনে নেই) জিভও কোনো রকম চুপ করে থাকতে জানত না। তিনিআসার সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নের ঝড় বয়ে গেল, 'মহাত্মাদের কোথা থেকে আসা হল?' 'রাস্তা কেমন?' 'হ্যাঁ, আপনি মালবের উজ্জয়িনীর বাসিন্দা। আমি উজ্জয়িনীর পথে গিয়েছি। 'আপনাকে তো খুব অল্পবয়স্ক মনে হচ্ছে; এখন তো আপনার লেখাপড়া করার সময়।' 'আচ্ছা, আপনার জন্মস্থান বারাণসীর কাছে? বারাণসীতে আমি দুইবার গিয়েছি। মণিকর্ণিকা-স্নান ও বিশ্বনাথ দর্শন করেছি। কাশী বিশ্বনাথের শহরের কথা কি বলব? হিমালয় ছাড়া অন্য কোনো স্থান যদি আমার ভাল লেগে থাকে তো, তা কাশীপুরী। কিন্তু অনেক বছর থেকে হিমালয়ে

ঘুরছি, তাই কাশীর গরম বরদাস্ত হয় না। আমি আগের বছর কয়েক মাস থাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ফাল্গুনের পরে সেখানে থাকা সম্ভব হল না।'

বড় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তিনি অনায়াসে শুদ্ধ সংস্কৃত হিন্দিতে ধারা প্রবাহের মতো কথা বলছিলেন। তাঁর জন্মস্থান বেরিলি- মোরাদাবাদের দিকে বলে মনে হচ্ছিল। তাঁর ভাষায় অনেক উর্দু শব্দও এসে যাচ্ছিল। তাঁর উর্দু শব্দের উচ্চারণও খুব বিশুদ্ধ। 'আপনার কোথা থেকে আসা হচ্ছে'—জিগ্যেসকরায় তিনি বললেন—'আমি হরিদ্বারের দিক থেকে আসছিনা। এখান থেকে পশ্চিমে রামপুর-কুলু- চম্বা-জম্মু-কাশ্মীর আমার বিচরণ ভূমি। শীতের দিনে কুলুতে ছিলাম। মণিকর্ণের নাম শুনেছেন?শোনেননি মনে হয়। খুব কম লোকই জানে। বড় জাগ্রত তীর্থ। যমুনোত্রীতে একটা গরম কুণ্ড দেখবেন। সেখানে অনেক। যমুনোত্রীতে তো গরম কুণ্ডে রুটি আলু ছেড়ে দিলে রান্না হয়ে যায়। কিন্তু মণিকর্ণে জলে পাত্র রেখে রান্না করে নিন। পার্বতীর কানের মণি পড়েছিল, তাই নাম হয়েছে মণিকর্ণ।... হ্যাঁ, ঠিক কাশীর মণিকর্ণিকার নামও পার্বতীর কানের মণি পড়েছিল বলেই হয়েছে। কিন্তু এখানে উথলে ওঠা জলের ঝরণা বলে দেয় যে ত্রিশূলীর ত্রিশূল মণি খুঁজে বার করার জন্য কত চেষ্টা করেছিল।.... না বুড়োবাবা, কথায় বলে— 'যে যায় কুল্লু, হয়ে যায় উল্লু।' কুল্লু-চম্বার সৌন্দর্যের অন্ত নেই, তাতে সন্দেহ নেই। আমি কার্তিকের মেলায় গিয়েছিলাম রামপুরে। দারুণ সব কম্বল আসে। কিন্তু ভারী কম্বল। রাজা অনেক করে বললেন— 'ব্রহ্মচারীজি! শীতের জন্য কিছু কাপড় নিয়ে নিন।' জানেন তো কাপড়ের বোঝা নিয়ে ঘোরাফেরা করা আমার কাছে সবচেয়ে কষ্টকর মনে হয়। কঠিন থেকে কঠিনতর পাহাড়ও আমার কাছে কিছু না। ধরাসু থেকে এদিকের রাস্তা আমি দেখিনি, তবু এই রাস্তা মেরামতের জন্য হয়ত রাজার কিছু খরচ করতে হয়। আমি এমন রাস্তা পেরিয়ে এসেছি, যেখানে রাস্তা বানানোর কাজ মানুষের পা করেছে। নদীর এক পাড় থেকে অন্য পাড়ে বাঁধা একটি দড়ির ওপর দিয়ে নদী পারাপার করতে হয়।... হ্যাঁ, এই কম্বল ও পট্টুর লম্বা কুর্তা রামপুরের রাজার দেওয়া। দুইই হালকা, কিন্তু খুবই গরম। পট্টু—এটা পশমিনের পট্টু। বরফ পড়ে এমন জায়গার ভেড়ার লোমের ভেতর পশম হয়। হ্যাঁ খুব নরম। আসল পশমিনার প্রমাণ হল, মলমলের মতো পাতলা পশমিনাকে চার ভাঁজ করে জমে-যাওয়া ঘিয়ের ওপর রেখে দিলে আধঘণ্টার মধ্যে ঐ ঘি গলে যায়। হ্যাঁ, রামপুরের রাজাকে বড় রাজা বলা চলে। এদিকের পাহাড়ের চার গ্রামের রাজা। পাহাড়ী লোক বড় সাচ্চা হয়। কিন্তু আজকাল সমতলের লোকের সংসর্গে তারা কিছুটা চালাক হয়ে গেছে। নয়তো মিথ্যা কথা বলা ও চুরি করার নামও জানত না তারা। সাধু-সন্তদেরও খুব শ্রদ্ধা করে। হ্যাঁ, বুড়োবাবা, বদরী-কেদারের সড়কের ধারে চটীতে যারা দোকান করে, কতদিন তাদের শ্রদ্ধা বজায় থাকবে। ঐ রাস্তায় তো রোজ শত শত সাধু-সন্ত যাতায়াত করে।... হ্যাঁ, এই ঝোলায় এক গাঁজার কলকে, রুমাল, দেশলাই ও কিছু গাঁজা আছে।... আমার এক কমণ্ডলুই যথেষ্ট। তেষ্টা পেলে জল খাওয়া যায়। গ্রাম থাকলে ঘোল ও দুধ ভিক্ষা করে নিই।... রুটি বানানোর দরকার কি? আহারের সময় দুই চারটা বাড়ি ঘুরে এলে চারটা রুটি মিলে যায়। খেয়ে নিই।... এই কুকুর রামপুর রাজ্য থেকে আমার সঙ্গে সঙ্গে আসছে। বড় সৎ কুত্তা। রুটি বানিয়ে স্নান করতে অথবা হাতপা ধুতে চলে যান, ও বসে রুটিকে পাহারা দেবে। ওর পাশ দিয়ে অন্য কোনো কুকুর যেতে সাহস করবে না। খুব তাগড়া কুকুর। রুটি সামনে রেখে দিন, ও আড়চোখে দেখতে থাকবে কিন্তু 'খাও' না বলা পর্যন্ত ভুখা থেকে মরে যাবে কিন্তু রুটিতে মুখ লাগাবে না। এই কুত্তা সঙ্গীর কাজ দিয়ে আসছে।...'

ব্রহ্মচারীর কথা আমি সোৎসাহে শুনছিলাম। মন বলছিল—এ বাজিন্দার মতো মানুষ। হায়! আমিও যদি এর মতো ঘোরাফিরা করে থাকতে পারতাম। সন্ধ্যা হওয়ার আগেই তিনি অল্পক্ষণের জন্য ঘুরতে চলে গেলেন। পরে দেখলাম ঠিকাদারের মুন্সী 'জী মহারাজ' বলতে বলতে তাঁর পেছনে আসছে। ব্রহ্মচারী তাকে বললেন—'দেখ, এই দুজন শুকনো রুটি বানাচ্ছে। এদের জন্য একপো ঘি ও কিছু তরকারি-টরকারি পাঠিয়ে দাও। আচ্ছা নাও, প্রথমে এক ছিলিম গাঁজা তৈরী করো। টান দিলেই আপদ শেষ।'

ছিলিম তৈরী হল। পিতল মোড়া কাঠের লম্বা কলকেটা ধোঁয়াতে হলদে হয়ে যাওয়া রুমালে জড়িয়ে দূর পর্যন্ত বনস্থলীতে প্রতিধ্বনি তুলে বললেন, 'লেনা হো শংকর।... আ যা কৈলাসকে রাজা।' তারপর দম দিয়ে মালবীবাবার দিকে তাকিয়ে বললেন— 'বুড়ো বাবা, এসো। দম লাগাও। রুটি হতে থাকবে, গোটা রাতটাই তো আমাদের।'

দম দিয়ে মুন্সীজী আমাদের জন্য ঘি ও তরকারি দিয়ে গেল। ঠিকাদারের বাড়িতে ব্রহ্মচারীর নেমন্তন্ন ছিল। তিনি আরো কয়েকবার কলকেতে দম দিয়ে সেখানে চলে গেলেন। বেশ রাত করে ফিরলেন। বলতে লাগলেন চরস আর গাঁজা পাহাড়ে কোথায় পাওয়া যাবে। এখানে তো জঙ্গলের ভাঙ তার জঙ্গলের গাঁজা। হাতে ডলে ডলে ভাঙের রস বার করে নিলে তাতে চরসের কাজ চলে যায়। অনেক রাত পর্যন্ত কথাবার্তা চলতে থাকল। অধিকাংশ কথা ব্রহ্মচারীই বলছিলেন। মালবী বাবা কদাচিৎ কথা বলছিলেন। আমি বেশীর ভাগ 'হ্যাঁ,' 'হ্যাঁ' করছিলাম। আর কখনো কখনো জিজ্ঞাসার জন্য দুয়েকটা কথা বলছিলাম।

সকাল বেলা আমরা তিনজনই রাস্তায় চলতে শুরু করলাম। যমুনার বাম তীরের পাশ দিয়ে রাস্তা। দুপুরে এক জল চাকীর পাশে রান্নার সরঞ্জাম হতে লাগল। তখন ব্রহ্মচারী দেখলেন, কুত্তা গায়েব। তিনি কুত্তা খুঁজতে তিন-চার মাইল পেছনে চলে গেলেন। কিন্তু কুত্তা পেলেন না। ওকে আজ গরমে অস্থির মনে হচ্ছিল। যেখানেই জল দেখছিল, সেখানেই ও শরীরকে ভেজাতে যাচ্ছিল। ব্রহ্মচারী বলছিলেন, যে গ্রাম থেকে কুত্তা সঙ্গে আসছিল, সেখানে আরো বেশী ঠাণ্ডা। নিজের গ্রামের কথা মনে হতেই ও সেখানে ফিরে গেছে। আমরাও এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছলাম।

আমরা যতই এগোতে লাগলাম, ততই পাহাড়ের সবুজ ও ঝরণা বাড়তে লাগল। যমুনোত্রীর পাণ্ডার গ্রামে আমরা সন্ধ্যায় পৌঁছলাম। সেখানে চামড়ার দড়ি বাঁধা বাজনাগুলো এক মসৃণ সমতল জায়গায় রাখা হয়েছিল। সেখানকার লোকজন বলল, আজ স্ত্রী-পুরুষের নাচ হবে। এই কথা আমার কাছে কিছুটা অদ্ভুত লাগল। কেননা, আমার মনে হল পাণ্ডারা সপরিবারে নাচবে। গৃহস্থ স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলিত নাচ আমাদের দেশের গ্রামে ও শহরে খারাপ চোখে দেখা হয়। আমার মনে আছে যখন আমি নয়-দশ বছরের ছিলাম, তখন আমার সমবয়স্ক ও সম্পর্কে ভাই জগমোহনের বিয়ে হচ্ছিল। জগমোহনের ঠাকুরদা ছিল নামকরা সাহসী চোর ঘুরবিন আহীর। পরে সে গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে বলবান পুরুষ ও বিরহা গান গাওয়াতে কয়েকটা গ্রামের মধ্যে অদ্বিতীয় যুবক হয়েছিল। বরযাত্রী যাওয়ার দুই তিন দিন আগে থেকেই পূজা ও স্ত্রী আচার শুরু হয়ে যেত। সারাদিন আর রাতেও অনেকক্ষণ নাগাড়া বাজতে থাকত। আহীর বড় দিল খোলা জাত। উৎসাহ ও পরিশ্রমের সঙ্গে গরু মোষ পালন, চাষবাস করা এবং তারপর চিত্তবিনোদনের উপকরণও তাদের প্রয়োজন হত। সে চিত্তবিনোদন ছিল বিরহা ও লোরিকী গাওয়া এবং মাঝে মাঝে নাচা। যুবতী স্ত্রীলোকও নাচতে আসত। জগমোহনের মা কোনো কাজে বাড়ির বাইরে এসেছিল। গ্রাম সম্পর্কের কোনো দেওর তাকে ঠাট্টা করেছিল। এই বাহাদুর আহীর স্ত্রীলোক তা

কি করে সইবে। সে তৎক্ষণাৎ ময়দানে চলে এল এবং যতক্ষণ সামনের জোয়ান মরদেরা ক্লান্ত হয়ে পালিয়ে না গেল, ততক্ষণ সে নাচতে থাকল। সেই দিনের নাচ ও তা দেখে আমার আনন্দের কথা, আমি ভুলিনি। কনৈলা থেকে চলে আসার সময় থেকে যে শুষ্ক বৈরাগ্য চলছিল আজ হিমালয়ের ভূমিতে তা যখন কিছুটা সরস হয়ে আসছিল, তখনও পাগুা স্ত্রী-পুরুষের নাচের কথা কেমন যেন লাগল।

পরদিন চলতে চলতে যমুনার কিনারে সেখানে পৌঁছলাম। যেখানে দুটি পাথরের ওপর কাঠের পাটাতন দিয়ে পুল বানানো হয়েছে। সেখানে পাথরের ওপর কিছু লাল রক্ত লেগেছিল। জিগ্যেস করে জানলাম, কেউ পড়ে যাওয়ায় তার মাথা ফেটে গিয়েছিল। একথা আমি ঠিক মেনে নিতে পারিনি। কেন না এ জায়গাটা তেমন কঠিন ছিল না, যদিও আরো আগে অবশ্যই বেশ কঠিন রাস্তা পড়েছিল। বৃক্ষের কাণ্ডে ও শাখায় সবুজ কাপাসের বড় বড় টুকরো ঝুলছিল। যে সব জায়গায় বরফ পড়ে তার এই চিহ্ন। কিন্তু এই গাছ দেবদারুর মতো সুন্দর ছিল না। জল-ঝড় ছাড়াই আমরা যমুনোত্রী পৌঁছে গেলাম, সেজন্য আমরা ঈশ্বরকে অনেক ধন্যবাদ দিলাম। বৃষ্টি হলে শেষের দুই তিন মাইল যেতে আমাদের সত্যিই খুব মুশকিল হত।

যমুনোত্রীর উঁচু পাহাড়ে ঘেরা একটা ছোটমতো জায়গা, যার একটা দিক খোলা ছিল। জল ঐ দিক থেকে বইছিল। কিছু দূরে কয়েকশ ফুট উঁচুতে বরফ থেকে সদ্যোজাত দুইটি জলধারা নেমে আসছিল যা কয়েক পা গিয়ে এক হয়ে মিশে গিয়েছিল। বাঁ দিকের জল ধারার বাঁয়ে কিছুটা দূরে পাহাড়ের গোড়ায় পাথরের মধ্যে হাত দেড়েক লম্বা ও ততটা চওড়া এবং এক হাতের কিছুটা বেশী গভীর একটা কুণ্ড ছিল। জল এই কুণ্ডের মুখ পর্যন্ত ভরা ছিল না। এই যমুনোত্রীর তপ্ত কুণ্ড। কুণ্ডের কিনারায় সুতোর মতো একটা ধারা পিচকারির মতো ছুটছিল। কুণ্ডের গরম জলে রান্না করে খাওয়া তীর্থযাত্রীরা ধর্ম বলে মনে করত। আমরাও গামছায় আলু বেঁধে কুণ্ডের জলে ফেলে দিলাম। লুচি ভাজার জন্য যেমন কড়াইয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়, আমরাও তেমনি ছোট ছোট রুটি তৈরী করে গরম জলে ছেড়ে দিলাম। রুটি হয়েছে তা বোঝা যেত যখন জলের তলা থেকে রুটি ওপরে ভেসে উঠত। কুণ্ডের গরম জল ও বরফ গলা জল এক জায়গায় মেশানো হয়েছে। সেখানে যাত্রীরা স্নান করত। যমুনোত্রীর ঠাণ্ডায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই জলে পড়ে থাকতেই ইচ্ছা করত। যমুনোত্রীতে যমুনাজীর মন্দির কেমন ছিল তা মনে নেই। কিন্তু সেখানে দুয়েকটা দোকান ছিল যেখানে খাবার জিনিস কিনতে পাওয়া যেত।

যমুনোত্রীতে মালবীবাবার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হল। ব্রহ্মচারীর নির্দ্বন্দ্বতা, নানা দুরূহ স্থানে ভ্রমণ, কথাবার্তার বৈচিত্র্য, অধিকতর সংস্কৃতের ব্যবহার দেখে আমি তার দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলাম। যমুনোত্রী থেকে রওনা হওয়ার সময় আমাদের সঙ্গে এক মধ্য-বয়সী তৃতীয় ব্যক্তি যোগ দিয়েছিল। সে বাহুরাইচ জেলার মুরাও (কোইরী) ভগত। এখন পথ চলায় আমি আর আগের মতো ছিলাম না। হৃষিকেশে তো আমি ছিলাম দড়ি বেঁধে ওপরে টেনে তুলে নেওয়া মাথা ঝুলে পড়া মড়ার মতো। আমার পাও এখন ফুর্তিতে ব্রহ্মচারীর পায়ের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য তৈরী ছিল। চার পাঁচ মাইল যেতে না যেতেই আমরা আজকের পথচলতি সব যাত্রীকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেলাম।

এখন থেকে ত্রিশ বছর আগে আমার মনের আধারে যে ছাপ পড়েছিল, তার সাহায্যেই আমি হিমালয় ভ্রমণের এই বর্ণনা করছি। তারপর আর আমি এই রাস্তায় যাইনি। তাই ছায়া-ছায়া এই ছাপকে রঙ চড়িয়ে আমি এই ভ্রমণকে চটকদার করতে পারিনি। ঐ সময় আমি কোনো নোটও নিইনি। আর আজ (২৩·৪·৪০) জেলে বসে এই কাহিনী লেখার সময় আমার কাছে কোনো

ম্যাপ বা পথ প্রদর্শিকা বইও নেই, যার সাহায্যে আমি রাস্তা ও দূরত্ব সম্পর্কে কোনো বিশেষ জ্ঞান আহরণ করতে পারি। স্মৃতি প্রমাণ নয়, এতো ভারতের এক শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িকের কথা। অতএব পুরানো বাল্যস্মৃতির সাহায্যে লেখা এই বর্ণনা অনেক ক্ষেত্রে বাস্তবের বিপরীত হতে পারে।

যাহোক, মনে নেই কত মাইল চলার পর আমরা দুজন এক জায়গায় থামলাম। রান্না করার ভার ছিল আমার ওপর। মুরাও ভগত জল এনে দিত, আটা মেখে দিত। ব্রহ্মচারী তরকারি রান্না করায় সাহায্য করতেন। জানি না জঙ্গল থেকে কোন শাক তিনি এনে দিতেন। জলের ধারে এক বিঘৎ-এর চেয়ে কম লম্বা এই শাকের ডাঁটা ও হলদে মতো পাতার সবুজ অংশটা খেতে খুব ভাল লাগত। সেদিন বিকেলেই জানতে পারলাম যে, কয়েক মাইল পরে গঙ্গোত্রী যাওয়ার রাস্তাটা দু-ভাগ হয়ে যাবে। একটা তো পুরানো রাস্তা যা গঙ্গার কিনারে কিনারে ধরাসু হয়ে উত্তরকাশী ও পরে গঙ্গোত্রী চলে গেছে। আর দ্বিতীয় রাস্তাটি এখান থেকেই উত্তরকাশী গেছে। নয়া রাস্তায় গেলে দুই অথবা তিনদিন কম লাগে। কিন্তু তাতে আমার বা ব্রহ্মচারীর কোনো লোভ ছিল না তবু আমরা দ্বিতীয় রাস্তাই ধরলাম। কারণ আমরা শুনেছিলাম এই রাস্তা অনেক বেশী নির্জন, অব্যবহৃত ও বিপজ্জনক। আমরা এক বছরের রাস্তার চেয়ে ছয় মাসের রাস্তাকেই বেশী পছন্দ করতাম। মুরাও ভগতকে জিগ্যেস করায় সেও ছোট রাস্তায় যাওয়াই পছন্দ করল।

প্রথম রাস্তা ছেড়ে আমরা বাঁয়ে মোড় নিলাম। ৭টা বাজার আগেই আমরা শেষ গ্রাম ছাড়িয়ে এলাম। শুনলাম এর পরের গ্রাম আঠারো অথবা বিশ মাইল দূরে। আগেকার সময় হলে এতে আমার মন কেঁপে উঠত। রাস্তায় বেশী চড়াই-উতরাই ছিল না। আমরা পাকদণ্ডীর রাস্তায় চলছিলাম। রাস্তায় পদচিহ্ন ছাড়া মানুষের আর কোনো চিহ্ন ছিল না। বিশালকায় বৃক্ষের নিচে রঙ-বেরঙ ঔষধীর মাদকতাময় গন্ধ হাওয়া চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছিল। একেবারে সাপের ফণার মতো একটা চারাগাছ দেখিয়ে ব্রহ্মচারী বললেন, এর গোড়ায় সাপ থাকে। আমি তা পুরোপুরি বিশ্বাস করলাম। এতে বেদান্তের রজ্জুতে সর্পভ্রম হওয়ার ব্যাপার ছিল না। ঐ চারাগাছ একেবারে ষোল আনা সাপের ফণা বলেই মনে হয়েছিল। কয়েক মাইল যাওয়ার পর এক জায়গায় ধুনি জ্বলতে দেখলাম। কাঠের বড় গুঁড়ি তখন জ্বলছিল। আমরা ভাবলাম, রান্না করার সময় হিসেবে এখন অনেক সকাল। ব্রহ্মচারী ঝোলা খুললেন। ছিলিম তৈরী হল। তিনি 'বম বম' করে দম নিলেন। জনশূন্য বনস্থলীতে প্রতিধ্বনি হল। এক বিঘৎ না হলেও অন্তত চার আঙুল আগুনের শিখা কল্কের ওপর লাফিয়ে উঠল। 'ভগত, তুমি নাও' বলে কল্কে সঙ্গীকে দিলেন। আর একবার কল্কে পালটে কল্কে মাটিতে আস্তে ঠুকলেন। কল্কের ভেতরের গুলিটি উঠিয়ে আবার ভেতরে রাখলেন। কল্কে রুমালে জড়িয়ে ঝোলার ভেতর রেখে দিলেন। আবার আমরা পথ চলা শুরু করলাম। এগারটা নাগাদ বিশাল বৃক্ষের জঙ্গল শেষ হয়ে গেল। এখন এলাচি গাছের পাতাঅলা কেওড়া গাছের মতো ছোট ছোট বাঁকা-চোরা হয়ে যাওয়া গাছ দেখা যেতে লাগল। ব্রহ্মচারী বললেন, আমরা এখন আসল বরফের জায়গায় এসে গেলাম। আকাশে যখন তখন মেঘ দেখা যেতে লাগল। কিন্তু আমরা তার পরোয়া করিনি। আমরা শুকনো কাঠের খোঁজ করছিলাম। তা পাচ্ছিলাম না। তার ওপর খিদেও খুব বেড়ে যাচ্ছিল। যখন একটা পর্যন্ত সেই বাঁকা চোরা পাতলা গাছগুলো পাওয়া যেতে লাগল, তখন নিরুপায় হয়ে আমরা দেখতে শুকনো লাগছে এমন কাঠগুলো এক জায়গায় জড়ো করলাম। এমন শুকনো পাতা পেলাম না যাতে দেশলাই দিয়ে আগুন জ্বালানো যায়। মুরাও ভগতের পেতে শোওয়ার বস্তা ছিল। তা থেকে এক বিঘতের মতো কেটে নিয়ে আগুন দিলাম। বস্তায় তো আগুন জ্বলল। কিন্তু কাঠ একেবারে কালা, কিছু শুনছিল না। আমাদের এক বাক্স দেশলাই ও মুরাও ভগতের গোটা বস্তা শেষ হয়ে গেল,

কিন্তু তবু আগুন ধরানো গেলনা। হার মেনে এই চেষ্টা ছাড়তে হল। এ সময়ে মালবী ভগতকে আমার মনে পড়ে গেল। তিনি থাকলে তাঁর ঝোলা থেকে কিছু না কিছু খাওয়ার জিনিষ বেরোতো। আটা, আলু, কিছুটা ঘিও আমাদের সঙ্গে ছিল। কিন্তু তার জন্য আগুনের প্রয়োজন ছিল। মুরার ভগত বলল—আমার ঝোলায় গুড় মেশানো একপো ছাতু আছে, আর যা ছিল রাস্তায় খরচ হয়ে গেছে। ব্যাস, এইটুকুই অবশিষ্ট আছে। আমাদের দেহে প্রাণ ফিরে এল। মুরার ভগতকে সাবাসি দিলাম। ছাতু নিয়ে ঠিক তিন ভাগ করা হল। ব্রহ্মচারী আমাকে লোটার ভেতরে ছাতুতে জল দিতে বারণ করলেন। বললেন— আমি কমণ্ডলুতে ছাতু গুলে খেয়ে নিচ্ছি। তুমিও কমণ্ডলু ভর্তি জলে ছাতু গুলে খেয়ে নাও। পেট যতই ভরা থাকবে, ততই পা আগে চলবে। ছাতু কি, মনে হল দেবতারা না-ছোঁয়া অমৃত এখনই স্বর্গ থেকে পাঠিয়েছেন।

আরো দুই ঘণ্টা চলার পর পাহাড়ের একপাশে এক শূন্য কুঠিয়া দেখা গেল। রাত্রিতে আমরা যেখানে থাকব, সেখানে প্রথম পৌঁছে সাধু বললেন—'একবার রাত্রিতে আমি ঐ কুঠিয়ায় থেকেছিলাম। কখনো কখনো ওখানে রাখালরা থাকে। কিন্তু সেই রাত্রিতে কেউ ছিল না। কিন্তু যখন রাত্রিতে পাহাড়ের অন্য পাশে পঞ্চাশ কদম নিচে তাকালাম, তখন দেখলাম কয়েকটা ভালুক ও তাদের ছোট ছোট বাচ্চারা কোনো জিনিষের মূল খুঁড়ে খাচ্ছে। আমি ভয়ানক ভয় পেয়ে গেলাম। চুপচাপ এসে কুঠিয়ার এক কোণে পড়ে রইলাম। রাত্রিতে ঘুমের প্রশ্ন ছিল না। মনে হচ্ছিল, ভালুক এখনই আসছে। আর আমি এখানের এখানেই।'

সে যাই হোক, যদি আমাদের ঐ কুঠিয়ায় রাত কাটাতে হত, তবে আমরা অতটা ভয় পেতাম না। আমরা এক নয়, তিনজন ছিলাম। আমাদের মধ্যে মুরাও ভগতের কাছে ছিল শাবল, ব্রহ্মচারীর ছিল ছুঁচোল ও মাথায় লোহা-মোড়া লম্বা লাঠি। অবশ্য আমার কাছে কোনো অস্ত্র ছিল না। কিন্তু ব্রহ্মচারীর কথা শোনার পর একটা লাঠি আমি সর্বদা কাছে রাখতে লাগলাম। উৎরাই শুরু হল। প্রথমদিকের বেশীটা পথ পাহাড়ের পৃষ্ঠদেশে ছিল, সমতলভূমি বলে মনে হচ্ছিল। তারপর মানুষের পায়ে-চলা রাস্তা ও জলধারা বয়ে যাওয়ায় গভীর রাস্তা আরো বেশী মিলতে লাগল। খিদের তেজ প্রবল ছিল, ওই ছাতু তো ছিল গরম তাওয়ার ওপর দুই জল বিন্দু। তাহলেও এখন রাস্তার কাছাকাছি গ্রাম থাকার সম্ভাবনা ছিল। তাই মন ধৈর্য্য ধরতে তৈরী হয়ে রইল। সাড়ে চারটা নাগাদ আমরা গ্রামে পৌঁছে গেলাম।

গ্রামে ধর্মশালা ছিল না। এক গৃহস্থের একটা শূন্য ঘর হয়ত ছিল। তাতে আমাদের তিনজনেরও ঠাঁই হল। আমাদের পেটে খিদে কামড় দিচ্ছিল। কিন্তু পা কোনো অভিযোগ করেনি। ব্রহ্মচারী এক মিনিটও না থেমে 'তোমরা আরাম কর, আমি এখনই আসছি,' বলে চলে গেলেন। বড়জোর পনের বিশ মিনিট কাটাতে না কাটাতেই এক সের গরম গরম ভাজা গম ও আধপো গুড়ের ডেলা সঙ্গে নিয়ে ব্রহ্মচারী হাজির হলেন। বললেন, 'খাও খুব খাও। রুটির ফিকির করো না। এখনো বেলা আছে, আমি ভাবছিলাম, কিছুটা ঘোল যদি মিলে যায় তো ভাল। কিন্তু বিকেল ঘোলের সময় নয়।··· আমি সোজা গ্রামের প্রধানের ঘরে গেলাম। এমনি যোগাযোগ যে গ্রামের প্রধান নেপালী।নেপালের বাসিন্দা। কিন্তু এখানে বিয়েথা করে থেকে গেছে। আমি বললাম— প্রধান, তিন জন সাধু আজ সারাদিন না খেয়ে আছে। তোমার যা কিছু তৈরী আছে, প্রথম তাই দাও। ছাতুর জন্য গম ভাজা হচ্ছিল, সে তাই নিয়ে এল। পাহাড়ে গুড় মুক্তার দামে বিক্রি হয়। ওর বাড়িতে শুধু এইটুকুই ছিল।··· এখন খেয়ে নাও। আমি কথা বলার ফুরসত পেলাম কোথায়। তোমাদের পেটের ভেতর কি হচ্ছে, তা আমি ভাল করেই জানি।··· এখন যাব। আর রাত্রিতে ক্ষীর পরোটা খাওয়ার ইচ্ছে করছে।··· দুধ পাওয়া যাবে না কেন।'

রাত্রিতে সত্যিসত্যি ব্রহ্মচারী চার সের দুধ নিয়ে এলেন। প্রধানও এল। কিন্তু তার চেহারা—ছবি আমার মনে নেই। চিনি ছিল না। গুড় ইতিমধ্যেই আমরা শেষ করে ফেলেছিলাম। কিন্তু চিনি ছাড়াই ঐ ঘন নির্জলা ক্ষীর যার মধ্যে এক-চতুর্থাংশও চাল পড়েনি, খুব মিঠে লাগল।

পরদিন এক ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই আমরা ধরাসু যাওয়ার সড়কে পৌছলাম। ঐ দিনই উত্তরকাশী পৌঁছে গেলাম। মেঘ ও হাওয়ায় বড় ঠাণ্ডা লাগছিল। কিন্তু ধর্মশালায় গুড় ও চায়ের ঐ সদাব্রত ঠাণ্ডা দূর করতে সাহায্য করেছিল। মনে হয়, উত্তরকাশী গঙ্গার কিনারে এক উন্মুক্ত ভূমিতে ছিল। বেশ বড় ও সাদা শিব মন্দির। পাশের ধর্মশালাও খুব ভাল। সদাব্রত তো নিশ্চয়ই হয়েছিল। কোথায় ছিলাম, কতদিন ছিলাম, বাজার ও বসতি কত বড় ছিল তা বিস্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে গেছে।

সেখান থেকে কতদিনে গঙ্গোত্রী পৌঁছেছিলাম, তা মনে নেই। এটুকুই জানতে পারলাম, আমাদের রাস্তা গঙ্গার ডান দিকে ছিল, যার উপত্যকা দেবদারু গাছ শুরু হওয়া পর্যন্ত বেশ চওড়া ছিল। এখানের গ্রামে আখরোটের বড় বড় গাছ ছিল যাতে সবুজ ফল ধরেছিল। আমি ভেবেছিলাম, যখন এই ফলের রঙ হলুদ হয়ে যাবে, তখন ছেলেরা এই ফল আমের মতো ধরে চুষবে। দেবদারু গাছ শুরু হওয়ার আগে এক সড়কের কিনারে কিছু গাধা চরছিল, যা সাধারণত যেমন দেখা যায় তার চেয়ে কিছু বড়। রাস্তা থেকে একটু দূরে একটা ছোটমতো তাঁবু খাটানো ছিল। ব্রহ্মচারী আমাদের সঙ্গে নিয়ে সেখানে গেলেন। 'লামা' 'লামা' বলে তাঁবু-অলার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগলেন। আমার মনে হল, ও তিব্বতের নয়, নেপালের বাসিন্দা। ব্যবসা করতে এসেছে। ব্রহ্মচারী যখন জঙ বাহাদুর মহারাণার নাম করলেন, তখন তার মুখের হাসির রেখা কান পর্যন্ত বিস্তৃত হল, চোখ গালের ভেতর ঢুকে গেল এবং সে মুষ্টিবদ্ধ একটি হাত ওপরে তুলে জঙ বাহাদুরের তলোয়ারের শক্তির অভিনয় করে দেখাল। তার দেহের উচ্চতা ছয় ফুটের কম ছিল না। শরীরও চওড়া ছিল সেই অনুপাতে। ছেলেবেলায় দৈত্যের গল্প শুনেছিলাম, তাকে দেখে তো সেই দৈত্যের মতোই মনে হল। সেই সময় আমার ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে, তিব্বতের সবচেয়ে ছোট মানুষ এরকম হয়। চলে আসার সময় তার কাছ থেকে ব্রহ্মচারী 'চোরা' ও 'জিম্বুর' শেকড়বাকড় চাইলেন। এর মধ্যে প্রথমটিকে মনে হল পাতলা শেকড়, আর দ্বিতীয়টি কোনো একটা গাছের সবুজ পাতা। সেই রাত্রিতে ঘিয়ের সঙ্গে ওই শেকড়বাকড়ের একটা ফোড়ন দিয়ে আলুর তরকারি রান্না হল। তরকারিতে শুকনো লঙ্কা, নুন ও ঘি ছাড়া অন্য কোনো মশলা দেওয়া হয়নি। কিন্তু এই তরকারির যা স্বাদ হয়েছিল, তা আর কি বলব। ঐ সময়ে তা বললেও পাপ হত। আমার মনে হয়েছিল যেন রামদীন মামা তাঁর ডাকঘরের অফিসারকে খাওয়াবার জন্য মশলাদার পাঠার মাংস রান্না করেছেন।

সন্ধ্যায় আমরা দেবদারু ছায়ায় পৌঁছে গেলাম। সামনে সূর্য অস্তাচলে যাচ্ছিল, কিন্তু অন্ধকার বাড়ছিল না। আমার মনে হচ্ছিল, সূর্যের ভয়ে দেবদারুর ঘন সবুজ ছায়ার নিচে লুকিয়ে থাকা অন্ধকার সূর্যকে দুর্বল দেখে তাকে আক্রমণ করতে প্রস্তুত হচ্ছিল। বিশাল দেবদারু গাছ, শিবমন্দিরের শিখরের মতো সুঁচাল শীর্ষ, সহস্র বাহুর মতো সমকৌণিক শাখা চারদিকে ছড়িয়ে গেছে, লম্বা লম্বা পাতা, তার ওপর দেবদারুর মতো চিত্তাকর্ষক নাম, এই সব কিছু মিলে দেবদারুর সৌন্দর্যকে আমার কাছে বৃক্ষের সৌন্দর্যের মাপদণ্ড' হিসেবে দাঁড় করিয়েছিল। ত্রিশ বছর পরে আজও আমার সেই ধারণাই বজায় আছে। তখন দেবদারু গাছের নিচু থেকে বেরিয়ে

আসা যে হালকা সুগন্ধের ঘ্রাণ আমি নিয়েছিলাম সেই সুগন্ধ এখনো তেমনি টাটকা, যদিও আমি এখন দেবদারু থেকে কয়েকশ মাইল দূরে আছি।

দেবদারু বনে আমরা রাতটা কাটালাম। বনবিভাগের ঠিকাদারের লোকেরা কাছাকাছি দেবদারু কাঠ কেটে স্লীপার তৈরী করছিল।

পরদিন আমরা দেবদারুর আরো ঘন ছায়ার ভেতর দিয়ে চললাম। কোন নদী পার হতে হয়েছিল, মনে নেই। এক জায়গায় ওপরে যাওয়ার রাস্তা ছেড়ে ডান দিকে দিয়ে নিচে নেমে গেলাম। আমরা শুনেছিলাম যে ওপরের রাস্তায় এক ভয়ানক পুল পার হতে হয়। তাই আমরা নিচের রাস্তায় যাচ্ছিলাম। বেশ কিছু দূর যাওয়ার পর এক কাঠের পুল এল। ঐ পুল দিয়ে আমরা ভোটগঙ্গা পার হয়ে গেলাম। এবার অনেক দূর পর্যন্ত চড়াই শুরু হল। কিন্তু আমরা চড়াইয়ে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। আরো এগিয়ে যাওয়ার পর এক চৌকিদারের বাড়ির কাছে এলাম। সে আমাদের সতর্ক করে দিল যাতে যেখানে সেখানে আমরা আগুন না জ্বালাই। কারণ জঙ্গলে আগুন লেগে যাওয়ার ভয় আছে।

গঙ্গোত্রীতে আমরা যে ঘরে ছিলাম সেখানে শুধু সাধুই ছিলেন। তাদের সংখ্যা আট-নয় জনের বেশী ছিল না। মাঝখানে বড় বড় কাঠের ধূনী জ্বলছিল। আর ধূনীর পাশে নিজের নিজের আসনে সাধুরা বসে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কারু মাথায় ছিল লম্বা পিঙ্গল জটা, সারা দেহে বিভূতি, মালা ও ল্যাঙ্গট। নগ্ন দেহে আর কিছু ছিল না। কারু ঘাড় পর্যন্ত বাদামী চুল নেমে এসেছে, কানে স্ফটিকের মুদ্রা, কারু লাল ল্যাঙ্গট ও গর্দানে কালো পশমের মালা, কারু ন্যাড়া মাথা ও গায়ে লম্বা কুর্তা। বেশ-ভূষায় ভেদ থাকলেও এক ব্যাপারে সবাই ছিল একরকম, সেটা হল—গাঁজার রুমাল ও লম্বা কল্‌কে। গাঁজার কল্‌কে এক হাত থেকে আর এক হাতে যাচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে অন্য কল্‌কেও তৈরী হচ্ছিল। সেখানে গাঁজার দাম বেশি ছিল অথবা সস্তা ছিল, বলতে পারব না। নাকি নেপালের শিবরাত্রির মতো সেখানে সদাব্রত থেকেই গাঁজা পাওয়া যেত। সে যাই হোক ঝোলা থেকে গাঁজা বের করে দেওয়ার জন্য সাধুদের মধ্যে প্রতিযোগিতা লেগে ছিল। গঙ্গোত্রী ছিল একটি তীর্থ পথের শেষ সীমা। তাই প্রত্যেক ধর্ম-ইচ্ছুক গৃহস্থ সেখানে সাধু-সন্তদের ভোজন করিয়ে ও দক্ষিণা না দিয়ে থাকত না। আমার মনে হয়না যে দুই তিন দিন আমরা গঙ্গোত্রী ছিলাম আমাদের কোনদিন রান্না করতে হয়েছিল। প্রতিদিনই কোনো না কোনো দাতা-দাত্রীর পক্ষ থেকে পুরী-হালুয়া, মালপোয়া, মিঠাই আমাদের কাছে চলে আসত।

এখন এখানে আমি সাধুদের খুব কাছ থেকে দেখছিলাম। ওঁদের জমজমাট কল্‌কের মজলিশে তখনো আমি সামিল হইনি। তাঁদেরকে ব্রহ্ম-বেদান্তের চর্চায় লীন হতেও দেখিনি। তা সত্ত্বেও তাঁদের প্রতি আমার ঘৃণা অথবা উদাসীনতা প্রকাশ পায়নি। তাঁর কারণ এই নয় যে, আমি বেদান্ত ও বৈরাগ্যকে ভুলে গিয়েছিলাম। আমার মনে হয়, তাঁদের বেপরোয়া স্বচ্ছন্দ জীবন, তাঁদের একস্তরে এক সঙ্গে বসা, ভেদভাবশূন্য চলন, তাঁদের খাওয়া-দাওয়ায় ও খরচা করায় উদারতা, তাঁদের পথের কষ্ট আবাহন করতে উতলা হওয়া, আর তাঁদের কাল কি হবে, সে বিষয়ে উদাসীনতা এমনই নিরেট জিনিষ যে এই ছবির উলটো দিকে আমার নজর পড়েনি। ছাল ছাড়িয়ে নিলে ভেতরে কি পাওয়া যাবে তা আমি বলতে পারব না।

গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গনানী পর্যন্ত আমাদের আবার ফিরে আসতে হল। এই বার কাঠ ছাড়া রেলিঙ দেওয়া পাতলা পুল পেরিয়ে আমরা গঙ্গা পেরিয়ে গরম কুণ্ডে স্নানও করে এলাম। মনে নেই এ পুল অথবা আরো নিচে অন্য কোনো পুল পেরিয়ে আমরা কেদারনাথের রাস্তা

ধরেছিলাম কিনা। সম্ভবত আষাঢ় মাস ছিল। নদীর ওপরের খেতের ফসল কাটা হয়ে গিয়েছিল। খেতে গম গাছের লম্বা ডাঁটি দেখে তার তাৎপর্য আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। পরে জানা গেল এখানে শীষই কাটা হয়। বৃষ্টির আশংকা হলে ঐ শীষ বাড়ির ভেতরে রেখে দেওয়ার কোনো সমস্যা হবে না। বুড়া কেদারনাথের জন্য আমাদেরকে সমানে ওপর থেকে ওপরে উঠে যেতে হয়েছিল।

বুড়া কেদার খুব বড় জনপদ ছিল না। হ্যাঁ, তার কাছাকাছি খেত অনেক ছিল। মন্দিরের কথা মনে নেই। তবে এটা মনে আছে যে ব্রহ্মচারীর বক্তৃতায় প্রভাবিত হয়ে একদিন রাত্রিতে রুটি খাওয়ার সময় মাধুকরী চাইতে গিয়েছিলাম। একটা কি দুটো দরজায় গিয়েছিলাম। আর প্রত্যেক ঘর থেকে ছোট বড় একটা করে রুটি মিলেছিল। এই সময়ে কুকুরগুলো ডাকতে ডাকতে ছুটে এল। সেখান থেকেই আমি উল্টোদিকে ফিরে এলাম। তারপর আর আমি কখনো মাধুকরী করার নাম নিইনি।

বুড়া কেদারের পর আমার শরীর কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়ে। জ্বর আসতে থাকে। দুয়েকদিন এগিয়ে যাওয়ার পর আমি আর ব্রহ্মচারীর সঙ্গে পা-মিলিয়ে চলতে পারছিলাম না। ব্রহ্মচারীকে আমি নিজের অবস্থা বলেছিলাম কিন্তু তিনি কোনো খেয়াল করেননি। একদিন আমি চার পাঁচ মাইল যেতে যেতে আর এগোতে পারলাম না। পাশে এক ব্রাহ্মণের ঘর ছিল। নিচে গরু বলদ বেঁধে রাখার জায়গা। আর ওপরে মানুষের থাকার জন্য সাফ-সুতরো কামরা। বাড়ির চারদিকে বেরিয়ে থাকা বারান্দা। বাড়িতে কোন এক নওজোয়ান ছেলে ছিল। সে আমার অবস্থা দেখে বাড়িতে ডাকল। অনেক কষ্টে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেলাম। সেখানেই বারান্দায় কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। ক্লান্তি দূর হওয়ার পর নিজেকে কিছুটা সুস্থ মনে হতে লাগল। ঐ ঘরে আমি তুলসীদাসের রামায়ণ দেখেছিলাম। রামায়ণের চৌপদী ওখানেও পড়া হতো। দুই ঘণ্টা বিশ্রামের পর ব্রহ্মচারীর আগে চলার চিন্তা বাড়তে লাগল। আমি সাহস করে চলাটাই পছন্দ করলাম। বড় জোর এক মাইলের মতো যেতে পেরেছিলাম। কিন্তু তারপর পা আবার জবাব দিয়ে দিল। চড়াইয়ের রাস্তা। তাই শরীরকে ওপরে তোলা বড় কষ্টসাধ্য মনে হচ্ছিল। সামনের গ্রাম অনেকটা দূরে। সেজন্য রাস্তা থেকে একটু নিচে একটা গ্রামের শূন্য মণ্ডপে কম্বল বিছিয়ে পড়ে রইলাম। কিছু পরে তেষ্টা পাওয়ায় মাল ওখানে ফেলে দূরের ঝরণায় জল খেতে গেলাম। এরই মধ্যে ব্রহ্মচারী এলেন। তিনি আমার আসার জন্যও অপেক্ষা করলেন না। জিগ্যেস করা দূরে থাক, নিজের কম্বল যা আমি বহন করছিলাম, নিয়ে চলে গেলেন। এই ব্যবহারে আমার আপসোস হয়েছিল। কিন্তু কি করতাম ব্রহ্মচারীর সঙ্গে তার পরে আর দেখা হয়নি। আমি এখন আর আগের মতো দ্রুত চলতেও পারছিলাম না।

পরদিন রাস্তায় কোটার তিন-চার জন গৃহস্থের সঙ্গে দেখা হল। তাদের মাথায় তেরছা করে বাঁধা বড় ছিট কাপড়ের পাগড়ী। পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত নেমে আসা মাল-কোঁচা দিয়ে পরা ধুতি ও মুক্তার কানবালা আজও মনে আছে। এই যাত্রীগোষ্ঠীর প্রধানের পাশে ক্যানভাসের একটা ছোট মশক ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। তারা আমাকে তাদের সঙ্গে খেতেও যেতে বলল। তাদের পাচকের কাজটাও করতে বলল। ধর্মশালা সদাব্রত থেকে দূরে ঐ পথে আমার মতো ভিক্ষাভীরু লোকের কাছে এর চেয়ে ভাল প্রস্তাব আর কি হতে পারত। আমাদের একটা বিশ্রামস্থল ছিল পাহাড়ের ওপর রাখালদের একটা ঝুপড়িতে। নুন দিয়ে আটার রুটি ও কলাইয়ের ডাল রান্না করলাম আমি। আমাদের চারদিকে জঙ্গল। সেখানে বাঘ-ভালুকের বাস। জঙ্গলের বাঘ সম্পর্কে কথাবার্তা হতে লাগল। এক রাখাল বলছিল—বাঘের বাপ কোকী (জংলী কুকুর)। পঁচিশ

পঞ্চাশেক কোকী জোট বেঁধে একসঙ্গে চলে। আক্রমণও করে একসঙ্গে। বাঘও ওদের কাছ থেকে বেঁচে যেতে পারে না, গরু-মোষের তো কথাই নেই।

তিরযুগী নারায়ণ যাওয়ার আগে বৃক্ষশূন্য কিন্তু ঘাসে ঢাকা পাহাড়ে পায়ের বুড়ো আঙুলের মতো মোটা কালো কালো জোঁক দেখলাম। আমার জোঁকের ভয় ছিল না। অনেক লোক ছোট ছোট জোঁক দেখেও ভয় পায়। এই ডবল জোঁক দেখলে ওদের তো দমই বন্ধ হয়ে যাবে।

তিরযুগী নারায়ণ কেদারনাথের রাস্তা থেকে কিছুটা ওপরে উঠে যেতে হয়। সব যাত্রীকেই সেখানে যেতে হয়। তিরযুগী নারায়ণ এরকম প্রধান রাস্তার ওপরে। এখানে কালীকমলীঅলার সদাব্রত ছিল। কিন্তু কোটার শেঠের সঙ্গে ছিলাম বলে এবার আমার সদাব্রতের প্রয়োজন হয়নি।

তিরযুগী নারায়ণ থেকে উৎরাই দিয়ে নেমে এসে আবার কেদারনাথের প্রধান সড়কে এলাম। নদী পার হওয়ার সময় দেখলাম ঝুলার পুল ভাঙা। পাশেই অস্থায়ী দড়ির ঝুলা বাঁধা হয়েছিল। যাত্রীরা শোনা কথা বলছিল যে একবার অনেক লোক একসঙ্গে এই ঝুলায় উঠেছিল, তাই লোহার তারের এই ঝুলা ভেঙে গিয়েছিল। অনেক মানুষের লাশ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। সেই রাত আমরা গৌরীকুণ্ডে কাটালাম। সেখানকার গন্ধকভরা, হলুদ শীতল জলের ঝরণা ও কালো গরম জলের ঝরণায় লোক স্নান করছিল। পাশে একটা ভাল ধর্মশালাও ছিল। সেখানে কোনো নেপালী রানী ছিলেন। লোকেরা ভিক্ষা চাইতে যাচ্ছিল। ভিখিরীদের আবার কি! একজন যদি কোথাও কিছু পেল, তবে সেখানে পঁচিশ জন চলে যায়। কিন্তু দাতার শ্রদ্ধা ও টাকার থলিরও একটা পরিমাণ থাকে। দেখা-দেখি আমিও ভাগ্যপরীক্ষায় সামিল হলাম। সংকুচিত ও লজ্জিত হয়ে আস্তে আস্তে কয়েকবার বলেছিলাম, 'রানীজী কিছু মিলবে।' আর আমার মনে নেই রানীজী আমাকে কি দিয়েছিলেন। জীবনে দীনের মতো ভিক্ষা করার এই আমার প্রথম ও শেষ প্রয়াস।

গৌরীকুণ্ড থেকে চড়াই দিয়ে উঠে লামবগড়ে পৌঁছলাম। সেখান থেকে কেদারনাথ পাঁচ ছয় মাইল । ফিরে আসা যাত্রীরা কেদারনাথের ঠাণ্ডার কথা এমন বাড়িয়ে বলছিল যে নতুন যাত্রীরা ঘাবড়ে যাচ্ছিল। অধিকাংশ যাত্রী দুপুরে লামবগড়ে পৌঁছেও সেখান থেকে আগে যেতনা। প্রত্যেক যাত্রীই চাইত মালপত্র ওখানেই রেখে সাধারণ কাপড়-চোপড় নিয়ে কেদারনাথের দর্শন করে বিকেল নাগাদ লামবগড় ফিরে আসতে। আমার কাছে এমন কিছু মালপত্র ছিল না যা রেখে যাওয়া যেত। তাছাড়া আমি যমুনোত্রীর মার খেয়েছিলাম, যেখানকার রাস্তা আরো বেশী কঠিন।

লামবগড় থেকে রাস্তা নদীর (মন্দাকিনী) ডানদিকে। শুধু চড়াই আর চড়াই। কিন্তু চড়াই ততটা কঠিন ছিল না। কিছুটা আগে যাওয়ার পর উপত্যকা আরো চওড়া হয়ে গেল। বরফ গলে গিয়েছিল। বর্ষা এসে যাওয়ায় পাহাড়ের চারদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ। লামবগড় থেকে কতদূর পর্যন্ত গাছ ছিল, বলতে পারব না। কিন্তু শেষ দিকে বৃক্ষহীন ও ঘাসে ঢাকা ভূমি ছিল। খাড়া চড়াই না হওয়া সত্ত্বেও বেশ হাঁপানি হচ্ছিল। লোকেরা বলছিল, বিষাক্ত জড়ীবুটির প্রভাব। আমার ভূগোল বইয়ে অন্যান্য উঁচু জায়গার সঙ্গে এই জায়গার বর্ণনা আছে কিনা বলতে পারব না। কেদারনাথের জনবসতির কাছে পৌঁছনোর পর পুল পেরিয়ে মন্দাকিনীর বাঁ দিকে যেতে হল।

ঘটনাক্রমে আমার কোটার বাসিন্দা শেঠ কোনো পাণ্ডার কাছে না থেকে কালীকমলীঅলার ধর্মশালায় ওঠেন। অন্যান্য বাড়ি থেকে এই ধর্মশালা বেশী পরিচ্ছন্ন ও আরামদায়ক। দুই মহলা এই বাড়িতে টিন ও স্লেটের ছাউনি। সিঁড়ি দিয়ে নামার পর ডান দিকের ওপর ও নীচ দুইই

ধর্মশালার কর্মচারীদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। বাঁ দিকটা ছিল যাত্রীদের জন্য। মনে হয় আমরা বাঁ দিকে নিচের কোনো কামরায় ছিলাম। এখন আমরা প্রধান যাত্রাপথে চলে এসেছি যেখানে ধর্মশালা ও সদাব্রত সুলভ ছিল। রান্না করতে করতে শেঠের ইচ্ছামতো চলা আমার পছন্দ হয়নি। বরং সাধুদের বেপরোয়া পথচলা আমার বেশী ভাল লাগত। তাই এখান থেকে রান্না করার কাজ ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। ঐ দিনই রাত্রিতে ওপরের বারান্দায় রামায়ণের পাঠ হচ্ছিল। মনে হয় রামায়ণ পাঠ প্রথম দুই তিন জন সাধু শুরু করেন। গান নয়, অর্থের সঙ্গে চৌপদীর কিছুটা সুর দিয়ে পাঠ। পাঠ অন্য কেউ করছিলেন। অর্থ আমি করছিলাম। উত্তরাকাণ্ডের জ্ঞানদীপক প্রকরণ ছিল। কিছু পরে আরো মহাত্মারা এলেন যাঁদের মধ্যে সদাব্রতের অধ্যক্ষ উদাসীন বাবা ধর্মদাসও ছিলেন। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর অর্থ করার কাজ তিনি নিজের হাতে নিলেন। অর্থ করার সময় তিনি মাঝে মাঝে উপনিষদের বাক্য বলছিলেন। তিনি আত্মার স্বরূপকে 'অণুবো রণিয়ান মহিতো মহীয়ান' শ্রুতিবাক্যের দ্বারা প্রতিপাদন করতে শুরু করলেন। তাতে ওঁর বিদ্বত্তার যে ছাপ আমার ওপর পড়ল তা বর্ণনা করা যায় না। আমি কি জানতাম যে তিনি শ্রুতিবাক্যের অত অশুদ্ধ উচ্চারণ করছিলেন। যে শ্রুতিবাক্য তিনি স্থানে অস্থানে ফরফর করে আবৃত্তি করছিলেন, তা তিনি না বুঝে তোতাপাখির মতো মুখস্থ করে রেখেছিলেন। এই তাঁর সারা জীবনের পুঁজি।

কথা সমাপ্ত হওয়ার পর মহাত্মা ধর্মদাস আমাকে কিছু প্রশ্ন করেন। সাধু হওয়ার ব্যাপারে জিগ্যেস করায় আমি বললাম, 'সাধু তো আমাকে হতেই হবে। কিন্তু আগে সংস্কৃত ও বেদান্তগ্রন্থ পড়ে নেব তার পর।' তিনি বললেন, 'তাহলে তুমি হৃষিকেশ অথবা হরিদ্বারে থেকে গেলে না কেন?' 'সেখানে লেখাপড়ার কোনো সুযোগ সুবিধা তো হল না'—এই উত্তর দেওয়ায় তিনি বললেন—'দুই চারদিন থেকে খোঁজ করলে সুযোগ হয়ে যাওয়া মুশকিল ছিল না। আচ্ছা, তুমি দুইচারদিন আমার কাছে থাক। কাল চলে যেওনা। পরে আমরা এ ব্যাপারে কথা বলব।' আমার কাছে যে কম্বল ছিল তা কেদারনাথের ঠাণ্ডার জন্য যথেষ্ট ছিল না। সেই জন্য তিনি একটা মোটা কম্বল দিলেন। সঙ্গীদের সাথেই রাত কাটালাম।

পরদিন শেঠ চলে গেলেন। আমি ধর্মদাসজীর বৈঠকখানায় গেলাম। একটা বারান্দার পেছনে দুটো কামরা ছিল। একটাতে সদাব্রতের জন্য দেওয়ার জিনিষপত্র ছিল। সব মালপত্রের জন্য নিচে গুদাম ছিল। অন্য কামরায় যাত্রীদের রাত্রির জন্য যে লেপ কম্বল দেওয়া হত তা ছিল। তাছাড়াও ছিল ধর্মদাসজীর বিছানা। দিনের বেশীর ভাগ সময় তিনি নিজের কামরার সামনে বাইরের বারান্দায় মোটা গদীঅলা আসনে মোটা কাপড়ের কোট-পায়জামা ও কানঢাকা টুপী পরে ও সারা শরীর কম্বলে জড়িয়ে পড়ে থাকতেন। মৃদু বাতাস বইলেও সামনের জানালা বন্ধ করে দিতেন। তাতে ওখানে অন্ধকার হয়ে যেত। সামনে ধূমহীন চুলাতে আগুন পড়ে থাকত। ধর্মদাসজী গাঁজা কিংবা তামাক খেতেন না। গুড়, ঘি, আটা, চাল, ডালের সঙ্গে চা-ও সদাব্রত থেকে দেওয়া হত। কিন্তু তাঁর চায়েরও বিশেষ অভ্যাস ছিল না। তবে মাঝে মাঝে দুয়েক গ্লাস চা ঠিকই খেতেন। সিঁড়ির পাশের বারান্দার বাকী অর্ধেকটায় সদাব্রতের জিনিষ রেখে সেগুলো দেওয়ার জন্য দুজন চাকর বসে থাকত। তাদের একজনের নাম ছিল নৎথরাম, অন্য লোকটির নাম মনে নেই।

৩

হিমালয় (২)

পরের দুই তিন দিনের আলোচনার পর স্থির হল যে, পড়াশোনার জন্য আমাকে আর বারাণসীতে ফিরে যেতে হবে না। বাড়ি থেকে বিপদ আসতে পারে, এই ধারণা আমার মনে দানা বেঁধে ছিল। ধর্মদাসজী বললেন, 'সেপ্টেম্বর-অকটোবর নাগাদ যাত্রার সময় এসে যাবে। তখন আমি আবার হৃষিকেশ যাব। তখন তুমিও যাবে। কিন্তু তোমার বদ্রীনাথ দর্শন বাকী থেকে গেছে। বদ্রীনাথ হয়ে যাবে। হৃষিকেশ-এ তোমার সংস্কৃত পড়ার ব্যবস্থা করে দেব। তারপর পড়াশোনা করে তোমার ইচ্ছা হলে সাধু হবে।'

আর কি চাওয়ার থাকতে পারে আমার? কেদারনাথে সত্যিসত্যি প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। কেদারনাথের তুলনায় গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রীর ঠাণ্ডা কিছুই নয়। যে বরফ-গলা জলের তোড় মন্দাকিনী থেকে ছুটে আসছিল প্রথম দিন আমিও তাতে স্নান করেছিলাম। দ্বিতীয় দিন আমাকে স্নান করতে যেতে দেখে ধর্মদাসজী আমার সঙ্গে একজন লোক দিয়েছিলেন। সে আমাকে পূবদিকে পাহাড়ের গোড়ায় স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ জলের ঝরণাতে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানেও আমি দুয়েকদিন স্নান করতে গিয়েছিলাম। পরে দেখলাম ধর্মদাস ও তাঁর দুই কর্মচারী সকালে গরম জলে হাতমুখ ধুয়ে মন্ত্রস্নান করে নিচ্ছেন। তাঁরা আমাকেও বললেন—'এখানকার ঠাণ্ডা সাধারণ নয়। দুয়েকদিনের কথা হলে কোনো পরোয়া ছিল না। বেশী ঠাণ্ডা জলে স্নান করলে অসুখ করার ভয় থাকে।' তাঁর ব্রাহ্মণ কর্মচারী অধ্যক্ষের কথা সমর্থন করে বললেন, 'নিচের দেশে গঙ্গাজলে যতটা পাপশুদ্ধি হয় না, এখানে কৈলাশ খণ্ডের হাওয়া শরীরে লাগলেই তা হয়ে যায়।'

'বেড়ালের ভাগ্যে শিকা ছিড়ল।'—তিন চার দিন হিম শীতল জলে শরীর ভিজিয়ে যে কষ্ট হচ্ছিল, তা আমিই জানতাম। তারপর থেকে আমিও সহবাসীদের অনুকরণ শুরু করে দিলাম। বাবা আমার জন্যও সাদা কাপড়ের একটা মোটা কোট, পশমের পায়জামা, গরম কানঢাকা টুপী দিলেন। চলাফেরার জন্য গরম মোজা ও লুধিয়ানার লাল জুতাও দিলেন।

বাবা ধর্মদাস ছিলেন পাঞ্জাবী। কিন্তু তিনি ভারতের অনেক জায়গায় ঘুরেছেন। তাঁর বয়স ৫৪-৫৫ র মতো। বোল চালে অত্যন্ত চতুর। ঐদিন কথকতায় শ্রুতির উচ্চারণের সময় তাঁর জিহ্বায় হয়তো সরস্বতী ভর করেছিল। কিন্তু পরে আর তিনি পণ্ডিতী ফলাতে চাননি। স্পষ্ট স্বীকার করতেন যে, তিনি সংস্কৃত পড়েননি। বিচারসাগর, রামায়ণ, যোগওয়াশিষ্টের মতো কিছু গ্রন্থ হিন্দিতে পড়েছিলেন। এই স্পষ্টভাষণ আমাকে খুব প্রভাবিত করেছিল।

হরিদ্বারের পরে অথবা হয়ত তার আগেই আমার ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিকে কিছুটা ঢিলা পড়েছিল। কেন তা হয়েছিল? ভ্রমণের আকর্ষণের প্রভাব হয়তো আমার বৈরাগ্যের ওপর পড়েছিল। হয়তো সাধুদের জীবনযাত্রা ও আচরণ দেখে আমার চরমপন্থা কিছু আলগা হয়ে গিয়েছিল। অথবা ক্রমাগত পথচলার কারণে অবকাশও কম পাচ্ছিলাম। কয়েকমাসের জন্য এখন কেদারনাথ-এ স্থির হয়ে থাকতে হবে। তাই এখানে জীবনচর্যায়ও কিছু পরিবর্তন করার ছিল। রামায়ণ, বিচারসাগর, গুরুমুখী পঞ্চীগ্রন্থী ছাড়া বাবার কাছে শিবপুরাণের একটি হিন্দি টীকা ছিল। গুরুমুখী নতুন লিপি। কিন্তু দুই তিন দিনেই পঞ্চীগ্রন্থীর "১ ওঁ সতিগুরুপ্রসাদ..."-কে আমি

পড়তে লাগলাম। বিচার সাগর ও রামায়ণ অনেকবার পড়েছিলাম। তাই এই দুই বইয়ের ওপর বেশী সময় দিতে পারিনি। তবে দুপুরে খাওয়ার পর দুই তিন-ঘণ্টা শিবপুরাণের পাঠ চলত। সংস্কৃতের শ্লোকপড়া হত। তার পর পড়া হত তার হিন্দী টীকা। যত্রতত্র সংস্কৃতের কোনো কোনো শব্দের অর্থ বুঝতে পারতাম। কিন্তু হিন্দি ভাষান্তরেই কাজ চলে যেত। পাঠের সময় বাবাজী ছাড়া দুয়েকজন গ্রামবাসী পাণ্ডা এবং কর্মচারীদের মধ্যে কোন একজন থাকতেন। যাই হোক, সেখানে পাঠ শোনার আমার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না, আমি পাঠের রসাস্বাদন করতাম। নিজের অজ্ঞাতে বিস্মৃত, অলক্ষিত শিবলিঙ্গের ওপর গাছ থেকে বেলপাতা পড়ায় শংকরের দূত ঘোর পাপীকে স্বর্গে নিয়ে যেতে এসেছিল -এই কথা শুনে শংকরের প্রতি অতিরিক্ত শ্রদ্ধা জেগেছিল, তা বলা চলে না। কয়েক বছর আগে বছওয়ল-এ হাতেমতাই ও আরাইসে-মহফিল পড়ে আমার যে আনন্দ হয়েছিল, এই কাহিনী শুনেও তাই হয়েছিল।

বই পড়া এবং বাবার কাছে ভ্রমণের ও বেদান্তের কথা শোনা ছাড়া আমার কাজ ছিল আশেপাশের পাহাড়ে ঘুরতে যাওয়া। নিচের সবটা উপত্যকা এবং পূর্বদিকে অনেক দূর পর্যন্ত চলে যাওয়া অধিত্যকার সবুজ ঘাস ও রঙবেরঙের ফুলে ঢাকা ওষধির কার্পেট বিছানো ছিল। নাথুরামকে নিয়ে আমি প্রায়ই বেড়াতে যেতাম। পাহাড়ে অধিত্যকা থেকে কতবার আমি নিচের দিকে সেই অবধি গিয়েছি যেখানে ছোট ছোট গাছের শুরু। ওপরের দিক 'সৎপথ' শুরু হয়েছে যে পাহাড় থেকে, তা অনেকটা ছাড়িয়ে কয়েকবার গিয়েছি। প্রথম বার যখন আমরা দুইজন ঐ দিকে যাচ্ছিলাম, তখন ভেড়ার পালের মধ্য থেকে এক মাঝবয়সী মানুষ ডাকল। নাথুরাম তার কাছে গেল। ফিরে এসে বলল—'এখান থেকে আগে যাওয়া বারণ। পাণ্ডবেরা এই রাস্তায়ই হিমালয়ে গলতে গিয়েছিল। কত লোক এদিক দিয়ে যেত—তারা, পথেই গলে যায়। গলে গেলে মৃত্যুর পর, নয়তো সশীরেরই স্বর্গে পৌঁছে যেত। হ্যাঁ স্বর্গ এদিকেই।' প্রধান জিগ্যেস করছিল, 'আপনি সৎপথে যেতে চাচ্ছেন না তো। সরকারের পক্ষ থেকে নিষেধই আছে।'

'সৎপথে' যাওয়ার কোনো বাসনা আমার ছিল না। 'স্বর্গ এদিকেই'-র বিরুদ্ধে আমার ভূগোল জ্ঞান কতটা বিদ্রোহ করেছিল, তা আমার মনে নেই। একটা বিশাল চাটানের ওপর ত্রিশূল ও অন্য কিছুর চিহ্ন আঁকা দেখলাম। নাথুরাম বলছিল যে আগেকার 'সৎপথ' যাত্রীরা নিজেদের এই সব চিহ্ন ছেড়ে গেছে। ফেরার পথে আমরা সুন্দর সুন্দর ফুলের ও পাতার তোড়া বানিয়ে নিয়ে আসতাম।

প্রথম প্রতিদিন ও পরে সোমবার সোমবার আমি কেদারনাথ দর্শন করতে যেতাম। পাথরের মন্দির। এখন পর্যন্ত হিমালয়ে যে সব মন্দির দেখেছি তার চেয়ে বড়। কলস ও চূড়ায় কি ধাতু ছিল, মনে নেই। তবে মন্দির চূড়াঅলা ছিল। মন্দিরের বাইরে সম্ভবত সভামণ্ডপ ছিলনা। ভেতরে লিঙ্গের জায়গায় এবড়ো-খেবড়ো পাথরের একটি মহিষপৃষ্ঠাকার লিঙ্গ ছিল। কিংবদন্তি আছে যে, শংকরজী মোষের রূপ ধরে উপত্যকায় চরে বেড়াচ্ছেন শুনে পাণ্ডবেরা তাঁকে ধরতে যান। ভীম দুই পাহাড়ের ওপর দুই পা রেখে দাঁড়িয়ে যান তাঁর পায়ের তলা দিয়ে যে মোষ যাবে না, তাঁকেই শংকরজী মনে করে পাকড়াও করা হবে। শংকর সত্যি সত্যি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। পাণ্ডব তাঁকে ধরার জন্য হাত বাড়ালেন। কিন্তু ঐ জায়গায়ই শংকর অন্তর্ধান হতে লাগলেন। শুধু তাঁর পিঠ মাটির ওপর জেগে রইল। সেটাই এই কেদারনাথ মহাদেব, যিনি দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের এক। শংকরকে যে ভোগ-শিব নৈর্মাল্য দেওয়া হয়, তা খেতে নেই, একথা ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি। কিন্তু এখানে প্রায়ই শিবজীর প্রসাদ রাওয়ল-এর (কেদারনাথের দক্ষিণী প্রধান পূজারী) কাছ থেকে আসতে দেখে বাবাকে জিগ্যেস করায় তিনি বললেন—জ্যোতির্লিঙ্গ ও নর্মদেশ্বরের (নর্মদা থেকে নির্গত) প্রসাদ গ্রহণ করায় কোনো বাধা নেই।

মন্দিরের রাওয়ল-এর মতো কালীকমলিঅলার সদাব্রতের অধ্যক্ষ বাবা ধর্মদাসও কেদারনাথের প্রধান ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন। রাওয়লও প্রায় তাঁর কাছে আসতেন। শ্রাবণ মাসে বিশেষভাবে কেদারনাথের পূজা দেওয়া হত। ঐ সময় এক ধরনের পদ্ম ('হিমকমল') কেদারনাথকে প্রচুর দেওয়া হত। আমাদের বাবাজীও প্রত্যেক সোমবার লোক পাঠিয়ে টুকরি ভর্তি পদ্ম আনাতেন এবং পরম ভক্তিভরে তা শংকরকে দিতেন। 'পরসে তুহিন তামরস জৈসে'—এই চৌপদী আমার মনে ছিল এবং হিমালয়ে পদ্ম জন্মায়, তাও আমি মেনে নিতে পারিনি। কিন্তু লোকজনেরা এই ফুলকে কমলই বলতে চাইত এবং বলত বরফ গলে যাওয়ার পর পশ্চিম দিকের পাহাড়ের পেছনে একটা বিশাল ঝিলে এই পদ্ম জন্মায়। পশ্চিমের এই ঝিল আমি দেখতে যেতে পারিনি। কিন্তু উত্তর দিকে একদিন নাথুরামের সঙ্গে অনেক দূর পর্যন্ত গিয়েছিলাম। সেখানে হালকা হাওয়ায় শ্বাস নিতে বড় কষ্ট হচ্ছিল। আমরা সেখানকার বরফও পার হয়ে গিয়েছিলাম। যার নিচ থেকে মন্দাকিনীর ধারা আসছিল। আরো আগে ঈষৎ সবুজ স্বচ্ছ জলের ছোটমতো ঝিল দেখলাম। আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তাই একটা চাটানের ওপর শুয়ে পড়লাম। ঘুমও এসে গেল। কিন্তু নাথুরাম আরো আগে ঘুরতে গেল। সে ফিরে আসার পর আমরা দুজন একসঙ্গে ফিরলাম।

জানুআরিতে কেদারনাথে গরু-বলদ ছাড়া টাট্টু ও কুকুর যথেষ্ট দেখা যেত। মালপত্র বয়ে আনা-নেয়ার জন্য ছিল টাট্টু। ডাণ্ডী, ঝাপান ও খাটোলাতেও কাউকে কাউকে চড়া অবস্থায় নিশ্চয় দেখেছি। কিন্তু ঘোড়ায় সওয়ার কোনো যাত্রীকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। কুকুরের গলায় চার-ছয় আঙ্গুল চওড়া লোহা অথবা পিতলের বকলস ছিল। এখানকার লোকজন বলেছিল, ওটা থাকলে কুকুরকে নেকড়ে বাঘও কাবু করতে পারে না।

কেদারনাথে দুই-তিন সপ্তাহ কেটে গিয়েছিল। এই সময় আমি অন্ধকার জায়গায় আমার আসনে বসে দেখলাম, এক সাধুর সঙ্গে একটা ছেলে—অন্য কেউ নয় আমারই বাল্যবন্ধু যাগেশ—সদাব্রত নিতে এল। ওর কাছে দুটোর বেশী কুপন ছিল। সদাব্রত দেওয়ার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী লোক না দেখে সদাব্রতের জিনিষ দিতে রাজী হয়নি। সাধু তাই সঙ্গীদের নিয়ে আসার জন্য যাগেশকে পাঠালেন। যাগেশ সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাওয়ার পর আমিও চুপিচুপি সিঁড়ি দিয়ে নেমে ওর পেছনে চললাম। যাগেশের কাছে একটা ধুতি, সুতীর কুর্তা অথবা কোট ছিল। মাথা ও পায়ে কিছু ছিল না। আর আমি মাথা থেকে পা পর্যন্ত গরম কাপড়ে বোঝাই ছিলাম। দুই তিন সপ্তাহ নিশ্চিন্ত বাস ও খাওয়া-দাওয়ার আরামে শরীরে এমনিতেই নতুন রক্ত এসেছিল। তার ওপর সম্ভ্রান্ত পোশাক ও লুধিয়ানার লালজুতা আরো বলে দিচ্ছিল, কোনো ধনীর ছেলে। যাগেশ যখন তাঁর সঙ্গীদের থাকার জায়গায় পৌঁছে গেল, তখন আমি ডাকলাম, 'যাগেশ।'

যাগেশ পেছনে ফিরে আমাকে দেখল। আমাদের দুজনেরই আনন্দের সীমা রইল না। আমাদের কার চোখে আনন্দাশ্রু এসেছিল বলতে পারব না। আমাদের কথা বলার সময়তো পড়েই ছিল, তাই সেই প্রসঙ্গ না তুলে ওকে আমার সঙ্গে আসতে বললাম। যাগেশ সদাব্রত থেকে যে খবর এনেছিল তা তার সঙ্গীদের দিয়েছিল কিনা মনে নেই, কিন্তু যখন সে ওদেরকে বলল—'আমার ভাইকে পেয়ে গেছি, ওর খোঁজেই ঘর থেকে বেরিয়ে ছিলাম। সে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।' তখন প্রধান সাধু উঁকি মেরে আমাকে দেখেই ঘাবড়ে গিয়ে যাগেশের গলা থেকে কণ্ঠী খুলে ফেলতে লাগল। খুলে ফেলতে দেরি হচ্ছে দেখে কণ্ঠী ছিঁড়ে ফেলল। ওদের এই আচরণের কারণ জিগ্যেস করায় যাগেশ বলল—ও ভয় পেয়েছিল যে তোমার ভাইকে জবরদস্তি করে চেলা বানানোর কথা পুলিশকে বলে তুমি ওদের ফাঁসিয়ে দেবে। আমরা ওদের

সরলতায় হাসতে হাসতে ধর্মশালার দিকে গেলাম। আমি কর্মচারীকে বলে দিলাম—'হ্যাঁ, এদেরকে কুপন মাফিক সদাব্রত দিয়ে দাও। আমার এই ভাই এদের সঙ্গে এসেছে।' আমিও তো কর্মচারীর উপাধ্যক্ষের মতো ছিলাম। তাই আমার কথা সে মানবে না.কেন।

কিছু খাইয়ে-দাইয়ে যাগেশের কাছে গোটা গল্পটা শুনলাম। কিভাবে ও আমার উল্টো চিঠি পড়েছিল আর কিভাবে পিসামশাই হঠাৎ ঐ চিঠি তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। কিভাবে কোনো মালপত্র না নিয়ে অন্যের চোখে ধূলা দিয়ে ও ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে, কিভাবে কিছুটা রেলপথে, কিছুটা হেঁটে ও হরিদ্বার পৌঁছয়। কিভাবে বিষ্ণুদত্ত পণ্ডিত (?) আমি বদ্রীনাথ থেকে তাঁর ওখানেই ফিরে যাব বলে ওকেও ধরে রাখতে চেয়েছিল। আর আমার মতো যাগেশও তাঁর বানানো কথায় অসন্তুষ্ট হয়ে চলে আসতে বাধ্য হয়। রাস্তায় ও গাজীপুর জেলার এই গৃহস্থ—সাধুমণ্ডলীকে পেয়ে যায় এবং তাঁদের সঙ্গেই এই পর্যন্ত পৌঁছায়। আমিই শুধু জানতাম, যাগেশের কত কষ্ট হয়ে থাকবে। বিশেষ করে, আমার মতো ওর কাছে বেদান্ত ও বৈরাগ্যের বল ছিল না। শুধু আমার প্রতি ভালবাসা এবং কিছুটা দেশভ্রমণের লোভের টানে ও স্বেচ্ছায় এতটা কষ্ট সহ্য করে এসেছে। আমিও যাগেশকে আমার ভ্রমণের বিবরণ শোনালাম। বাবা ধর্মদাসের কাছে আমি সব কথা বললাম। তিনি বললেন—'কি ভালই হয়েছে, দুই ভাই হৃষিকেশ চল। সেখানেই সংস্কৃত পড়বে। ও সাধু হয়ে যাবে।' সাধু হওয়ার ব্যাপারে আমি 'হ্যাঁ' 'না' কিছুই বলতাম না। কিন্তু যাগেশ নিজেকে একেবারে প্রস্তুত বলে জাহির করত। তবে, ও আমার কাছে অবশ্যই বলত, 'ভাই, মার কথা মনে পড়ছে। চল ঘরে ফিরে যাই।' কিন্তু আমার ওপর তো অন্য এক ভূত সওয়ার হয়েছিল। আমি কোমল হয়ে কিন্তু দৃঢ়ভাষায় যাগেশকে ওই কথা বলা থেকে আটকাতাম।

কেদারনাথে ভাজা ছোলা ছিল টাকায় দুই সের। অর্থাৎ তা প্রায় ঘিয়ের দামে বিক্রী হত। আমার কাছে এর চেয়েও আশ্চর্যের বিষয় ছিল এই যে, আটা ও লুচি দুয়েরই ছিল এক দাম। সম্ভবত দুইই ছ আনা সের বিক্রী হত। কারণ জিগ্যেস করে জানতে পারলাম, সব হালুইকর প্রতিযোগিতা করছে। তাই এক দাম। এতে লোকসানও নেই। কারণ পুরি আটার দেড়গুণ হয়ে যায়। এতটা বেড়ে যাওয়ায় ঘিয়ের দাম ও কিছু লাভও বেরিয়ে আসে। লুচি খেয়ে পেট খারাপ হওয়াটা আমি দেখেছিলাম। কেদারনাথেব এই পাহাড়ী লোকেরাও এই পেট খারাপকে ভয় পেত। সকালে আমরা হালুয়া বানাতাম। ঘি-গুড় আটার কোনো কমতি ছিল না। হালুয়া বানানোর বিদ্যা আমাকে বাবা ধর্মদাস শিখিয়েছিলেন। যাগেশ আসার পর আমরা দুজনেই হালুয়া বানাতাম। কর্মচারী দুজনের মধ্যে কেউ অন্য সময় রান্না করত। দুপুরে কি খেতাম, তা তো মনে নেই। কিন্তু রাত্রির খাওয়া খেতে যেতাম নিচে। কেদারনাথে অড়হর অথবা কলাইয়ের ডাল পাওয়া যেত না। ভাতও সিদ্ধ হত না। আমাদের মুসুরির ডাল হত। আলুর ফসল উঠতে দেরি ছিল। তার বদলে পিঁয়াজের তরকারি হত। কোনো কোনো দিন জঙ্গলের কোনো শাক রান্নাও হত। রুটিতে ঘি মাখিয়ে খেতেও ভয় হত। তার পরিবর্তে আটা মাখার সময় কিছু ঘি দিয়ে দিতাম। ডালে ঘি ফোড়ন দিতে কোনো আপত্তি ছিল না। উপকরণের স্বল্পতা সত্ত্বেও আহার সুস্বাদু হত।

যাগেশ আসার পর আমরা একমাস অথবা তার কিছু বেশী দিন কেদারনাথে ছিলাম। দিনচর্যার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। শীতে বদ্রীনাথের সারা বসতি খালি করে লোকজন নিচে নেমে যেত। যাত্রীদের আসা বন্ধ হয়। কেদারনাথের ভূমি, মন্দির, বাড়িঘর, সব বরফে ঢেকে যায়। আর জানাশোনা মানুষদের কথা অনুযায়ী—শীতের ছয় মাসের ভোগ-আরতি করতেন

দেবতারা। পাণ্ডারা সেই জন্য জিনিষপত্র মন্দিরে বন্ধ করে রেখে যেত। মন্দিরের দরজা খোলার পর দেখা যেত সব সামগ্রী শেষ হয়ে গেছে, মন্দির থেকে তাজা ধূপের সুগন্ধ আসছে। তখনও দরজা বন্ধ হতে তিন চার সপ্তাহ বাকি ছিল। ঠিক হল এই সময়ের মধ্যেই আমরা বদ্রীনাথ হয়ে হৃষিকেশ ফিরে আসব। আর ওদিকে বাবা ধর্মদাসও সদাব্রত ও ধর্মশালা বন্ধ করে সেখানে পৌঁছবেন।

পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একদিন পরনের কাপড় গায়ের জামা এবং রাস্তায় খরচার টাকা-পয়সা দিয়ে বাবা আমাদের বদ্রীনাথের দিকে রওনা করিয়ে দিলেন। যাওয়ার সময় এই ধারণা আমার একেবারেই ছিলনা যে, বাবা ধর্মদাসের সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা। আগের দেড়-দুই মাস আমাকে খুব কম চলাফেরা করতে হয়েছিল। কিন্তু এখন অনেকটা দূর পর্যন্ত নিচের দিকে যেতে হবে। গুপ্তকাশীর কাছাকাছি পর্যন্ত আমরা শ্রীনগর-কেদারনাথের রাস্তায় এলাম। গুপ্তকাশীর ছোট গ্রাম ও সাধারণ মন্দির দেখে আমার তো মনে হয়েছিল যে, কাশীর নামকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। ওপর থেকে নেমে নদী পার হয়ে এগিয়ে গেলাম। উখীমঠ (উখীমঠ) দেখে আগে সুখসাগরের বাণাসুর ও উষার যে গল্প পড়েছিলাম, তা মনে পড়ল। সেখান থেকে আরো এগিয়ে একটা থাকার জায়গার কথা আজও মনে পড়ে। সেখানে গরু-মোষের চারণভূমি ছিল। খুব মশাও ছিল। বারাণসীর দিকে যেভাবে 'হী' বলে মোষকে ডাকা হত এখানে 'হী'র জায়গায় 'ডী' অথবা অন্য কোনো শব্দ ব্যবহার করা হত। তুঙ্গনাথ যাওয়ার বাসনা তো ছিল। কিন্তু যখন শুনলাম যে, তার জন্য দুরূহ পর্বত পথে আমাদের অর্ধেক আকাশ পর্যন্ত উঠে যেতে হবে, তখন সেই ইচ্ছা ঢিলে হয়ে গেল। চমোলির কাছে গঙ্গার লোহার ঝুলা ঐ বছর ভেঙে গিয়েছিল। পাশে যে দড়ির ঝুলা তৈরী হয়েছিল, তার সম্পর্কে লোকজন অতটা না বললেও আমি এই বিশাল দড়ির ঝুলা দেখে পাহাড়িয়াদের চাতুর্যের খুব প্রশংসা করেছিলাম।

এখান থেকে আমরা হরিদ্বার হয়ে সোজা বদ্রীনাথ যাওয়ার রাস্তায় ছিলাম। এখানে সড়ক বেশ চওড়া। বর্ষায় কোনো কোনো জায়গায় পুল ভেঙে গিয়েছিল। তবু আমার মনে হয়েছিল যে সরকারের রাস্তা মেরামতির দিকে বেশ দৃষ্টি ছিল। চটি ও গ্রামও বেশী ছিল। কোথাও কোথাও পাকা সফেদাও খেতে পেয়েছিলাম। ক্লান্ত হয়ে যখন কোনো চটিতে পৌঁছতাম, তখন যাগেশ হুট করে বলে উঠত, 'ভাই! খিচুড়ি বানিয়ে নেওয়া যাক না কেন?' এতে আমার শরীরে আগুন লেগে যেত। ছেলেবেলায় খিচুড়ি আমার কাছে অখাদ্য মনে হত। আমার কাছে খিচুড়ির স্থান এখনো আগের মতোই ছিল। অবশ্য বছওয়ল-এ আমি খিচুড়ি খেয়ে নিতাম তার কারণ সিরকা ও আমের টুকরো দিয়ে সেই খিচুড়ি খাওয়া হত সমবয়সী বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে। আমি যাগেশকে ধমক দিতাম, কিন্তু পরে বুঝতে পারতাম ও আমাকে ঠাট্টা করার জন্য ঐকথা বলতনা। খিচুড়ি বানানোতে পরিশ্রম কম, আর তৈরীও হত তাড়াতাড়ি, এই ভেবেই ও এই প্রস্তাব দিত। সেই সঙ্গে খিচুড়ি খেতে ওযে ভালবাসত তাতেও কোন সন্দেহ ছিল না। বদ্রীনাথের রাস্তা দিয়ে ওপরে যাওয়ার সময় আমাদের কখনো শরীর খারাপ হয়েছিল কিনা জানিনা। জোশীমঠের (জ্যোতির্মঠ) কোনো বিশেষ কথা আমার মনে পড়ছে না। জোশীমঠ বেদান্তের আচার্য শংকরাচার্যের চার প্রধান মঠের একটি। তার মাহাত্ম্যের কথাও আমার মনে গাঁথা হয়ে যায়নি।

জোশীমঠ ছাড়িয়ে উৎরাই দিয়ে নেমে কোনো নদী পার হতে হল। তারপর অলকানন্দার কিনারে কিনারে বদ্রীনাথ পর্যন্ত গেলাম। বদ্রীনাথের কয়েকমাইল আগেই পর্বত বৃক্ষশূন্য হয়ে গিয়েছিল। আরো এগিয়ে শুধু সবুজ ঘাস। দূরে পাহাড়ের চূড়ায় বরফ দেখা যাচ্ছিল। তাছাড়া অন্য কোথাও বরফের নামগন্ধও ছিল না।

বদ্রীনাথের কালীকমলীওয়ালার ধর্মশালা কেদারনাথের ধর্মশালার থেকে বড় ছিল। তার অধ্যক্ষ ছিলেন একজন গরীবদাসী সাধু। তাঁর মোহন্তর মত লম্বা শরীর, ফর্সা রঙ, মোটাসোটা দেহ ছিল। চুল-দাড়ি কামানো, শরীরে গেরুয়া কাপড়। বয়স পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ বছরের মতো। ধর্মদাসজীর থেকে তিনি বেশী লেখাপড়া জানতেন। কিন্তু সে বিষয়ে ভালো করে জানার সুযোগ হয়নি আমার। কেদারনাথ থেকে আমরা তাঁর জন্য চিঠি নিয়ে এসেছিলাম। তিনি থাকার ও আহারাদির ভাল ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু আমরা হৃষিকেশ এ ফিরে গিয়ে বাবা ধর্মদাসের সঙ্গে থাকব জেনে তিনি তা পছন্দ করলেন না। তিনি আমাদেরকে বারণ করতে শুরু করলেন— 'লেখাপড়া করতে চায় এমন নওজোয়ানের সাধুদের চক্করে পড়া উচিত নয়। ধর্মদাস নিজে লেখাপড়া জানা লোক নন, তিনি বিদ্যার কি কদর করবেন। চেলা বানিয়ে নেবেন আর বলবেন, মাথা মুড়িয়ে দিয়েছি, এখন ভিক্ষা করে খাও।' ওঁর উপদেশ চলতেই থাকল। তার কতটা আমাদের ভালর জন্য, আর কতটা ঈর্ষা প্রণোদিত ছিল, তা বলতে পারব না। আমি সমানে ওঁর সম্মতিকে আমার ভেতরে যেতে বাধা দিতাম। কিন্তু যাগেশ যেন আগে থেকেই ওঁর কথা মেনে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে বসেছিল। সেও বেশ জোর দিয়ে বলতে শুরু করল—'না ভাই। চল বারাণসীই যাই, সাধুদের কিছু ঠিক-ঠিকানা নেই। ওদের কথার অবাধ্য হলে কে জানে কি করে বসবে। হৃষিকেশ কি আমরা দেখিনি? সেখানে পণ্ডিত কোথায়?'

বদ্রীনাথের বসতি বেশ বড়। বাড়িঘর বেশ ভাল করে নির্মিত এবং সংখ্যায়ও বেশী। ছাদে টালির ছাউনির জায়গায় কাঠের পাটাতন ও তার নিচে ভূর্জপত্রের ছাল বিছানো। তপ্তকুণ্ড থাকায় সেখানে স্নান করে বড় আরাম হত। বদ্রীনাথের মন্দির ও মূর্তির কথা আমার কিছু মনে নেই। সেখানে দাড়ি-গোঁফ ছাড়া লাল মুখঅলা অনেক মজুর ও তাদের স্ত্রীদের দেখা যেত। সবাই ওদের মারছা বলত। গঙ্গোত্রীর কাছাকাছি যে লামাকে দেখেছিলাম তার সঙ্গে এদের চেহারার কিছু মিল ছিল, যদিও এরা এতটা লম্বা ছিল না। কিন্তু তথাপি এই সব পুরুষ ও নারীকে দেখে আমার মনে কোনো প্রশ্ন জাগেনি। শুনেছিলাম, এদের বসতি আরো ওপরে। কয়েক মাইল পরে বসুন্ধরা তীর্থ। একবার যাওয়ার ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু জানিনা কেন যাওয়া হয়ে ওঠেনি। বদ্রীনাথের বসতির বাইরে বেশী ঘোরাফেরা করিনি। ধর্মশালার রান্নাঘরে একটা বড় তাওয়া ছিল যার ওপর একসঙ্গে দশ বারটা রুটি সেঁকা যেত। এই রকম তাওয়া আমি প্রথম দেখলাম। তাই কিছুটা কৌতূহল ছিল। এখানে সিরা-পুরির বদলে ভোজ হত সিরা-রুটির। মনে হল, কেদারনাথের লোকদের মতো এখানকার লোকও পুরিকে ভয় পেত। বদ্রীনাথে আমরা তিন চারদিনের বেশী থাকিনি। অধ্যক্ষ মহাশয়ের উপদেশের ফলে সেখানে আমার মন বসেনি।

বাবা ধর্মদাসের কাছে থাকবনা, কেদারনাথ থেকে চলে আসার সময়ও এ বিষয়ে আমরা কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারিনি। এ ব্যাপারে আগে স্থির করতে পারলে আমরা তাঁকে একথা বলে আসতে পারতাম। কিন্তু এখনতো তাঁর সঙ্গে একমাত্র হৃষিকেশেই দেখা হতে পারে। যাগেশ আমাকে সেখান পর্যন্ত যেতে দিতে প্রস্তুত ছিল না। ওর ভয় ছিল—তাতে কিছু সত্যও ছিল যে, একবার হৃষিকেশে পৌঁছে গেলে আমি সেখান থেকে নড়ব না। বারাণসী যাওয়াতে আমার বেশী শংকা ছিল। যদিও আমাদের ঐ সময় এ ব্যাপারে কোন ধারণা ছিল না, তবু হৃষিকেশের সাধুদের মধ্যে কিছু সংস্কৃতজ্ঞ নিশ্চয়ই ছিলেন। বদ্রীনাথের মহাত্মা তো সোজা বলে দিয়েছিলেন যে সেখানে সংস্কৃতজ্ঞ কেউ নেই। বদ্রীনাথেও হৃষিকেশে না যাওয়ার ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি। কিন্তু স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর তখনো যথেষ্ট সময় ছিল। তখনো কয়েকদিন হৃষিকেশ ও রামনগরে যাওয়ার পথ আলাদা হয়ে যায়নি।

চমোলির কাছ পর্যন্ত আমরা যে রাস্তায় গিয়েছিলাম, সেই রাস্তায়ই ফিরলাম। অলকানন্দার দড়ির পুলের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় বিশেষত যখন নিচের স্রোতের দিকে তাকাচ্ছিলাম তখন কিছুটা রোমাঞ্চ হয়েছিল। কিন্তু এই রোমাঞ্চে ততটা ভয় হয়নি, যতটা হয়েছিল গঙ্গোত্রী থেকে ফেরার সময় ভৈরবঘাটে ভোটগঙ্গার ওপরের পুল থেকে কয়েকশ ফুট নিচে সাদা পাতলা স্রোত ও দোদুল্যমান লোহার পুল দেখে। সম্ভবত যখন নন্দপ্রয়াগ থেকে হরিদ্বারে যাওয়ার রাস্তা আলাদা হয়ে গেল, তখন বারাণসীতে যাওয়ার জন্য আমার মনও তৈরী হয়ে গিয়েছিল। আমরা যতই নিচে নামছিলাম, ততই গরম বেড়ে যাচ্ছিল। পাহাড়ের ওপর গ্রামের সংখ্যাও বেশী দেখা যাচ্ছিল। আমাদের পথ চলার গতিও বাড়ছিল। আর শেষ দিন অর্থাৎ যেদিন আমরা রামনগরে পৌঁছলাম সেদিন আমরা একদিনে চল্লিশ মাইল হেঁটেছিলাম।

৪

কাশীর দিকে

রামনগরে এলাম। এখন আমরা সমতলে। বর্ষা সদ্য শেষ হয়েছে। কিন্তু মাটিতে তার ছোঁয়া তখনো ছিল। পাহাড় থেকে নেমে এসেও আমরা তরাইয়েই ছিলাম। চারণের সুবিধার জন্য এখানে অনেক গোপালন করা হত। বড় রাস্তা ধরে আমরা পায়ে হেঁটেই কাশীপুরের দিকে রওনা দিলাম। ঠাণ্ডা জায়গা থেকে এসেছি। তাই রোদের তাপ বড় কড়া লাগছিল। পিপাসার জ্বালায় মুখ তো সব সময় শুকনোই থাকত। গ্রাম থেকে দূরে কোন এক বিত্তশালী ব্যক্তি মুসাফিরদের জন্য একটা ধর্মশালা তৈরী করে রেখেছিলেন। তার উঠোনের গাছে পাকা পেয়ারা ছিল। অন্য কিছু খেতে না পেয়ে আমাদের ঐ আধ পাকা পেয়ারা খেতেই বেশ লাগল। ধর্মশালার যাত্রীদের ঘোল খেতে দেখে তাদের কথামতো আমরাও ঘোল আনতে গেলাম। গৃহস্থের বাড়িতে কলসী কলসী ঘোল তৈরী ছিল। গরু অনেক ছিল। এক ঘরভর্তি লোক খেলেও তা ফুরোত না।

রাস্তায় বিশ্রাম নিয়ে অথবা কিভাবে একদিন সন্ধ্যায় কাশীপুরে পৌঁছলাম। সেদিন ভাদ্রমাসের কৃষ্ণজন্মাষ্টমী ছিল। এক ভক্ত খুব শ্রদ্ধাভরে আমাদের তার বাড়ি নিয়ে গেল। বেশ খিদে পেয়েছিল কিন্তু মধ্যরাত্রিতে কৃষ্ণজন্ম হয়ে যাওয়ার পর পেটভর্তি প্রসাদ মিলবে, এই আশায় আমরা বসে রইলাম। ভক্তজীর ওখানে অনেক আলো জ্বলছিল। এক যুবক সাধু তার পেটরায় কয়েকটা সাপ নিয়ে এসেছিল। তার কয়েকটা মাথায়, কয়েকটা গলায়, কয়েকটা হাতে জড়িয়ে নিজেকে শংকর বানিয়ে দেখাল। এভাবে মনোরঞ্জন হতে হতেই অর্ধেক রাত কেটে গেল। কান্হাইয়াজীর জন্মও হয়ে গেল। কিন্তু সেখানে এক চামচ চরণামৃত এবং এক চিম্টে গুড়ো করা আটার প্রসাদ ছাড়া আর কিছু ছিল না। খিদের জ্বালায় ঘুম এল না। সকালে বাসি শুকনো রুটি মিলল তাও আধপেট। এই ধরনের 'শ্রদ্ধাশীলভক্ত' অন্য কেউ যাতে না এসে পড়ে, তার জন্য আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শহরের বাইরে এসে ঠাকুরদ্বারের রাস্তা ধরলাম। হয়তো আমরা ছাড়া আর একজন তৃতীয় সহযাত্রীও ছিল। কোনো এক কুয়ায় শেকল অথবা দড়ির সঙ্গে

বালতি বাঁধা দেখে এই ব্যবস্থা আমার ভারী ভাল লাগল, যদিও এই ব্যবস্থা শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্যই ছিল।

ঠাকুরদ্বারে কয়েক ঘর ধনী বৈশ্য পরিবার থাকত। তাদের বড় বড় পাকা বাড়ি শুধু বাইরে থেকে দেখেই আমরা সোজা মন্দিরে চলে গেলাম। সেখানে আগন্তুকদের থাকার ব্যবস্থা ছিল। রাত্রিতে আমি তো ঘুমিয়ে পড়ি। কিন্তু যাগেশ জেগে ছিল আর সে এক নওজোয়ান সাধুর নাচগানের খুব তারিফ করছিল। বোধ হয় ঠাকুরদ্বারের জন্মাষ্টমী ছিল আজকে। হিন্দুদের সব পরব তো দুদিনেও পড়ে যায়। ঠাকুরদ্বার থেকে আমরা মোরাদাবাদ সম্ভবত পায়ে হেঁটেই গিয়েছিলাম। সেখানে রামগঙ্গার কিনারে এক বৈরাগী সাধুর মঠে উঠলাম। পাঠকজীর সঙ্গে দেখা হল। কিভাবে হরিদ্বার থেকে হতাশ হয়ে আমরা বারাণসী ফিরে যাচ্ছি, আমি বললাম। সেই সঙ্গে বাবা ধর্মদাসের কথাও বললাম। কথায় কথায় পাঠকজী এই কথা সেই সাহুজীকে বলে দেন, যিনি দশ কমণ্ডলু জমা করে নয় জন সঙ্গী নিয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় বৈরাগ্য সেবন করছিলেন। তাঁর ভাই ও মায়ের ষড়যন্ত্রে পড়ে তাঁকে না জানিয়ে আমার পালিয়ে যাওয়া তার বড় খারাপ লেগেছিল। এখন তাঁর মনে হল যে বাবা ধর্মদাসকে না জানিয়ে আমাদের চলে আসাটা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। আমার অনুপস্থিতিতে তিনি মঠের বৃদ্ধ মোহন্তকে এসে বললেন যে, আমাদের দুজনকে যেন তিনি মঠে থাকতে না দেন। সে যাই হোক, আমরা তো সেখানে বাসা বেঁধে থাকতে যাইনি। আমরা সর্বদাই পথচলার জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। মোহন্ত আমাদের বলেছিলেন, তিনি শহরের নামকরা লোক, তাঁকে নারাজ করা উচিত হবে না।

আবার সেই সোজা রাস্তাই ধরলাম। চার মাস আগে এই সড়ক দিয়েই আমি গিয়েছিলাম। মনে হয়নি সে সময় থেকে চার মাস কেটে গেল। মনে হচ্ছিল সব ঘটনা কাল ঘটেছে। ঘটনার সংখ্যাও নিশ্চয় অনেক ছিল। রামপুরে গোর্খা পলটনের সঙ্গে ছিলাম। সেপাইরাই খানাপিনার ব্যবস্থা করেছিল। বেরিলিতে ছিলাম স্টেশনের পাশে পাকা ধর্মশালায়। ঐ ধর্মশালারই এক অংশে রেলওয়ের দারোগার (সাব-ইন্‌সপেক্টর) পরিবার থাকত। দারোগা সাহেবের ভাই সেখানেই বরাবর থাকত। পাশে থাকায় আমাদের সঙ্গে তার বেশ আলাপ—পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। সে উন্নাও জেলার পুরওয়া তহশীল ও পুরওয়া শহরের বাসিন্দা রাজপুত ছিল। তার বাড়ির লোক পলটনেও চাকরি করত। আমাদের বন্ধুও যেভাবে তার দোপাট্টা কালো দাড়ি ও খাড়া গোঁফ দুভাগে ভাগ করে আঁচড়াত তাতে তাকেও পলটনের সেপাই বলেই মনে হত। মনে নেই, আমাদের খাবার ধর্মশালা থেকে আসত না দারোগাজীর বাড়ি থেকে আসত।

দুয়েকদিন পরে এখানে নেপালী সাধুদের একটি দল এল। তাঁরা হিংলাজের ভবানীর (করাচী ছাড়িয়ে বেলুচিস্তানের মরুভূমিতে) দর্শন করে ফিরছিলেন। সাধুদের এই দলের প্রধান পুরুষ পূর্ণানন্দের কাছে হিংলাজের ভবানীর মহিমা শুনলাম। তার চেয়েও বেশী উটে চড়ে পথচিহ্নহীন মরুভূমিতে আন্দাজে পথপ্রদর্শকের ইশারায় দিনের পর দিন পথচলার বর্ণনা শুনে আমার জিভে জল এসে গিয়েছিল। দলের প্রধান সরদার পূর্ণানন্দ ছিলেন না, ছিলেন তাঁরই 'গুরুভাই' পঞ্চাশ বছরের এক অবধূতানী। স্বামী পূর্ণানন্দের মাথায় ও মুখে চুল-দাঁড়ি-গোঁফ ছিল না। কিন্তু অবধূতানীর জটা অন্তত ছয় ফুট ছিল। তাঁর গলায় ছিল বড় বড় রুদ্রাক্ষ, হিংলাজের পাতলা সাদা পাথর ও পুঁতির কয়েকটা মালা। তাঁরও দেহে পূর্ণানন্দের মতো স্বচ্ছ গেরুয়ার আলখাল্লা। পূর্ণানন্দ নেপালের অনেক কথা শোনাতেন। রাজনীতির কথা নয়, প্রকৃতির ও ধর্মের কথা। নেপাল দেখার সুপ্ত বাসনা তখন থেকেই আমার ভেতরে প্রবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। যা পূর্ণ করার

জন্য আমাকে তের বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। আমি বারাণসীর দিকে যাচ্ছিলাম। তাই তাঁর ঠিকানা জিগ্যেস করলাম। তিনি বললেন, মণিকর্ণিকায় 'দত্তাত্রেয়ের পাদুকা' তাঁর স্থান।

যে ধর্মশালায় আমরা উঠেছিলাম, তার পাশে আর একটি ধর্মশালা এক অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ (নাম শিবনাথ হতে পারে) তৈরী করিয়েছিলেন। সেখানে এক বিদ্বান সন্ন্যাসীর খবর শুনে আমি একদিন তাঁকে দর্শন করতে গেলাম। তিনি গেরুয়া কাপড় পরে বগলে একটা ডাণ্ডা নিয়ে আসনে বসেছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি সেই ডাণ্ডাটি মাটিতে ঠুকতেন। লোকজন বলছিল—চিত্তকে একাগ্র করছেন। যখন চিত্ত এদিক ওদিক যায়, তিনি ডাণ্ডা ঠোকেন। মনে হয় তিনি কথাবার্তা বলতেন না, অথবা আমার সঙ্গে তিনি কথা বলেননি। তাঁর পাশে তিনি কিছু ছাপা পুস্তিকা রেখেছিলেন। তার মধ্যে একটি উঠিয়ে তিনি আমাকে দিয়েছিলেন। বেশ সরল সংস্কৃতে লেখা ছিল। যা আমিও বুঝতে পারতাম। তাতে অহিংসার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছিল। এই খুন্নীলাল শাস্ত্রী নামে সাধু আমার কাছে তাৎপর্যহীন মনে হয়েছিল। কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছিলাম যে হিন্দী ভাষাভাষী দেশে বৌদ্ধ ধারাকে যাঁরা পুনরায় প্রবাহিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে তাঁর বিশেষ স্থান ছিল।

আমি প্রতিদিনই সেখান থেকে যাওয়ার কথা বলতাম কিন্তু দারোগাজীর ভাইয়ের আগ্রহ দেখে থেকে যেতে হত। তার এই আগ্রহকে যাগেশও সমর্থন করত। তাই পাল্লা ওদের দিকে ভারী হত। এভাবে এক সপ্তাহের বেশী কেটে গেল। শেষ পর্যন্ত আমি ওদের কোনো কথা শুনলাম না। যাগেশকেও ধমকালাম। এবং আমরা ট্রেনে পীলীভীত রওনা হলাম। তখন পর্যন্তও আমি বুঝতে পারিনি যে যাগেশকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে একটা ষড়যন্ত্র হচ্ছিল। আগেই বলেছি যে, যাগেশের ওপর বৈরাগ্যের ভূত সওয়ার হয়নি। আমার প্রতি ভালবাসা ও দেশভ্রমণের লোভে সে এই কষ্টময় যাত্রায় সামিল হয়েছিল। এতদিন ঘরের বাইরে থেকে ওর বাড়ির প্রতি, বিশেষ করে মায়ের প্রতি টান বেড়ে যাচ্ছিল। ও চুপিচুপি আমার সব কথা দারোগাজীর ভাইকে বলে দিয়েছিল। মনে হয়, সে পুলিশ মারফত বছওয়ল এ খবর দিয়েছিল। ওরা বছওয়ল থেকে কারুর দ্রুত চলে আসার অপেক্ষায় আমাকে আটকে রাখছিল। আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এইরকম তিনটি অযাচিত চেষ্টা হল। প্রথম আমার ভিতিহরা হয়ে আসার খবর শুনে বাবা অযোধ্যা পৌছন। আর এক মৌনী সাধু তাঁকে ঠকিয়ে গৃহস্থ শিষ্য বানিয়ে ছিলেন এই বলে 'হ্যাঁ—আপনার ছেলে এখানে এসেছিল। আমার কাছ থেকে গুরুমন্ত্র নিয়েছে। বদ্রীনারায়ণ গিয়েছে। ও নিশ্চয়ই ফিরে আসবে।' হরিদ্বার থেকে লেখা আমার চিঠি দেখে পিসেমশাইয়ের সম্মতি নিয়ে দাদুও বেরিয়ে পড়েন। তিনিও বদ্রীনাথ হয়ে ফিরে আসেন। কিন্তু আমাকে খুঁজে পাননি। এই হল তৃতীয় বার। বস্তুত যদি আমি আর একদিন থেকে যেতাম, তবে যাগেশের বাবা সহদেও পাণ্ডে বেরিলিতেই আমাদেরকে পাকড়াও করতেন। পীলীভীতেও যে মঠে আমরা কয়েকঘণ্টার জন্য থেমেছিলাম, সেখান থেকে আমাদের বেরিয়ে পড়ার এক-আধ ঘণ্টা পরেই তিনি সেখানে পৌছে গিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁকেও খালি হাতে বছওয়ল ফিরে যেতে হয়েছিল।

পীলীভীতে যখন আমরা শহরে ঘুরছিলাম তখন এক ভদ্র ব্যক্তি ডাকলেন। বদ্রীনারায়ণ থেকে ফিরে আসছি শুনে পুরি-মিঠাই আনিয়ে খাওয়ালেন। আমরা শহরের বাইরে এক মঠে কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম নিলাম। বেশী সময় ইতিপূর্বে দেখা রাস্তায় ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বারাণসী পৌছে পড়াশোনা শুরু করার চিন্তা হচ্ছিল আমার। কিন্তু ট্রেন ভাড়ার প্রশ্নটা ছিল। শুনলাম রাজা ললিতাপ্রসাদ এই জায়গার এক অত্যন্ত ধনী ব্যক্তি। কি জানি কোথা

থেকে আমার মাথায় এই আজব ধারণা এল যে রাজা সাহেবকে প্রশংসা করে আমি একটা কবিতা পেশ করব। তাতে হয়তো কপাল খুলে যাবে। আমি একটা যা মনে এলো তাই ছন্দমিল রচনা করলাম, তা একটি পরিষ্কার কাগজে লিখলাম, এবং রাজা সাহেবের দরবারে হাজির হলাম। কি করে এই 'কবিরাজ' দেউড়ির দারোয়ানদের তার 'আগমনের' খবর দিয়েছিল তা মনে নেই। কিন্তু কোনো দরবারে যাওয়ার তার প্রয়োজন হয়নি। হয়তো লিখিত কবিতাই ভেতরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল অথবা রাজা সাহেব বাইরে এসে তা নিয়ে গিয়েছিলেন। আশা করেছিলাম বারাণসীর জন্য দুটো ট্রেনের টিকিট। কিন্তু 'কবিরাজের' মিলল আধ পয়সা। ফিরে আসার সময় আমার সঙ্গে আবার সেই বুড়ো সজ্জনের দেখা হল। জিগ্যেস করায় আমরা বললাম—আমরা বারাণসী যেতে চাই। যদি আপনি ঐ পর্যন্ত টিকিটের ব্যবস্থা করে দেন তবে ভাল হয়। তখন তিনি তা দিতে রাজী হননি। কিন্তু যখন আমরা স্টেশনে গোলাগোকর্ণনাথের গাড়ির অপেক্ষা করছিলাম, তখন তাঁর লোক এসে গেল। 'কোথায় যাবে,' জিগ্যেস করায় আমরা বললাম—যেতে তো চেয়েছিলাম অযোধ্যা পর্যন্ত। কিন্তু টিকিটের পয়সা নেই। তাই গোলাগোকর্ণনাথ যাচ্ছি। গোলাগোকর্ণনাথের টিকিটও বোধহয় আমরা কেটে ফেলেছি। সে গোলাগোকর্ণনাথের টিকিট পালটে অযোধ্যা পর্যন্ত দুটো টিকিট আমাদের জন্য কেটে দিলো।

ফৈজাবাদ থেকে অযোধ্যা গিয়ে আমরা হয়তো একদিনের মধ্যে যা কিছু দর্শন-টর্শন করার ছিল সেরে সামনের রাস্তা ধরেছিলাম। রাস্তায় পৌকোলীর পৌহারীজীর মঠে ভাণ্ডারা ছিল। আমাদেরও এক একটা গামছায় দুটো অথবা তিনটা বড় বড় লাড্ডু মিলল। এবার আমাদের লক্ষ্য বারাণসী—জৌনপুরের রাস্তা ধরে পায়ে হেঁটে।

তখনো আমাদের ছেলেমানুষী যায়নি। একদিন আমরা পথ চলছিলাম। আর একটি লোকও কয়েকমাইল একই পথ ধরে চলছিল। তার শরীরে দুয়েকটা ক্ষত দেখলাম যা হালে হয়েছে মনে হল। আমরা তাকে বললাম, কি হে কাউকে মেরে টেরে পালাচ্ছ নাকি? লোকটি জবাব দিলনা। আরো দুই তিন বার একই কথা বলায় লেকটা আমাদের মারতে ছুটে এল। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম, পরিস্থিতি গুরুতর। আবার ঐ কথা বললে সে আমাদের না মেরে ছাড়ত না। আসলে সে মারপিট করেই পালিয়ে যাচ্ছিল সম্ভবত পুলিশের ভয়ে।

খেতসরাইয়ের আগে একটা বাগানের মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম। তখন কয়েকজন স্ত্রীলোক নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল—'আরে ঐ পুলের ওপর একটা চাঁই শুয়ে আছে।' আরো কি বলছিল, তা আমার মনে নেই। কিন্তু চাঁই এর কথা শুনে একটা পুরানো কথা মনে পড়লো আর মন কিছুটা শঙ্কিত হয়ে উঠল। রানীকিসরাইয়ে যখন পড়াশোনা করছিলাম, তখন প্রয়াগে মাঘ মাসের স্নানের জন্য পায়ে হেঁটে হাজার হাজার স্ত্রী ও পুরুষ ঐ রাস্তায় যেত। মেয়েদের মাথায় ও পুরুষদের পিঠে থাকত আটা ও ছাতুর গাঁটরি, হাতে লোটা-দড়ি, কাঁধে কম্বল অথবা কাঁথা। পায়ে জুতা থাকত খুব কম লোকের। প্রয়াগের এই যাত্রীদলের মধ্যে পন্দহার কিছু লোক ছিল। তাদের একজনের কাছে এই কাহিনী শুনেছিলাম। ঘটনাটা ঘটেছিল জৌনপুর জেলার কোনো জায়গায়। কয়েক শ যাত্রীর একটা দল কোন বাগানে রাত কাটাচ্ছিল। মেরে ধরে এত বড় যাত্রীদলের জিনিষপত্র ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। আর ট্রেনভাড়া বাঁচানোর জন্য পায়ে চলা যাত্রীদের কাছে সম্পত্তিই বা কি থাকতে পারে? কিন্তু সাধারণ গরীব চোরদের পক্ষে তাদের ছাতু-আটার গাঁটরি ও কাপড়ই অনেক। এক চাঁই হয়তো সন্ধ্যা থেকেই গাছে চড়ে বসেছিল অথবা সুযোগ দেখে গাছে উঠেছিল। রাত্রিতে সবাই ঘুমোবার পর সে গাঁটরি ওপরে তোলার জন্য লোহার কাঁটা দড়ির সাহায্যে নিচে নামিয়ে দেয়। ঘটনাক্রমে কাঁটার একটা

দিক কোনো গাঁটরিতে না আটকে এক বৃদ্ধের ধুতিতে বিঁধে যায়। গাঁটরি ভেবে চোর কাঁটা ওপরে তুলতে থাকে। মাটি থেকে ওপরে ওঠার সময় বৃদ্ধের ঘুম ভাঙে। দুয়েক হাত ওপরে ওঠার পর বৃদ্ধ জোরে চিৎকার করে সঙ্গীদের বলে—'ভাই-বোনেরা, আমি যদি কোনো গালাগালি করে থাকি, তবে আমাকে মাপ করো। প্রয়াগরাজের ফল এখানেই পেয়ে যাচ্ছি। ভগবান দড়ি বেঁধে দিয়েছেন ও এই দেহ দিয়ে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।' চাঁই এতক্ষণে বুঝতে পারল, সে ভুল করেছে। সে দড়ি ফেলে দিয়ে গাছ থেকে নেমে পালাল। আর বৃদ্ধের মাথা ফাটল, কোমর ভাঙল। আবার তাকে সংসারে ফিরে আসতে হল। চাঁই আমার কাছে অত্যন্ত পরিচিত শব্দ ছিল। আর সেটা কানে আসায় এই ঘটনা মনে পড়ে হাসি পাচ্ছিল। আমাদের অবশ্য কোনো ভয় ছিল না। কেননা, এখন দিনের বেলা আর আমরা বসতি থেকে বেশী দূরে ছিলাম না। ঐ পুলে সত্যিসত্যি একটা লোককে শুয়ে থাকতে দেখি।

জৌনপুর জেলা ছেড়ে আমরা বারাণসী জেলায় ঢুকেছিলাম। পিণ্ডারার আশেপাশে কোনো জায়গায় ছিলাম আমরা। যাগেশ পাশের গাঁ থেকে ভুট্টার দানা ভেজে নিয়ে এল। আমরা দুজনেই গুড় দিয়ে খেলাম। খাবার সময় আমার মনে ছিল না যে নিজামাবাদে গুড়মাখানো ভুট্টার খই খাওয়ার পর আমাকে ম্যালেরিয়ায় ধরে ছিল। আর তখন থেকে সেটা দেখলেই শরীরে গর্মি এবং বুঁকে কাঁপুনি হয়। খাওয়ার পর বমি হয়েছিল কিনা মনে নেই। কিন্তু কিছু দূর যাওয়ার পর আমাকে কাঁপুনিতে ধরল। কাপড় গায়ে দিয়ে আমি ঐ সড়কের পাশে পড়ে রইলাম। কাঁপুনি যাওয়ার পর জ্বর বাড়ল। কিন্তু আমরা সাহস করে কিছুটা দূরে বাঁ-দিকে এক কুমোরের বাড়ি গেলাম। সারারাত সেখানেই পড়ে রইলাম। সম্ভবত বারাণসীর আগেই যাগেশকেও কাঁপুনিতে ধরল। কিন্তু সকালে কাঁপুনিতে ধরার আগেই আমরা কিছুটা রাস্তা হেঁটে নিতাম। মনে নেই কতদিনে আমরা বারাণসী পৌঁছেছিলাম।

বারাণসী পৌঁছে আমরা সবচেয়ে আগে এডোয়ার্ড হাসপাতালে ম্যালেরিয়ার ওষুধ নিতে গেলাম। শিশিতে কুইনিন ও আরো কিসব মিলিয়ে বিষের চেয়েও কড়া ওষুধ পেলাম। তা থেকে কিছু আমরা সেখানেই খেয়ে নিলাম। ঐ রকম রোগে কাহিল শরীর নিয়ে গঙ্গাস্নান! কি আর করব। তবু কোনো রকমে অস্সীর তুলসী ঘাটে পৌঁছলাম। কাউকে পাঠশালা ও পড়াশোনার কথা জিগ্যেস করছিলাম সেখানে। এমন সময় এক কৃশ, বেঁটেখাটো, মধ্যবয়সী ব্যক্তি ঘাটের নিচ থেকে আমাদের কাছে উঠে এলেন। তাঁর মুখে বসন্তের দাগ, কপালে ত্রিপুণ্ড, বিভূতি, দুই কানে ছোট ও গলায় বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা এবং হাতে গঙ্গাজল ভরা তামার ঘটি। তিনি 'কোথা থেকে' ও 'কিভাবে' জাতীয় প্রশ্ন করলেন। পড়াশোনার কথা শুনে বললেন—আমার সঙ্গে এসো। এর আগে আমি বারাণসী দেখেছিলাম নামমাত্র। বারাণসীর এই দিকটায় তো আমার আসাই হয়নি। যে সব গলি ও সড়ক ঘুরে সেদিন আমি মোতীরামের বাগানে পৌঁছেছিলাম, সেগুলি ধরে তুলসী ঘাটে স্নান করতে ও সাঁতার কাটতে যাওয়া পরের দুই বছরে প্রতিদিনকার কাজের মতো হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু প্রথম পরিচয়ের দিন আমি তার যে অদ্ভুত রূপ দেখেছিলাম, পরে তা লুপ্ত হয়ে গেল।

মোতীরামের বাগান ছিল দুর্গাকুণ্ডে যাওয়ার সেই ছোট সড়কের ওপর যেখানে ভাস্করানন্দের সমাধি ও কুরুক্ষেত্রের পাথর দিয়ে ঘাট বাঁধানো পুকুর ছিল। সূর্যগ্রহণের সময় ছাড়া সর্বদাই এই পুকুর জলশূন্য থাকত। শুধু সেই সময় কাশীতেই কুরুক্ষেত্রের পুণ্য লাভ করার জন্য এই পুকুরে জলের কোনো একটা ব্যবস্থা করা হত। পুবদিকে কুরুক্ষেত্রের পুকুরের কাছেই মোতীরামের বাগান। ঐ সড়ক দিয়ে কিছুটা উত্তরে বাগানের চারদিকে পাতলা লাখৌরী ইঁট দিয়ে তৈরী দেয়াল, তিনটি ছোট ছোট দরজা। পুবদিকের দরজাটি আমাদের আজকের দয়ালু চক্রপাণি

ব্রহ্মচারীর দখলে ছিল। সেই দরজাকে বন্ধ করে তিনি তাকে কুঠরিতে পরিণত করেছিলেন। বাগান যেমন ছোট ছিল, ঘরও ছিল তেমনি ছোট ছোট। মনে হচ্ছিল যেন কোনো বামনদ্বীপের অধিবাসীদের থাকার জন্য এইসব ঘর বানানো হয়েছে। যাহোক, এই বাগান ও তাতে যারা থাকত তাদের বর্ণনা অন্য সময়ে করা যাবে। চক্রপাণি ব্রহ্মচারী আমাদের তাঁর নিজের জায়গায় নিয়ে গেলেন। সেখানে দুটি কুঠরি। পুবদিকের বারান্দা ছিল ঐ দুই কুঠরির জন্য হলের মতো। তাছাড়া ছিল কুঠরির মাঝখানের রাস্তা যার পুবপ্রান্তে বাগানের প্রধান দরজা ছিল। এই সবই একটি পাকা ছাদের নিচে ছিল। চক্রপাণি ব্রহ্মচারী নিরাকার সাধক পরমহংস ছিলেন না। তিনি সাকার-সাধক ছিলেন। তাঁর কাছে সর্বদা একটা গরু থাকত এবং এই সময় একট. ভাল জাতের কুচকুচে কালো গরু তাঁর সেবা পেত। গরুকে বৃষ্টি থেকে বাঁচানোর জন্য ঘর দরকার। গরুকে খাওয়ানোর জন্য ভুসি ও তা রাখার জন্য জায়গা দরকার— গোশালার জায়গা তো ব্রহ্মচারী মূল কুঠী থেকে দক্ষিণে টিনের ছাউনি দিয়ে বানিয়ে নিয়েছিলেন, আর পেছনের 'হল' ভুসি রাখার কাজে আসত। কুঠীর পশ্চিম দুয়ার ও কুঠরির সামনে আরো একটা টিনের ছাউনি ছিল। তাতে ব্রহ্মচারী ও তাঁর সহবাসী ছাত্রদের উনুন ছিল।

তাঁর সঙ্গে দুচারদিন থেকে বুঝতে পারলাম যে ছাত্রদের কাছাকাছি রাখা চক্রপাণিজীর ব্যসনের মতো ছিল। তিনি ধনী ছিলেন না। নিজের খরচা চালানোর জন্য তাঁর কোনো কষ্ট হত না। শহরে তাঁর অনেক দাতা ছিলেন। তাঁর পরিমিত আমদানি থেকে তিনি সাধ্যমতো ছাত্রদের সহায়তা করতেন। ছাত্ররা তাঁর গরুর সেবাযত্ন করবে, তাঁর কাজে সহায়তা করবে, তাঁর সেই লোভও ছিল না। কিন্তু লোকে জানুক যে ব্রহ্মচারী চক্রপাণির সঙ্গে পাঁচজন ছাত্র থাকে, তার চেয়ে বেশী স্বার্থ তাঁর ছিল, একথা বলা চলে না। কুরুক্ষেত্রের কাছে গৌড় ব্রাহ্মণ কুলে চক্রপাণি ব্রহ্মচারীর জন্ম হয়েছিল। দেশের নদী ও দীঘির জল যেমন বিন্দু বিন্দু করে জমা হয়ে সমুদ্রে পৌঁছয়, তেমনি ভারতের দূরের ও নিকটের সব প্রান্তের সব জায়গার গ্রাম থেকে বিদ্যালাভের কামনায় ব্রাহ্মণের ছেলেরা বারাণসীতে পৌঁছয়। বালক চক্রপাণির বারাণসীতে আসার এই কারণই যথেষ্ট ছিল। বারাণসীতে তিনি পড়তে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁর তেমন বুদ্ধিমত্তা ছিল না। তাই পড়াশোনায় তিনি তেমন এগোতে পারেননি। ব্যাকরণে লঘুকৌমুদীর কয়েক পৃষ্ঠা তিনি পড়েছিলেন। তবে রুদ্রী ও শুক্ল যজুর্বেদের কয়েকটি অধ্যায় তিনি সুর করে কোনো বৈদিকের কাছে পড়েছিলেন। বৈদিক যাগযজ্ঞের পুরানো প্রণালী এবং শংকরের সগুণ পূজা উপাসনায় তাঁর খুব শ্রদ্ধা ছিল। শংকরাচার্যকে তিনি শিবাবতার ও বেদের নায়কের মতো পূজা করতেন। বেদান্তের সংস্থাপকের মতো নয়। বেদান্ত সম্পর্কে তাঁকে আমি কখনো কথা বলতে শুনিনি। কিন্তু দণ্ডী স্বামীদের ও আমাদের বাগানের মহাজ্ঞানী ব্রহ্মচারী মঙ্গনীরামকে তিনি পূজনীয় বলে মনে করতেন।

তাঁর সময়ের অনেকটা কেটে যেত কৃষ্ণার সেবায়। সহবাসী ছাত্রদের কথা অনুসারে কৃষ্ণা রাজ্যভোগ করছিল। আর চক্রপাণি ব্রহ্মচারীর পূর্বজন্মের ঋণশোধ হচ্ছিল। ঘাস-ভুসি-তুস ছাড়া তাঁর রোজ দুই তিন সের অন্ন মিলে যেত। তাঁর বোতলের মতো ঝকঝকে শরীরের কোথাও হাড় দেখা যেত না। রোম ছিল ভৈরবজীর কালো রেশমের গলার মতো। সকালে উঠেই কৃষ্ণার দানাপানি দিয়ে ও দুধ দুইয়ে ব্রহ্মচারী গঙ্গায় (তুলসীঘাটে) স্নান করতে চলে যেতেন। সেখান থেকে ফিরে এসে আসনে বসে চোখে চশমা এঁটে (ঐ সময় তাঁর বয়স ৪৫-এর বেশী ছিল) কিছু পূজাপাঠ করতেন। সম্ভবত নর্মদেশ্বরের দুয়েকটা স্তোত্র তাঁর পূজার অন্তর্গত ছিল। তারপর ফুলের সাজি নিয়ে তিনি উত্তর দিকের শিবালয়ে শিবের মাথায় ফুল-বেলপাতা (বাগানে অনেক বেলগাছ ছিল) চড়াতেন। অবশেষে সুর করে গোস্তোত্র পড়ে কৃষ্ণার মাথায় চন্দনের টীকা ও

ফুল দিতেন। তারপর তিনি কৃষ্ণার সামনের পায়ের খুরে মাথা রেখে প্রণাম করতেন। নর্মদেশ্বরের আরতি করার সময় কৃষ্ণারও আরতি করা দরকার ছিল। কৃষ্ণাকে এত ভক্তি ও সেবা করার পরও কখনো কখনো দানাপানি দেওয়ার সময়, বিশেষত দুধ দোয়ার সময়, সে হাত-পা চালিয়ে দিত। ব্রহ্মচারীরও রাগ চড়ে যেত এবং দুয়েকটা ডাণ্ডা ঝেড়ে দিতেও তাঁর বাঁধত না। আমার এই মনে হয়েছিল যে, দেবতাও যদি চব্বিশ ঘণ্টা তাঁর সঙ্গে থাকতেন তাহলে তাঁকেও এই ধরনের ব্যবহারের মুখোমুখি হতে হত।

মোতীরামের বাগানে আসার পর আমার ম্যালেরিয়া কোথায় চলে গেল কে জানে। পাঁচ-সাত দিনের বেশী আমাকে চক্রপাণি ব্রহ্মচারীর আতিথ্য স্বীকার করতে হয়নি। বাবা বাড়ি থেকে চলে আসায় কিংবা যাগেশের প্রেরণায় আমরা নিজেরাই বাড়ি চলে গেলাম। কিন্তু এই নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে গেলাম যে, পড়াশোনা করার জন্য আবার আমাকে এখানেই ফিরে আসতে হবে। কিন্তু যাগেশ এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। কারণ ওর পড়াশোনা করার ও বৈরাগ্যের রোগ ছিল না। আমার বাড়ির লোকেরা এবার তাঁদের ভুল বুঝতে পারলেন। তাই আমার সংস্কৃত পড়ায় তাঁরা আর বাধা দিতে চাননি। বারাণসীতে পড়ার চাইতে তিন মাইলের মধ্যে বছওয়ল-এ পড়া অনেক নিরাপদ, এই ভেবে তাঁরা বছওয়ল-এ থেকে পড়াশোনা করার পরামর্শ দিয়েই ক্ষান্ত হননি। বরং কাকাবাবু তিন-চার মাসের আটা-ডাল সঙ্গে নিয়ে আমাকে একদিন সেখানে পৌঁছে দিয়ে এলেন। পিসামশাই আটা ডালের কথা শুনে কাকাকে অনেক বকাবকি করে বললেন— 'আমার এখানে খাওয়ার অন্ন আছে, একটা ছেলে বাড়তি খেলে আমার অন্ন কম পড়বে না।'

অকটোবরের (১৯১০ খৃ:) একদিন শুভমুহূর্তে মিছরি দিয়ে সরস্বতীর পূজা করে পিসামশাই আমাকে লঘুকৌমুদী শুরু করালেন। এটা মনে পড়লে খুব আফশোস হত যে, আট বছর (জুলাই, ১৯০২) আগেই আমি এখানেই সারস্বত শুরু করেছিলাম। হায়, যদি সেই ক্রমই চালু থাকত, তবে আমি আজ কোথায় থাকতাম। স্মরণশক্তি তখনো জবাব দেয়নি। কিন্তু সেই সঙ্গে পরিশ্রম না করার অভ্যাসও আমার ছিল। ১৯০২-এ কেউ বলেনি যে মুখস্থ করাটা বদ অভ্যাস। কিন্তু মধ্যের কয়েক বছরে অনেক বিশ্বাসযোগ্য লোকের মুখে 'মুখস্থবীরের' নিন্দা শুনেছি। তার প্রভাব না পড়ার কথা নয়। বিশেষত তা যখন পরিশ্রম না করার এক সম্মানজনক পথ দেখিয়ে দিচ্ছিল। অন্য ছেলেরা পঞ্চাশ বার চিৎকার করে নিজেদের পড়া তৈরী করত, আমি মনে মনে কিছুক্ষণ পড়েই তা মনে রাখতাম। এতে সময় কম লাগত কিন্তু আমার মনে হত যে চেঁচিয়ে মুখস্থ করলে হয়ত স্মৃতি আরো বেশী প্রখর থাকে। লঘুকৌমুদীর সঙ্গে আমি হিতোপদেশও শুরু করে দিয়েছিলাম।

বছওয়ল-এ বাল্যকালে যে সময়টা কাটিয়েছিলাম তার অনেক মধুর স্মৃতি মনে আসত। প্রথম বার আমি এসেছিলাম বর্ষাকালে। ভুট্টার ফসলের সময়। ছোট ভাইবোনেরা মিলে আমরা মাচানের ওপর যেতাম। পাখির কাছ থেকে ভুট্টার ক্ষেত রক্ষা করতে মেয়েরা বেশী যেত। ওরা গান শুরু করত। 'সবকে সিপাহিয়নকে লালি লালি আঁখিয়া, হমারি কাহে কুচুরী এ দীদী-বহিনী?' (সকলের সিপাহী স্বামীর লাল লাল চোখ কিন্তু আমার (স্বামীর) কেন ছোট বিশ্রী?) আমি আর যাগেশও এই গান গাইতাম। আমরা কি তখন জানতাম যে এই গান মেয়েদের, ছেলেদের এই গান গাইতে নেই। বছওয়ল থেকে কনৈলা ফিরে গিয়ে একদিন একা মাচানে বসে এই গান ধরেছিলাম। বিদ্যাবাবা তা শুনে ঠাট্টা করতে শুরু করলেন—'কোন মেয়ে গান গাইছে?' তখন আমি আমার ভুল বুঝতে পারলাম। আবার একবার গরমের দিনে যে বছর (১৯০৭ খৃ:) দিদিমা

মারা যান। বহুওয়ল-এ এসেছিলাম। সে-সময়ে পিসামশাইয়ের এখনকার চেয়ে বেশী ছাত্র ছিল। রামস্বরূপ ছিল এক হৃষ্টপুষ্ট ফর্সা তরুণ ছাত্র। সে চন্দ্রিকা পড়ত। দুপুরে গরুড় পুরাণের ছোট পাতাঅলা পুঁথি সামনে রেখে ব্যাস এর মতো পা মুড়ে মধুর স্বরে অর্ধেক গানের সুরে তা পড়ত, সঙ্গে সঙ্গে তার অর্থও করে যেত। তা যে কি ভাল লাগত। রামস্বরূপ এখন মারা গেছে। এরজন্য আরো আমার আপসোস হত। আগেকার অনেক ছাত্র বহুওয়ল ছেড়ে হয় বাড়ি চলে গেছে নয়তো বারাণসীতে পড়তে গেছে। অতীতের চিহ্ন রাজারাম তখনো বহুওয়ল-এ ছিল, এ আমার কাছে ছিল খুশীর ব্যাপার। প্রথম বার আমি যখন এসেছিলাম, তখন পিসামশাই ও তার ছোট ভাই (যাগেশের বাবা সহদেও পাণ্ডে) একান্নবর্তী ছিলেন কিন্তু এখন তাঁরা আলাদা হয়ে গেছেন। সাধারণত পৃথক হয়ে যাওয়াটা হয় তিক্ততার পরে। একথা এই দুই ঘর সম্পর্কেও বলা চলে। কিন্তু আমার এই দুই বাড়ির সঙ্গে একই রকমের স্নেহের সম্পর্ক ছিল। এক বাড়িতে আমার পিসিমা বরতা থাকতেন। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাঁর পরিমার্জিত ও পরিশীলিত কথাবার্তা ও ব্যবহারকে আমি গর্বের বিষয় বলে মনে করতাম। অন্য বাড়িতে ছিল যাগেশ, আমার অনন্য বাল্যবন্ধু। দুই বাড়ির মধ্যে যে সম্পর্কই থাকনা কেন, আমি তাদের আলাদা বলে ভাবিনি। যাগেশ আমাকে ভালবাসত বলে ওর মাও আমাকে ওর মতোই দেখতেন। তাঁর সম্পর্কে শুনেছিলাম যে, যাগেশ যখন আমার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছিল তখন তাঁর ঘরে যে সব ভিখিরিরা আসত তারা দ্বিগুণ-তিনগুণ ভিক্ষা পেত। কারণ ওর মায়ের মনে হত, তাঁর বড় ছেলেও ঐ রকম অন্যের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছে। তাই ভিখিরিদের মধ্যে তিনি বড় ছেলের চেহারা দেখতে পেতেন।

বহুওয়ল-এ দুই আড়াই মাস আমি নিশ্চিন্তে পড়তে পেরেছিলাম। তারপরই মাথায় দুষ্টুমি শুরু হয়ে গেল। প্রয়াগে খুব ধুমধাম করে প্রদর্শনী হচ্ছিল। সরকার এই প্রদর্শনীতে খুব পয়সা খরচ করছিল। পরামর্শ করলাম প্রদর্শনী দেখা যাক। পয়সার অভাব? পায়ে হেঁটে যারা শালীগ্রামকে ভেজে খেয়েছে, বেগুন ভাজায় তাদের আবার দ্বিধা? যাগেশ, আমি, পিসামশাইয়ের এক ছাত্র বিশ্বনাথ ও সম্ভবত আর এক জন কেউ ছিল। ঠিক হল, সবাই কনৈলাতে অমুক দিন পরমহংস বাবার কুটিরে এসো। যাগেশ ওখানেই এল। খঙ্গপুরে আবার বিশ্বনাথকে সঙ্গে নিয়ে পায়ে হেঁটেই রওনা দিলাম। পরিকল্পনায় কোনো বিঘ্ন হয়নি। কুয়াশা ছিল। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পরে যাগেশের সঙ্গে পরমহংস বাবার কুটিরে দেখা হল। বিশ্বনাথ স্বচ্ছল ঘরের ছেলে। কিন্তু ওরা পুরোপুরি যজমানীর ওপর নির্ভরশীল। ওদের চাষবাস ছিল না। তাই শরীরে ও খুব দুর্বল ছিল। অথচ ও আমাদের দুজনের চেয়েই বয়সে বড়। ভালা হয়ে আমরা ঔড়িয়ার পৌঁছে গেলাম। তারপর রেলের সড়ক ধরে সারনাথ পৌঁছলাম। এ পর্যন্ত সারনাথের স্তূপকে দূর থেকে দেখে 'লেরিক কুদান' বলে আমরা মনকে সন্তোষ দিয়েছিলাম। এবার আমরা স্তূপ দেখতে গেলাম। ঐ সময় হলুদ কাপড় পরা কিছু বর্মী ভিক্ষু ঐ স্তূপ ভক্তিভরে প্রণাম করছিল। তাদের মধ্যে এক বৃদ্ধ আমাদের দিকে তাকিয়ে হাত দিয়ে চোখের দিকে ইশারা করে বললেন—'চক্‌খু,' 'চকখু'। কিন্তু আমি তার অর্থ কি করে বুঝব। তবে এইবার আমি বুঝতে পারলাম যে, স্তূপ শুধু লেরিক কুদানই নয়, দূর দেশের লোকদের তীর্থস্থানও। এ সময়ে সারনাথের জাদুঘর তৈরী হয়নি। খনন করে বের করা মূর্তি জৈনমন্দিরের পেছনে দেয়ালে ঘেরা জায়গায় রাখা হয়েছিল। সেখানে একজন কালো রঙের মানুষ দেখলাম। জিগ্যেস করায় তিনি বললেন, তিনি সিংহলী। তিনি বুদ্ধমূর্তিগুলি দেখালেন। একটি মন্দির প্রতীকের চারদিকে নগ্নমূর্তি গুলির বিষয়ে জিগ্যেস করায় তিনি হেসে বললেন - এই সব জৈনমূর্তি।

পুরাতাত্ত্বিক বস্তু ও মূর্তিশিল্পের সঙ্গে এই আমার প্রথম সাক্ষাৎকার। আমার ধারণা হয়েছিল যে সিংহলের সব লোকই এই ব্যক্তির মতো হিন্দি জানে। বোধ হয় তিনি কলকাতায় থাকতেন।

আমরা বারাণসীতে না থেকে গঙ্গা পেরিয়ে চলে গেলাম। রামগড় না রাজঘাটের রাস্তায় গিয়েছিলাম মনে নেই। সূর্যাস্তের পর আমরা চুনারে পৌঁছলাম। তাই কেল্লার ভেতরে ভর্তৃহরির সমাধি দর্শনের ঔৎসুক্য থাকা সত্ত্বেও তা দেখতে পারিনি। আমাদের গন্তব্যস্থান ছিল প্রয়াগ। কিন্তু আমরা চুনার-মির্জাপুর-বিন্ধ্যাচলে চক্কর দিচ্ছিলাম কেন? স্রেফ ঘুরে বেড়ানো আর কি। আমরা প্রয়াগে পৌঁছলাম, প্রদর্শনী দেখলাম। কুস্তি দেখা ও এরোপ্লেন-এ চড়ে ঘোরা দুইই আকর্ষণের বস্তু ছিল। কিন্তু সেজন্য আমাদের কাছে পয়সা ছিল না। প্রয়াগে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়েছিল অথবা আমরা একসঙ্গে ফিরেছিলাম মনে নেই। তাছাড়া এটাও বলতে পারি না, কবে আমি বছওয়ল-এ পড়াশোনা শেষ করে প্রস্থান করেছিলাম।

মার্চে (১৯১১ খৃ:) আমি নিশ্চিতরূপে বারাণসীতে ছিলাম। ঐ সময় আর এক দীর্ঘ যাত্রায় উদ্যোগী হয়েছিলাম। পন্দহায় কার কাছে শুনেছিলাম যে, সে পায়ে হেঁটে সেখান থেকে কলকাতা গিয়েছিল। আমারও তার অভিজ্ঞতার সুযোগ নেওয়ার ইচ্ছা হল। অস্সীতে জগন্নাথমন্দিরে পণ্ডিত মুখরাম পাণ্ডে থাকতেন। তিনি পিসেমশাইয়ের পুরানো ছাত্র। আমি তাঁর কাছে পড়তে যেতাম। থাকতাম চক্রপাণি ব্রহ্মচারীর কাছেই। জগন্নাথজীর পূজারী ছিল মুখরাম পণ্ডিতের জন্মস্থান বীরপুর ও কনৈলার মাঝামাঝি এক গ্রামের বাসিন্দা। তাঁর ভাই দশরথ লঘুকৌমুদীর ছাত্র ও আমার সমবয়সী। আমরা দুজনে শলাপরামর্শ করে ঠিক করলাম—এবার পায়ে হেঁটে কলকাতা যেতে হবে। একদিন আমরা দুজনে চম্পট দিলাম। রাজঘাট-মুঘলসরাই হয়ে পুরানো বাদশাহী (শেরশাহওয়ালা) সড়ক ধরে চললাম। চন্দৌলীতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। আমরা কোথায় থেকেছিলাম মনে নেই। খেতের মটর ও ছোলার দানা খেয়ে দিনের বেলা কেটে যেত। কর্মনাশার স্রোতকে আমরা বিস্ময়ভরে দেখলাম। কেননা ষোল-আনা না হলেও আমাদের দশ বার আনা নিশ্চয় বিশ্বাস ছিল যে এই নদীর জল ছুঁলে কর্ম (পুণ্য) নাশ হয়ে যায়। সকাল দশটায় আমরা দুর্গাবতীতে পৌঁছলাম। দশরথ আমার কিছু পরে আসে। খিদে-তেষ্টা তো যা থাকার ছিলই, আমাদের পায়ের তলাও কেটে গিয়েছিল (আমাদের খালি পা ছিল) আর দশরথের পা ফুলে গিয়েছিল। দশরথ বড় কাতর হয়ে বলেছিল এখন ফিরে যেতে হবে। আমরা আবার বারাণসীতে ফিরে এলাম।

৫

বারাণসীতে পড়াশোনা (১)

মোতীরামের বাগান প্রাচীন না হলেও মধ্যযুগের মুনির আশ্রমের মতো ছিল। আশ্রমের কুটিরসমূহ বাগানের চারপাশের দেয়ালের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এদের মধ্যে একটি বাদ দিলে অন্য সবকটি কুটিরের আকার বৃত্তের মতো ছিল। ব্রহ্মচারীর ঘরের উত্তরে চার-পাঁচ হাত দূরে এক দণ্ডী স্বামীর কুটির। তাঁর ভাইপো বনমালী আমার সমবয়সী বন্ধুদের একজন ছিল। আরো উত্তরে

থাকতেন ব্রহ্মচারী জগন্নাথ। তিনি পাঞ্জাবী ছিলেন। তাঁর সারা জীবনেই তিনি হিন্দি বলতে পারলেন না। তিনি চিরকাল মতলবকে মতবল এবং চাকুকে কাচু বলতেন। তাঁরও গোপালনের আগ্রহ ছিল। কিন্তু চক্রপাণি ব্রহ্মচারী—যাঁর সঙ্গে তাঁর কখনো কখনো কথা কাটাকাটি হয়ে যেত—বলতেন, আমাকে ঈর্ষা করেই ও এইসব করে। ক্রোধে জগন্নাথ ব্রহ্মচারী দুর্বাসার দ্বিতীয় অবতার ছিলেন। আরো আগে দেয়াল পশ্চিমদিকে মোড় নিয়েছে। তার কিছুটা দূরে পাকা কুয়া ও শিবালয়। তার কাছে শাহারানপুরের বাসিন্দা এক মহাত্মা থাকতেন। বার্ধক্যে তাঁর কোমর বেঁকে গিয়েছিল। তিনি চিরন্তন কাশীবাসের প্রতীক্ষা করছিলেন। কুটির থেকে পশ্চিমের দেয়াল ঘেঁসে খালি জমিতে না গিয়ে সেখান থেকে দক্ষিণ দিকে গেলে বাগানের কেন্দ্রে পৌঁছনো যেত। যেখানে বড় বড় গাছের ছায়ায় উঁচু পাকা চত্বরে টিনের ছাদ ছিল। গরমের সময় সেখানে বসে থাকতে বড় ভাল লাগত। সেখান থেকে পশ্চিমে কয়েক পা গেলেই একটি ছোট উত্তরমুখী কুটির ছিল, যাতে এক অতি বৃদ্ধ সন্ন্যাসী থাকতেন—যাঁর বয়স একশ বছরের বেশী হওয়ায় আমার কখনো সন্দেহ হয়নি। মাঝে মাঝেই বেশ কয়েকদিন তাঁর পায়খানা হতনা। তাই পিচকারী ব্যবহার করতে হত। চলা-ফেরা করতে পারতেন না। সব ইন্দ্রিয় এবং মনও জবাব দিয়ে দিয়েছিল। এই কুটির থেকে একটু এগোলেই পশ্চিমের ঘরের সারি আরম্ভ হত। আর তা ছিল ছত্রের সারি। প্রথম ছত্র ছিল গাজীপুরের এক মারোয়াড়ী শেঠের। সেখানে কিছু আহারও বিতরণ করা হত। কিন্তু এই ছত্রের বেশী নাম ছিল অপক্ব অন্ন বিতরণের জন্য। বারাণসীর আশেপাশে অনেক দূর পর্যন্ত সরযূপারী ব্রাহ্মণরাই থাকে। তাই বারাণসীর পণ্ডিত ও ছাত্রদের মধ্যে তাদের সংখ্যা বেশী হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। 'আট কনৌজিয়া, নয় চুলা,' এই কথা কনৌজিয়া ব্রাহ্মণদের মতো সরযূপারী ব্রাহ্মণদের সম্পর্কেও বলা চলে। বারাণসীতে যে সব ছত্রে পাক করা অন্ন বিতরণ করা হত, তার চেয়ে অপক্ব অন্ন বিতরণ করত এমন ছত্রের সংখ্যা কম ছিল। তারজন্যও এই ছত্রের মাহাত্ম্য বেশী ছিল। কিন্তু তাছাড়াও বেনারসে এর খ্যাতি ছিল দানপ্রার্থী ছাত্রদের যোগ্যতার কারণে। ছাত্রদের যোগ্যতার ভিত্তিতে দান করা হত বলে এই ছত্রের খ্যাতি বেশী ছিল। এখানে পরীক্ষার পর বিদ্যার্থীদের বেছে নেওয়া হত। মাসের খরচ বাবদ ছাত্রদের গম, ডাল, নুন, দেশলাই ও আগুন জ্বালানোর কাঠ ইত্যাদির দাম দেওয়া হত। এই ছত্রের পরে পাতিয়ালার ব্রাহ্মণ রবি দত্ত পণ্ডিতের ছত্র ছিল। তাঁর বাবা ভাল পণ্ডিত ছিলেন। পাঞ্জাবে তাঁর বহুসংখ্যক গৃহস্থ শিষ্য ছিল। তাদেরই সহায়তায় এই রুটি-ছত্র চলত। সেখানে পাঞ্জাবের কিছু ছাত্র ভোজন করত। এই ছত্রের দক্ষিণদিকের দরজার কাছে সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীদের এক রুটি-ছত্র ছিল। সেখানে দুয়েক জন ছাত্রও থাকত। দেয়ালের সঙ্গে সঙ্গে পূর্বদিকে ঘুরে কয়েকপা এগোলে উঁচু ভিতের ওপর অনেকটা উঁচু পাকা বারান্দা ছিল, যার দুই মাথায় ছিল দুটো হাওয়াদার ঘর। আর সামনে ছিল চওড়া পাকা চত্বর। প্রথমদিকে বাগানের সঙ্গেই এই ইমারত তৈরী হয়েছিল। সম্ভবত কূয়ার পাশের শিবালয়ও ঐ সময়ের। কিন্তু অন্যান্য কুটির নিশ্চয়ই পরে হয়েছে। বাগানে কিছু বেল ও আমগাছ ছাড়া কাগজী লেবুর গাছও অনেক ছিল। বছরে তা থেকে কিছু আমদানিও হত।

যে বারান্দার কাছে গিয়ে আমরা থামলাম, কাশীতে ঐ সময় তার খুব মাহাত্ম্য ছিল। ব্রহ্মচারী মঙ্গনীরাম ঐখানে থাকতেন। পাতলা, ফর্সা শরীর, ছোট টিকি, সাদা চুল-দাড়ি, কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত এক গেরুয়া গামছার আবরণ, একটা সাদা পৈতাও হয়ত ছিল। এই ছিল ব্রহ্মচারীর চেহারা। এই বেশভূষায় যদি কোনো লোক-দেখানোর ব্যাপার থেকে থাকে তবে এইটুকুই। এছাড়া তাঁকে আর কোনো কৃত্রিমতা স্পর্শ করতে পারেনি। তাঁর ধর্মোপদেশ দেওয়ার রোগও

ছিল না। ছিল না যোগাভ্যাস ও ধ্যানের বিলাসিতা ও বেদান্ত-উপনিষদের ভূত অথবা পূজাপাঠের প্রতি আসক্তি। তিনি ঐ চত্বরে হাঁটতেন অথবা কুটিরে বসে বই পড়তেন। তাঁর কাছে সাধারণ দর্শকদের ভিড় থাকত না। কিন্তু কখনো কখনো কোনো কোনো অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসু তাঁর কাছে আসতেন। প্রণাম করলে স্বাভাবিক হেসে তিনি 'নারায়ণ' বলতেন। কথা খুব কম বলতেন। কিন্তু মৌনী ছিলেন না। খুব কম লোকই তাঁকে বিরক্ত করতে আসত। তাঁর আশেপাশে কোনো সাধক অথবা পরিচারকও থাকত না। তিনি অর্শে ভুগতেন। যবের রুটি ও মুগের ডাল খেতেন। এক পাঞ্জাবী বৃদ্ধা তাঁকে রোজ তা রান্না করে পৌঁছে দিয়ে যেত। আষাঢ়ী-পূর্ণিমার (গুরু পূর্ণিমার) দিন তাঁর কাছে বেশ ভিড় হত। তাঁর পূজার জন্য সেই দিন তাঁর নিজস্ব শিষ্যদের ভিড় হত। তাদের মধ্যে যদি সে-সময় আপনি সেখানে থাকতেন, তাহলে দেখতে পেতেন—শিবকুমার শাস্ত্রীর মত দিগ্‌গজ পণ্ডিতও ঐ দিন ফল-ফুল নিয়ে মঙ্গনীরাম ব্রহ্মচারীর পূজা তথা পরিক্রমা করছেন। যাঁদের হৃদয়ে মঙ্গনীরাম ব্রহ্মচারীর প্রতি শ্রদ্ধা ছিল তাঁরা সাধারণ রাস্তার লোক ছিলেন না। ভাস্করানন্দ ও তৈলঙ্গ স্বামীর দেখা পাওয়ার জন্য যাঁরা ব্যাকুল ছিলেন, তাঁরাও ব্রহ্মচারীর কাছে পৌঁছতে পারতেন না। নিরাকাঙ্ক্ষ, প্রদর্শনশূন্য মঙ্গনীরাম ব্রহ্মচারী বিদ্বান ছিলেন। বিশেষ করে বেদান্ত ও উপনিষদে তাঁর অধিকার ছিল। কিন্তু তাঁর বিদ্যা বিতর্কের জন্য ছিল না। তাঁর বিদ্যা হৃদয় থেকে হৃদয়ে পৌঁছে সেখানেই থেকে যেত। তাঁর অধ্যয়ন সম্পর্কে বলা হত যে শুকনো পাতার ক্ষণিক আলোতেই তিনি তাঁর পাঠ মুখস্থ করেছিলেন। আমি সর্বদাই ঐদিক দিয়ে যেতাম এবং তাঁকে দেখলেই প্রণাম করতাম। উত্তরে 'নারায়ণ' শুনতে পেতাম। শিক্ষার্থী ছাত্রদের মধ্যে আমার খ্যাতি ছিল। তাই আমাকে কিছু না বললেও চক্রপাণি ব্রহ্মচারীর কাছে আমার সম্পর্কে কখনো কখনো জিগ্যেস করতেন।

মঙ্গনীরাম ব্রহ্মচারীর কুটিরের আগে এক কোণে পুবের দেয়ালের সঙ্গে একটি কুটির ছিল। এই ছিল মোতীরামের বাগান, যা মোতীরাম নামে কোনো এক পাঞ্জাবী ব্রাহ্মণের সম্পত্তি ছিল। কিন্তু সে-সময় তা অন্যের হাতে চলে গিয়েছিল।

মোতীরামের বাগানের আশ্রমবাসীদের কথা আমি আগেই বলেছি। এরা ছাড়া আরো কিছু ছাত্রও থাকত। কিন্তু তাদের দুবছর পরে আর পাওয়া যেত না। আমাদের গোষ্ঠীর মধ্যে অর্থাৎ চক্রপাণি ব্রহ্মচারীর সঙ্গে যারা থাকত তাদের মধ্যে সীতাপুর জেলার (?) বংশীধর ছিল। খুব সাধাসিধা আর হাসিমুখ এই বংশীধরের ঠোঁট সেলাই করে দিলেও তা ছিঁড়ে ফেলে হাসি বেরিয়ে আসত। একটা সময় ছিল যখন ছাত্ররা সারস্বত দিয়ে ব্যাকরণ পড়া শুরু করত। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার পর সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা দিয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পা আগে বাড়াত। কিন্তু এই প্রক্রিয়ার ত্রুটি ছিল এই যে, ছাত্রদের তিন ধরনের সূত্র কণ্ঠস্থ করতে হত। কিন্তু "রটন্ত বিদ্যা ও ঘোষন্ত পাণীর" মতো তা নির্দোষ মনে করা হত। কিন্তু এখন যখন 'রটন্ত' বিষয়ে 'যাবজ্জন্য মিতব্যতা'—বাহাদুরী বলে মনে করা হত, তখন প্রাদেশিক ব্যাকরণের জায়গায় সর্বত্র প্রচলিত পাণিনির ব্যাকরণ পরীক্ষা ও ব্যবহার দুই দৃষ্টিকোণ থেকেই অধিক উপযোগী ছিল। এই সময় সারস্বত চন্দ্রিকার রাস্তায় কে যেতে চাইবে? বংশীধর চন্দ্রিকা শেষ করছিল। খাওয়া-দাওয়া তো ছত্র-টত্রতেই চলে যেত। কিন্তু তার ওপর কিছু পয়সারও প্রয়োজন হত। তার জন্য এবার সে ভাগবতপুরাণের পুঁথি কিনেছিল—বাইরে যাব, কোনো না কোনো জায়গায় কথকতা তো হবেই আর নগদ বিশ-পঁচিশ তো পাওয়া যাবেই—এই ভাবনায় প্রেরণা পেয়ে।

কিছুকাল পরে তার মামার ছেলে অর্জুনও এসে গেল। লম্বা স্বাস্থ্যবান শরীর, বয়স তেইশ-চব্বিশ, অক্ষরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি। লোকেরা বলল,বুড়া তোতা রাম-রাম কি বলবে।

কিন্তু চক্রপাণি ব্রহ্মচারী তাকে রেখে নিলেন। বেচারীর স্মরণশক্তিও অত্যন্ত ক্ষীণ ছিল। তাই পড়াশোনায় সে বিশেষ এগোতে পারেনি। একদিন মজা করে আমরা দুজন, পরস্পরের হাত টানাটানি করছিলাম। ঐ সময় আমার পা বেকায়দায় পড়ে এবং আমি অর্জুনকে নিয়ে তার ওপরে পড়ে যাই। একটা শব্দ হল আর হাঁটু থেকে পা 'ভেঙে গেল'। ব্রহ্মচারী রামনগরের এক মাঝিকে চিনতেন। তার হাড় জোড়া লাগানোর বেশ খ্যাতি ছিল। বিশেষত চক্রপাণি তার গুণগ্রাহী ছিলেন। নৌকোয় আমাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হল। ঘটনাক্রমে তাকে ঘাটেই পাওয়া গেল। সে হাত দিয়ে আমার পা ধরে একটা ঝট্‌কা দিল। ফট করে আওয়াজ হল। সে বলল, 'যাও ঠিক হয়ে গেলে।' সত্যি সত্যিই পা ঠিক হয়ে গেল। কিন্তু ব্রহ্মচারী ও অন্যান্যদের কথা অনুযায়ী আমি দৌড়ে তো নয়ই, হেঁটেও আসতে পারিনি। এই খেলার চিহ্ন এখনো আছে, আমার ডান পায়ের হাঁটুতে একটা চলমান কড়ি হয়ে আছে, ওঠা-নামা করা কোমলাস্থিতে যা কখনো কখনো বসার সময় টান হয়ে যাওয়া চামড়ার মধ্যে এসে কষ্ট দেয়।

আমি আসার আগেই বনমালী এখানে থাকত। আমি চলে যাওয়ার পরেও সে এখানে কয়েকমাস ছিল। সেও লঘুকৌমুদী পড়ত। কিন্তু আমরা এক গুরুর কাছে পড়তাম না। তবে হ্যাঁ, বেদের স্বরের অধ্যয়ন আমরা একসঙ্গে এক গুজরাটী বৈদিক ব্রহ্মচারীর কাছে আরম্ভ করেছিলাম। তিনি অস্‌সী নালার পারে এক বাগানে থাকতেন। শীতল দাসের আখড়া ছিল অন্য পারে। এক সময় হাত তুলে তুলে এক স্বরে, "হরিহি ও-ও-ম্‌-মা। গণা-আ-না-আং-ত্বা-আ"— পড়তে বেশ ভাল লাগত। যদিও ঐ সময় আমরা যজুর্বেদের পবিত্র স্তোত্র পাঠ করছিলাম। এর চেয়ে বেশী জ্ঞান এ সময়ে আমাদের ছিল না।

ব্যাকরণ পড়তে যেতাম পণ্ডিত মুখরাম পাণ্ডের কাছে। তিনি প্রথমে জগন্নাথ মন্দিরে পরে 'পুষ্করের' কিনারায় ছোট মঠের ছাদের এক কোণে একটা কুঠুরীতে একা থাকতেন। পণ্ডিত মুখরামজী পিসামশাইয়ের সুযোগ্য ছাত্রদের একজন। তাই সেই সম্পর্কের জন্য তিনি আমাকে সাধারণ ছাত্রদের চেয়ে অধিকতর সমাদর করতেন। সরযূপারী ব্রাহ্মণদের মধ্যে অন্য ব্রাহ্মণদের ছোঁয়া খাওয়া জাতি-নিয়মের বিরোধী ছিল। কিন্তু এই নিয়মকে আমি আগে থেকেই মানিনি। এখন পার্থক্য ছিল এই যে, আমি এই নিয়মকে খোলাখুলি নিন্দা করতাম। পড়ায় কতটা সময় দিতাম তা তো আমিই জানতাম, কিন্তু অন্যান্য সবাই আমাকে ভাল ছাত্র মনে করত। হিতোপদেশ আদির অর্থ করার ব্যাপারে আমি সমকক্ষ বিদ্যার্থীদের অনেক আগে থাকতাম। যাহোক, চক্রপাণি ব্রহ্মচারীর ওপর আমার সম্পর্কে এই সর্বজনীন ধারণার খুব ভাল প্রভাব পড়েছিল। তাই তিনি আমার শারীরিক প্রয়োজন সম্পর্কে খুব লক্ষ রাখতেন। আমার রান্না হত তাঁর সঙ্গে। তাঁর কৃষ্ণার দুধ এমনিতেই ঘন হত। উপরন্তু জ্বাল দেওয়া দুধে আধ ছটাক ঘি দিতে তাঁর ভুল হত না। এই রকম দুধ আমার একেবারে পছন্দ হত না। কিন্তু কি করব স্নেহের এই অত্যাচার সহ্য করতে হ্ত। মোতীরামের বাগানের অধিবাসীদের মাসে কম করেও দশ দিন নিমন্ত্রণে যেতে হত। আমার তো মাসে অর্ধেক দিনই নিমন্ত্রণ থাকত। আমি বেদপাঠ করতাম, পঙ্‌ক্তিতে পরিবেশনের সময় বেদপাঠক ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য বেশী বলে মনে করা হত। নিমন্ত্রণের অর্থ সাধারণ ডাল রুটি খাওয়া নয়, রান্না করা ভোজন। লুচি, ক্ষীর, হালুয়া তো মামুলী ভোজে হত। না হলে মালপোয়া, লাড্ডু, জিলাপি ও আরো নানা ধরনের মিষ্টি, দই, রায়তা ও আরো কত তরকারি। আর কোনো কোনো জায়গায় তো দুধকেও কেশর দিয়ে হলুদ রঙ করে দেওয়া হত। অনেক বার ভোজ আমাদের বাগানেই হত। যদি কখনো সম্মিলিত নিমন্ত্রণে যেতে হত তবে পণ্ডিত রবি দত্তের ভাগ্নে সেদিন সরবতের সঙ্গে ভাঙ বাঁটা মিশিয়ে জবরদস্তি করে খাইয়ে দিত।

তার অর্থ ছিল, সেদিনের বিকেল ও রাত্রির পড়া খতম। মোতীরামের বাগানের ছাত্রদের সংখ্যা এক ডজনের বেশী ছিল না। তাদের যতটা খাওয়া ও থাকার সুবিধা ছিল, সেই অনুযায়ী পড়াশোনায় তাদের মনোযোগ ছিল না, এতে সন্দেহ নেই।

গরমের সময় সাধারণত বিহার ও উত্তর প্রদেশের ছাত্ররা বাড়ি চলে যেত। ফিরে আসত আষাঢ়-পূর্ণিমা নাগাদ। বারাণসীর গরম থেকে গ্রামে গরমটা কিছু কম থাকে। তাছাড়া গরমের তাপে পড়াশোনা ভাল হত না। আর যেসব ছাত্ররা পরীক্ষা দিত, পরীক্ষার ফলের অপেক্ষায় তাদের পড়াশোনা বন্ধ থাকত। পণ্ডিত মুখরামজীও বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমি তো শুধু লেখাপড়া শিখতে বারাণসী আসিনি। গৃহের প্রতি বিরক্তিও আমার বারাণসী আসার কারণ ছিল। মোতীরামের বাগানে তিন-চার মাসের বাস এবং যজুর্বেদ ও শিবভক্তদের সংসর্গে আমার মনে আর এক বাতিক সওয়ার হয়েছিল। তা ছিল বৈষ্ণব-বিরোধী শিবভক্তি। ৩২টি বড় রুদ্রাক্ষের মালা আমার গলায় থাকত। আর কপালে ভস্মের ত্রিপুন্ড্র মুছে যেত রাত্রিতে ঘুমোবার পরই। রুদ্রাষ্টাধ্যায়ীর অনেক অধ্যায় ও মহিম্নস্তোত্র বারবার পড়ায় মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। প্রতি সোমবার বিশ্বনাথ দর্শনে যেতাম নিয়মিতভাবে। গরমে চক্রপাণি ব্রহ্মচারীও নিয়মিতভাবে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দুর্গাচকের সামনের কূয়ার জল খাওয়াতে যেতেন। কিন্তু কি জানি কেন কাছে হওয়ার জন্যই হোক অথবা অন্য কোনো কারণে আমি সেখানে খুব কম যেতাম। বারাণসীতে বৈষ্ণব (রামানুজীয়, নিম্বার্কীয় ইত্যাদি) খুব কমই দেখা যায়। কিন্তু অযোধ্যার বৈরাগী আমার বাবাকে ঠকিয়ে কণ্ঠী বেঁধে দিয়েছিল দেখে হয়তো আমার কিছুটা রাগ হয়েছিল। নয়তো কেন আমি বৈষ্ণবদের বিরুদ্ধে পুরানো খিস্তি-খেউড়ের বই খুঁজতাম। 'চক্রাঙ্কিত মত নিরূপণ' ও আরো দুয়েকটি ঐ ধরণের 'খণ্ডন-মণ্ডন'-এর বই বড় সযত্নে খুঁজে বের করেছিলাম। আমি বারবার বলায় বাবাকে তাঁর গলার কণ্ঠী ছিড়ে ফেলে দিতে হয়েছিল।

সব মিলিয়ে দেখলে বলা যেতে পারে যে আমি আমার সময় কাজে লাগিয়েছিলাম, যদিও আমি তাতে সন্তুষ্ট ছিলাম না। বারাণসীতে গরম ছিল বটে। দুপুরটা তো কোনো রকমে কাটিয়ে দিতাম। বিকেল চারটা বাজতেই গঙ্গার ধারে ছুটতাম। দুঘণ্টা গঙ্গায় সাঁতার কেটে ও খেলে কাটাতাম। কখনো সাঁতরে গঙ্গার ওপারে যাইনি। যাইনি আমার কোনো সঙ্গী ছিল না বলে। অস্সীর অর্ধেকটার বেশী আমি রোজই সাঁতরে পেরিয়ে যেতাম।

গরমের সময় রঘুবংশ, বাল্মীকির রামায়ণ ও অন্যান্য সরল কাব্যগ্রন্থ খুব মন দিয়ে পড়েছিলাম। তার ফল হয়েছিল এই যে, সংস্কৃত গ্রন্থ পড়া আমার কাছে আর অন্ধকার ঘরে হাত্ড়ে বেড়ানোর মতো ছিল না। একদিন কূয়ার ধারের বাবা আমাকে দিয়ে সত্যনারায়ণের কথা পড়িয়ে ছিলেন। এখানকার সমাজে কথার ততটা মান ছিল না। কিন্তু কথার সঙ্গে সঙ্গে আমি অর্থ বলে দিচ্ছিলাম। লোকজন আমার খুব প্রশংসা করলেন। সঙ্গী ছাত্র মণ্ডলীর তো প্রশংসা করারই কথা। কারণ খেলায় খেলা আর মাগনা প্রসাদ।

আষাঢ় মাসে আবার ছাত্ররা আসতে শুরু করল। মুখরাম পণ্ডিতও এসে গেলেন। তিনি কলকাতার ব্যাকরণের প্রথম পরীক্ষা দেওয়ার পরামর্শ দিলেন। আমিও তা মেনে নিলাম। তাঁর অন্নবৃত্তি মিলত মোতীরামের বাগানের সেই প্রসিদ্ধ অন্নছত্র থেকেই। ছত্রের পরিদর্শক নতুন ছাত্র ভর্তির জন্য এসেছিলেন। অনেক ছাত্র প্রার্থী হয়ে এসেছিল। আমিও গিয়েছিলাম। হাতের লেখা দেখলেন, কিছু প্রশ্ন করলেন। তারপর আমার নাম বৃত্তি প্রাপকদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। চক্রপাণি ব্রহ্মচারী ও নিমন্ত্রণের কৃপায় আমার ঐ বৃত্তির তেমন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু লক্ষ্মী ঘরে এলে তাঁকে কে ফিরিয়ে দেয়?

বারাণসী থাকার সময় আমি পূর্ণানন্দ স্বামীকে খুঁজে বার করেছিলাম। তাঁর সঙ্গে বেরিলিতে দেখা হয়েছিল। দত্তাত্রেয় পাদুকা খুঁজে বার করা তেমন মুশকিলও ছিল না। কিন্তু পূর্ণানন্দজী তখন সেখানে ছিলেন না। তাঁর গুরুকে দেখলাম। বড় বড় জটা, একেবারে ন্যাংটা ধুনির কাছে ছিলিমের পর ছিলিম গাঁজা ও চরস ওড়াচ্ছিলেন। তাঁর চারপাশে 'জী মহারাজদের' পলটন বসেছিল। একদিন তিনি বলছিলেন—"আজ গিয়েছিলাম বিশ্বনাথ দর্শন করতে। পাণ্ডা বলল—বাবা কিছু ভোগটোগ দিচ্ছেন না। পুরুষাঙ্গ থেকে একটা সিকি বার করে ফেলে দিলাম। পাণ্ডা লাল চোখ দেখাতে লাগল। আমি বললাম—'চোখের মাথা খেয়েছিস? এটাই তো বিশ্বনাথ।' অন্য পাণ্ডা তাকে ধমকাল—'চেন না কোন মহাপুরুষের সঙ্গে কথা বলছ?'"

চারপাশের মণ্ডলী বলে উঠল—'দয়ালু! সবার কি আর চোখ থাকে...।'

বর্ষা শুরু হওয়ার আগেই স্বামী পূর্ণানন্দজী এসে গেলেন। তাঁর গুরুকে আমি শ্রদ্ধা করতে পারিনি। কিন্তু কিছুটা নেপালে জন্ম হয়েছে বলে এবং কিছুটা তাঁর শান্ত প্রকৃতির জন্য পূর্ণানন্দজীর সঙ্গে আমার মধ্যে অধিকতর বোঝাপড়া হল। তাতে সহায়ক হয়ে গেল মন্ত্রতন্ত্রের প্রতি আমার নবজাত আকর্ষণ। লোকমুখে শুনেছিলাম যে নেপালের দিকে ভাল ভাল মন্ত্রবেত্তা থাকেন। আমি ঐ মন্ত্রতন্ত্রের খোঁজেই পূর্ণানন্দজীর কাছে বার-বার যেতাম। তিনিও ধীরে ধীরে আমার শ্রদ্ধাকে ওদিকে আরো বেশী বাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। 'জিন খোঁজা তিন পাইয়া' অনুসারে ক্রমশ লিখিত, মুদ্রিত নানা তন্ত্র ও ভূর্জপত্র পেলাম। আর যা হল তা তো বলছিই। তন্ত্রে মন পুরোপুরি ডুবে যাওয়ায় সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান বেড়ে যেতে লাগল। এতো নগদ লাভ। একটি রসায়নের পুস্তকে তামাকে সোনা বানানোর ভাল বিধি দেখে আমি তা প্রয়োগ করতে চাইলাম। হরিতকী, সোনামুখী এবং আরো অনেক জিনিষ বাঙ্গালিটোলার একটা দোকান থেকে কিনে আনলাম। বারাণসী থেকে বছওয়লকে আরো নির্জন ও এই কাজের জন্য অনুকূল মনে হল। সেখানে যাগেশের অনুমোদন এবং সমর্থনও ছিল। যাগেশ আমার প্রত্যেক কথায় 'হ্যাঁ, ভাই ঠিকই তো' বলার জন্য প্রস্তুত ছিল। এক অথবা সওয়া মণ ঘুঁটের আগুনে এই রসায়ন জ্বাল দেওয়া হল। কিন্তু তামা আদৌ সোনা হল না। কিন্তু একবারের ব্যর্থতাতে বিশ্বাস কি আর ভেঙে যায়।

বারাণসী ফিরে এসেও পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে এই পাগলামি চলতে লাগল। স্বামী পূর্ণানন্দ 'অনঙ্গরঙ্গ' নামে এক গোর্খা (নেপালী) ভাষার হস্তলিখিত পুস্তক দিয়েছিলেন। বইটা ছিল কামশাস্ত্রের (লোদী শাসনকালে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থের অনুবাদ)। কিন্তু তাতে অনেক ওষধীর কথাও ছিল। আমি তার কপি করার সময় তা গোর্খা ভাষায় না লিখে, সংস্কৃত ভাষায় লিখি। এই আমার অনুবাদের প্রথম প্রয়াস। এই গ্রন্থে সুগন্ধী তেলের উল্লেখ ছিল। আমি তিল তেলে প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিয়ে বোতলে বন্ধ করে রোদে কয়েকদিন রেখে তেল বানিয়েছিলাম। একেবারে সফল হইনি তা বলতে পারব না। কিন্তু একথা নিশ্চয় বলা চলে যে এর চেয়ে ভাল তেল বাজারে অর্ধেক দামেই পাওয়া যেত।

মন্ত্রতন্ত্রের সন্ধানে ছিলাম, শুধু তাই নয়, বরঞ্চ আমি মন্ত্র-তন্ত্রের বিশেষজ্ঞ, এই ধরণের খ্যাতি ধীরে ধীরে আমার সীমাবদ্ধ ছাত্রবন্ধুদের মহলে ছড়িয়ে পড়ল। এক বড় জ্যোতিষীর কাছে তাঁর দেশের এক ছাত্র থাকত। তার আমার মন্ত্রশক্তি উপলব্ধি করার সুযোগ হয়েছিল। বেচারী দক্ষিণার একটি একটি করে পয়সা জমিয়ে ভাগবতের পুঁথি কিনেছিল। দুই তিন দিনও হয়নি সে চক থেকে পুঁথিটি নিয়ে এসেছিল, অথচ এরই মধ্যে কেউ তা মেরে নেয়। চিন্তায় আকুল হয়ে সে আমার কাছে এসে অনুতাপ করতে লাগল। আমি খুব গম্ভীর হয়ে বললাম—'এতে ঘাবড়ানোর কি আছে? বই হজম করে ফেলবে, তা হতে পারে না। আপনি যান। লোলার্ক

কুণ্ডের দেবীর চত্বরের একটি ইট উলটে দিয়ে আসুন। আর এই মন্ত্রের সওয়া লাখ জপ করুন। কিন্তু আগে আশেপাশে যারা থাকে তাদের জানিয়ে দিন যে আপনি ভয়ংকর পুরশ্চরণ করতে যাচ্ছেন। দেবীর ইট উলটে দেওয়া আর এই অমোঘ মন্ত্রের জপ রসিকতা নয়। যদি এই নতুন চোরের আক্কেল থাকে তবে সে শুধরে নেবে। তবে আপনি আপনার কুঠরিতে তালা না লাগিয়ে মাঝে মাঝে আসা-যাওয়া করবেন।'

ছাত্রটি আমার কথা অনুসারে কাজ করল। বিকেল বেলা সে খুশী হয়ে আমার কাছে ছুটে এল এবং রাশি রাশি ধন্যবাদ দিতে লাগল—'আপনার কৃপা, শুধু আপনার কৃপা। নয়তো এই বই ফিরে পাওয়ার কথা ছিল না। আমি তালা না লাগিয়ে কুঠরির বাইরে গিয়েছিলাম। সন্ধেয় ফিরে এসে দেখি বই দরজার ভেতরে রাখা আছে। আমি জপ পর্যন্ত শুরু করতে পারিনি। ইঁট ওলটাতেই এই অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেছে। আর নাম বলে কি হবে। যে বই হজম করতে চেয়েছিল, তাকেও জেনে গেলাম। ব্যাটার দু-বারই পায়খানা হয়েছিল। আর আমার পুঁথি কে ঘরে রাখে? আমি চিরকাল আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। এরই নাম মন্ত্রবল।...'

এই ছাত্রটির লেখাপড়ার সঙ্গে সম্পর্ক বিশেষ ছিল না। ছত্র ও নিমন্ত্রণে ভোজন, এখানে-ওখানে মোসাহেবী করা ও আড্ডা মারা এই ছিল তার কাজ। এই ধরণের লোকের দ্বারা আমার নাম উচ্চ মধ্যবিত্তদের মধ্যে না হলেও নিম্নবিত্ত মানুষের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা ছিল, যাকে আমি সবচেয়ে বেশী ভয় পেতাম। তাকে আমি অনেক বুঝিয়েছি, ধমকও দিয়েছি। তবেই সে কথাবার্তায় কিছুটা সংযত হয়েছিল। একদিন সে সবিনয়ে আমাকে বলল—'আমি আপনার মন্ত্রের কথা কাউকে বলি না। আপনি তো জানেন জ্যোতিষী আমাকে কতটা কৃপা করেন। তাঁর বেচারী বোন নিঃসন্তান। অনেক অনুষ্ঠান হয়েছে, ওষুধ বিষুধও খাওয়ানো হয়েছে। কিন্তু তাঁর বন্ধ্যাত্ব ঘোচেনি। স্বামী-স্ত্রী ওরা শুধু দুজন। ওদের বড় ইচ্ছা আপনি ওদের জন্য একটা অনুষ্ঠান বলে দেন।

'তাহলে আপনি ওদের কাছেও সব খবর পৌঁছে দিয়েছেন?'

'আপনি রাগ করবেন না। আমি আমার ঠোঁট সেলাই করে দিয়েছি। কারু কাছে একটা উল্লেখও করি না। কিন্তু জ্যোতিষীজীর পরিবারের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক তা তো আপনি জানেন। তাছাড়া আপনি আমাকে বলে দেওয়ার আগেই আমার মুখ থেকে যে কথা বেরিয়ে গেছে, তাকে কিভাবে ফেরানো যাবে?'

আমার বন্ধুর দাবি বেড়েই যেতে লাগল—'মহিলা খোদ আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। অনুষ্ঠানে যে খরচ লাগবে, তা দিতে উনি প্রস্তুত।' আমি তন্ত্রের গ্রন্থে বন্ধ্যার পুত্রযোগের অনেক প্রয়োগ দেখেছিলাম। কিন্তু আমি এই ব্যবসা করতে চাইনি। ঐ সময়ে এ ব্যাপারে আমার সংকোচ হাজার গুণ বেশী ছিল, যদিও মন্ত্র-তন্ত্রের প্রয়োগ কতদূর টেনে নিয়ে যেতে পারে, সে বিষয়ে আমার কোনো ধারণা ছিল না। একদিন ছাত্রটি কাঁদ-কাঁদ মুখে বলতে লাগল—'ঐ বাড়িতে আমার ওপর আর আস্থা থাকবে না। আপনি একবার গিয়ে বরঞ্চ বলে আসুন এই কাজ অসাধ্য। তবু একবার নিশ্চয় চলুন। নয়তো আমাকে মিথ্যাবাদী বানানো হচ্ছে।...'

পুঁথিতে বন্ধ্যোপচার পড়ে সমস্যার মোকাবিলা করা চলে না। কিন্তু আমি গেলাম। আমার বয়স আমার বিরুদ্ধে যে রায়ই দিক না কেন, আমাকে যাতে আনাড়ি ভাবে আমি তা হতে দিইনি। আমি শুধু এইটুকু বললাম, 'বন্ধ্যাত্ব নিবারণের ব্যবস্থা আমি পড়েছি। কিন্তু কোনো গুরুর তত্ত্বাবধানে আমি তা প্রয়োগ করিনি। আর মন্ত্র বিদ্যায় গুরুর নির্দেশ ছাড়া কিছু করা বিপজ্জনক।'

মহিলার ওপর আমার স্পষ্ট কথার ভাল প্রভাব হল। তাতে আমিও প্রাণে বাঁচলাম।

যখন-তখন স্বামী পূর্ণানন্দের কাছে চলে যেতাম। মন্ত্র-তন্ত্রের নানা গ্রন্থ পড়ে তাঁর 'গুরুভাই' অবধূতানীকে সিদ্ধযোগিনী বলে আমার সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু অবধূতানী কিছুদিন কাশীতে থেকে নেপাল চলে যান। যজুর্বেদ পড়তে দেখে স্বামী পূর্ণানন্দ আমাকে নেপালী কাগজে লেখা একটি অসম্পূর্ণ যজুর্বেদ সংহিতা দিয়েছিলেন। কয়েক বছর পরে আমার কাছে সুরক্ষিত নয় বলে তা আমি লালচন্দ্র গ্রন্থাগারকে (ডি·এ·ভি·কলেজ, লাহোর) প্রদান করে দিলাম। মন্ত্রতন্ত্রের ওপর আমার শ্রদ্ধা ও তা নিয়ে পরিশ্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। মন্ত্রতন্ত্রের বড় ধরনের প্রয়োগ আমার পক্ষে অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। আমি পূর্ণানন্দজীকে গুরু হিসেবে মেনে নেব তা তিনি কখনো আশা করেননি। আর আমিও তা করিনি। কোনো মন্ত্র বা দেবতার সিদ্ধির জন্য প্রয়োগব্যবস্থা বলে দেওয়ার ব্যাপারে তাঁকে ধরাধরি করতে লাগলাম। আশ্বিনের নবরাত্র যতই কাছে আসতে লাগল, ততই আমার আগ্রহ বাড়তে লাগল। আর তাঁকে আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করতে হল।

নবরাত্রে পণ্ডিত মুখরামজীর বাড়ি যাওয়ার কথা। তাই মন্ত্রসিদ্ধির জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান তাঁর কুঠরি। ছোট মঠে ঐ একটিই কোঠাঘর। সেটা ছিল এক কোণে (পূ-উত্তর)। মন্দির, রান্নাঘর ও সাধুদের থাকার জায়গা ছিল পশ্চিম দিকে, যা এই কুঠরি থেকে বেশ কিছুটা দূরে ছিল। কুঠরির নিচে যে সব ছাত্ররা থাকত তারাও বাড়ি চলে গিয়েছিল। একমাত্র ছিল কোমর বাঁকা দুবলা-পাতলা আশী বছরের বুড়ী যাকে খেপিয়ে ছাত্ররা বেশ মজা পেত। বুড়ীও বিচলিত না হয়ে বেছে বেছে গাল দিত— 'গোলামের বাচ্চা...' নারকেলের ডাবায় কল্কে রেখে ধূমপান করার সময় ছাড়া অন্য সময় বুড়ীমা ছেলেদের মুখ থেকে ভাল কথাও শুনতে চাইত না। বুড়ী এই মঠে আছে ত্রিশ বছর। বৃদ্ধ মোহন্ত তাকে তরুণী বিধবা বলে মুজফ্‌ফরপুর জেলা থেকে এনে আশ্রয় দিয়েছিলেন। বংশীদাস এখনও জীবিত ছিলেন কিন্তু বার্ধক্যের জন্য এখন তিনি চোখ-কানের সঙ্গে মঠের অধ্যক্ষতাও হারিয়েছিলেন। বুড়ী তাঁকেও অনেক গালিগালাজ করত। কিন্তু মোহন্ত তা শুনবে কি করে? খাবার-দাবার দিতে বুড়ী এখনও বংশীদাসকে সাহায্য করত।

আমার মন্ত্রসাধনের কুঠরির ঠিক নিচেই বুড়ী থাকত। কিন্তু তাতে আমার কোনো বিঘ্ন হওয়ার ভয় ছিল না। স্বামী পূর্ণানন্দ ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন চক্রপাণি ব্রহ্মচারী যিনি আমার মন্ত্রসিদ্ধির কথা জানতেন। তাঁর দায়িত্ব ছিল রাত্রিতে শুধু একবার কৃষ্ণার আধসের গরম দুধ এনে দেওয়া, যা তিনি একসের দুধ জ্বাল দিয়ে তাতে এক ছটাক ঘি মিশিয়ে নিয়ে আসতেন।

পণ্ডিত মুখরামের সব গ্রন্থ সযত্নে এক ধারে রেখে দেওয়া হল। সেগুলো সংখ্যায় বেশী ছিল না। বাকি মালপত্র নিচের কুঠরিতে রেখে এলাম। এই পরিচ্ছন্ন কুঠরিতে শুধু আমার আসন ছিল। মধ্যিখানে পাকা মেজের ওপর গঙ্গার মসৃণ মাটি দিয়ে কিছুটা উঁচু করে আমি সুন্দর ষট্‌কোণ তৈরী করেছিলাম যার কেন্দ্রে 'ওঁ' আর ছয় কোণে 'শ্রীং হ্রীং ক্লীং ফট্ স্বাহা' মাটি দিয়ে উঁচু করে সুন্দর অক্ষর বানিয়ে লিখেছিলাম। ভোরে অন্ধকার থাকতেই আমি গঙ্গাস্নান করে আসতাম। পাশের ফুল বাগান থেকে কিছু ফুল এনে ধূপ-দীপ দিয়ে 'চক্রের' পূজা করতাম। তারপর পূর্ণানন্দের কথা অনুযায়ী 'শ্রীং হ্রীং ক্লীং' মন্ত্র রুদ্রাক্ষের মালায় জপ করতাম। তিনি বলেছিলেন যথাযথ নিয়ম অনুযায়ী নয় লক্ষ বার এই মন্ত্র জপ করলে সিংহবাহিনী দুর্গার সাক্ষাৎ দর্শন হবে, তিনি "বরং ব্রূহি" বলবেন। তখন ধন, বল, বুদ্ধি, বিদ্যা যা তোমার চাওয়ার আছে চেয়ে নিও। প্রথমে দিকে আমি অল্পশ্রম সাধ্য যক্ষিণী, অথবা হনুমান আদি অন্যান্য ছোটখাট

দেবতার সিদ্ধি চেয়েছিলাম। কিন্তু পূর্ণানন্দের রায় হল—কিছুটা বেশী পরিশ্রম করতে হলেও আদ্যাশক্তির সিদ্ধিতে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চার ফলের সাধন হবে।

সারাদিন পশ্চিম ও দক্ষিণের দুই দরজাই বন্ধ থাকত। আর আমি জপে তন্ময় হয়ে থাকতাম। বৃদ্ধ ছাত্র পণ্ডিত রামকুমার দাস হয়তো আমার পূজা সম্পর্কে জানতেন। কিন্তু কখনো তিনি এ নিয়ে কথাবার্তা বলতে চাননি। রাত্রিতে কয়েক ঘণ্টা ঘুমনো ছাড়া বাকি সময়টা জপ ও পূজাতেই কেটে যেত। সন্ধ্যায় ব্রহ্মচারী দুধ দিতে আসতেন। তাছাড়া কোনো মানুষের সঙ্গে দেখা হত না। ব্রহ্মচারীর সঙ্গেও দুয়েকটার বেশী কথা হত না। পাঁচ-ছয় দিনের তো কথাই নেই, সাত দিনও কেটে গেল কিন্তু সিংহবাহিনীর বাহনের গলার ঘণ্টা শুনতে পেলাম না। রাত্রিতে ছাদের দিকে যখন তাকিয়ে দেখতাম, তখন লোহার কড়ির ওপর পাথরের খণ্ড খসখসে হওয়ার দরুন সব রেখা টিমটিমে ঘিয়ের প্রদীপের আলোয় একটু বেশী স্পষ্ট মনে হত। সেখান থেকে কিছু চেহারার আকার বেরিয়ে আসতে দেখা যেত। কিন্তু রেখাগুলি স্পষ্ট হয়ে যেতেই চেহারাটা বিলীন হয়ে যেত। আটটি দিন ও রাত কেটে গেল। ঐ দিন সূর্যাস্ত থেকেই আমার বুক দুরুদুরু করতে লাগল। আজ পূজার জন্য বিশেষ সামগ্রী এনে রেখেছিলাম। তার মধ্যে অন্যান্য জিনিষ ছাড়া বেশ কিছু ধুতুরার পাকা ফলও ছিল। আমি ভক্তিভরে গদগদ হয়ে স্তুতিপুরঃসর জগদম্বার পূজা করলাম। 'কুপুত্র জায়েত ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি'—ভাবাবেগের সঙ্গে বারবার বললাম। জপের শেষভাগও সমাপ্ত হল। চিত্ত ভগবতীর গুণের চিন্তন, কান তাঁর নূপুর নিক্কণের শ্রবণ, আর চোখ যখন তখন চারপাশ দেখাতে নিমগ্ন ছিল।' ধীরে ধীরে দিন কেটে গেল। সন্ধ্যা হল। অন্ধকার হতেই ব্রহ্মচারী দুধ দিয়ে গেলেন। আমি তাঁর সঙ্গে একটি কথাও বলিনি। তিনি চলে যাওয়ার পর আমার মনে প্রতিক্রিয়া শুরু হল। আমি সব নিয়ম সম্পূর্ণরূপে পালন করেছি। কোনো সামগ্রীরই ঘাটতি ছিল না। মন্ত্রের উচ্চারণও পুরোপুরি শুদ্ধভাবে করেছি। মন্ত্রের প্রভাব তো অমোঘ, তাহলে কি কারণে জগদম্বা আমাকে দর্শন দিলেন না? অনেক চিন্তাভাবনা করে আমার এই সিদ্ধান্ত হল যে, আমার হতভাগ্য জীবনই এই ব্যর্থতার কারণ। আমি স্থির করলাম, 'এই জীবন রেখে আর লাভ নেই। তৎক্ষণাৎ আমি দুটো চিঠি লিখলাম। একটিতে লিখলাম যে আমার দেহকে যেন মণিকর্ণিকায় পুড়িয়ে দেওয়া হয়। অন্যটিতে বাবাকে এই হতভাগ্য পুত্রের জন্য শোক না করার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছিল। ধুতির খুঁটে অথবা পৈতায় হয়তো দুটি চিঠিই বেঁধে রেখেছিলাম। পূজায় যে ধুতুরার ফল ভোগ দিয়েছিলাম তার দুইটি ফলের সব বীজ মিছরির সঙ্গে থেঁতো করে এই অর্ধ-অবলেহ জল দিয়ে গিলে ফেললাম। তারপর বিছানা কুঠরি থেকে বার করে পশ্চিমের ছাদে বিছিয়ে পড়ে রইলাম।

এরপর আমার যে অবস্থা হয়েছিল, তা মঠে যারা থাকতেন তারা বলেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন হয়তো পণ্ডিত রামকুমার দাস ওপরে প্রস্রাব করতে আসেন। তিনি আমাকে ছাদে পাক খেতে দেখেন। অন্যদের সাহায্য নিয়ে তিনি আমাকে নিচে নিয়ে যান। কিছু সময় আমি কথাবার্তা বলতে পারিনি। পরে বিক্ষিপ্তভাবে বলছিলাম। আমার মনে আছে ধুতুরা ফল খাওয়ার পর বমি হয়েছিল এবং পেটের ভেতরে থেকে তার অনেকটা বেরিয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় কথা মনে পড়ে—বেশ বেলা হয়েছিল। আমাকে কয়েকজন লোক জোর করে ধরে রেখেছিল। আমার সঙ্গে মানুষের মতো ব্যবহার করার জন্য আমি তাদের অনুনয়-বিনয় করছিলাম।

সেই দিনই হঠাৎ যাগেশ এসে গেল। ঐ অবস্থায়ও যাগেশকে দেখে আমি শান্তভাবে কথা বলতে লাগলাম। আমি বললাম, আমাকে পুকুরে নিয়ে চল। আমি ভাল করে মুখ ও মাথা ধুতে চাচ্ছিলাম। যাগেশ আমাকে পাকা সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে পুকুরে নিয়ে গেল। আমি পুকুরে লাফিয়ে

পড়লাম। যারা দেখছিল, তারা ঘাবড়ে গেল। যাগেশও যা পারে ছিল, সেই অবস্থায় লাফিয়ে পড়ে আমাকে ধরে ফেলল। আসলে আমি গরমে অস্থির হয়ে ঝাঁপ দিয়েছিলাম। বের করা হল। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যা নাগাদ আমার জ্ঞান ফিরেছিল, নাকি তৃতীয় দিন, তা বলতে পারব না। সেখান থেকে আমাকে মোতীরামের বাগানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ইতিমধ্যে আমি অনেকটা প্রকৃতিস্থ হয়েছিলাম। কিছুটা বিরক্ত ছিলাম। কিন্তু কথাবার্তায় অসংলগ্নতা ছিল না। সঙ্গীরা বলল—আমি অনেকটা ধুতুরা খেয়ে ফেলেছি। পেট আগুনে পুড়ছে। পোড়া তামাক ও কয়লা গুঁড়ো করে খাওয়াও। তাতে পেট সাফ হয়ে যাবে। তা আমাকে বোধহয় দেওয়াও হয়েছিল। কিন্তু পেটে তখন কি আর কিছু ছিল! আমার এই অবস্থায় না ডাক্তার ডাকা হয়েছে, না কবিরাজ। ভূতপ্রেত ঝাড়ার ওঝা এসেছিল কিনা আমার জানা নেই।

বাগানের মাঝখানের চত্বর থেকে চাঁদনী রাতে লেবুগাছের দিকে তাকিয়ে দেখতাম, তার ডাল ধীরে ধীরে বাড়তে থাকত এবং শেষে হাজার অস্ত্রসজ্জিত পদাতিক ও ঘোড়-সওয়ার সৈনিকের সারিতে পরিণত হত। ওরা মার্চ করে আমার দিকে আসত, আমার কাছে পৌঁছতে যখন পাঁচ-সাত কদম বাকি থাকত এবং আমি পেছনে যাওয়ার কথা ভাবতাম, তখন তারা আবার পেছনে সরে গিয়ে ছোট ছোট পাতা হয়ে যেত।

এভাবে প্রাণকে বাজী রেখে আমি মন্ত্রসাধনা করেছিলাম।

৬

বারাণসীতে পড়াশোনা (২)

অন্যান্য দিকে ভাল হয়ে যাওয়ার পরও বইয়ের অক্ষরকে মনে হতে লাগল যেন পৃষ্ঠায় কালি মাখিয়ে রাখা হয়েছে। যাগেশের সঙ্গে আমি বাড়ি চলে গেলাম। সপ্তাহ খানেক পরেও চোখের দৃষ্টির অবস্থা একই রকম রইল। এরই মধ্যে কলকাতার পরীক্ষা দেওয়ার নিদর্শনপত্র ভর্তি করার সময় পার হয়ে গেল। আবার যখন অক্ষর পড়তে শুরু করলাম, তখন বারাণসীতে (অক্টোবরে) ফিরে গেলাম।

ইতিমধ্যে আমার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছিল। মন্ত্রতন্ত্র, দেব-দেবীর ওপর আমার বিশ্বাস ভেঙে গিয়েছিল, সেকথা তো বলতে পারব না। তার সম্ভাবনাও ছিল না। কেননা আমার চারপাশের বিদ্বান-মূর্খরা এই বিশ্বাস বাড়ানোর সহায়ক ছিল। তবে হ্যাঁ, আমি আবার সেইরকম অভিজ্ঞতা লাভ করতে প্রস্তুত ছিলাম না। ধর্মীয় বায়ুমণ্ডলে ওড়ার সাথে সাথে শক্ত পৃথিবীতেও পা রাখা প্রয়োজন, সেদিকে আমার দৃষ্টি রইল। সাধু ও ত্যাগীদের সমাজেও ইংরেজী জানা লোকের কদর দেখে, আমি কিছুটা সময় সেই উদ্দেশ্যে দেওয়ার জন্য স্থির করলাম। আনন্দবাগে এক তরুণ ব্রহ্মচারী থাকতেন। তাঁর সম্পর্কে চক্রপাণি ব্রহ্মচারী বলতেন যে, তিনি সব বিলাতী বিদ্যা পাস করেছেন। আমি একদিন গিয়ে দেখলাম যে ভাস্করানন্দজীর সমাধির পূর্বদিকের বাড়ির ওপরের সিঁড়িতে লেখা আছে—'কৃপা করে এখানে আসার কষ্ট করবেন না।'

আমি সেখান থেকেই ফিরে এলাম। কিন্তু চক্রপাণি কোনোভাবে তাঁর কাছে পৌছে গেলেন। তাঁর কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতিও নিয়ে এলেন যে তিনি আমাকে ইংরেজী পড়াবেন। কিন্তু বাড়িতে আমাকে না পড়িয়ে তিনি ঠিক করেছিলেন যে তিনি বিকেলে বেড়াতে বেরিয়ে আমার বাসস্থানে এসে আমাকে পড়াবেন। আমি এসময়ে স্বামী অনন্তাশ্রমের লিমডী-ছত্রে থাকতাম। আমি কয়েক মাস তাঁর কাছে পড়েছিলাম। তার মধ্যে আমি ষষ্ঠ শ্রেণীতে যে সব রীডার পড়তে হত তা শেষ করেছিলাম।

তন্ত্রমন্ত্র ও পূজাপাঠ না করায় আমার অনেক সময় বাঁচত। সেই সময়টা আমি সংস্কৃত, ইংরাজী এবং হিন্দি বই ও খবরের কাগজ পড়ার কাজে লাগাতে শুরু করলাম। 'বিদেশ যাত্রা'র মামলা বারাণসীতে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, সেইজন্য আমার খবরের কাগজ পড়ার আগ্রহ হয়েছিল। বাবু শ্রীপ্রকাশ বিলাত থেকে ফিরে আসার পর তাঁর অগ্রওয়াল সমাজ তাঁকে জাতিচ্যুত করেছিল। তাই ঐ জাতির পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করা হয়েছিল। পঞ্চায়েতের পক্ষে সমুদ্র যাত্রার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিচ্ছিলেন পণ্ডিত শিবকুমার শাস্ত্রীর মতো ধুরন্ধর পণ্ডিত। মকদ্দমার বিবরণ নিয়মিতভাবে সংবাদপত্রে ছাপা হচ্ছিল।কচৌড়ীগলিতে অন্নপূর্ণার মন্দিরের দিকে যাওয়ার রাস্তার শেষ দিকে একটি সংবাদপত্রের পাতা টাঙানো থাকত। আমার মতো কপর্দকহীন যে সব মানুষের খবরের কাগজ পড়ার সখ ছিল, তারা তা পড়ত। এই সখ বাড়তে বাড়তে চকে যাওয়ার পথে কারমাইকেল লাইব্রেরী ও রীওঁয়া কুঠিরে এক তরুণ ছাত্রের কাছে আমাকে নিয়ে যেতে লাগল। দুর্গাকুণ্ডেও বই ও হিন্দি সংবাদপত্রের একটি কেন্দ্র খুঁজে পেলাম। সেখানেই প্রথমদিকে আমি 'সরস্বতী' পড়তে শুরু করি। তখন খান্নার আমেরিকা ভ্রমণের বিবরণ বেরোচ্ছিল। স্বামী সত্যদেব পরিব্রাজকের দু-একটি ব্যাখ্যানও (চেনা ও বাছাই করা তরুণদের গোদৌলিয়ার সামনে তাঁর বাসস্থানের একটি ঘরে) শোনার সুযোগ পেয়েছিলাম।

এই সময় যে আড়কাটিরা ফুসলিয়ে দ্বীপে পাঠিয়ে দিত, তাদের থেকে সাবধান থাকা এবং দ্বীপের কষ্ট সম্বন্ধে লেখা তাঁর হ্যান্ডবিল পড়ার সুযোগ হয়েছিল। মনে হয় এ বিষয়ে বেশ কয়েকটি লেখা পড়েছিলাম, তাই কোন আড়কাটির সঙ্গে মোকাবিলার জন্য তক্কে তক্কে ছিলাম। এদিন আমি দশাশ্বমেধ থেকে সিকরৌল যাওয়ার রাস্তা দিয়ে কোনো জায়গায় যাচ্ছিলাম। একটি লোক আমাকে এসে জিগ্যেস করল—'চাকরি করতে চাও?'

'কি চাকরি?'

হয়তো আমার মাথায় চন্দন ছিল অথবা ছাত্রের বেশ দেখে সে বুঝতে পেরেছিল যে আমি ব্রাহ্মণ। সে বলল—'বাবুর রান্না করতে হবে।'

মজা করার জন্য আমি গম্ভীরভাবে বললাম, 'মাসে কত মিলবে?'

'বিশ-টাকা মাইনে কিন্তু বারাণসী থেকে কিছুটা দূরে যেতে হবে।'

এবার আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম যে লোকটা আড়কাটি। আমি আরো স্বস্তির সঙ্গে বললাম—'ভাই, পাঁচ দিন ধরে আমি চাকরির খোঁজে ঘুরে মরছি। তা পেলে তো তোমার বড় অনুগ্রহ বলে মনে করব।'

তারপর সেই চাকরি, তার আরাম ও আয় সম্পর্কে কথা বলতে বলতে সে আমাকে ইংলিশিয়া লাইনে এক জায়গায় নিয়ে গেল যেখানে মেথরদের ঝুপড়ির সামনে বর্তমানে এক জহুরীর বাংলো আছে। সে-সময় চারদিকে ইটের দেয়ালে ঘেরা একটি বাগান ছিল, যার দক্ষিণে পাকা সড়কের দিকে কয়েকটি সাধারণ পাকা বাড়ি ছিল। ভেতরে গিয়ে দেখলাম সেখানে কয়েক ডজন দেহাতী মানুষ বসে আছে। তাদের মধ্যে আমার বয়সী একটি ছেলেও ছিল।

আমি তাকে জিগ্যেস করলাম—'বাড়ি কোথায়?' উত্তর পেলাম, 'আজমগড় জেলায়, দেওকলী।' দেওকলী। আমার গ্রামের খুব কাছে। আবার জিগ্যেস করলাম— 'এখানে কেন বসে আছো?' 'চাকরির জন্য। বাবু ভাল চাকরি দিচ্ছেন।'

আমি তখনো আনকোরা ছিলাম। নিজেকে সংযত রাখতে পারিনি। উত্তেজিত হয়ে আমি ছেলেটাকে বলতে শুরু করলাম—

'বাবু, ভাল চাকরি দিচ্ছেন! তিনি তোমাকে দশ টাকায় বিক্রি করে দিচ্ছেন। সমুদ্রের ওপারে মিরিচ, ডমরা দ্বীপে পাঠাচ্ছেন, যেখানে না আছে ধর্ম.....।'

আমার স্বর কিছুটা উচ্চগ্রামে উঠে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটা ভয় পেয়ে যেভাবে আমার কাছে এসে আমার কথা শুনতে লাগল এবং যেভাবে আশেপাশের আরো দুয়েকটা লোকও চলে এল, তা দেখে আড়কাটির নজর আমার দিকে পড়ল। আমার কথা শুনে সে রেগে লাল হয়ে আমার দিকে লাফিয়ে এল। আমি চার লাফে বাগানের বাইরে চলে এলাম। ভাগ্য ভাল ছিল, দরজা খোলা পেয়েছিলাম, লোকটা এক নাগাড়ে ঢিল মারতে লাগল। আমিও উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালালাম। শহরের গুণ্ডারাই বেশীরভাগ আড়কাটি হত। তাই মারপিট করা ওদের পক্ষে বাঁ হাতের খেলা। যদি আমি ধরা পড়তাম, তাহলে আমাকে খুব মেরামত করা হত।

বিপজ্জনক জায়গার বাইরে এসে আমার চিন্তা হল কিভাবে ঐ ছেলেটাকে উদ্ধার করা যায়। তখন রাজনীতির হাওয়া পর্যন্ত আমাকে স্পর্শ করেনি। আড়কাটিদের ধোঁকা ও দ্বীপে অত্যাচারের কথা পড়ে আমার ধারণা হয়েছিল যে আড়কাটির হাত থেকে ঐ ছেলেটাকে বাঁচানোর অর্থ হল কসাইয়ের হাত থেকে গাভীকে বাঁচানো। আমি শুনেছিলাম সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজে আজমগড় জেলার রামজীলাল (বছওয়ল) আর দুধনাথ পাণ্ডে পড়েন। তাঁদেরকে বললে হয়তো এখনও ছেলেটাকে বাঁচানো যাবে। এদের ছাড়াও আমি অন্য যুবকদের কাছে ও আরার দেবেন্দ্র কুমার জৈনের (যে কলেজের হোস্টেলে থাকত) কাছেও গিয়েছিলাম। আমার আবেগের কিছুটা আমি তাদের মধ্যেও সংক্রামিত করতে পেরেছিলাম। আর আমাকে এবং সম্ভবত রামজীলালকে বাগানের দিকে পাঠিয়ে দিয়ে ওদের মধ্যে কয়েকজন খুব আশা নিয়ে সহায়তার জন্য এ্যানি বেসান্টের কাছে গেল। আমরা তিনজন আবার সেই বাগানের পাশের সড়কে এলাম। আমাদের মধ্যে একজন খবর দিতে ও অন্যদের নিয়ে আসার জন্য চলে গেল। আমরা দুজন—আমি আর হয়তো রামজীলাল—পাহারা দেওয়ার জন্য থেকে গেলাম যাতে ছেলেটাকে অন্য কোথাও নিয়ে না যায়। আমরা বড় রাস্তায় টহল দিচ্ছিলাম। সন্ধ্যা হতে থাকে। দুই তিনটি আড়কাটি ছাদ থেকে ইঁট মারতে শুরু করল। এরপর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা অর্থহীন ছিল কেননা হিন্দু কলেজ থেকে কেউ খোঁজ-খবর নিতে আসেনি। বর্তমান ভারত মাতা ভবনের (তখনও তার অস্তিত্ব ছিল না) পরের একটা বাড়ি অনেকদিন থেকেই কাশী বিদ্যাপীঠের বিদ্যালয় বিভাগের ছাত্রাবাস ছিল—আর সেই সময় সেখানে কলেজের অনেক ছাত্রও থাকত। আমরা যখন ঐ বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন আমার সঙ্গীর খেয়াল হল সেখান থেকে কিছু ছাত্র সঙ্গে নিয়ে হকি স্টিক দিয়ে আড়কাটিদের মেরে ছেলেটাকে ছিনিয়ে আনব। কিন্তু সেই সময়ের ভারত আজকের ভারত ছিল না। কলেজে যাওয়ার পর বুঝতে পারলাম—বেসেন্ট মেম-সাহেব সাহায্য দেওয়ার জায়গায় শান্ত থাকার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত লেকচার ঝেড়ে নিজের কর্তব্য পালন করলেন।

আমার জনসাধারণের জন্য কাজ করা শুরু হয়েছিল এই সময় (নভেম্বর ১৯১১), যদিও তখন এই কাজের পেছনে কোন জ্ঞান ও নিরন্তর কাজ করে যাওয়ার প্রবণতার অভাব ছিল।

ডিসেম্বরে দিল্লীতে সম্রাট জর্জের রাজ্যাভিষেক হল। বারাণসীতে ঐ দিন বেশ ধূমধাম হয়েছিল। কুইন্স কলেজের সামনে থেকে পল্টন ও রামনগর রাজ্য থেকে, যেটা তখনও জমিদারী ছিল, ব্যান্ড বাজানোর সাজগোজ করা সেপাইদের মিছিল বেরিয়ে ছিল। রাজা মুন্সী মাধবলালের কুঠী খুব সাজানো হয়েছিল। শহরের অন্যান্য জায়গাও সাজানো হয়েছিল। অস্সী মহল্লায় অতটা ধূমধাম হয়নি। তার কারণ শহর থেকে আলাদা থাকাও হতে পারে। বস্তুত হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার আগে অস্সীকে শহরের বাইরের প্রান্ত বলে মনে হত। আমাদের জন্য এই মিছিল ও বাজনা-টাজনা এক বড় তামাশা ছিল। এই সময়ে যে সমাজে আমি চলাফেরা করতাম, সেখানে ইংরেজের প্রতি রাজনৈতিক বিরূপতার কোনো ভাব দেখা যেত না। কিন্তু ইংরেজ বিধর্মী ও ম্লেচ্ছ, এই ভাব থেকে কেউ মুক্ত ছিল না।

নতুন বছর ১৯১২ এল। তার সঙ্গে সঙ্গে আমার জ্ঞান ও দৃষ্টির বিকাশ হতে লাগল। লঘুকৌমুদীর পর আমি সিদ্ধান্তকৌমুদী শুরু করেছিলাম। কিছু সহজ নাটক ও কাব্য—কিছু অন্যের সঙ্গে ও কিছু একাই সমাপ্ত করেছিলাম। ব্রহ্মচারী ইংরেজী পড়াচ্ছিলেন। আর হিন্দির স্বাধ্যায় আপনা থেকেই চলছিল। এই সময়ে আমাকে যাঁরা পড়াতেন তাঁদের মধ্যে পণ্ডিত মুখরাম পাণ্ডে ছাড়া ছিলেন পণ্ডিত শিবমঙ্গল দুবে, পণ্ডিত চাননরাম, এক কাব্যতীর্থ বৈরাগী (যিনি অস্সীতে পণ্ডিত অনন্তরামের বাড়ির পেছনে থাকতেন), গুজরাতী ব্রহ্মচারী এবং আরো দুয়েকজন সজ্জন। বন্ধুদের মধ্যে ছিল বনমালী ছাড়া রীঁওয়াঁ কুঠী নিবাসী পুরোহিত পুত্র গিরিশংকরজী (?) ও ছোট গুদরওয়ালী সড়কের ধারে যে কবিজী থাকতেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র (?), যে খুব বিদ্বান হয়ে যুবক বয়সেই মারা যায়। পণ্ডিত শিবমঙ্গলজী নগওয়ায় পড়তেন। তিনি নিজে পড়াতে যেতেন স্যাদ্বাদ বিদ্যালয়ে। একদিন আমিও তাঁর সঙ্গে স্যাদ্বাদ বিদ্যালয়ে গেলাম। পণ্ডিতজী পড়াচ্ছিলেন, আমি উঠানে হাঁটছিলাম। মন্দিরের দরজা খোলা দেখে আমি মন্দিরে ঢুকলাম। পূজারী দৌড়ে এল—'আপনার মন্দিরে আসা উচিত হয়নি। এটা জৈনমন্দির?'

'কেন?'

'জৈনমূর্তি দর্শন করলে পাপ হয়।'

'তাহলে তুমি পূজা কর কেন?'

'আমি তো পেটের জন্য....।'

এও আমার এক নতুন অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতার পরে শুনলাম—"নবেদদ্ যাবিনীং ভাষাং ন গচ্ছেদ্ জৈনমন্দিরম্।"

গরমে এবারও আমি বারাণসীর বাইরে যাইনি। এ সময়ে অস্সীতে আর এক নতুন মূর্তি এলেন, যিনি পাকা পুকুরের দক্ষিণের ঘরে ডেরা বাঁধলেন। সারা ছাত্রমণ্ডলীতে— এমনকি পণ্ডিতমণ্ডলীতেও শোরগোল পড়ে গেল যে অগাধ পণ্ডিত, বড় কবি, সূক্ষ্মতার্কিক, মহানাস্তিক রামাবতার শর্মা এসেছে। সে বেদ মানে না, ভগবান মানে না। পুণ্য-পাপ মানে না। অন্যান্য শত শত ব্যক্তির মতো আমারও শুনে তাকে আজব মানুষ মনে হল। প্রথম বার তাঁর দর্শন হল জগন্নাথ মন্দিরের বাইরের ফটকের সামনে কিন্তু সড়কের অন্য পারে। একটি ধুতি পরেছিলেন, একটা ধুতি হয়তো একটা গামছাও হাতে ছিল। কাঁধে দুই তিন বছরের একটি মেয়ে বসেছিল যাকে সামলানোর জন্য অন্য হাতটি উঠে ছিল। পাঁচ-সাত জন লোক—যাদের মধ্যে ছাত্রই বেশী তাকে ঘিরে ছিল। ব্যাকরণ অথবা ন্যায়ের শাস্ত্রার্থের আলোচনা হচ্ছিল না। বরঞ্চ কথা হচ্ছিল কোনো পৌরাণিক গল্প অথবা ঋষির অসম্ভব চমৎকার কার্যকলাপের। পণ্ডিতজী স্নানের জন্য গঙ্গার রাস্তায় ছিলেন। একদিন আমি তাঁর বৈঠকে পৌছে গেলাম। বৈঠকখানা ছিল দুই

দরজার এক সাধারণ কুঠরি। তিনি মেঝের ওপরই বসেছিলেন। সেখানে আমাদের সেই কাব্যতীর্থ বৈরাগী তরুণও ছিল। পণ্ডিত রামাবতারের দরজা সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল। তাই আমরা নিঃসঙ্কোচে সেখানে যেতাম। হয়তো ফেরিওয়ালাদের কাছ থেকে কিছু কলমী আম কিনে এক্ষুণি তিনি বাড়িতে পাঠাচ্ছিলেন—হ্যাঁ, শুনেছিলাম, পণ্ডিতজীর দুই স্ত্রী। তিনি বৈরাগী তরুণকে ঠাট্টা করে বলছিলেন—'ভাই, সাত-সাত দিন উপবাসের পরও আমার তো ইন্দ্রিয় সংযম করা মুশ্‌কিল হয়ে পড়ে। আর তোমাদের আজন্ম ব্রহ্মচর্য! অসম্ভব।'

এরপর স্বামী মুদ্‌গরানন্দের কথা শুরু হল। তিনি হেঁচে দিলে দনাদ্দন হাতী বেরিয়ে আসত। পুরাণের গল্প নিয়ে মজা করার জন্য স্বামীজী এই সব কথা বলতেন। তিন-চার বারের বেশী তাঁর কথা শোনার সুযোগ হয়নি আমার। ক্ষণিক মনোরঞ্জন ছাড়া আমার ওপর তাঁর কোনো স্থায়ী প্রভাব হয়েছিল তা বলতে পারব না। হতে পারে সেই সময় এর জন্য প্রয়োজনীয় প্রারম্ভিক প্রস্তুতি আমার ছিল না, অথবা, যখন-তখন বিশৃঙ্খলভাবে অল্প সময়ের জন্য তাঁর কথা শুনেছিলাম।

মে অথবা জুন মাস আসতেই স্থির হল আমিও স্কুলে নাম লেখাব। আমার রীওয়াঁর সঙ্গী নতুন স্থাপিত দয়ানন্দ স্কুলের নবম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিল। ঐ স্কুলের ভর্তি হওয়ার জন্য আমিও তাঁর সম্মতি পেয়েছিলাম। সংস্কৃত পড়ার জন্য তো ভর্তি ফি-এর প্রয়োজন ছিল না। সেখানে তো ছাত্রবৃত্তিও পেতাম। কিন্তু এখানে দরকার হল ফি-এর আর বইয়ের দামের। আমি বাড়ির ভরসায় ভর্তি হতে যাইনি। আর আমার আয়ের কোনো স্থায়ী ব্যবস্থাও ছিল না। কেউ কেউ বলল, স্কুলের ম্যানেজার পণ্ডিত কেশবদেব শাস্ত্রীর নামে কোনো সুপারিশ চিঠি নিয়ে এস। তাহলে হয়তো ফি মাপ হয়ে যাবে। একথাও জানতে পারলাম যে স্যাদ্বাদ বিদ্যালয়ের ম্যানেজার নন্দকিশোরজী পণ্ডিত কেশবদেবের বন্ধু। নন্দকিশোরজীর সঙ্গে আমার মাঝে মাঝে দেখাশোনা হত। তিনি চিঠি লিখে দিলেন। পণ্ডিত কেশবদেব শাস্ত্রী আধা ফি মাপ করার জন্য হেডমাস্টারকে লেখেন। এইরকম পরীক্ষা নিয়ে আমাকে দয়ানন্দ স্কুলের সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি করা হল। এ সময় স্কুল ভাড়া-করা বাড়িতে গোদৌলিয়া গিরিজা থেকে সিকরৌল যাওয়ার সড়ক থেকে একটু দূরে গলির মধ্যে ছিল। সেই সময় পণ্ডিত কেলকরজী হেডমাস্টার ছিলেন। তখন তিনি হিন্দু কলেজে এম·এ· পড়ছিলেন। আমার শিক্ষকদের মধ্যে একজন বাঙালি ছিলেন যাকে দাড়ির সাদৃশ্যের জন্য আমরা 'কিং জর্জ' বলতাম। আর সংস্কৃতের শিক্ষক ছিলেন একজন সাদাসিধা বৃদ্ধ পণ্ডিত। ক্লাসে মোট ছয়-সাতজন ছাত্র ছিল যাদের একজন ছিল চন্দ্রাবতীর পাশের বাসিন্দা রাজপুত। বয়সে সে আমাদের সবাইয়ের চেয়ে বড় ছিল। সংস্কৃতে আমার কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল না। কলেজে যা পড়ানো হত তা আমি পড়ে ফেলেছিলাম। গণিতের মধ্যে বীজগণিতটা নতুন জিনিস ছিল। কিন্তু তাতেও আমার দক্ষতা সহপাঠীরা অবিলম্বে স্বীকার করেছিল। ইংরেজীতে বিশেষ করে তার ব্যাকরণে আমার দুর্বলতা ছিল। একদিন পরীক্ষা নিয়ে মাস্টার মশাই তার জন্য আমাকে পড়াশোনা করতে খুব করে বললেন। আমাদের ক্লাসে এক মোটামতো বাঙালি ছেলে ছিল। তার পড়াশোনায় একেবারেই মন লাগত না। সে সবসময়ই গালগল্প করত—'কলকাতা গিয়েছিলাম, মুগলসরাইয়ে কেলনারে খানা খেয়েছি, বোতল উড়িয়েছি।' শ্যামবর্ণ এক মুন্সীজী ছিলেন। তার সুন্দর অক্ষর দেখে আমার হিংসে হত। ধর্ম শিক্ষার পিরিয়ড নির্দিষ্ট ছিল। আর সেটা নিয়মিতভাবে হত। হয়তো দুয়েকদিন পথ ভুলে সেখানে গিয়েছিলাম। কিন্তু ওদের কথা আমার কাছে শিশুর বকবকানি বলে মনে হত।

প্রথমদিকে গিরিজাশংকরের সঙ্গে আমি প্রত্যহ অস্সী থেকে সেখানে পড়তে যেতাম। অনেকটা দূরে যেতে হয় দেখে কিছুটা কাছে থাকার কথা মনে হল। এদিকে যাগেশ এক-আধবার প্রয়াগ থেকে এসেছিল। সেও ঠিক করল, এখানে এসে পড়াশোনা করবে। গোদৌলিয়া গিরিজা থেকে কিছুটা পুবে। এক গলিতে এক সন্ন্যাসীর মঠ ছিল। সন্ন্যাসীবাবা কনৈলা থেকে দুই মাইল পুবের গ্রাম দৌলতাবাদের ব্রাহ্মণদের গুরু ছিলেন। তাঁকে বলায় তিনি খুব খুশী হয়ে আমাদের থাকার জন্য একটা ভাল কুঠরি দেন। তাতে একটা আলমারিও ছিল। আমাদের বই ও কাপড়-চোপড় মহাফূর্তিতে সেখানে এনে রাখলাম। যাগেশের ওয়েস্ট-এন্ড-ওয়াচ বেশ ভারী মনে হয়েছিল, তাই সেটাও আলমারিতেই রাখা হল। খাওয়া-দাওয়ার জন্য এক-আধ মাসের পয়সা আমাদের কাছে নিশ্চয়ই ছিল, তাই আমরা এই নতুন ঘরে থাকতে গিয়েছিলাম। একটা দিনই আমরা ঐ ঘরে থাকতে পেরেছিলাম। পরদিন দেখলাম ঘড়ি গায়েব। কে তা নিয়ে গিয়েছিল, তা না দেখে তো বলা সম্ভব নয়। কিন্তু যে নিয়েছে সে ঐ বাড়িরই লোক তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। হাত থেকে যে জিনিষ বেরিয়ে গেছে জিজ্ঞাসাবাদ করে তা কি করে ফিরে আসবে। যাগেশের মন বিষণ্ণ, আমার মনও উদাস। এরপর যাগেশ প্রয়াগ চলে গেল। আমি আবার মোতীরামের বাগান থেকে স্কুলের রাস্তা রোজ মাপতে শুরু করলাম।

পণ্ডিত চন্দ্রভূষণজী সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজের সংস্কৃত বিভাগের (রণবীর পাঠশালা) প্রিন্সিপ্যাল ও বারাণসীর প্রধান বৈয়াকরণদের মধ্যে একজন ছিলেন। আমার শিক্ষক পণ্ডিত মুখরামজী তাঁর ছাত্র ছিলেন। ঐ সময়ও তাঁর শব্দেন্দু (?) শেখরের কিছু পাঠ চলছিল। একবার তাঁর সঙ্গে আমিও পণ্ডিত চন্দ্রভূষণজীর কাছে গিয়েছিলাম। পুরানো পণ্ডিতদের অনাড়ম্বর জীবনের কথা কি বলব? ছাত্রকে তিনি বাড়ির একজন বলেই মনে করতেন। পণ্ডিতজী খাটিয়ার ওপর বসে কথা বলছিলেন। খেয়াল হল গরুর সামনে ভুসি নেই। বলে উঠলেন—'মুখরাম, মনে হচ্ছে গরুর সামনে ভুসি নেই।' 'দিয়ে আসছি, গুরুজী', এই বলে পণ্ডিত মুখরামজী উঠতে যাচ্ছিলেন। আমি বলে উঠলাম, 'আমি যাচ্ছি, আপনি বসুন।' আমি উঠে দাঁড়ালাম। সূর্যাস্তের সময় ভুসির ঘরে কিছুটা অন্ধকার ছিল। পণ্ডিতজী নিজের ছোট মেয়েকে ডাকলেন, 'তুষারে। ও তুষারে। আরে উত্তর দিচ্ছিস না কেন? লণ্ঠন নিয়ে আয়। গরুকে ভুসি দিতে হবে।' ভুসি দিয়ে আমি ফিরে এলাম। তার আগে আমার সম্পর্কে গুরু-শিষ্যের কি কথা হয়েছিল, তা আমি শুনিনি। এবার বলছিলেন—

'ছেলেটার ভাল লক্ষণ আছে দেখছি। কোনো জায়গা থেকে বৃত্তি পাচ্ছে কি?'

'না গুরুজী। এখন তো পাচ্ছে না।'

'বৃত্তি ছাড়া লেখাপড়া শেখার ছাত্র আর কি পড়বে?··· এবার ভর্তির সময় নিয়ে এস। বৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।'

সেই সময় আমার সঙ্গে এক সিন্ধী যুবকের দেখা হল। তার গায়ের জামা ছিঁড়ে গিয়েছিল। পথ চলতে চলতে আমার সঙ্গে কথাবার্তা হল। সে বলল—ঘর ছেড়ে, চলে এসেছি। আমি তাকে আমার কুর্তা দিয়ে দিলাম। দুদিন পরে যখন দেখলাম আট আনা ভাড়ার একটা ঘর নিয়ে সে পকৌড়ির দোকান করেছে, এবং টাকা পয়সার ব্যাপারে স্বাধীন, তখন আমার বড় ভাল লাগল। প্রথম আমি তার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছিলাম, তাতে সে বেশ কৃতজ্ঞ। সে আমাকে নিজের কথা বলল। তার বাবা এক ধনী শেঠ। সে বাবার টাকা যৌবনের ফূর্তিতে বরবাদ করেছে

এবং পালিয়ে চলে এসেছে। তার আমীরের জীবন থেকে পকৌড়ি বেচা পর্যন্ত নেমে আসা আমার কাছে সাহসিকতার কাজ বলে মনে হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই।'

সেই সময়ে ছোট মঠে কিছু সেবকসহ এক বড় মোহন্ত উঠেছিলেন। যেখানে মোহন্তজী ছিলেন সেখানে আমার যাতায়াত খুব কম ছিল। পণ্ডিত মুখরামজীর কুঠরি আলাদা ছিল। কেবল তাঁর সঙ্গেই আমার সম্বন্ধ ছিল। একদিন রাত্রিতে সাতটার সময় পণ্ডিত রামকুমার দাসের শিষ্য আমাকে ডাকতে আসে—'চলুন, গুরুজী আপনাকে ডাকছেন।' গেলাম। দেখলাম এক বেঁটেখাটো ফর্সা, মধ্যবয়স্ক, ভদ্র পুরুষ। সাদা সাধারণ বেশ-বাস। এক চৌকির ওপর বসে আছেন। তাঁর আশেপাশে দুই চারজন সাধু দাঁড়িয়ে অথবা বসে আছেন। পণ্ডিত রামকুমারজী আমার দিকে একটি কাগজ বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—"এই কাগজটি পড়ে দিনতো।' আমি কাগজটি হাতে নিয়ে দেখলাম, ওটা কোনো আদালতের রায়ের সঠিক নকল। আমার মন তো প্রথম ঘাবড়ে গিয়েছিল—'তিনদিন হল আমি ইংরেজী পড়তে শুরু করেছি, আদালতের রায় আমি কিভাবে পড়ব?' কিন্তু আমার মনের ভয় আমি বাইরে প্রকাশ করিনি। কাগজটা খুলতে খুলতে বললাম, 'আদালতী কাগজ পড়ার এই হল আমার প্রথম সুযোগ। এর একটা বিশেষ ভাষা আছে, আর আমি তো হালে ইংরেজী শিখতে শুরু করেছি।'

রায়টি একবার আমি মনে মনে পড়লাম। কিছু অর্থতো বোধগম্য হল কিন্তু বহু শব্দের অর্থ আমি বুঝতে পারলাম না। তবু আমি নুন লংকা মিশিয়ে এর ভাবার্থের কিছুটা শুনিয়ে দিলাম। মোহন্তজী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, 'দেখেছ মোহন্ত রামকিসুনদাস, দেখেছ পণ্ডিত রামকুমার দাস। তোমরা, সদর-অলারা এই রায় লিখেছ। এখন সাত জন্মেও বাবুরা এই মঠের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।'

পাশে বসা মণ্ডলী বলে উঠল, 'হ্যাঁ, ঠিক সরকার, আপনার কৃপায়।' আমি কয়েক মিনিট সেখানে বসে রইলাম। তারপর মোতীরামের বাগানে চলে গেলাম।

পরদিন পণ্ডিত রামকুমার দাস পণ্ডিত মুখরামজীর কাছে বলছিলেন, "ইনি ছাপরা জেলার এক অতি প্রাচীন ও বড় মঠ পরসার মোহন্ত। লাখ লাখ টাকার সম্পত্তির মালিক। তিনি এক বড় মন্দির বানাবেন। তাই নিজে দেখে পাথর কিনতে এসেছেন। ঐ পরসার বাবুদের মোহন্তজীর বিরুদ্ধে দায়ের করা এক মকদ্দমার রায়ই গত রাতে কেদারনাথজী পড়েছিলেন। মোহন্তজীর এক শিষ্য ছিলেন রামউদার দাস, তিনি হালে মারা গেছেন। মোহন্তজী তাঁকেই মোহন্ত পদের উত্তরাধিকারী করেছিলেন। বাবুরা তাঁকে চাইতেন না। ঝগড়ার কারণ ছিল এই। দেওয়ানি ছাড়া কয়েকটি ফৌজদারী মামলাও চলছে। মকদ্দমায় মোহন্তজীর পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে।...'

আমার তো মুখরামজীর বাড়ি প্রতিদিন যেতে হত। মোহন্তজী কয়েকদিন সেখানে ছিলেন। পণ্ডিত রামকুমার দাস একা দেখতে পেলে যখন তখন পরসা মঠের কথা আলোচনা করতে লাগলেন। বললেন, মোহন্তজীর যোগ্য ও প্রিয় শিষ্য মরে গেছে। তাঁর জন্যই ইনি এত সব ঝগড়া করেছেন। মোহন্তজীর খুব আপসোস হয়েছে। আমাকে বলছেন, 'তুমি বারাণসীতে থাক। আমার জন্য একটি ভাল লেখাপড়া জানা তরুণ শিষ্য খুঁজে দাও না।'

প্রথমদিকে যখন এই ধরনের কথা হত, তখন আমি ভাবতাম আমি ছাড়া অন্য কারু কথা হচ্ছে। আমার ধারণা হয়েছিল যে, পণ্ডিত রামকুমার মোহন্তজীর জন্য আমাকে চেলা খুঁজে দিতে

বলছেন। শেষ পর্যন্ত দিন দুই-তিন পরে তিনি খোলাখুলি বললেন, 'কেদারনাথজী, আপনি যেদিন রায় পড়ে শোনালেন, তার পরদিন থেকে মোহন্তজী আর কাউকে পছন্দ করছেন না। দুয়েকজন ছাত্রের নাম করেছিলাম। কিন্তু তিনি আপনার কথা জিগ্যেস করেন। বাড়ির সঙ্গে তো আপনার কোনো সম্পর্ক নেই। সাধু হওয়ার কথাও তো আপনি বলেন?'

যদি তিনি আমাকে বৈষ্ণবের চেলা হওয়ার কথা বছরখানেক আগে বলতেন, তাহলে রাগে আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠত। কিন্তু মন্ত্রসাধনার পরে আমি আর আগের মতো উগ্র বৈষ্ণবপন্থার শত্রু ছিলাম না। আমি সোজাসুজি অস্বীকার না করে বললাম—

'আমি তো পড়াশোনা করছি। আপনি তো জানেন আমি স্কুলে নাম লিখিয়েছি। ইংরেজী ও সংস্কৃত দুইই আমি মনপ্রাণ দিয়ে পড়তে চাই।'

'এ আর এমনকি বাধা। আপনার পক্ষে আরো অনুকূল হবে সেই জায়গা। পড়ানোর জন্য পণ্ডিত ও শিক্ষক রাখতে পারবেন। এখানে এসেও পড়তে পারবেন। দেখছেন না, এই মঠেরই এক শাখা বগৌরার মোহন্তের শিষ্য...এখানে পড়ছে।'

'পরাধীনতা হবে। আমি মোহন্তজীর স্বভাবের সঙ্গে পরিচিত নই।'

'বেচারী মোহন্তজী অত্যন্ত সাদাসিধা লোক। সকাল থেকে এগারটা পর্যন্ত একনাগাড়ে পূজাপাঠ নিয়ে থাকেন। বার বছরেরও বেশী হয়ে গেছে ইনি ভাত খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। শুধু ফলাহার করেন। এত বড় মোহন্ত, যার বার্ষিক নগদ আয় পনের হাজার টাকা ও ফসল থেকে আয়ও তার কাছাকাছি, তিনি এমন তপস্বীর জীবন যাপন করেন। আমার তো এই শুধু কামনা যে আপনার মতো এমন মানুষ যাঁর বিদ্যাই একমাত্র ব্যসন তিনি যদি পরসার প্রধান হন তবে তিনি বিদ্যার্জনে আগ্রহী অন্যান্য ছাত্রদের কদর করবেন।'

'কিন্তু কথাগুলো আমার ঠিক পছন্দ হচ্ছে না।'

"আমি এখনই ফয়সলা করতে বলছি না। আপনি এ ব্যাপারে বিচার করে দেখুন। মোহন্তজী আরো পাঁচ-সাতদিন থাকবেন। পাথরের এক বড় মন্দির বানাবেন। কয়েকবার দশাশ্বমেধে পাথর দেখতে গিয়েছেন। কিন্তু তাঁর পছন্দসই পাথর সেখানে খুব কম আছে। আমি বলছি, পরসামঠ আপনার জন্য সবচেয়ে অনুকূল হবে। আপনি তো বলেছেন আপনি নিশ্চয়ই সাধু হবেন। তাহলে এরকম জায়গাতে কেন হবেন না, যেখানকার কথা আমি কিছুটা জোরের সঙ্গে বলতে পারব।' 'আচ্ছা, আমি ভেবে জবাব দেব।'

এই প্রস্তাব আমার কাছে একেবারে নতুন। কিন্তু পড়াশোনায় আর্থিক দুরবস্থা, বিশেষত ইংরেজী স্কুলে নাম লেখানোর পরের যে অবস্থা হয়েছে তার একটি বিহিত করার এটাও একটা উপায়। এ বিষয়ে আমি ভেবে দেখিনি। এখন আমি পণ্ডিত রামকুমারের প্রস্তাব সম্পর্কে বিশেষ মন দিয়ে বিচার করতে লাগলাম। আমার মুশকিলটা হল এই যে, বারাণসীতে এই সময় এমন কেউ ছিল না যার কাছে এই রহস্যময় সমস্যার কথা খোলাখুলি বলতে পারি। বৈরাগীর চেলা হওয়াটা চক্রপাণি ব্রহ্মচারী কখনো পছন্দ করবেন না। আমার বাড়ি ও পিসামশাইয়ের সঙ্গে সম্পর্কের জন্যও পণ্ডিত মুখরামজী এই প্রস্তাব শুনেই শুধু এর বিরোধিতাই করতেন না, সেই সঙ্গে নানাভাবে বাধা দিতেন। যাগেশ এ সময়ে এখানে ছিল না। এখানে থাকলেও বৈরাগ্য ও আশ্রম পরিবর্তনের ব্যাপারে আমার সঙ্গে সে একমত ছিল না। এই প্রশ্নের মীমাংসা আমাকে ভেবেচিন্তে একাই দেবার ছিল।

আর্থিক দুরবস্থা আমার এমন কিছু বেশী ছিল না। বাড়ির লোকদের সাহায্য চাওয়া যদিও আমার আত্মসম্মানের পক্ষে হানিকর বলে আমি মনে করতাম। তবু ব্রহ্মচারী চক্রপাণির কৃপায়

আমি থাকা খাওয়া সম্পর্কে নিশ্চিন্ত ছিলাম। মাসিক চারপাঁচ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থার কথাও কয়েক জায়গায় হচ্ছিল। সেই ব্যবস্থা হওয়াও খুব দেরি ছিল না। পণ্ডিত চন্দ্রভূষণের কথা তো আগেই বলেছি। এক বৃদ্ধা রানীর বাড়িতে পূজা করার আহ্বানও এসেছিল। আমি কিছুটা বৈদিকও হয়ে গিয়েছিলাম। ধর্মা-ধ্যক্ষ পছন্দ করে শেষে স্বীকৃতির জন্য আমাকে রানী সাহেবের কাছে নিয়ে যেতে বলেন। শুনেছিলাম রানী স্বয়ং দেখে পছন্দ না করা পর্যন্ত নিয়োগ করা যায় না। রানী আমাকে দেখলেন, দুয়েকটা কথা জিগ্যেস করলেন আর অনুমতি দিয়ে দিলেন। রানী সম্পর্কে ইতিমধ্যেই আমি অনেক গুজব শুনেছিলাম। এই সব গুজব এখন স্পষ্ট হচ্ছিল, তাই আমি আর সেখানে যাইনি। দুয়েক জায়গায় কারুর (দুর্গাজীর এক পাণ্ডা) ছেলেকে পড়ানোর কথাও চলছিল। এত সব হওয়া সত্ত্বেও আমার সিদ্ধান্তে আর্থিক অনুকূলতার প্রভাব ছিল না, তা বলতে পারি না। সেই সময়ের একটা দৃষ্টান্তের কথা আমার মনে আছে। অস্সীর বাসিন্দা এক সাধারণ ছাত্র—কীনারামী রামগড় (?) মঠের মোহন্তের চেলা হতে যাচ্ছিল। আগে তাকে কেউ পুছত না। কিন্তু এখন সে পীতাম্বরী পরে তিওয়ারীজীর সড়কের ধারে একটা কামরায় থাকে। আর্থিক সুবিধার চেয়েও যা পরসার পক্ষে আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে প্রণোদিত করেছিল, তা হলো—আমার বাড়ির লোকদের আওতার বাইরে, পৃথিবীর অন্য সীমান্তে, হ্যাঁ, ছাপরা জেলা তখন আমার পক্ষে ঐ ধরণের অপরিচিত জায়গাই ছিল—সেখানে চলে যাওয়া, এক নতুন জায়গা, নতুন জগতের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা। মোহন্তজীর পূজাপাঠ নয়, তাঁর সাদাসিধা স্বভাবও আমাকে প্রভাবিত করেছিল, যদিও তখন আমি জানতাম না যে তিনি সংস্কৃত জানতেন না।

কয়েকদিন ভাবনা-চিন্তা করে শেষ পর্যন্ত আমি আমার স্বীকৃতি দিলাম। মোহন্তজী খুব প্রসন্ন হলেন। পণ্ডিত রামকুমারের প্রতিও তিনি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

বারাণসী থেকে যাওয়ার সময় আমার একথাও মনে হয়েছিল যে আমার বাড়ির লোক যেন আমি কোথায় গিয়েছি, তার ঠিকানা না পায়। চিরকালের জন্য না হলেও অন্তত বেশ কিছু সময়ের জন্য। এই জন্য পণ্ডিত মুখরাম ও ব্রহ্মচারী চক্রপাণির কাছে আমার সিদ্ধান্ত ও আমার সঙ্গে মোহন্তজীর সম্পর্ক গোপন রাখা অত্যন্ত জরুরী ছিল। পণ্ডিত মুখরামজী আশ্বিনের নবরাত্রে বাড়ি যেতেন। তাই সেই সময়ই ছিল প্রস্থানের জন্য সবচেয়ে অনুকূল সময়।

কোন দিন আমি বারাণসী থেকে রওনা হব, ছাপরা স্টেশনে কোন দিন পৌঁছব, আর স্টেশনে কোনো লোক না পেলে আমাকে কোথায় যেতে হবে সব মোহন্তজীর সঙ্গে দেখা করে ঠিক করে নিলাম।

পরসায় সাধু (১৯১২-১৩ খৃঃ)

ঐদিন (সেপ্টেম্বর ১৯১২) আমার ট্রেন ছাপরা (ভগবান বাজার) স্টেশনে সন্ধ্যায় পৌঁছল। মোহন্তজীর লোক আমার সঙ্গে বারাণসী থেকে এসেছিল নাকি স্টেশনে আমার সঙ্গে দেখা

করেছিল, তা আমার মনে নেই। পঞ্চমন্দিরের পেছনে পরসামঠের ছাউনিতে পৌঁছতে আমার কোনো অসুবিধা হয়নি। মোহন্তজী খুব প্রসন্ন হলেন। তাঁর পরিচারক ও মোসাহেব আমাকে খুব সম্মান দেখাচ্ছিল। বারাণসীতে এক অকিঞ্চন ছাত্রের মতো আমি থাকতাম না। আমার কাপড়-চোপড় জমকালো না থাকলেও তা দেখে এবং আমার চেহারা দেখে লোকটি বুঝতে পেরেছিল যে আমি বেশ আরামে থাকতে অভ্যস্ত। মোহন্তজীও তাঁর নিজের লোকজনকে বলে রেখেছিলেন যে আমার যেন কোনো কিছুর কষ্ট না হয়। তাঁর সহিস রামদাসের ছেলেকে বিশেষ করে আমার ব্যক্তিগত পরিচারক নিযুক্ত করেছিলেন। ছাপরার সেই প্রথমদিকের জীবনের ঘটনার মধ্যে 'খোয়ার দই' কথা আমার কানে নতুনের মতো লেগেছিল। আমি ভাবছিলাম, দই দুধ থেকে হয়, খোয়া হয়ে গেলে তো দুধ শুকিয়ে যায়, তা দিয়ে দই কি করে হবে। আর একটি শব্দও আমার নতুন মনে হয়েছিল, যে কুলিটি স্টেশন থেকে আমার মালপত্র পরসা ছাউনিতে পৌঁছে দিয়েছিল, তার নাম ছিল দহাউর।

ছাপরায় দুয়েকদিনের বেশী থাকিনি। স্টেশন থেকে দূরে কোথায়ও গিয়েছিলাম কিনা মনে নেই। হয়তো পঞ্চমন্দিরে বাবু ঠাকুরপ্রসাদের বাড়ি গিয়েছিলাম। তাঁর সঙ্গে দেখাও নিশ্চয় হয়েছিল। কেননা মোহন্তজীর মকদ্দমায় তিনি শুধু মোক্তারের কাজই করেননি, প্রয়োজনে ঋণ দিয়েই শুধু নয়, লাঠি দিয়েও বাবুদের বিরুদ্ধে মোহন্তজীর মদত করেছিলেন। মোহন্তজী তাঁর প্রতি বড় কৃতজ্ঞ ছিলেন কারণ তিনি জানতেন যে মোক্তার ঠাকুরপ্রসাদের মতো সহায়ক না পেলে শুধু আইন তাঁকে রক্ষা করতে পারত না।

আমরা ট্রেনে ছাপরা থেকে একমা গেলাম। মোহন্তজী সেকেন্ড ক্লাসে ছিলেন। আমি কোন ক্লাসে গিয়েছিলাম, বলতে পারব না। একমা প্ল্যাটফর্ম ও স্টেশনের বাইরে দাঁড়ানো ঘোড়ার পিঠে বাঁধা এক্কার ঝাঁক সেই দিন কিছুটা বিচিত্র মনে হয়েছিল। মোহন্তজীর সঙ্গে মালপত্র ও চাকর-বাকর ছিল অনেক। আমার সঙ্গে দুচারটে বই, ধুতি-চাদর, গায়ে সাদা ডোরা কাটা কোট, আর হয়তো মাথায় টুপী ছিল। আশ্বিনের শেষ অথবা কার্তিকের দুয়েকদিন কেটে গিয়েছিল। মোহন্তজীর ফিটন গাড়িতে আমি যখন পরসাতে যাচ্ছিলাম, তখন দেখছিলাম সড়কের পাশে সবুজ ধানের খেতের হিল্লোল। আমি মাঝে মাঝে ঋতু ও ফসল সম্পর্কে দুয়েকটা কথা জিগ্যেস করছিলাম। মোহন্তজীও আমাকে কথাবার্তায় ব্যস্ত রাখতে চেয়েছিলেন। কাঁচা সড়ক তাই ঘোড়ারা দৌড়বার বিশেষ সুযোগ পায়নি। ধুরদহ পুল পার হবার পর ডানদিকে অনেক দূরে আমি খুব উঁচু বাড়ি দেখতে পেলাম। মোহন্তজী বললেন, 'ঐ হল বাবুদের গড়। ওরা এক চেলাকে শিখণ্ডী দাঁড় করিয়ে লড়ছে।' আমি বললাম,—'বাড়ি খুব উঁচু মনে হচ্ছে।' উত্তর পেলাম, পুরানো গড়, ওখানকার জমিও অনেক উঁচু। তাই বাড়ি অনেক উঁচু মনে হয়। অনেক বাড়ি ভেঙেচুরে গেছে। বাবুদের দুই তিন ঘর ধনী। বাকি সবাই গরীব হয়ে গেছে।

আরো এগিয়ে মঠের টালি ছাওয়া বাড়ি ও দুইটি চূড়াঅলা মন্দির দেখা গেল। মোহন্তজী বললেন, 'এ হল পশ্চিমদিকের মঠ, এর থেকে কিছু দূরে পূর্বদিকের মঠ। ওখানে গোপালজীর মন্দির আর এখানে রামজীর। এই ছোট মন্দির হল সমাধি। বিগত দিনের মোহন্ত-গুরুদের চরণ পাদুকা এখানে রাখা আছে।

কথা বলতে বলতে কখন যে তিন মাইল রাস্তা পার হয়ে আমরা মঠে পৌঁছে গেছি, বুঝতে পারিনি।

সেই সময় মঠের বাইরের দিকে পাকা ঘর ছিল না। সেইখানে পশ্চিমদিকে শুধু একটা আস্তাবল ছিল। মঠের সামনের দিক পাকা। তার সামনে উঁচু ভিতের ওপর টালিছাওয়া বারান্দা।

বারান্দার দুই প্রান্তে দুইটি কুঠরি যাতে পূবদিকের মঠের দেওয়ান সাহেব থাকতেন। ভেতরে ঢোকার পর আমার মালপত্র পাকা দালানের পূর্ব প্রান্তের কুঠরিতে রাখা হল। আমাকে বলা হল, উত্তরাধিকারী যুবক মোহন্ত মৃত রামউদার দাস ঐ কুঠরিতেই থাকতেন। এখানে রামদাস আমার ব্যক্তিগত সেবক, তাই নতুন জায়গা হওয়া সত্ত্বেও আমার কোনো ব্যাপারেই অসুবিধা হয়নি।

সকাল বেলা যখন মঠ থেকে পায়খানা করতে ক্ষেতে যেতাম, তখন রামদাস লোটাতে জল নিয়ে আমার সঙ্গে যেত। নিজের কুঠরির পেছনে পুকুরের পাকা ঘাটে হাত-পা ধুতাম, দাঁতন করতাম, তারপর স্নান করতাম। হালুইকরকে হুকুম দেওয়া হয়েছিল যে আমার জন্য সকাল বেলাই যেন এক পোয়া গরম গরম জিলাপি পাঠিয়ে দেয়। বারাণসীতে নিয়মিত পান খেতাম না। কিন্তু মোহন্তজী হয়তো আমাকে পান খেতে দেখেছিলেন। তাই পান এনে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। কুঠরির মেঝে পাকা। এর একদিকে একটা চত্বর ছিল যা মৃত ঐ তরুণ মোহন্ত নিজের জন্য তৈরী করিয়েছিলেন। ঐ চত্বরের উপর আমার বিছানা পাতা হল।

বাবুদের মকদ্দমায় হার হয়েছিল। কিন্তু তখনো ঝগড়া বন্ধ হয়নি। আপীল করার মেয়াদ তখনো বাকি ছিল। পূবদিকের মঠের বাইরের উঠানের দালান ও অনেক কুঠরি তখনো বাবুদের পক্ষের কিছু সাধুদের অধিকারে ছিল। ঐ জায়গার দুটো মন্দিরের—গোপালজী ও রামজী—পূজারীরা মোহন্তজীর দলে ছিলেন। একদিন রামজীর মন্দিরের পূজারী এক সমানবাহু লম্বা-চওড়া তরুণ সাধু—গালি দিতে দিতে এসে বলল, 'আমার কাজে ওরা বাধা দিচ্ছে, বলছে ওদের মঠ।' লোকজন লাঠি নিয়ে পূবদিকের মঠের দিকে দৌড়ে গেল কিন্তু তা মারপিট অবধি গড়ায়নি।

সন্ধ্যায় মঠের পুরোহিত পণ্ডিত—ওঝাজী ও তিওয়ারীজী এলেন। পশ্চিমদিকের মঠে তিওয়ারীজী রোজ কথকতা করতেন, আর ওঝাজী কথকতা শোনাতেন গোপাল মন্দিরের সামনে। ওঝাজী সংস্কৃত বেশী পড়েছিলেন তাই তাঁর সঙ্গে তাড়াতাড়ি অন্তরঙ্গতা হয়ে গেল। তিওয়ারীজী বড় মধুর স্বভাবের বৃদ্ধ মানুষ ছিলেন। কথকতা করার সময় তিনি ভাবার্থও বলতেন কিন্তু যে ভাষায় তিনি বলতেন তা দুনিয়ার কোনো কথ্য ভাষার মধ্যে ছিল না। তার মধ্যে বারাণসী 'ভয়া' এসে যেতো, ব্রজভাষারই বা কত রকম 'সুবন্ত-তিঙন্ত' প্রত্যয় থাকত, আর ছাপরা জেলার গভীর আবরণ তো থাকতই। তিনি প্রথম কিছু সুর দিয়ে শ্লোক পড়তেন, পরে তা নিজের মতো অর্থ করতেন—'ওহি সমৈয়াকো বীচমৌ—ৗ, জে—বা-সে, রামজীকীী হিংছাসে সুখদে-বর্জীীমহারাঁ—া-জ বো-ও-লতে-ভ-য়ে। ক্যা-কর-কর-কর-করকে, গোবিন্দায়-নমো-ও-ন-মঃ…" । একাদশীর দিন 'একাদশী মাহাত্ম্য' থেকে ঐ দিনের একাদশীর কথা বলা হত।

ওঝাজীর কথকতা পূবদিকের মঠে হত, তাই তাঁর কথকতা শোনার সুযোগ আমার হয়নি। তাঁর ভাষা কিছুটা কম অস্বাভাবিক হত। সেদিন সন্ধ্যায় দুইজন পণ্ডিত একত্র হয়েছিলেন, তাই মোহন্তজী আমার সাধু হওয়ার জন্য একটি শুভ তিথি স্থির করার প্রস্তাব করলেন। বেশ কিছু সময় ধরে পৃষ্ঠা ওলটানো হল। আমার মকর রাশির (চো) সঙ্গে গ্রহ ও নক্ষত্রের স্থানকে মেলানো হল এবং শেষ পর্যন্ত কার্তিকের শুক্লা একাদশীকে (বৈষ্ণবী) সবচেয়ে পবিত্র দিন বলে ধরা হল। মোহন্তজী অনেক ভেবে চিন্তে আমার জন্যও তাঁর মৃত উত্তরাধিকারীর নাম রামউদার দাস রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন।

একাদশীর মন্ত্রদীক্ষার সব বিধিতো আমার মনে নেই। হ্যাঁ, তাতে কণ্ঠী ও 'রাঁ রামায় নমঃ"

মন্ত্র দেওয়া ছাড়া আরো একটি বিধি ছিল। তা যদি আমি বারাণসীতে জানতে পারতাম তা হলে সেই জন্যই আমি আর পরসার নাম নিতাম না। কিন্তু তখন তো কথা দিয়ে অনেকটা এগিয়ে গেছি। বাবু পত্তর সিংহের উক্তি মনে পড়ছিল। 'তেরী মানে খসম কিয়া।' বুরা কিয়া'। 'ছোড় দিয়া'। 'বহুৎ হী বুরা কিয়া।' ("তোর মা ভাতার নিল। খারাপ করল। ছেড়ে দিল। আরো খারাপ করল।" বিধিটি হল— পিতলে তৈরী শঙ্খচক্র মুদ্রাটি আগুনে পুড়িয়ে লাল করে দুই বাহুমূলে ছাপ দেওয়া। রামানুজীদের (আচারী) মধ্যে বাধ্যতামূলক হলেও বৈরাগীদের মধ্যে এই প্রথা ছিল না। কিন্তু আমাদের মোহন্তজী দক্ষিণে পর্যটনের সময় আকৃষ্ট হয়ে এই প্রথা গ্রহণ করেছিলেন। আচারীরা তো একেবারে হালকা করে ছুঁয়ে দিত মাত্র যাতে খুব হালকা দাগ পড়ত। কিন্তু আমার মনে হল যেন জীবিত মানুষের শরীরে আগুনে পোড়া ধাতু লাগানো হচ্ছে না, বরং ডাকঘরের কোনো নতুন ডাকপিওন ধীরে সুস্থে মোহর লাগাচ্ছে। যাহোক, আমি মন শক্ত করে চোখ অন্য দিকে ফিরিয়ে রেখেছিলাম। ভেবে নিয়েছিলাম, শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কয়েক মিনিটে হয়ে যাবে। কয়েক ঘণ্টা লাগবে না।

সেই সময় থেকে আমাকে রামউদার দাস অথবা সংক্ষেপে রামউদার বলা হতে লাগল। মঠে আমার আরামের দিকে পুরা নজর রাখা হত। আমি এখানে বৈরাগী, তপস্বী সাধু ছিলাম না, বরঞ্চ এক সুশ্রী রাজপুত্র ছিলাম যাকে স্নান করানোর, পা টেপার, তেল মাখাবার জন্য চাকর ছিল। কোট ছেড়ে দিতে হল। তার বদলে খেরজাই (চৌরন্দী), ধুতিতে শান্তিপুরী পাড়ের সূক্ষ্মকাজ, দিল্লীওয়ালা লাল জুতা। রোদে বেরোলে চাকর মাথায় ছাতা ধরে চলত। পুরানো নামরাশির সব দিনচর্যা চাকরেরা আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিল। আমিও প্রথম দিকে যাতে বোকা না হই সেজন্য তা স্বীকার করেছিলাম। পরে তা খুব সাধারণ ব্যাপার হয়ে গিয়েছিল। আমার ওপর মোহন্তজীর স্নেহও বেড়ে যাচ্ছিল। তিনি নিজের সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার আমাকে শেখাতে শুরু করলেন। আর সত্যি অনেক কিছু শেখারও ছিল। পায়খানা করার সময় মাথায় হাত দিয়ে বসা চলবে না। সেখান থেকে ফেরার সময় ডান হাতে লোটা ধরা যাবে না। মাটি দিয়ে হাত ধোয়ার সময় প্রথম বাঁ হাত ধুতে হবে পাঁচ বার মাটি লাগিয়ে, তারপর পাঁচবার ডান হাত এবং শেষে পাঁচ বার দুই হাত ধুতে হবে। পাও মাটি লাগিয়ে ধুতে হবে। লোটা শুদ্ধ ভূমিতে রাখার সময় মাটিতে এক আঁজলা জল ফেলে তবে রাখতে হবে। ছুরি নয়, চাকু বলতে হবে, সবজীকে 'চিরনা' নয় 'অমনিয়া করনা' বলতে হবে—এই ধরনের একটি আলাদা শব্দসূচী বলে দেওয়া হল। যাতে বাবুশাহী (গৃহস্থ) বুলি থাকার জন্য অনেক শব্দ নিষিদ্ধ ছিল। তার বদলে সাধুশাহী কোষের কথা বলে দেওয়া হল। ঐ সময়ই এই মহাবাক্য শুনেছিলাম—'বারহ বরষ রহে সাধুকী টোলী। তব পাওয়ে এক টুটহী বোলী।'

আগেই বলেছি, মোহন্তজী ফলাহার করতেন। এগারটায় পূজা-পাঠ সমাপ্ত করার পর কিছুটা দুধ খেতেন। আধঘণ্টা মঠের কাজ দেখে ফলাহার তৈরী করতে যেতেন। এখন তাঁর শরীর বৃদ্ধ এবং কোমরও বাঁকা হয়ে গেছল। তাই তাঁর কাজে আমার কিছু সাহায্য করা জরুরী ছিল। ফলাহার তৈরী করা দিয়েই আমি তা প্রথম শুরু করলাম। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে শুধু তপস্যার প্রয়োজনেই ফলাহার করা হয় না। অন্নগ্রহণ করলে পঙ্‌ক্তিতে বসতে হয়, সেখানে বিষ মিশিয়ে দেওয়ার ভয় থাকে। ফলাহারী অবস্থাতেও মোহন্তজীর এক গুরুভাই একবার তাঁর দুধে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল, যা খেতে খেতে তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন। তাই তিনি অন্য কারু হাতে না খেয়ে নিজে ফলাহার বানাতেন। মোহন্তজীর ফলাহার তৈরী করাও ছিল এক বিশেষত্বপূর্ণ রসুন-কলা। তাতে চাল, ডাল, পুরি, পকৌড়ি, হালুয়া, ক্ষীর, তরকারি, চাটনী, মালপোয়া সবই

ছিল এবং রোজ ডজন খানেক পদ তৈরী হত। চালে ধানের জায়গায় নীবার, আটায় গমের জায়গায় কুটু (বাক হুইট), ডাল-বেসনে অড়হর ছোলার জায়গায় বকলা (ক্লওয়র) গ্রহণ করতেন। দুধ ও ঘি শুধু গরুর এবং মিষ্টির জন্য শুধু মিছরি ব্যবহার হত। এ পর্যন্ত রন্ধনশাস্ত্র আমার কাছে সবচেয়ে দুরূহ বস্তু ছিল। এখন একেবারে ফলাহারের ওপরই তা প্রয়োগ করার সুযোগ মিলে গেল। তার মধ্যে কুটুর আটা মাখা ছিল ভয়ানক কঠিন কাজ। কিন্তু ধীরে ধীরে মোহন্তজী আমাকে সব শিখিয়ে দিলেন। রান্নায় পাস হয়ে যাওয়ার পর তিনি আমাকে পূজা-পাঠও শেখালেন। কেননা তিনি অসুস্থ হলে পূজা-পাঠের ভার আমার ওপর পড়বে।

পরসা মঠের দুইভাগ—পূবের মঠ ও পশ্চিমের মঠ, তা আমি আগেই বলেছি। মোহন্তজী, আমি ও আরো অনেক সাধু পশ্চিমের মঠে থাকতাম। কোনো এক সময় পশ্চিমের মঠে শুধু মোহন্ত, দুই-চারজন পরিচারক ও পূজারী থাকতেন। অন্য সব সাধু থাকতেন পূবের মঠে। রান্নাও সেখানেই হত এবং উত্তরাধিকারীও থাকতেন সেখানেই। কিন্তু ঝগড়ার পর রান্নার ব্যাপারটা পশ্চিমের মঠে চলে আসে। বেশীর ভাগ সাধুও এখানেই চলে আসেন এবং পূবের মঠ ধীরে ধীরে শূন্য হতে থাকে। আমার সামনেই তার নহবৎখানা বাইরের উঠানের কাঠের বেষ্টনী ও পাকা দালান ভেঙে পড়ে এবং আমার সামনেই পশ্চিমের মঠের উঠানের ভেতরের ঘর কাঁচা থেকে পাকা হয়ে যায়। বাইরে কয়েকটি পাকা ঘরের সঙ্গে যুক্ত একটি নতুন চত্বর নির্মিত হতে থাকে।

কার্তিকের শেষ সপ্তাহ থেকে অঘ্রাণের প্রথম পক্ষ পর্যন্ত সোনপুরের (হরিহর ক্ষেত্র) মেলা বসত। মেলা শুরু হওয়ার আগেই আমি পরসায় পুরনো হয়ে গিয়েছিলাম। গুরুজীর সঙ্গে তাঁর ফিটনে বহরৌলী ও অন্য দুয়েকজন জমিদারের গ্রামেও গিয়েছিলাম। কনৈলা ও বছওয়ল-এ কখনো কখনো ঘোড়ায় চড়েছি কিন্তু সেই ঘোড়া পরসার পাঁচশ' টাকার ঘোড়ার সামনে গাধার মতো ছিল। পরসার ঘোড়া অনেক দিন থেকেই শুধু ফিটনেই চলত। তাই সওয়ারীর চাল ভুলে গিয়েছিল। পরসা পৌছনোর সাত-আট দিন পরেই সহিস নকছেদীর কাছে ঘোড়ায় চড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম। এখানে খরহরা করার মামুলী সাদা-সিধা লাগাম ছিল। কিন্তু আমি বললাম—'কোনো পরোয়া নেই, এই লাগামের সঙ্গে পিঠে গদী বেঁধে দাও।' রেকাবও ছিল না। আমি মঠের দরজা থেকেই ঘোড়ায় সওয়ার হয়েছিলাম এবং দ্রুত ছুটিয়ে একমার রাস্তায় বহু দূর পর্যন্ত চলে গিয়েছিলাম। ফেরার সময় একই চালে আসছিলাম কিন্তু বড় সড়ক থেকে রাস্তা যেখানে মঠের দিকে ঘুরে গেছে, সেই মোড় দেখে চাল টিমে করতে চাইলাম। কিন্তু ঘোড়া ঐ লাগামের অর্থ বুঝবে কি করে? আমার মন ছিল কিছুটা নিজেকে বাঁচানোর দিকে এবং কিছুটা লাগামের সাহায্যে ঘোড়াকে দাঁড় করানোর দিকে। এরই মধ্যে মঠের পাশের পুলের ঢালু জমি এল। ঘোড়াকে সামলাবার আগেই মঠের ফটক থেকে সিধা ৯০ ডিগ্রীর সমকোণ, এই মোড়ে এসে আমি নিজেকে ঠিক রাখতে পারলাম না এবং আমি ঘোড়ার পিঠ থেকে বাঁদিকে বলের মতো উৎক্ষিপ্ত হয়ে পড়লাম। সেখানে রাখা কাঠ থেকে কোনো রকমে বেঁচে গেলাম। চোট লাগেনি। ধুলা ঝেড়ে আমি বাহাদুর সওয়ারের মত উঠে দাঁড়ালাম। প্রথম দিকে লোকজনের দুশ্চিন্তা হয়েছিল। কিন্তু আমাকে হাসিমুখে দাঁড়াতে দেখে তারিফ করতে লাগল—'কাঁটা ছাড়া লাগামে এই রকম জবরদস্ত ঘোড়ায় সওয়ার হওয়া যে-সে লোকের কাজ নয়।'

মঠের ফিটনকে আমার খুব বাজে মনে হত। গুরুজীর পরিকল্পনা অনুসারে মঠের গ্রাম বহরৌলীর রামজিয়াওয়ন মিস্ত্রীর হাতে এই ফিটন তৈরী হয়েছিল। একেবারে ষোল আনা স্বদেশী। গুরুজী গাড়ির ভেতরে অনেকটা জায়গা রাখার আদেশ দিয়েছিলেন। আর

রামজিওয়ন মিস্ত্রী সাধারণত যতটা লাগে তার চেয়ে চার-পাঁচগুণ বেশী শিশু কাঠ লাগিয়েছিল। তার কমানোর জন্য এক-আধবার চাঁছা ছোলাও করা হয়েছিল। কিন্তু তাতে কিছু ইতর-বিশেষ হয়নি। আমার এই বাজে ও চারদিকে বন্ধ ধীরগতি সওয়ারী পছন্দ ছিল না। আমি চাইতাম বেগবান গাড়ি। গুরুজী আমার কথা মেনে নিয়ে মেলায় টমটম কেনার জন্য আমাকেই পাঠালেন।

এবারের পর জানিনা কতবার সোনপুরের মেলায় গিয়েছি। কিন্তু প্রথমবারের নজরে তাকে বেশ আলাদা মনে হয়েছিল। কোনো জায়গায় কাতারে কাতারে হাতী বাঁধা এবং যখন তখন হাতীর ডাক। কোনো জায়গায় ঘোড়ার আলাদা আলাদা বাজার; ছোট আলাদা, নেপালী টাংগন আলাদা, বড়দরের ঘোড়া আলাদা। অনেক ঘোড়ার ওপর সুন্দর চাঁদোয়া টাঙানো হয়েছে। বলদ ও গরুর বাজারে গেলে মনে হয় বহু দূর পর্যন্ত তাদেরই হাট লেগেছে। মেলায় সবচেয়ে অপ্রিয় বস্তু ছিল দিনে ধূলা ও রাত্রিতে ধোঁয়া। আমি আমার পছন্দমতো একটা টমটম ও ঘোড়ার নতুন সাজ কিনলাম। সেখানে দুয়েকদিন থেকে টমটম নিয়ে আসার জন্য লোকজন রেখে চলে এলাম।

নতুন জায়গার নূতনত্ব ধীরে ধীরে চলে যেতে লাগল। আমি পড়াশোনায় মন দিতে শুরু করলাম, তখন বুঝলাম, এখানে আমার আশেপাশে ও দিনচর্যায় তার কোনো স্থান নেই। যাহোক, আমি সরস্বতী ও ডন (ইংরাজী মাসিক পত্র)-এর গ্রাহক হলাম। ইন্ডিয়ান প্রেসের ছাপা কিছু হিন্দি বই ও অনেক সংস্কৃত কাব্য-নাটক আনিয়ে নিলাম। এতে আমার শূন্যতা কিছুটা কমল। মাস দুই আড়াইয়ের মতো ক্রমাগত গ্রামে ঘুরে বেড়ানোর ফলেও তা কিছুটা কমেছিল। গুরুজী জানকীনগর, বুচয়া, কল্যাণপুর হয়ে একদিকে গণ্ডকের কিনারে সালেমপুর ঘাট পর্যন্ত পৌঁছে যান; অন্যদিকে সন্থার কাছে গঙ্গা-সোন সঙ্গমে মকর সংক্রান্তির স্নান করেন। সর্বত্রই গিয়েছিলাম সেই পুরনো ফিটনে। আমার টমটম গুরুজীর পক্ষে ততটা আরামপ্রদ হয়নি।

মঠের জমিদারির গ্রামে প্রজাদের ওপর জমিদারের প্রতাপ আমার পক্ষে এক নতুন জিনিষ ছিল। মামাবাড়িতে ও বাবার গ্রামে আমরা ছোটখাট জমিদার ছিলাম, তাই নিজের ওপর জমিদারের প্রতাপের কি অর্থ কি করে বুঝব? কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি কিভাবে জমিদার নিজের প্রজাদের কাছ থেকে পারস্পরিক ঝগড়ার জরিমানা উশুল করতে পারেন,বিয়ে-সাদী, যাতায়াত সব সময়ে হুকুম চালাতে কিংবা বেগার খাটাতে পারেন। উত্তর প্রদেশে যেখানে পাটওয়ারী সরকারী কর্মচারী ছিল, এখানে তাকে জমিদারের কর্মচারী হিসেবে দেখলাম। পাটওয়ারীকে সব কিষাণ কত ভয় পেত, তা আমি জানতাম। তাই এখানে পাটওয়ারীকে জমিদারের কর্মচারী দেখে কিষাণদের করুণ অবস্থা আরো ভাল করে বুঝতে পারলাম।

মঠের চাকর-বাকর আমাকে খুব সম্মান করত শুধু এই জন্যই নয় যে আমি নতুন 'পূজারীজী' (পরসার মোহন্তের উত্তরাধিকারীদের এই ছিল একটি উপনাম। হয়তো আগে কিছু ব্যক্তি মোহন্ত হওয়ার আগে পূজারী ছিলেন), বরং এই জন্য যে আমি কাগজের আগড়-বাগড় বুঝতাম, 'ফার্সী', ইংরেজী সব জানতাম। বৃদ্ধ মোহন্তের পর আমিই মোহন্ত হব, এতে কার সন্দেহ থাকতে পারে যখন আমার নামও রাখা হয়েছে রামউদার দাস যার নামে মোহন্তজী মোহন্তপদ লিখে দিয়েছেন।

কনৈলা অথবা পন্দহাতে আমার কখনো জমিদারীর কাগজপত্র দেখার সুযোগ মেলেনি। আর এখানকার কাগজপত্র—'তিরজী', 'সিয়াহা' ইত্যাদি একেবারে আলাদা জিনিষ। প্রথমদিকে সেদিকে মন দিতেই আমার বিরক্তি এসে যেত কারণ তখনো আমি নিজেকে ছাত্র বলেই মনে

করতাম। ধীরে ধীরে কাগজপত্র দেখতে সহজ হয়ে গেল। আমি মঠের জমা-খরচের জঙ্গলকে দেখতে চাইলাম। জানতে পারলাম, বেশ কয়েকবছর জমা-খরচ লেখাই হয়নি। মোহন্তজীর তা বোঝার শক্তি অথবা দেখার অবকাশ ছিল না। জিগ্যেস করায় জমা-খরচ লেখার লোক টাল-বাহানা করতে লাগল। যাহোক, একথা আমি বুঝে গিয়েছিলাম যে ঋণ বাড়ছিল এবং মোহন্তজী আয়ের চেয়ে বেশী ব্যয় করছিলেন। যে সভামণ্ডপের জন্য পাথর আসতে শুরু করেছিল, তা টাকা ধার করেই করা হচ্ছিল। মোহন্তজী তার খরচ ধরে রেখেছিলেন চার-পাঁচ হাজার টাকা। কিন্তু আমার ধারণা হয়েছিল দশ হাজার লাগবে এবং শেষ পর্যন্ত পনেরো হাজারে পৌছে গেল। মঠ পরিচালনার যন্ত্রটির ভেতরে অনেকটা ডুবে গিয়ে দেখার ইচ্ছা আমার একেবারেই ছিল না কারণ আমি তো আগেই বলেছি আমি আমার দৃষ্টি পড়াশোনা থেকে অন্যদিকে নিয়ে যেতে চাইনি। কিন্তু যা দেখেছিলাম, তাও কম নয়।

তিন মাস কেটে গেছে। ১৯১৩-র জানুয়ারি এসে গেছে। অথচ পড়াশোনার কোনো ব্যবস্থাই হয়নি। হয়তো এর প্রভাবও দেখা যেত। কিন্তু এই সময় পাথর পাঠানোতে এবং কারিগরদের আসার ব্যাপারে কোনো গণ্ডগোল দেখা দেয়। সেই জন্য মোহন্তজীকে আবার বারাণসীতে যেতে হল। মোহন্তজীকে ঠকানো সহজ ছিল এবং তিনি হামেশা ঠকে যেতেন। কিন্তু স্বয়ং সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে ট্রেন ও খাওয়া-দাওয়ার চারগুণ খরচা করেও যদি কাজ হত, তাহলে বুঝতেন যে অনেক টাকা বেঁচে গেল। তাঁর অনুপস্থিতির সময় একদিন বাবা ও পিসামশাই মহাদেব পণ্ডিত আচমকা পরসায় এসে হাজির। ঠিক যে বিপদকে আমি ভয় পেতাম, একদিন তাই এসে আমার সামনে দাঁড়াল। ভাবতে লাগলাম, কিভাবে বাঁচা যায়। ঠিক করলাম, যে-সময় ওঁরা অন্য লোকের সঙ্গে কথাবার্তায় ব্যস্ত থাকবেন, সেই সময় পালিয়ে যেতে হবে। পরদিন সকালবেলা আমি নকছেদীকে বললাম,—টমটম জুতে দূরের সড়কে নিয়ে যাও। 'জী মহারাজ'—বলে সে টমটম জুততে লাগল। আমি ভাল ছেলের মতো পিসামশাইয়ের পাশে বসে কিছু শুনছিলাম। রামদাস অথবা অন্য কেউ ইশারায় জানিয়ে দেয় যে টমটম চলে গেছে। আমি একটা অছিলায় উঠে গেলাম এবং খিড়কীর দরজা দিয়ে খেত পেরিয়ে সড়কে পৌছলাম। একবার টমটমে সওয়ার হওয়ার পর আমার হাতে ছিল চাবুক এবং দাঁড়িয়ে পড়ার নাম করলে ছিল ঘোড়ার পিঠ। একমা, দাউদপুর, কোপা-সমহূতার কাছে পৌছলাম। আমার জেলার বাইরে কোনো অজ্ঞাত জায়গায় চলে যাওয়া আমার পক্ষে জরুরী ছিল। কিন্তু টমটমের পক্ষে অতটা দূর যাওয়া সম্ভব ছিল না। তাই নকছেদীকে বললাম, 'টমটম ফিরিয়ে নিয়ে যাও। রাস্তায় কেউ জিগ্যেস করলে বলবে, কোথায় গেছে আমি জানি না। আমি তো এখানেই নামিয়ে দিয়ে আসছি।'

কোপা-সমহূতায় ট্রেন আসতে দেরি ছিল। সেই জন্য সামনের স্টেশন ছাপরায় পায়ে হেঁটে গিয়ে সেখানে অপেক্ষা করাই উচিত মনে হল। ছাপরা থেকে মুজফ্ফরপুর, পাটনা, বারাণসীর দিকে চলে যাওয়া সম্ভব। ট্রেনও ছিল। কিন্তু সবচেয়ে প্রথম যা প্রয়োজন ছিল, তা হল টাকা। পরসায় টাকার কথা আমি ভাবিনি, যদিও সেখানেই তা পাওয়ার সুবিধা ছিল। ছাপরায় মোক্তার ঠাকুরপ্রসাদ ছাড়া আমি আর কাউকে চিনতাম না। আমি গিয়ে তাঁকে বাবা ও পিসামশাইয়ের চলে আসার কথা জানালাম। বললাম যে, এ সময় আমার এখান থেকে সরে যাওয়াই ঠিক হবে এবং আপনি কিছু টাকা দিন। টাকা কিরকম ভয়ংকর, এর নাম কি বিষময় যা বলার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের কথা, মান, ইজ্জত, অকিঞ্চিৎকর হয়ে যায়। মোক্তার সাহেবের মনেও এই ধরনের কোনো ভাব উদ্ভূত হয়েছিল অথবা বাবার প্রতি তাঁর সহানুভূতি হয়েছিল। তিনি 'না' করলেন না কিন্তু 'একটু পরে বলব' বলে, শব্দান্তরে তাই বললেন।

আমি ফিরে যাচ্ছিলাম। গলিতে বাবার সঙ্গে দেখা হল। আমি এগার-বার মাইল টমটমে এসেছি। তিনি পরসা থেকে ছাপরা এই সারা রাস্তা পায়ে হেঁটে এসেছেন। এত তাড়াতাড়ি তিনি এলেন কি করে? আর এত তাড়াতাড়ি তিনি এই জায়গার ঠিকানাই বা পেলেন কি করে? মনে হল, কারু কাছ থেকে তিনি এই রহস্য জানতে পেরেছেন। কিন্তু যে বলেছে সে এমন কেউ নয় যে মোহন্তজীকে প্রসন্ন করতে চায়। বাবা হাঁফাচ্ছিলেন, তাঁর চোখে জল ছলছল করছিল। তিনি বেশ জোরে কিছু বলতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু লোক জড় হয়ে যাবে সেই লজ্জায় আমি বললাম—'আপনি চিৎকার করবেন না। সকাল বেলা আমি পরসায় যাব।'

সেখান থেকে আমরা ছাউনিতে চলে গেলাম, যা একশ গজের বেশী দূর ছিল না। সকাল বেলা আমরা পরসা পৌছে দেখলাম মোহন্তজীও এসে গেছেন। পিসামশাইয়ের কথা এড়াতে না পেরে মোহন্তজী শুধু দশ দিনের জন্য আমাকে কনৈলা যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন, একথা শুনে আমার ভারী রাগ হল। পিসামশাইয়ের পণ্ডিতীর প্রভাব পড়েছিল ওঝাজী ও অন্যান্য লোকজনের ওপর। তিনি যখন বললেন—'ওর ঠাকুরমা ও পিসীমা কাঁদতে কাঁদতে মরে যাচ্ছে। কিন্তু বৈরাগী হয়ে যাওয়ায় এখন ও আর আমাদের জাতের নয়। শুধু দেখা দিয়ে ও সান্ত্বনা দিয়ে ও চলে আসুক। ব্যাস্ আমরা শুধু এইটুকুই চাই।' মোহন্তজী বললেন, 'তাতে কোনো বাধা নেই।'

যাওয়ার সময় রামদাসকে সেবক ও হনুমান দাসকে (অন্ধ বলে তাকে আমরা সূরদাস বলতাম) সঙ্গী হিসেবে আমার সঙ্গে পাঠানো হল। 'দশ দিনের মধ্যে পাঠিয়ে দেওয়ার কথা ভুল। সেখানে পৌছতেই আমি নজরবন্দী হয়ে যাব।'—আমি যতই বলি না কেন, মোহন্তজী বললেন—'আমি কথা দিয়েছি।'

৮

পাকড়াও করে কনৈলায় (১৯১৩ খৃঃ)

ব্রহ্মের ওপর পিসামশাইয়ের বিশেষ বিশ্বাস ছিল। বছওয়ল-এ এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ তাঁর কাছ থেকে পাঁচশ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। লিখিত দলিলও ছিল। টালবাহানা করে তিনি তামাদির মেয়াদ পার করে দিয়েছিলেন। সুতরাং মকদ্দমা দায়ের করায় তা খারিজ হয়ে গিয়েছিল। মকদ্দমা দায়ের করার আগে হয়তো তিনি মূল টাকাটা দিতেও চেয়েছিলেন। যাই হোক মকদ্দমা হেরে পিসামশাইয়ের ভীষণ রাগ হল। বাড়ির লোকেরা বললেন, পাঁচশ টাকার জন্য এতটা দুশ্চিন্তা করার কি আছে। কিন্তু তিনি কবে কথা শুনেছেন। তিনি চুল রাখলেন, পুরশ্চরণ শুরু করলেন এবং জং বাহাদুর লালকে নির্বংশ করার জন্য তিনি তাঁদের টোলার কতকালের ভুলে-যাওয়া ব্রহ্মের পিণ্ডির ওপর দুধের ধারা দিয়ে তাঁকে জাগাতে শুরু করলেন। এই সব চিন্তা করে তিনি হরসূরাম ব্রহ্মের শরণও নিয়েছিলেন। কিন্তু জং বাহাদুরলালের একটি কেসও এতে

কুণ্ঠিত হয়নি। হরসুরাম ব্রহ্মের মতো মৈরবার ব্রহ্মও ছিলেন। এবং মৈরবা আমাদের রাস্তায় পড়ত। অতএব পিসামশাই সেখানে না নেমে কি করে পারেন।

সকালবেলা ৯টা নাগাদ আমরা স্টেশনে নামলাম। তারপর মাইলখানেক পায়ে হেঁটে 'বাবার ধামে' পৌছলাম। যাত্রী আসছিল। পাণ্ডারাও ছিল। কিন্তু বিগত ২৮ বছরে 'বাবার ধামের যে শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল, এ সময়ে তা ছিল না। মন্দিরের উত্তরে যে বড় পুকুর এবং যে সব বাড়ি ও দোকান আজ দেখা যায়, তা সবই বিগত দিনের মায়া। আমরা মন্দিরের পাশের কূয়ার ধারে বসলাম। পিসামশাই স্নান-আহ্নিক করতে লাগলেন। তাছাড়া তাঁর হরিরাম ব্রহ্মের পূজা করাও ছিল। আমি এই ব্রহ্মপূজা থেকে মুক্ত ছিলাম। বৈষ্ণব হওয়ার এই একটি লাভ অন্তত পেলাম। পণ্ডিত বলছিলেন—'হরিরামের গরুকে রাজা (যার বিধ্বস্ত গড় কিছুটা দূরে ঝরই নদীর কিনারায় পূর্ব-উত্তর কোণে তখনও দেখা যাচ্ছিল) জবরদস্তি করে নিয়ে গিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ হরিরাম অনেক মিনতি করেছিল। কিন্তু প্রভুত্বের গর্বে অন্ধ রাজা তাঁর মিনতিতে কর্ণপাত করেননি। হরিরাম আত্মহত্যা করল। দেখতে দেখতে রাজার আধিপত্য স্বপ্নের মতো বিলীন হয়ে গেল। 'কুল গেল, কাঁদারও কেউ রইল না।' সুন্দর প্রাসাদ ধসে মাটিতে মিশে গেল। আমি এই কাহিনী মন দিয়ে শুনলাম। কিন্তু দুর্গা সাধনার আগে এই রকম অলৌকিক কাহিনী থেকে যে প্রেরণা পেতাম, এ সময়ে আর সেই প্রেরণা মিলত না।

মৈরবা থেকে অন্য গাড়ি ধরে, ভটনীতে গাড়ি পালটে মউ পৌছলাম। মউ-এ এই আমি প্রথম এলাম। সেখানে একদিন অথবা দুই দিন আমরা ছিলাম। কোথায় ছিলাম, মনে নেই। সুরদাস ও রামদাসের আমার সঙ্গে আসাটা পিসামশাই পছন্দ করেননি। তিনি সুরদাসকে বিশেষ করে ভয় পেতেন কেননা সে পরসা ফিরে যাওয়ার কথা আমার মনে করিয়ে দিত। পিসামশাইয়ের বোলচাল শুনে সুরদাসও বুঝে গিয়েছিল। তাই সে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার অছিলা করে ছুটি চাইল। আমিও তা চেয়েছিলাম। আমি তো চেয়েছিলাম রামদাসও সঙ্গে না যাক। কারণ একেবারে একা থাকলে আমার পালাতে সুবিধা হবে। আমি বুঝে গিয়েছিলাম যে এখন থেকে আমাকে ভালোরকম চোখে চোখে রাখা হবে।

মনে হয়, পিসামশাই বাবাকে আমার ওপর বিশেষভাবে নজর রাখার কথা বুঝিয়ে ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে গ্রামে ভাল খাওয়া-পরার সুবিধা নেই, তাই ওর মন ওখানে টেকে না। যে বাবা সাদা পোশাক, সাদাসিধা আচার-ব্যবহারের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, তিনিই জোর দিয়ে আমার জন্য গল্‌তার কামিজ এবং ঐ ধরণেরই সুতি ও রেশমী কাপড়ের ওয়েস্ট কোট মউয়েই সেলাই করিয়ে নেন। পানের খিলিই শুধু এল তা নয়। তার ওপর কনৈলাতে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য শ'দেড়েক ভাল হলুদ পানের পাতা, খয়ের-সুপারি, চুণ-জর্দা সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হল। আমি মনে মনে হাসছিলাম।

আমাকে কনৈলাতে দেখে সবচেয়ে বেশী খুশী হয়েছিলেন আমার দাদু। ছেলেবেলা থেকেই তো আমি তাঁর সর্বস্ব। ঠাকুরমা ও কাকীমাও খুশী হয়েছিলেন এবং আমারও আনন্দ হয়েছিল, এটা আমি অস্বীকার করি না। কনৈলা ও পন্দহা দেখে আমার আনন্দ হবে না কেন? সেখানের প্রত্যেক গাছ, প্রত্যেক ভিটে, প্রত্যেক ডোবা-পুকুর, এমনকি প্রত্যেক ভগ্নাবশেষের মধ্যে আমার বাল্যকালের কত না মধুর স্মৃতি লুকিয়ে ছিল। গোবিন্দ সাহেব অশ্বত্থ এখন শুকিয়ে শেষ হয়ে গেছে কিন্তু যখন ওদিক দিয়ে যেতাম তখন ফাল্গুনের দিনের প্রহসনের কথা মনে পড়ত—জ্যোৎস্নাভরা রাতে কিভাবে একদিকে মেয়েদের এবং অন্যদিকে পুরুষদের আসর বসত; কিভাবে মাঝখানে কোনো প্রতিভাশালী তরুণ সদ্যোজাত ভাবাবেগে অনুপ্রাণিত হয়ে

মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য নানারকমের অভিনয় করত। তাদের মধ্যে বেশ কিছু অভিনয় অশ্লীল হত একথা ঠিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাতে মনোরঞ্জনের অনেক সামগ্রী থাকত। চুড়ি-অলা নওজোয়ানদের উৎসাহের জন্য জোগীড়া গান খুব জমত। ফজল, বালীজান ও আবদুলের এই সময় বড় চাহিদা ছিল। ফজলের ঐ সময়ের হাসিমুখ যা অন্যকেও হাসাত কয়েক বছর পরে আমি তা আবার দেখেছিলাম। কিন্তু তার খালি মাথা, ওয়েস্ট-কোট, কালো লুঙ্গী-পরা চেহারার বদলে তাঁকে হাঁটু পর্যন্ত পায়জামা, কুর্তা ও মাথায় টুপী পরা দেখে আমার ভাল লাগেনি। আমি দলসাগরে ব্রহ্মবাবার বটগাছ আমার দরজা থেকে দেখতে পেতাম। সেই সময় কামুক সৈয়দের হাত থেকে নববিবাহিতা পত্নীর সতীত্বকে বাঁচানোর জন্য ব্রাহ্মণদম্পতির আত্মাহুতির চেয়েও সেই সব স্মৃতি আমার কাছে বেশী মধুর ছিল। যার মধ্যে ছিল গ্রীষ্মকালের সেই দুপুর যা পশুপক্ষীদেরও সব কাজ ছেড়ে গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিতে বাধ্য করত, আর ছেলেরা বটের নিচে গরুমোষ রেখে দিত—তারা নিজেরা জাবর কাটত এবং ছেলেরা ঘন শীতল ছায়ায় সজীব হয়ে লুকোচুরি খেলতে থাকত। অন্য কোথাও হলে গাছে চড়ার ক্লাসে অপরিচিত হওয়ার কারণে যোগ দিতাম না, কিন্তু ব্রহ্মবাবার মাটি-ছোঁয়া মোটা মোটা হাজার শাখায় চড়ে লাফ-ঝাঁপ দিলেও পা ভাঙার ভয় ছিল না। বড়ী, লাহুরিয়া আর নাউর-এর পুকুরগুলো সেইসব গল্পকে মনে করিয়ে দিত যা আমি পিসিমা বা মায়ের কোলে বসে তন্ময় হয়ে শুনতাম। ভাবতাম, কনৈলাতে হয়তো কোনো রাজা ছিল যার বড় ও ছোট দুই রাণী ছিল। আর ছিল তাঁদের এক প্রিয় নাপিতানী। এই তিনজনে এই তিন পুকুর বানিয়েছিল। এই পুকুরগুলিতে আমি এক সময় কিন্না ও বদরীর সঙ্গে মাছ ধরতাম। কনৈলার জায়গাগুলো দেখে পুরানো সব ঘটনা আবার চোখের সামনে সজীব হয়ে উঠত, আর মনে 'তেহি নো দিবসা গতাঃ'-এর বিষাদের সঙ্গে এক ধরনের আনন্দও দিত। তাই এভাবে কনৈলা আসাটা শুধুই ক্ষোভের কারণ হয়নি।

পাঁচ-সাতদিন পরে রামদাস পরসা হয়ে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করে। আমিও তার মাধ্যমে গুরুজীর কাছে আমার পরিস্থিতির কথা বলে পাঠালাম। রামদাস আটদশ দিন পরে ফিরেও এল। কিন্তু এখানে যেতে দেওয়ার নামটি পর্যন্ত কেউ করে? নিরাশ হয়ে রামদাস যখন পরসা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো, তখন বাড়ির লোকেরা খুব খুশী হল। আমারও মনে হল, ভালই হল। কেননা আমার সঙ্গে রামদাসকে নিয়ে পালানো বেশী মুশকিল হত। ঘাস খাওয়ার জন্য লম্বা দড়ি দিয়ে বাঁধা বাছুরের মতো আমারও যে বাঁধন ছিল তাতে কনৈলা থেকে বছ্ওয়ল পর্যন্ত যাওয়া আসার সুযোগ ছিল। আমার জন্য খাওয়া-দাওয়ার বিশেষ বন্দোবস্তও ছিল। আত্মীয়দের সঙ্গে ভোজনে যে মন ডাল ভাতকেও অমৃত মনে করে খেত, সেই মন এখনও আমার ছিল। তাই ছোট ভাইদের ও বাড়ির অন্যান্য লোকদের থেকে আলাদা বিশেষ খাওয়া-দাওয়া আমার ভাল লাগবে কি করে?

রামদাসের চলে যাওয়ার সপ্তাহ খানেক পরে আমি একবার মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করি। পালিয়ে আজমগড় স্টেশনে পৌঁছে গিয়েছিলাম। কিন্তু ট্রেন ধরার আগেই বাবা সেখানে এসে হাজির। বাবার সামনে পড়ে যাওয়ার পর ভিড় জমিয়ে কথা কাটাকাটি করা আমার ভাল লাগত না। আমি হার স্বীকার করলাম এবং তাঁর সঙ্গে কনৈলা রওনা হলাম। রাস্তায় তিনি আমাকে বোঝাতে লাগলেন—তোমার গ্রামের জীবন পছন্দ নয়। সেখানে ভাল খাওয়া-দাওয়া পাওয়া যায় না, পরিষ্কার কাপড়-জামা দুর্লভ। আমি তোমার সারা জীবনের জন্য ঘি-দুধ খাওয়ার ও সাফ জামাকাপড় পরার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তারপর তিনি হিসাব করতেও শুরু করে দিলেন। আর বললেন—'এতটা মূলধনের সুদ থেকে তোমার কাজ চলে যেতে পারে। তুমি কোথাও যেয়ো না। ঘরেই থাক। আমি এই টাকাটা তোমার নামে জমা করে দিতে রাজী আছি।' তাঁর কথা শুনে

আমার রাগ হয়নি, আমার শুধু এই কথা মনে হয়েছিল যে আমার মনের কথা তাঁকে বোঝানো কতটা কঠিন। জ্ঞানেরও কোনো খিদে আছে, বিস্তৃত জগৎকে দেখারও কোনো খিদে আছে, শিক্ষিত সংস্কৃত সমাজে থাকারও কোনো খিদে আছে, যা পেটের খিদের থেকে হাজার গুণ বেশী প্রবল এবং সর্বদা অতৃপ্ত—এই সব আমি তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করতাম। কিন্তু যদি আমি কনৈলায় তাঁর চোখের সামনে থাকার শর্ত মেনে নিতাম, তবেই তিনি এই সব কথা শুনতে রাজী হতেন।

কনৈলা ও বছওয়ল-এর লোক খুব সজাগ হয়ে গিয়েছিল; তাই এই অবস্থায় কোনো ঝুঁকি নেওয়া নিরর্থক হত। মুক্তি পাওয়ার জন্য আমার ওপর বিশ্বাস এনে দিয়ে ওদের সতর্কতার অবসান ঘটানো জরুরী ছিল। যাগেশ অর্ধেক সময়ে থাকত প্রয়াগে, অর্ধেক বছওয়ল-এ। সে সভ্য নাগরিক সমাজে থাকা পছন্দ করত। কিন্তু জ্ঞানলিপ্সার যে প্রচণ্ড দাবানল আমার মধ্যে জ্বলছিল, সে তার প্রহার থেকে অনেকটা সুরক্ষিত ছিল। সে এখনো আমার 'নর্মসচিব'। তাই হোলির আগে সে বছওয়ল-এ আসায় আমি খুব খুশী হয়েছিলাম। আগের মতোই আমরা চারপাইয়ে শুয়ে অথবা বসে অতীত ও ভবিষ্যতের নানা কথা কল্পনা করতাম। আগের মতোই একসঙ্গে কখনো কুঠী, কখনো সংকটাপ্রসাদের বাংলা এবং কখনো সবুজে ভরা খেতে ঘুরতে চলে যেতাম। কনৈলা থেকে বছওয়ল-এ আমার দিন ভাল কাটত। পিসামশাই নস্য নিতেন, তাঁর ছোট ভাই সহদেও পাণ্ডের (যাগেশের বাবা) খইনী (খাওয়ার তামাক) ও আফিম এই দুই অভ্যাসই ছিল। নিজের বড় ভাইয়ের মতো তিনি সংস্কৃত পড়েননি। তার বদলে তিনি উর্দু শিখেছিলেন। নিচের ঠোটে খইনী ঠেসে বেশ সুর করে অথবা কখনো গদগদ হয়ে রামায়ণের চৌপদী পড়তেন। বাইরে থেকে আমার প্রতি তিনি শিষ্টাচার সম্মত ব্যবহার করতেন। কিন্তু যাগেশের ওপর আমার প্রভাব তিনি একেবারেই পছন্দ করতেন না। বড় ছেলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহস ছিল না যাগেশের মার এবং তিনি জানতেন যে যাগেশ ও আমার ভালবাসা কতটা চিরস্থায়ী ছিল।

আমার পিসীমা আমার কাছে গর্বের ব্যাপার ছিলেন। প্রথম দেখা হওয়ার সময় থেকেই মিতভাষিণী ও গম্ভীর হওয়া সত্ত্বেও তিনি যে স্নেহময়ী তা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। মার এই কথা আমার মনে ছিল—'সেই সময় বিয়ে হওয়ার পর আমি প্রথম শ্বশুরবাড়ি এসেছিলাম। বড় পরিবার ছিল। আমার ছোট ননদ বরতা, তখনো তার বিয়ে হয়নি। সে দেয়ালের আড়াল থেকে আঙুল দেখিয়ে বলেছিল—'এ হল কাকা।' আমি ঐ একবার দুচোখ ভরে নিজের শ্বশুরকে দেখেছিলাম। কিছুকাল পরেই তিনি মারা গেলেন।' মা ও তাঁর ছোট ননদ কিভাবে ছিলেন? তখনতো এই সংসারে আমার অস্তিত্বও ছিল না। বিয়ের পর পিসীমা যখন বছওয়ল গেলেন, তখন তাঁকে অনেক শস্য পিষতে দেওয়া হত। কনৈলায় তাঁর বাপের ঘর খুব ধনী না হলেও তারা অনেক জনমজুরের মালিক ছিল। তাই তাঁকে বিশেষ কাজ করতে হত না। আর তখনতো তিনি ছোট মেয়ে ছিলেন। তাঁর এই কষ্টের খবর যখন কনৈলা পৌছল তখন জানকী পাণ্ডে নিজের ভাইকে বললেন—'মথুরা! এখান থেকে কিছু বাটনা বাটার লোক নিয়ে যাও। রামটহল তিওয়ারী (?) পিসামশাইয়ের (—এর মেশোমশাই যে ঐ সময় সংসারের দেখাশোনা করতেন) বাড়িতে ছ'মাসের কুটা-বাটা করে দিয়ে আসবে। সত্যি সত্যি মথুরা পাণ্ডে কয়েকজন মজুরনীকে নিয়ে গিয়েছিলেন। পিসীমা আমার সঙ্গে অনেক কথাবার্তা বলতেন এবং তাঁর কথাবার্তা সাধারণ গ্রাম্য স্ত্রীলোকদের চেয়ে কিছু উচ্চস্তরের ছিল। তাই সেই সময় আমি সদ্য সংস্কৃতির প্রেমে পড়েছিলাম। তাই আমার কাছে তা খুব ভাল লাগত। একদিন এক বৃদ্ধা এল। সে গ্রামের

পশ্চিমের মঠে (টোলে) থাকত। ন্যুব্জ এই বৃদ্ধা লাঠি ভর দিয়ে চলত। তার সম্পর্কে আমি পিসীমাকে জিগ্যেস করলাম। বললেন—"বাছা। ও যখন ঘরের কথা বলত তখন ওর চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়তে দেখে আমারও কান্না পেত। বলত, 'বদমলী (১৮৫৭-এর বিদ্রোহ)-এর সময় আশেপাশের গ্রাম মেরে জ্বালিয়ে গোরা পল্টন আমাদের গ্রামেও এসেছিল। ওর গ্রাম ছিল লখ্নৌ-এর পাশে। গোরারা ঘরের তিন যুবতী বউকে এক্কায় তুলে নিয়ে ছাউনীর দিকে রওনা দেয়। রাস্তায় দুই বউ পুকুর কিংবা কুয়ায় লাফিয়ে পড়ে মরে যায়। আমি আমার ভাগ্যকে অভিশাপ দিতাম, কেন আমিও তাই করিনি। বেঁচে থাকার লোভ হলো আমার।' এরপর ঘোরাঘুরি করতে করতে আজমগড়ে মঠের মোহন্তের কাছে পৌঁছে যায়।"

ঐ সময় বছওয়ল-এ এক দুর্ঘটনা ঘটেছিল। পিসীমার বড় ছেলে রমেশ বয়সে আমার চেয়ে অল্প ছোট-বড় ছিল। মেজাজ খুব গরম ছিল। একদিন কথায় কথায় তার সঙ্গে একটা ছেলের ঝগড়া বেঁধে যায়। সে তাকে তুলে পুকুরে ফেলে দেয়। মামলা পুলিস পর্যন্ত গড়ায়। তদন্ত করতে দারোগা ছাড়া ইন্‌সপেক্‌টরও এসেছিলেন। যখন সাক্ষী-সাবুদ হচ্ছিল তখন আমিও সেখানে ছিলাম। পিসামশাইয়ের পণ্ডিতী প্রভাব ইন্‌সপেক্‌টর সাহেবের ওপরও পড়ল। আর ছেলেদের ঝগড়া বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সেখানেই মিটিয়ে দেওয়া হল। ইন্‌সপেক্‌টর সাহেবের মন বিশেষভাবে আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। কেন? আমি উর্দু ও কিছু সংস্কৃত জানি, এই খবর তিনি কতটা জেনেছিলেন, তা আমি বলতে পারব না। কিন্তু, আমি তখন ১৯ বছরের লম্বা ছিপছিপে, পাতলা কিন্তু স্বাস্থ্যবান যুবক ছিলাম। গ্রামের লোকের চোখে আমার ছিল উজ্জ্বল যৌবন। পরিষ্কার মিহি ধুতি, লাল জুতা ও ফ্লানেলের বিনীত পোশাকের প্রভাবও নিশ্চয় পড়েছিল। জিগ্যেস করায় পিসামশাই যখন গর্ব করে বললেন—'আমার শালার ছেলে—আমারই ছেলে।' তখন ইন্‌সপেক্‌টর সাহেব বললেন—'আমার এই রকম ছেলে থাকলে আমি তাকে ইংরেজী পড়াতাম।' আমার দৈহিক উচ্চতা দেখে হয়তো তাঁর মনে হয়ে থাকবে যে ইংরেজী পড়ালে একদিন তাঁর মতো ইন্‌সপেক্‌টর হওয়া আমার পক্ষে সহজ হত। এখন কনৈলার থানা জহানাগঞ্জ ভেঙে চিঁরৈয়াকোট হয়ে গিয়েছিল। একদিন সেখানকার দারোগা এমনি ঘুরতে ঘুরতে কনৈলা এসেছিলেন। আমাদের দুয়ারে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। ক্ষত্রিয় এই যুবক বারাণসীর বাসিন্দা ছিলেন। কলেজের পড়া ছেড়ে পুলিশে এসে গেছেন। বড় বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল। সেজন্য বেচারা বর্তমান পরিস্থিতিতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। হয়তো তিনি আমার মধ্যে কিছু সাদৃশ্য দেখেছিলেন, সেইজন্য তাঁর পুরানো স্বপ্ন আমার কাছে তুলে ধরেছিলেন। পুরানো আশাভঙ্গ হওয়া স্বপ্নের কথা বলাও কোনো কোনো সময় ভাল লাগতে পারে। আমার শৈশব কাল মনে পড়ত। একবার বাবা গ্রামের অন্য এক ঘরের কিছু খেতের চাষ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ঝগড়াটা ছিল জমির স্বত্ব নিয়ে। ফৌজদারী মামলা হয়েছিল। জহানাগঞ্জ থেকে দারোগা তদন্ত করতে এসেছিলেন। গ্রামের বাইরে পুকুরের ধারে পাকুড় গাছের নিচে খাটিয়ায় বসে ছিলেন দারোগাজী। চারদিকে লাল পাগড়ীপরা সিপাই ও কালো কুর্তা পরা চৌকীদার বসে ছিল। তখন রাত। লণ্ঠনের আলোয় দারোগাজী দুই পক্ষের সাক্ষীর সাক্ষ্য লিখে নিচ্ছিলেন। নিজের সঙ্গে নিশ্চয়ই লণ্ঠন এনেছিলেন দারোগাজী কারণ তখনো কেরোসিন তেল ও লণ্ঠন পৌঁছয়নি। আমি দেখছিলাম সারা গ্রাম এবং সাত-আট বছরের ছেলে আমার ওপরও দারোগাজীর আধিপত্যের ছায়া পড়েছিল। অনেক দিন পর্যন্ত শিউবরতী (শিবব্রতা মেজ) পিসীমা, দিদিমা অথবা অন্যের মুখে গল্প শোনার সময় রাজার নাম নিলে পাকুড় গাছের নিচের দারোগা সাহেব তথা তাঁর আশেপাশের সিপাই-চৌকিদারের কথা মনে পড়ত। আজ

দারোগাজীকে আমার সামনে কোনো জবরদস্তি কেড়ে নেওয়া আদর্শের জন্য আপসোস করতে এবং নিজেকে সহানুভূতি প্রকাশ করতে দেখছিলাম।

হোলির দিন আমি বছওয়ল-এ ছিলাম। যাগেশের প্রয়াগ ফিরে যাওয়ার কথা ছিল। তাই কোনোদিন ওর সঙ্গে চলে যাওয়া আমার পক্ষে সহজ ছিল। আমরা রাত্রিতে যাগেশের মামাবাড়ি শাহপুরে থাকি। ওর মামা লক্ষ্মীকে দেখেছিলাম প্রথম যেবার বছওয়ল-এ গিয়েছিলাম, তখন তার বয়স কম ছিল। ওর মেয়েলি গলার জন্য লোকজন ঠাট্টা করত। সে বাড়ি ছিল না। রানীকীসরাই স্টেশন থেকে আমাদের দুজনের রাস্তা দুদিকে যাওয়ার কথা। যাগেশের গাড়ি কিছু আগে রওনা হয়েছিল। চার বছর পরে রানীকীসরাই দেখার সুযোগ মিলেছিল। কিন্তু গাড়ি ধরার তাড়াতাড়িতে আমি সেদিকে মন দিতে পারিনি। তবে যাগেশের গাড়িতে আমার সহপাঠী জাহাঙ্গীপুরের দেওকীপ্রসাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমরা দুজন এক সঙ্গে নিজামাবাদ থেকে মিডল পাস করেছিলাম। সে জৌনপুরে আমীনের কাজ করছিল। পন্দহার আর একজন পরিচিত লোকও ছিল। তিনি আমাকে একেবারেই চিনতে পারেননি। তা থেকে আমি বুঝতে পারলাম যে সেই সময় থেকে আমার চেহারায় অনেক পরিবর্তন হয়েছে। জীবনে বার এবং চব্বিশ বছর বয়সেরচেহারার মধ্যে অনেক তফাত থাকে। আমিও এই অবস্থায় পরিচয় দেওয়াটা নীতিবিরুদ্ধ মনে করেছিলাম।

ভটনীতে এসে পোষাক পরিবর্তনের প্রয়োজন হল। ইচ্ছে করলে বৈরাগী সাধু মুখ ও মাথা কামিয়ে ফেলতে পারে অথবা সবই রেখে দিতে পারে। এ পর্যন্ত কনৈলাতে আমি গৃহস্থ বেশে ছিলাম। যাহোক, নাপিত খুশি হয়ে এই কাজ করে দিয়েছিল, যদিও গোঁফ কামাবার সময় সে ইতস্তত করছিল—আমাদের ওদিকের হিন্দুরা একমাত্র বাবা মারা গেলেই গোঁফ কামায়। হ্যাঁ, এখন আমার মুখে অল্প-স্বল্প দাড়ি উঠছিল। আমি নাপিতকেই ওয়েস্ট-কোটটা দিয়ে দিলাম। সে বাবুর দরাজ হাত দেখে খুব খুশী হল। সে কি করে বুঝবে যে বাবুর পোশাকের সঙ্গে সামঞ্জস্য না হওয়ার জন্যই সে এটা ফেলে দিল।

৯

আবার পরসায়

গুরুজী একেবারে আশা ছেড়ে না দিলেও আমার ফিরে যাওয়া সম্পর্কে তাঁর সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। আমাকে ফিরে আসতে দেখে তিনি খুব খুশী হয়েছিলেন। আমি কোথায় গেছি, বাবা ও পিসামশাই তা বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু এখন সেখান থেকে ফিরিয়ে আনা তাদের ক্ষমতার বাইরে বুঝতে পেরে চুপ করে রইলেন। রামদাস আবার আমার সেবায় লেগে গেল এবং তিন মাস আগে যে দিনচর্যা ছিল তা আবার শুরু হল।

পড়াশোনার ব্যাপারে গুরুজীকে কিছু বললে তিনি সোজাসুজি না করতেন না। কখনো বলতেন 'আচ্ছা', কখনো বলতেন, 'এখানেই ওঝাজীর কাছে পড়ছ না কেন?' কখনো বলতেন, 'আমি বুড়া হয়েছি, খাড়া হয়ে চলতে পারি না, জানি না কবে চোখ বুজব, তুমি মঠের ব্যাপারে সামলাও।' এই সব কথা আমার ভাল লাগত না ঠিকই, কিন্তু আমি এও দেখছিলাম যে মঠের অবস্থা খুবই খারাপ। হিসাব-কিতাবের দিকে কোনো নজরই ছিল না। আমদানির চেয়ে খরচ অনেক বেশী ছিল। সরাসরি এই ঘাটতির কাজ 'লাভজনক উদ্যোগ' মনে করে বড় উৎসাহের সঙ্গে করা হচ্ছিল। পরসায় মঠের অনেক ধানের খেত ছিল। ভাগচাষ করলে তা থেকে অনায়াসে একর প্রতি ১০-১৫ টাকা পাওয়া যেত। কিন্তু তা খাস 'জিরাতে' রাখা হয়েছে। আমি হিসাব করে দেখালাম যে সেইসব খেতের জোতানো, বীজ বোনা, আগাছা তোলা,সেচ করা, কাটা, ঝাড়া—এইসব কাজে যত খরচ হয় আমদানি তত হয় না। প্রতি একর মালগুজারীতে যে ১০-১৫ টাকা লোকসান হয় তা আলাদা। কিন্তু গুরুজী এই সব কথা বুঝতে পারতেন না। কর্মচারী বুঝিয়ে দিত বছরে খামারে যত ধান দেখা যায়, সব কিনতে হবে, আর গুরুজী সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করতেন। মন্দিরের সভামণ্ডপের কাজও কমার জায়গায় বেড়েই যাচ্ছিল। সেই সময় বারাণসীর মিস্ত্রীরা তাতে কাজ করছিল। এই দুটো ব্যাপারকে বন্ধ করা আমার ক্ষমতার বাইরে মনে হচ্ছিল। কিন্তু ঋণের ভার কমানোর ও আমদানীর ব্যবস্থা স্থায়ী করার জন্য কিছু করা অত্যন্ত জরুরী ছিল।

মঠের সবচেয়ে বড় গ্রাম ছিল বহরৌলী। এই গ্রামের বছরের আমদানি ছিল সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা। গ্রামটি মঠের প্রভাবশালী সংস্থাপক বাবা পরসাদীরাম আঠার শতাব্দীতে দিল্লি থেকে দান হিসেবে পেয়েছিলেন। গ্রামের রাজপুতেরা বড় লড়াকু ছিল। মালগুজারী কখনো উশুল হত না। বস্তুত সেই জন্যই এটা বুড়ি গাইদের গোদাম হয়েছিল। পরসাদী বাবার অধিকারে আসার পরও গ্রামের রাজপুতদের মালিকানার স্বত্ব স্বীকার করে নিতে হয়েছিল এবং সরকারের কাছে জমা করার মালগুজারীর কিছু অংশ মালিকানা হিসাবে তখনো তাদের মিলত। কিছু বাদ দিলে বহরৌলীর সব খেতই ছিল রবি ফসলের। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে বহরৌলীর নীলকুঠী গোটা উত্তর বিহারে প্রসিদ্ধ ছিল। তার নীল-সাহেবদের আশপাশের কয়েকশ গ্রামের ওপর প্রচণ্ড আধিপত্য ছিল। কুঠীর বিশাল বাংলা, অনেক ফ্যাক্টরী ঘর ও যন্ত্র সে-সময়েও ছিল। নীল থেকে আয় যখন খুব বেশী ছিল, তখন বহরৌলীর অর্ধেকেরও বেশী খেতে নীলের চাষ হত। নীল চাষ বন্ধ হওয়ার পর খুব তাড়াতাড়ি কুঠীরও ভগ্নদশা উপস্থিত হয়। কুঠী ও তার চারপাশের জমি অন্য কেউ কিনে নিয়েছিল। মালিকের চাষের জমি মালিকের কাছেই ফিরে গেল। অনেক সার দেওয়া নীল চাষের জমি খুব উর্বর ছিল। তাই জমির জন্য ক্ষুধার্ত জনবসতিপূর্ণ বহরৌলীর চাষীরা প্রতি একরে বিশ-পঁচিশ টাকা হারে খেতের বন্দোবস্ত নিয়েছিল। এ সময়ে চাষীরা ঐ টাকা দিতে পারছিল না এবং প্রতি বছর অনেক মালগুজারী বাকী থেকে যেত।

তখন বকেয়া মালগুজারী সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গী এই রকম ছিল না। আমি দেখছিলাম আমার গোমস্তা, পাটোয়ারী মিলে কিছু লেনদেন উশুল হতে পারে এমন অর্থও বাকী রেখে দিত। যখন কয়েক বছরের বকেয়া জমা হয়ে যেত তখন মালিককে বলত—'মালিক, এটাকা আর উশুল হবার নয়। ছেড়ে দেওয়া হোক।' এইভাবে প্রতি বছর দুই-চার হাজার টাকা ছেড়ে দেওয়া হত। এতে মালিককে ধোঁকা দেওয়া হত বলেই আমার মনে হত। এদিকে বহরৌলীর বাবু রাজনারায়ণ সিংহ যিনি নিজের উদ্যোগে কলকাতায় গিয়ে একটা বড় সম্পত্তি

করেছিলেন—তিনি কিছু টাকা অগ্রিম দিয়ে গোটা গ্রামের ঠিকা নিতে রাজী ছিলেন। আমি স্থির করলাম যে গ্রামকে ঠিকা দিয়ে দেওয়াই ভাল। গুরুজী আমার মত মেনে নিলেন। তথাপি এতে যাদের স্বার্থে আঘাত লাগল তারা ক্রমাগত গুরুজীকে উল্টো বোঝাতে চেষ্টা করতে লাগল—'মহারাজজী, ঠিকা দিয়ে দিলে আপনি নিজের জমিদারিতেই পর হয়ে যাবেন। এত এত জরিমানা, ফরমায়েস হুকুমতের আমদানিই শুধু ঠিকাদার পাবে না...'

পাটোয়ারীরা বেশ কয়েক বছর ধরে কাগজ তৈরী করেনি, আর তা করাও সহজ ব্যাপার ছিল না। তা তৈরী করতে কয়েক মাস লেগে গেল। আর যখন ঠিকার কাগজের রেজিষ্ট্রী হয়ে গেল, তখন আমার মনে হল একটা বোঝা হাল্‌কা হয়ে গেল।

* * *

রাত্রিতে মন্দিরের আরতি পূজা ও আহার শেষ হওয়ার পর অন্যান্য শিষ্যদের সঙ্গে আমিও গুরুজীর পা টিপে দিতে যেতাম। এই সময়ই গুরুজী তাঁর নিজের তীর্থযাত্রার ও তাঁর শোনা কাহিনীর কথা এবং মঠ তথা সম্প্রদায়ের মৌখিক ইতিহাস আমাদের বলতেন।

পরসাদীরামের গুরু পরম্পরা পেছনের দিকে শাহজাহান-ঔরঙ্গজেবের সমকালীন সন্ত ধরণীদাস পর্যন্ত চলে গেছে। তিনি এক বড় সন্ত কবি হয়ে গিয়েছিলেন। পরসাদীরামের পরে মোহন্ত হন রামসেবক দাসজী। তাঁর সময়ে সারন জেলা কোম্পানীর অধিকারভুক্ত হয়। রামসেবকদাসের শিষ্য রামচরণদাস কিছুদিন ইংরেজের পল্টনে সিপাই ছিলেন। গুরুর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ মোহন্তপদের দাবীদার ছিলেন। হথুয়ার বাবু ছত্রধারীশাহী যিনি পরে নিজের সেবার জন্য মহারাজ ছত্রধারীসাহী (বর্তমান হথুয়া রাজবংশের পূর্বজ) হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন তাঁর পক্ষে। হথুয়া রাজ্যের তরফ থেকে ছোট নদীর কিনারে রামনগর আদি পাঁচটি গ্রাম পরসা মঠ পেয়েছিল। তাই মঠের উত্তরাধিকারের প্রশ্নে আমারও কথা বলার অধিকার আছে, এটাই তাঁর বলার ছিল। অন্য পক্ষ—যাতে পরসার বাবুরা যোগ দিয়েছিলেন—বলে-কয়ে রামচরণদাসকে পরসা নিয়ে আসে এবং তাঁর হয়ে মোহন্তপদের দাবীতে মামলা করে। অনেকদিন পর্যন্ত এই লড়াই চলেছিল। শেষ পর্যন্ত জয় হয়েছিল রামচরণ দাসের। আর পরসা মঠ গৃহস্থের ঘরে পরিণত হওয়া থেকে বেঁচে যায়। এই মামলার সময় বহরৌলীর লাখেরাজ সম্পত্তির বাদশাহী সনদ আদালতে জমা করা হয়েছিল এবং দায়ভাগ কায়েমী বন্দোবস্তের সময় দ্বিতীয়বার জরিপের সময়, তা পেশ করতে না পারায় যে হারে সরকারী খাজনা ধরা হল, তা আশেপাশের হার থেকে বেশী ছিল। রামচরণ দাস মোহন্ত হওয়ায় বাবু ছত্রধারীশাহ নিজের রাজ্য থেকে যে পাঁচটি গ্রাম পরসাকে দেওয়া হয়ছিল, তা ফিরিয়ে নেন।

সাতান্নর বিদ্রোহে বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে দেশের সংঘর্ষ দেখে রামচরণ দাসের বুড়া শরীরেও একবার সিপাইয়ের রক্ত টগবগ করে উঠল। তিনি পরসার পিতলের কারিগরদের ডেকে তোপ ঢালাই করার পরামর্শ শুরু করলেন। গড়ের বাবুরা খুব হাতজোড় করে তাঁকে ঐ কাজ করা থেকে বিরত করেন। বাবা রামচরণ দাস খুব দীর্ঘজীবী হয়েছিলেন। বলা হয়ে থাকে যে তিনি একশ বছরেরও বেশী বেঁচেছিলেন এবং তাঁর আবার নতুন করে দাঁত উঠেছিল। দান-ধ্যানের জন্যও তিনি বিখ্যাত ছিলেন। সামনে যা কিছু আসত তা দিতে তাঁর কোনো সংকোচ ছিল না। মঠের কাজকর্ম সামলাতেন ছোট মোহন্ত শ্রীরঘুবীরদাস। সেই সময় মঠের হাতী দান হয়ে যাওয়ার ভয়ে পরসা মঠে তাদের আনা যেত না।

আমার গুরুজীর গুরু শ্রীরঘুবরদাসজীর কোনো নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল না। তবে তাঁর এই বিশেষত্ব ছিল যে তিনি মঠের সম্পত্তির সুবন্দোবস্ত করতে পারতেন। ব্যবস্থা করার অধিকার

আরো একজনের ছিল। তাঁকে অধিকারীজী বলা হত। বস্তুত ইংরেজের রাজ্য—সব রকমের সম্পত্তির ওপর ব্যক্তির সীমাহীন অধিকার—সবার ওপর এই এক লাঠি ঘুরিয়ে মঠের সম্পত্তির ওপরও ব্যক্তির একাধিকার যেভাবে কায়েম করে দিয়েছিল তা আগে ছিল না। প্রথমদিকে মোহন্ত খুশীমতো কাজ করলেও তাকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা ছিল অধিকারীর। তাছাড়া তাঁর ওপর অন্যান্য সাধু, গৃহস্থ ও সম্প্রদায়ের সঙ্ঘের অধিকারও ছিল। আমি পরসায় আসার আগেই অধিকারীর স্থান শূন্য হয়ে গিয়েছিল। আর গুরুজী তার স্বাধীনতার বাধা মনে করে তাকে নিয়োগ করার কথা মনেও আনেননি।

কোনো এক সময় পরসার মঠ কইল-এর মঠ থেকে বার হয়েছিল। ঐ মঠের সংস্থাপক কেবলরামের উত্তরাধিকারী গৃহস্থ হয়ে গিয়েছিলেন। আজ ঐ মঠে তাঁরই সন্তান গৃহস্থ বৈরাগীর মতো থাকে। কেবলরামের গুরু ছিলেন মাঝী-র ধরণীদাস। এই কথা আমি আগেই বলেছি। এইভাবে পরসা মঠের স্থান মাঝী ও কইল-এর পরে আসে। কিন্তু বৈরাগীদের জগতে পরসার নামই বেশী প্রসিদ্ধ। তার কারণ হল এই যে পরসাদী রামের শিষ্যপরম্পরা বেশী বড় ছিল আর বিগত দুই শতাব্দীতে তা শুধু যুক্তপ্রান্ত ও বিহারই নয়, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র ও বঙ্গদেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। এই মঠের শাখাই এখন প্রায় শ'খানেক। এই সময় গুরুজী এই সব মঠের নাম ও তাদের সংস্থাপকদের বিশেষত্বের কথাও বলতেন। তিনি নিজেও অনেক ঘুরেছেন। সেই সঙ্গে কখনো কখনো ঐ সব মঠের সাধুরা তাঁদের মঠের উৎপত্তি-স্থান দেখতে পরসায় আসতেন—তাঁর কথা শুনে তা বুঝতে পারতাম।

যদিও তিনি চাইতেন না যে আমি পরসা থেকে চলে যাই, তথাপি তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানতেন যে আমি যে কোনো সময়ে চলেও যেতে পারি; তাই আমাকে 'ধর্ম-কর্ম' (সাম্প্রদায়িক আচার ব্যবহার) শেখাতে খুব তৎপর হয়েছিলেন। 'রামপটল' ও 'রাম পদ্ধতি'র ছোট ছোট পুঁথি আমার হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন এবং সাগ্রহে বলতেন এ থেকে ধাম-ক্ষেত্র-পঞ্চ-সংস্কার মুখস্থ করে ফেল।' বেদান্ত ও ভগবতীর মহামন্ত্রর সিদ্ধির মার যার ওপর পড়েছে, আর্যসমাজের ছিটা না পড়া সত্ত্বেও, তার কাছে এই সব পটল পদ্ধতি তো ছেলেখেলার মতো। তবু এই সব দেখা জরুরী ছিল। এতে সন্দেহ নেই যে ধর্ম ও বৈরাগ্যের খোঁজে আমি পরসা আসিনি, আমি এসেছিলাম শাস্ত্র ও সংসার বিষয়ক বিস্তৃত জ্ঞানার্জনে সুবিধা হবে এই ভেবে। পরসায় একদিন এক পণ্ডিতের সঙ্গে আমার তর্ক বেঁধে গেল। আমি অদ্বৈত বেদান্তের পক্ষে কথা বলছিলাম। গুরুজীর বেদান্তের সূক্ষ্ম সিদ্ধান্তের কি প্রয়োজন। তবু, তিনি একথা জানতেন যে, অদ্বৈত বেদান্ত শংকরাচার্যের জিনিষ। তাই তিনি আমাকে বললেন—এ আমাদের সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত নয়। আমার কাছে এই কথাও নতুনের মতো শোনাল। কেননা আমি রামানন্দের শিষ্য কবীর ও রামানন্দীয় তুলসীদাসকে অদ্বৈত-বেদান্তের সমর্থক বলে জানতাম।

পঞ্চসংস্কারের ষোল আনা জালি শ্রুতি তো আমার কাছে অসহ্য মনে হত, কেননা রুদ্রী ও যজুর্বেদের বহু অধ্যায় সুর করে পড়েছিলাম বলে আমি জানতাম যে, বেদের মন্ত্রের ভাষা কি রকম হয়। কোনো নতুন মঠে অথবা সাধুর কাছে গেলে তাদের আসল-নকল বোঝার জন্য ধাম-ক্ষেত্র বিষয়ক জ্ঞান সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। এই বিষয়ে কিছু প্রশ্নোত্তর গুরুজী আমাকে বলেছিলেন যা নিচে দেওয়া হল।

'আপনার স্থান কোথায়, মহাত্মা।'

'পরসা।'

'আপনার গুরু মহারাজের নাম কি?'

'শ্রী শ্রী শ্রী লক্ষ্মণদাসজী মহারাজ।'

'কোন আখড়া আপনার?'

'দিগম্বর।'

'কোন দ্বারা?'

'সুরসুরানন্দ।'

সাধারণভাবে এই প্রশ্নই যথেষ্ট ছিল। ধামক্ষেত্রের মধ্যে বৈষ্ণবদের চার সঙ্ঘবদ্ধ সম্প্রদায়কে আলাদা আলাদা 'অযোধ্যা, ধর্মশালা, চিত্রকূট, সুখবিলাস' ইত্যাদি সূচি দেওয়া হয়েছে। পাঁচ-সাত বার বলার পরও আমাকে এই তথ্যাদি মুখস্থ করতে না দেখে গুরুজী আমাকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন— 'যদি মুখস্থ না করতে থাক, তাহলে বালাজী (তিরুপতী)-তে পঙ্‌ক্তি থেকে সাধুরা উঠিয়ে দেবে।'

আমি উত্তর দিলাম—'পঙ্‌ক্তিতে বসার সময় আসার আগেই আমার ধাম-ক্ষেত্র, পঞ্চসংস্কার মুখস্থ হয়ে থাকবে।

★ ★ ★

আজমগড় ও ছাপরা জেলার মধ্যে কেবল বালিয়া অথবা গোরখপুর থেকে শুধু একটা জেলার ফারাক। এই দুই জেলার ভাষাই ভোজপুরী এবং আজমগড়ের কিছু থানায় এই ভাষার একটি উপশাখা মল্লী, যা ছাপরাতেও তাই বলা হয়। যদিও কনৈলা ও পন্দহা এই দুইয়েরই ভাষা কাশীকা (বারাণসী) উপশাখার মধ্যে গণ্য হয়। আর এই কারণে তা ছাপরার ভাষা থেকে আলাদা। এইভাবে অনেক গ্রামীণ আচারে ও পূজা-পদ্ধতিতেও প্রভেদ দেখা যেত। যখন প্রথমবার বহরৌলীতে আমাকে বলা হল—আজ ছট পরব (কার্তিক শুক্লা ষষ্ঠী সূর্য পূজা), তখন আমি একথা বুঝতে পারিনি যে, সেদিন হিন্দুবাড়ি রাত্রিতে কয়েক ঘণ্টার জন্য স্ত্রীলোক শূন্য হয়ে যাবে। মেয়েদের যে গান হয় তাও কনৈলা-পন্দহা থেকে অনেক ফারাক বলে মনে হত। আমার কাছে আরো তাজ্জবের কথা হল এই যে, বিশেষভাবে আগে ব্যবস্থা না করলে বহরৌলীর মতো বড় গ্রামেও আতপ চাল—বৈষ্ণবেরা ঐ চালই খেতে পারে—পাওয়া যেত না। বাড়িতে, গ্রামে, হাট বাজারে সর্বত্রই সিদ্ধ চাল (সিদ্ধ ধানের চাল) খাওয়া হয়।

মঠের সাধুদের সঙ্গে সর্বদাই আমার সহৃদয় সম্পর্ক ছিল। জ্ঞানার্জনে সহায়তা ছাড়া মঠের অধিকারকে আর কোনো অর্থে আমি গ্রহণ করতাম না। যদিও ভবিষ্যতের রূপ রেখা আমার কাছে সাকার ছিল না, তবু তখনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে পরসাতে আমার 'অথ' অথবা 'ইতি' হবে না। মঠে সাধুর সংখ্যা ১৫ থেকে ১৬-র কাছাকাছি ছিল। আমি সেইসব দিনের কথা খুব ঈর্ষার সঙ্গে শুনতাম, যখন পরসা মঠের পঙ্‌ক্তিতে একশ'র কম সাধুর পাতা পড়ত না। গুরুভাইদের মধ্যে শ্রীসীতারামদাস প্রথম থেকেই আমার স্নেহের পাত্র ছিল। আর এক তরুণ গুরুভাই—যে অল্প-স্বল্প লঘুকৌমুদী পড়েছিল—তার সঙ্গে আমার এমন ভালবাসা হয়েছিল যে, যখন প্রথম দীর্ঘ যাত্রা থেকে ফিরে এসে শুনলাম তার মৃত্যু হয়েছে, তখন তার জন্য বেশ কিছু দিন পর্যন্ত আপসোস ছিল। আমার কুঠুরীর বাইরে মৌনীবাবার আসন ছিল। তিনিও পরসার হিতৈষী সরল-সাধুদের অন্যতম ছিলেন। তিনি কখনোই কথা বলতেন না কিন্তু আঙ্গুলে অথবা চোখের ইশারায় সব কিছু বুঝিয়ে দিতেন। স্লেট পেন্সিলের খুব কম প্রয়োজন হত। তাঁর ওপর মোহন্তজীর খুব বিশ্বাস ছিল। তিনিও মঠের অব্যবস্থায় বিশেষ দুঃখিত ছিলেন, কিন্তু কি করবেন? মঠের স্থায়ী সাধুদের মধ্যে সুরদাস ও মাধবদাস এই দুই ভাই ছিলেন। সুরদাস—নেত্রহীন হওয়ায় তাঁর এই নাম হয়েছিল। তিনি সমঝদার ছিলেন। কিন্তু তাঁর ভাই

মাধবদাসের বুদ্ধি ছিল আট বছরের শিশুর মতো। তরুণ ছেলেপুলে ও অল্পবয়সী মঠবাসীদের কাছে তিনি মজার খোরাক ছিলেন। ভাত রান্না করার বড় বাসন তাকে মাজতে দিয়ে বলা হত—মাধবদাস, যাও আজ থেকে তোমাকে 'টোকনা'র (ডেকচি) মোহন্ত করে দেওয়া হল। তাকে নিয়ে মজা করা হচ্ছে বুঝতে পেরেও সে রেগে যেত না, খুশী হত। সুদর্শন দাসের কথা বড় মনোরঞ্জক ছিল। ষোল-সতের বছর বয়সে সে মোহন্তজীর শিষ্য হওয়ার জন্য এসেছিল। দালানে শুয়েছিল। অন্য একজন সাধু সেটা বুঝতে পেরে তুলসীর কণ্ঠী নিয়ে সন্তর্পণে তার গলায় বেঁধে দেয়। তারপর সে যখন তার কানে মন্ত্র ফুঁকে দিচ্ছিল, সে তখন চোখ খুলল। আর কি করা যাবে? চেলা তো হয়ে গেছে, তাই ঐ সম্পর্কই স্থায়ী হয়ে গিয়েছিল। এক আধ-পাগল সাধু গঙ্গাদাস (?) হামেশা আস্তাবলে থাকত। ডেকচি মাজার কাজ তার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হল। তাকে কখনো কেউ স্নান করতে দেখেনি। যে খড় ও চাটাইয়ের ওপর ঘুমোত তাও কখনো বদলাত না। এক-আধ বার তার শরীরের চাপে মরা সাপ বিছানার নিচে পাওয়া গিয়েছিল। এই সব সত্ত্বেও সে পয়সা জমা করতে ওস্তাদ ছিল। পরসা থেকে একমা যাওয়ার সড়কের প্রায় অর্ধেক দূরত্বে বটগাছের নিচে একটা কাঁচা কূয়া ছিল। সে লোটা দড়ি নিয়ে গিয়ে যারা যাতায়াত করত তাদের জল খাওয়াত। বাংলা ফেরত অনেক যাত্রী একমা স্টেশনে নেমে এই পথে ফিরত। জল খাইয়ে সে অতি মধুর স্বরে বলত, 'ভাই। অন্য ইচ্ছা তো পুরা হয়ে গেছে। রামজীর দয়ায় কূয়াও তৈরি হয়ে গেছে, এখন এই কূয়ার চারদিক পাকা করার আর একটি ইচ্ছা বাকি আছে। এক আনা-দুই আনা ও দু-এক পয়সা যে যা দিতে পারেন, তা দিয়ে ধর্মের কাজে সাহায্য করুন।' এতে পয়সাও তার মিলে যেত। লোকে মনে করত এই সাধুই কূয়া তৈরী করেছে।

সাধুদের মধ্যে লেখাপড়ার অভাব ছিল। তার জন্য কোনো উৎসাহও দেওয়া হত না। মস্তিষ্কের সম্পদ যতটা সম্ভব কম রয়েছে এমন সাধুই এখানে দরকার ছিল—যে বাসন মাজতে পারে, ঝাঁট দিতে পারে, রান্না করতে পারে, হাজার ছোট-খাট শালগ্রাম স্নান করিয়ে (ধুয়ে) তার ওপর একটু একটু চন্দন আর একটি করে তুলসীর পাতা দিতে পারে, রাম-লক্ষ্মণ-সীতা অথবা রাধা-গোপালের মূর্তিকে মাঝে মাঝে নূতন কাপড় পরাতে পারে, আরতি করতে পারে, সকালে খোল-কর্তাল নিয়ে বেসুর-তালে ভজন গাইতে পারে এবং রাত্রিতে দোকান থেকে ছুটি পেয়ে যে সব বেনে ভক্তরা আসে তাদের সঙ্গে মিলে রামায়ণ গানের নাম করে খুব গলা ফাটাতে পারে। তার ওপর আর কাউকে যদি প্রয়োজন ছিল, তা হল মোহন্তজীর জন্য এক 'হুজুরিয়া'র (সাধু সেবক), এক ভাণ্ডারীর (ভাণ্ডারের জিনিষ দেওয়া-নেওয়ার লোক)। তারা যদি কিছু লেখাপড়া জানল তো ভাল কথা। গায়ে খেটে কিছু কাজ করে দেওয়া, দুবেলা খাওয়া-দাওয়া, আর তারপর সময় থাকলে কিছুক্ষণ গলা ঝেড়ে নেওয়া অথবা গালগল্প করা—ব্যস, এই ছিল এখানকার সাধুদের দিনচর্যা। শুধু এখানে কেন, অন্যান্য বৈরাগী মঠের হালও এর চেয়ে ভাল ছিল না।

আমার চাকরদের মধ্যে কোচোয়ান নকছেদী ছিল। তার ছেলে রামদাস আমার সেবক ছিল। নকছেদী খুব সাদাসিধা বুড়োমানুষ ছিল। গুরুজীর সেই সময়ের সেবক টুনমুনের বাবা ও নকছেদীর সঙ্গে যখন দেখা হত, তখন দারুণ ভাল লাগত। টুনমুনের বাবা চুপিচুপি কিছু না বলে ছুটে গিয়ে গোলা দাগার মতো নকছেদীর কাছে গিয়ে মাটির দিকে হাত বাড়িয়ে বলত, 'প্রণাম নকছেদী ভাই।'

'প্রণাম...আরে এ কি, কোথাও কি বড় ভাই ছোট ভাইকে প্রণাম করে?'

'তুমিই বড় ভাই, না?'

'বললেই হয়ে যাব?'

'তবে কি কাউকে মধ্যস্থ করতে ডাকব?'

'মধ্যস্থ করার কি দরকার? (নকছেদী রাউতের কাছাকাছি কারুর ওপর বিশ্বাস ছিল না।) দুজনের চেহারা দেখলেই তা বোঝা যাবে।'

'কমবেশী সাদা চুল দেখে বয়স বোঝা যায় না।'

'তবে কি চামড়ার কুঁচকানো দেখে?'

'হ্যাঁ।' আবার সন্দেহতে পড়ে, 'না, সারা গ্রাম জানে কে বড় কে ছোট।'

'তবে নকছেদী ভাই, আর কাউকে যদি তুমি মধ্যস্থ না মানতে চাও, তবে ভাবীকেই মধ্যস্থ মেনে নাও। ও যাকে ছোট বলবে সেই ছোট।'

'হুঁ,' হাসি যাতে ঠোঁটের বাইরে না এসে পড়ে, সেজন্য অনেক চেষ্টা করে, 'ভাশুরের (বড় ভাই) সামনে ভবেহ (ছোট ভাইয়ের বৌ) কি করে আসবে?'

'বৌদিকে বৌমা বানিও না, নকছেদী ভাই।'

নকছেদী খুব চেষ্টা করত, কিন্তু ঢুনমুনের বাবার যুক্তি ও মধ্যস্থের রায় তার বিরুদ্ধে যেত।

* * *

আমার পক্ষে পরসায় বাসকে বৌদ্ধিক-অনশন বলা যেতে পারে। কি ধরনের সমাজে ছিলাম, তার কিছু দিগদর্শন ওপরে দিয়েছি। এর বেশী কিছু থাকলে ছিল খোশামুদী, জীহুজুরী। তাদের কথা শুনলে মনে হত তারা মঠ ও তার ভগবানের কতটা অনন্য ভক্ত। কিন্তু সুযোগ পেলেই তারা চোখে ধুলো দিতে দেরি করত না। ফিটনে বড় ঘোড়া লাগত, যাকে গুরুজীরও দরকার হত। তাই চৈত্রের ডুমরসনের মেলা থেকে সওয়ারীর জন্য একটা ঘোড়া কিনতে চেয়েছিলাম। আমি আমার চেনাশোনা এক বিশ্বাসযোগ্য লোককে দাম ঠিক করতে সাহায্য করার জন্য বেছে নিয়েছিলাম। সওয়া শ' টাকায় ঘোড়া কেনা হল, কিন্তু পরে বুঝতে পারলাম এই ঘোড়ার দাম পঁচাত্তরের বেশী কখনোই হতে পারে না। সেখানে সারা বায়ুমণ্ডলই ঘোড়ার নাদে ভরা বলে মনে হচ্ছিল। সেই সময়টা আমার ভাল কাটত, যখন সরস্বতীর নতুন প্রকাশিত সংখ্যা ও আরো কিছু নতুন বই পড়তাম। ঐ সময় হিন্দি সাহিত্যও প্রারম্ভিক অবস্থায় ছিল। পূজা-পাঠে আমার মন লাগত না। সকালে স্নান করে কুঠরীতে যেতাম। লোকে মনে করত, 'পূজারীজী' পূজা-পাঠ করছেন। আর এখানে পূজারীজী দরজা বন্ধ করে বিছানার ওপর খুব পা ছড়িয়ে শুয়ে রয়েছে, অথবা কোনো উপন্যাস বা সরস্বতীর কোনো সংখ্যা পড়ছে। মন্দিরের পূজারী অন্য ছিল। কিন্তু যদি কোনোদিন পূজার কাজ আমার মাথায় পড়ত তবে পাঁচ মণ শালগ্রামকে বড় থালায় দুই দুই কলস জলে একটা একটা করে ধোয়া আমার শক্তির বাইরে ছিল। সৌভাগ্যবশত, স্নান শৃঙ্গারের সময় মন্দিরের দরজায় পর্দা টানানো থাকত। ঐ সময়ে আমি প্রত্যেকটিকে আলাদা আলাদা ধোয়ার বদলে এক এক অঞ্জলি জলে ডুবিয়ে রাখতাম। যদি শক্ত কাপড় থাকত এবং যদি আমার দুহাতে সব শালগ্রামের স্তূপ ওঠাতে পারতাম, তবে একবারেই সব ডুবিয়ে রাখতাম। শ্রদ্ধার সঙ্গে অত্যাচার করার এই ফল। এ পর্যন্ত, আমি আর্যসমাজের মূর্তি বিরোধিতার দ্বারা প্রভাবিত হইনি তবু আমার কাছে শালগ্রামের এই কালো-কালো, গোল-গোল মসৃণ পাথর নিরেট পাথরই ছিল। যেমন-তেমন করে তাদের ওপর চন্দন ও তুলসী পাতাও দিতাম। তাড়াতাড়ি পর্দা সরিয়ে দিলে সন্দেহ হতে পারে এই ভয়ে ভেতরে বসেই এক শালগ্রামের সঙ্গে অন্যের ঠোকাঠুকি করতাম।

পরসায় যদি কোনো লোকের সঙ্গে মিশে আমার ভাল লাগত, তবে তিনি দেওরিয়ার (ডেওঢ়িয়া) ওঝাজী। সিদ্ধান্তকৌমুদীর (ব্যাকরণ) অনেক ভাগ সমাপ্ত করেছিলাম। তবু কাব্যশাস্ত্র পড়েই আমি রসাস্বাদন করতে পারতাম। কাদম্বরী না পড়লেও দশকুমার চরিতের অনেকাংশই পড়ে ফেলেছিলাম, অনেক নাটক পড়েছিলাম—'কাব্যমালা'য় ছাপা নাটকও। মনে আছে একদিন পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। শাহজাহানের পুরস্কার দেবার কথা উঠলে পণ্ডিতরাজ বলেছিলেন—

'ন যাচে গজালিং, ন বাবাজিরাজীং, ন বিত্তেষু চিত্তং মদীয়ং কদাপি।
ইয়ং সুস্তনী মস্তকন্যস্তহস্তা লবঙ্গী কুরঙ্গীদৃগঙ্গীকরোতু।।'

আজ থেকে তিনশ বছর আগে এক মহান বিদ্বান ব্রাহ্মণ 'যবন' তরুণীকে বিয়ে করেছিলেন, সামাজিক রীতিনীতি সহ আমার মনের ওপর এর কি প্রভাব পড়েছিল, বলতে পারি না। বস্তুত ঐ সময় আমার মনে যে বিচার ধারার সবচেয়ে বেশী প্রভাব ছিল, তা হল বেদান্ত এবং বেদান্তী ব্যবহার নিম্ন থেকেও নিম্নতর একেবারে বোকামিতে ভর্তি নিতান্ত পরস্পর বিরোধী মতেও বিশ্বাস করার বিধান দেয়।

১০

পরসা থেকে পলায়ন (১৯১৩ খৃঃ)

বহরৌলীকে ঠিকা দেওয়ার ব্যবস্থার অনেকটা কাজ আমি করে দিয়েছিলাম। এদিকে বৌদ্ধিক-অনশনেও আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল। এ সময় লিচু-আম-কাঁঠাল খুব মজা করে খেয়েছিলাম। এই ফসলও শেষ হয়ে যাওয়ার সময় এসে গেল। গুরুজীর কাছ থেকে বোম্বাই প্রান্তের সব তীর্থ ও সেখানকার বৈরাগী স্থান সম্পর্কেও অনেক শুনেছিলাম। পড়াশোনা করার ইচ্ছা তো প্রবল হচ্ছিলই, সেই সঙ্গে বাজিন্দাও দিনরাত গুণগুণ করতে শুরু করেছিল।

'সৈর কর দুনিয়াকী গাফিল জিন্দগানী ফির কঁহা?
জিন্দগী গর কুছ রহী তো নৌজওয়ানী ফির কঁহা।।'

কনৈলার মতো এখানেও কাউকে মনের কথা বলা আমার নীতিবিরুদ্ধ ছিল। গুরুজীর পক্ষ থেকে নিশ্চয়ই বাধা আসত। মন্দির নির্মাণকারী মিস্ত্রী মহাবীরদাস বারাণসীর লোক বলে আমার বেশী বিশ্বাসভাজন ছিল। তার কাছ থেকে তিন টাকা নিয়ে রাতে ট্রেনের কিছু আগেই একমা পৌছে গাড়ি ধরলাম (জুলাই ১৯১৩)। দুয়েকটা সংস্কৃত পুস্তক, দুটো ধুতি, দুটো ল্যাঙট, গামছা এবং বিছানোর জন্য আলোয়ানের এক পাট আমার সঙ্গে ছিল। এর চেয়ে বেশী জিনিষ কি করেই বা নেওয়া যেত? একমা থেকে হাজীপুরের টিকিট কাটলাম।

হাজীপুরে সবচেয়ে প্রথম দরকার হল লোটার। লোটা ছাড়া কোনো সাধুদের জায়গায় কিভাবে যাওয়া যায়—সঙ্গে সঙ্গে বলে বসত, লোটা ছাড়া এই সাধু নিজের 'ধর্মকর্ম' কিভাবে নির্বাহ করে? পয়সা কম খরচ করতে হবে তাই আট আনায় একটা বাঙালি লোটা কিনলাম। এই

প্রথমবার রমতা সাধু হিসেবে আমাকে কোনো স্থানে যেতে হল। সেই জন্য পরীক্ষার্থী ছাত্রের মতো আমার বুক দুরুদুরু করছিল। 'আখাড়া-দ্বারা' তো মনেই ছিল। রাত্রে ট্রেনের আলোতে আমি 'ধামক্ষেত্র', 'পঞ্চসংস্কারের' অনেকাংশই মুখস্থ করে নিলাম। কোথাও কেউ জিগ্যেস করে না বসে। রামচৌরা মঠে গেলাম। কিন্তু সেখানে পরসার নামটাই বলতে হল। বাকীটা আমার ভব্য পোশাকই বলে দিচ্ছিল।

পরসা থেকে প্রস্থান করার সময় এতো ঠিক করে নিয়েছিলাম যে এবার মাদ্রাজের দিকে যেতে হবে। কিন্তু কিভাবে তা তো ঠিক করতে পারিনি। ঠিক করলাম, রেলের জন্য পয়সা নেই কিন্তু পয়সা থাকলেও পায়ে হেঁটে যাওয়াই ভাল। আগের বার কনৈলা থেকে মুরাদাবাদ সর্পগতিতে রাস্তার সব ভূমি ছুঁয়ে গিয়েছিলাম। এবার মণ্ডুক-প্লুতি (ব্যাঙের লাফ) করছিলাম। হাজীপুরে দুয়েকদিন থেকে ট্রেনে বরৌনী পৌঁছলাম। সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। আমি স্টেশনের পশ্চিমদিকে কাছের একটা গ্রামে গেলাম। সংস্কৃতে কথা বলতে পারতাম বলে আমার এই ভরসা ছিল যে কোনো সংস্কৃতজ্ঞের বাড়িতে রাত্রির জন্য আশ্রয় মিলবে। কিন্তু সেখানে যে ব্রাহ্মণ দেবতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল, তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে আমি বৈরাগী, তখন তাঁর মুখ বাঁকা হয়ে গেল। অবজ্ঞাভরে একটা গোয়ালের মতো জায়গা দেখিয়ে দিলেন। আমি কি সব ভাবতে ভাবতে সেখানে গিয়ে শুয়ে রইলাম।

সকালে ঘাটের গাড়ি ধরলাম এবং গঙ্গা পার হয়ে ট্রেনে লক্ষ্মীসরাইয়ে পৌঁছলাম। জিগ্যেস করায় সাধুদের জায়গার সন্ধান পেয়ে গেলাম। সড়ক থেকে ডানদিকের এক মহল্লায় একটা ছোটমতো ঠাকুরবাড়িতে পৌঁছলাম। সেখানে শুধু একজন মূর্তি সাধু ছিলেন। জমিয়ে বসলাম।। তাঁর মধুর কথাবার্তা শুনে ক-মিনিটেই মনে হল আমি কোনো অপরিচিত স্থানে নেই। আমার তিনটাকা পুঁজি শেষ হয়ে আসছিল। সেজন্য এবার এখান থেকে পায়ে হেঁটে যাওয়ার কথা ভাবছিলাম। রাস্তা সম্পর্কে স্থানীয় মহারাজকে জিগ্যেস করলাম। তিনি বললেন, সামনে বৈজনাথের জঙ্গল আসবে। সেখানে চোর-ডাকাতে ধরে। আপনার সঙ্গে কিছু আছে কি নেই সেটা তারা জানবে কি করে। প্রথমে তাদের বিষমাখা তীর আপনার শরীরে লাগবে। তারপর এসে তারা দেখবে। শেষে তাঁর পরামর্শে আমি ঠিক করলাম যে আসানসোল পর্যন্ত রাস্তা আমি ট্রেনে পার হয়ে যাব। এর মধ্যে জঙ্গল শেষ হয়ে যাবে। তারপর পায়ে হেঁটে যাব।

নদী পেরিয়ে কিউলে গাড়ি ধরার ছিল। সেখানে পৌঁছবার পর বুঝতে পারলাম গাড়ি ছাড়তে কিছুটা দেরি আছে। এক মুসলমান টিকিট-কালেকটরকে জিগ্যেস করতে লাগলাম। তিনি সবিনয়ে সব জানালেন। সেই সঙ্গে আমার বসার জন্য চেয়ার আনিয়ে রাখলেন, খাওয়া-দাওয়ার জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন। প্রথম আমি বুঝতে পারিনি কেন তিনি আমাকে এত বেশি সম্মান দেখাচ্ছেন। আমার দেহে শান্তিপুরী পাড়ের সাদা মিহি ধুতি সাধারণভাবে আঁচলের মতো করে জড়ানো ছিল। গায়ে কুর্তা অথবা অন্য কিছু ছিল না। হাত ও পায়ের অনেকটাই খালি ছিল। অন্য ধুতিতে বইগুলো ল্যাঙ্গটে জড়িয়ে বাঁধা ছিল। হয়তো কাঁধে পরিষ্কার পাতলা গামছা ছিল। মাথা ও পা-ও খালি ছিল। ভাল খাওয়া-দাওয়া ও ঘোড়ায় চড়ার ফলে শরীর মাংসল ও দৃঢ় মনে হত। তার ওপর সুগন্ধী তিল তেলের দৈনিক মালিশ চামড়াকে স্নিগ্ধ এবং ছায়ায় বাস তাকে শুভ্র করেছিল। এই চেহারা দেখে টিকিট-কালেকটর প্রভাবিত হয়েছিল কি? কিছুটা নিশ্চয়। কিন্তু বেশী প্রভাব পড়েছিল আমার ভাষার। হয়তো টিকিট-কালেকটর যুক্তপ্রান্তের বাসিন্দা ছিলেন এবং আমার উর্দু ও তার শুদ্ধ উচ্চারণ তাঁকে বেশী প্রভাবিত করেছিল।

ট্রেন এল। অনেক কম্পার্টমেন্ট খালি ছিল। টিকিট-কালেকটরকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি একটায় উঠতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু পাশের কম্পার্টমেন্টের এক ভদ্রলোক বলে উঠলেন—'এই কম্পার্টমেন্টে আসুন মহারাজ।' আমি তাতেই চলে গেলাম। টিকিট-কালেকটারের সঙ্গে 'আদাব' হল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই গাড়ি ছেড়ে দিল।

আমার কম্পার্টমেন্টের অন্য সঙ্গী কথাবার্তা শুরু করলেন। জায়গার কথা জিগ্যেস করায় বললাম, পরসা। ব্যবসায় তো সাধুই। 'কোথায় যাচ্ছেন?'—'যেখানে শিং ঢোকে। কিন্তু আপাতত আসানসোল পর্যন্ত।' তাঁর সম্পর্কে জিগ্যেস করে জানতে পারলাম তিনি রাঢ়-এর উকীল যুগেশ্বরী শরণ (?)। কাছারির ছুটিতে পুরী, রামেশ্বর এবং সম্ভবত দ্বারকা দর্শনের জন্য বার হয়েছিলেন। প্রথম পরিচয় সমাপ্ত হওয়ার পর দেখলাম যে তিনি খুব চাইছিলেন আমি আসানসোলে না নেমে তাঁর সঙ্গে যাই। আমি পায়ে হেঁটে যাওয়ার পক্ষপাতী ছিলাম। ট্রেনের কামরায় বন্ধ হয়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পৌঁছনতে আমি কোনো আনন্দ পেতাম না। উকীল সাহেবের সম্ভ্রান্ত ব্যবহার দেখে শেষ পর্যন্ত তাঁর অনুরোধ অস্বীকার করতে পারিনি। ঠিক হল, আমার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা উকীল সাহেব করবেন, আর ট্রেনে যাত্রা বিনা টিকিটে।

আসানসোল, আদ্রা ও খড়্গপুরে ট্রেন বদলাতে হল। বিনা টিকিটে কিভাবে বেঁচে আমি নতুন ট্রেন ধরেছিলাম, তার কোনো কথা মনে নেই। হয়তো কোনো টিকিট-কালেকটরের মুখোমুখি হতে হয়নি। এক জায়গায় তো পুল দিয়ে না গিয়ে লাইন পেরিয়ে অন্য প্ল্যাটফর্মে চলে গিয়েছিলাম। খুর্দা থেকে পুরীর টিকিট নিয়ে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে কোনো পাণ্ডার লোকও সঙ্গে গিয়েছিল। স্টেশন থেকে ঘোড়াগাড়িতে চেপে পাণ্ডার বাড়ি পৌঁছলাম। কোঠাবাড়িতে একটা ভাল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘর পেলাম।

সাতাশ বছর আগে সেই সময় আমি পুরীর কোন কোন জায়গা কি চেহারায় দেখেছিলাম, তা পুরোপুরি আমার মনে নেই। জগন্নাথের মন্দিরের ওপরের অশ্লীল সব মূর্তি আমাদের দুজনেরই অপছন্দ হয়েছিল। জগন্নাথ দর্শনে বদ্রীনারায়ণ দর্শনের মতোই আমার মধ্যে কোনো বিশেষ প্রভাব পড়েছিল বলে তো আমার মনে পড়ে না। একবার আমরা সমুদ্রে স্নান করতেও গিয়েছিলাম। দুই-তিন দিন পুরীতে ছিলাম। রোজ একবেলা জগন্নাথের প্রসাদ 'হটকা'—চলে আসত। চলে আসার সময় পাণ্ডা তার রেজিস্টারে মতামত লেখার জন্য উকীল সাহেবের কাছে পাঠায়। তিনি ইংরেজীতে তাঁর খুব খারাপ মন্তব্য লিখে দেন। জানি না কেন এই ব্যাপারটা আমার ভাল লাগেনি। পাণ্ডা এতটা খাতির করে ও আরামে রেখে যদি কিছুটা দক্ষিণা আশা করে, সেটা এমন কি খারাপ কাজ?

আমি পুরী পর্যন্তই ট্রেনে যাওয়ার কথা স্বীকার করেছিলাম। এবার আমি এখান থেকে পায়ে হেঁটে যাওয়ার কথা বললাম। উকীল সাহেব খুব অনুরোধ করতে লাগলেন এবং সংকোচে পড়ে আমি এবারও না বলতে পারিনি, যদিও আমার মনে হয়েছিল যে আমি নিজেকে ভ্রমণের অনেক আনন্দ থেকে বঞ্চিত করছিলাম।

খুর্দার পরে দু-চারটে স্টেশন পর্যন্ত আমার টিকিট কাটা হয়েছিল। এবার আমরা মাদ্রাজ মেলে উঠেছিলাম। হয়ত এক ট্রেনেই ত্রিশ ঘণ্টারও বেশী যেতে হয়েছিল। আর এক-আধ বার টিকিট চেকার নিশ্চয়ই এসেছিল। কিন্তু জানি না কিভাবে আমি ছাড়া পেয়েছিলাম। যদি ট্রেন থেকে নামিয়ে দিত আমি খুব খুশী হতাম। বাইরের দৃশ্য বিহার ও যুক্তপ্রদেশ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। চিল্‌কা হ্রদের কথা ভূগোল-এ পড়েছিলাম। কিন্তু তা এখন প্রত্যক্ষ চোখের সামনে

দেখছিলাম। তাতে জেলেদের সব নৌকা আর তার ওপর পাল, আমার মন সেই দিকে জোর করে টেনে নিচ্ছিল আমি তাদের মধ্যে সত্যনারায়ণের পাঁচালীর সাধু বেনেদের বাণিজ্য জাহাজ দেখছিলাম। পাশেই ছোট ছোট পাহাড়, লাল মাটি ও অনেক দূর পর্যন্ত ধানের ক্ষেত ছিল। স্ত্রী-পুরুষের বেশ দেখে মনে হচ্ছিল আমি কোনো দ্বীপে যাচ্ছি। বিশেষ করে অন্ধ্র-স্ত্রীলোকদের নাকের চার জায়গায় ছিদ্র—দুটি নথে, নাকের শেষ দিকেও বিভাজন দণ্ডে। যতোই এগোচ্ছিলাম মানুষের বর্ণ আরো বেশী শ্যাম ও কালো হচ্ছিল। তার সঙ্গে শরীরও খর্বাকৃতি হচ্ছিল।

সকাল নটা অথবা দশটায় আমরা মাদ্রাজ পৌছলাম। উকীল সাহেবের সঙ্গে 'ছত্রম্' (ধর্মশালা)-তে পৌছতে কোনো অসুবিধা হল না। ছত্রম্ পড়ে রেলের সড়ক পার হয়ে। এখান থেকে অন্য ট্রেনে রামেশ্বর যেতে হবে, যেটা রাত্রিতে অন্য স্টেশন থেকে ছাড়ে। দিনে ঘোরাঘুরি করে আমরা মাদ্রাজ শহরের কিছু স্থান দেখে নিলাম। এখানকার অধিকাংশ একতলা বাড়ি দেখে মনে হয়নি যে আমরা ভারতের তৃতীয় বড় শহরে ঘুরছি। স্ত্রীলোকদের চড়া রঙের খোপকাটা শাড়ি ও খোলা মাথার দিকে আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছিল। এখানে পরদাপ্রথাকে কেউ বিশেষ পরোয়া করে না। আট-দশ ঘণ্টা থাকার সময় পাওয়া গেছল। কিন্তু এই সময়টুকুও শহরকে ভাল করে দেখার জন্য উকীল সাহেব খরচ করেননি। এখন ট্রেনে আরো যাওয়া আমার অসহ্য মনে হচ্ছিল। কিন্তু সরাসরি না করে দেওয়ার সাহস করতে পারিনি। এতদিন একসঙ্গে থাকার পর এই রকম ব্যবহার করা খুব অভদ্র হবে বলে মনে হচ্ছিল।

রাত্রি নটা কিংবা দশটায় গাড়ি ছাড়ার কথা ছিল। সৈদাপটের টিকিট নিয়ে আমিও উকীল সাহেবের সঙ্গে গাড়িতে উঠে বসলাম। আর একপাও ট্রেনে যাওয়া অসহ্য লাগছিল। কিন্তু মানসিক পরাধীনতা—ভদ্রতার বন্ধন ছিঁড়ে ফেলার সাহস ছিল না আমার। একমাত্র আশা ছিল টিকিট-চেকার, যদি সে এসে যায় এবং নেমে যাওয়ার কথা বলে তবে আমি এতদূর চলে যাব যে উকিল সাহেব আমাকে আর পাবেন না। দুরুদুরু মন নিয়ে আমি ট্রেন ছাড়ার অপেক্ষা করছিলাম। যখন টিকিট-চেকারকে ট্রেনের কামরাগুলোর মাঝামাঝি এপার থেকে ওপার চলে যাওয়া রাস্তা ধরে আসতে দেখলাম, তখন মনে কিছুটা আনন্দ হল। টিকিট-চেকার আমার টিকিট দেখে ইংরেজীতে বলল—'নেমে যাও, এই ট্রেন সৈদাপট-এ দাঁড়াবে না।' আমি দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। উকীল সাহেব, 'একটু থাকুন' বলে কিছু কথাবার্তা বলতে লাগলেন। এই কথাবার্তার পরিণাম শোনার আমার ইচ্ছা ছিল না। আমি দরজা থেকে এক লাফে প্ল্যাটফর্মে এবং তারপর উকীল সাহেবের দৃষ্টির বাইরে চলে এলাম।

জানতে পারলাম সৈদাপটে যাওয়ার গাড়ি অন্য প্ল্যাটফর্মে আছে। আমি যখন সৈদাপট স্টেশনে নামলাম তখন রাত দশটা কিংবা এগারটা হবে। গুরুজী বলতেন, মাদ্রাজে যাত্রীদের থাকার জন্য জায়গায় জায়গায় 'ছত্রম'—আছে। যার অধিকাংশতে সদাব্রতও পাওয়া যায়। রাত্রিতে আমার সদাব্রতের দরকার ছিল না। কিন্তু রাত্রিতে থাকার জন্য এবং আশেপাশের তীর্থাদি সম্পর্কে জানবার জন্যও 'ছত্রম'-এর প্রয়োজন ছিল। স্টেশন থেকে বাইরে বেরোবার পূর্বেই একটা ছেলের সঙ্গে দেখা হল। আমি ইংরেজীতে 'ছত্রম কোথায় আছে' জিগ্যেস করলাম। সে বলল—'আমি ওদিকেই যাচ্ছি, চলে আসুন।' আমি ইংরেজীতেই কথাবার্তা বলে যাচ্ছিলাম। কিন্তু একটু আগে এক পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে ও হিন্দুস্থানীতে কথা বলল। আমি জিগ্যেস করায় ছেলেটা বলল—আমরা এদিকের মুসলমানেরা হিন্দুস্থানী ভাষাতেই কথা বলি। ঐ সময়ে দাদুর কথা মনে হল আমার। তিনি বলতেন—'তেলেঙ্গানাতে (অন্ধ্র) যখন ভাষা বোঝার মত কোনো লোক পেতাম না, তখন আমি মুসলমানের কথা জিগ্যেস করতাম। মুসলমানেরা অবশ্যই আমার

কথা বুঝতে পারত।' ছেলেটা ছত্রম-এর দরজা পর্যন্ত আমাকে এগিয়ে দিল।। রাত্রিতে আমি দরজার বাইরের চত্বরে শুয়ে রইলাম।

সকালে ছত্রমে কারু কাছে পরবর্তী দর্শনীয় স্থান সম্পর্কে কিছু জানতে পারিনি। কারু কাছে জিগ্যেস না করেই সড়ক ধরে একদিকে চলতে লাগলাম। অনেকটা দূরে সড়কের ডান দিকে একটা বড় বাংলো দেখলাম। আঙিনায় কিছু গাছ ছিল। কিন্তু ফুল ছিল না এবং এক কোণে ছিল একটা পাকা কূয়া। আমি কায়দা-কানুন জানতাম না যে কারু আঙিনায় যাওয়া অপরাধ। বিশেষ করে কূয়া বাড়ির আঙ্গিনায় হলেও তা সর্বজনীন সম্পত্তি বলেই মনে করতাম। আমি কূয়ায় গিয়ে আরাম করে জল ভরে দাঁতন করে স্নান করলাম। তখন দেখলাম বাংলোর বাইরের গাছের নিচে তিন-চারটি চেয়ার পাতা হয়ে গেছে এবং তার ওপর এক তরুণ ও দুইজন স্ত্রীলোক বসেছে। স্ত্রীলোকেরা উত্তর ভারতের মেয়েদের মতো শাড়ি পরেছিল। আঙিনায় আসার সময় আমি জানতাম না বাংলোয় কে থাকে। স্নান করার সময় চাকর এসে ইশারায় জানিয়ে গেল যে মালিক আমাকে ডেকেছেন। সেখানে যাওয়ার পর তরুণ আমার বাড়িঘর ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশ্ন করল আর একথাও জিগ্যেস করল যে আমি কোথায় যাচ্ছি। তাঁর মা ও বোনও কথাবার্তায় যোগ দিলেন। তাঁরা আমাকে খাওয়া-দাওয়া করে যেতে বললেন। খাওয়ারই সময় ছিল। আমার মনে হল ডাল তরকারির ঝামেলা ছেড়ে ঘি ও মিছরি দিয়ে রুটি খাওয়া তাড়াতাড়ি হবে। পাঞ্জাবী মেয়েদের দরাজ হাত, তার কাছে এক-ছটাক, দুই-ছটক ঘির কথা নেই। এক বাটি ভর্তি ঘি এল। খাবার খেলাম। লাহোরের একটা উর্দু খবরের কাগজ ছিল। তা খানিকক্ষণ পড়লাম, তারপর রওনা হওয়ার জন্য উঠে পড়লাম। তরুণ সেইদিন থেকে যেতে বলল। কিন্তু 'আজ থাকা' আর 'কাল থাকার' ফের থেকে আমি সদ্য ছাড়া পেয়ে এসেছি। তরুণটি আশেপাশের কোনো তীর্থ সম্পর্কে চাকরকে জিগ্যেস করায় তিরুমলে (?) নাম শুনতে পেলাম। 'তিরুমলে অংগে' (তিরুমলে কোথায়) এইটুকু আমি তালিম নিয়ে শিখে নিয়েছিলাম। আর কোথাও কোনো মানুষকে সামনে দেখতে পেলেই, ঐ কথার পুনরাবৃত্তি করতাম। সেও হাত দিয়ে দেখিয়ে বলত 'ইংগে পো' (এদিকে যাও)। সম্ভবত তিরুমলে পর্যন্ত আমাকে হাঁটাপথেই যেতে হয়েছিল, যদিও সড়ক কাঁচা এবং অনেক চৌরাস্তা হয়ে সে পথ গিয়েছিল।

তিরুমলে মন্দিরের সামনে একটা পদ্মভরা সরোবর ছিল। দক্ষিণের প্রায় সব মন্দির এই রকমই হয়। তাই এটা এই মন্দিরের বিশেষত্ব হতে পারে না। হ্যাঁ, এই মন্দিরের পাশে ছোটমতো একটা পাথুরে পাহাড় ছিল, যার ওপর মন্দির না হলেও এক গোপুর (দ্বারশিখর) নিশ্চয়ই ছিল, রাত্রিতে একাধিক লণ্ঠন তার দু-তিনটা তলে জ্বালিয়ে দেওয়া হত। সন্ধ্যার অনেক আগে তিরুমলে পৌঁছেছিলাম। এখানে সংস্কৃতের জন্য আমার কথাবার্তা ও চলাফেরায় কোনো অসুবিধে হয়নি। মন্দির দর্শন করলাম। কোনো নতুন পরিচিত ব্যক্তি আমাকে বলে দিল যে রাত্রিতে মন্দিরের ভোজনশালায় যাত্রীদের দধ্যোদন মেলে। দধ্যোদন হল তিল তেলে মেথী অথবা অন্য কোনো জিনিসের ফোড়ন দিয়ে ছোঁকা মাঠা ও ভাত। টক নোনতা খেতে বেশ ভাল লাগল। পূজারীর কাছ থেকে এও জানতে পারলাম যে এখানে 'উত্তরার্ধীমঠম'ও আছে। উত্তরার্ধীমঠম্-এ সম্ভবত এক আচারী ও আচারিণীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বৈরাগীদের ওঁরা নিম্ন শ্রেণীর জন্তু মনে করলেও সেখানে রাত্রিবাসের জায়গা মিলেছিল এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য দর্শনীয় স্থান সম্পর্কে অনেক কথা জানতে পেরেছিলাম। গুরুজী বলতেন যে দক্ষিণের তীর্থস্থানগুলিকে 'দিব্যদেশ' বলা হয়, তাদের সংখ্যা কয়েকশ যেখানে রামানুজাচার্য ও অন্যান্য মহাত্মাদের বাস। এই উত্তরার্ধী (উত্তর ভারতীয়) আচারী সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীদের কাছ থেকে

জানতে পারলাম যে তামিল প্রান্তের বহু দিব্যদেশে উত্তরার্ধী সাধু থাকেন। তাঁরা কিছু সাধুদের নামও লিখে দেন। এও জানতে পারলাম যে প্রায় সব মন্দিরেই দুইচার জন নতুন আগন্তুকের জন্য 'প্রসাদের' ব্যবস্থা থাকে।

এই উত্তরার্ধী আচারীরা আমাদের মতো বৈরাগীদের নিচু চোখে দেখত। কিন্তু ওদের দৃষ্টিতে আমাদের যে স্থান ছিল, দক্ষিণী গৃহস্থ-আচারীদের দৃষ্টিতে ওদের স্থান ছিল সেইরকম। রেগে গিয়ে আমি উত্তরার্ধীদের 'বৈরাগী' বলে গাল দিতেও শুনেছি। এই সব উত্তরার্ধীরা কিভাবে 'দিব্যদেশে' পৌঁছল এবং স্থানীয় ব্রাহ্মণ-পূজারীদের বিদ্বেষী হয়েও কিভাবে নিজেদের আড্ডা জমাতে পারল সেও এক মজার কথা। উত্তর ভারতে সাধুদের ও তাদের মঠকে পুরোপুরি স্ত্রী সংসর্গ থেকে আলাদা রাখা আবশ্যক বলে মনে করা হয়। কিন্তু এখানে এ ব্যাপারে কিছু উদারতা ছিল। তার কারণ খুঁজে জানতে পারলাম যে উত্তর ভারতের বিরক্ত আচারীদেরও দক্ষিণী আচারীই আদর্শ ও পূজ্য ছিল এবং দক্ষিণী আচারীদের মধ্যে এমন কাউকে প্রায় পাওয়াই যেত না, যে গৃহস্থাশ্রমী নয়। এই কারণে মঠে স্ত্রীলোকের থাকা তেমন নিন্দনীয় বলে মনে করা হত না, বিশেষত যদি স্ত্রীলোকের সঙ্গে কোনো নিকট সম্বন্ধের কথা জানানো যেত। এই উত্তরার্ধীদের মধ্যে অনেকেই তীর্থ করার জন্য টাকাকড়ি ছাড়াই ছত্রম-এর ভাত ও মন্দিরের পুঙ্গল (খিচুড়ি) রান্না করতে করতে ও দধ্যোধন খেতে খেতে চলে এসেছে। কোনো দিব্যদেশে এসে যেখান-সেখান থেকে ফুলপাতা জমা করে "পুষ্পকৈকর্য" (ফুলদ্বারা সেবা) করতে থাকে। মাদ্রাজ ও আশেপাশের শ্রদ্ধাশীল অব্রাহ্মণ ভক্তদের সঙ্গে বেশ কিছুটা পরিচয় বাড়ে। উত্তরভারতে সমস্ত অব্রাহ্মণকে তো শূদ্র বলে মনে করা হয় না। সেখানে তো ব্রাহ্মণ, রাজপুত, ভূমিহার, কায়স্থ, আগরওয়াল আদি পঞ্চাশ রকমের জাতিকে আহার ও প্রণাম ছাড়া একেবারে সমান বলে ধরা হয়। শুধু তাই নয়, অনেক জায়গায় তাদের হাতের কাঁচা-পাকা রান্নাও ব্রাহ্মণদের চলে। কিন্তু এখানে মাদ্রাজে ব্রাহ্মণ নিজেকে ছাড়া অন্য সবাইকে অত্যন্ত নিচ 'শূদ্র' মনে করে। উত্তরার্ধী ব্রাহ্মণ অভ্যাসবশে এখানে অব্রাহ্মণ গৃহস্থদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে, যার প্রভাব পড়াটা জরুরী হয়ে উঠল। ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল অব্রাহ্মণ চেট্টী ও মুদালিয়র লোকের হাতে। উত্তরার্ধী নিজের ব্যবহারের জন্য এদের কাছে প্রিয় হয়ে যায় আর এভাবে পুষ্পকৈকর্যের জন্য দুই আনা চার আনা মাসিক চাঁদা কয়েক জায়গা থেকে পেতে থাকে। স্ত্রী ও ছেলেপিলেদের বোঝা না থাকায় এই টাকা জমা হতে থাকে এবং অল্পদিনের মধ্যেই উত্তরার্ধীদের নিজেদের বাড়ি, নিজেদের বাগান ও কখনো কখনো যথেষ্ট সম্পত্তিও হয়ে যায়।

তিরুমলেতে জানতে পারলাম এখান থেকে কিছুটা দূরে পুন্নমলের দিব্যদেশ আছে। আমি রাত্রিতে বহুসংখ্যক তামিল বাক্য আমার নোটবুকে লিখে নিয়েছিলাম। সকালে রওনা হলাম। সৌভাগ্যক্রমে সংস্কৃত জানে এমন একটি তরুণ কিছুদূর পর্যন্ত আমার সঙ্গী হয়েছিল এবং জিগ্যেস করতে করতে পুন্নমলে পৌঁছে গেলাম। পুন্নমলে বাজার বেশ বড়। জনপদে নারকেল গাছ ও বাগান অনেক। এখানে প্রথম উত্তরার্ধী মঠে গেলাম। স্বামিনী এক উত্তরার্ধীনী আচারিণী ছিলেন। তিনি বহুকাল এখানে থাকায় চমৎকার তামিল বলতেন। তিনি এখানকার আচারী (বৈষ্ণব আয়েঙ্গার) ব্রাহ্মণীদের মতো কাছা দিয়ে খোপকাটা শাড়ি পরেছিলেন। দেখে বোঝা যাবে না যে তিনি রীওয়াঁর বাসিন্দা। কিছুটা পরিচয় দিয়ে বই রেখে আমি মন্দিরে গেলাম। এখানকার মন্দির তিরুমলের মন্দিরের চেয়ে বড়। মন্দিরে সংস্কৃতজ্ঞ লোক মিলে যেতই। নিজেদের অসহ্য জাত্যভিমানের সঙ্গে তামিল ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে একথা নিশ্চয়ই বলা চলে যে তাদের একশ' লোকের মধ্যে একশ'ই শিক্ষিত। তারা কাপড়-চোপড়, ঘর-দুয়ার বেশী পরিষ্কার

রাখে। আর এদের মধ্যে বহু সংস্কৃতাভিজ্ঞ লোকও পাওয়া যায়। পুঙ্গল না দধ্যোদন পেয়েছিলাম, বলতে পারি না। তা খেয়ে আমি উত্তরার্ধী মঠে চলে আসি। উত্তরার্ধী মঠে এক আচারীও ছিলেন। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম তিনিই স্বামী। পরে বুঝতে পারলাম তা ঠিক নয়। যাহোক, তাঁকে জিগ্যেস করে কিছু দিব্যদেশের নাম ও রাস্তার কথা লিখে নিলাম। তাদের মধ্যে প্রথম পড়ল—পচ্চপেরুমাল, তিরুমিশী ও তিন্নানুর। প্রথম দুইস্থানে উত্তরার্ধী আচারী থাকেন তাও জানতে পারলাম।

পচ্চপেরুমাল দূরে ছিল না। তবু এখন প্রতিদিন এক দিব্যদেশ দর্শনের নিয়ম হয়ে গিয়েছিল। পচ্চপেরুমাল একটি ছোট গ্রামের ছোটমতো মন্দির। কিন্তু এই 'ছোটমতো মন্দিরও' ভোগ-রাগ, বস্ত্র-অলংকার, বৃত্তিবন্ধনে আমাদের এখানকার বড় মন্দিরেরও নাক কেটে দিতে পারে। এখানকার উত্তরার্ধী আচারী কয়েক বছর আগে এসেছে। তাঁর নিজস্ব বাড়িও ছিল না। কোনোভাবে চালিয়ে নিতেন। কিন্তু এ পর্যন্ত দেখা তিন দিব্যদেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সহৃদয় ব্যবহার এখানেই পাওয়া গেল। অনেক রাত্রি পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে দক্ষিণী লোকদের আচার-ব্যবহার সম্পর্কে কথাবার্তা হতে থাকে। তিনিও ওদের আত্মাভিমানে বিরক্ত হয়েছিলেন। আগে যাওয়ার ব্যাপারে তিনি বললেন যে তিরুমিশীতে আপনার শ্রীহরিপ্রপন্নাচার্যের সঙ্গে দেখা হবে। তিনি আমাদের উত্তরার্ধীদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি।

১১

তিরুমিশীর উত্তরাধিকার (১৯১৩)

পরদিন সকাল আটটায় তিরুমিশী (বা তিরুমলিশৈ)-তে ছিলাম। চারদিক বাঁধানো ফোটা পদ্মফুলে ভরা বড় সরোবর। তার উত্তর ও পূর্ব সীমানা থেকে অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে একতলা টালি-ছাওয়া কিন্তু পরিচ্ছন্ন ঘরের সারি। পশ্চিম দিকে অনেকটা খালি জায়গা ছেড়ে মন্দিরের বিশাল গোপুর (শিখরদ্বার)—নানা রকমের পশুপক্ষী ও দেব-দেবীর ইট ও চুন দিয়ে তৈরী মূর্তিতে অলংকৃত এবং তাঁর দুই পাশে সাপের মতো বেরিয়ে গেছে চতুর্ভুজ প্রাকার ও তার অন্তরালবর্তী মন্দির সমুদয়। প্রাকারের দক্ষিণ-পশ্চিমে কিছুটা রাস্তা ছেড়ে আবার একই রেখায় অবস্থিত গৃহের সারি। সরোবরের পূর্বদিকে ফুলের বাগান, সুন্দর মণ্ডপ ও ফটক।

সরোবরে স্নান করে প্রথমে আমি দেবদর্শনের কাজ থেকে নিবৃত্ত হতে মন্দিরে চলে গেলাম। দর্শনের সময়ের কথাও মনে রাখাও আবশ্যিক ছিল। এখানে চারটি অথবা পাঁচটি সন্নিধি (দেবালয়) ছিল।·তিরুমিশী আলওয়ার (ভক্তিসার স্বামী) রামানুজী বৈষ্ণবদের বারজন প্রধান আলওয়ারদের (সিদ্ধাচার্য) মধ্যে একজন। এটা আমি তখন বুঝতে পেরেছিলাম, যখন আমি ভারী রুদ্রাক্ষ গলায় পরে এবং ভস্ম ত্রিপুণ্ড্র—দূর থেকেও যার দীপ্তি দেখা যেত, ধারণ করে বৈষ্ণবদের বিরুদ্ধে লেখা গালমন্দ খুঁজে বার করে মহানন্দে পড়তাম; তাদের মধ্যে কোনো গ্রন্থে

বৈষ্ণবদের পন্থাকে নিচ-অন্ত্যজ প্রমাণ করার জন্য কোনো পুরানো গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত এই শ্লোক আমার মনে ছিল—

"বিচক্ষণো বিশ্ববিমোহহেতু ঃ
কুলোচিতাচারকলানুষক্তঃ।
পুণ্যে মহীসারপুরে বিধায়,
বিক্রীয় শূর্প বিচচার যোগী।"

এখানেই সেই মহীসারপুর ছিল এবং ভক্তিসার স্বামীর জন্ম ও কর্মস্থান ছিল। কোনো সময়ে এক শূর্পকারের ভূমি হওয়ায় আজ এর এই ইজ্জত। কিন্তু আজকের শূর্পকার রাস্তার ভেতর পর্যন্ত ঢুকতে পারে না, মন্দিরের ভেতরে ঢোকার কথা তো ওঠেই না।

দর্শন ও প্রসাদ গ্রহণের পর আমি উত্তরার্ধী মঠে গেলাম, যা দক্ষিণের রাস্তার প্রাকারের অন্য-দিকে ছিল। লম্বা ও একটু মোটা এক প্রৌঢ় ব্যক্তি চত্বরে বসেছিলেন। আমি সংস্কৃতে বললাম, উত্তরার্ধী মঠ কি এটা? সংস্কৃততেই আমার পরের প্রশ্নগুলোরও উত্তর পাওয়া গেল। অনেক পরে বুঝতে পারলাম যে ইনিই স্বামী হরিপ্রপন্ন। কিছুক্ষণ পরে যখন আমি যাত্রা করার অনুমতি চাইতে লাগলাম, তখন তিনি অকৃত্রিম মধুর স্বরে বললেন—'দুপুরের প্রসাদ না নিয়ে যেও না।' থেকে যাওয়ার পর আবার কথাবার্তা শুরু হল। জানতে পারলাম তাঁর জন্মস্থান বালিয়া জেলায়। বৃন্দাবনের কোনো 'খটলা'তে তিনি শিষ্য হন। সেখানেই লঘুকৌমুদীর অনেক ভাগ পড়েছিলেন। তারপর দিব্যদেশের দর্শনলিপ্সা তাঁকে এখানে নিয়ে আসে। ছাপরা ও বালিয়া কাছাকাছি জেলা। তাই ছাপরার নাম শুনে অধিকতর আত্মীয়তা অনুভব করা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। দুপুরের পর যখন যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম, তখন বলতে লাগলেন—'মহাত্মা, দুই চারদিন এখানে বিশ্রাম কর। এই জায়গাকে অন্যের বলে মনে করো না। তোমার দিব্যদেশ দর্শনের বাসনা আছে। তো আমিও সেই বাসনার টানে দেশ ছেড়ে এই মুলুকে এসে পড়েছি। বিগত পঁচিশ বছর থেকে আমি সব দিব্যদেশ ঘুরে এসেছি। আমি তোমাকে সেই সব কথা বলে দেব যা জানলে তোমার যাত্রা অল্প শ্রমসাধ্য হবে।'

তাঁর কথা আমার যুক্তিযুক্ত মনে হল এবং আমি আমার দণ্ড-কমণ্ডলু সেখানেই রেখে দিলাম।

হরিপ্রপন্ন স্বামী বৃন্দাবন থেকে খালি হাতে পালিয়ে দক্ষিণে এসেছিলেন। তিনি এখানেই পুষ্পকৈঙ্কর্য শুরু করেছিলেন। ধীরে ধীরে মাদ্রাজের অনেক চেট্টী গৃহস্থ তাঁর পরিচিত হয়ে যায়। চার আনা আট আনা মাসিক চাঁদা জমা করে এখন তাঁর আমদানি মাসিক পঞ্চাশ টাকারও বেশী। আজ স্বামী হরিপ্রপন্নর রাস্তার পাশে দুটো ঘর। সরোবরের পূর্বদিকে বড় গোলাপের বাগানও তাঁরই। বেশ কিছু ধানের জমি ছাড়া তাঁর কয়েক হাজার টাকা সুদে খাটত। 'এই সব ভক্তিসার স্বামীর পুষ্পকৈঙ্কর্যের কৃপায়,' তিনি এরকমই বলতেন।

মঠে হরিপ্রপন্ন স্বামীর দুই শিষ্যের মধ্যে দেবরাজ ফৈজাবাদের বাসিন্দা ছিলেন। আর তীর্থযাত্রা করে এমনি ঘুরতে ঘুরতে তিনি এখানে পৌঁছে যান; অপর শিষ্য রীওয়াঁ রাজ্যবাসী হরিনারায়ণ। দেবরাজ খুব সাদাসিধা ছিলেন। কিন্তু গুরুর স্নেহ ও বিশ্বাস তাঁর ওপরই বেশী ছিল। প্রথমে হরিপ্রপন্ন স্বামী তাঁর অসুবিধার কথা আমার কাছে বলে আমার সহানুভূতি পেয়েছিলেন। তামিল ব্রাহ্মণদের অহংকারের নিশানা হতে হয়েছিল তাঁকে নিশ্চয়ই। খালি হাতে এসে এত বড় ধর্মস্থান নির্মাণ করেছেন, এতে কার সন্দেহ হতে পারে? দু-চারদিন থাকার পরে তিনি বললেন—'আমিও পড়ার সময় এভাবে পালিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়িয়েছি।

পড়াশোনা করলে আজ এক বড় পণ্ডিত হয়ে যেতাম। তোমার পড়াশোনা করার বয়স। পরেও তো ঘুরে বেড়ানো যেতে পারে।'

বাজিন্দার সর্বদা জীবন্ত বাণীর কোলাহলের মধ্যেও কখনো কখনো হরিপ্রপন্ন স্বামীর মতো মানুষের এই যুক্তির তথ্যকে আমি স্বীকার করতাম। তারপর তাঁর—'পরসার গুরুজীকে লিখে দাও এবং কয়েক বছর এখানে থেকেই লেখাপড়া কর। ব্যাকরণের জন্য আমাদের দেশ প্রসিদ্ধ কিন্তু ন্যায়, বেদান্ত, মীমাংসা ও কাব্যে এখানকার লোকদের অধিকার বেশী। এই বাড়ি নিজের বাড়ি বলে মনে করো। কোনো ব্যাপারে কষ্ট হলে আমাকে বলো। এখানে একটি ভাল সংস্কৃত পাঠশালা আছে, এখানে থেকে সংস্কৃত পড় না কেন?'

হরিপ্রপন্ন স্বামীর নিঃস্বার্থ উপদেশ কেন আমার ভাল লাগবে না, শেষ পর্যন্ত ভ্রমণ ও বিদ্যাব্যসনের মধ্যে কোনটা আমার বেশী প্রিয়, এই প্রশ্নের উত্তর এখনো আমি বুঝে উঠতে পারিনি।

সরোবরের উত্তর-পূর্ব দিকের বাড়িতে তখন সংস্কৃত পাঠশালা ছিল। সেখানে দুজন শিক্ষক ছিলেন। আমি গিয়ে পাঠশালায় নাম লেখালাম। ভক্তি (পরে মীমাংসা-শিরোমণি টী· বেংকটাচার্য), রঙ্গা ও শ্রীনিবাস আমার সহপাঠী ছিল। আমরা পাঠশালার ওপরের শ্রেণীতে পড়তাম। এখানকার ছাত্র ও কাশীর সমকালীন ছাত্রদের মধ্যে অনেক পার্থক্য ছিল। কিন্তু তার জন্য দোষ আমাদের এখানকার বিদ্যার্থীদের ছিল না। শেষ পর্যন্ত ওরা যে সব বাড়ি থেকে আসত সেখানে কত শতাংশ শিক্ষিত লোক থাকত? অনেক ছাত্র তো 'রামাগতি' শুরু করে 'ইয়ং স্বরে' মুখস্থ করতে থাকে এবং ঠিকমতো বর্ণমালা ও হিন্দির পাঠশালার বইয়ের সঙ্গেও তাদের পরিচয় ঘটেনা। ভক্তি ও অন্য সঙ্গী প্রস্ফুটিত পদ্মেভরা সরোবরের কিনারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে তার সৌন্দর্য দেখত, প্রচণ্ড বর্ষায় কানায় কানায় ভরা জলাশয় দেখতে তিন-তিন মাইল চলে যেত। আমার বারাণসীর সঙ্গীদের কাছে এই ধরনের কাজ করার আশা করতে পারতাম কি? এখানে আমরা শুধু পাঠ্যপুস্তকই মুখস্থ করতাম না বরঞ্চ নিজেদের পছন্দসই অনেক নাটক, চম্পূ একসঙ্গে মিলে অথবা আলাদা আলাদা পড়তাম। দেলরামকথাসার-এর মতো অনেক অপরিচিত কাব্য-নাটক আমি এখানেই সমাপ্ত করেছিলাম। মনে হয় গল্প উপন্যাসের মতো সংস্কৃতের এই সব বইও সখের পড়ার মধ্যে নিয়ে আসতে পারতাম। পাঠশালায় আমরা সিদ্ধান্তকৌমুদী, মুক্তাবলী ও কিছু কাব্য অলংকারের গ্রন্থ পড়তাম। আমার খুব মন লেগে গিয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

হরিপ্রপন্ন স্বামী এখন ধীরে ধীরে নিজের সব পরিশ্রম ব্যর্থ ও মঠের সব সম্পত্তি নষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা বলে আমাকে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করতে শুরু করলেন—'এমন স্থান যেখানে লেখাপড়া-জানা সভ্য লোকদের সমাগমসুলভ, এ এক মহান পুণ্যতীর্থ হওয়ায় সারা বৈষ্ণব জগতে যার সম্মান স্বীকৃত, এখানে থেকে এবং উত্তর ভারতীয়রা কি রকম বিদ্বান হতে পারে তা দক্ষিণীদের দেখিয়ে দিতে পারলে কত ভাল হয়?...'

তিনি বড় ব্যবহারকুশল ছিলেন। তিনি তাঁর নিজের অভিপ্রায় এক দিনেই বলে ফেলেননি। তার জন্য তিনি এক পক্ষকাল অপেক্ষা করেন। তিনি এটা জানতে পেরেছিলেন যে ওখানকার সহপাঠী, পড়াশোনা ও সমাজে আমার মন লেগে গেছে। তা সত্ত্বেও আমি সর্বদাই আপত্তি করছিলাম—'আমি এক জায়গাতে শিষ্য।'

'ঠিক কিন্তু রামানুজ স্বামীতো ঐ সম্প্রদায়েরও মূল। তাঁর বেদান্তের ঐতিহ্য তো বরঞ্চ আচারীদের কাছেই আছে,'—উত্তর পেলাম। এরই মধ্যে বৃন্দাবনের মহান নৈয়ায়িক সুদর্শনাচার্যের (পাঞ্জাবী নন, অন্য কিছু) প্রধান শিষ্য শ্রীভাগবতাচার্য শ্রীরংগম থেকে তিরুমিশী এলেন। মনে হয় হরিপ্রপন্ন স্বামী বিশেষ করে তাঁকে ডেকে এনেছিলেন। ভাগবতাচার্য নব্য ন্যায়ের বড় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর অধ্যাপকের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্রই ছিলেন। তিনি উত্তর ভারতে থাকলে তাঁর বিরাট খ্যাতি হত। তাঁর হাঁপানি রোগ ছিল। শীত এবং বর্ষায়ও উত্তরে থাকলে বরাবর এই রোগে আক্রান্ত হতেন। সেই কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য তিনি তামিল দেশে চলে আসেন। তামিল দেশে ঠাণ্ডার নামও নেই। পৌষ-মাঘ মাসেও এখানে গায়ে কাপড় দেওয়ার দরকার হত না। এখানে তিনি হাঁপানি থেকে রক্ষা পেতেন। বেশীর ভাগ সময় তিনি শ্রীরংগমে থাকতেন। কিন্তু মাঝে মাঝে রামানুজাচার্যের জন্মভূমি পেরেম্‌বুদুর (ভূতপুরী), তিরুমিশী ও অন্য দিব্যদেশেও যেতেন। সেই সময় তাঁর বয়স ছিল পঞ্চাশেরও বেশী। তাঁর ক্ষীণ দুর্বল ফর্সা দেহ, মেদহীন প্রসন্ন মুখ, অসাধারণ মধুর বাণী ও সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার যে কোনো লোককে তাঁর দিকে আকৃষ্ট না করে পারত না। তাঁর কিছুদিন এখানে থাকার কথা ছিল এবং আমি বিশুদ্ধভাবে ন্যায়ের কিছু গ্রন্থ পড়তে শুরু করি, সেই ব্যাপারে তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেন। তর্ক-সংগ্রহ আমি পড়েছিলাম কিন্তু তাঁর প্রত্যেক লক্ষণকে ধরে ধরে তিনি আমাকে পড়াতে শুরু করেন। তাঁর পড়ানোর পদ্ধতি সুন্দর ছিল। ন্যায়ের মতো শুষ্ক বিষয়ও তিনি চিত্তাকর্ষক করে তুলতে পারতেন।

আমার দিকে শ্রীভাগবতাচার্যের বিশেষ দৃষ্টি পড়েছিল কারণ হয়তো পড়ার প্রতি আসক্তি ও পরিচ্ছন্ন রুচি। হরিপ্রপন্ন স্বামীর কথার তিনিও সমর্থন করতে শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত আমাকে হরিপ্রপন্ন স্বামীর প্রস্তাব জোর করে স্বীকার করে নিতে হল। আবার আমাকে বাসুদেবমন্ত্র দেওয়া হল, বাহুমূলে তপ্তমুদ্রার (শঙ্খচক্র) ছাপ দেওয়া হল। কিন্তু পরসায় নতুন আচারীর হাতে যেমন দেওয়া হয়েছিল ততটা গরম ও ততটা নির্দয়তার সঙ্গে নয়। দীক্ষার পরেও পঙ্‌ক্তিতে বসে ভোজন করার জন্য আমি যে ব্রাহ্মণ তার প্রমাণের প্রয়োজন ছিল। আমি প্রয়াগে যাগেশের কাছে লিখলাম এবং ওর চিঠি চলে এল। লিখিত প্রমাণ হরিপ্রপন্ন স্বামীর জন্য নয় দক্ষিণের আর উত্তরার্ধী সম্প্রদায়ের জন্য প্রয়োজন ছিল।

আমার জন্য এখানে পূজাপাঠের বিশেষ ঝামেলা ছিল না। সকালে শৌচ-দাঁতন করে সরোবরে স্নান করতাম, তারপর তালপাতার ছোট সাদা সুন্দর ঝাঁপি থেকে সাদা সুবাসিত রজ ও লাল রোরী দিয়ে' কপালে তিলক কাটতাম—ব্যাস, পূজা শেষ। হরিপ্রপন্ন স্বামী ও পণ্ডিত ভাগবতাচার্য সংস্কৃতের পাঠ্যপুস্তক পড়াও পূজা-পাঠের অঙ্গ বলে মনে করতেন। স্নানের সময় সপ্তাহে একবার তিলতেল দিয়ে মালিশ অবশ্যই হত। এখানে তেল মালিশ-অলার (স্নাপক) পক্ষে এক ছটাক তেল শরীরে মালিশ করে শুকিয়ে দেওয়া এমন কিছু প্রশংসার কথা ছিল না এবং এই রকমের মালিশঅলার অভাবও ছিল না। যাইহোক, দেহে মালিশ করা ভাল ব্যাপার হলেও কিন্তু যখন চোখেও তিল তেল ঢালতে হত, তখন আমার খুব খারাপ লাগত। কিন্তু যখন দেবরাজ ও হরিনারায়ণ এক দিক থেকে বলতে থাকত—এতে চোখ নীরোগ থাকে, তখন মানতেই হত। স্নানের সময় তেঁতুলের মতো একটা ফল (শিকাকাই) জল দিয়ে বেঁটে গায়ে মাখতে হত। এতে শরীরের তেল বেরিয়ে যায় এবং তেল লেগে ধুতি ময়লা হয় না। যদি তেল মাখতে আর কাপড়ও সাফ রাখতে হয় তাহলে তার এর চেয়ে ভাল উপায় হতে পারে না। কামাবার সময় উত্তর ভারতের বৈরাগীর পক্ষে মাথা ও মুখের চুলদাড়ি কামিয়ে ফেলাই যথেষ্ট

ছিল। কিন্তু এখানে লজ্জাসরম ছেড়ে সারা শরীরে ক্ষুর চালাতে হত। বুক ও পায়ের রোমও কেটে ফেলা আমার কাছে পণ্ডশ্রম বলে মনে হত। সেই সময় আমার একথা মনে আসেনি যে এখানকার কর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণদের জন্য সেলাইকরা কাপড় পরতে নেই। তারা কুর্তা, কোট, মেরজাই পরতে পারে না। তাই দেহের উপরের চুল দেখতে খারাপ লাগে।

সব লোক বাড়িতে ও ভ্রমণের সময়ও পদ্মপাতায় খায়। পদ্মপাতার শুকনো গাঁটও বাজারে থালার মতো বিক্রী হত। খাওয়া-দাওয়াতে অনিবার্যভাবে ভাত থাকতই। আমি নিজেকে এর সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছিলাম। সকালে জল-খাবার হিসেবে পাওয়া যেত রাত্রের বাঁচা ভাত দিয়ে বানানো তাজা দধ্যোদন, যা সত্যিই খেতে বড় স্বাদু লাগত। দুপুরে উত্তর ভারতের ডাল-ভাত তরকারির সঙ্গে দক্ষিণের রস অথবা মাতৃমধুও থাকত। কখনো কখনো লাল লঙ্কার ঝাল বেশী হয়ে যেত নয়তো গরম গরম পান করতে অথবা ভাতের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে বেশ ভাল লাগত। এর প্রধান উপাদান ছিল তিল তেল, লাল লঙ্কা, তেঁতুল। জ্বর হওয়ায় আমার এক সহবাসীকে যখন পথ্য হিসেবে রসমু দেওয়া হচ্ছিল, তখন আমি আপত্তি করে বললাম—'কেন বেচারাকে মেরে ফেলতে চাইছ?' আমার উত্তর ভারতীয় সঙ্গীরা বলল, 'এটা উত্তম পথ্য, এখানকার আবহাওয়ার জন্য এতে ক্ষতি হয় না।' আমার মনে হল এতে প্লীহা না বেড়ে পারে না। ভাত-ডাল রান্না হত মাটির হাঁড়িতে। কোনো গ্রহণ না আসা পর্যন্ত হাঁড়ি পালটানোর প্রয়োজন হত না। মুসলমানদের রান্নাঘরের মতো দক্ষিণী আচার অনুসারে আচারীদের রান্নাঘরও ধোয়া-টোয়ার দরকার হত না। সেখানে তো কেউ খায় না। তাহলে শুধু কালি ঝুলি সাফ করার জন্য রোজ রোজ পরিশ্রম করে এক তোলা রক্ত শুকানো বোকামি নয় কি? রান্নাঘর ও খাওয়ার ঘর আলাদা ছিল। আর সেটা খুব পরিচ্ছন্ন থাকত। খাওয়ার পর পাতা নিজেকেই তুলে নিয়ে যেতে হত। তারপর সেখানে কিছুটা গোবর দিয়ে লেপে মাটিতে পড়ে-যাওয়া ভাত তুলে নিতে হত এবং আবার জল ছিটিয়ে দিতে হত। ভোজনে আচারীদের নিয়ম আসলে তামিল বৈষ্ণব ব্রাহ্মণদেরই নিয়ম ছিল। আহার কাঁচা অথবা পাকা যাই হোক না কেন, যাদের সঙ্গে একত্র খাওয়া চলে একমাত্র তাদের হাতের রান্নাই এবং তাদের চোখের সামনেই খাওয়া যেতে পারে। যার হাতে খাওয়া চলত, জলও তারই হাতে পান চলত। এই নিয়মের জন্য বহু ধনী ও উচ্চ পদস্থ মাদ্রাজী ব্রাহ্মণদের স্ত্রীলোকদের নিজেদের হাতে রান্নাঘর,বাসন ধুতে হত, জল ভরতে হত ও রান্না করতে হত।

খাদ্য ও জল সম্পর্কে ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারে আমার ততটা বিরাগ ছিল না। কেননা এতে কিছু উদার হওয়া সত্ত্বেও এ বিষয়ে আমার ধারণা কোনো সৈদ্ধান্তিক বিচারের ওপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু বিয়ে-সাদীর রীতি আমাকে খুব পীড়া দিত। ভক্তির প্রতিবেশী ছিলেন এক বড় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। তার গৌরবর্ণা কন্যার নাম কি যেন···বল্লী—বিয়ে করেছিল পশ্চিমের সড়কের বাসিন্দা এক স্থূলকায় শ্যামবর্ণ যুবককে। আমরা যারা যুবক তাদের কাছে এই বিয়ে অনুচিত বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না যখন জানতে পারলাম যে ঐ যুবকের আপন বোনই তার আপন শাশুড়ীও। মামার মেয়ের সঙ্গে ভাগ্নের বিয়ের কথা আগে শুনেছিলাম। কিন্তু বোনের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে এ সময়ে আমার কাছে কল্পনাতীত ছিল। এরপর অনেক মামা ও পিসীমার জামাইকে দেখে এটা সাধারণ ব্যাপার বলেই মনে হতে থাকে। খালি মাথাকে সৌভাগ্যের চিহ্ন বলে মনে করায় পর্দার প্রশ্নই ছিল না কিন্তু বাবা-মার সামনে নব দম্পতির ঘোরাফেরা করা উত্তর ভারতীয়-এর চোখে বিনয়শূন্যতা বলে মনে হত, যদিও আমি একে পুরোপুরি সমর্থন করতাম। বিকেলে যুবতীপত্নী সাপের লেজের মতো বেণীকে ফুল দিয়ে

সাজাত, হামেশাই জমকালো রঙের রেশমী শাড়ি কাছা দিয়ে পরত। তারপর সন্তান থাকলে তার সাজগোজ করে স্বামীর সঙ্গে বাগান, রাস্তা ও সরোবরের পাড়ে বেড়াতে যেত। আমাদের উত্তর ভারতের বৃদ্ধা শাশুড়ী একে 'নির্লজ্জতার পরাকাষ্ঠা'না বলে থাকতে পারত না। তবে হ্যাঁ, একটা ব্যাপার আমার কাছে নিশ্চয়ই খারাপ লাগত, বৃদ্ধ বয়সে কিছু বিশ্রামের পরিবর্তে শাশুড়ীকেই সবচেয়ে বেশী কাজ করতে হত। দু ঘণ্টারাত থাকতেই শাশুড়ী উঠত, ঘর-উঠান ঝাঁট দিত। জলে গোবর গুলে অবিরল ধারায় সেই জলের ছড়া দিতে হত। তারপর দরজার সামনে সুন্দর করে চুন দিয়ে আলপনা দিত—এই আলপনা দেখলে মনে হত দক্ষিণী মেয়েরা চারুকলার সুরুচিতে তাদের উত্তর ভারতীয় বোনেদের চেয়ে অনেকটা এগিয়ে রয়েছে। সূর্য উঠে যেত, তবু বউয়ের তন্দ্রা ভাঙতো না। বুড়ী শাশুড়ী জল গরম করত—বউ হয়তো তেল-সাবান দিয়ে চান করতে চাইতে পারে, কেশ ধুতে চাইতে পারে, অন্তত হাত মুখ ধুতেও চাইতে পারে। বউর বাচ্চা নাওয়ানো ধোওয়ানোও শাশুড়ীরই কাজ। শাশুড়ী না থাকলে বাসন মাজা, রান্না করা, খাওয়ানো বউকেই করতে হত। আর সাধ্য থাকলে এরকম ঘরে খুব কম মা-বাবাই মেয়ে দিতে চাইত। রাত্রিতে রান্না করা, বাচ্চাদের খাওয়ানো-দাওয়ানো ও তাদের দেখাশোনাই শুধু নয়, বউয়ের বেণী বাঁধা—প্রত্যহ নূতন বেণী বাঁধার অভ্যাস তো কিছু খারাপ ব্যাপার নয়। বেণী ফুল দিয়ে সাজানোও শাশুড়ীরই কাজ। ভোর চারটা থেকে রাত দশটা-বারটা পর্যন্ত শাশুড়ীর শ্বাস নেওয়ারও ফুরসত কোথায়? পঞ্চাশ বছরের হোক অথবা সত্তর বছরেরই হোক, শাশুড়ী এভাবে প্রতিদিন, প্রতি মাস, প্রতি বছর যন্ত্রের মতো কাজ করতে করতে একদিন যখন তার চোখ চিরকালের জন্য বুজত তখন তার ছুটি মিলত। 'বৃদ্ধার সঙ্গে তরুণ পুত্র ও বধূর এই ব্যবহার হৃদয়ের অভাবের কথাই বলে দেয়'—উত্তরার্যীয়দের এই আক্ষেপের দক্ষিণীদের উত্তর ছিল—'কিন্তু সব শাশুড়ীই তো প্রথমে বউয়ের জীবন কাটায় এবং তখন সে প্রথমে এই সব সুবিধা ভোগ করে। সেই সঙ্গে নব্বুই শতাংশ বধূই শাশুড়ীর অপরিচিত নয়, তার ভাই, বোন, মেয়ের মেয়ে হয়ে থাকে।'

তিরুমিশীতে মঠের ভেতরে ছাড়া অন্য সময়ে আমাকে সংস্কৃতের ব্যবহার করতে হত। সেখানে এক ব্রাহ্মণ দোকানদার ছিল। সেখান থেকে তেল, দেশলাই অথবা অন্য কোনো জিনিষ আনতে হলে আমাকে ইংরাজী ব্যবহার করতে হত। তিরুমিশীতে চারমাস ছিলাম। কিন্তু লেখাপড়ার মতো মানসিক শ্রমের কাজও এমন অনুকূল ভাবে ও সস্নেহ অন্তরঙ্গতার সঙ্গে হত যে মনে কখনো ক্লান্তি আসত না। সত্যি সত্যিই 'দিবস জাত নহিঁ লাগহি বারা।' প্রয়োজন না হওয়ায় এবার আমার তামিল শেখার সুযোগ হয়নি।

হরিপ্রপন্ন স্বামীর এক শিষ্য দেবরাজ তো খুব সাদাসিধা মানুষ ছিল। রান্নাঘর-বাসন ধোয়া, রান্না করা, মন্দিরের ভেতর থেকে জল ভরে আনা (বাড়ির কুয়ার জল নোনতা ছিল) এবং কিছু গরু-বলদের খাওয়ানো-দাওয়ানোর তত্ত্বাবধান করা—এই সব করতেই তার সময় কেটে যেত। হরিনারায়ণজী পড়াশোনা করেছিল নামমাত্র কিন্তু বুদ্ধিমান ছিল। তা সত্ত্বেও সে আমাকে ঈর্ষা করত না, যদিও হরিপ্রপন্নাচার্যের উত্তরাধিকারী হওয়ায় নিজের হক থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল। হয়তো তার কারণ আমার মঠের সম্পত্তি ও মোহন্ত পদের প্রতি নিস্পৃহতা। আমার চিঠি যখন পরসা পৌঁছল, তখন চিঠির উত্তরের সঙ্গে গুরুজী পঁচিশ টাকার মানি অর্ডারও পাঠিয়ে দেন। আর লেখেন যে, যখনই দরকার পড়বে টাকা চেয়ে নেবে এবং দক্ষিণের তীর্থে খুব ভ্রমণ করবে।

মন্দিরের তিন দিকের (পুব দিকে সরোবর ও তারপর মানুষের বাস ছিল না) সড়কের ধারে শুধু ব্রাহ্মণদের বাড়ি ছিল। ঘরের দেয়াল ইটের, ছাদ টালির। ঘরের ভেতর খুব পরিচ্ছন্ন ছিল। প্রত্যেক বাড়ির বৈঠকখানায় শেকলে-বাঁধা কাঠের তক্তার একটা দোলনা অবশ্যই থাকত যাতে

আগন্তুকেরা বসত অথবা কাজের অবকাশে বাড়ির লোকেরাও বসত। সকাল বেলা সব দরজায় ভিন্ন ভিন্ন রকমের আলপনা ও সবুজ গোবরে ধোয়া জমির জন্য রাস্তা খুব সুন্দর দেখাত। আমি ওখানকার ব্রাহ্মণদের সঙ্গে যখন আমাদের এদিকের ব্রাহ্মণদের তুলনা করতাম, তখন আমি ভাবতাম যে এরা তো বাড়িতে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকে, এদের খরচা চলে কি করে। বস্তুত ওখানকার পক্ষে ব্রাহ্মণদের নিজেদের হাতে কোদাল চালানো, খুরপি ব্যবহার করা অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে হয়তো উত্তর ভারতেও ব্রাহ্মণদের এই অবস্থাই ছিল। কিন্তু সেখানে তো নতুন শাসনের আমলে রাজার কাছ থেকে ব্রাহ্মণেরা যে জমি ও বৃত্তি ও দানপত্রের হাজার শপথ পেয়েছিল, তা শুয়োর, গাধা, ইত্যাদি গালমন্দ করে, বাতিল করে কেড়ে নেওয়া হয়। শাসনদণ্ডের সামনে কারু কথাই চলে না। এই কারণেই উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণেরা শেষ পর্যন্ত নিজেদের শারীরিক পরিশ্রমের ওপর নির্ভর করার শিক্ষা গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে তামিল, কেরল ইত্যাদি দেশ সর্বদাই হিন্দু শাসনের অধীন ছিল, মুসলমান শাসকেরা কখনো সেখানে স্থায়ী বিজয় লাভ করেনি। তাঁরা দিল্লির ফরমান মেনে নিয়েছিল, তবুও নিজেদের স্থানীয় রাজাদের দিল্লির সামন্ত ও করদ রাজা হিসেবে রেখে দেওয়ার ফলে ব্রাহ্মণদের রাজপ্রদত্ত ভূমি ও দেবালয়ের স্থাবর-অস্থাবর বহু সম্পত্তি তাঁদের হাত থেকে চলে যেতে পারেনি। তারা পুরানো শাস্ত্রীয় শিক্ষার ক্রমকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। এতে তারা নিরক্ষর হতে পারেনি এবং সাধারণ মানুষের ওপর তাদের বিদ্যার আধিপত্যও বজায় ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে এই অবিচ্ছিন্ন শাস্ত্রীয় ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের ফলে দক্ষিণের ব্রাহ্মণদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিচারের সংকীর্ণতা ও সামাজিক বৈষম্য অক্ষুণ্ণ ছিল।

তিরুমিশীতে দেবস্থান ছিল দুটি। বৈষ্ণব দেবস্থান ছাড়া গ্রামের উত্তর দিকে এক শৈব দেবস্থানও ছিল। কোনো বৈষ্ণব যদি হঠাৎ শিবের মূর্তি হঠাৎ দেখে ফেলত, তাহলে তাও পাপ বলে গণ্য হত। কিন্তু একদিন ভক্তির সঙ্গে চুপিচুপি আমি তা দেখতে গিয়েছিলাম। গরুড়ের জায়গায় নন্দী, বিষ্ণুর জায়গায় শিব, গণেশ প্রভৃতির বিশেষত্বের সঙ্গে বাকি সব একই জিনিস ছোট চেহারায় এখানেও ছিল। বৈষ্ণব মন্দিরের কাছে অনেক বিষয়-সম্পত্তি ছিল, যার কমিটির প্রধান 'ধর্মকর্তা' ছিলেন এক অব্রাহ্মণ মুদলিয়ার। প্রত্যেক মাসেই দু-একটা বিশেষ দিন পড়ত যখন মন্দিরে বিশেষ পূজা হত। অথবা কোনো বিশেষ দেবতা অথবা আচার্যের মূর্তি বাদ্য-বাজনা নিয়ে মিছিল করে বাইরে নিয়ে আসা হত। প্রধান মন্দিরের অচল শিলামূর্তি ছাড়া মিছিল করে নিয়ে যাওয়ার জন্য ধাতুর ছোট চল-মূর্তি থাকত। সুবর্ণ, মণি, মুক্তার নানা অলংকারে সাজিয়ে মূর্তিকে সোনার গিলটি করা আলোক বিচ্ছুরিত সিংহাসনের ওপর রাখা হত। চার অথবা আট জন মানুষ—ব্রাহ্মণ-সিংহাসন কাঁধে নিয়ে চলত। আগে যেত বাদ্য—তার মধ্যে দক্ষিণের প্রসিদ্ধ নফীরী (রৌশনচৌকি)ও থাকত। তারও আগে ধুতির ওপর কোমরে নিজের গামছা বেঁধে উর্ধকায় নগ্ন রেখে ব্রাহ্মণেরা প্রথমে দ্রাবিড়প্রবন্ধ (সপ্তবাণী) ও পরে বেদমন্ত্র সুর করে পড়তে পড়তে যেত। স্ত্রী-পুরুষ মাথা নিচু করে সিংহাসনের সামনে পৌছত, সিংহাসন যারা বয়ে নিয়ে যেত তারা অল্পক্ষণের জন্য থামত, মূর্তির সামনে রাখা ঘণ্টা লাগানো চরণপাদুকা পূজারী বিনম্র নগ্ন শিরে রাখত।

কিন্তু তিরুমিশীর অব্রাহ্মণ পল্লীতে গেলে এই পরিচ্ছন্নতা, এই সুরুচি ও এই সংস্কৃতি দেখা যেত না। কিছু স্বচ্ছল কৃষক পরিবার বাদ দিলে সেখানে নিরক্ষরতা ও দারিদ্রের অপ্রতিহত রাজত্ব দেখা যেত। আমার ব্রাহ্মণ সঙ্গীরাও খুব কমই সেদিকে যেতে চাইত। আর তারা একথা শুনে তাজ্জব হয়ে যেত যে, উত্তরের ব্রাহ্মণরা এই শূদ্রদের—(ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য সব জাতিই শূদ্র ধরে নেওয়া হত) হাতের জলই নয়, অন্নের মিষ্টি পর্যন্ত খেয়ে নেয়।

প্রথম্ম প্রথম যখন রাত্রিতে বলা হয়—'গোষ্ঠীতে চল, পুঙ্গল প্রসাদ গ্রহণ করতে', তখন গোষ্ঠী বলতে আমি আন্দাজ করে নিলাম—কিছু লোকের একত্র সমাবেশ। কিন্তু পুঙ্গল শুনে আমার মনে হল কোনো মহার্ঘ পক্কান্ন হবে। দুটি প্রধান মন্দিরের সম্মিলিত সভামণ্ডপে যেখানে কোনো জানালা গবাক্ষ কিছু না থাকায় দিনের বেলায় অন্ধকার থাকত, রাত্রিতে টিমটিমে তেলের প্রদীপ সেখানে কি করবে, পাথরের মেজেতে লোক—শুধু ব্রাহ্মণরাই বসে ছিল। মধুর সুরে কেউ বাঁশী বাজাচ্ছিল। পূজারী পিতলের বাসন থেকে বার করে করে হাতে চার পাঁচটা আমলকির মতো কোনো জিনিষ দিচ্ছিল। প্রথমে 'কুলীন' বলে দক্ষিণী ব্রাহ্মণদের হাতে প্রসাদ দেওয়া হল। তারপর উত্তরার্ধী 'নীচ' ব্রাহ্মণদের পালা এল। অব্রাহ্মণরা মণ্ডপের দরজার বাইরে আকাশের নিচে আলাদা দাঁড়িয়েছিল এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে। আমার হাতেও 'পুঙ্গল' পড়ল। মহা আনন্দে তা মুখে ফেললাম। দেখলাম খিচুড়ী। হ্যাঁ, সেই খিচুড়ী যা খাওয়ার কথা বলায় যাগেশকে আমার অনেক কথা শুনতে হয়েছিল। আমি আস্তে হরিনারায়ণাচারীর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'খিচুড়ী'! এই পুঙ্গল!!' সেখান থেকে ফেরার সময় হরিনারায়ণজী আমাকে একটা ঘটনার কথা বললেন—'বালিয়া জেলার দুই নতুন আচারী বাপবেটা—তীর্থ করতে দক্ষিণাপথ আসে। এই ধরনের গোষ্ঠীতে তারাও সোৎসাহে পুঙ্গল প্রসাদের জন্য বসে। আপনারই মতো হাতের পুঙ্গল মুখে দেয় আর ছেলেটা চিৎকার করে ওঠে 'ও বাবা, এ যে খিচুড়ী, শ্বশুরে, পুঙ্গল বলে জাত মেরে দিয়েছে।'

যাকগে, আমার তো জাতের পরোয়া ছিল না এবং যাগেশের মতো খিচুড়ীপ্রেমিকের কাছে তো বেশী ঘি ঢেলে কলাইয়ের ডালের খিচুড়ীও খুব ভাল লাগত। মিঠা পুঙ্গল ও মিঠা 'দোসে' (চাল-মুগের মোটা ছিলকা রুটি) তো আমারও ভাল লাগত। কিন্তু তা কালে ভদ্রে দেওয়া হত। আর ক্ষীরের নাম নিলে শিউরে উঠতাম। স্বামী হরিপ্রপন্ন বলতেন, একপো দুধে এক দক্ষিণী একমণ ক্ষীর তৈরী করতে পারে।

তিরুমিশীতে থাকার সময় পুন্নমলে, পচ্চপেরুমাল, পেরেম্বুদুরের উৎসবে যোগ দিয়ে এসেছিলাম। যেদিন প্রথম হরিপ্রপন্ন স্বামী পুন্নমলে যাওয়ার জন্য নিজের বণ্ডী (গরুর গাড়ি) জুতছিলেন, তখন আমি বললাম,—'থাক, আমরা পায়ে হেঁটেই যাব।' 'এতে আমরা তাড়াতাড়ি যাব' —শুনে আমার বিশ্বাস হল না। হরিণের মতো পেছনের দিকে বাঁকানো শিঙ-অলা তাঁর পুঁচকে বলদ যুততে দেখে মনে হল না তা সম্ভব। কিন্তু আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম যখন গাড়ি এক্কার ঘোড়ার চালে দৌড়ে চলতে দেখলাম। গাড়ির ওপরে ডাইনে ও বাঁয়ে ধনুকাকৃতি ছাদ ছিল। চাকায় সম্ভবত স্প্রিং ছিল না।

অগ্রাণ মাস ছিল। একদিন হরিনারায়ণাচারী তিরুপতীর কাছে তিন্নানুরের মহোৎসবের উল্লেখ করলেন। বালাজী তিরুপতীর নাম আমি পরসায় অনেক শুনেছিলাম, ভাবলাম, যাওয়া যাক। সেটাও দেখে আসি।

১২

দক্ষিণের তীর্থপর্যটন

চৌরাস্তায় দুটো রাস্তা শুধু নিকটেই আসে তা নয়, একেবারে মিশে যায়। কিন্তু সেই রাস্তা যেতে যেতে শত শত নয়, হাজার হাজার মাইল দূরে চলে যায়। মানুষও এই রকম চৌরাস্তা থেকে কিছুটা আলাদা রাস্তায় চললে তারপর কোথা থেকে কোথায় চলে যায়। তিরুমিশী থেকে যাত্রার সময় হরিপ্রপন্ন স্বামী তিরুপতীর এক আচারী-স্থানের ঠিকানা দিয়েছিলেন এবং পরিচয়পত্র হয়তো দিয়েছিলেন। ট্রেনে একা বসে আমি ভাবতে লাগলাম, আচারীর স্থানে যাব নাকি তিরুপতির বৈরাগী মোহন্তরাজ—বহু লাখ লাখ টাকার সম্পত্তির অধিকারী তিনি আসলে রাজা মোহন্ত—তাঁর স্থানে যাব। সেখানকার পঙ্‌ক্তিতে বসা বৈরাগীদের পক্ষে খুব গর্বের বস্তু। পয়সার সম্পর্ক তখনো আমি মন থেকে ছিঁড়ে ফেলিনি। কেননা তখনো আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি যে আমার কার্যক্ষেত্র উত্তর ভারতে থাকবে নাকি দক্ষিণে। ভবিষ্যতের হাতে এবিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত নেওয়া ছেড়ে দিয়ে আমি স্থির করলাম, তিরুপতীতে বৈরাগীর স্থানে যাওয়াই ভাল হবে।

বেশভূষায় আমাকে বেশ সম্ভ্রান্ত যুবক বলে মনে হত, লেখাপড়াও করেছিলাম। এইজন্য মোহন্তজীর ঝাড়লণ্ঠনে সাজানো হলঘরের পাশে একটি সুন্দর কুঠরীতে আমাকে থাকতে দেওয়া হল। আমার পাশের ঘরে ছাপরা জেলার এক যুবক সাধু ছিল। সে লঘুকৌমুদী পড়ছিল। হলঘরে দরজা পুবদিকের কামরায় সুরসণ্ড (মুজফ্‌ফরপুর) লওয়াহীপট্টীর পরমহংসের শিষ্য এক পণ্ডিত সাধু থাকতেন। এই দুই ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হল। সকালের জলখাবার হয়ে গেল। দুপুরের আহারের সময় এল। পঙ্‌ক্তিভোজনের ঘণ্টা বা নাগারা বাজল। অন্যদের সঙ্গে আমিও মন্দিরের সভামণ্ডপে গিয়ে বসলাম। কিছু পরে এক পাচক এল এবং সে বিনীতভাবে আমাকে নিয়ে গিয়ে উঠানে বসা সাধুদের পঙ্‌ক্তিতে বসিয়ে দিল। আমার সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হল যে এই দুই জায়গায় কিছু উঁচু-নিচু ভেদ আছে। একথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি লোটা হাতে উঠে শুধু নিজের কুঠরীতেই চলে আসিনি, বরং বাজারে গিয়ে কিছু আপেল ও মিঠাই কিনে এনে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করছিলাম। এরই মধ্যে এই ঘটনা মঠের প্রমুখ ব্যক্তিদের নজরে এসেছিল। একটি লোক ছুটতে ছুটতে আমার কাছে এল, বলল,—'চলুন, আপনি উঠে এলেন কেন?'

'আপনি আমার ধাম-ক্ষেত্র, পঞ্চসংস্কার যা বৈরাগীদের ধর্মকর্ম তা জিগ্যেস করতেন; তা বলার পর আপনি আমাকে যেখানে ইচ্ছা বসাতে পারতেন। কিন্তু আপনি সোজা আমাকে নিয়ে গিয়ে কাঙালদের মধ্যে বসিয়ে দিলেন।'

'না, কাঙালদের মধ্যে আপনাকে বসাইনি। ওপরের পঙ্‌ক্তিতে তাদেরকে বসানো হয়, যাঁরা ওপর (বালাজী) থেকে ফিরে আসে। আপনি এখন ওপর থেকে আসেননি, সেই জন্য পাচক ঐ রকম করেছে।'

'কিন্তু এখন তো আমি খাওয়া-দাওয়ার জিনিষ এনে ফেলেছি।'

'না, অপরাধ মাপ করুন। পাচকরা নিরক্ষর উজবুক হয়, তাতো আপনি জানেন। চলুন আপনি যেখানে ইচ্ছা, সেখানে বসবেন।'

যাহোক, আমি গিয়ে সভামণ্ডপের পঙ্ক্তিতে বসে খেলাম।

তিরুপতী বেশ ভাল শহর। সেখানে যাওয়ার পর বুঝলাম, এই জায়গা তামিল দেশে নয়, অন্ধ্রতে। মঠ (ধর্মস্থান) সম্পর্কে বলা চলে যে প্রথম এই সব সম্পত্তি—গ্রাম ইত্যাদি—সমস্ত কিছুই কোনো রাজার ছিল। কোনো একজন বৈরাগী হাতীরাম বাবা উত্তর ভারত থেকে এসেছিলেন। তাঁর সিদ্ধিবলের দ্বারা রাজা এতটা প্রভাবিত হয়েছিলেন যে তিনি তাঁর সর্বস্ব তাঁকে দিয়ে দিয়েছিলেন। মঠে গ্রাম থেকে আমদানি বার-তের লাখ বলা হয়, তা ছাড়া পাহাড়ের ওপর বেংকটেশ (বালাজী) ও নিচের কয়েকটি মন্দিরে ভোগ দেওয়া হত তা থেকেও ভারী আমদানি হত। ঐ সময়েও মন্দিরের আমদানিতে মোহন্তের একাধিকার ছিল না। আগে কয়েকজন মোহন্তকে বিষ অথবা গুলিতে হত্যা করার কথা আমি শুনেছিলাম। সেইজন্য বর্তমান মোহন্ত প্রয়াগদাসের পক্ষে বেশী সতর্ক থাকা খুবই স্বাভাবিক ছিল। হাতীরাম বাবার সময় থেকেই এখানকার মোহন্ত উত্তর ভারত থেকে আসতেন মোহন্ত প্রয়াগদাসের জন্ম হয়েছিল রাজপুতানায়। মোহন্ত হওয়ার জন্য অনেক পড়াশোনার প্রয়োজন কি, যখন বৈরাগীদের মধ্যে এই উক্তি প্রচলিত আছে—'পঢ়েলিখে বব্‌ভনকা কাম, ভজ বৈরাগী সীতারাম।' এক-আধবারই আমি মোহন্ত প্রয়াগদাসের কাছে গিয়েছিলাম, তাও এই স্থানের প্রভুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য। নয়তো কারু মোসাহেবী করা আমার স্বভাবের একেবারে বিপরীত ব্যাপার ছিল।

এখানে থাকতে থাকতেই আমি ভাবছিলাম এবং শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলাম যে উত্তরাখণ্ড ছেড়ে দক্ষিণাপথকে আমার কার্যক্ষেত্র করতে পারব না; আর যতই প্রিয় হোক না কেন, তিরুমিশী ফিরে যাওয়া আমার উচিত হবে না। আমি পরসা টেলিগ্রাম করে দিলাম এবং টেলিগ্রাম মানি অর্ডারেই টাকা এল। টাকা নেওয়ার সময় মোহন্তজীর স্বাক্ষর প্রয়োজন ছিল। তাই ঐ সময়ে তাঁর সঙ্গে দুয়েকটা কথা বলতে হয়েছিল। তিরুপতী থেকে কিছু দূরে তিন্নানুর অথবা চিন্নানুর গ্রামে লক্ষ্মীর একটা পুরানো মন্দির আছে। উৎসবের অত্যন্ত ভিড় ছিল। সেখানে অন্ধ্র, দ্রাবিড় স্ত্রী-পুরুষ ছাড়া শত শত বৈরাগী ও আচারী হিসেবে অনেক উত্তর ভারতীয়ও ছিল।

বেংকটাচলম্ বা বালাজীর পর্বত তিরুপতী থেকে আট দশ মাইল দূরে পাহাড়ের ওপর। পাহাড়ের পাদদেশ থেকে সিঁড়ি তৈরী করা হয়েছে, যাতে প্রথম দিকে সিঁড়ি তৈরীর অর্থের দাতারা নিজেদের নাম খোদাই করে অক্ষয় ফল লাভের চেষ্টা করত। আর এখন বিজ্ঞাপনবাজীর যুগে অনেক ব্যবসায়ী কোম্পানি ক্ষণস্থায়ী ফল লাভের জন্য নিজেদের নাম সিঁড়িতে খোদাই করেছে। পাহাড়ে পায়ে হেঁটে ওঠায় ঘুরে ঘুরে বিনা সিঁড়ির যতটা রাস্তা ভাল সিঁড়ির রাস্তা ততটা নয়। সিঁড়ি ভাঙতে মানুষ অল্পেতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তবু সিঁড়ি বানানোর রেওয়াজ অনেক পুরানো বলেই মনে হয়। সিঁড়ি পেরিয়ে আসার পর সাধারণ চড়াই-উৎরাইয়ের রাস্তা শুরু হয়ে যায়। রাস্তার দুই দিকেই গভীর জঙ্গল।

বিস্তর যাত্রী ও তাদের সহায়তায় ব্যাপৃত লোকদের নিয়ে বালাজীর জনবসতি। তিরুপতীর বৈরাগী সংস্থার মূল মঠ এখানেই যাকে আগেকার রাজপ্রাসাদ বলা হয়। মঠে গিয়ে প্রথমে আমার ধ্যান করার ছিল। মঠের বাইরের ভাগে পাহাড়ের গোড়ায় সারিতে অনেকগুলি কুঠরি ছিল যার একটাতে অন্য দুই জন সাধুর সঙ্গে আমারও স্থান হল। ঘটনাক্রমে আমার কুঠরির পাশেই এক আত্মভোলা সাধুকে পেলাম। তিনি কয়েকবছর থেকে সেখানেই থাকছিলেন। কথাবার্তা, গানবাজনায় দেশ-বিদেশ সম্পর্কে তাঁর যা জ্ঞান ছিল, তাতে তিনি ইচ্ছা করলে এই

মঠের প্রভাবশালী ব্যক্তি হয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু এসবের তাঁর দরকার ছিল না। বহুকাল তিনি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভ্রমণ করেছিলেন। এই সময়ে এখানে এক জায়গায় থেকেও তিনি রোজ দুই-চার ক্রোশ দূরে জঙ্গলে চলে যেতেন। কোমরে জড়ানোর কাপড়, কমণ্ডলু ছাড়া একটা শিক, ঝোলায় গাঁজার কল্‌কে, রুমাল ও দেশলাই তাঁর কাছে থাকত। মৌজ হলে বেশ সুরের সঙ্গে গান ধরতেন, 'চার যুগোমে নাম তুমহারা কৃষ্ণকনহৈয়া তুম্‌হীতো হো।' তিনি মুরাদাবাদের মতো কোনো শহরের বাসিন্দা ছিলেন। স্বভাবতই তাঁর ভাষা ছিল পরিমার্জিত। তাঁর যাযাবর মনের সঙ্গে এই বিশেষত্ব আমার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা এনে দিল। বিকেলে আমরা দুজন অনেক দূরে চলে যেতাম। এতকাল গাঁজা ও রুমাল এড়িয়ে চলেছি কিন্তু এখন আর এড়াতে পারলাম না। বস্তুত সেরকম করলে আমাদের সম্বন্ধের অর্ধেক মজাই নষ্ট হয়ে যেত। কখনো কখনো আমরা দুই তিন ঘণ্টা রাত্রি হয়ে যাওয়ার পর ফিরে আসতাম। লোকজন বলত, এই জঙ্গলে বাঘ থাকে এবং এক-আধ বার বসতির পাশের মঠের গোশালা থেকে গরুও ধরে নিয়ে গেছে। এখানে দীর্ঘকাল বসবাসকারী সঙ্গী যদি তা পরোয়া না করেন, তবে আমার পরোয়া কি। বিকেল চারটায় আমরা এই দৈনিক ভ্রমণে বেরোতাম। দিনে আর একটা আড্ডা জুটে গিয়েছিল। বালাজীরমন্দিরের দরজা খোলার সময় থেকে যতক্ষণ তা খোলা থাকত ততক্ষণ বৈরাগী মঠের এক ব্যক্তির সেখানে থাকা আবশ্যিক ছিল। এই ব্যক্তি ছিলেন পঞ্চাশ বছর বয়সী একজন উত্তর ভারতের সাধু। গলায় সোনার শেকল, কানে শেকল-অলা মণিখচিত কুণ্ডল ও জরির মূল্যবান খিলঅত পরে দরজার দক্ষিণ দিকে এসে দাঁড়াতেন। তখন দরজা খুলত। তাঁর নিজের আরামপ্রদ স্থান আর বাগান ছিল যা তিনি খুব সাজিয়ে রাখতেন। 'কৃষ্ণকান্‌হাইয়া' বাবার সঙ্গে আমি একদিন সেখানে গেলাম। হাতীরাম বাবাও রাজার সঙ্গে পাশা খেলতেন। হয়তো তাই সেখানেও পাশা খেলা হত। আমিও খেলায় যোগ দিলাম। খেলার পর ওখানেই খাওয়া-দাওয়ার অনুরোধ। এত কাল এদেশে থেকেও তাঁর ভাত খাওয়ার অভ্যাস হয়নি। দুপুরে আমাকে প্রায়ই সেখানেই খেতে হত। আর সর্বদা পুরিই তৈরী হত। বালাজীতে দশদিন কিংবা পনের দিন ছিলাম, মনে নেই। তার মধ্যে অধিকাংশ দিন আমার দুপুরের ভোজন এখানেই হত।

অন্যান্য মঠের মতো বালাজীর 'অধিকারী'রও মোহন্তর পরই মঠের ব্যাপারে যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। অধিকারীজী এখানেই বেশী থাকতেন। তাঁর দুটো পা বেকার ছিল। কৃষ্ণকান্‌হাইয়া বাবার যখনই গাঁজায় টান পড়ত, তখনই তিনি অধিকারীর কাছে চলে যেতেন। অধিকারীজী তাঁকে স্নেহ করতেন। প্রকৃতপক্ষে, মোহন্তের চেয়ে অধিকারীজী সাধুমহলে অধিক জনপ্রিয় ছিলেন। বালাজীর মধ্যম শ্রেণীর সাধু কর্মচারীদের হাতে যখন অনায়াসে চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা হয়ে যেত, তখন অধিকারী সম্পর্কে বলাই বাহুল্য।

আমার ধারণা হনুমানজীর স্থানই ছিল বালাজীর সবচেয়ে মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য। সেখানে বার মাসই 'জনু বসন্ত ঋতু রহিয়ো লুভাঈ।' অনেক গাছপালা, চারদিকে সবুজ, জলপূর্ণ জলাশয় এবং আশেপাশে অরণ্যে ঢাকা পাহাড় ছিল।

বালাজীতে ভালই থাকলাম। চলে যাওয়ার সময় আমার মন বিষণ্ণ হয়েছিল। কিন্তু তা হলেই বা কি হবে, সব জায়গায় এক এক বছর থাকতে হলে হাজার হাজার বছর বেঁচে থাকাও দরকার। হাজার বছর আয়ু হলেও কে জানে তখন এক বছর হয়তো মানুষের চোখে দশ-পনের দিনের মতো লাগবে।

বালাজী থেকে আবার তিরুপতী এবং সেখান থেকে সামনের যাত্রা শুরু হল। এখন আর আগেকার মতো হাতপাতা ভিখিরি ছিলাম না। পাঁচ টাকা হাতে থাকতেই আমি পয়সায় তার করে দিতাম আর তৃতীয় দিনে পঁচিশ টাকার মানি অর্ডার এসে যেত। তবু যে টাকার ওপর

নির্ভর করে ভ্রমণ করতে চায়, সে ভ্রমণের আসল মজা পায় না। আখেরে লংকার ঝালই তো আসল স্বাদ। এ সময় রেনগুণ্টা থেকে যখন আমি স্বামীকার্তিকের দিকে গেলাম, তখন আমার সঙ্গে আরো চার পাঁচজন বৈরাগী ছিল। আচারীদের অতিরিক্ত ছোঁয়াছুঁয়ি, 'আমি বড়, তুই ছোট' এই নীতিও আমাকে তিরুপতীতে আচারীদের খাটালে যেতে দেয়নি। একটা লোটা বা কমণ্ডলু সম্বল করে সবচেয়ে কম মালপত্র নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর ইচ্ছা যে মানুষের, সে আচারীদের নানারকম নিয়ম-কানুন মাথায় নিয়ে বয়ে বেড়াবে কি করে? বৈরাগীদের এ ব্যাপারে কিছু স্বতন্ত্রতা ছিল, যদিও সন্ন্যাসীদের মতো অতটা নয়। আমরা চার পাঁচ জন বৈরাগী ছিলাম। কিন্তু পরস্পরের হাতে রুটি খাওয়ার আগে নিজের জাতির প্রমাণপত্র আনানো আবশ্যিক ছিল না। স্থান, নাম, দ্বারা-আখড়ার উত্তর সঠিক হলে বোঝা যেত—আসল সাধু, নকল নয়।

স্বামীকার্তিক মন্দির পাহাড়ের ওপর রেনগুণ্টা থেকে কিছু দূরে, হয়তো এক স্টেশন পরে ছিল। কি ধরনের মূর্তি, কি রকম মন্দির, মনে নেই। সম্ভবত পাশে ছত্রম্-তে সদাব্রত ছিল। সেখানে আমরা রান্না করে খেয়েছিলাম।

চিঙ্গলপট থেকে আমরা পক্ষীতীর্থে গিয়েছিলাম। উত্তর ভারতের সাধুরা দক্ষিণের অধিকাংশ নামকে অন্য নামে প্রসিদ্ধ করে দিয়েছে। তাই বলতে পারব না পক্ষীতীর্থের তামিল নাম কি। সেখানে এক প্রাকার ঘেরা বিশাল মন্দির আছে। কিন্তু বৈরাগীদের পক্ষীতীর্থ তার পাশের পাহাড়ের ওপর। প্রত্যহ বেলা দশটায় পূজারীরা কিছু খাদ্য তৈরী করে ঐ পাহাড়ের পাশে নিয়ে যায়। তারপর দুটো বড় বড় পাখি চক্কর দিতে দিতে নেমে আসে এবং পূজারী তাদের খাওয়ায়। বলা হয়, এই পাখি সাধারণ পাখি নয়। এঁরা বিষ্ণুর বাহন সাক্ষাৎ গরুড় ও তাঁর ধর্মপত্নী। আমার তো মনে হয়েছিল চামরশকুনি (সাদা শরীর, কালো পুচ্ছ-অলা ছোট শকুনি)। সেখানে বহু শ্রদ্ধাশীল মানুষ গরুড় মহারাজকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করত। নিচের বড় মন্দির সম্পর্কে শুধু এই মনে আছে যে, মন্দিরের কোনো ঘরে বাদুড় ভর্তি ছিল এবং দুর্গন্ধের জ্বালায় নাক ফেটে যাচ্ছিল।

কাঞ্চীপুরের (কাঞ্জীভরম) শিবকাঞ্চী, বিষ্ণুকাঞ্চী নগরার্ধের মন্দিরগুলোতেও গিয়েছিলাম, কিন্তু সে-সময়ের কোনো কিছু মনে নেই। শ্রীরংগম ও মাদুরা হয়ে রামেশ্বরমের দিকে গেলাম। রামেশ্বরমের রেলের পুল তখনো তৈরী হয়নি। যাওয়ার সময় এক স্টিমারে অন্য পারে গেলাম। খাকচকে ডেরা বাঁধলাম। বেশীর ভাগ বৈরাগীদের স্থান ঐখানেই, যেখানে তুলসীদাসের রামায়ণ প্রচলিত—যদি বাঙালি গৌড়ীয় সাধুদের বৈরাগী বলে গণ্য করা না হয়। গুজরাতে বৈরাগীদের স্থান অনেক। মহারাষ্ট্রেও তাদের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু সেখানকার সাধুরা অধিকাংশ হিন্দি ভাষাভাষী। মাদ্রাজের দিকে বৈরাগীদের স্থান কম। সেই কারণে সেখানে তাদের কষ্ট হয়। বস্তুত, স্থান বলতে কি—ঘুরে বেড়ানো পল্টনের স্থায়ী ছাউনী। সেখানে পৌঁছলেই সাধুর মনে হয় সে নিজের বাড়িতে এসেছে। যদি স্থানীয় সাধুর কাছে খাওয়া-দাওয়ার কিছু থাকে তবে সে তা নিয়ে হাজির হয়। যদি তা নাও থাকে তবে সে এক লোটা জল নিয়ে এসে দাঁড়াতে পারে। অভ্যাগত তাতে অসন্তুষ্ট হবে না। অভ্যাগতের কাছে আপনার বলতে যা কিছু থাকবে তা রান্না করবে এবং স্থানীয় সাধুকেও খাওয়াবে। দক্ষিণে বৈরাগী সাধু কম হওয়া সত্ত্বেও সেখানে ছত্রম্ আর সদাব্রত যথেষ্ট, যার ফলে যাত্রা অসহনীয় হয়ে ওঠেনা। রামেশ্বরমে বৈরাগী সাধুদের দুয়েকটি ছোট ছোট স্থান আছে—খাকচক ও রামঝরোখা। খাকচক বসতিতে হওয়ার জন্য অধিকাংশ সাধু সেখানেই যায়। সেখানে দুয়েক দিন সাধুর সেবাও হয়। দাতা সম্ভবত অধিকাংশই উত্তর ভারতীয় যাত্রী। রামঝরোখা বসতির বাইরে একটি জায়গা। তখন সেখানে এক চালাক-চতুর সাধু থাকতেন। তিনি দুই চারজন অভ্যাগত সাধুকে ডেকে নিতেন। তারপর যাত্রীদেরকে 'আমার এখানে, বুঝলে

বাবা, এত লোক আছে, কিছু খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কর,' বলে জিনিষপত্র আনতেন। সন্ধ্যায় সাধুদের এক মুঠ করে ছোলা দিয়ে বিদেয় করে দিতেন। পরদিন আবার রামেশ্বর থেকে অন্য লোক ফাঁসিয়ে আনতেন। এই ছিল তাঁর কাজ।

রামেশ্বর মন্দিরের বিশাল বারান্দা ও ছাদ থেকে কুণ্ডপরিক্রমা দেখে বুঝতে পারতাম, যে মুসলমান শাসনকালে যে সব মন্দির ভাঙা হয়েছে তা গুণতির মধ্যে না আনলে মন্দির নির্মাণে উত্তর ভারত দক্ষিণ ভারত থেকে অনেকটা পিছিয়ে আছে। রামেশ্বরের প্রধান গর্ভমন্দিরের সামনে কোন মণ্ডপ তৈরী হচ্ছিল। ভেতরে, শিবলিঙ্গে লোকে জল ঢালছিল। অনেকে কাশী, হরিদ্বার ও গঙ্গোত্রীর গঙ্গাজল ঢালছিল।

রামেশ্বর থেকে কিছু সাধুর সঙ্গে আমি ধনুষ্কোডি যাওয়ার জন্য বেরোলাম। স্টেশনের রাস্তায় দুয়েকটি লোকের মধ্যে ব্রহ্মচারী দয়াশংকর নামে এক যুবক সাধুর সঙ্গে দেখা হল। নামটা ভুল হতে পারে (ওটা তাঁর হাতে খোদাই করা ছিল)। তাঁর শরীরে একটা লম্বা আলখাল্লা, মাথায় ছোটমত গামছা, হাতে পিতলের কমণ্ডলুতে একটা শংখ ছিল। দোহারা চেহারা, ক্ষীণকায়, গৌরবর্ণ, বয়স ২৬-২৭-এর মতো। শহুরে হিন্দি বড় অনায়াসে বলছিলেন। মনে হল তাঁর জন্মস্থান মথুরা। তিনিও ধনুষ্কোডি যাচ্ছিলেন। আমরা রামেশ্বর দ্বীপের দূর পর্যন্ত বিস্তৃত বালি, কাঁটা-অলা বাবলা ও তাল গাছ দেখতে দেখতে ট্রেনে রওনা হলাম। স্টেশনে নেমে কিছু দূরে তাল পাতায় ছাওয়া এক বৈরাগী-কুটির ছিল। হালে তৈরী হয়েছিল এই কুটীর। তাই এতে কোনো জিনিষপত্র ছিল না। সেখানে দূর থেকে মিঠে জল আনতে হত। যাহোক্, এই তপ্তভূমিতে তালপাতার ছায়াও সামান্য ব্যাপার ছিল না। কুটির থেকে কিছুটা দূরে দক্ষিণ ও পশ্চিম এই দুই দিক দেখিয়ে বলা হয়েছে এ হল 'রত্নাকর' ও 'মহোদধির' সঙ্গম। দুপুরে ও সন্ধ্যায় সমুদ্রে স্নান হল এবং রাত্রিতে এখানেই বিশ্রাম।

ফিরে আসার সময় ব্রহ্মচারী দয়াশংকরের সঙ্গে ভাল করে আলাপ হল। কয়েক মাস হল তিনি দক্ষিণে এসেছেন। আজকাল পামনে আছেন। বৈদ্যের কাজ করেন। ফলে অনায়াস বিচরণের জন্য তাঁর অনেক সুবিধা। তাঁর সাথে এক কালো মতো লোক ছিল। সে ব্রহ্মচারীর গাঁজা কল্কে দেশলাইয়ের খাজাঞ্চী। 'বৈরাগ্য'তে এসে সে পুলিশের চাকরি ফেলে ব্রহ্মচারীর সঙ্গ নিয়েছে। আমিও উর্দু বলতে পারতাম। আমার অনেক শেরও মনে ছিল। শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মচারী আমাকে পামনে গিয়ে কিছুদিন থাকতে বলেন। এইরকম নিমন্ত্রণ যদি প্রত্যেক শত মাইলের পরে পাওয়া যেত তবে আমি এক-এক জায়গায় দুই সপ্তাহ করে কাটাতে প্রস্তুত ছিলাম।

পামন রামেশ্বর দ্বীপের অন্তিম বসতি। এরপর কয়েকমাইল জুড়ে গভীর উপসাগর এবং তারপর জম্বুদ্বীপের (ভারত) স্থলভাগ পড়ে। পামনের বেশীর ভাগ বাসিন্দাই মুসলমান। ব্রহ্মচারীও এক মুসলমানের বাড়িতেই থাকতেন। মুসলমানরা হিন্দুস্থানী বলত। এতে তামিল-না-জানা ব্রহ্মচারীর সুবিধা হত। বেশীর ভাগই ঘর খড় ও বাঁশের ছিল। ব্রহ্মচারীর অর্থের অভাব ছিল না। দৈনিক দশ, পনের, বিশ টাকা এসে যেত। রোজ তাঁর পাঁচ-সাত টাকা গাঁজাতেই হাওয়া হয়ে যেত। তাঁর কাছে শুধু দুইটি ওষুধ ছিল। এক জমালগোটার জুলাপ আর দুই সেঁকো বিষ ভস্ম। মাথাধরা, পেটব্যথা প্রভৃতি মামুলী রোগ থেকে কুষ্ঠ, ন্যাবা, যক্ষ্মার মতো সাঙ্ঘাতিক রোগের জন্যও তিনি অনুপান বদল করে ঐ ওষুধই দিতেন। বিনা পয়সায় খুব কমই কাউকে ওষুধ দিতেন। ওষুধ দেওয়ার আগে কি দিতে হবে তা ঠিক করে নিতেন। দুই-তৃতীয়াংশ অথবা কম হলে অন্তত অর্ধেক আগেই নিয়ে নিতেন। আর বলে দিতেন যে এত দিন পরে রোগীকে রোগমুক্তি স্নান করিয়ে দেবেন, সেই দিন বাকিটা দিতে হবে। তাঁর ওষুধে অনেক

রোগে আশ্চর্য ফল হয়েছিল। তাই লোকেরা খুশী হয়েই টাকা দিয়ে চিকিৎসা করাত। পামনে যে মুসলমানদের সঙ্গে তিনি বাস করতেন, তারা দোভাষীর কাজ করে দিত। কিন্তু অন্যান্য জায়গায় রোগীরা নিজেরাই দোভাষী নিয়ে আসাত। মুসলমানের সঙ্গে থাকার জন্য লোকজন, বিশেষ করে ব্রাহ্মণেরা তাঁর কিছু সমালোচনা করতে পারে, সেই ব্যাপারে ব্রহ্মচারী পরোয়া করতেন না।

মুসলমানের বাড়িতে থাকলেও ব্রহ্মচারী নিজে রান্না করে খেতেন নয়তো কোনো সাধু থাকলে তাকে দিয়ে রান্না করাতেন। আর এটা আমাদের মতো মানুষের পক্ষে কষ্টের ব্যাপার ছিল। দুধ, ঘি, আটা যত চাই, সব ছিল। কিন্তু তা রান্না করার লোকের দরকার ছিল। রন্ধনশিল্প আমার বিশেষ ভাল লাগত না। কিন্তু তা আমি একেবারেই জানতাম না, তা বলতে পারব না। দিনে একবার ক্ষীর পরোটা অথবা কোনো অল্পশ্রমসাধ্য জিনিষ বানিয়ে নিতাম। সেখানে কখন দিন কখন রাত বুঝতেই পারতাম না। সকালে যখন ঘুম ভাঙত, তৈরী গাঁজার কল্‌কে পেতাম। আর একটি কল্‌কে নিভে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আর এক কল্‌কে জ্বলত। রাত্রিতে ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত এই অবস্থা চলতে থাকত। আমার মনে হয় রাত্রিতে তিন চার ঘণ্টা মাত্র আমার মস্তিষ্ক গাঁজার নেশা থেকে মুক্ত থাকত। ব্রহ্মচারীর ওষুধের চমৎকারিত্ব দেখে আমার মনে হল এই চিকিৎসা শিখে নিই। ব্রহ্মচারী শিখিয়ে দিতেও চেয়েছিলেন কিন্তু বলছিলেন যে জমালগোটা ও সেঁকো বিষ ভস্ম ব্যবহার করা আপনি বই থেকেও শিখতে পারেন। কিন্তু সামনে বানিয়ে না দেখানো পর্যন্ত মুখে বলে কোনো লাভ নেই। তিনি ঠিকই বলেছিলেন। বস্তুত আমার তিন চার সপ্তাহ পামনে থেকে যাওয়ার প্রধান কারণ ছিল এই ভস্মবিধি শেখার ইচ্ছা। গাঁজা খাওয়া ও আড্ডা মারা ছাড়া সেখানে আমার আর কোনো কাজ ছিল না। সম্ভবত উর্দুর কোনো কবিতার বই ব্রহ্মচারীর কাছে ছিল, আমি তা পড়তাম। আমাদের বাসস্থানের কাছে এক মুসলমান কুষ্ঠরোগী ছিল। ব্রহ্মচারীর তাঁকে বিনা পয়সায় ওষুধ দেওয়া শুরু করার কথা ছিল। দুয়েকটা কাক তাঁর খুব পোষ মেনে গিয়েছিল। তারা তাঁর মাথা ও কাঁধে বসত। ছেলেবেলা থেকে কাককে আমি খুব হুঁশিয়ার জাতি বলেই জানতাম। শুনেছিলাম একবার এক মাদী কাক তার বাচ্চাদের শেখাচ্ছিল—'কেউ পাথর তোলার জন্য মাথা নোয়ালেই উড়ে যাবে।' বাচ্চারা জিগ্যেস করল— 'কিন্তু মা। সে যদি বাড়ি থেকেই পাথর নিয়ে আসে?' মা বললেন—'তবে ত তোমাদের আর শেখাবার কোনো প্রয়োজন নেই।' এখানে এই কাকদের কুষ্ঠরোগীর মাথায় ও কাঁধে বসতে দেখে কাক জাতির পক্ষেও তার ধূর্তামির ব্যতিক্রম মনে পড়ল।

ব্রহ্মচারী জিনিষপত্র আনিয়ে ভস্ম বানানো শেখাবার ব্যবস্থা করছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে আমার রুচি তা থেকে উঠে গিয়েছিল। দুনিয়ার সব ব্যবসা শেখার দরকার কি, আমি যখন সব ব্যবসা করতে পারব না? কোনো কোনো ব্যাপারে ব্রহ্মচারীর ও আমার মিল ছিল। উর্দু, শহুরে ভাষা ও জীবনের আমরা সমান ভক্ত ছিলাম। তাই আমি চলে যাব, সেটা তিনি চাইবেন কি করে?

চলে যাওয়ার জন্য আমরা পামন খাড়ির ওপর নতুন তৈরী পুল দিয়ে ট্রেনে যাওয়াই পছন্দ করলাম। ব্রহ্মচারী রামনদেও নিজের জন্য একটা আস্তানা করে রেখেছিলেন। তিনিও আমার সঙ্গেই এলেন। আস্তানার আর কি—বসতি থেকে দূরে খেজুরের কাঁটা-অলা ঝোপ কেটে পনের বিশ হাত লম্বা ও চওড়া একটা জায়গা সাফ করে রাখা হয়েছিল। আর সেখানে তালপাতার এক ঝুপড়ি পড়ে ছিল। ব্রহ্মচারী কখনো এলে সেখানেই থাকতেন। ঝুপড়ি ছিল মাদুরা থেকে রামনদ হয়ে রামেশ্বর যাওয়ার সড়কের ধারে। সেই জন্য পায়ে হেঁটে চলার সাধু কখনো কখনো এসে যেত। বস্তুত এই ভেবেই ব্রহ্মচারী এই জায়গাটা পছন্দ করে ছিলেন। সাধু এসে গেলে তাঁর খুব আনন্দ হত। ব্রহ্মচারী ছিলেন সেই সব লোকদের মধ্যে যারা আজকের আমদানিকে

কালকের জন্য রেখে দেওয়াকে অপরাধ মনে করে। সাধুদের খাইয়ে-দাইয়েও তাঁর আনন্দ হত। তীর্থযাত্রী দুই শ্রেণীর হয়ে থাকে। নিয়মপূর্বক কোনো সম্প্রদায়—বৈরাগী, উদাসী, সন্ন্যাসী প্রভৃতির মধ্যে প্রবিষ্ট সাধু যাদের কাছে নিজের সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার শেখা অত্যন্ত জরুরী এবং যাদের সম্প্রদায়ের সর্বজনীন মতামত মেনে চলা বাধ্যতামূলক। তাদের লজ্জা, সংকোচ ও আত্মসম্মানের কথাও খুব মনে রাখতে হয়। এভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়ার লাভ এই যে সারা ভারতবর্ষে জায়গায় জায়গায় নিজেদের সম্প্রদায়ের স্থানে দাপটের সঙ্গে আর অন্য স্থানে সসম্মানে তাদের ইচ্ছামতো থাকার সুযোগ পাওয়া। এই সব স্থান পয়সাকড়ি ছাড়া যাত্রীদের জন্য খাওয়া ও থাকার হোটেল। এতে বোঝা যায় যে এই সব সংস্থা সাধুদের জন্য ভ্রমণ কি রকম সহজ করে দিয়েছে। ভারতের এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে এ ধরনের মঠ বা সাম্প্রদায়িক স্থান নেই। হিন্দি ভাষাভাষী হিন্দু দেশে এর সংখ্যা অনেক বেশী, হিন্দুদের সংখ্যা অনুসারে পাঞ্জাব, সিন্ধু সীমান্তেও যথেষ্ট। গুজরাত, কাথিয়াওয়াড় সাধু-সেবার জন্য খুব প্রসিদ্ধ স্থান বলে গণ্য। আসাম, বাঙলা, উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্রেও এমন স্থান যথেষ্ট। দ্রাবিড় ভাষাভাষী চার দেশে অবশ্য এমনি মঠ কম আছে। সেদিক দিয়ে, এইরকম মঠ কাবুল, কান্দাহার পর্যন্তই শুধু নয়, সুদুর পশ্চিম কাস্পিয়ান সমুদ্রের তীরে বাকুতেও কয়েক বছর আগে মজুত ছিল।

রামনদের ব্রহ্মচারীর কাছ থেকে বিদায় নিলাম। একবার আবার তিরুমিশী ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতে পারতাম। কিন্তু আমার মত **মুক্ত-মেজাজ মুসাফির-রুচির** মানুষের পক্ষে আচারীদের আচার-ব্যবহার বড় বন্ধন—একথা এখনকার বালাজী থেকে রামেশ্বরে টাট্‌কা ভ্রমণ থেকেও আমি বুঝতে পেরেছিলাম। সেই জন্য তিরুমিশী ফিরে যাওয়ার খেয়াল ছেড়ে দিলাম। ভ্রমণের মতো পড়াশোনার রুচিও আমার স্বভাবে আছে। তাই পড়াশোনার তাগিদ বেশী তীব্র হয়ে ওঠার আগেই কিছুটা ভ্রমণ করে নেওয়াটা আমি জরুরী মনে করেছিলাম। এখন আমার গতি ছিল দ্বারিকার রাস্তায় যে সব তীর্থ ও দর্শনীয় স্থান পড়বে সেইদিকে।

বাঙ্গালোর—রাস্তায় প্রথম বাঙ্গালোরে নামলাম। শহর দেখে ট্রেনে আগে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। বাজারে খাওয়া-দাওয়া সেরে ফেলার জন্য একটা জায়গা খুঁজছিলাম। একটা মিষ্টির দোকান পেলাম। মিষ্টির দোকান দ্রাবিড় দেশে নতুন জিনিষ। যে দেশে জল ও লুচি নিয়ে বরাবর ছোঁয়াছুঁয়ি বিচার চলে, সেখানে মিষ্টির দোকান কি করে চলতে পারে? গিয়ে ইচ্ছেমতো পেটভর্তি পুরি-মিঠাই খেলাম। পয়সা দেওয়ায় হালুইকর বলল, 'না মহারাজ, আপনার কাছ থেকে পয়সা নেব না। উত্তর ভারতের সাধুদের একবার খাইয়ে-দাইয়ে সেবা করা আমার নিয়ম।'

বিজয়নগর—যতদূর মনে পড়ে বাঙ্গালোরের পরে বিজয়নগরের (হাম্‌পি) ভগ্নাবশেষের জন্য ট্রেন থেকে যেখানে নামার কথা সেখানে নামলাম। সম্ভবত স্টেশনের নাম ছিল হসপেট। ধর্মশালায় কিছু 'খড়িয়াপলটন' সাধুর সঙ্গে দেখা হল। 'খড়িয়াপলটন' এই সাধুদের বিশেষ নাম। অনেক স্ত্রী-পুরুষ কোনো সম্প্রদায়ের নিয়ম অনুযায়ী দীক্ষা না নিয়েই সাধুর বেশ তৈরী করে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। এদের সাম্প্রদায়িক আচার ব্যবহার ও বেশভূষার শিক্ষা নিয়মমতো হয়নি, তাই তারা বাইরে থেকে সাধুদের দেখে তাদের নকল করতে চায়। নকল করতে হলেও সাধুদের মধ্যে যে ভিন্নতা আছে—যা খুব সূক্ষ্ম তা জানা জরুরী। কিন্তু এতে তাদের অভিজ্ঞতার অভাব প্রকাশিত হয়। সাধুরা দেখেই বুঝে নেয় এরা ভণ্ড সাধু। কাঁধের দুই দিকে লটকানো ঝোলাকে বলে খড়িয়া। কোনো সম্প্রদায়ের সাধুই তা ব্যবহার করে না। এই সব তীর্থবাসী খড়িয়া নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তাই এদের নাম 'খড়িয়াপলটন' হয়ে গেছে। সাধুদের মধ্যে যারা স্ত্রীলোক তারা স্ত্রীসন্ন্যাসিনীদের সঙ্গে এবং যারা পুরুষ তারা পুরুষ সাধুদের সঙ্গে

চলাফেরা করে। খড়িয়াপলটন এই নিয়ম থেকে নিজেদের মুক্ত বলে মনে করে। তাদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ দুইই থাকে।

খড়িয়াপল্টনদের কাছে জানতে পারলাম, কিষ্কিন্ধ্যা বিজয়নগরের পাশের বসতি এখান থেকে বেশী দূরে নয়, পাকা সড়ক চলে গেছে। বোধহয় গাড়ি-ঘোড়াও পাওয়া যাচ্ছিল এবং আমার কাছে পয়সারও কমতি ছিল না। তা সত্ত্বেও পায়ে হেঁটে যাওয়াই আমার পছন্দ হল। বোঝা নিয়ে চলারও বিরোধী আমি। শরীরকে একেবারে হাল্কা রাখতেই আমার ভাল লাগে। খালি হাতে চলতে মজা লাগে আমার। রাস্তা ও তার আশেপাশের জায়গাগুলির কথা আমার মনে নেই। কেবল মনে আছে যে আমি কন্নড় ভাষাভাষী প্রদেশে হাঁটছিলাম। বিকেল চারটা নাগাদ আমি এক ভগ্নাবশেষের কাছে পৌছলাম। একটা কবর ও একটা গাছের কিনারে বড়োমতো চত্বর দেখলাম। অনেকদিন তার কোনো মেরামতী হয়নি। সেখানে এক শাহ্ সাহেব (মুসলমান ফকির) বসেছিলেন। তিনি হাত উঠিয়ে 'দর্শন সফা' বললেন, আমিও 'মিজাজে বফা' বলে জবাব দিলাম। হিন্দু-মুসলমান সাধুদের পারস্পরিক অভিবাদনের এই রীতি। শাহ্ সাহেব সাগ্রহে আমাকে বসালেন। গাঁজার কল্কে তৈরী করলেন। দয়াশংকর ব্রহ্মচারীর ঘরের কল্কেতে মুসলমান গৃহস্থেরাও এসে যোগ দিত, তাই মুসলমান সাধুদের কথা আর নতুন করে বলার কি আছে? কলকেতে টান দিতে দিতে আমাদের কথাবার্তা চলতে লাগল অনেকক্ষণ। শাহ সাহেব উত্তর ভারতেরই কোনো জায়গার লোক। দক্ষিণের মুসলমানদের খাওয়া-দাওয়া, ভাষা ও কথাবার্তা সম্পর্কে তাঁর কড়া অভিযোগ ছিল। বলছিলেন, 'তেঁতুল আর লংকা। তোবা তোবা। কমবখ্‌তেরা খাওয়ার তরীকা পর্যন্ত জানে না।' আমরা যখন কথা বলছিলাম তখন অন্য আর এক সাধু এলেন; তিনি তাঁর সঙ্গে যাওয়ার জন্য আমাকে আহ্বান করলেন। ওরা তিন-চার জন সাধু নদীর পারে এক পরিত্যক্ত পাষাণগৃহে পাঁচ-সাত দিন ধরে ছিলেন। শাহ্ সাহেবের চত্বর থেকে যখন আমি রওনা হলাম তখন সূর্যাস্ত হয়ে গিয়েছিল। আমাদের এক-আধ জায়গায় নগরের ভাঙা পাথরের প্রাকার পেরিয়ে যেতে হল। আমি ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়েছিলাম ঠিকই কিন্তু তখনো ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখতে শিখিনি। তবু বিজয়নগরকে ঐতিহাসিক স্থান মনে করে দেখতে এসেছিলাম। সাধুদের বাসস্থান সত্যি সত্যিই আত্মভোলাদের আখড়া ছিল। গোঁসাই (সন্ন্যাসী), উদাসী, বৈরাগী সম্প্রদায়ই সেখানে জড়ো হয়েছিল। আমি ছাড়া আর সবাই জটাধারী বিভূতিমাখা ছিল। মাঝখানে কাঠের ধুনি জ্বলছিল। তার চারদিকে আমরা সবাই বসেছিলাম। এখানে ব্রহ্মচারী দয়াশংকরের মতো অখণ্ড কল্কেচক্র চলতে পারেনি। কিন্তু দুই চার কল্কেতে কোনো বাধা ছিল না। বাকি সময়টা 'শুকনো তামাক' চলছিল। কথাবার্তা কম হচ্ছিল না। সবাই আখড়ার পুরানো লোক এবং দুনিয়া ঘুরেই জীবন কেটেছে। ধুনিতে আটার মোটা রুটি (টিক্কর) সেঁকা হল। তরকারি অথবা ডাল ছিল কিনা মনে নেই।

রাত্রিতে তো আমি কিছু দেখতে পাইনি। সকালবেলা স্নান সেরে ঘুরে ঘুরে প্রাচীন বিজয়নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে শুরু করলাম। সেই সময়ে পুরাতাত্ত্বিকেরা উল্লেখযোগ্য ধ্বংসাবশেষের ওপর এত সাইনবোর্ড লাগায়নি। সাধুদের মধ্যে যারা আগে এসেছিল, তারা প্রত্যেক ধ্বংসাবশেষের পরিচয় কিংবদন্তি অনুসারে দিচ্ছিল— 'এ হল সুগ্রীবের কাছারি', 'এটা বালির রাজদরবার', 'এটা তারা-মহল', 'এটা অঙ্গদকুমারের মহল'...। সবই ত্রেতাযুগের জিনিষ, সবই বালির কিষ্কিন্ধ্যাপুরীর ইমারত। কিন্তু আমি যে চলেছিলাম বিজয়নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে। সেই ব্যাপারে কিছু বলার মতো কেউ ছিল না। তবুও এই মন্দির ও মহল যে বিজয়নগর রাজ্যের সমর্থক তাতে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না। বৈষ্ণব বিরোধী পুস্তিকাগুলি পড়ার সময় তাতে ত্রিপুন্ড্র ও উর্ধ্বপুণ্ড্রের (আড়ী-বেড়ী টীকার) ঝগড়াও লক্ষ করেছিলাম।

আমার মনে হয়েছিল বৈষ্ণবদের উর্ধ্বপুণ্ড্র অনেক পরের, ত্রিপুণ্ড্রই সনাতন কাল থেকে চলে আসছে। আমি এক ধরণের উর্দ্ধপুণ্ড এখানকার মন্দিরে আঁকা দেখেছি। বেশ কিছু মাইল চলে যাওয়ার পরও ধ্বংসাবশেষ শেষ হয়নি এবং তার মন্দিরগুলি ও সামনের সারিবদ্ধ পাথরের ঘর অথবা বাজার ভেঙে যাওয়া সত্ত্বেও যথেষ্ট রূপরেখা থেকে গেছে। মন্দির তো অনায়াসেই মেরামত করা যেতে পারে। নগরের মাঝখানে সব টিলার ওপরে কোনো না কোনো মন্দির ছিল। এই মন্দিরগুলির মধ্যে এক জায়গায় আমরা দুপুরে পৌঁছলাম। স্থানটি ছিল আচারীদের। আচারী—তিন লোকসে মথুরা ন্যারী—এই সিদ্ধান্ত অনুসারে নিজেদের দেড়চালের খিচুড়ি আলাদাই রাঁধে। অন্য সম্প্রদায়ের স্থানে তাদের খাওয়া-দাওয়া হতেই পারে না। তাই অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকদেরকে নিজেদের ওখানে এনে খাওয়ানোর কি দরকার—এই ভেবেই বৈরাগী-উদাসী সন্ন্যাসীদের অতিথি সৎকারও তাদের ওখানে হয় না। হলেও তা বেগার দেওয়ার মতো। সেই স্থান—রামশিলা কিংবা স্ফটিকশিলা-এর অধিকারী অন্যান্য সাধুদের জন্য ভোজনসামগ্রী দিয়ে দিলেন আর আমাকে খেতে ডাকলেন। এই পার্থক্যের কারণ কি হতে পারে? মনে হয় জটা ও বিভূতি না থাকায় এ রকম করে থাকতে পারে।

দুপুরের পরে আমরা তুঙ্গভদ্রার তীরে গেলাম। নদী পার হওয়ার জন্য সূচীশিল্প পরিশোভিত পুরোপুরি চামড়ার নৌকা ছিল যাতে এক সঙ্গে তিন চার জন বসতে পারত। নদীতে যেখানে সেখানে জলের ওপরে ও নিচে পাথরের চাঁই দেখে চামড়ার নৌকার উপযোগিতা বুঝতে পারলাম। এখন আমরা হায়দরাবাদ রাজ্যের এক বড় গ্রাম অথবা মফঃস্বল শহরে ছিলাম। সেখানে অনেক দোকান ও পাকা বাড়ি ছিল। লোকজন এর নাম বলল কিষ্কিন্ধ্যা (আজকালকার)। রাত্রিতে আমরা পম্পা সরোবরের পাড়ে কাটালাম। একটা ছোট পুকুরে—যাকে পম্পা সরোবর বলা হত—এক বৈরাগী-স্থান ছিল। পাঁচ-দশ জন সাধু এখানে বরাবর থাকত। বাসস্থান এবং মন্দিরও ছিল। সম্ভবত অনেক গরুও ছিল। অভ্যাগত সাধুদের সেবা হত। এই থেকে বুঝতে পারলাম যে কর্ণাটকে উত্তরের সাধুদের কিছুটা চলে যায়।

সকালে উঠে স্নান-'পূজা'র পরে আমি আশেপাশের পাহাড়ে ঘুরে বেড়ালাম। এক ছোট পাহাড়ে বলা হল,অঞ্জনাগুহা আছে। এখানে অঞ্জনা হনুমানকে প্রসব করেছিল। মঠ থেকে কিছু দূরে নুয়ে পড়া আখের খেত ছিল। সম্ভবত খাওয়ার জন্য দাম দিয়ে অথবা বিনা দামে দুয়েকটা পাওয়া গিয়েছিল।

পম্পাসরোবর থেকে নদী পেরিয়ে আর এক বার হাম্পীর (বিজয়নগর) ভগ্নাবশেষে আসতে হয়েছিল। মনে আছে ধ্বংসাবশেষে বিজাপুরের কোন মহল অথবা মসজিদও দেখেছিলাম যা অপেক্ষাকৃত সুরক্ষিত অবস্থায় ছিল।

বাগলকোট—হুসপেট থেকে আবার ট্রেনে রওনা হলাম। পরসায় গুরুজীর কাছে জেনেছিলাম যে তাঁর এক সাদিক (ধর্ম-কর্ম লেখা সাধক) চেলা বাগলকোটের মোহন্ত। এখানেও বাগলপুরের মোহন্তর সাধুসেবার খুব খ্যাতির কথা শুনেছিলাম। আর আমার টাকাও ফুরিয়ে যাচ্ছিল। তাই কোথাও দু-চারদিন থেকে টাকা আনানোর প্রয়োজন ছিল। বাগলকোট সোজা রাস্তায় ছিল না। যতটা মনে পড়ে গডগ রাস্তায় পড়েছিল। কিন্তু আমি সেখানে নামিনি। স্টেশন থেকে মঠে পৌঁছতে কোনো অসুবিধা হয়নি। বাগলকোটে অনেক মারোয়াড়ি দোকানদার আছে এবং হিন্দিভাষা-ভাষীদের পাদরী তো আমরা ছিলামই।

আমি পরসার মোহন্তের শিষ্য জেনে মোহন্ত বৈষ্ণব দাস (হয়তো তাই তাঁর নাম ছিল) খুব প্রসন্ন হলেন। আমার গুরুজী শুধু তাঁর 'সাদিক' গুরুই ছিলেন না, গুরুজীর পরামর্শেই তাঁর মোহন্তপদ মিলেছিল। তাই তিনি সেই ব্যক্তির শিষ্য ও উত্তরাধিকারীকে খুব খাতির করবেন না

কেন? এমনিতেই বাগলকোটে সাধুদের খুব খাতির করা হত। আর তাঁদের তিনদিন পর্যন্ত থাকার ঢালাও অনুমতি ছিল। অভ্যাগতদের কোনো কাজ করতে হত না। অন্য জায়গায় রান্নার সামগ্রীর ব্যবস্থা করা ও আরো কিছু ছোটখাট কাজ করার দরকার হত। কিন্তু এখানে রাত তিনটায় মোহন্তজী উঠে যেতেন। স্নান পূজার পর নিজের এক শিষ্যের সঙ্গে অন্ধকার থাকতেই তিনি রান্নাঘরে ঢুকে যেতেন। পুরি তরকারি, সঙ্গে হালুয়া অথবা মালপোয়ার মধ্যে অন্তত একটি বারমাসই তৈরি হত। কাঁচা রান্না খাওয়ানো মোহন্তজীর জ্ঞানবিরুদ্ধ ছিল। বাগলকোটের মারোয়াড়ি গৃহস্থদের মোহন্তজীর সাধুসেবায় সাহায্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলত। সূর্যোদয় হতে-হতেই যখন নদী থেকে স্নান করে পূজার জন্য মারোয়াড়ি মহিলারা আসতে আরম্ভ করত, ততক্ষণে রান্না হয়ে যেত।

বিগত এক মাস অতিরিক্ত গাঁজা, তামাক খেয়েছিলাম। তাই আমার সন্দেহ হয়েছিল যে পেটে অনেক ঝুলকালি জমা হয়েছে। এখানে নিজের হাতে সনায়-এর জুলাপ বানিয়ে খেলাম। এখানে আসার পর দিনই টাকার জন্য পরসায় তার করে দিয়েছিলাম।

বাগলকোটের বাইরে একটি নদী বয়, আর সম্ভবত সেটা পাথরে ভর্তি ছিল। এদিকে ধোপাকে কাপড় দেওয়ার রেওয়াজ খুব কম। দেখতাম ঘাটে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত লোকেরা কাপড়ের ওপরে দুমদাম ডাণ্ডা মারছে।

পণ্ডহরপুর—টাকা আসার পর আমি সেখান থেকে পণ্ডহরপুরে রওনা হই। নতুন নতুন তীর্থস্থানের খবর সাধুদের কাছ থেকে জানা যায়। পণ্ডহরপুর ও সেখানকার বিট্‌ঠলনাথ মহারাষ্ট্রের মান্য তীর্থ ও দেবমূর্তি। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে শুধু এতটুকু জানতাম যে যখন আমার সঙ্গী-সাধুরা ময়দানে রান্না করত, তখন তারা বলত—ভাই বিট্‌ঠল ভগবান থেকে হুঁশিয়ার থেক, অর্থাৎ দেখো কুকুর যেন রুটি নিয়ে না পালায়।

পুনা বোম্বাই—পণ্ডহরপুর থেকে রওনা হয়ে হয়তো একদিন পুনা থেকেছিলাম। সেখানে কি দেখেছিলাম মনে নেই। বোম্বাইয়ে পঞ্চমুখী হনুমানে ছিলাম। শহর ও মহালক্ষ্মীকে দেখলাম। এখানে এমন কিছু বিশেষ ছিল না যা আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। জানকী মায়ের খ্যাতি শুনলাম—'সে অনেককে জাহাজে দ্বারকা পাঠিয়ে দেন, বড় বড় শেঠ তার সেবক' ইত্যাদি। আমার বোম্বাই থেকে সিধা না দ্বারকা যাওয়ার কথা ছিল আর না ভাড়ার টাকারও আমার অভাব ছিল।

নাসিক—দ্বারকা যাওয়ার আগে নাসিক যাওয়াই ভাল মনে করলাম। নাসিক স্টেশন থেকে শহর পর্যন্ত সে সময়ে ঘোড়ার ট্রাম যেত। অন্ততপক্ষে তার লাইনটা তখনো ছিল। শহরের পরে পাথুরে জমিতে অনেকগুলো ধারায় ডুবে ভেসে ওঠা গোদাবরী পার হলাম। পরসার এক শাখামঠ কপিল ধারাতে (নাসিক জিলা) ছিল। তার শাখা নাসিকেও আছে। সেই খবরও নিয়েছিলাম। খোঁজ করে সেই জায়গা তো পেয়ে গেলাম। কিন্তু সেখানে এ সময়ে কোনো লোক ছিল না। নাসিক মহারাষ্ট্রে কিন্তু এখানে বৈরাগী ও অন্য উত্তর ভারতীয় সাধুপন্থের অনেক স্থান আছে। তা দেখে কিছুটা নতুন মনে হল, কিন্তু পরে বোম্বাইয়ের বাসিন্দা মারোয়াড়ি গৃহস্থদের কথা মনে হওয়ায় সেই শংকা দূর হল। দুই-তিন দিন থেকে পঞ্চবটী ও অন্যান্য জায়গায় ঘুরে বেড়ালাম।

ত্র্যম্বক—নাসিকে জানতে পারলাম যে গোদাবরীর উৎস ত্র্যম্বক অত্যন্ত প্রসিদ্ধ তীর্থ। ঐ সময় কোনো বার্ষিক মেলা ছিল। হাজার হাজার স্ত্রীপুরুষ হাঁটাপথে সেই দিকে যাচ্ছিল। আমিও তাদের সঙ্গ নিলাম। নাসিক থেকে ত্র্যম্বক কত মাইল মনে নেই। তবে আমি দুপুরের আগে রওনা দিইনি। রাত্রিতে রাস্তায় থাকতে হয়েছিল। পরদিন যখন ত্র্যম্বক পৌঁছলাম, তখন সেখানে

ভারী ভিড়। গোদাবরীতে স্নান করে ত্র্যম্বক দর্শন করলাম। কোথায় থেকেছিলাম, মনে নেই। কর্তাল ও একতারা নিয়ে কয়েকটি মণ্ডলী কীর্তনের মতো কিছু করছিল যা উত্তর ভারতের মেলা থেকে কিছুটা আলাদা ছিল। রাত্রিতে গ্যাসের আলোতেও ভজন গান চলতে থাকে।

কপিলধারা—ত্র্যম্বক থেকে কপিলধারার দিকে রওনা হলাম। গ্রামের অন্য কিছু নাম ছিল এবং তা দেওলালী থেকে কাছে। কিন্তু আমি নাসিক থেকে আবার ফিরে বোম্বাইয়ের দিকে যেতে চাইনি। পাহাড়ী পাকদণ্ডীর রাস্তা। পথে খাওয়ার জন্য কিছু পেঁড়া বেঁধে নিলাম। পাহাড়ে জল কম। আর এদিকে মিষ্টি খাওয়ায় খুব জোর তেষ্টা পেল। কাছাকাছি কোনো লোকজন না পাওয়ায় এক-আধ বার আমি রাস্তাও ভুলে গেলাম। এতে আরো মুশকিল বেড়ে গেল। দুপুরে তো পিপাসায় কাতর হয়ে আমি রাস্তা-টাস্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে একটা গ্রাম খুঁজতে লাগলাম। কিছু দূর যাওয়ার পর কয়েকটা ঝুপড়ি পেলাম। তেষ্টা পেয়েছে, একথা বলায় একটা ছেলে গ্রামের বাইরে একটা ডোবা দেখিয়ে দিল যার জল কাদার মতো ময়লা আর আমার মনে হল এতে গরু-বলদ ঢুকে পড়ারও কোনো বাধা ছিল না। সাধারণ অবস্থায় এই ডোবার জল কে খেত? কিন্তু যখন তৃষ্ণায় তালু ফেটে যাচ্ছিল, তখন এই জল খেতে কে অস্বীকার করতে পারে? সন্ধ্যায় পাহাড়ের এক বড় গ্রামে পৌঁছলাম। সেখানে সর্বজনীন মণ্ডপের সভাগৃহের মতো ছিল। সেখানেই থাকলাম। রাত্রিতে পুলিশের এক সেপাই এল। আমার নামধাম আদি নোট করে নিল। মনে হল এটা হায়দরাবাদ রাজ্যের গ্রাম। কিন্তু এখন মনে হয় না গ্রামটা সত্যিই তাই ছিল। গ্রাম থেকে খুব ভোরেই আমি কপিলধারার দিকে গেলাম। উঁচু থেকে নিচু ঢালু সমতল জমির দিকে, আবার নিচু থেকে উঁচুতে রাস্তা চলে গিয়েছিল। রাস্তায় একজন লোক ক্ষেত পাহারা দিচ্ছিল। তার কাছে থেকে আমি তাজা মটর অথবা ছোলা খেয়েছিলাম। কপিলধারায় দুপুরের আগেই পৌঁছে গেলাম। সেই সময় মোহন্তজী সেখানে ছিলেন না। একজন অভ্যাগত সাধু মন্দিরের কাজ করছিল। মঠে গরু ছিল অনেক। ভেতরে এক ঝরণা ছিল যার নাম কপিলধারা। মহারাষ্ট্রের এই অরণ্য পর্বতে কিভাবে স্থান বানাতে বৈরাগীরা সফল হল অথবা কিভাবে এই মঠ চলছে এবং এর প্রয়োজনই বা কি তা আমি বুঝতে পারলাম না। কিন্তু যে সময়ে এই কথা আমার মাথায় আসছিল, তখন আমি ত্র্যম্বকের রাস্তার যন্ত্রণা ভোগ করে আসছিলাম। কপিলধারা থেকে দেওলালী খুব দূরে নেই, একথা আমার খেয়াল ছিল না। কপিলধারার ঐ সাধারণ মিষ্টি জলের ঝরণা ছাড়া আর কোনো বিশেষত্ব ছিল না। কিন্তু পরসা মঠের সুদূর মহারাষ্ট্রে অবস্থিত শাখার অবস্থা দেখতে এসেছিলাম যাতে পরসা ফিরে গুরুজীকে বলতে পারি যে আমি ঐ জায়গা হয়ে এসেছি। যে সাধু সেখানে একা ছিল, এক আগন্তুক সাধুকে সে দেখায় তার ওপর পড়ল এক ভারী বোঝার মতো অবস্থা। সে প্রথমে তো বলল—মোহন্তজী এখানে নেই। তিনি কোথাও গেছেন, আমি তো মন্দির ও গরুর দেখাশোনা করছি। কিছুক্ষণ পরে এদিক-ওদিকের কাজ সেরে সে ফিরে এসে বলল—আমার তো খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে। চাল দিয়ে দিচ্ছি, রেঁধে নিন। আর ঘোলের সঙ্গে খেয়ে নিন। আমি বললাম—আমি এখন বড় ক্লান্ত, দুয়েক লোটা ঘোলই দাও। তা খেয়েই আমি বিশ্রাম করব।

দেওলালী বেশী দূর নয় শুনে দুপুরের পরে আমি স্টেশনে চলে এলাম।

ওঙ্কারনাথ মান্ধাতা—বোম্বাই থেকেই নাসিকের দিকে যাওয়ার সময় স্থির করেছিলাম যে ওঁঙ্কারনাথ ও উজ্জয়িনী দর্শন করে ডাকোর থেকে দ্বারকার দিকে যেতে হবে। দেওলালী থেকে আমি বুরহানপুরের টিকিট নিলাম। কিন্তু সেখানে শহরে থাকিনি। বুরহানপুর থেকে ওঙ্কারনাথ যেতে কোন স্টেশনে নেমেছিলাম, মনে নেই। কিন্তু সম্ভবত একটা কিংবা দুটো নদী পার হতে হয়েছিল। স্টেশন থেকে কিছুটা পায়ে হেঁটে মান্ধাতা যেতে হয়। পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে নর্মদার

গভীর প্রবাহ চলে গেছে। নদীর দুই দিকে বসতি। পুলের অন্য পারের বসতিকে কোনো গোণ্ড রাজার মহল বলা হয়ে থাকে। আমি এই পারের নরসিংহটেকরীর বৈরাগীর স্থানে উঠলাম। আমার বেদ-অধ্যাপক গুজরাতী ব্রহ্মচারীর কাছে নর্মদার মহিমার কথা অনেক শুনেছিলাম। তিনি নর্মদার তীরে অনেক ঘুরেছেন। তাঁর মতে পবিত্রতায় নর্মদার স্থান গঙ্গার চেয়ে কম নয়। বরঞ্চ যোগী ও তপস্বীদের জন্য মুক্তি সাধনায় যে সুবিধা নর্মদা দেয় তা গঙ্গাও দেয় না। ওঙ্কারনাথে একাধিক দিন থেকেছিলাম। বিকেলে নদীর তীরের দিকে অনেক দূর পর্যন্ত চলে যেতাম। সেখানে **খর্মুজের** খেত ছিল। ডিসেম্বর অথবা জানুআরিতে এই **খর্মুজ** পাকার তো সময় ছিল না। এপারের এক শিবালয়ে আমি একটি শিলালেখ দেখেছিলাম। কিন্তু তা প্রাচীন না নবীন তখন তো সে বিষয়ে আমার মনোযোগ সম্ভবই ছিল না। পুলপারের বসতিতেও গিয়েছিলাম। ওঙ্কারনাথের মন্দির এই পারে অথবা অন্যপারে ছিল, বলতে পারব না।

উজ্জয়িনী—মান্ধাতার থেকে চলে আসার সময় আমার সঙ্গে আর এক তরুণ নাগা-সাধুও ছিল। মুসলমানী যুগে সমসাময়িক দেশে মঠাধিকারী ও ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়কে নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য ফৌজী পদ্ধতিতে নিজেদের সংগঠিত করতে দেখা যায়। ভারতেও তাই হয়েছিল। সেই সময়ে মুসলমান শাসন থাকায় আজকালের মতো হিন্দু-মুসলমান ঝগড়া তো হতেই পারত না। তার বদলে হিন্দুরা নিজেদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ঝগড়া করত। প্রত্যেক বার বছরে আর নিজেদের মধ্যে কয়েক বছরের অন্তরে হরিদ্বার, প্রয়াগ, উজ্জয়িনী, ও নাসিকে চার চঢ়াও (কুম্ভমেলা) হত যাতে যাত্রীদের সংখ্যা কয়েক লাখে পৌছে যেত। বৈরাগী,দশনামী (গোঁসাই অথবা সন্ন্যাসী) ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের হাজার হাজার সাধু জোট বেঁধে যেত। সংখ্যা ও প্রভাবে বৈরাগী ও সন্ন্যাসী এগিয়ে ছিল। সেই জন্য কুম্ভমেলায় প্রথম স্নান করার জন্য এরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করত। কবীরের কাল তো বৈরাগীদের প্রারম্ভিক সময় ছিল। তাই ষোল শতাব্দী শেষ হয়ে যাওয়ার আগে তারা যে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে লড়াইয়ের উপযুক্ত হয়নি তাতে সন্দেহ নেই। মনে হয়, প্রথম-প্রথম ঝগড়া শুরু হয় সতের শতাব্দীর গোড়ায়, খুব বেশি পেছিয়ে গেলেও এর আরম্ভ হুমায়ুন-শেরশাহের সময় পর্যন্ত যেতে পারে।

এই চঢ়াও-এর ঝগড়ায় মার খেয়ে প্রত্যেক দল নিজেদের মজবুত করতে শুরু করে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সশস্ত্র সাধারণ যুদ্ধশিক্ষাপ্রাপ্ত সেনা গড়ে উঠতে থাকে। বৈরাগীদের দিগম্বর, **নির্বাণী**, নির্মোহী প্রভৃতি সাতটা আখড়া এবং সন্ন্যাসীদেরও নিরঞ্জনী ইত্যাদি আখড়া তৈরী হয়। আখড়ায় যেসব যুবক সাধু নাম লেখাত তাদের নাগা বলা হত। তাদের বর্শা—দুইমুখে লোহা বাঁধানো লাঠি, তরবারি-বল্লম চালানোর নিয়মিত শিক্ষা দেওয়া হত। বৈরাগী আখড়ায় যে সব ছেলেরা ঢুকত তাদের **ছড়দংগা** বলা হত। বার বছর আখড়ায় শিক্ষা নেওয়ার পর কোনো কুম্ভমেলায় পঞ্চায়েত তাদের নাগা বানাতো। সেই সময় তারা সূচী-শিল্প শোভিত ঝাণ্ডা-নিশান (দিগম্বরদের পাঁচরঙা এবং অন্যদের ভিন্ন ভিন্ন) রাখার ও ওড়ানোর অধিকারী হত। বার বছরের নাগা হওয়ার পর তারা 'অতীত' হয়ে যেত। এই সব আখড়ার পাশে মাহাত্ম্যপূর্ণ স্থানে অনেক মঠ ও সম্পত্তি থাকত বার সব বিধিব্যবস্থার অনেক কিছুই এক মোহন্তের হাতে না থেকে থাকত পঞ্চায়েতের হাতে এবং সত্যি সত্যি সঙ্ঘের শক্তির নির্ণায়ক হত।

• নাগা-অতীতরা নিজেদের আখড়া ছাড়াও এক চঢ়াও থেকে আর এক চঢ়াও-তে জোট বেঁধে পায়ে হেঁটে যেত। তাদের কাছে উট থাকত। যে মঠে এই নাগারা যেত, তাদের খাওয়ানো-দাওয়ানো ছাড়াও নিজেদের সম্প্রদায়ের পলটন মনে করে কিছু ভেটও দিতে হত। নাগাদের মধ্যে এখানে নিজেদের শিষ্যদের চেয়েও সাদিক শিষ্যদের প্রাধান্য হত।

জ্ঞান-বৈরাগ্যের জন্য এদের তৈরী করা হয়নি। এরা ছিল মেলা ও অন্য সময়ে সুযোগ এলে আখড়ার ঝাণ্ডা উঁচু রাখার জন্য। মরতে ও মারতে এরা কাউকেই ভয় পেত না।

এখন ইংরেজ শাসনের এতকাল পরে নাগাদের আর সেই মাহাত্ম্য নেই। পুরানো সময়ের কিছু নকল এখনো আমরা চঢ়াওগুলোতে দেখতে পাই: এই সব আখড়ার অনেক মঠ ও স্থান উজ্জয়িনী, হরিদ্বার প্রভৃতি জায়গায় দেখা যায়।

উজ্জয়িনীতে আমরা রাত্রিতে নামলাম। আমার সঙ্গীর এখানকার খারী বাবলী না কি যেন একটা স্থান জানা ছিল। আমরা সেখানে বিনা অসুবিধায় পৌঁছে গেলাম।

উজ্জয়িনীতে তিন-চার দিন ছিলাম। কুম্ভের সময় মেলা কোথায় বসে সেই জায়গাটা দেখলাম। আরো অনেক আখড়াতেও গেলাম। মহাকালের দর্শনও করেছিলাম কিন্তু তা এখন ভুলে গিয়েছি। শীতের দিন ছিল, ঠাণ্ডাও লাগছিল। তাই নাগার সঙ্গে আমিও নিজের জন্য এক গরম কোট বানালাম। পয়সা থাকলে কোটের বদলে মেরজাই বানাতে হত। এখানেও ধুনির পাশে বিছানা পাতলাম এবং এখানেও **গাঁজাখোর-ভাঙখোরদের** নেতৃত্ব ছিল। একদিন ভাঙের গুলি খেয়ে নেশা করে আমি চোখ বুজে পদ্মাসনে বসে ছিলাম। ভাঙের নেশায় যদি আপনি কথা বললেন তবে খুব কথা বলতে থাকবেন। আর চুপ করে থাকতে চাইলে একদম চুপই থাকবেন। আমি একদম শান্ত হয়ে বসে ছিলাম। রাত্রি আটটা-নটা হবে। শহরের এক শ্রদ্ধাশীল গৃহস্থ অনেকক্ষণ ধরে অন্যান্যদের কথা বলা দেখছিল শুনছিল। কিন্তু আমাকে ঐ রকম চুপচাপ দেখে মনে করল কোনো যোগী ধ্যানমগ্ন হয়ে আছেন। সে পাশের সাধুদের জিগ্যেস করল। সাধুরা, তো তারিফ করতে শুরু করল—'ভক্ত! মহাত্মা না হলে এই দুনিয়া আছে কি করে?... আমার মনে হল, বলে দিই— 'কেন মিথ্যা কথা বলছ,' কিন্তু ভক্তদের শ্রদ্ধা নিয়ে খেলা করাও তো ঠিক নয়।

ডাকোর—উজ্জয়িনী থেকে ডাকোরের দিকে যাওয়ার সময় সেই নাগা যুবকও আমার সঙ্গে ছিল। রাস্তায় রতলাম পড়েছিল। কিন্তু আমরা ঐ শহরে যাইনি আমাদের যাওয়ার ছিল ডাকোর—নতুন দ্বারকা। গুজরাতের মানুষদের মধ্যে বৈরাগী সাধু কম হওয়া সত্ত্বেও সেখানে তাদের স্থান অনেক। ডাকোরকে তো এক ধরনের বৈরাগী স্থান-এর নগর বলা চলে। সব গলি ও রাস্তায় কোনো না কোনো স্থান আছে। আমরা থাকচকে 'নামলাম' (থাকলাম)।

অনেক মাস ধরে কয়েক'শ স্থানে 'নেমে' কথাবার্তা বলে ইতিমধ্যে রীতি-রেওয়াজ এবং স্থানীয় ও অভ্যাগত সাধুর কর্তব্য ও অধিকার জানা হয়ে গিয়েছিল। কোনো জায়গায়ই এখন আর যাতায়াতের, মেলামেশার, জীবন-যাত্রার কোনো সংকোচ ছিল না। এখন বস্তুত আমি খাঁটি সাধু হয়ে গিয়েছিলাম। এই সব জায়গায় ঘুরে দেখছিলাম যে লেখাপড়া জানা সাধুর কত অভাব; তাদের সাংস্কৃতিক স্তর কত নিচু। কিন্তু তা সত্ত্বেও দুরূহ রাস্তায় এবং যে দেশে তারা অবাঞ্ছিত সেখানে যেতে প্রস্তুত এমন অনেক যুবক তাদের মধ্যে পাওয়া যেত। তাও আমার কাছে কম আকর্ষণের ব্যাপার ছিল না।

বালাজীর মতো ডাকোরেও আমার এক ছোট স্থান-এর মোহন্ত দামোদরদাসের সঙ্গে পরিচয় হয়। তিনি সাধারণ বৈরাগীদের চেয়ে অধিকতর মার্জিত ও জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। সেই মঠে আরো দুই তিন জন সাধু ছিল। আড্ডামারা, পাশাখেলা ও বিড়ি-তামাক খাওয়ার জন্য মোহন্তজীর সময়ের অভাব ছিল না। তিনি আমার সমবয়সী ছিলেন। তাই আমাদের দুজনের মধ্যে বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল। আমি হামেশাই তাঁর ওখানে থাকতাম। পাশা খেলার পর একটা গুজরাতী বই তাঁর ওখানে দেখে তা তুলে নিয়ে দেখতে লাগলাম। অনেক অক্ষর তো আগে থেকেই পরিচিত ছিল। পরের দুই তিন দিন আমি বইটি ভাল করে পড়লাম এবং তার ভাবার্থ বুঝতেও আমার

কোনো অসুবিধা হল না। দামোদর দাসজী আমার কাছে বিহারের ভাল ধানের বীজ চেয়েছিলেন। পরসা ফিরে এসে আমি তা পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

আহমদাবাদ—(জানুয়ারী ১৯১৪) মাঘ মাস পড়ছিল, তখন আমি আহমদাবাদে রওনা হলাম। আহমদাবাদের জমাল দরওয়াজার বাইরে কিছুটা দূরে নরসিংহ বাবার মন্দির সাধুসেবার জন্য বিখ্যাত ছিল। আমার সঙ্গী সেখানেই যাচ্ছিল। আমিও তার সঙ্গে সেখানে গিয়ে ধুনির পাশে 'নামলাম'। ধীরে ধীরে দেখলাম ধুনি আমাকে বেশী আকৃষ্ট করছে। সে কি গাঁজা অথবা তামাকের কল্‌কের জন্য? তা নয়, তবু, গাঁজাখোর-ভাঙখোরেরাই প্রথম শ্রেণীর ভবঘুরেও হয়ে থাকে। তাদের কাছেই 'দেশ-দেশান্তরের' কথা বেশী শুনতে পাওয়া যায়। তাদের অভিজ্ঞতার কথা শুনেই আমি পরবর্তী যাত্রার প্রোগ্রাম তৈরী করতাম। কাশ্মীর, কুলু, কাথিয়াওয়াড়, ছত্রিশগড়, অমরকণ্টক, আসামের দুর্গম তীর্থগুলির কথা এই ধুনির সামনেই শোনা যেত। মঠে ব্রজবাসী মোহন্ত বড় সাদাসিধা লোক ছিলেন। একটা ময়লামত কাপড়ের টুকরা, খালি-পা, খালি মাথা ব্যাস এই তাঁর বেশ। কাজ করতে তাঁর না ছিল আলস্য, না সংকোচ। উঠানে ঝাড়ুটাড়ু দেওয়া তো তাঁর কাছে সাধারণ কাজ ছিল। গৃহস্থরা তাঁকে শ্রদ্ধা করত এবং মাসে বিশ দিন কারু না কারু কাছ থেকে ভোজের নিমন্ত্রণ আসত। সাধুসেবী দেশের মধ্যে গুজরাত সাধুদের কাছে খুব বিখ্যাত, গুজরাতের মধ্যে বিখ্যাত আহমদাবাদ। কালী-রোটী, ধবলী-দাল (মালপোয়া ও ক্ষীর) তো সেখানে সাধারণ ভোজ বলেই মনে করা হত। আহমদাবাদে এক মাসের মতো ছিলাম। তখন দেখেছিলাম যে সর্বদাই পুরির সঙ্গে কোনো দিন হালুয়া কোনদিন মালপোয়া-ক্ষীর থাকত। অনেক গৃহস্থ স্থানেই খাদ্য সামগ্রী পাঠিয়ে দিত। আবার অনেকে নিজেদের বাড়িতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করত। তাদের বাড়িতে যাওয়ার সময় কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে সাধুদের মিছিল বেরোত, ইচ্ছা হলে নিশান (দামী পতাকা) নিয়েও যেত। এক-আধবার সবরমতীর অন্য দিকের কোনো গ্রামেও আমরা খেতে গিয়েছিলাম।

স্নান ইত্যাদির জন্য আমাদের সবরমতী যেতে হত যে স্থান থেকে সেটা বেশী দূরে ছিল না। এখানেও সাধারণ লোক ধোপাকে কাপড় না দিয়ে নিজেরাই সাফ করে নিত। নদীর ক্ষীণ ধারার সঙ্গে কাপড়-ধোয়া জল মিশে যাওয়ায় জল অত্যন্ত নোংরা হয়ে যেত। শীতের দিন ছিল এবং যারা কাপড় ধুত তারা কিছুটা দেরি করে কাজ শুরু করত। তার আগে ভোরের শীতেই আমরা স্নান করে আসতাম। সেই সময়ে সবরমতীর সঙ্গে গান্ধীজীর কোনো সম্বন্ধ স্থাপিত হয়নি। তখন তিনি আফ্রিকাতেই ছিলেন। স্থানে বেশী ছিল অভ্যাগত সাধু যারা এক সপ্তাহ কিংবা দশদিন থেকে চলে যেত। মোহন্তজীর শিষ্য ও উত্তরাধিকারী মাধবদাস গুজরাতী যুবক ছিলেন। তিনি কিছুটা লেখাপড়া করেছিলেন কিন্তু বেশী এগোননি। আমার সঙ্গে মামুলী আলাপ হয়েছিল। এক-আধবার তাঁর সঙ্গে গুজরাতী গৃহস্থ পরিবারে গিয়েছিলাম। শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে তারা অনেক উন্নত ছিল যেমন আমাদের দেশের চাকরি-করা শিক্ষিত পরিবারে দেখা যায়। এখানেই প্রথম আমি বিড়ির প্রচলন বেশী দেখি। এ পর্যন্ত তা বিহারে ও উত্তরপ্রদেশে পৌঁছয়নি। আগন্তুকের সামনে ধনে ভাজা, কাটা সুপারি ও বিড়ি দেওয়া হত। গুর্জরদেরও পঞ্চ দ্রাবিড়ের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এখানে, শুধু ছাদ থেকে টাঙানো দোলনাই তামিল বাড়ির মত দেখলাম। পর্দাপ্রথা ছিল না, তবে, এখানকার শাড়ির সঙ্গে তামিল শাড়ির কোনো সাদৃশ্য ছিল না। বোধহয় মামার কন্যার সঙ্গে ভাগ্নের বিয়ের (?) প্রথা এখানেও চলে আসার কারণে এখানকার ব্রাহ্মণদের পঞ্চ-দ্রাবিড়দের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। এখানকার লোকেরা দুর্বল। বাজরার রুটির দেশ, তবু এতটা দুর্বল কেন? বন্ধুরা বাজরার সংস্কৃত করেছে বজ্রান্ন। স্ত্রীলোকদের চেয়ে পুরুষেরা বেশী দুর্বল। আর অনেকে বলে এখানকার স্ত্রীলোকেরা অবলা নয়,

প্রবলা। হয়তো বেনে ও করণিক শ্রেণীকে দেখে তাদের এই ধারণা হয়ে থাকবে। অন্যান্য স্ত্রী-পুরুষদের মধ্যে এই রকম বৈষম্য আমি দেখিনি।

আহমদাবাদে থাকাকালীন আমি কিছু গুজরাতী বই পড়লাম। শিক্ষকের দরকার ছিল না। গুজরাতীর সঙ্গে হিন্দির সে-রকমই সম্বন্ধ, যেরকম হিন্দির সঙ্গে ভোজপুরী ও মগধীর। গুজরাত কেন হিন্দিভাষাভাষী দেশের অঙ্গীভূত নয়, তাতে আশ্চর্য হতে হয়। পরসা থেকে টাকা আসার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল বলে আমাকে এতদিন আহমদাবাদ-এ থাকতে হয়েছিল। আমি ডাকোর থেকে তার করেছিলাম। দেরি হচ্ছিল দেখে সেখান থেকে চলে আসি। শেষ পর্যন্ত যখন এখানে টাকা এল তার আগেই আমি রওনা হয়ে গিয়েছিলাম।

আহমদাবাদ থেকে যেতে হবে কাথিয়াওয়াড় ও দ্বারকার দিকে। কিন্তু আহমদাবাদের সঙ্গীরা বলল—ডাকোরের মতো হোলি এদিকে কোথাও হয় না। তাই স্থির করলাম, ডাকোরের হোলি দেখে দ্বারকা যাব। জমাল দরওয়াজা থেকে দুয়েকদিনের জন্য আমরা শহরের প্রাচীরের বাইরে অন্য একটা জায়গায় গিয়েছিলাম। এখানে স্ত্রীলোকদের কাপড়ের ওপর জরির কাজ করতে দেখলাম। জিগ্যেস করায় জানতে পারলাম নিশান এখানেও তৈরী হতে পারে কিন্তু কারবার করার কারিগর আছে সুরাট-এ। নিশানে জমির সূতায় মহাবীরজীর বুঁটি খচিত মূর্তি তৈরী হয়। এতে হয়তো কিছু বিশেষ কারিগরির প্রয়োজন হয়।

দেশ দেখতে হয় তো পায়ে হেঁটে চল, এই সিদ্ধান্তে আমি পুরোপুরি বিশ্বাসী, যদিও সব সময় তা মেনে চলা আমার পক্ষেও সম্ভব হয়নি। এবার আহমদাবাদ থেকে নড়িয়াদ-এর রাস্তায় ডাকোর পায়ে হেঁটে যাওয়া ঠিক করেছিলাম। সঙ্গীরা ছিল, অনেক দিন গুজরাতে আছে এমন এক নাগা এবং বস্তী জেলার এক মোটা তাগড়া 'রমতেরাম' (পর্যটক)। গুজরাতের গ্রাম কিছুটা বুন্দেলখণ্ডের সমতলভূমির গ্রামের মতো মনে হয়েছিল। গ্রামেও জায়গায় জায়গায় সাধুদের স্থান ছিল। সেখানে নাগাজী পরিচিত ছিলেন। আমরা সেখানেই থাকতাম। নরসিংহ স্থানের (আহমদাবাদ) মতো এখানেও বড় বড় গরু পালন করা হত। রাত্রিতে ঘিয়ে চপচপে বাজরার রুটি, টক ঘোলের সঙ্গে বেসন ও মশলা দিয়ে বানানো কঢ়ী খেতে আমার এত স্বাদু লেগেছিল যে কালী-রোটী ও ধবলী-দাল খেয়েও তা লাগেনি। গ্রামে অনেক জায়গায় পথিকদের জন্য মণ্ডপ ছিল, যদিও আমাদের সেখানে থাকার প্রয়োজন হয়নি।

নড়িয়াদে এক চমৎকার বৈরাগী স্থানে ছিলাম। মোহন্ত এখন ততটা না হলেও আগে কিছু নাগরিক জীবন-যাপন পছন্দ করতেন। তাঁর বৈঠকখানায় ভাল ভাল কোচ, গদী-আঁটা চেয়ার, ঝাড়-লণ্ঠন ও ছবি টাঙানো ছিল। নাগাজী জানালেন, এই সবই মোহন্তজীর প্রেয়সীর দান। কিছু দিন হল তার মৃত্যু হয়েছে এবং তারপরই মোহন্তজীর জীবনে ঔদাস্য এসে গেল। গুজরাতের বৈরাগী মঠের অধিকাংশ মোহন্ত ও স্বত্বাধিকারী উত্তর প্রদেশ ও বিহারের লোক। মোহন্তপদের সংখ্যা সব জায়গায়ই এক রকম এবং সব জায়গায়ই প্রেয়সীরা সুলভ। তাই কোনো প্রদেশের পুরুষ অথবা স্ত্রীলোকের সংযমের অভাব আছে তা বলা ভুল। আমার বন্ধু বলতে চাচ্ছিলেন যে গুজরাতে যুবক বৈরাগী সন্ততিপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখতে সহায়তা করে। কিন্তু আমি প্রশ্ন করলাম—যখন এদের অধিকাংশের সংযোগ হচ্ছে কুলীন বিধবাদের সঙ্গে তখন সন্ততিপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখার প্রশ্ন ওঠে কি করে? রাস্তায় বিগত ভ্রমণের বর্ণনা ও নতুন ভ্রমণের পরিকল্পনা নিয়ে কথা চলছিল। হিমালয়ের দেবদারু ও বরফে ঢাকা সাদা শৃঙ্গ আমার হৃদয় হরণ করেছিল। তাই প্রকৃতির সৌন্দর্য, দুঃসাহসিক ভ্রমণের কথা যখন উঠত তখন আমি হিমালয়ের নাম করতাম। দ্বারকার কাছাকাছি ইতিমধ্যে পৌঁছে গিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল আর কয়েকদিনের মধ্যে সেখানে পৌঁছে যাব, কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত পূর্ণ হয়নি। আমরা এরপরে সম্ভবত হিমালয় আর

পাঞ্জাবে যাত্রা করার কথা ভাবছিলাম। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে কম ঘুরে বেড়িয়ে ছিলেন বস্তীর বাবা।

ডাকোরে এবার 'চার সম্প্রদায়'-এ নামলাম। এখানকার মোহন্ত নাগাজীর পরিচিত। আমাদের থাকার জায়গা হয়েছিল ওপরের কুঠরিতে। আমার কাছেই নাহ্ন-এর মোহন্তজী ছিলেন। তিনি দুয়েকজন সাধুকে নিজের সঙ্গে নাহনে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। বস্তীর বাবা রাজী হয়ে গেলেন। কারণ রাস্তায় আমি হিমালয়ের ঝুড়ি ঝুড়ি প্রশংসা করেছিলাম। সাধুদের মধ্যে মোহন্তজীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল কেননা তাঁর রক্ষিতা ছিল। সঙ্গে সঙ্গে সাধুসেবায় যে ডাকোর কোনো স্থানের পেছনে ছিল না, তিনি নিজের সব সম্পত্তি শাড়ি-সিন্দুরে খরচ করেন না, তার জন্য প্রশংসা করার লোকও কম ছিল না। বড় সম্পত্তির মালিক এবং বৈরাগ্যের আদর্শে যাঁর বিশ্বাস অতি সামান্য সেই মোহন্তের কাছে শহুরে জীবনের উপভোগ থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখা, অখণ্ড ব্রহ্মচর্যের আশা করা আসলে তাঁকে আত্মবঞ্চনা এবং অপরকে বঞ্চনা করায় উৎসাহিত করারই নামান্তর। 'চার সম্প্রদায়ের' মোহন্তজী অত্যন্ত বিনয়ী ও মিশুকে ছিলেন। হোলির দুয়েকদিন আগে আমি ডাকোর পৌঁছেছিলাম এবং হোলির দুয়েকদিন পরে আমি চলে এসেছিলাম। এই অল্প সময়ের মধ্যে আমি মোহন্তজীর সঙ্গে- মেলামেশার কতটা সুযোগ পেয়েছিলাম, মনে নেই। কিন্তু একবার নিজের আস্তাবলে তিনি নিজে আমাকে তাঁর কচ্ছী ঘোড়া দেখিয়েছিলেন। সেই ঘোড়ায় আমি চড়িনি কিন্তু আমার মন তা চেয়েছিল নিশ্চয়ই।

ডাকোর কালো মিশ্রীমতো রণছোড়-এর (মগধরাজ জরাসন্ধের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মথুরা থেকে দ্বারকা পালিয়ে যাওয়ায় কৃষ্ণের এই নাম হয়েছিল) মূর্তি আছে। বলা হয়ে থাকে যে, দ্বারকা ছেড়ে ডাকোর আসার ইচ্ছা তিনি এক সাদাসিধা গৃহস্থের কাছে প্রকাশ করেছিলেন এবং সেই গৃহস্থ তাঁকে ডাকোর নিয়ে এসেছিল। ডাকোরে তাঁর দর্শনের জন্য দুয়েকবার নিশ্চয়ই গিয়েছিলাম। কিন্তু অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করা ও ভিড়-ভাড় ছাড়া আর কোনো কথা মনে নেই। হোলির মিছিল সত্যি সত্যি অনেক প্রস্তুতির সঙ্গে বেরিয়েছিল। সাধারণভাবে গুজরাতে এবং বিশেষ করে ডাকোরে বৈরাগী নাগারা নিজেদের আখড়া নির্মাণ করেছিল। সেদিন তারা মিছিলে লাঠি ও তরোয়াল খেলছিল। চারদিকে সংখ্যাতীত দর্শকের ভিড় দেখা যাচ্ছিল। ঝাণ্ডা যাচ্ছিল কিনা মনে নেই, কিন্তু বাজনা বাজছিল, আবীর লাগানো হচ্ছিল, হয়তো হোলির গানও গাওয়া হচ্ছিল, যদিও উত্তর ভারতের মতো এই গানে নোংরামি ছিল না। কেননা গান গাইছিল সাধুরা। তবুও কৃষ্ণরাধা ও গোপীকৃষ্ণ নামের এই গান সরস করা সম্ভব ছিল।

ডাকোর এসেই আমি পরসায় তার করেছিলাম এবং হোলির পরদিনই টেলিগ্রাম মানি-অর্ডারের সঙ্গে খবর এল—জরুরী কাজ আছে, শীগ্‌গীর চলে এস।

পরসায় প্রত্যাবর্তন

ডাকোর থেকে পরসা অনেক দূর এবং আমাকে যেতে হল রতলাম, ভূপাল, বীনা, কাটনী, প্রয়াগ কাশী হয়ে। কিন্তু একদিনের জন্য কাশী ছাড়া আমি রাস্তায় কোথাও নামিনি। পরসা এসে জানতে পারলাম, ডোরীগঞ্জের মোহন্ত মারা গেছেন। তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনয়নের বিষয়টি পেশ করা হয়েছে। ছাপরা থেকে কয়েক মাইল দূরে গঙ্গাতীরে অবস্থিত ডোরীগঞ্জ কোনো এক সময় এক বড় বাজার ছিল। তখনো রেলপথ হয়নি। ব্যবসা-বাণিজ্য হত গঙ্গার জলপথে। যেখানে লক্ষ্মী থাকেন, সাধুরাও সেখানে তাদের আবাস তৈরী করে নেন—এই নিয়ম অনুসারে পরসাব কিছু সাধু সেখানে গিয়ে নিজেদের ছোটমতো কুটির তৈরি করে নেন। ধীরে ধীরে তাই বেড়ে একটা ছোটখাট মঠে পরিণত হয়। পরে বাজারের আর্থিক মন্দার প্রভাব মঠের ওপরও অবশ্যই পড়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু খেত ও মোহন্তজীর কাছে কিছু টাকা পয়সা ছিল। পরসার মোহন্ত প্রধান স্থানের অধ্যক্ষ হওয়ায় তাঁর মোহন্ত মনোনয়নের অধিকার ছিল। ডোরীগঞ্জের মোহন্তের আকস্মিক মৃত্যু হয়েছিল। সুতরাং কাকে মোহন্ত করে ডোরীগঞ্জে পাঠানো যেতে পারে, তা স্থির করার সময়ও পাননি পরসার মোহন্তজী। মৃত্যু অথবা কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়ার খবর আসার পর মঠের সম্পত্তির দেখাশোনা করার জন্য একজন সতর্ক মানুষকে পাঠানো আবশ্যিক ছিল। সতর্ক ও মোহন্তজীর বিশ্বাসভাজন এই ধরনের লোকের অভাব ছিল পরসায়। নিরুপায় হয়ে তিনি তাঁর এক ভাইপোশিষ্য রামলখনদাসকে পাঠিয়ে দেন। বালিয়া জেলার সৈথওয়ার গ্রামেও পরসা মঠের এক ভাল শাখামঠ আছে। সেখানকার প্রথম মোহন্ত রামলখনদাসের গুরু ছিলেন। রামলখন দাসের বড় আশা ছিল যে, সেই মঠের মোহন্তের মৃত্যু হলে তিনি মোহন্ত হবেন। কিন্তু তাঁকে মোহন্ত করলে পরসার মোহন্তের কাছে যে ভেট আসে তা কমে যেত। পূর্বজের শিষ্য হওয়ায় নতুন মোহন্তের মঠের অস্থাবর সম্পত্তির ওপর অধিকার জন্মাত এবং ভবিষ্যতের জন্য তা সে নিজের কাছেই রাখতে চাইত। পরসার মোহন্তজী 'মৌনীজী'কে সৈওয়ারের মোহন্ত মনোনীত করেন। এতে রামলখনদাসের বিক্ষুব্ধ হওয়া সুনিশ্চিত ছিল। রামলখনদাস ছিলেন সেই সাধু যিনি ছেলেমানুষ সুদর্শনদাসকে ঘুমের মধ্যেই কন্ঠী ও মন্ত্র দিয়ে দিয়েছিলেন যাতে সে পরসার মোহন্তের শিষ্য না হতে পারে।

ডোরীগঞ্জ গিয়ে রামলখনদাস ভাবল যে, এখানেও মোহন্তজী সব টাকাপয়সা নিজের কাছে রাখতে চাইবেন এবং তাঁর কথা না শুনলে তিনি রামলখনদাসকে মোহন্ত করবেন না। সেই জন্য এইবার সে মোহন্তজীকে ঠকানোর জন্য আটঘাট বেঁধে কাজে লেগেছিল। প্রথমে মঠের গৃহস্থ শিষ্যদের বুঝিয়ে দিলেন যে মোহন্তজী চাইবেন ডোরীগঞ্জে মাটিও কেটে তুলে নিয়ে যেতে। সর্বত্রই তিনি এইরকম করে থাকেন। মঠের 'সেবক'রা স্থির করল, যে তারা মোহন্তজীকে তা করতে দেবে না। এর কিছুটা আভাস মোহন্তজীর কানেও পৌছে গিয়েছিল। তাই মোহন্তজী আমাকে তার পাঠিয়েছিলেন। সবকথা শুনে আমার মনে হল, যে. ডোরীগঞ্জের সব অস্থাবর সম্পত্তি পরসায় চলে এলে, তা অনুচিত ও নীতিবিরুদ্ধ হবে। সেখানেও তো মন্দির ও মঠ

আছে। সেই সঙ্গে রামলখনদাসের দ্বারা সেখানকার ধার্মিক জনতাকে মোহন্তজীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার কথাও আমি শুনেছিলাম। সব কিছু ভেবেচিন্তে আমি গুরুজীকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তা ওঁর ভাল লাগবে কেন। ইঁট-চুন-পাথরে স্বাহা করার জন্য তাঁর প্রত্যেক বছর দশ-পনের হাজার টাকার দরকার ছিল। অতএব তার মনে হয়েছিল যে, ডোরীগঞ্জের হাজার-বারশ টাকা খুব কাজে লেগে যাবে।

শ্রাদ্ধ অথবা ভাণ্ডারার দিন এল। এক-আধ দিন আগেই আমি গুরুজীর সঙ্গে ডোরীগঞ্জ পৌঁছলাম। মোহন্তজী যখন টাকা চাইলেন, তখন স্থানীয় গৃহস্থদের কান খাড়া হয়ে গেল। রামলখনদাস মুচকি হেসে বলল, 'আমি বলছিলাম না—মোহন্তজীর কাছে ডোরীগঞ্জের স্থান চুলোয় যাক, তাঁর তো দরকার টাকার।' শেষমেশ গৃহস্থ সেবকদেরও মঠের ওপর কিছু অধিকার থাকে, তাদের কয়েক প্রজন্ম ডোরীগঞ্জের শিষ্য হয়ে আসছে। মঠের সম্পত্তিতে তাদের দানের টাকাও ছিল। তাদের সন্তান-সন্ততিদেরও মঠের সঙ্গে স্থায়ী সম্বন্ধ ছিল। তাই নতুন মোহন্ত খালি হাতে কাজ শুরু করবে, একথা তাদের ভাল লাগবে কেন? তারা বিনীতভাবে বলল যে মঠের মেরামতি ইত্যাদি অনেক কাজ বাকী, তার জন্য টাকাটা রাখা হয়েছে। গুরুজী এই কথা শুনে রেগে লাল হয়ে তক্তপোষে লাফঝাঁফ দিতে লাগলেন। রেগে গেলে তিনি মুখ কান লাল করে চৌকীর ওপর ক্রমাগত আসন বদলাতে বদলাতে দুলতে থাকতেন এবং কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিতেন। কিন্তু যেখানে লম্ফ-ঝম্প দিয়েও কিছু করার ছিল না সেখানে কি হবে। যেখানে সারা গ্রামের লোক একদিকে সেখানে বিশ ক্রোশ দূরের বড় থেকে বড় মানুষের তার বিরুদ্ধে কি করার ক্ষমতা ছিল? সৈঁথওয়ারে রামলখনদাস অনভিজ্ঞ ছিলেন না, প্রয়োজনের চেয়ে তাঁর বেশী আত্মবিশ্বাস ছিল এবং সাধারণ মানুষকে নিজের পক্ষে টেনে আনার প্রয়োজনীয়তা তখন তিনি বুঝতেন না। কিন্তু এবার তিনি আগেকার ভুলের পুনরাবৃত্তি করতে যাচ্ছিলেন না।

নিমন্ত্রিত হয়ে আশেপাশের বেশ কিছু স্থানের মোহন্ত আর সাধুরা এসেছিলেন। ভাল ভাণ্ডারার আয়োজন করা হয়েছিল। টাকা দিতে অস্বীকার করায় মোহন্তজী জিদ ধরলেন, 'তাহলে আমি রামলখনদাসের মোহন্তপদের চাদরই দেব না।' বোঝানোর জন্য আমাকে অনেক পরিশ্রম করতে হল। আমি বললাম, 'আপনি চাদর না দিলেও রামলখনদাস ডোরীগঞ্জ থেকে চলে যাওয়ার পাত্র নন। গত দশ-বার দিনে তিনি আপনার বিরুদ্ধে লোকজনকে উত্তেজিত করে নিজের স্থিতি মজবুত করে নিয়েছেন। তাই অনর্থক বদনাম নিয়ে কি লাভ? শেষমেষ এক হাজার কিংবা বারশ' টাকায় আপনার কিছু যাবে আসবে না।' লম্ফ-ঝম্প করার পর তাঁর পারা কিছুটা নিচে নামে, একথা সবাই জানত। অবশেষে আমাদের কথার কিছু ফল হল। তিনি মুখ ফুলিয়ে হলেও বাইরে ক্রোধ প্রকাশ না করে সব কাজ করলেন। চাদর দিয়ে রামলখনদাসকে মোহন্ত নিয়োগ করলেন, তাঁর পর যে সব মোহন্ত এসেছিলেন তাঁরাও চাদর দিলেন। রামলখনদাস সৈঁথওয়ারের মোহন্ত না হলেও ডোরীগঞ্জের মোহন্ত হলেন।

পরসায় রামনবমী হল। পরসায় রামনবমী ও জন্মাষ্টমী খুব প্রসিদ্ধ। বাইজীদের নাচ না হলেও ছেলেমেয়েদের যে নাচের দল আসত, তাদের খাওয়া-দাওয়া ও বিদায় মিলত। ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী হওয়ায় বর্ষার জন্য সেই সময় কিছু বাধা-বিঘ্নও আসতে পারে। কিন্তু রামনবমীতে দুই দিন পর্যন্ত শামিয়ানার নিচে নাচ চলে। সাধারণ মানুষের আমোদ-প্রমোদ চাই—তা সে ধর্মের নামে বা অন্য যে নামেই হোক না কেন। আশেপাশের পঞ্চাশটি গ্রামের লোক নাচ দেখার জন্য গ্যাঁট হয়ে থাকত। সকালে ভেরী আর রোশনচৌকী সাধারণভাবে বাজত। বেলা বারটায় রামের জন্ম হত। সেই সময় বাজনার আওয়াজে কানের পরদা ফেটে যাওয়ার মতো হত। প্রসাদ নেওয়ার জন্য লোকজনের ভিড় লেগে যেত। দুপুরে খানাপিনার পর নিশ্চিন্ত হয়ে নাচ শুরু

হত। এবং তা চলতেই থাকত। আমার নাচগান দেখার শখ ছিল না তা নয় কিন্তু যে ধরনের গায়কেরা জমা হত তাদের জন্য নিজের ঘুম নষ্ট করা আমি উচিত বলে বিবেচনা করতাম না। কখনো কখনো কোনো কত্থক নর্তক অথবা প্রকৃত গায়ক এসে যেত তখন নিশ্চয় কিছু সময়ের জন্য তা শুনতাম। অবশ্য এই রকম সুযোগ কমই হত কারণ গুরুজীর কাছে মুড়ি মুড়কি একদর।

এবার পরসা ফিরে এসে এক পরিচিত মুখ দেখে বড় ভাল লাগল। সেই মুখ হল বনমালী ব্রহ্মচারীর।সেই বনমালী,যে বারাণসীতে মোতীরামের বাগানে আমার বেদের সহপাঠী ছিল। সে আমার জেলারই লোক। আমার বন্ধু। শুনলাম আমি বারাণসী থেকে চলে আসার পর তার মনেও আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং সেও পরসায় এসে গুরুজীর শিষ্য হয়ে যায়। তার নাম হয় বরদরাজদাস। গুরুজী দিব্যদেশ পর্যটনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আচারীদের নকল করতে চাইতেন। তিনি শঙ্খচক্রের ছাপ দিতে শুরু করেন এবং সেই কারণে তিনি আমার বন্ধুকে বরদরাজের মতো আচারী নাম দিয়েছিলেন। বরদরাজকে কাছে পেয়ে আমি আনন্দিত ও দুঃখিত দুইই হয়েছিলাম। খুশী হয়েছিলাম এই জন্য যে আমার কাছে এক অভিন্নহৃদয় বন্ধুকে পেয়েছিলাম যার কাছে আমি খোলাখুলি মনের কথা, সুখ-দুঃখের কথা বলতে পারতাম। দুঃখিত হয়েছিলাম।—পরসার সমাজ ও তার বিদ্যাবিমুখতা ও নিম্নস্তরের পরিমণ্ডলে আমি নিজেই অসন্তুষ্ট ছিলাম, সেখানে নিজের এক বন্ধুকে ফেঁসে যেতে দেখে আমার ভাল লাগেনি। তবু নিজের স্বার্থের কথা ভেবেই হয়তো আমার খুশীর মাত্রাই বেশী ছিল।

আমার আবার সেই পুরানো জাবর-কাটা। জমিদারীর সব গ্রাম দেখ, কাগজপত্র বোঝো, মামলা মকদ্দমার জন্য কর্মচারীদের নির্দেশ দাও, দিনদিন বাড়তে থাকা ঋণের চিন্তায় মরো, এবং এই সব কিছুর সঙ্গে নিজের বুদ্ধিবৃত্তির অবমাননাকারী চাটুকারদের খোশামোদ শোনার জন্য তৈরী থাক। গরমের দিনে কোনোভাবে নয়টা-দশটা পর্যন্ত কাটিয়ে দাও; তারপর গরমে বাইরে যাওয়া অথবা কারু সঙ্গে মেলামেশার কোনো ব্যাপার নেই। কুঠরিতে পাখার নিচে অথবা এমনি বসে যে কোনো একটা বই পড়তাম। বরদরাজের সঙ্গে গল্প করতাম অথবা ঘুমোতাম। চারটা নাগাদ উঠে মঠের এখানে-ওখানে কিছু কাজ দেখতাম। ঠাণ্ডা হওয়ার পর হয় ঘোড়ায় চড়ে অথবা টমটমে পাঁচ-ছয় মাইল ঘুরে আসতাম। টমটমে গেলে একমার দিকে যেতাম। অনেকবার টমটম উলটে গেছে, আমিও পড়ে গেছি। ঘোড়া থেকে পড়ার তো সুযোগ হয়নি। কিন্তু কখনো আমার কোনো চোট-টোট লাগেনি। একদিন একমা থেকে টমটম হাঁকিয়ে ফিরছিলাম, ঘোড়া কিছু দেখে ভয় পেয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে একটা চাকা মাঝখানের উঁচু রাস্তা থেকে দেড় হাত নিচে পড়ে যায়। চাকা নিচে যাচ্ছে, সেটা আমার মনে আছে। কিন্তু কখন মস্তিষ্ক তার খবর পেল, কখন সে হাত-পাকে লাফিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিল, তা আমার মনে নেই। টমটম একেবারে উল্‌টে যায়, তার সামনের বাঁশ ঘোড়ার পিঠের ওপর চলে যায়। তাতে এই ভাল হল যে ঘোড়া উল্‌টে পড়ল না। ঘোড়ার সঙ্গে টমটমের উল্‌টে যাওয়ারও পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। আর আমি সেরকমই ফুটবলের মতো লাফিয়ে গেলাম। একবারের ঘটনা আমার স্মৃতিতে আছে, যা মনে হলেই আমার রোমাঞ্চ হয়। পরসা থেকে তাড়াতাড়ি এক গ্রামে যাওয়ার কথা ছিল। টমটম অথবা ফিটনে যেতে দেরি হত। বেশীদিনের কাজও ছিল না। তাই সহিসকে পায়ে হেঁটে যেতে বললাম। আমি ঘোড়ায় সাধারণ গদী বেঁধে এবং খররা করার বিনা কাঁটার লাগাম লাগিয়ে পরসা থেকে রওনা হই। বাজারের রাস্তা যেখানে একমা যাওয়ার রাস্তায় গিয়ে পড়েছে, সেই চৌরাস্তায় চার-পাঁচ বছরের অনেক বাচ্চা খেলছিল। ঘোড়া ছুটিয়ে আমি যাচ্ছিলাম। যখন একেবারে কাছে গিয়ে পড়েছি, তখন বাচ্চাদের দেখলাম। আমি লাগাম

টানলাম কিন্তু ঘোড়া তা মানবে কেন? ঘোড়া যখন টগবগিয়ে বাচ্চাদের খেলার জায়গা পেরিয়ে গেল, তখন আমি প্রায় সংজ্ঞা হারিয়েছিলাম, আপনা থেকেই আমার চোখ বুঁজে গিয়েছিল। এগিয়ে গিয়ে ঘোড়াকে ঘুরিয়ে যখন দেখলাম যে সবকটা বাচ্চাই রাস্তার দুই কিনারে দাঁড়িয়ে আছে, তখন আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। তাদের যৌথবুদ্ধিবৃত্তি তার কাজ করে গেছে। হয়তো বেশী বয়স হলে তাদের মধ্যে এক-আধ জন অবশ্যই হতবুদ্ধি হয়ে সেখানে থেকে যেত।

এই বছর অথবা গত বছর যখন আমি পরসায় ছিলাম, তখন ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের দুই ফোটোগ্রাফার এস· গাঙ্গুলী ও পিণ্ডীদাস পুরানো বস্তুর ফটো নিতে এসে একমার ডাকবাংলোয় উঠেছিলেন। তাঁরা পরসাও এসেছিলেন। সেই সময় পুরাতাত্ত্বিক-সম্প্রদায়ের নামের সঙ্গেও আমার পরিচয় ছিল না। তাহলে তাঁদের কাজের মাহাত্ম্য আমি কি করে বুঝব? পিণ্ডীদাস মঠে এসে কিছু খোঁজ-খবর নেন। আমিই একমাত্র লোক ছিলাম যার কাছে তিনি কিছু জিগ্যেস করতে পারতেন। সেই সময় মন্দিরের সেই সভামণ্ডপ ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। তাতে সুন্দর নকশা-করা অনেক কাঠের ব্রাকেট লেগেছিল। অবশিষ্ট মন্দিরের যে চূড়া তখনো দাঁড়িয়েছিল, সেই চূড়ার ও সমাধির ফোটো নেন। আমারও প্রথম ফোটো এই সময়ই নেওয়া হয়েছিল। পিণ্ডীদাসজী তার একটি কপি আমাকে দিযেও ছিলেন। কিন্তু তা অযোধ্যা যাওয়ার সময় মনকাপুরে বরদরাজের কাছ থেকে হারিয়ে যায়। অশ্বারোহী অবস্থায় আমার এক ফোটোও নিয়েছিলেন এবং ঠিকানা দিয়েছিলেন কলকাতার ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের। কিন্তু আমি ফোটোর জন্য চিঠি লিখিনি। এই দুই ভদ্রলোককে এখানে সেখানে যাওয়ার জন্য আমার টমটমও দিয়েছিলাম। তা না দিলে তাদের একমার পুরানো ঢঙের এক্কায় যেতে হত। খেয়েদেয়ে এই এক্কায় চড়লে পেট আপনা থেকেই খালি হয়ে যেত।

বহরৌলী গ্রাম ঠিকা দেওয়া হয়ে গিয়েছিল। তারপর জানকীনগরই (থানা বসন্তপুরের খুব কাছে) মঠের দ্বিতীয় বড় গ্রাম ছিল। এই গ্রামকে পরসার বাবুরা 'জানকী'জীর ভোগের জন্য দিয়েছিলেন। সেই সময় গ্রামের নাম ছিল 'বৌডেয়া। পরে ঋণ ও খাজনায় বাবুদের জমি নীলাম হয়ে যায়। নতুন ক্রেতারা অন্যান্য গ্রামের সঙ্গে বৌডেয়াকেও দখল করতে চেয়েছিল। কিন্তু ততদিনে বৌডেয়া জানকীনগরে পরিণত হয়ে গিয়েছে। খুঁজে খুঁজে পরাস্ত হলেন, কিন্তু ঐ নামের গ্রাম পাওয়া গেল না—এই হল পুরানো কিংবদন্তী। জানকীনগর থেকে মঠের বাইশ শ' টাকা আয় হত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুসারে সরকারী খাজনা দিতে হত একশ'বা সওয়া শ'র মতো। লর্ড কর্নওয়ালিসের সময়ে এই বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। গুরুজীর সঙ্গে আমিও জানকীনগরে জমিদারির দেখাশোনা করতে গিয়েছিলাম। বিহারের জমিদার ছোটখাট রাজা—অন্তত সেই সময় ছিল, স্ত্রী পুরুষের ঝগড়া হলেও জরিমানা আদায় করত। সাধারণ মারপিটের ঝগড়া থানা পর্যন্ত যেতে পারত না। দুই পক্ষের কাছ থেকেই কিছু নিয়ে জমিদার অথবা তার কর্মচারী ঝগড়া মিটিয়ে দিত। জমিদাররা যে ন্যায় বিচার করত, তা নয়। প্রত্যেক বছর জরিমানা থেকে যত বেশী টাকা পাওয়া যায় তারা তো তাই চাইত। সেই সময় আমিও জমিদারের এই অধিকারকে অন্যান্য সামাজিক ব্যবস্থার মতো সনাতন ও বৈধ মনে করতাম। তথাপি আমার চেষ্টা ছিল পুরো ন্যায় বিচার করার। জানকীনগরে এক প্রতাপশালী ব্যক্তি দুর্বল ব্যক্তিদের ওপর অত্যাচার করেছে দেখতে পেলাম। তথ্য ও সাক্ষ্যের দ্বারা তার দোষ প্রমাণিত হল। আমি জরিমানা করলাম। জমিদারের কর্মচারী গ্রামের প্রতাপশালী ব্যক্তির পক্ষ অবলম্বন করাই পছন্দ করে। আমি যাতে জরিমানাটা মুকুব করে দিই তার জন্য তারা চেষ্টা করে। কিন্তু এ ব্যাপারে তারা আমার স্বভাব জানত। তাই তারা গুরুজীর কাছে গিয়ে সুপারিশ করতে শুরু করে। তিনি জরিমানা মাপ করে দেন। আমার কাছে তা খুব অসহ্য মনে হল। নিয়ম ও ব্যবস্থার

প্রতি পদে অবহেলা করা গুরুজীর স্বভাবের মধ্যে ছিল—তা আমি জানতাম। তবুও এতে আমার ক্ষোভ ব্যক্ত করেছিলাম এবং রাগ করে সেখান থেকে সোজা পরসা ফিরে চলে এসেছিলাম।

লিচুর মরশুম শুরু হয়ে গিয়েছিল। আম পাকারও আর বিশেষ দেরি ছিল না। মিঠে লিচু আমার মন ভুলিয়ে দিয়েছিল, তা বলতে পারব না। পরসায় থাকা শুধু সময় নষ্ট করা বলেই আমার মনে হত। এই সময়টা আমি পড়াশোনা করার অথবা ঘুরে বেড়ানোর কাজে লাগাতে পারতাম। বরদরাজ মঠেই ছিল এবং তার ভবিষ্যতের কার্যক্রম সম্পর্কে কথাবার্তা হত। যাগেশের অনেক গুণ বরদরাজের ছিল। দুজনই নতুন দেশ, নতুন দৃশ্য দেখতে পছন্দ করত। দুজনেরই আমার প্রতি গভীর ভালবাসা ছিল এবং সেই সঙ্গে দুজনের একজনও লেখাপড়া করার ওপরে বিশেষ জোর দিত না। এই তৃতীয় বিষয়ে যদি তাদের রুচি আমার সঙ্গে মিলত, তবে হয়তো জীবনের দৌড়ে অনেক দূর পর্যন্ত তারা আমার সঙ্গে থাকত।

যে সময় আমি কনৈলার সঙ্গে বন্ধন ছিন্ন করিনি এবং বারাণসীতে পড়ছিলাম, তখন বাবা কনৈলার পূর্বে জিগরসণ্ডী গ্রামের এক জমিদারি কিনতে চেয়েছিলেন। একবার জমিদারির মালিক দস্তাবেজ লিখতেও গিয়েছিলেন কিন্তু কোনো ব্যাপারে মতের মিল হয়নি। পরে তাঁরা এই জমি অন্য একজনকে লিখে দিয়েছিলেন। বাবার সবচেয়ে ছোট বোনের শ্বশুরের নামে সেই জমির কিছুটা আগের বছর লেখাপড়া হয়ে গিয়েছিল। বাবা এখন জমির মালিকের বিরুদ্ধে অগ্রাধিকার বলে ক্রয়ের অধিকারের মামলা দায়ের করেন। এই মামলায় তিনি জিতে যান। তাঁকে এখন অন্য মালিকের টাকা ফিরিয়ে দিতে হবে। টাকা দেওয়ার মেয়াদ কাছাকাছি এসে গেল। অথচ নগদ টাকার দেখা নেই। যে টাকা ধার দেওয়া হয়েছিল, তা হাতে আসার সময় হয়নি। আমার কাকা প্রতাপ পাণ্ডে কিছু দলিল নিয়ে টাকা ধার নেওয়ার জন্য পরসা আসেন। আমি বুঝতে পেরেছিলাম ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে তিনি এদিকে আসতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু এই ধরনের ব্যাপারে আমি এমনিতেই হস্তক্ষেপ করতে পারতাম না। আর এ সময়ে তো আমি সদ্য ঝগড়া করে জানকীনগর থেকে চলে এসেছি। আমি অপরের সঙ্গে রুক্ষ ব্যবহার করেছি, এমন দৃষ্টান্ত খুবই কম। এ সময়ে নিজের কাকার সঙ্গে এই ধরনের ব্যবহার একটি দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করে ফেলল। সেই স্মৃতি আমার সর্বদা অপ্রীতিকর বলেই মনে হয়। আমি বলে দিলাম—'আমি কিছু জানি না, আপনি মোহন্তজীর কাছে যান।'

বর্ষণ শুরু হয়ে গিয়েছিল। সেই বছরে আমের ফসলও খুব ভাল হয়েছিল। অথবা অন্যত্র ভাল ফসল হোক না হোক, আমরা যে অবস্থায় ছিলাম তাতে আম আমাদের জন্য দুর্লভ বস্তু ছিল না। ফসল পাকলে সেই সময়ের ফলকে আমার খাদ্যের প্রধান অংশ করাটাই আমার অভ্যেস। অন্যান্য ভোজ্যবস্তু থেকে অনেক সস্তা হলেও। কিন্তু যে ফল বারমাস মিলত তার প্রতি আমার এই ধরনের পক্ষপাত ছিল না। পাকা কাঁঠাল পেটভরে খেতে দেখে আমার বন্ধুরা ভয় পেত। কিন্তু আমি বড় তৃপ্তিতে খেতাম। এ সময়ে আম-এর খুব রমরমা ছিল। সকালে, দুপুরে ও রাত্রির ভোজনের সঙ্গে যথেষ্ট আম থাকাটা আবশ্যিক ছিল। গুরুজীর ভয় ছিল আমি আবার কোনো দিকে পালিয়ে না যাই। তাই আমার সেবক ছাড়াও এক সেপাই ও দুয়েকজন সাধুকে আমাকে পাহারা দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন। বস্তুত রাত্রিতে ঘুমোবার সময় হাতকড়ি-বেড়ি ও জেলখানা না থাকলেও আমার অবস্থা এক কয়েদীর চেয়ে ভাল ছিল না। ভেতরে ভেতরে আমি পালানোর সুযোগ খুঁজছিলাম। বরদরাজ আমার সঙ্গে যেতে রাজী ছিল। দুজনের একসঙ্গে পালানো অসম্ভব মনে করে আমরা ঠিক করলাম, আমি প্রথম পালাব এবং

১০-১২ মাইল দূরে মহারাজগঞ্জের এক মঠে গিয়ে থাকব। সেখানে বরদরাজ এসে যোগ দেবে এবং তারপর দুজনে যাত্রা শুরু করব।

একদিন সুযোগ পেয়ে গেলাম। রাত হয়েছিল এবং বৃষ্টি পড়ছিল। খালি গায়ে মহারাজগঞ্জের সেই মঠে পৌঁছলাম। দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় দিন বরদরাজও চলে এল। দুজনে একসঙ্গে পরসামঠের এক ভাল শাখামঠ বগৌরায় গেলাম, যা তিন-চার মাইলের মধ্যে ছিল। আগে থেকেই মোহন্তজীর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। খুব স্বাগত সম্ভাষণ হল। তিনি বুঝে গেলেন যে আমরা পালিয়ে এসেছি। আমরা যাতে ফিরে যাই সেজন্য তিনি অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু আমরা বললাম —পরসায় থাকার অর্থ সময় নষ্ট করা। অযোধ্যায় থাকব এবং কিছু পড়াশোনা করব। মোহন্তজী নিজে লেখাপড়া জানা লোক ছিলেন না। কিন্তু লেখাপড়ার কদর করতে জানতেন। সেই কারণেই তিনি নির্জের এক শিষ্যকে বারাণসীতে লেখাপড়া করতে পাঠিয়েছিলেন। সেই সময় বগৌরাতে পুরি, আম ও তার ওপর দুধের ভোগ দেওয়া হত। পরসার মতো বগৌরাতেও অনেক প্রাচীন ও ধনী জমিদার পরিবার আছে। এই মঠের চার-পাঁচ হাজার বার্ষিক আয়ের জমিদারির অধিকাংশই সেখানকার বাবুদের দেওয়া। পরসায় বাবুদের মঠের সংস্করণ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে জবরদস্ত মকদ্দমা ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। কিন্তু বগৌরায় এখন পর্যন্তও তা হয়নি। কিন্তু ঐ সময়ে কে বুঝতে পেরেছিল যে তা ভবিষ্যতের গর্ভে আছে এবং অচল 'সীতা'র (মন্দিরের মূর্তি) জন্য চড়ানো রেশমী শাড়ি এক চলাফেরা করা সীতার শরীরে গিয়ে কেলেঙ্কারী ঘটাবে। দুই চারদিন বগৌরা থেকে আমরা অযোধ্যা রওনা হয়ে গেলাম।

১৪

অযোধ্যায় তিন মাস (১৯১৪ জুলাই-সেপ্টেম্বর)

দুরৌন্দা থেকে গাড়িতে চড়ার সময় আমরা দুজন দুই কামরায় উঠেছিলাম। আমি বরদরাজকে গোরখপুরের পরের স্টেশনে নামতে বলে দিয়েছিলাম। হয়তো আমাদের দুজনের মধ্যে একজন বিনা টিকিটে গিয়েছিলাম। তা না হলে বরদরাজ সেখানে নামতে ভুলতনা এবং আমাদের দুজনের দুই কামরায় যাওয়ার প্রয়োজন হত না। আমি যে স্টেশনে নেমেছিলাম হয়তো সেটা ডোমিনগড় ছিল। খোঁজাখুঁজি করলাম কিন্তু বরদরাজ নেই। স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল। রাত্রিতে তাঁরই সহায়তায় রওনা হয়ে মণিকাপুরে ট্রেন পালটে লকড়মণ্ডী পৌঁছলাম। অযোধ্যা সামনে দেখা যাচ্ছিল। কপর্দকহীন হয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু এতদিনে পয়সাকড়ি ছাড়াই দুনিয়ার অনেকটা দেখে ফেলেছিলাম। তাই অযোধ্যার দিকে পা বাড়ানো ঘরের দিকে যাওয়ার মতো ছিল। বর্ষাকালের জন্য এসময় পুল নেই, স্টিমার চলছিল। আর সম্ভবত গোলাঘাটে ভিড়ত। স্বর্গদ্বারের বিদেহীজীর স্থানের নাম আমি আগেই শুনেছিলাম। তাই আমি সেখানেই নামলাম। নিচে সিঁড়ির বাঁদিকের কুঠরিতে থাকার জায়গা পাওয়া গেল।

শ্রাবণ মাস অযোধ্যায় খুব রমরমার সময়। অর্ধেক অযোধ্যা মন্দির ও মঠে ভর্তি। এই মাসে প্রত্যেক মন্দিরে রামসীতা দোলনায় দোলে। ফুল, ঝকমকে বল ও আলো দিয়ে দোলনা সাজানো হত। সব জায়গায় কিছুটা গানবাজনার ব্যবস্থা থাকত, অধিকতর সমৃদ্ধ সব মন্দিরে নাচও হত এবং কোনো কোনো মন্দিরে 'সীতারাম' তো বাইজীর নাচও দেখতেন। ঝুলন দেখে যখন ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম তখন শুনলাম যে পাশের মন্দিরের ঝুলনে ছাপরার বিখ্যাত নর্তকী তৌখী নাচছে, এতে আমার কিছুটা বিস্ময় এবং গর্বও হল। তৌখীর নাম আমার মনে রয়ে গেল, কারণ ১৯২২-এ তিলক স্বরাজ ফান্ডে অনেক টাকা দিয়ে সে দেখিয়ে দিয়েছিল যে বাইজীরও হৃদয় থাকতে পারে। উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের দূর দূরান্ত থেকে শ্রদ্ধাশীল স্ত্রী-পুরুষেরা ঝুলন দেখে শ্রাবণ মাস কাটানোর জন্য অযোধ্যা আসে। কিন্তু সব মানুষকেই নিশ্চয় শ্রাবণের আকর্ষণই টেনে আনত না।

দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় দিন বরদরাজের সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল। সে তার জন্মস্থানের এক বৃদ্ধ সাধুকে পেয়ে গিয়েছিল। পরসা মঠের এক মহাত্মার অযোধ্যার অন্তরঙ্গ ধর্মীয় মণ্ডলীতে খুব খ্যাতি ছিল। তাঁর দ্বারাই আমরা একে অন্যের ঠিকানা পেয়েছিলাম।

পাঁচ-সাত দিন তো অযোধ্যায় ভিন্ন ভিন্ন মঠ ও মন্দির দেখতে এবং রাত্রিতে ঝুলন উৎসবের আনন্দ কুড়োতেই কেটে গেল। দর্শকদের মধ্যে একমাত্র চর্চা ছিল এই, 'অমুক জায়গার ফুলের সাজ বড় সুন্দর ছিল', 'অমুক জায়গার আলো ভাল',।'অমুক জায়গায় সবুজ-হলুদ ঘাসকে কেমন সুন্দর সাজিয়েছিল?'... 'মন্দিরের কত্থক নাচ তো একেবারে কামাল করে দিচ্ছিল।' দর্শকদের চলন্ত মণ্ডলী অর্ধেক রাত পর্যন্ত চলাফেরা করত। সব মন্দিরে তো তামা, পিতল, অষ্টধাতুর রামসীতা ঝুলনে ঝোলে। কিন্তু 'রসিক' লোক এখানে দেখে-শোনে, চলা-ফেরা করে এমন জীবন্ত জাগ্রত রাম-সীতা ঝুলনের আনন্দ নিচ্ছিল। রামলীলার মতো ছোট ছোট সুন্দর ছেলেদের রামসীতা সাজিয়ে সেখানে দোলনায় বসায়। 'দ্বাপর যুগের বেশে মুকুটধারী ও নাকে মুক্ত পরা রামজী বসে আছেন ধনুর্ব্বাণ নিয়ে। তার পাশে ঘাঘরা-ওড়না পরা মাথায় চন্দ্রিকা মুদ্রাসহ জানকীজী। দুজনের মাথায়ই চন্দনের প্রলেপ। গোলাঘাটের মহাত্মা শ্রীরামবল্লভাশরণজী নিজের শ্রীকরকমলে রামজানকীর ঝুলন দোলাচ্ছিলেন। তাঁদের আশীর্বাদ করছিলেন, মুখে পানের খিলি দিচ্ছিলেন। সেখানে আলোর ঝলকানিতে রাত দিন হয়ে গিয়েছিল। ফুল ও আতরের সুগন্ধে বাতাসও ভারী লাগছিল। এখানে ফৈজাবাদ আর অন্য নগরের সম্ভ্রান্ত পরিবারসমূহের স্ত্রী-পুরুষ শিশুদের নিয়ে বসে ঝুলনের ও গানের আনন্দ উপভোগ করছিলেন। লক্ষ্মণ কেল্লা, হনুমতনিবাসের মতো রসিক দেবালয়গুলিতে শ্রাবণের জন্য খুব প্রস্তুতি ছিল। নিজেদের সূক্ষ্মরুচি সম্পর্কে এখানকার মানুষদের গর্ব ছিল এবং সেই গর্ব অনেকটা সঙ্গতও ছিল।

পরসার শিষ্য এক ভজনানন্দী মহাত্মার কাছে যাতায়াতের সুযোগ না পেলে সখীমতাবলম্বীদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানতে পারতাম না। তথাপি সেই সময় এবং এখানে তো আমি অনেককে বলতে শুনেছি যে সখীমতাবলম্বীরা দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে ফেলে লম্বা চুল রেখে একেবারে স্ত্রী-বেশে থাকে কিন্তু পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে এরকম মুখ আমার চোখে পড়েনি। হ্যাঁ, স্ত্রী-সুলভ ভাবনা তাদের মধ্যে বেশী। আমাদের স্থানের এই মহাত্মারও ভেতরে ভেতরে সখীভাব ছিল। অবশ্য বাইরে লম্বা দাড়ি-গোঁফ, লম্বা-চুল, গায়ে কাপড়ের টুকরো ও মাথায় সাদা গামছা থাকত। কিন্তু তাঁর শিষ্যের এই বেশের সঙ্গে কপালে রাম নামের ছাপ ছাড়া গলার স্বর ছিল একেবারে মেয়েলি। চলনে-বলনে হুবহু মেয়েদের অনুকরণ করে এমন অনেক সখীমতাবলম্বী আমিও দেখেছি। তারা বলে— একমাত্র ভগবানই তো পুরুষ হতে পারেন। অন্য

কোনো ব্যক্তি পুরুষভাব রেখে কখনোই ভগবানে ভক্তিলাভ করতে পারে না। তাই ভগবানে ভক্তির জন্য সখীভাবের পূর্ণসাধনার অত্যন্ত প্রয়োজন। প্রত্যেক 'সখী'র (সখীমতাবলম্বী) এক স্ত্রীলিঙ্গসূচক গোপন নাম থাকে,—'লবঙ্গলতা', 'অনঙ্গলতা'। তারা রামকে নিজেদের স্বামী মনে করে পূজা করে। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে অনেকেই ঘুমোয় পর্যন্ত এবং অনেককে তো মাসিক ঋতুমতী হওয়ার অভিনয় করতেও দেখা যেত। রসিক অথবা 'সখী'রা অপরের ভক্তিকে আনাড়ি নিম্নস্তরের ভক্তি বলে মনে করত। এখানে 'রাম-জানকী' পূজা-অর্চনায় আজকালের রাজারাণীর উপভোগের সব সামগ্রী উপস্থিত করতে চাইত। বিয়োগান্ত নাটক নয়, 'সখী'লোকেরা সর্বদা মিলনান্তক পরিণতিই পছন্দ করত। এদের কাপড়-চোপড় কিছু বেশী পরিচ্ছন্ন, চেহারায় স্নিগ্ধতাও কিছু বেশী, কণ্ঠস্বর মেয়েলি ও মধুর। একদিন আমরা শ্রীরামবল্লভাশরণজীর কাছে কথাবার্তা বলতে গেলাম। বেদান্ত পাঠশালার ব্যাপারে তিনি প্রথমে রাজকুমার রাম সম্বন্ধে স্বরচিত কিছু কবিতা শোনালেন। তারপর যে উদ্দেশ্যে আমরা গিয়েছিলাম সে ব্যাপারে কথাবার্তা বললেন। তখন তাঁর ফিনফিনে কাপড়ের টুকরো সুতি কিংবা রেশমী ছিল, তা বলতে পারব না। কিন্তু তাঁর চাদর সাদা কাশী সিল্কের ছিল। কেশর দেওয়া চন্দনে সীতারাম ও চন্দ্রিকা মুদ্রিকা সারা কপালে চোখের বাইরের কোণ পর্যন্ত আঁকা ছিল। তাঁর কণ্ঠস্বর ও হাবভাব বলে দেয় যে তাঁর মধ্যে গাম্ভীর্য নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তা থেকে এও বলা যায় যে কোনো দাড়িওলা মহিলা কথা বলছেন।

সখীমতের উৎস জানকীঘাট কোনো এক সময় নিজস্ব সখ্যভাব ও শিক্ষাদীক্ষার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। তারপরে কেল্লার যুগলানন্যশরণের নক্ষত্র ঝলমল করত; যা এখন ডুবে গেছে। এই সময় এই জায়গার মোহন্তের স্ত্রীনাট্য নয় পুরুষের অভিনয়ই পছন্দসই ছিল। গোলাঘাটের শ্রীরামবল্লভাশরণের প্রকট ও পণ্ডিত বল্লভাশরণের গুপ্ত সখ্যভাবনার খ্যাতি ছিল। কিন্তু বস্তুত সখীসমাজের কেন্দ্র হতে যাচ্ছিল হনুমতনিবাস, যার মোহন্ত গোমতীদাস সখ্যভক্তিতে অনেক এগিয়ে গেছেন বলে মনে করা হত। মুবারকপুরের (ছাপরা) শ্রীভগবানদাসের তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা তাঁর শক্তি ও প্রভাবকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল। ভগবানদাসজী গৃহস্থ থাকাকালীন পরসার প্রথম মোহন্ত শ্রীরঘুবরদাসের শিষ্য ছিলেন। ভগবানদাসজী নিজের ভক্তদের মধ্যে রূপকলাজী নামে অধিকতর প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি প্রথম স্কুলের ডেপুটি-ইনসপেক্টর ছিলেন। পেনসন নেওয়ার পর গৃহের প্রতি অনাসক্তি এসে যায় এবং অযোধ্যায় এসে থাকতে শুরু করেন। যে সময়ের কথা আমি লিখছি তখন তিনি হনুমতনিবাসে থাকতেন। দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে পুরোপুরি স্ত্রীরূপে রামভক্তি করছিলেন। তাঁর বিহারের এক শ্রেণীর শিক্ষিত মানুষের ওপর খুব প্রভাব ছিল। যার ফলে তাদের জন্য তো হনুমতনিবাস কাবা হয়ে গিয়েছিল।

সখীমতের সব কর্ণধারের কথা তো বলতে পারব না কিন্তু এদের অধিকাংশই রামভক্তির আড়ালে তাদের স্থানগুলিকে অস্বাভাবিক ব্যভিচারের আড্ডায় পরিণত করেছিল। আমার বড় বিস্ময় লাগত যে অনেক গৃহস্থই এই গোপন ব্যাপারটি জেনেও তাদের খ্যাতি বাড়ানোর সহায়ক হত।

পাঁচ-সাত দিনে অযোধ্যা ভাল করে দেখে নেওয়ার পর পড়াশোনা শুরু করার সময় এসেছিল। তখন জানতে পারলাম যে গোলাঘাটের পাশে 'দিব্যদেশ'এ (মাদ্রাজী রীতিতে তৈরী আচারী দেবালয়) এক বেদান্ত পাঠশালা খোলা হয়েছে। সেখানে এক যোগ্য মাদ্রাজী পণ্ডিত পড়ান। আমিও সেখানে ভর্তি হয়ে গেলাম। ছাত্রদের সংখ্যা বার-তের-র মতো ছিল। তিন-চার জন বাদ দিলে তাদের মধ্যে সবাই বৈরাগী ছিল এবং তারাই ভাল ছাত্র ছিল। সম্ভবত বেদার্থসংগ্রহের পাঠ চলছিল। তিরুমিশীতে থাকার সময় আমি 'যতীন্দ্রমতদীপিকা'

(রামানুজবেদান্তের প্রারম্ভিক গ্রন্থ) পড়েছিলাম। শংকরবেদান্তেব সঙ্গেও কিছুটা পরিচয় হয়েছিল। সেইজন্য তা পড়তে আমার খুব রুচি ছিল। দদুআ সাহেবের (অযোধ্যার রাজা) মহলের পেছনে তাঁরই বাড়িতে কিছু মহারাষ্ট্রের বৈদিক থাকতেন। বিদেহীজীর স্থানবাসী এক ব্রাহ্মণ ছাত্রের কাছে জানতে পারলাম যে সেখানে এক পণ্ডিত সামবেদ পড়ান। আমি সেখানে গিয়ে সামবেদও 'পড়তে' শুরু করলাম। এখানে পড়ার অর্থ ছিল সুর করে পাঠ। গুরুজী নিজেও শুধু গর্দভ স্বরেরই অনুকরণ করতে সক্ষম ছিলেন। আর এই বান্দাও ব্রহ্মার কাছে তখন পৌঁছেছিল যখন তিনি মৃদু ও সঙ্গীতোপযোগী স্বরগুলি বণ্টন করে ফেলেছেন। যাহোক, গান করার খেয়ালে কিভাবে সামগানের পাঠের বিকৃতি ঘটে, তার কিছু পরিচয় এসময়ে মিলেছিল। অধ্যাপক গায়ক হলে আরো বেশী মজা হত। বৈদিক গুরু আমাদের বড় ভালবেসে পড়াতেন এবং যতদিন অযোধ্যায় ছিলাম তার শেষ মাসটা বাদ দিলে আমি বরাবর তাঁর কাছে পড়তে যেতাম।

বেদান্তপাঠশালায় পড়ার সময় বন্ধুদের অনুরোধে আমি প্রমোদভবনের বড় কুটিরে চলে আসি। সেখানে এইসময় একশ'রও বেশী সাধু থাকত এবং এই জায়গা অযোধ্যার ভাল সাধুসেবী স্থানের মধ্যে গণ্য হত। আমার কয়েকজন সহপাঠী এর আশেপাশেই থাকত। এ ছিল সেই সময় যখন ধর্মীয় জগতে সর্বজনীন বক্তৃতার ধুমধাম ছিল। আর্যসমাজী, সনাতনপন্থী, খ্রীষ্টান, মুসলমান পরস্পরের শাস্ত্রার্থ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করত। বক্তাদের খুব কদর ছিল। যদিও অযোধ্যার বনেদি চালের মহাত্মাদের সভায় গলা ফাটিয়ে হাত-পা নেড়ে চিৎকার করাকে এক্কেবারে ধর্মবহির্ভূত নয়া কর্মপ্রণালী বলে মনে করা হত। কিন্তু নবীন প্রজন্ম বক্তৃতা মঞ্চের শক্তির কিছু কিছু আভাস পেতে থাকে। এই তো হালেই ভরতপুরের অধিকারী...জী ও লক্ষণাচার্যের বড় জায়গায় বক্তৃতা হল, যা আমরাও শুনতে গিয়েছিলাম। তার ফল হয়েছিল এই যে আমরা কয়েকজন সাধুছাত্র মিলে এই কুটিরে একটা ছোট বক্তৃতা মঞ্চ করেছিলাম। এই সভার প্রাণ ছিলাম আমি। সপ্তাহে একদিন আমরা যে কোনো একটি বিষয়ে বক্তৃতা করতাম। যদিও এই ছিল আমার প্রথম প্রয়াস কিন্তু এখানে আমি অন্ধদের মধ্যে কানা রাজার মত ছিলাম। স্বামী হংসস্বরূপ, পণ্ডিত জ্বালাপ্রসাদ মিশ্রের মুদ্রিত বক্তৃতা আমরা আমাদের ভাষণশিক্ষার অঙ্গ বলে মনে করতাম। আর্যসমাজের ধাক্কায় হিন্দুদের প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় বিরক্ত হয়ে পড়েছিল। মূর্তিপূজা, শ্রাদ্ধ, অনেকদেবতাবাদ, পুরাণের ওপর শ্রদ্ধা প্রভৃতি সিদ্ধান্তসমূহকে আর্যসমাজীরা তীব্রভাবে খণ্ডন করত। এই বক্তব্য যে শুধু খবরের কাগজ ও পুস্তকেই ছাপা হত তাই নয়, একেবারে অযোধ্যায়ও ফৈজাবাদের কেদারনাথ মহাশয় খুব সাড়া ফেলেছিলেন। যখন তখন তাঁর বক্তৃতা হত, যদিও আমার তা শোনার সুযোগ হয়নি। আর্যসমাজীরা তাদের এই খণ্ডন করার প্রবৃত্তির জন্য অপ্রিয় হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই বিরাগ ধর্মব্যবসায়ীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অন্যান্য হিন্দুরা তাদের ইসলামের সঙ্গে 'লড়ে' হিন্দুধর্ম রক্ষার নীতির দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছিল।

সভার আমরা কি নাম রেখেছিলাম? মনে নেই। যাহোক, বড় কুটিরে সপ্তাহে একবার সন্ধ্যায় আমরা ভাষণ দিতাম। বক্তৃতা দেওয়া শেখার বাসনা তো ছোঁয়াচে রোগের মতো ছেয়ে গিয়েছিল। আমাদের দেখাদেখি পণ্ডিত বল্লভাশরণের ওখানকার ছাত্ররাও নিজেদের সভা প্রতিষ্ঠা করেছিল। আমি মাঝে মাঝে ইচাক মন্দিরের পণ্ডিত গোবিন্দদাসের কাছে যাতায়াত করতাম। মনে হয় আমার ভাষণের খ্যাতি বড় কুটির ছাপিয়ে এখানকার ছাত্রদের মধ্যেও পৌঁছে গিয়েছিল। ওরা আমাকে ভাষণ দেওয়ার জন্য—ঠিক তাও নয়—ভাষণ দিতে শেখাবার জন্য—বিশেষ করে ধরে বসল। আমার একেবারেই আত্মবিশ্বাস ছিল না, তাতো বলতে পারব না। কিন্তু আমি নিজেকে বক্তা বলে মনে করতাম না। নোট লিখে বক্তৃতা দেওয়ার ব্যাপারটা

তখন পর্যন্ত আমি জানতাম না। এই প্রথম খেলোয়াড়ের সম্পর্কে আর কি বলা যেতে পারে? যাহোক, ওদের ছোট সভায় ভাষণ দিতে গেলাম। পণ্ডিত বল্লভাশরণও গিয়েছিলেন। মনে নেই কি বিষয়ে ভাষণ দিয়েছিলাম। আমি কি বলছিলাম, আমার নিজেরই তা ধারণা ছিল না। সামনে যাঁরা বসেছিলেন, বিশেষ করে পণ্ডিত বল্লভাশরণের প্রতিপত্তি এমন বিস্তৃত হয়েছিল যে সেখানে ভেবেচিন্তে কথা বলার অবকাশও ছিল না। আমার মনে হয়েছিল, ভূতাবিষ্ট হয়ে আমি কিছু বলছিলাম—ভূতাবেশও বলব না—কেননা ভাষণের শুরু থেকেই আমার স্বরের আরোহ্-অবরোহের বিশেষ সুযোগ ছিল না। ভাষণ শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমাকে সবাই খুব প্রশংসা করল। পণ্ডিতজী ছাত্রদের বললেন—এই রকম ভাষণ দিতে শেখ, যুগটা হল ভাষণের। বক্তৃতার প্রশংসায় আমি ততটা খুশী হইনি, যতটা খুশী হয়েছিলাম আমার মান বেঁচে যাওয়ায়।

এদিকে বেদান্ত পাঠশালায় এক নতুন ব্যাপার ঘটতে লাগল। শ্রীবলরামাচার্যর (তিরুমিশীতে যে পণ্ডিত ভাগবতাচার্যের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, ইনি ছিলেন তাঁর দীক্ষাগুরু) শিষ্য ইন্দোরের এক শেঠ এই পাঠশালা খোলার জন্য টাকা দিয়ে সাহায্য করছিলেন। যখন আমি তিরুমিশীতে ছিলাম, সেই সময় এই শেঠ সেখানে গিয়েছিলেন এবং পাঠশালা খোলা সম্পর্কে কথাবার্তা চলছিল। এখানে পাঠশালা খোলার উদ্দেশ্য ছিল উত্তরের আচারীদের রামানুজ বেদান্তের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া। কিন্তু এখানে পড়াশোনা করার জন্য দুচারজন আচারী কষ্টেসৃষ্টে এসেছিল। কেননা—অযোধ্যায় তাদের স্থানই খুবকম—আর ওদিকে বৈরাগীতে ভরে গিয়েছিল। বৈরাগীরাও রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবেদান্তকেই মানত, এ ব্যাপারে তাদের আচারীদের ওপর বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। নিজেদের বেদান্তের জ্ঞানের অভাব ছিল। তাই তারা আচারীদের প্রাধান্যকে স্বীকার করত। যদি বৈরাগীরা বেদান্ত শিখে যায়, তবে তাদের প্রাধান্যকে কেড়ে নেবে, এই ভেবে আচারীরা দিব্যদেশের বেদান্ত পাঠশালাকে নিজেদের সম্প্রদায়ের পক্ষে ক্ষতিকারক বলে মনে করেছিল। তারা এই পাঠশালাকে বন্ধ করার কথা ভাবতে থাকে। কিন্তু পাঠশালার অধ্যাপক এই মনোবৃত্তিকে গুরুত্ব দিতেন না, বরঞ্চ তিনি বুঝতে পারতেন না যে, শ্রদ্ধাশীল তরুণ মস্তিষ্কে বেদান্তের বীজ বপন করলে কিভাবে তা সম্প্রদায়ের ক্ষতি করতে পারে? তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও পড়াশোনায় তীব্র অনুরাগ দেখে তিনি চাননি যে পাঠশালা উঠে যাক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনিও তো পরাধীন, তাঁর কাছে এমন টাকা কোথায় ছিল যে তিনি শেঠ ও বলরামচারীকে ভর্ৎসনা করে লিখে দেবেন,—যাও, তোমরা তোমাদের টাকা নিজেদের কাছে রাখ, আমি তো এখানে এই ছাত্রদের পড়াব। আমরাও এমন আকস্মিকভাবে এই খবর পেলাম যে অন্য কোনো ব্যবস্থা করতে পারলাম না। তবুও এই খবর পেয়েও আমাদের মনে আগুন জ্বলে উঠল। আমরা আর একটি বেদান্ত পাঠশালা খোলার জন্য একটি অস্থায়ী সমিতি প্রতিষ্ঠা করলাম। পণ্ডিত গোবিন্দদাস হলেন তার প্রধানমন্ত্রী, আর আমি উপমন্ত্রী। পণ্ডিত গোবিন্দদাস কিছুটা নিষ্ক্রিয় ও মিতভাষী ছিলেন। তাই অনেক কাজ এসে পড়ল আমার ওপর। পণ্ডিত মথুরাদাস ও অন্য কিছু সাধু ছাত্র খুব তৎপরতার সঙ্গে অর্থ সংগ্রহের কাজে লেগে গেল। ভূতপুরীর বেদান্তী আমাদের উৎসাহ দেখে বললেন, 'এখন তো আমাকে সস্ত্রীক বাড়ি যেতে হবে। কিন্তু সেখান থেকে আপনাদের বেদান্ত পাঠশালায় পড়ানোর জন্য আমি অবশ্যই আসব।' তাঁর চলে যাওয়ার আগেই আমরা বছরে বার-তের শ' টাকা চাঁদার প্রতিশ্রুতি পেয়ে গিয়েছিলাম। এই কাজ করতে গিয়ে আমার অযোধ্যায় প্রায় সব মঠের মোহন্তের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ হয়েছিল। বড় জায়গার আর রাজগোপালের—দুই মোহন্ত আমাদের উৎসাহ অনেক বাড়িয়েছিলেন। পণ্ডিত বল্লভাশরণের সম্বন্ধ ছিল রসিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে। কিন্তু তিনিও

আমাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অন্যান্য পাকা রসিকেরা তো বেদান্ত ও বিশিষ্টাদ্বৈতকে অকেজো পণ্ডিতদের 'বাদবিতণ্ডা' বলে মনে করত।

বেদান্ত পাঠশালার জন্য আমরা ফৈজাবাদ থেকে রসিদ বই ছাপালাম, বসার জন্য চাটাই বানালাম। ছোটি কুটিয়া-র মোহন্তজী ছোট ফটকের পাশের কোঠা ঘরকে পাঠশালার জন্য দিতে রাজী হলেন। একদিন পণ্ডিত সরযূদাসজী ব্যাকরণোপাধ্যায়কে অধ্যাপক রেখে আমাদের পাঠশালার উদ্ঘাটনও করে দিলাম।

যে সময়ে আচারীদের অপমানপূর্ণ ব্যবহারে আহত হয়ে আমরা অযোধ্যার কিছু শিক্ষিত তরুণ বৈরাগী বেদান্ত পাঠশালা খোলার আয়োজন করছিলাম এবং অনেক জায়গায় বক্তৃতা সভা চালাচ্ছিলাম, সেই সময় য়ুরোপে মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল। আগে থেকেই আমি 'সরস্বতী' প্রায়ই পড়তাম। কিন্তু সাপ্তাহিক পত্রিকা পড়তাম কিনা আমার মনে নেই। মহাযুদ্ধ খবরের কাগজের দুনিয়ার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। কলকাতার 'বঙ্গবাসী' সাপ্তাহিকগুলির মধ্যে খুব জনপ্রিয় ছিল। গায়ে দেওয়ার ও বিছানোর চাদরের মতো পর্যাপ্ত বিশাল কলেবর এই পত্রিকা প্রতি সপ্তাহে আমার চোখের সামনে দিয়ে চলে যেত। কোথায় সেই সব লোক, কোথায় বা ব্রুসেলস—আমার তো বেলজিয়াম সম্পর্কেও আবছা জ্ঞান ছিল। খবরের কাগজের পক্ষে তখন মানচিত্র ছাপাটা জরুরী মনে করা হত না। সেই সময় খবর পড়ে মনে হত যে, ইংরেজ, ফরাসী ও রুশী সেনা ক্রমাগত জিতছিল কিন্তু ইংরেজের প্রতি আমাদের স্বাভাবিক ঘৃণা ছিল। তাই বিজয় সত্ত্বেও আমরা তাদের পরাজয় দেখতে চাচ্ছিলাম।

অযোধ্যা ও ফৈজাবাদের মধ্যে সড়ক থেকে কিছুদূরে দেওকালী নামে এক প্রসিদ্ধ দেবীস্থান আছে। অযোধ্যার বৈরাগীরা নিজেরা দখল করে তা শাক্তশূন্য করে ফেলেছিল। বাল্মীকির কথা অনুযায়ী যে রাম সীতাহরণের শোকেই মদ ও মাংস ছাড়লেন, তাঁকে তাঁর অযোধ্যায় কলিযুগের ভক্তরা চিরকালের জন্য মদ ও মাংস থেকে বিরত করে দিল! কিন্তু দেওকালী এমনই স্থান ছিল যে সে সময়েও দুই নবরাত্রির সময় পাঁঠাবলি হত। জানিনা কোথা থেকে এক ভবঘুরে যুবক ব্রহ্মচারী (বৈরাগী অথবা বৈষ্ণব নয়) ঘুরতে ঘুরতে সেখানে পৌঁছে যায় এবং সে আশ্বিনের নবরাত্রিতে বলি বন্ধ করাতে খুব বাধা দিতে আরম্ভ করে। গৃহস্থরা—বিশেষ করে গৃহস্থ স্ত্রীলোকেরা—পরিষ্কার দেখছিল যে, কালীমার কাছে পাঁঠা মানত করে তাদের ছেলে অথবা স্বামী বেঁচে গেছে, নয়তো তারা কবে পুত্রহীন অথবা বিধবা হয়ে যেত। তারা তাদের মানত অনুযায়ী মাকে পাঁঠা দেওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিল। অথচ সেখানে সেই যুবক সাধু তা করলে ভীষণ শাপ দিতে অথবা আত্মহত্যা করার জন্য প্রস্তুত। দুদিকেই ধর্মসংকট। কি করা যায়, গৃহস্থরা বুঝতে পারছিল না। কিন্তু দেওকালীর পূজারী খুব বুদ্ধিমান ছিলেন। নবরাত্রির দিন কেটে যাচ্ছিল। অথচ সেখানে একটিও পাঁঠা আসছিল না। বলির পাঁঠার মুণ্ডটি পূজারীর প্রাপ্য আর মুণ্ডের ঝোল খুব স্বাদু, এই কথা মনে হতেই, ব্রহ্মচারীর বিরুদ্ধে তাঁর রক্ত গরম হয়ে উঠছিল। তার ওপর বলির সঙ্গে প্রাপ্য দাক্ষিণাও তাঁর হাত থেকে ফসকে যাচ্ছিল। আর যদি কালীর প্রতাপকে এরকম রাম-শ্যাম এসে কমিয়ে দিতে থাকে, তবে পাণ্ডা-পূজারী কত দিন বাঁচতে পারবে। তিনি স্থির সিদ্ধান্ত নিলেন যে, নবরাত্রির শেষ দিন (আশ্বিনের শুক্লা নবমীর দিন) বলির ব্যবস্থা করতেই হবে। সেই জন্য কালীমা যে ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়েছেন তাও সর্বত্র বলে বেড়াতে লাগলেন।

ব্রহ্মচারী নবমীর লড়াইয়ে ভয় পেয়ে গেল। নবমীতে যদি বলি পড়ে, তবে সে যা কিছু করেছে সব বেকার হয়ে যাবে। এই কথা ভেবে সে বড় চিন্তায় পড়ে গেল। সেই সময় আমাদের মতো বৈরাগী যুবকদের কথা সে জানতে পারল। সে আমাদের কাছে এসে পশুবলির বিরুদ্ধে

আমাদের প্রবণতাকে আরো উত্তেজিত করল। আমাদেরও মনে হল যে 'পঞ্চকোশী'র মধ্যে যদি নিরপরাধ পশুবলি হয়, তাহলে আমাদের ডুবে মরার ব্যাপার হবে। আমরা নবমীতে দেওকালী যাওয়ার কথা দিলাম।

যখন আটটা নাগাদ অযোধ্যা থেকে দেওকালীর উদ্দেশে রওনা হলাম, তখন আমাদের মনে হল যে, পাণ্ডা গোপনে কিছু গৃহস্থকে বলি দেওয়ার জন্য নিয়ে আসবে। সেই সময় আমাদের ভব্য বৈষ্ণব স্বরূপের বাণী প্রয়োগ করতে হবে। ব্রহ্মচারীর বক্তব্য অনুযায়ী এতেই গৃহস্থদের বলি দেওয়ার হিম্মত নষ্ট হয়ে যাবে। নিমন্ত্রিত যুবকদের মধ্যে পণ্ডিত গোবিন্দদাস সবচেয়ে বেশী সংস্কৃতজ্ঞও (কাশীর ব্যাকরণাচার্যের কয়েক খণ্ড পাস) ছিলেন। কিন্তু লেট-লতীফ হওয়ায় দেওকালী খণ্ড সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত তিনি রাস্তায়ই ছিলেন। আমাদের বন্ধুদের মধ্যে দুজন তিরহুতের সাধু খুব মোটা-সোটা ছিল, এক 'লস্করী' তো একেবারে পালোয়ানের মতো ছিল। আর একজন ছিল 'হরিব্যাসী', সে কিছুটা নরম। বড়ি কুটিয়ার পঞ্চশিখী পরমহংস ছিল। সাধারণ শরীরের স্বামী এই লড়াইয়ে যোগ দিলে মথুরাদাসজী সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে। বয়সে আমি সবচেয়ে ছোট। আমি তখন ২১ বছরের লম্বা, ছিপছিপে যুবক। সাধুদের নিয়মানুসারে আমার পাতলা ধুতি লুংগির মতো করে পরা, মাথা খালি, হয়তো পায়ে জুতা ছিল। রওনা হওয়ার সময় পণ্ডিত গোবিন্দদাসজী এক শিশুগাছের ছড়ি হাতে তুলে নিয়েছিলেন। দেখতে নিশ্চয় আমার ঠাঠবাটই ছিল সবচেয়ে বেশি বড়লোকের মতো। আমি নিজেকে এই সমাবেশের নেতা বলে মনে করিনি, এবং আমার নেতা হওয়ার ইচ্ছাও ছিল না। তবু বোলচালে আমিই ছিলাম সব থেকে বেশী সাহসী। সবচেয়ে বেশী দেশও আমিই দেখেছিলাম। আর পড়াশোনায় বেশি না হলেও কারুর চেয়ে কমও ছিলাম না। আমরা কত যুগ বাদে অযোধ্যা থেকে দেওকালী পৌঁচেছিলাম, তার ঠিক আন্দাজ নেই। কিন্তু পরের ঘটনাবলী থেকে অবশ্যই সেই সময়টা মনে হয়েছিল কয়েক যুগ। চারদিকের প্রাচীরে একটা বড় দরজা ছিল। বলা হল তার ভেতরে দেওকালীর স্থান। দরজার বাইরে দশ কদম দূরে চারদিকে পাকা ঘাটওলা এক পুকুর ছিল। দরজার পাশে অনেকগুলি মালী স্ত্রী-পুরুষ ফুল-বাতাসা বিক্রী করছিল। দরজার সামনে ঘাটের ওপরের সিঁড়িকে আমরা বক্তৃতামঞ্চ বানিয়ে ফেললাম। একের পর এক আমরা সবাইকে বোঝাতে লাগলাম। কেউ কেউ তো দেবীকে জগন্মাতা বলে 'বাচ্চা' (ছোট পাঁঠা) বলি দেওয়া নিষিদ্ধ তা প্রমাণ করছিলেন। কেউ বলছিল প্রাণ-হিংসা পাপ ও নরকের রাস্তা। বক্তৃতা উচ্চ গ্রামে পৌঁছে অভিশাপ দেওয়ার মতো অবস্থায় চলে গিয়েছিল। বিশেষ করে যখন আমাদের ভাষণ দেওয়া সত্ত্বেও একটা পাঁঠাকে পুকুরে নিয়ে তাকে স্নান করানো হচ্ছিল। সম্ভবত পাঁঠাকে স্নান করিয়ে তার মাথায় ফুলের মালা পরিয়ে লাল চোখে এক পাণ্ডা বানানো যজমান অর্থাৎ (আমাদেরকে বলা হয়েছিল যে সাধারণ মানুষ যাতে বলি দিতে রাজী হয় সেজন্য পাণ্ডারা নিজেদের পয়সায় পাঁঠা কিনে নিজেদেরই লোক দিয়ে বলি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে)—এর হাতে পাঁঠাকে ধরে সে দরজার ভেতরে ঢোকে। আমার বন্ধুরা রাগে অধীর হয়ে দরজার ভেতরে ঢোকার জন্য এগোতে থাকে। আমি তাদের ভেতরে যেতে বারণ করলাম। কিন্তু এখানে তো অহিংসা ভূত হয়ে তাদের মাথায় সওয়ার হয়েছিল। আমার ছয়-সাতজন বন্ধুকে আগে যেতে দেখে আমিই বা কি করে পেছনে পড়ে থাকি? সীমানার মধ্যে এক দিকে দেবকালীর সাদামাটা পাকা মন্দির, তার সামনে বলির কাঠগড়া। সামনে এক উঁচু ভিতের ওপর বারাণসীর মহারাজার তৈরী এক মন্দির যাতে হয়তো তৎকালীন মহারাজের পোরসিলিনের ওপরে আঁকা চিত্রও ছিল। আমার বন্ধুরা তাঁর উঁচু চত্বরকে ভাষণমঞ্চে পরিণত করে। ভাষণের অর্থ ছিল জ্বলে পুড়ে যাওয়ার অভিশাপ ও গালাগালি। সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল। যখন পাণ্ডা পাঁঠার গলা কাটার জন্য অস্ত্র

ওঠাল, তখন আমি বন্ধুদের বললাম, এখন বক্তৃতা বন্ধ করুন, নিজেদের চোখে বলি দেখে লাভ কি। বাইরে আসুন, চলে যাই।

যখন বাইরে যাওয়ার জন্য আমরা ফটকের কাছে পৌছলাম, সেই সময়ই পাণ্ডারা হাত চালাতে শুরু করল। কয়েকজন বন্ধু মার খেল। হরিব্যাসী বাবার কল-অলা ছাতা এক ঝটকায় ছিনিয়ে নেওয়ার সময় তার হাতে তা লেগে ঘা হয়ে গেল, ছাতা তো গেলই। পালোয়ানের মতো দেখতে লস্করী বাবাকে দেখে প্রথম দিকে পাণ্ডা কিছুটা ভয় পেয়েছিল বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু সে যখন পিঠ কুঁচকে বাইরে বেরোবার চেষ্টা করছিল, তখন মোটা শরীরে ছোট হিম্মত বুঝতে পারায় তার পিঠেও কয়েক ঘা পড়ে। এক পাণ্ডা আমার দিকে ইশারা করে নিজের সঙ্গীদের চেঁচিয়ে বলল—'আরে এটা তো একেবারে গা বাঁচিয়ে পালাচ্ছে। তারা আমাকে মারতে লাফিয়ে এল। পরিস্থিতি খুব আবেশের ছিল। আমার সঙ্গে যারা ছিল তাদের ছাতা ছাড়া আর কিছু ছিল না। কার্যকারণ বিচার করে পক্ষ-বিপক্ষের যুক্তি শুনে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অবকাশ কোথায়। এখানে যা কিছু সিদ্ধান্ত হচ্ছিল তা সবই হচ্ছিল সেকেন্ডের মধ্যে সহজ বুদ্ধির দ্বারা। একতরফা মার খেয়ে ফিরে যাওয়া আমার কাছে কিছুটা লজ্জাকর ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল। তখনো গান্ধীজীর নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের ধ্বনি কানে পৌছয়নি। পাণ্ডা ছুটে এসে আমার রেশমী চাদর ধরে ফেলল। আমি চাদর ফেলে আগে ছুটলাম। সে ডাণ্ডা চালাল। আমি তা এড়িয়ে শিশুগাছের ছড়ি চালালাম। সে তা ধরে ফেলল। শেষমেশ, শিশুগাছের ছড়ি তো সখের ব্যাপার, তা মারপিটের জন্য একেবারেই ছিল না। টানাটানিতে ছড়ি মাঝখান দিয়ে ভেঙে গেল। কিন্তু ততক্ষণে আমি ফটকের বাইরে পৌছে গেছি। সেখানে লোকজনের ভারী ভিড় ছিল। তাদের সামনে সাধুদের গায়ে হাত তোলার সাহস ছিল না পাণ্ডাদের। আমাকে একেবারে মার না খেয়ে বাইরে বেরোতে দেখে এক পাণ্ডা (যার ওপর হয়ত আমার ছড়ি পড়েছিল) আর কিছু না পেয়ে তার পাশে বসা মালিনীর ফুলের ডালা রাখার টিন উঁচিয়ে ছুঁড়ল। কিন্তু তাও আমার গায়ে লাগল না, আমার বন্ধুর পিঠে লেগে ঝনঝন করে মাটিতে পড়ল।

মন্দিরের বাইরে, দরজারও কিছুটা দূরে চলে যাওয়ার পর পাণ্ডারা ফিরে গেল। আমি দেখলাম আমার সঙ্গীরা সব কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে। এরপর কি করা যাবে কেউই তা বুঝে উঠতে পারছিল না। জানা গেল, এখানে পুলিশ চৌকি আছে। আমি বললাম, পুলিশকে যদি আমরা খবর না দিই, তবে যারা আমাদের পিটিয়েছে, উলটে তারাই আমাদের বিরুদ্ধে মকদ্দমা দায়ের করবে এবং হয়রান হতে হবে আমাদেরই। আমি জানতাম যে প্রত্যেককে যদি আলাদা আলাদা বয়ান দিতে বলা হয়, তবে অনেক পরস্পরবিরোধী কথা বেরিয়ে আসতে পারে। তখনই চারদিকে দাঁড়ানো লোকের ভিড়ে সঙ্গীদের নিজেদের এজাহার সম্পর্কে রিহার্সাল দেওয়াও সম্ভব ছিল না। আমি বন্ধুদের বললাম—'আমরা পুলিশ চৌকিতে যাব। আমি প্রথম আমার বয়ান লেখাব। তারপর সেই অনুযায়ী সবাই বলবেন। দরজার ভেতরে আমরা কাশীরাজের মন্দির দর্শনে গিয়েছিলাম। বক্তৃতা দিয়ে বলি বন্ধ করতে যাইনি, এই কথা খুব করে মনে রাখতে হবে।'

পুলিশ চৌকিতে পৌছতে পৌছতেই আমি ওদের স্বনির্বাচিত নেতা হয়ে গেলাম। চৌকিতে সব কথাই পুরোপুরি সত্য বলেছিলাম। শুধু মন্দিরের ভেতর ভাষণমঞ্চ তৈরীকে আমরা দেবদর্শনে পরিণত করে দিলাম। পাণ্ডারাও সেখানে গিয়েছিল। তারা আমাদের ওই একটা মিথ্যা কথার প্রতিবাদ করে আর সেই সঙ্গে মারপিট করার কথা অস্বীকার করে। চৌকি থেকে আমরা সেপাইয়ের সঙ্গে ফৈজাবাদ কোতোয়ালিতে গেলাম। কোতোয়াল সাহেব ছিলেন মুসলমান। তিনি হয়তো আজমগড় জেলার লোকই ছিলেন। তিনি আমাদের এজাহার নেন। আমি আমার প্রথম এজাহারেরই পুনরাবৃত্তি করলাম। আমার সঙ্গীরাও তাই সমর্থন করল। পাণ্ডাদেরকে

জিগ্যেস করা হলে আমরাই মারপিট করেছি বলে তারা জানায়। এই সময় অযোধ্যার এক লম্বা-চওড়া জাঁদরেল রাজপুত সাব-ইনস্‌পেক্টর সেখানে কোনো কাজে এসেছিল, সে শুধু পাণ্ডাদেরকেই নয়, তাদের দেবীকে পর্যন্ত যাচ্ছেতাই বলতে শুরু করল—'এই পাঁচ-ছয় সাধু যারা লেখাপড়া করছে, তারা তোমাদের সঙ্গে লাঠালাঠি করতে গিয়েছিল? ওঁদের যদি তাই ইচ্ছে হত তাহলে ওরা কি লাঠিয়াল সাধু অযোধ্যায় পেত না? কেন মিথ্যা কথা বলছ? কোতোয়াল সাহেব এই শা··· বিরুদ্ধে কেস দিন। আর এদের দেবীও··· কিরকম তাকে জগন্মাতা বলা হয় সেই তার নিজের বাচ্চাকে খাচ্ছে?···'

আমার সঙ্গীদের মধ্যে কেউ আমার কানে ফিসফিস করে বলল, 'জানতো, এ হল আর্যসমাজী!'

আর্যসমাজী খুব খুশী হয়ে বলছিল। কিন্তু এই সময় সে ভুলে গিয়েছিল যে সে পরোক্ষভাবে মূর্তিপূজাকে ধূলিসাৎ করে দিচ্ছে।

কারুরই এমন কঠিন আঘাত লাগেনি যাতে পুলিস কেস করতে পারে অথবা কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারে। মামলা করার কথাবার্তা হলে লোকজন বলল—ফৈজাবাদের আর্যসমাজী উকীল এতে পুরো সাহায্য করবেন। আমি এক সঙ্গীকে নিয়ে বলদেও বাবুর (আচার্য নরেন্দ্রদেও-র বাবা) কাছে দুয়েকবার গেলাম। তাঁর কাছে মকদ্দমার সব কথা বললাম, তিনি সহায়তা করতেও তৎপর ছিলেন। শেষ পর্যন্ত আমি দেখলাম যে আমার বন্ধুরা মামলার জন্য দৌড়াদৌড়ি করতে চাইছে না। আর সমস্ত বোঝাটা আমার ওপর ছেড়ে দিতে চায়। পক্ষান্তরে পাণ্ডা চাইছিল আপোষের ব্যবস্থা করতে। এই পরিস্থিতিতে মকদ্দমা চালানোর প্রশ্ন ছেড়ে দেওয়াই আমি উচিত মনে করলাম। আমাদের জিনিষগুলি পেয়ে গেলাম, পাণ্ডারা অনুশোচনা করল। মামলা এখানেই খতম হয়ে গেল।

আমি আর্যসমাজের নাম প্রথম প্রথম ১৯০১ অথবা ১৯০২-এ রানীকিসরাইয়ে আমার যোগী মাস্টারের কাছে শুনেছিলাম। আমি শুধু জানতাম যে, ওরা দেব-দেবীর নিন্দা করে। বারাণসীতে দয়ানন্দ স্কুলে (বর্তমান ডি· এ· ভি· কলেজ) আমি কয়েকমাস ছাত্র ছিলাম। কিন্তু সেখানে সর্বদাই জলে পদ্মের মতো ছিলাম। কখনো তাদের কথাবার্তা শুনতে চাইনি, শুনিওনি। এখানে অযোধ্যায় ভাষণ দিতে শেখার ব্যাপারে, সনাতনধর্মী ব্যাখ্যা তা হংসস্বরূপ, জ্বালাপ্রসাদ মিশ্র ইত্যাদির আর্যসমাজী মত খণ্ডনের বই পড়েছিলাম। আর্যসমাজের প্রতি এক ধরনের ঘৃণা জন্মায় এমন জিনিসই বেশি পড়েছিলাম। কিন্তু কখনো কখনো কোনো কোনো জিনিষ এমন জায়গায় মিলে যায় যা সেখানে পাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে কম। খণ্ডনগুলি পড়ার সময় আমি বেশ কয়েকবার স্বামী দয়ানন্দের 'সত্যার্থপ্রকাশ'-এর নাম শুনি। আমিও প্রথমদিকে একে 'মিথ্যার্থপ্রকাশই' বলতাম। একদিন পণ্ডিত মথুরাদাসের কাছে তার একটি কপি দেখতে পেলাম। তিনি এর যুক্তির খণ্ডনের জন্যেই বইটি পড়তে চাইছিলেন। আমি তো গ্রন্থকীট ছিলামই। ঐ বই নিয়ে আমি তা পড়তে লাগলাম। কোন কোন 'সমুল্লাস' পড়ে ফেললাম, তা মনে নেই। গোটা বইটা তো নিশ্চয়ই পড়তে পারিনি এবং পড়েও ছিলাম অনেক কিছু খণ্ডন করার দৃষ্টিতে, কিন্তু তার যুক্তিপূর্ণ কথা হটকারিতার মোকাবিলা করছিল। এদিকে দেওকালীর মামলায় অযোধ্যার সাব-ইনস্‌পেক্টর ও বাবু বলদেওপ্রসাদ উকীল প্রমুখ ব্যক্তি যাঁরা আর্যসমাজী বলে আমাকে বলা হয়েছিল, তাঁদের কথাবার্তা আর্যসমাজের প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গী পালটে দিল। অতএব সত্যার্থপ্রকাশের পরের অংশকে আমি শুধু খণ্ডন করার দৃষ্টিতেই পড়ছিলাম, তা নয়।

বরদরাজ আমার সঙ্গে থাকত না। কিন্তু ক্রমাগতই আমাদের দেখা হত। পরসা ও অন্যান্য

বৈরাগী সংস্থাগুলি থেকে ভিন্নত্বের বীজ আমার মনে যথেষ্টই বোনা হয়েছিল। এ ব্যাপারে আর্যসমাজের সংশ্লেষকে বাদ দিলে অন্য সব ব্যাপারে বরদরাজ আমার ভাগীদার ছিল। আমার আর এখন অযোধ্যা থাকায় রুচি রইল না। আমার সহপাঠী ও সহকারীদের মনোবৃত্তির সঙ্গে আমার মনোবৃত্তির পার্থক্য এসে গিয়েছিল। আর্যসমাজ ছাড়াও খবরের কাগজের দ্বারাও আমার গায়ে বাহ্য জগতের হাওয়া লাগছিল। আমার অন্তঃস্থলের সংকীর্ণ গর্ত থেকে বেরিয়ে বিশাল জলাশয়ে যাওয়ার বোবা বেদনা অনুভব করছিলাম। যদিও তখনো আমি বুঝতে পারিনি, এই জলাশয় কোন দিকে, কি রকম?

বহুদিন পর পিসামশাইকে বছওয়ল-এ এক পত্র লিখলাম। এই চিঠিতে আমার মানসিক উথালপাথালের চিহ্ন নিশ্চয়ই ছিল। তিনি বাবাকে হুকুম দিয়েছিলেন—যাও, ছেলেকে অযোধ্যা থেকে নিয়ে এসো।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে তিনি অযোধ্যা থেকে খালি হাতে ফিরেছিলেন, কিন্তু এবার নয়।

তৃতীয় পর্ব

নব-প্রকাশ (১৯১৫-২২)

১

"কিং করোমি, কুত্র গচ্ছামি" (কি করি কোথায় যাই)

কার্তিকের প্রথম পক্ষে দেওয়ালীর কাছাকাছি সময়ে বরদরাজের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি বাবার সঙ্গে কনৈলায় রওনা হই। বর্ষা শেষ। রবি ফসল বোনা হচ্ছিল। আমি যখন কনৈলা পৌঁছলাম, ধান তখনো কাটা হয়নি। মনে হয়, আমরা আজমগড় স্টেশনে নেমেছিলাম। বাবার বিশ্বাস হয়েছিল যে বৈরাগ্যের ভূত এখন আমার ঘাড় থেকে নেমেছে, এখন আমি পুরোপুরি প্রকৃতিস্থ এবং গৃহস্থালির দায়িত্ব বহন করতেও প্রস্তুত। তিনি বুঝতে পারেন নি যে এই শান্ত অবস্থা আসন্ন প্রচণ্ড ঝড়েরই পূর্বাভাস মাত্র। তিনি হয়তো ভালভাবে বুঝতে পারেন নি যে, যে-বিয়েকে তাঁরা অথবা সমাজ স্থির, মজবুত বেড়ি মনে করে আমার পায়ে পরিয়ে দিয়েছিলেন,

তাকে কবেই আমি অস্বীকার করে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছিলাম। আর এই কথা মনে হওয়ার পর এক মুহূর্তের জন্যও আমার মন কনৈলায় থাকতে প্রস্তুত ছিল না।

যখন আমি মাদ্রাজের তীর্থ পর্যটন করছিলাম, তখনই দাদুর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় আমার কথা তাঁর সব সময়েই মনে ছিল। আমাকে তিনি অসম্ভব ভালবাসতেন। আমার জন্য তিনি কত কী স্বপ্নই না দেখেছেন। আমি ছিলাম তাঁর প্রাণ। আমার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য তিনি তাঁর অজান্তে আমার জীবন প্রবাহের জন্য পথ কেটেছিলেন। কিন্তু মানুষের জীবন প্রবাহ নদীর ধারার চেয়েও বেশি দুর্দমনীয়। দাদু তাঁর স্বপ্নকে সফল করতে পারেননি। যাকে তিনি তাঁর সর্বস্ব দিয়েছিলেন, যার জন্য তিনি তাঁর সহোদর ভাই ও তার সন্তানদের সঙ্গে ঝগড়া করেছিলেন, জন্মভূমিকে ছেড়েছিলেন, জামাতার বাড়িতে থাকার নিন্দা স্বীকার করেছিলেন, তাকে দেখার জন্য কেঁদে কেঁদে তাঁর জীবন শেষ করতে হয়েছিল। সত্যি সত্যি আমার মনে তাঁর জন্য সমবেদনা ছিল। কিন্তু দক্ষিণে তাঁর আসন্ন মৃত্যুর চিঠি পেয়ে আমার হৃদয়ে কি এই সমবেদনা হতো।

বছওয়ল যাওয়ার পর কিছুটা যেন বিজয়গর্বের সঙ্গেই পিসামশাই বলেছিলেন—"ক বিশেষঃ" অর্থাৎ বৈরাগ্য অথবা বাড়ির মধ্যে কোনটা ভাল? আমি কোনো উত্তর দিইনি এবং তাতে আমার মেজাজও খারাপ হয়নি। আমি এ সময়ও আমাকে নিজের পথ থেকে দূরে বলে মনে করিনি। হ্যাঁ, এই পথ যে কোন্ নতুন দিশার সংকেত জানাচ্ছিল, তা তখনো আমার চোখে স্পষ্ট হয়নি। এবার সাপ্তাহিক পত্রিকায় যুদ্ধের খবর পড়ার জন্য প্রতি সপ্তাহে আমাকে বছওয়ল যেতে হতো। যদিও 'বঙ্গবাসীর' বিপুল কলেবরের দু-তিন কলাম জুড়ে যে খবর ছাপা হতো, এবং প্রত্যেক সরকার নিজের নিজের জায়গায় যেভাবে এই খবরকে নিজস্ব যুদ্ধ সম্পর্কিত প্রচারের মাধ্যম করছিল, তাতে আমাদের মতো আনাড়ি লোকের পক্ষে কিছু বুঝে ওঠা মুশকিল ছিল। তবুও খবর পড়ার পর ছোট পিসামশাই (যাগেশের বাবা) সোৎসাহে জিগ্যেস করতেন—কি বাবা, লড়াইয়ের কি খবর বলো। তিনি নিজেও কাগজ পড়তেন। কাগজে যাই লিখুক না কেন, আমাদের সবাইয়েরই রায় ছিল, যুদ্ধে জার্মানি জিতছে। যদিও বাস্তবিকতা সম্বন্ধে আমাদের বিন্দুমাত্র জ্ঞান ছিল না।

আমি যখন বছওয়াল যেতাম না, তখন যাগেশ কনৈলা চলে আসত। কনৈলা ও বছওয়াল দু'জায়গার লোকেরাই আমাদের দুজনকে দুটি 'চণ্ডাল' বুঝতে পেরেও বরদাস্ত করতে বাধ্য হয়েছিল, যদিও তাঁদের মনে শংকা ছিল। এবার যোগেশ কোথা থেকে "সঙ্গীতরত্নপ্রকাশ"—অর্থাৎ আর্যসমাজী গীত সংগ্রহ—যোগাড় করেছিল। খাটে শুয়ে আমরা বড় মৌজ করে আমাদের সঙ্গীত পলায়ন স্বরে আর্যসমাজের মূর্তিপূজা-শ্রাদ্ধ বিরোধী ভজনগুলি গাইতাম। একদিন এমনি সময়ে পরিবারের এক কাকা এসে পড়েছিলেন। তিনি গ্রামের সেই সব লোকেদের মধ্যে ছিলেন, দারিদ্র্যের জন্য যাঁদের বিয়ে হয়নি এবং কিছুদিনের মধ্যেই যাদের বিয়ে ব্যাপারটা একেবারে তামাদী হয়ে যাবে। তিনি বললেন—"আমি দোহ্‌রীবরহলে আর্যসমাজীদের সভা দেখেছিলাম। ওরা এখানে এসে পৌঁছোয়নি তো?"

"এখানে কি প্রয়োজন, কাকা?"

"আরে, বিধবা বিবাহ চলত। কত ঘরের প্রদীপ নিভবার অবস্থা।"

আর এই কথার মধ্যে অনেকটা সত্য ছিল। কনৈলার বিশ ঘর ব্রাহ্মণের মধ্যে নয় ঘরের সন্তানেরা একেবারেই অবিবাহিত ছিল। আর ব্যক্তির কথা ধরলে বলা চলে যে মাত্র দু'তিনটি এমন ঘর ছিল যাদের বিয়ের ব্যাপারে নিশ্চিন্ততা ছিল, বাকি সব ঘরে বেশ বয়স্ক ব্যক্তিরা

অবিবাহিত ছিল। এদের সবাইয়ের বিয়ে হলে অনেক সন্তান হবে, ঐ সময় একথা নিয়ে আমার মাথা ঘামানোর দরকার ছিল না।

অগ্রক্রয়াধিকারের টাকার ব্যবস্থা কোনোভাবে ক'রে বাবা জিগরসণ্ডীর জমিদারী নিজের আত্মীয়ের নামে কিনে নিয়েছিলেন। তিনি স্বয়ং সেখানকার তহ্শীলে উশুল করতে যেতেন। আর কখনো কখনো আমিও গ্রাম দেখতে যেতাম। একদিন গ্রামে যাওয়াতে আমার এক পরিচিত রাজপুত পরিবারে জ্যান্ত মাছ মেরে এনেছিল। ওদের পক্ষ থেকে বলা হল—"পাণ্ডেজী আসুন, মাছ রাঁধুন না?" (ব্রাহ্মণ হওয়ায় আমার পক্ষে রাজপুতের হাতের কাঁচা রান্না খাওয়া সম্ভব ছিল না এবং মাছ যে কাঁচা রান্না তাতে সন্দেহ ছিল না।) ছেলেবেলার প্রিয় খাদ্য কিছুদিনের সংসর্গে অপ্রিয় হয়ে যায় না। আমি রেঁধে খেলাম। তেলে ভেজে হলদি ও সরষে দিয়ে রান্না করা মাছ, জানি না, ঐ সময় কি করে এমন সুস্বাদু হত? জিগরসণ্ডীতে একটি লোক ছিল যে অনেক বছর ব্রিটিশ গায়না (দক্ষিণ আমেরিকা) থেকে ফিরে এসেছিল। আড়কাঠির দ্বারা প্রতারিত হয়ে সে কুলী হয়ে সেখানে গিয়েছিল। বিশ বছর সেখানে থাকার পরও সেখান থেকে সে খালি হাতে ফিরে এসেছিল। খুব ঘটা করে সে এক ধরনের ইংরেজী বলতো যার সঙ্গে ব্যাকরণের কোনো সম্পর্ক ছিল না। গায়নার আরামের কথা যখন তার মনে হতো, তখন সে ফিরে আসার জন্য আক্ষেপ করতো।

এবার পরমহংস বাবার কুটিরে গিয়েছিলাম কিনা মনে নেই। বৈরাগ্য ও বেদান্তের জোর কমে তার গতি অন্য কোনো দিকে যাচ্ছিল। জিজ্ঞাসা ও ভ্রমণলিপ্সার বেগ আগের মতোই ছিল।

প্রয়াগের মাঘমেলা কাছাকাছি এসে গিয়েছিল। সেখানে যাওয়ার জন্য যাগেশের সঙ্গে পরামর্শ হলো। বাড়ির লোকেদের আমার ওপর আর আগের মতো সন্দেহ ছিল না। তাই আমাদের তেমন চোখে চোখে রাখা হয়নি। একদিন কোনোভাবে আমার হাতে বিশ-পঁচিশ টাকা এসে গেল এবং আমিও রাণীকীসরাই স্টেশন থেকে প্রয়াগের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

প্রয়াগে আমি যাগেশের থেকে দু'চারদিন আগে পৌঁছেছিলাম। পয়সা ছিল, মেলায় থাকার জায়গার অভাব ছিল না। আজকালের মেলাকে সেই দৃষ্টিতে কখনো দেখিনি। সেই সময় তো অনেক জায়গায় ধর্মীয় ভাষণ দিতে দেখা যেত। পুরনো ঢঙের কথক ঠাকুর সন্ধেবেলায় যেখানে তাঁদের কথা শুরু করতেন, সেখানে সনাতন ধর্ম ও আর্যসমাজের শামিয়ানাগুলিতে নতুন ধরনের ব্যাখ্যান শোনা যাচ্ছিল। ঐ সময়েই আমি প্রথম মদনমোহন মালব্য-এর ব্যাখ্যান শুনি। হতে পরে কোনো ধর্মীয় সভার বিশেষ অধিবেশন ছিল। কুমায়ুনের পণ্ডিত দুর্গাদত্ত পন্ত ঋষিকুলের দুই ব্রহ্মচারীর সঙ্গে এসেছিলেন, যাঁদের মাথায় রুদ্রাক্ষের মালা বাঁধা ছিল। আর্যসমাজের ব্যাখ্যান আমি বেশী শুনতাম এবং তাদের খণ্ডন-মণ্ডনের গ্রন্থও নিয়ে পড়তাম। যাগেশ চলে আসার পর ওর শ্বশুরবাড়ির আত্মীয় এক পুলিশের জমাদারের কাছে আমরা রাত্রিতে থেকে যেতাম।

আমার ইচ্ছা ছিল খাওয়া-পরা চলে যায় এমন কিছু রোজগার করে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া। এই কথা মাথায় রেখেই আমি একদিন ইন্ডিয়ান-প্রেস-এ গেলাম। এদিকে, কয়েক বছর ধরে 'সরস্বতী' নিরন্তর পড়ছিলাম। আর চশমা পরা ঝুলে-পড়া-গোঁপ নিয়ে যে লোকটি দেয়ালে হেলান দিয়ে কথাবার্তা বলছিলেন, আমার মনে হয়েছিল তিনিই পণ্ডিত মহাবীর প্রসাদ দ্বিবেদী। অবশ্য আমার এই ধারণা সঠিক ছিল না। আমি পণ্ডিত রামজীলাল শর্মার সঙ্গে কথা বলছিলাম। তিনি খুব বিনয়ের সঙ্গে বললেন—"যদি দু'তিন দিন আগে আপনি আসতেন, তবে প্রুফ রীডারের কাজে আপনাকে আমি রেখে নিতাম। কিন্তু দুঃখের কথা, এখন তো কোনো কাজ নেই।" এই সময় একদিন যখন শাহাগঞ্জে যাগেশের ভগ্নীপতি ব্রজভূষণ পাণ্ডের (?) ওখানে

গেলাম, সেখানে কাঠের পা-অলা আলিগড়ের এক বাবুর সঙ্গে দেখা হলো। তিনি হাইকোর্টে কাজ করতেন। বেশ কয়েকজন লোক এসেছিলেন। আমার পড়াশোনা করার ইচ্ছা দেখে তিনি বললেন—"আগ্রায় পণ্ডিত ভোজদত্তের বিদ্যালয়ে চলে যাচ্ছো না কেন? সেখানে খাওয়া-দাওয়া ও পড়াশোনার ব্যবস্থা আছে। ব্যাখ্যাম শেখানো হয়।"

ওর কথা আমার মনে গেঁথে গেলো। প্রয়াগে মকর সংক্রান্তিটা নিশ্চয়ই পুরো ছিলাম। আর হয়তো অমাবস্যা পর্যন্ত আরো থেকে থাকব। আমি এলাহাবাদ থেকে যখন আগ্রা রওনা হলাম, তখন আগ্রার টিকিট কাটার পর আমার কাছে আট আনা পয়সা বেঁচে ছিল।

২

আগ্রায় আর্য মুসাফির বিদ্যালয়

সেইদিন (জানুয়ারি ১৯১৫) সকালের গাড়িতে আগ্রায় নেমেছিলাম। স্টেশনে নেমেই আর্য মুসাফির বিদ্যালয়ের ঠিকানা পাইনি। বিদ্যালয়টি খুঁজে বার করার চেয়েও জরুরি ছিল হাত-মুখ ধুয়ে নেওয়া। তাই সোজা যমুনার তীরে চলে গেলাম। হাত-মুখ ধুলাম, হয়তো স্নানও করেছিলাম। স্নান করতে আসা এক ভদ্রলোক আমাকে বলে দিলেন বিদ্যালয়ের ঠিকানা নামনেরা। আট আনা পয়সার কিছুটা জলখাবারে খরচ হয়ে গিয়েছিল। বাকী পয়সা পকেটে রেখে আমি পায়ে হেঁটে নামনেরের দিকে রওনা হলাম। মহল্লা আর সেখানে মুসাফির বিদ্যালয় খুঁজে পেতে দেরি হল না। সড়ক থেকে কিছুটা হেঁটে যাওয়ার পর একটা মন্দির ছিল, তার আড়ালে মুসাফির বিদ্যালয়ের বাড়ি। বিদ্যালয়ের জন্য বিশেষভাবে কোনো বাড়ি ঠিক করা হয়নি। আর্যসমাজের জন্য একটা পুরনো বাড়ি কেনা হয়েছিল, তাতেই বিদ্যালয়ের কাজ হত। দরজার ভেতরে ঢুকতেই একটা বড় দালান ছিল। সেখানেই সংস্কৃত পড়ানো হত। উত্তর দিকে কয়েকটা ঘর ছিল। সেখানে থাকত ছাত্ররা। কোঠা ঘরে উত্তর দিকের ঘরে আরবী পড়ানো হত আর পশ্চিম দিকের ঘরে কয়েকজন ছাত্র থাকত। আট-দশ জন বিদ্যার্থী থাকার মতো বড় ছিল না ঘরটি। তাই বাকি ছাত্ররা থাকতো রান্নাঘরে এবং তারাও থাকার জায়গা পাল্টাতো।

বিদ্যালয়ে যাওয়ার পর প্রথম ছাত্রদের সঙ্গে দেখা হলো। মনে হয়, ভাই সাহেব মৌলবী মহেশপ্রসাদের সঙ্গে তখন দেখা করতে পারিনি। অধিকাংশ ছাত্রের বয়সই আমার মতো ছিল। নতুন ছাত্র ভর্তির ব্যাপারে তাদের জিগ্যেস করে জানতে পারলাম—"যদিও বছর শুরু হয়ে দু'তিন মাস হয়ে গেছে, তবুও জায়গা আছে, আপনি বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপক ডঃ লক্ষ্মীদত্তের (পণ্ডিত ভোজদত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র) সঙ্গে দেখা করুন।" দশটা নাগাদ আমি পণ্ডিত ভোজদত্তের, ঘরের সিঁড়ি দিয়ে উঠে সেই ঘরে গেলাম যেখানে সাপ্তাহিক 'মুসাফির আগ্রা'র দপ্তর ছিল। ছোটমত ঘর যেখানে দুটো টেবিল ও চার-পাঁচটা চেয়ার ছাড়া কষ্টেসৃষ্টে ঘরে ঢোকার জন্য সামান্য জায়গা ছিল। টেবিলে দোয়াত-কলম, কাগজ ছাড়া অনেক হিন্দি ও উর্দু খবরের কাগজ পড়ে ছিল, যার মধ্যে সাপ্তাহিক ও উর্দু খবরের কাগজের সংখ্যা বেশী ছিল।

ডক্টর লক্ষ্মীদত্ত সেই সময় ঘরে ছিলেন অথবা তাঁর প্রতীক্ষায় কিছুক্ষণ বসতে হয়েছিল মনে

নেই। ডক্টর লক্ষ্মীদত্তের চেহারা গোখলের সঙ্গে বেশ মিলে যায়। চশমা লাগিয়ে নেওয়ার পর শুধু মারাঠী পাগড়ীটার অভাব থেকে যায়। তিনি ফেল্টের গোল টুপি পরতেন। নব-আগন্তুকের সঙ্গে কথা বলার সময় তার মুখের ভাব গম্ভীর হয়ে যেত, যদিও পরিচিতদের সঙ্গে রঙ্গ রসিকতা করতে তিনি মজা পেতেন। আমি আমাকে ভর্তি করে নেওয়ার জন্য প্রার্থনা করলাম তাঁর কাছে। তিনি আমার পড়াশোনা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। উর্দু মিড্‌ল পর্যন্ত, অনেকটা সংস্কৃত এবং কিছুটা ইংরেজীও ভর্তির জন্য ছিল যথেষ্ট যোগ্যতা। "পড়াশোনা করে তুমি তোমার সময় আর্যসমাজের প্রচারের কাজে লাগাবে?" "—অবশ্যই, যদি আপনি আমাকে তার যোগ্য করে দেন।" "আচ্ছা, তাহলে আপনি যান, আপনি ভর্তি হয়ে গেলেন।"

নব-আগন্তুক সহপাঠীকে দেখে তরুণ ছাত্রদের খুব কৌতূহল হয়। কেউ তার দৃষ্টি এড়িয়ে তাকে নিয়ে মজা করতে চায়, কেউ নতুন জায়গায় যাতে মন লাগে সেজন্য সহায়তা করতে চায়। কেউ এই নবাগত সম্পর্কে বিশেষভাবে জানতে চায়। আবাব কেউ সবার আগে নিজেকেই দেখাতে চায়।

এ পর্যন্ত যে সব সহপাঠীর সঙ্গে পড়েছি, মুসাফির বিদ্যালয়ের ছাত্ররা তাদের মতো ছিল না। এদের প্রত্যেকের হৃদয়ে একটি বিশেষ ভাব তরঙ্গিত হচ্ছিল। ওরা বড় বড় বিপদের মুখোমুখি হয়ে বৈদিক ধর্ম—যাকে ওরা কখনো কখনো দেশের স্বাধীনতা থেকে অভিন্ন মনে করতো—প্রচাব করতে চাইত। দয়ানন্দ ও লেখরাম—যাদের স্মৃতিতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাঁদের আত্মবিসর্জন সত্যিসত্যি এদের অনুপ্রাণিত করছিল। এই ধরনের ভাবনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সহপাঠী তখন পর্যন্ত আমি পাইনি।

সেই প্রথম সাক্ষাতের সময় কার সঙ্গে কীভাবে কথাবার্তা হয়েছিল তা তো মনে নেই। যারা বেশী কথা বলেছিল, তাদের মধ্যে হয়তো অভিলাষচন্দ্র ও ভগবতীপ্রসাদ ছিল। সহপাঠীদের মধ্যে মানিক চাঁদের বয়স ছিল সবচেয়ে কম। সে কথাও বলতো সবচেয়ে কম। মুন্সী মুরারীলাল বেনারস জেলার বাসিন্দা হওয়ায় আমার জন্মস্থানের সবচেয়ে কাছের মানুষ ছিল। তাই তার দিকে আমার নজর রাখা প্রয়োজন ছিল। দুর্গাপ্রসাদ ও মাষ্টার বসন্তরাম অল্প ক-মাস পড়ে বিদ্যালয় ছেড়ে চলে যায়। সেজন্য তাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের কোনো প্রভাব ছিল না। আমার ওপরের ক্লাসে দুজন ছাত্র ছিল। তাদের মধ্যে রামগোপালের সঙ্গে তো সেইদিন থেকেই আমার ঘনিষ্ঠতা হয়ে যায়।

মুসাফির বিদ্যালয়ের কোর্স ছিল দু'বছরের। ন্যূনপক্ষে উর্দুতে মিডল পাস ছেলেদের নেওয়া হতো। তাদের সংস্কৃত ও আরবী ভাষার সঙ্গে খ্রীষ্টান, মুসলমান ও হিন্দুদের প্রধান প্রধান সম্প্রদায়ের দুর্বল রীতি-নীতি সিদ্ধান্ত এবং আর্যসমাজের মুখ্য সিদ্ধান্তের শিক্ষা দেওয়া হত। প্রতিদিন সন্ধ্যায় নিয়মিতভাবে বহস-মুবাহিমা (শাস্ত্রার্থ) করানো হত এবং বক্তৃতা দেওয়ার বিধিও বলে দেওয়া হত। মুসাফির বিদ্যালয়ে সংস্কৃত যতটা পড়ানো হত তার চেয়ে অনেকটা বেশী আমি ইতিমধ্যেই পড়ে ফেলেছিলাম। তাই অন্যান্য সহপাঠীদের পরে আসা সত্ত্বেও আমার পড়তে হত শুধু আরবী।

জানুয়ারি নাগাদ লড়াইয়ের চার মাসেরও বেশী কেটে গিয়েছিল। কিন্তু তখনকার দিনের ভীষণ যুদ্ধ ও আজকের (১৯৪০) সিগফ্রীড ও মেগিনো দুর্গশ্রেণীর মধ্যে চুপচাপ লুকিয়ে বসে থাকার মধ্যে বিস্তর ফারাক। প্রথম দিকে সরকারের তরফ থেকে কোনো দৃষ্টি না দেওয়ার ফলে জিনিষপত্রের দাম অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল এবং চালের তো আকাল পড়েছিল বলে মনে হচ্ছিল। আমাদের এখানে তার প্রভাবে আটার সঙ্গে পর্যাপ্ত আলু মিশিয়ে রুটি বানানো হতো। অবশ্য শীতকাল কেটে যাওয়ার পর আবার খাঁটি আটার রুটি তৈরী হতে থাকে।

গরমের দিন আসতে আসতে আমিও আরবীতে আমার অন্য সহপাঠীদের ধরে ফেলেছিলাম। তখন বসন্তরাম ও দুর্গাপ্রসাদ আমাদের ছেড়ে চলে যায়। অভিলাষের ডামাডোল অবস্থা ছিল। ওর আরবী ধাতু ও শব্দরূপ মুখস্থ করার চেয়ে ঘড়ি বানানো, মেশিনের সূচিপত্র দেখা, ইতস্তত ঘুরে বেড়ানো বেশী ভাল লাগত। এখন আমাদের শ্রেণীতে ছিলাম ভগবতী, মাণিক মুন্সী, মুরারিলাল ও আমি এই চারজন ছাত্র। ওপরের শ্রেণীতে বাবুরাম ও রামগোপাল ছিল স্থায়ী। ভাই সাহেব মহেশপ্রসাদের সহপাঠী পণ্ডিত ধর্মবীর ধর্ম প্রচারের জন্য বাইরে যেত। ইস্‌লাম সম্পর্কে তার কঠোর ছিদ্রান্বেষণের জন্য খ্যাতি শুনে আমার খুব ভাল লাগত। আমাদের বিদ্যালয়ের ভজনের উপদেষ্টা ছিলেন সুখলাল। তাঁর প্রভাবশালী ভজন—মাঝে মাঝে অবতরণিকা—এখন সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেই খ্যাতিলাভ করছিল। সংস্কৃতের পণ্ডিত মধ্যমার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন এবং প্রতিদিন এসে সংস্কৃত পড়িয়ে যেতেন। তিনি ছিলেন সনাতন ধর্মী। এবং মনে করতেন যে কিছু টাকার লোভে আমরা ধর্মকে বিক্রি করছি। মৌলবী মহেশপ্রসাদ পড়াতেন আরবী যাঁকে আমরা ভাইসাহেব বলতাম। মুসাফির বিদ্যালয়ের ছাত্র মণ্ডলীর মধ্যে এবং আমার জীবনে তাঁর বিশেষ স্থান আছে। তাই তাঁর সম্পর্কে বিশেষভাবে লিখব। তাছাড়াও ছিলেন ডক্টর লক্ষ্মীদত্ত ও তাঁর ছোট ভাই পণ্ডিত তারাদত্ত উকিল। পিতা পণ্ডিত ভোজদত্ত দ্বারা স্থাপিত এই বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য তাঁরা নিরন্তর প্রযত্নশীল ছিলেন। বিকেলে দুই ভাই নামনেরের বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে বেরোতেন এবং সূর্যাস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ে ফিরে আসতেন। বন্ধুদের মধ্যে ভোগাঁওয়ের মামা সাহেব ও হাসিমুখ পণ্ডিত প্যারেলাল অবশ্যই থাকতেন। বিদ্যালয়ের বড় উঠোনে বেঞ্চ ও চেয়ার পড়ে থাকতো। সেখানে তাঁদের ও ছাত্রদের জমায়েত হত, রাত্রি নটা-দশটা বেজে যেত। কিন্তু আমরা বুঝতেই পারতাম না। কখনো কখনো ঐ সময়েই আমাদের বিষয় দেওয়া হত এবং আমাদের বাদী-প্রতিবাদী হয়ে শাস্ত্রীয় বিতর্ক করতে হত। তাছাড়া কখনো দুয়েকদিন আগেও বিষয় দিয়ে দেওয়া হত। আমাদের ভাষণের ত্রুটি সম্পর্কে ডাক্তার সাহেব আলোচনা করতেন। সেটা খুব কাজের হতো। ভাষণের শিক্ষাও একই রকমভাবে কখনো বিষয় আগে দিয়ে কখনো পরীক্ষার জন্য সদ্য দিয়ে দেওয়া হত। ভাষণ দেওয়ার ব্যাপারে যতদিন অভিলাষ ছিল, ততদিন সে ভাল ছিল। শাস্ত্রীয় বিতর্কে অল্পদিনের মধ্যেই সবাই আমার প্রাধান্য মেনে নিতে থাকে। তার কারণ এই নয় যে সংস্কৃতে আমার বিশেষ দক্ষতা ছিল। শাস্ত্রীয় বিতর্কে আমি নিজের ওপরে আরোপিত আপত্তিগুলির উত্তর দিতে আমার সব শক্তি ব্যয় করতাম না। বরং অধিকাংশ সময় প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে যুক্তি বর্ষণ করে তা খরচ করতাম। ধীরে ধীরে আমার যুক্তির সংখ্যা বেড়ে যেতো। কারণ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রত্যেকটির উত্তর দিতে পারতো না। আমি উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত আমার যুক্তিরই পুনরাবৃত্তি করতাম। দু'তিনবার এরকম হলেই প্রতিদ্বন্দ্বী নিজের কাছে যে সব আপত্তি জড় করেছে তার উত্তর দিতে গিয়ে জড়িয়ে পড়ত। আমার বিরুদ্ধে আপত্তি করার ফুরসতই পেত না সে। আমার কাজ ছিল দৃঢ়ভাবে সব দিক থেকে সুরক্ষিত হয়ে আক্রমণ করতে যাওয়া এবং শ্রোতাদের ওপর নিজের যুক্তি কৌশলের প্রাধান্য বিস্তার করা। আমার জন্য তিন স্থায়ী সঙ্গীর মধ্যে মুরারিলাল ব্যাখ্যান দেওয়ার ব্যাপারে ভাল ছিল। ভগবতী তার ব্যাখ্যানের ঘাটতি মেটাতে তীক্ষ্ণ আক্রমণ করত। মাণিক ছেলেমানুষ ছিল, তার পড়াশোনায় বেশী জোর দেওয়ার আগ্রহ ছিল। ওপরের শ্রেণীর রামগোপাল ভাইয়ের ভাল বক্তৃতা শক্তি ছিল। সে সঠিকভবে কণ্ঠস্বরের ওঠানামাকে কাজে লাগাতে পারত। লিখিত ও মুখস্থ উদ্ধৃতিকে সে খুব সাবলীলভাবে ব্যবহার করতে পারত। বক্তৃতা কলার দৃষ্টিতে গোটা বিদ্যালয়ে তার সমান কেউ ছিল না। বাবুরামজীও ভাল বলতে পারতেন।

ভাই মহেশপ্রসাদ এলাহাবাদ জেলার কায়স্থান শহর নিবাসী ছিলেন। ম্যাট্রিক পাশ করার পর সাব-ইন্সপেক্টর পদের প্রার্থী ছিলেন। প্রায় সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি ঘোড়ায় চড়াও শিখতে শুরু করেছিলেন। এ সময়ে এলাহাবাদ থাকার সময় তার মনে যে ছাপ পড়েছিল, তা তাঁর ওপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। সেই সময়ে এক উগ্র জাতীয়তাবাদী 'হিন্দুস্থান' উর্দু পত্রিকা এলাহাবাদ থেকে বার হত। এই কাগজের অনেক সম্পাদক জেলে চলে গিয়েছিলেন কিন্তু 'হিন্দুস্তান' নির্ভীকভাবে ব্রিটিশ শাসনের অত্যাচারের কথা, হ্যাঁ বেশীর ভাগ অত্যাচারেরই, কথা খোলাখুলি প্রকাশ করত। উগ্র জাতীয়তাবাদী দলের মতো জাতীয় দুর্বলতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার তার প্রয়োজন ছিল না। হিন্দুস্তানের যে সব সম্পাদক জেলে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে মহাত্মা নন্দগোপালও ছিলেন। তাঁর দ্বারা ভাই সাহেব বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। হয়তো সুফী অম্বাপ্রসাদকে তিনি দেখেন নি। কিন্তু তাঁর সাহসিকতাপূর্ণ কাজ, বিশেষ করে এ্যাংলো ইন্ডিয়ান সেজে কয়েকমাস পুলিশকে ধোঁকা দিয়ে ঘোরাফেরা করা তাঁর প্রশংসনীয় কাজ ছিল। বঙ্গভঙ্গের পর স্বাধীনতার জন্য দেশ যত আহুতি দিয়েছে, তার ইতিহাস তাঁর জিভের ডগায় ছিল। প্রথম প্রথম এই সব রোমাঞ্চকর আত্মবিসর্জ্জনের জ্বলন্ত উদাহরণ ভাই সাহেবের মুখ থেকেই আমি শুনেছিলাম। ভাই সাহেব বক্তা ছিলেন না, তাঁর কলমও সাধারণ স্তরের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি। কিন্তু তিনি শুধু আমাদের সফল শিক্ষকই ছিলেন না, বরং আরো বেশী কিছু ছিলেন। ধীরে ধীরে কিন্তু স্থিরতার সঙ্গে তিনি তাঁর কথা চালিয়ে যেতেন এবং তারই মাঝে মাঝে আমাদের প্রশ্নোত্তরের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। এই আলোচনার দ্বারা তিনি আমাদের হৃদয়ে এক প্রচণ্ড আগুন জ্বালাচ্ছিলেন। এই আগুন কতটা রাজনৈতিক পরাধীনতা-বিরোধী অথবা কতটা ধর্মীয় ছিল, তা আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারিনি; কেননা সে সময়ে 'স্বদেশ' 'ও' 'স্বধর্ম'কে আমরা অভিন্ন বলে জানতাম। 'আবির' অকবরাবাদীর (ডাক্তার লক্ষ্মীদত্ত) কবিতা সমূহ সুখলাল তার গানে এভাবে পালটে দিত—

"হে বন্ধু, দেশের নামে তোমরা মরতে জান না" বদলে বলতো "হে বন্ধু, ধর্মের নামে তোমরা মরতে জান না"।

আমাদের পক্ষে সৌভাগ্যের কথা, মুসাফির বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকের ভারে আমাদের মরে যাওয়ার মতো অবস্থা ছিল না। সংস্কৃতে জীবারামের সংস্কৃত-শিক্ষার প্রথম-দ্বিতীয় ভাগ প্রভৃতি পুস্তক এবং হয়তো হিতোপদেশও ছিল। আরবীতে 'সরফ', নহু-এর একটি করে পুস্তক ও কোরানশরীফ ছিল। পড়াশোনা করে যে সময় থাকত, তা ছিল আমাদের নিজেদের। কিন্তু এই সময়টা আমরা খুব উপযোগী ও মনোরঞ্জক ঢঙে কাটাতাম। আমি পাঠ্যক্রমের বাইরের বই খুব পড়তাম এবং খুব আড্ডা মারতাম। কিন্তু তা আমার ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে তোলার জন্য অত্যন্ত উপযোগী হয়েছিল। সেই সব দিন ও বিশেষত রাতের কথা আমার মনে পড়ে যখন খাটিয়ায় শুয়ে অথবা বসে ভাই সাহেব শহীদদের কথা শোনাতেন, 'হিন্দুস্তান'-এর ক্ষুধার্ত ও শিক্ষিত সম্পাদকদের তপস্যার কথা বর্ণনা করতেন। সরলতার সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি ছিলেন ভাই সাহেব। তিনি মোটা কাপড় (তখনো খদ্দরের দিন আসেনি কিন্তু হাতে বোনা কাপড়ের ওপর ভাই সাহেব নিশ্চয়ই জোর দিতেন)—ধুতি পাঞ্জাবী-কুর্তা পরতেন। টুপির প্রয়োজন ছিল না। জুতা দেহাতী। খাওয়া দাওয়া সাদামাটা রাখতে অবশ্য তাঁর আর্থিক অবস্থাই বাধ্য করেছিল। খাওয়া ছাড়া ভাই সাহেব মাসিক আরো দশ-পনের টাকা পেতেন যা থেকে তিনি মাসিক কিছু টাকা দিয়ে এক মৌলবী সাহেবের কাছে আরবীতে পরবর্তী পড়া চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

অযোধ্যায় ভাষণ ও খবরের কাগজ শুরু হয়েছিল। মহাযুদ্ধের খবর আমাদেরকে জার্মানি, অষ্ট্রিয়া, জাপান, রাশিয়া প্রভৃতির জোরালো অস্তিত্বকে মেনে নিতে বাধ্য করেছিল। আর এখানে

আমি আগের অবস্থা থেকে এই অবধি সরে এসেছিলাম। কিন্তু এখনো আমি পুরনো জগতেই ছিলাম। আমার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি কোন দিকে ছিল, তার পরিচয় তখনো পাইনি। এখানে আগ্রাতে ভাই সাহেবের সংস্পর্শে এসে নিজেকে মনে হল এমন একটা মানুষ যাকে অন্ধকার ঘর থেকে বার করে সূর্যের আলোকে রেখে দেওয়া হল, যেন দম-বন্ধ-করা কালো কুঠরি থেকে বার করে শীতল মন্দ-সুগন্ধ বাতাস ভরা বাগানে আনা হল। এখন আমার মনে হতে লাগল, দুনিয়ার এমন কাজ আছে যার জন্য জীবনের প্রয়োজন আছে: এমন আদর্শ আছে যার জন্য মৃত্যুও মধুরতম বস্তু। ইংরেজ কিভাবে ভারতকে শোষণ করছে, এ বিষয়ে উর্দু-হিন্দিতে যে সব বই পেতাম, তা আমি মন দিয়ে পড়তাম—এই সব বইয়ের মধ্যে কিছু বাজেয়াপ্ত করা বইও ছিল। আমার মনে আছে কত পরিশ্রম করে ভাই পরমানন্দের বাজেয়াপ্ত করা "ভারত কে ইতিহাস" পেয়েছিলাম এবং কি খুশী হয়ে আমি তা পড়েছিলাম। ইংরেজী জ্ঞানের ব্যাপারে আমি একেবারে আনাড়ী ছিলাম না। কিন্তু এখনো ইংরেজী পড়ার অভ্যাস হয়নি।

খাওয়া-দাওয়া করে দুপুরে রোজ "মুসাফিরের" অফিসে চলে যেতাম এবং দু'তিন ঘণ্টা থেকে কাগজ পড়তাম। 'মুসাফির'-এর বিনিময়ে কয়েক ডজন খবরের কাগজ সেখানে আসত। মনে হয় 'লীডার' ডক্টর সাহেব বিশেষভাবে আনাতেন। তার ভাবার্থও আমি ভালভাবে বুঝতে পারতাম না কেননা সংবাদপত্রের ভাষায় কিছুটা বিশেষত্ব থাকে। তা সত্ত্বেও আগ্রায় সওয়া বছর থাকাকালীন এমন দিন অল্পই ছিল যে দিন আমি 'লীডার' পড়ায় এক-আধ ঘণ্টা দিইনি। আখেরে খবর পড়ে বুঝতে আমার আর কোনো অসুবিধা হয়নি। এই সব খবরের কাগজের মধ্যে ধর্মীয় কাগজের সংখ্যাই বেশী ছিল। "আর্যগেজেট" ও "প্রকাশ", "হিন্দুস্তান" ও "দেশ"—লাহোরের এই সব কাগজের আমি নিয়মিত পাঠক ছিলাম। 'সুদর্শন'জী এই সময় তাঁর পত্রিকা প্রকাশ করেন। মহাত্মা মুন্সীরামের "সদ্ধর্ম প্রচারক", ফররুখাবাদ থেকে প্রকাশিত "সত্যবাদী" (?) আর্যসমাজের হিন্দি সাপ্তাহিক ছিল। এছাড়া আমাদের শহর থেকে প্রকাশিত এবং প্রাদেশিক আর্য-প্রতিনিধি সভার মুখপত্র "আর্যমিত্র" তখন সর্বানন্দ-এর সম্পাদনায় বেরোত। সম্প্রতি আমি 'মেঘদূতের' এক ছন্দোবদ্ধ অনুবাদ দেখেছিলাম, যাতে বড়-দাড়ি-গোঁপ সহ অনুবাদকের ফটো ছাপা হয়েছিল। একদিন আমার বন্ধুদের সঙ্গে শহরের (হীঙ্গকী মণ্ডী) আর্যসমাজের পণ্ডিত আর্যমুনি অথবা স্বামী অচ্যুতানন্দের ভাষণ শুনতে গিয়েছিলাম। সেখানে একটি দু'তিন বছরের শিশুকে নিয়ে একজন দাড়ি-গোঁপ-কামানো ভদ্রলোক এসে বসলেন। আমার সঙ্গীদের মধ্যে কেউ আমার কানে কানে বলল, "ইনিই আর্যমিত্র সম্পাদক সর্বানন্দজী। কিন্তু এঁর আসল নাম পণ্ডিত লক্ষ্মীধর বাজপেয়ী।" মেঘদূতের ফটো আমার মনে পড়ল। আমার সঙ্গীদের মধ্যে একজন বলল—মিড্‌ল পর্যন্ত পড়েই ইনি এতটা যোগ্যতা লাভ করেছেন যে এখন ইনি হিন্দির বড় বড় লেখকের কান কাটেন। আমি ভাবলাম—আমিও তো শুধু মিড্‌ল পাস করেছি। খবরের কাগজে আমার দৃষ্টি তিনটি জিনিষের ওপরে থাকত—আর্যসমাজের জগতের নতুন খবর কি, কোথাও শাস্ত্রীয় বিতর্ক ও আলোচনা হচ্ছে না তো, কোথাও বড় সমাজের জলসা হচ্ছে না তো এবং সেখানে কোন কোন বিখ্যাত ব্যক্তি এসেছিলেন। স্বামী সোমদেব, স্বামী মুনীশ্বরানন্দ, স্বামী অনুভবানন্দ, স্বামী সর্বদানন্দ, স্বামী সত্যানন্দ, মহাত্মা মুন্সীরাম, মহাত্মা হংসরাজ, প্রফেসর রামদেব, প্রোফেসর দীওয়ান চন্দ, পণ্ডিত তুলসীরাম, পণ্ডিত রামচন্দ্র দেহ্‌লওয়ী, চৌধুরী খুবচন্দ প্রভৃতি আমাদের সে যুগের বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। আরো দেখতাম কোথাও কোনো আর্যসমাজী ভাষণ অথবা আলোচনা নিয়ে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মাথা ফাটাফাটি হয়েছে কিনা। খণ্ডন-মণ্ডনের লেখা বিশেষ করে ইসলামের বিরুদ্ধে লেখা—সোৎসাহে পড়তাম। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ শেষ হওয়ার আগেই 'মুসাফির আগ্রা' ছাত্র

কেদারনাথের লেখাও ছাপতে শুরু করে। নিজের লেখাকে প্রথম ছাপার অক্ষরে দেখে তরুণ লেখকের কি আনন্দ হয়, তা একমাত্র অভিজ্ঞতাই বলে দিতে পারে। আমার উর্দু লেখা প্রথম ছাপা হয়েছিল অথবা হিন্দি, তা বলতে পারছি না, কিন্তু মীরাটের হিন্দি মাসিক 'ভাস্কর'-এর দুই সংখ্যায় নিজের লেখা ছাপার অক্ষরে দেখে আমার বেশী আনন্দ হয়েছিল। এই লেখাটাই ছিল আমার হিন্দিতে প্রথম লেখা। এতে অযোধ্যায় সাধুদের কাছে গৃহস্থেরা কিভাবে মন্ত্র নিতে আসে, তা বিদেহীজীর স্থানে দেখা দৃশ্যকে আমি বর্ণনা করেছিলাম।

সংস্কৃতের পড়া তৈবী করতে না হওয়ায় আমার কাছে আরো কিছু বাড়তি সময় ছিল, যা আমি বাইরের বই পড়ার কাজে লাগাতাম। 'মুসাফির' আফিসের বাজে কাগজ ও আবর্জনার মধ্যে সমালোচনাব জন্য আসা অনেক আর্যসমাজী বই পড়েছিল। আমি আবর্জনা সাফ করে এই সব বই জমা করি এবং একটা একটা করে সব পড়ে ফেলি। এই বইয়ের মধ্যে পণ্ডিত আর্যমুনি, পণ্ডিত রাজারাম শাস্ত্রী, পণ্ডিত তুলসীরাম কৃত দর্শন, উপনিষদ ও অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থের মূলসহিত অনুবাদ ছিল। আমি এখন এই সব গ্রন্থ পড়ার উপযুক্ত হয়ে গিয়েছিলাম। উর্দুর 'কুল্লিয়াত-আর্যমুসাফির' আমার বড় প্রিয় জিনিষ ছিল, কেননা তা সেই ধর্মের জন্য শহিদ পণ্ডিত লেখরাম আর্য-মুসাফিরের কৃতির সংগ্রহ যার স্মৃতিতে আমাদের আর্যমুসাফির বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল স্বামী দর্শনানন্দ, পণ্ডিত ভোজদত্ত, মহাশয় ধর্মপাল (যিনি এখন আবার মুসলমান হয়ে গেছেন)—এঁদের সব উর্দু পুস্তক আমি সাগ্রহে পড়েছিলাম। ইসলামের সমালোচনা করে লেখা পাদ্রীদেরও অনেক বই আমি দেখেছিলাম। আমার সঙ্গী শোনা কথার পরম্পরা পুনরাবৃত্তি করে যখন মৌলবী সানাউল্লা অমৃতসরী, পাদ্রী জ্বালাসিংহ এবং স্বামী দর্শনানন্দের শাস্ত্রীয় বিতর্কে অপ্রতিভ প্রতিভার বর্ণনা করত তখন আমার ঈর্ষা হত—আমিও কি ঐরকম হতে পারি না। মৌলবী সানাউল্লার 'আহ্‌লে হদীস' তো আমি প্রত্যেক সপ্তাহে পড়তাম। 'পৈগাম-সুলহ', 'অলফজল', 'নূর'-এর মতো কাদিয়ানী সংবাদপত্র থেকেও নবীন ইসলাম সম্পর্কে জানার ভাল সুযোগ পেতাম।

আমরা বৈদিক ধর্ম, আর্যসমাজের সিদ্ধান্ত সমূহ, ঋষি দয়ানন্দের বাণী সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য মিশনারি তৈরী করতে যাচ্ছিলাম। উপদেশ, খবরের কাগজ ও পুস্তকের দ্বারা আমাদের এই কথা জানানো হত যে, দুনিয়ার সবচেয়ে পুরনো ধর্ম—সব ধর্মের আদি স্রোত—আজও নিজের সিদ্ধান্তে কি দৃঢ়! তাতে এক ঈশ্বর ছাড়া অন্য কারো পূজা নেই। বহুদেববাদ বেদ বিরুদ্ধ, শ্রাদ্ধ ব্রাহ্মণ পোপদের পেট ভরাবার চাল। জন্ম নেই এমন ঈশ্বরের অবতার নেই। পুনর্জন্ম ও কর্মের সিদ্ধান্ত অন্য সব ধর্মের চেয়ে আমাদের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। বর্ণব্যবস্থা জন্ম থেকে নয়, রুচি অনুসারে বৃত্তি বেছে নেওয়ার স্বাধীনতার অন্য নাম। তীর্থ, মূর্তিপূজা সবই গোপলীলা। কথায় কথায় আমাদের সামনে খ্রীষ্টীয় মিশনারিদের ধর্মপ্রচারের জন্য স্বার্থ ত্যাগ ও সাহসিকতার মিশ্রণ উপস্থিত করা হত এবং তার থেকে বেশী জাপান-চীন-তিব্বত-মধ্য এশিয়ার দুরূহ রাস্তায় বহু শতাব্দী পূর্বের বৌদ্ধ ভিক্ষুদের উদাহরণ পেশ করা হত। আমরা নিজেদের দয়ানন্দের বৌদ্ধ ভিক্ষু ও অনেক ত্রুটিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের বিদ্যালয়কে ছোটমতো নালন্দা বলে মনে করতাম।

শিক্ষা শুধু মৌখিক ছিলু না, তাকে ব্যবহারে রূপ দেবার চেষ্টাও আমাদের ছিল। মুসাফির বিদ্যালয়ের আমরা সব ছাত্ররা সপ্তাহের অধিকাংশ দিন শহরে অথবা সুলতানপুরা বাজারের সড়কে বক্তৃতা দিতে যেতাম। এই পরম্পরা আমার আগে থেকে চলে আসছিল। প্রথম বারের ছাত্র ছিল ভাই সাহেব ও ধর্মবীরজী, দ্বিতীয় বার রামগোপালজী এবং এখন আমাদের দলের নম্বর তৃতীয়। মনে হচ্ছে, এটা খ্রীস্টানদের কাছ থেকে শেখা হয়েছিল। এই সব বক্তৃতার শ্রোতা

পাঁচ-দশ মিনিটের বেশী এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারত না। বেচাকেনা করার জন্যই লোকেরা আসত, তাই আমাদের বক্তৃতা সংক্ষিপ্ত হত। বক্তৃতা দেওয়া ছাড়াও অস্পৃশ্যতা দূর করার জন্য আমাদের বিশেষভাবে কাজ করতে হত। পণ্ডিত ভোজদত্তজী অখিল ভারতীয় শুদ্ধি সভার সভাপতি ও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এঁর কাজ তো ছিল মুসলমান ও খ্রীস্টানদের বৈদিক সভায় নিমন্ত্রণ জানানো। কিন্তু এতে সাফল্য মিলেছিল সামান্য। কদাচিৎ কোনো ভবঘুরে মুসলমান অথবা খ্রীস্টান জাতপাতের সংকীর্ণতায় অবদমিত হিন্দু সমাজে আসতে চাইত। তবে হ্যাঁ, শুদ্ধ্যশুদ্ধির সংখ্যা দেখানোর জন্য অস্পৃশ্যদের শুদ্ধি সংস্কার হত। কিছু লেখাপড়া জানা ও অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হোক। পরিবার অবশ্যই চাইত যে সমাজে তাদের লাঞ্ছিত, অপমানিত অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হোক। এই আশাতেই তারা নিজেদের 'শুদ্ধি' করাত। এর জন্য একটা দিন নির্দিষ্ট থাকত। ঐ দিন পরিবারের কর্তা সংস্কারের গুরুত্ব প্রমাণ করার জন্য উপবাস করত। বিকেলে আমরা সেখানে গিয়ে হোমের কুণ্ড খুঁড়তাম। আলপনা করতাম, সঙ্কার বিধির মন্ত্রে হোম করতাম। পরিবারের কর্তা সেখানে যজমানের মতো বসে নিজের হাতে আহুতি দিত। তারপর তার হাতে তৈরি হালুয়া পুরী বিতরণ করা হত। আমরা পুরোহিতেরা সেটাই খেতাম। আমাদের এই সব ভাইয়েরা যারা শুদ্ধ হত, তাদের অধিকাংশই আগ্রার আশেপাশের চামার ছিল। যাদের চেহারা-টেহারা দেখলে আশেপাশের অন্যান্য মানুষদের থেকে আলাদা মনে হত না।

বৈষ্ণব ধর্ম-বৈরাগী সম্প্রদায় সম্পর্কে আমি উদাসীন হয়ে গিয়েছিলাম। ধর্মের আকর্ষণ নয়, বরং ঘুরে বেড়াবার আকর্ষণ এবং বাড়ির বন্ধন থেকে মুক্তির ভাবনা আমাকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে আমার চিন্তা ছিল বন্ধ্যার মতো। কিন্তু এখানে আর্য সমাজে নিজের বুদ্ধিকে বেশী স্বচ্ছন্দ, বেশী অনুকূল পরিস্থিতিতে পাচ্ছিলাম। আর্যসমাজীরা জাতপাতের খণ্ডন একটা সীমা পর্যন্তই করতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি তাকে অসহ্য ব্যাধি বলে মনে করতাম। বর্ণব্যবস্থা নিয়ে এই সময়ে যুক্তপ্রান্তের আর্যসমাজীরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। এক দল ব্রাহ্মণ পার্টি—বর্ণ ব্যবস্থাকে গুণ-কর্ম-স্বভাবের অনুসার বলা সত্ত্বেও স্বভাবের ওপর খুব জোর দিয়ে পয়োনালীকে সেখানেই রাখতে চেয়েছিল। এই দলের প্রধানদের মধ্যে সামিল ছিলেন পণ্ডিত মুরারিলাল (সিকন্দারাবাদী), পণ্ডিত তুলসীরাম এবং জ্বালাপুর মহাবিদ্যালয়ের পণ্ডিত দল। স্বামী সর্বানন্দকে পুরানো মর্যাদা লঙ্ঘন করে ব্রাহ্মণদের নিচে ঠেলে দিয়ে অস্পৃশ্যদের আগে বাড়াতে দেখে কবিরাজ পণ্ডিত নাথুরামশংকর 'চমরনকে তারনকো তারনকে কারণ প্রগটে সন্ত-সর্বাদানন্দ' লিখে ফেলেছিলেন। আমি আমার সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে এই চিন্তা ধারার কঠিন প্রতিপক্ষ ছিলাম। আমার সহপাঠীদের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভগবতী প্রসাদ কিছুকাল গুরুকুল সিকন্দরাবাদে ছিল এবং পণ্ডিত মুরারিলাল শর্মার চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। সে প্রায়ই বর্ণব্যবস্থা নিয়ে আমার সঙ্গে ঝগড়া করত। আমি সমস্ত আর্য (সমাজী) মাত্রেরই অবাধ খাওয়া-দাওয়া ও বিয়ের পক্ষপাতী ছিলাম এবং স্বামী সর্বানন্দের অকপট কথাবার্তাকে আমি খুব পছন্দ করতাম।

একমা থেকে একবার গুরুজীর সঙ্গে একদিন আমি ছাপরা যাচ্ছিলাম। আমাদের সেকেন্ড ক্লাস কামরায় ছাপরার ব্যারিস্টার মিস্টার মুস্তাফা বসেছিলেন। কথায় কথায় পরিচয় হল। মিষ্টার মুস্তাফা গুরুজীকে বললেন—'মোহন্তজী, আপনার শিষ্যকে বিলাত পাঠান।' কেন তা আমি শুনিনি কিংবা আমার মনে নেই। মোহন্তজী হেসে ফেলেছিলেন। পরসার বৈষ্ণব বৈরাগী খ্রীষ্টানের মুলুকে যাবে, তা তিনি চিন্তাও করতে পারেন না। এই কথা শুনে আমার কিন্তু ঐরকম মনে হয়নি। তারও আগে বেনারসে আমি যখন সরস্বতীতে খান্নার আমেরিকা-যাত্রা সম্বন্ধে

লেখাগুলি পড়তাম, তখন আমার হৃদয় কিন্তু শুধু সাক্ষী হয়ে থাকত না। সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজের সম্ভবত কুমার দেবেন্দ্রকে সুর করে গাইতে শুনেছিলাম—"নিউ ইয়র্কে পৌঁছে আমাকেও তার পাঠিও।" তা আমার মনকে অদ্ভুতভাবে নাড়া দিয়েছিল। আর এখন তো আমি বিদেশ যাত্রারই স্বপ্ন দেখছিলাম। আমার স্বপ্ন আমেরিকা, য়োরোপের ছিল না। আমি এশিয়ারই কোনো কোনো অংশকে পছন্দ করতাম। প্রথম আরব, মিশর, ইরান ও পরে চীন-জাপান। কেন? —বৈদিক ধর্মপ্রচারের জন্য। কিন্তু যেভাবে ধর্মবীরজী আরবে ধর্মপ্রচার করতে যাবার জন্য উতলা হয়ে বোম্বাইয়ের কোনো মস্‌জিদে কিছুদিন কাটিয়ে এসেছিলেন, আমি ততটা তাড়াহুড়ার পক্ষপাতী ছিলাম না। তার জন্য আমি যথেষ্ট প্রস্তুতি দরকার বলে মনে করতাম। আমরা চার সহপাঠীই একই স্বপ্নের ভাগীদার ছিলাম। কিন্তু রামগোপালের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করতে খুব আনন্দ হত। আমি স্বাধীন ছিলাম। আমার কোথাও যাওয়া-আসাতে কোনো বন্ধন ছিল না। কিন্তু রামগোপালের উড়ানে প্রতিবন্ধক ছিল তাঁর স্ত্রী। আমি পরামর্শ দিতাম—ওকে পড়াশোনা করিয়ে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে দাও। কোথাও অধ্যাপিকা হয়ে যাবে। আমাদের ভবিষ্যৎ কাজের পরিকল্পনার মধ্যে এক মিশনারি বিদ্যালয়ও ছিল, যাতে পুরানো নালন্দা ও এ সময়ের মুসাফির বিদ্যালয়ের সংমিশ্রণ হবে। সেখানে আমরা লেখা-পড়া জানা যুবকদের ছয়-সাত বছরের বিশেষ শিক্ষা দেব। যে যে দেশে যাবে, সে সেই দেশের ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্ম সম্পর্কে বিশেষভাবে পড়বে।

পণ্ডিত ভোজদত্তজী আগ্রাতেই ছিলেন কিন্তু তাঁর ব্যাধি ছিল দুশ্চিকিৎস্য—হয়তো যক্ষ্মা। তাঁর দর্শন খুব কমই পেতাম।

আমার পিসীমার মেয়ের বিয়ে দেওয়ার কথা ছিল। পিসামশাই চিঠি দিয়েছিলেন—"ফিরোজাবাদের পোষ্ট মাষ্টারের (আজমগড় জেলা নিবাসী) ছেলেকে দেখে আসবে এবং বিয়ের কথাবার্তাও বলে আসবে।" আমি ফিরোজাবাদ গিয়ে বিয়ে ঠিক করায় সহায়তা করি। এই সময়ে কনৈলা থেকে চিঠি এল, সম্ভবত যাগেশের;—তোমার বাবা অর্ধোন্মাদের মতো হয়ে গেছেন, সম্ভবত তোমার পালিয়ে যাওয়ার জন্যই; তাই একবার দেখা করে যাও। পনের-বিশ দিন ছুটি নিয়ে আমি কনৈলা গেলাম। বাবা খুব দুর্বল হয়ে গিয়েছিলেন। মনে হচ্ছিল, অনেকদিন রোগভুগে উঠেছেন। তিনি আমাকে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। মস্তিষ্কের উত্তাপ কমাবার জন্য কানপটীর কাছের শিরা কেটে রক্ত বার করবার জন্য লোক এসেছিল। তিনি বললেন—"শিরা কেটে কি করবে, এখন আমি ভাল হয়ে যাব।" দেওয়ালীর দিন আজমগড় আর্যসমাজে ছিলাম। কার্তিক পূর্ণিমায় করহার মেলা দেখতে এসেছিল আজমগড়ের স্ত্রীপুরষেরা। আমাকে সেখানে লেক্‌চার ঝাড়তে দেখে তারা বেশ আশ্চর্য হয়ে যায়। এ সময়ে মুহম্মদাবাদে বাবু বৈজনাথ প্রসাদ উকীলের ওখানে ছিলাম। তিনি সদ্য এলাহাবাদ থেকে ওকালতী পাস করে এসেছিলেন। তাঁর কাছে 'কর্মযোগী'র সম্পূর্ণ ফাইল ছিল। রাজনীতি নিয়ে কথাবার্তা বলা ছাড়াও এই ফাইলের অনেক অংশ আমি পড়েছিলাম। তিন-চার সপ্তাহ পরে বাবা সানন্দে আমাকে আগ্রা ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেন।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই-আগষ্ট নাগাদ লেখাপড়ায়, চালচলনে আমার যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছিল। এখন আমাকে আগ্রার বাইরে ফতেহ্‌গড়, জসওয়ন্তনগর, ফিরোজাবাদের মতো জায়গায় ব্যাখান ও সংস্কার করানোর জন্য পাঠানো হতে লাগল। ব্যাখ্যান দেওয়ার সময় অপরিচিত অগণিত মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করার উত্তেজনা আজও কমেনি। তবু শ্রোতাদের টিপ্পনী ও চেষ্টা অনুৎসাহবর্ধক না হওয়ায় আমার আত্মগ্লানি হত না। এরই মধ্যে সম্ভবত সেপ্টেম্বরে (১৯১৫) ডক্টর লক্ষ্মীদত্ত ও পণ্ডিত ধর্মবীরের কাছে জব্বলপুর থেকে

নিমন্ত্রণ এল মুসলমানদের সঙ্গে শাস্ত্রীয় বিতর্ক করার। আমিও শাস্ত্রীয় বিতর্কে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে গণ্য হচ্ছিলাম এবং সংস্কৃতের প্রমাণ জোটাতে তাঁদের যথেষ্ট সাহায্য করতে পারতাম। তাই ডক্টর লক্ষ্মীদত্ত আমাকেও সঙ্গে যেতে বললেন। আমরা প্রথম এলাহাবাদ গেলাম। সেই সময়ে সেখানে যুক্তপ্রান্তের রাজনৈতিক নেতাদের একটা বড় কনফাঁরেন্স হচ্ছিল। যুক্তপ্রান্তে সেই সময় লেফ্‌টেনান্ট-গভর্নর শাসন করতেন। দেশভক্তদের—যাঁদের মধ্যে মতিলাল নেহ্‌রু, তেজবাহাদুর সপ্রু প্রভৃতি সবাই সামিল ছিলেন—দাবি ছিল গভর্নরের। সম্ভবত ইংরেজ সরকার এই দাবি মানেনি। এই নিয়ে কংগ্রেসের তরফ থেকে সমস্ত প্রান্তের লোকদের এই বিরাট কনফারেন্স ডাকা হয়েছিল। আমরা আগ্রার পক্ষ থেকে কোনো সভার প্রতিনিধি ছিলাম না। সভাস্থলেই আমরা একটা করে প্রতিনিধি টিকিট পেয়ে গেলাম। সম্ভবত কন্‌ফারেন্স হয়েছিল ম্যোহালেতে। ইংরেজীতে জোরদার বক্তৃতা হল যা বুঝে ওঠা এমনিতেই আমাদের পক্ষে মুশকিল ছিল, তার ওপর গরমের কথা আর কি বলব, 'বরফ দেওয়া জল' গ্লাসের পর গ্লাস গলায় ঢেলে দিতাম তাতেও পিপাসা মিটত না।

জব্বলপুরে আমাদের হিতকারিণী হাইস্কুল বাড়িতে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। হয়তো সেই সময়ে কোনো ছুটি ছিল এবং স্কুল বন্ধ ছিল। গরম এখানেও খুব বেশী ছিল। কিন্তু বাড়ির ছাদ কিছুটা উঁচু ছিল এবং লেমনেড বরফের সব সময় ব্যবস্থা ছিল। মুসলমানদের পক্ষে মৌলানা সানাউল্লার শাস্ত্রীয় বিতর্ক করার কথা ছিল। তাঁর সহায়তা করার জন্য মৌলানা আবুতুরাব, মৌলানা কাসিম বনারসী ও অন্যান্য সজ্জনও এসেছিলেন। আর্যসমাজের পক্ষে বক্তা ছিলেন ডক্টর লক্ষ্মীদত্ত ও পণ্ডিত ধর্মবীর। পণ্ডিত রামচন্দ্র দেহলওয়ী কিছু ভাষণ দিয়েছিলেন এখানকার টাউন হলে। সেই ভাষণের ওপরই এই শাস্ত্রীয় বিতর্কের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছিল। কোনো আর্যসমাজী-মুসলীম বিতর্ক দেখার আমার এই ছিল প্রথম সুযোগ। একই মঞ্চে মধ্যস্থের দুই দিকে দুই টেবিলে পুস্তকের স্তূপ নিয়ে বসেছিলেন দুই পক্ষের পণ্ডিত-মৌলবী। সম্ভবত মধ্যস্থ ছিলেন জব্বলপুরের কোনো কলেজের মিশনারি প্রিন্সিপ্যাল। চারদিকের খোলা জায়গায় বিরাট হিন্দু-মুসলমান জনতা শাস্ত্রীয় বিতর্ক শোনার জন্য বসেছিল। রাতের অন্ধকার দূর করার জন্য প্রচুর লণ্ঠনের ব্যবস্থা ছিল। বক্তাদের দফায় দফায় বলতে হচ্ছিল। সময় পূর্ণ হতেই মধ্যস্থ ঘন্টা বাজিয়ে দিতেন। শাস্ত্রীয় বিতর্কের প্রকৃত প্রভাব জনতার ওপর কিভাবে পড়বে যখন তাদের সহানুভূতি আগে থেকেই স্থির হয়েছিল। তবু আর্যসমাজ নিজের ধর্মকে বিজ্ঞানসম্মত করার জন্য অনেক পুরানো মিথ্যা বিশ্বাসকে ভেঙে দিয়েছিল। স্বামী দয়ানন্দ সেই সব সিদ্ধান্তকেই মান্য বলে রেখেছিলেন, যা তাঁর সময়ের লোকেরা বিজ্ঞানসম্মত মনে করতেন। একদিকে নিজের অধিকাংশ জঞ্জাল আগুনে পুড়িয়ে একটি মানুষ এসেছে আর অন্যদিকে এসেছে এমন এক ব্যক্তি যে তেরশ বছরের অধিকাংশ ফালতু কথাগুলি কাফির হবার ভয়ে না ছাড়তে বাধ্য হয়েছে, এই দুই পক্ষের মধ্যে কে বেশী ভাল লড়বে, তা তো স্পষ্টই বোঝা যায়।

মনে হয় শাস্ত্রীয় বিতর্ক দু'দিন হয়েছিল। এই সময় আমরা টাংগায় ভেড়া ঘাটের মার্বেল রক (মর্মর চাটান) দেখতে গিয়েছিলাম। আমাদের ভোজনের নিমন্ত্রণ করে যাঁরা নিজেদের বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন ব্যারিষ্টার গুপ্ত সাহেব। বিলাতে যুবক ভারতীয়দের ওপর গোয়েন্দা পুলিশের কিরকম কড়া নজর থাকত সে বিষয়ে তিনি বলছিলেন—আমরা তাদের কাছ থেকে বাঁচবার জন্য অধিকাংশ সময়েই ময়দানের ঘাসে বসে যেতাম। জব্বলপুরে আমার একদিন সংস্কৃতে বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কোনো কারণে বক্তৃতা হতে পারেনি। সেই সময়ে শাস্ত্রীয় বিতর্ক দেখে মনে হয়েছিল যে এখনকার চেয়ে সেই সময়ের লোক অধিকতর বিচার-সহিষ্ণু ছিল।

যুদ্ধের প্রচণ্ডতা আরো বেড়ে গিয়েছিল। নামনের আগ্রা ছাউনির ভেতরে বলে মনে করা হত। আমরা দুপুরের পরে পড়বার জন্য কখনো কখনো একটা বাগানে যেতাম। সেখানে দেখতাম দলে দলে রংরুট আসত, চারিদিকে গোয়েন্দা পুলিশ ও গুপ্তচরের তো জাল বিছিয়ে রাখা হয়েছিল। আমাদের বিদ্যালয়ের সামনের মন্দিরে এক পাগল থাকত, অনেক লোক বলছিল—লোকটা পাগল নয়, গুপ্তচর। কুমার সুখলালের গানে জাতীয়তাবাদী উত্তাপ কিছুটা বাড়ছিল সেজন্য পুলিশ বেশ সজাগ হয়ে উঠেছিল। একবার আমাদের কাছে দোভাষী হয়ে সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে মেসোপটামিয়া যাওয়ার প্রস্তাব এসেছিল। কিন্তু জানি না কেন প্রস্তাব সেখানেই থেমে গিয়েছিল। আমাদের মধ্যে এমন কয়েকজন ছিল যারা ভ্রমণের লোভে সেখানে যেতে প্রস্তুত হয়ে যেত। এখন অভিলাষ আর বিদ্যালয়ের ছাত্র নয়। তবু সে মাঝে মাঝে আসত। আসত বিপজ্জনক চেহারা নিয়ে। ঘড়ি, ফোটোগ্রাফির ছোটখাট ক্যামেরা নিয়ে চলার বড় সখ ছিল তার। অল্প খরচাতেই সে খুব ফিটফাট থাকতে পারত। সে উচ্চবর্গের চালাক তরুণ, খারাপ অর্থে নয়। সে সঙ্গীদের বিশ্বাস ক়রত এবং নিজেও তাদের বিশ্বাসভাজন ছিল। বঙ্গভঙ্গের পর যে বোমা-সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল, প্রচণ্ড দমননীতি সত্ত্বেও তা কমার জায়গায় বেড়ে যাচ্ছিল। দিল্লিতে ভাইসরয় লর্ড হার্ডিংজের ওপর বোমা মারা হয়েছিল। তার প্রতিধ্বনি এখনো হাওয়ায় ভাসছিল। আমরা খুব গুরুত্ব দিয়ে ও সহানুভূতি নিয়ে দিল্লি ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমা সম্পর্কে পড়াশোনা করতাম। আমি আগ্রায় থাকাকালীনই অওয়ধ বিহারী, মাষ্টার আমীরচাঁদ ও বালমুকুন্দের ফাঁসি হয়েছিল। তাদের ফাঁসি আমাদের নিজের কোনো নিকট আত্মীয়ের হত্যার চেয়ে বেশী (দুঃখজনক) বলে মনে হয়েছিল। সেই সঙ্গে তাঁদের নিয়ে আমাদের খুব গর্বও ছিল। বিগত বছরের সাহিত্য ও সৎসঙ্গ, আমার সুপ্ত হৃদয়কে জাগ্রত করে দিয়েছিল। রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের খিচুড়ি বানানো সত্ত্বেও দেশের আজাদীর জন্য আমরা অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। অভিলাষ একবার কোথা থেকে বিস্ফোরক কিছু মশলা এনে একটা কাগজে দড়ি দিয়ে বেঁধে উঠানে ফাটাল, একটা হালকা মতো দড়াম শব্দ হল। মনে হয়, উঠানের বাইরে আওয়াজ পৌঁছয়নি। কিছুক্ষণ গন্ধকের গন্ধ ভাসতে থাকল। সে বলল, এই হল বোমার মশলা কিন্তু আসল বোমা বানাতে আরো অনেক জিনিষের দরকার। আমার কাছে অভিলাষের—সাহসী ও ব্যবহারপটু অভিলাষের—স্থান অনেক উঁচুতে ছিল, যদিও ওর পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়াটা আমি পছন্দ করিনি। সন্ত্রাসবাদীদের প্রতিও আমার খুবই সহানুভূতি ছিল। দেশের স্বাধীনতার জন্য তাদের অধীরতার আমি প্রশংসা করতাম। প্রয়োজন হলে তাদের কাজের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতেও আমার দ্বিধা ছিল না। কিন্তু সেই একদিন একটি কাগজের পুরিয়ার দু'মিনিটের বিস্ফোরণ ছাড়া আমার কখনো সন্ত্রাসবাদীদের কাছাকাছি যাওয়ার সুযোগ হয়নি। কিন্তু কেন আমি সন্ত্রাসবাদী হলাম না! —সম্ভবত এর কারণ যোগাযোগের অভাব। আশেপাশের এমন কেউ ছিল না যে আমাকে ঐদিকে টেনে নিতে পারত। অথবা আমার মধ্যে দৃঢ় জিজ্ঞাসা কম ছিল আর আমি তাঁদের আস্তানা খুঁজতে বেরোইনি। তাদের সঙ্গে অভিলাষের সম্পর্ক হয়তো ছিল কিন্তু সে আমাকে তার অন্য বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেওয়ার কথা বলেনি। ভাইসাহেব রাজনৈতিক স্বাধীনতার জবরদস্ত পাঠ দিচ্ছিলেন। তিনি লাল-বাল-পালের পরমভক্ত ছিলেন এবং দেশের জন্য যাঁরা মৃত্যুবরণ করছিলেন, তাঁদের প্রশংসা করতে তাঁর কোনো ক্লান্তি ছিল না। কিন্তু তিনিও কোনো কর্মঠ সন্ত্রাসবাদীর সংস্পর্শে আসেননি। তবু আমরা—মুসাফির বিদ্যালয়ের খালি পা, খালি মাথা তরুণরা পুলিশের নজর থেকে বেঁচে ছিলাম না।

১৯১৫-র শেষ দিকে আমার পড়াশোনাও শেষ হয়ে আসছিল। আমাদের বন্ধুদের মধ্যে

কেউ নমাজ ও কোন মৌলুদ[1] দেব নাগরী অক্ষরে লিখে আগ্রার এক প্রেসকে দিচ্ছিল। একবার সেই প্রেস আমাকে কোরানের হিন্দিতে অনুবাদ করে দেওয়ার কথা বলে। পরিশ্রম ও পারিশ্রমিকের সঙ্গে তখনো আমার পরিচয় হয়নি। আমি আড়াই টাকা সিপারাতে[2] দেবনাগরী অক্ষরে আরবী আয়াত-কে এবং হিন্দিতে তার অর্থ লিখে দিতে স্বীকার করলাম। প্রথম সিপারা দিয়ে আসার পর বুঝতে পারলাম প্রেস-অলা (বম্বে মেশিন প্রেস) আমাকে লুটে নিচ্ছে। দ্বিতীয় সিপারা যখন নিয়ে গেলাম, তখন আমি পারিশ্রমিক বাড়াতে বললাম। কিছু স্থির হল না এবং আমি তারপর অনুবাদের কাজ ছেড়ে দিলাম। কয়েক বছর পরে আমার অনূদিত দুই সিপারাকে কানপুরের কোনো হাটে আমার নাম ছাড়া ছাপা হয়ে বিক্রি হতে দেখলাম। আমি প্রেস-অলাকে চিঠি দিলাম। সে স্তোকবাক্যে ভুলাতে চাইল এবং কিছু টাকা পাঠিয়ে দিল। আমি নিজে ঝামেলায় পড়তে চাইনি, তাকেও ঝামেলায় ফেলতে চাইনি।

আগ্রাবাসের দিনগুলি শুধু শুকনো আদর্শবাদ নিয়েই কাটেনি। সমবয়স্ক সহৃদয় বন্ধুদের সঙ্গে ছিল একটি লোভনীয় জিনিষ। মুন্সী মুরারিলালজী আমাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুগম্ভীর মানুষ ছিলেন। তিনি স্বামী রামতীর্থের বেদান্ত-সংক্রান্ত দুয়েকটা উর্দু পুস্তক পড়েছিলেন। প্রয়াগে থাকাকালীন স্বামী রামের দর্শন ও সৎসঙ্গের যাঁদের সুযোগ হয়েছিল তাঁদের অনেকের কাছ থেকে স্বামী রামের ব্যক্তিত্বকে তিনি জানতে পেরেছিলেন। তার ফলে তাঁর ওপর বেদান্ত ও রামতীর্থের গভীর প্রভাব পড়েছিল। একটা সময় ছিল যখন বৈষ্ণব হয়েও আমি শংকরাচার্যের বেদান্তের অতিশয় ভক্ত ছিলাম। কিন্তু এখন আমি পাকা আর্যসমাজী। শুধু ওপর-ওপরই নয় দর্শনের ক্ষেত্রেও। আমি আর্যসমাজী দ্বৈতবাদের সামনে বেদান্তের অদ্বৈতবাদকে একেবারে দুর্বল বলে মনে করতাম। আমার মনে হত ভাই মুরারিলাল এখনো আদিম অবস্থায় আছেন। যখন কোনো সভায় আলোচনায় কিছুটা আলসেমি দেখা দিত, তখন রামতীর্থকে নিয়ে আমরা তাঁকে খেপাতাম। আঘাতটা লঘু হলে মুরারিভাই সমাধান করার চেষ্টা করতেন কিন্তু যদি শক্ত আক্রমণ হত, যদি আমি প্রশ্ন করতাম, "বেদান্ত কি—আর ব্রহ্মই বা কি? যে মানুষ জলে ডুবে মরতে প্রস্তুত, সে শুধু পাগলই হতে পারে।" তখন এই কথা তাঁর সহ্যের বাইরে চলে যেত। কিন্তু এর জন্য তিনি ঝগড়া করতেন না। তাঁর 'মৌনং কেবলমুত্তরং' (মৌনতাই এর উত্তর) হত। ভাই মুরারিলালের কাছে এক ডোরাকাটা কাপড়ের আচকান ছিল। শীতের দিনে কখনো কখনো তিনি তা পরতেন। কালো রঙের একটা নৌকোর মত টুপিও ছিল। আমরা মুসাফির বিদ্যালয়ের ছেলেরা খালি মাথায় থাকতাম। কিন্তু মুরারিভাই যখন আচকান পরতেন তখন তিনি টুপিও লাগাতেন। আমরা তাঁকে অনেক বলতাম—"ভাই সাহেব, সকলের মতো আপনারও খালি মাথায় থাকা উচিত।" বলতেন—"উঁহু, এই আচকানের সঙ্গে তো টুপি জরুরী।" "টুপি জরুরী" বলে যখন আমরা আওয়াজ দিতে লাগলাম তখন আচকানই উঠে গেল।

আমাদের ওখানে এক বুড়ী মিশ্রাণী রুটি বানাত। বৃদ্ধ ও যুবকদের দুনিয়া আলাদা। আমাদের মধ্যে অনেক রসিক মাঝে মাঝে মিশ্রাণীকে জ্বালাতনও করত। একদিন মিশ্রাণী আন্দাজ মতো আমাদের সকলের খাওয়ার জন্য আটা নিয়ে আসে। আমরা ঠিক করলাম, আজ মিশ্রাণীকে ঠকাব। ব্যস, আমরা আসন পিঁড়ি হয়ে বসলাম। মিশ্রাণী ফোলা ফোলা রুটির ফুলকা ছুঁড়ে দিতেই লাগল, আমরা খেতেই লাগলাম। আটা ফুরিয়ে যাওয়ার পরও আমরা বসে রইলাম।

১। হজরত মহম্মদের জন্মোৎসব (অনুবাদক)
২। কোরাণের ত্রিশটি ভাগের কোন একটি (অনুবাদক)

নিরুপায় হয়ে আবার সেরখানেক আটা এল। আটা আসতে দেরি হল, মাখতে আরো কিছু দেরি হল, ততক্ষণে আবার আমাদের খিদে পেয়ে গেল। ঐ একসের আটাও খতম করলাম। চাকর আবার আটা আনতে গেল, আমরা আবার খিদেকে উসকে দিলাম। মিশ্রাণী বলল, "খাও কত খাবে।" আমরা বললাম, "খাওয়াও কত খাওয়াবে।" দুই পক্ষেরই প্রতিযোগিতা লেগে গেল। চতুর্থবার আটা আনানোর পর মিশ্রাণী হতাশ হয়ে হার মানল। আমরা রুটির সেই ফুলকাগুলিও খেয়ে উঠলাম।

মুসাফির বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন পণ্ডিত ভোজদত্ত শর্মা। পণ্ডিত লেখরাম শর্মার পর মুসলমানদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বড় মহারথী হিসেবে তিনি পরিচিত ছিলেন। তাঁর কথাতে জবরদস্ত তাকত ছিল, যদিও কলমে ততটা ছিল না। প্রথম কিছুদিনের জন্য তিনি আর্যপ্রতিনিধি সভা পাঞ্জাবের উপদেষ্টাও ছিলেন। পণ্ডিত লেখরামের কাজ যাতে অব্যাহত থাকে সেজন্য তিনি মুসাফির বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন ও সাপ্তাহিক 'মুসাফির আগ্রা' পত্রিকা বার করেন। বিদ্যালয়ের কাজ চলত চাঁদায় যা আদায় করা যুদ্ধের সময়ে সহজ কাজ ছিল না, বিশেষ করে যখন পণ্ডিত ভোজদত্ত রোগ শয্যায় পড়েছিলেন। তাঁর দুই ছেলে ডাঃ লক্ষ্মী দত্ত ও পণ্ডিত তারাদত্ত উকিল বিদ্যালয়ের কাজ দেখতেন। কিন্তু তাঁদের নিজেদের সংসার চালাতে হত। সুতরাং নিজেদের পেশায় তাঁদের সময় দিতে হত। ডাক্তার লক্ষ্মী দত্তের ডিসপেনসারি শহরে ছিল। পণ্ডিত তারাদত্ত নতুন উকিল ছিলেন, তার জন্য তাঁর কম টানাটানি ছিল না। আর্থিক সহায়তার জন্য ডাক্তার লক্ষ্মী দত্তকেই বেশী কাজ করতে হত। এই টাকার কিছুটা পণ্ডিত ধর্মবীর ও কুমার সুখলালের মাধ্যমে আর্যসমাজের উৎসব ও সভা থেকে আসত। আর চিঠিপত্র লেখার পর কিছু টাকা সহায়ক মানুষেরা পাঠিয়ে দিত। যুক্ত প্রদেশের মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষেরই মধ্যে আর্যসমাজের প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল। তাই তারা বেশী টাকা-পয়সা দিতে পারত না। আগ্রা থাকাকালীনই পণ্ডিত বলদেব চৌবে (এখন স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী) বৃন্দাবন ইত্যাদি ঘুরে এখানে এসেছিলেন। এই সময় তিনি প্রয়াগে ম্যাট্রিকের ছাত্র ছিলেন। সাধারণ কথাবার্তা হয়েছিল। একই জেলার হওয়ায় আকর্ষণ কিছুটা নিশ্চয় বেড়ে যায়। কিন্তু তখন বুঝতে পারিনি যে, আমাদের এই প্রথম পরিচয় আজীবন বন্ধুত্বে পরিণত হবে। আমরা ঐ বছরের (১৯১৫) ডিসেম্বরে বৃন্দাবন গুরুকুলের বার্ষিক উৎসব দেখতে গিয়েছিলাম। পরে কংগ্রেসের অধিবেশন ও তার বিরাট ক্যাম্প দেখে ঐ স্মৃতি ফিকে হয়ে যায়। কিন্তু ঐ সময় এই ছোটোমত শিক্ষিত, সংযত মেলা অন্য গেঁয়ো, অসংযত ধর্মীয় মেলা থেকে অনেক ভাল মনে হয়েছিল। এখানে আমি আর্যসমাজের প্রধান উপদেষ্টাদের প্রোফেসর রামদেব প্রভৃতির ভাষণ শোনার সুযোগ পেলাম। বার বার জল অথবা দুধ ঢোক দিয়ে খেয়ে গলা সাফ করা, নোটবুকের পাতা ওলটানো, ফেনাভরা মুখে আরোহ-অবরোহ হয়ে বার-হওয়া তাদের আওয়াজ এবং বেদের সত্যের সামনে বিজ্ঞান ও পশ্চিমী জগতের মাথা নত করার গর্জনের পর জনতার তুমুল হর্ষধ্বনি—এই সব কথা আমার আজও মনে আছে। ১৯১৫-র বৃন্দাবন গুরুকুলের ইমারতের অত্যন্ত অল্পই স্মৃতি ছিল আমার। গুরুকুলের কাছেই কিছুটা জঙ্গলের মতো ছিল। ইমারত কম, কিন্তু পরিচ্ছন্ন ছিল। হলুদ কাপড়, কাঠের খড়মে সেখানকার ব্রহ্মচারীরা ঋষিযুগের স্মৃতি এনে দিত। ঈর্ষা হত, আমার এই ধরনের সংস্থায় পড়াশোনার সুযোগ কেন মেলেনি।

বৃন্দাবনে আমি প্রেম মহাবিদ্যালয়ও দেখতে গিয়েছিলাম। এর প্রতিষ্ঠাতার নাম ও বর্ণনা যুদ্ধের আগেই হয়তো 'সরস্বতীতে' আমি পড়েছিলাম। এদিকে যুদ্ধের সময় যেভাবে সর্বস্ব ত্যাগ করে তিনি ইংলন্ডের শত্রুদের সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করেছিলেন তার খবরও আমরা যখন-তখন পেতাম। সেই সময় তাঁর ভূসম্পত্তি সদ্য বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আমরা

তাঁর দূরদর্শিতার প্রশংসা করতাম—তাঁর ভূসম্পত্তির অধিকাংশই তিনি প্রেম মহাবিদ্যালয়কে দান করেছিলেন। বৃন্দাবনে এক-আধটা মন্দিরেও গিয়েছিলাম। শ্রীরঙ্গের মন্দির দেখে তামিল দেশের এই রকম হাজার হাজার মন্দিরের স্মৃতি মনে এসেছিল। আমরা মথুরার ওপর দিয়ে অবশ্যই গিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে থাকিনি। এই যাত্রায়ই রেল গাড়িতে সাহিত্যাচার্য পণ্ডিত ব্রহ্মদত্তের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তখনও তিনি এম.এ. পাস করেননি। আর্যসমাজেও যোগদান করেননি। কিছুকাল পরে পণ্ডিত অখিলানন্দ আর্যসমাজ থেকে আলাদা হয়ে তাকে ও তার প্রতিষ্ঠাতাকে গালি দিতে থাকেন। আর নিজের সংস্কৃত কাব্যচাতুর্যের গর্বে আর্যসমাজীদের শাস্ত্রীয় বিতর্কের চ্যালেঞ্জ দিতে থাকেন। তখন তাঁর মোকাবিলার জন্য ব্রহ্মদত্ত আবির্ভূত হলেন। সংস্কৃত ভাষায় গদ্যে ও পদ্যে যে কোনোটায় তিনি অখিলানন্দকে শাস্ত্রীয় বিতর্কের চ্যালেঞ্জ জানালেন।

আগ্রা থাকাকালীনই কোমাগাতামারুর বাহাদুর শিখেরা ও তাদের নেতা বাবা গুরু দত্ত সিংহের ওপর বজবজে গোলাবর্ষণের ঘটনা ঘটেছিল। কোমাগাতামারুর শিখেরা সাহসিকতার সঙ্গে ইংরেজের মোকাবিলা করেছিল। এই ঘটনাকে আমরা গর্বের ব্যাপার মনে করতাম। তারপর পাঞ্জাবে স্বাধীনতার জন্য একের পর এক প্রচেষ্টার খবর ল্যাহোর ষড়যন্ত্র মামলা থেকে জানতে পারতাম, মামলার অগ্রগতির কোনো কোনো কথা খবরের কাগজের মারফত অথবা অন্যভাবে পাওয়া যেত। জাতীয় স্বাধীনতার প্রেরণা লক্ষ লক্ষ ভারতীয় নওজোয়ানের মতো আমার হৃদয়কেও পূর্ণ করেছিল। তাই পরমানন্দের বাজেয়াপ্ত 'ইতিহাস' পুস্তক আমার পড়া হয়ে গিয়েছিল যখন লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁর ফাঁসির সাজা দেওয়া হল। আমার মানসিক অবস্থা তখন এই রকম ছিল যে যদি তাঁকে অথবা তাঁর সঙ্গীদের ছাড়িয়ে আনার জন্য প্রাণ দিতে ইচ্ছুক স্বেচ্ছাসেবকের দরকার হত তাহলে আমি প্রথম নাম লেখাতাম।

জাতীয় স্বাধীনতার জন্য আমার মধ্যে এতটাই অস্থিরতা ছিল কিন্তু সেই সময় জাতীয় স্বাধীনতা সম্পর্কে আমার ধারণা কি ছিল? জাতীয়তা ও ধর্মকে আমি তখন আলাদা মনে করতাম না। ধর্ম বলতে আমি বুঝতাম, আর্যসমাজ ও স্বামী দয়ানন্দ স্বীকৃত বৈদিক ধর্ম। অন্যান্য ধর্ম—খ্রীষ্ট, ইসলাম, ইহুদী ও বৌদ্ধ ধর্মই শুধু নয়, হিন্দু ধর্মের অনেক সম্প্রদায়কেও আমি মিথ্যে ধর্ম তথা বেদ ও বিজ্ঞানের আলোয় শীঘ্রই লুপ্ত হয়ে যাবার মত ধর্ম বলে মনে করতাম। তর্ক ও নথিপত্রের দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বীকে আমার পথে নিয়ে আসার পক্ষপাতী ছিলাম আমি। কোনো ধরনের বলপ্রয়োগকে আমি দুর্বলতা বলে মনে করতাম। তাই যখনই আমার কোনো খ্রীষ্টান বা মুসলমান ধর্মপ্রচারকের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ হত, তখন আমি তাঁদের সঙ্গে খুব ভালবেসে মিলতাম। কথা বলার সময় সর্বদা মাথা ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করতাম। আগ্রায় ভাই মহেশ প্রসাদজীর পরিচিতদের মধ্যে সেখানকার ব্যাপটিস্ট মিশন স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রী স্যামুয়েল ছিলেন। তাঁর বাবা ব্রাহ্মণ থেকে খ্রীষ্টান হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মা, এখনো বোধহয় ছেলেকে শ্যামলাল বলে ডাকতেন। ভাই সাহেবের সঙ্গে কখনো কখনো আমিও শ্যামুয়েল সাহেবের কাছে যেতাম। তাঁর বুড়ী মা ভাই সাহেবের কাছে জগন্নাথ দর্শন করিয়ে আনার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতেন। শুদ্ধির কথা তাঁর মার কানেও পৌঁছেছিল। কিন্তু তাঁর এই আন্তরিক ইচ্ছায় একমাত্র ছেলের সহানুভূতি ও পুত্রবধূর বিরুদ্ধতা দেখে তিনি বিরক্ত হতেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল যে পুত্রবধূ বাধা না দিলে আমি আবার ব্রাহ্মণ হয়ে যেতাম। স্যামুয়েল সাহেব নিজের মার শ্রদ্ধার সম্মান করতেন, তাঁকে খুব ভালবাসতেন। সে সময়ে একথা আমার মাথায় আসেনি যে, এক পরিবারেও মা-ছেলে খ্রীষ্টান ও হিন্দু এই দুই ধর্মই রাখতে পারে। আর্যসমাজকে আমি সার্বভৌম সমাজ বলে মনে করতাম এবং বিশ্বাস করতাম যে নিজের সভ্যতার নিত্যতার জন্যই এই ধর্মও বিজ্ঞানের মতোই

এক দিন সমগ্র জগতে সমঝদার ও সাধারণ মানুষের ধর্ম হয়ে যাবে। জাত-পাত ও ছোঁয়াছুঁয়ি তাঁর প্রতিবন্ধক দেখে আমি তার সঙ্গে বিন্দুমাত্র আপোষ করতে প্রস্তুত ছিলাম না। ঐ সময় কোনো মুসলমানের সঙ্গে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল কিনা মনে নেই। কিন্তু আগ্রাতেই আমি বেনারসের এক সর্বধর্মের যৌথভোজের কথা কাগজে পড়েছিলাম। এই ভোজে পণ্ডিত কেশবদেও শাস্ত্রীর মতো আর্যসমাজী নেতাও যোগ দিয়েছিলেন। আর্যসমাজের কিছু সংবাদপত্র এর বিরুদ্ধে লিখেছিলেন। কিন্তু আমি এর বড় সমর্থক ছিলাম। ভগবতী ভাই অন্য বিচারধারার সমর্থক ছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল যে বিনা শুদ্ধিতে কোনো অনার্যের হাতে খাওয়াটা ঠিক নয়। আমি বলতাম—যদি এই কথা বলা হয় তবে শুদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত কোনো হিন্দু-ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের হাতে খাওয়াও উচিত নয়।

ঐ সময় আমি আর্য সমাজের উগ্রদলের চিন্তার সমর্থক ছিলাম। এছাড়া বেদ ঐশ্বরিক হওয়ায়, কারো আপত্তি আমি সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলাম না। বেদে রেল, তার, বিমানের কথা আছে একথা আমার সত্য মনে হত যদিও এখন পর্যন্ত আমি তাকে ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখিনি। আর্যসমাজীদের নিজেদের হিন্দু বলা, আমি লজ্জার কথা মনে করতাম। আর্য ধর্ম হিন্দু ধর্ম থেকে ততটাই দূর যতটা ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্ম। একথা আমি চিরকাল বলে এসেছি। ভারতের ওপর আর্যধর্মের বিশেষ অধিকার আছে। তার উন্নতি ও স্বাধীনতা আর্যধর্ম ও অখণ্ড জাতীয়তার প্রতিষ্ঠার দ্বারাই হতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে এও আমি মনে করতাম যে আজ যদিও সব ধর্মানুগামীদের এক হয়ে যাওয়া অসম্ভব মনে হচ্ছে, কিন্তু আর্যধর্মের সত্যতাকে অস্বীকার করাও যাবে না। বিজ্ঞানের সঙ্গে কিছু মিথ্যা বিজ্ঞানও সংসারে জাল টাকার মতো চলছে। ডারউইনের বিবর্তনবাদকেও আমি এরকম মিথ্যা বিজ্ঞান বলেই মনে করতাম। বিবর্তনবাদ খণ্ডন করে লেখা পণ্ডিত আত্মারাম অমৃতসরীর পুস্তক হাতে পেয়ে আমি. যখন পড়লাম, তখন বড় খুশী হয়েছিলাম। জগৎ সৃষ্টির জন্য এক সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের প্রয়োজন আছে (জন্মাদ্যস্য যতঃ। বেদান্ত সূত্র ১।১) এবং ঈশ্বর মনুষ্যসৃষ্টির সঙ্গে তাঁকে নিজস্ব জ্ঞানও অবশ্যই দেবেন। এই ভাবে ঈশ্বরীয় জ্ঞান সৃষ্টির শুরুতেই হয়ে যায়। ডারউইনের বিবর্তনবাদ অনুসারে বাঁদর থেকে জংলী তথা সভ্য মানুষ পর্যন্ত উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা করে মানুষের জ্ঞানের বিকাশ করা আমি ঈশ্বরের সত্তার ওপর বড় আঘাত বলেই মনে করতাম। তাই বাদপ্রতিবাদ হলে আমি বলতাম এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত বলেছি—"যদি অস্বীকার করতে হয়, তাহলে ঈশ্বরের অস্তিত্বকেই প্রথম অস্বীকার কর। যদি ঈশ্বর থাকে, তাহলে সৃষ্টির আরম্ভ থেকেই তিনি সূর্যের মতো এক জ্ঞান-সূর্যও দিয়ে থাকবেন যাতে তাঁর সন্তানরা ভুল পথে না যেতে পারে। আর ঐ জ্ঞানসূর্য হল জগতের সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ বেদ।"

শীতের সঙ্গে আমার পড়াশোনাও সমাপ্তির দিকে এগিয়ে চলছিল। ভাই রামগোপাল উপদেষ্টা হয়ে কর্নাল চলে গিয়েছিলেন। বিদ্যালয় থেকে যে নতুন ছাত্ররা বেরিয়ে যাবে তাদের মধ্যে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমার ওপর বেশী আশা রাখতেন। লেখাপড়া ও খাওয়া-দাওয়ার নিখরচা ব্যবস্থা করায় বিদ্যালয়ের আমাদের কাছ থেকে অন্তত কয়েক বছরের কাজ পাওয়ার অধিকার ছিল। পড়াশোনার পর যখন ব্যবস্থাপকদের পক্ষ থেকে বলা হয়, এখন আর্যসমাজ ও বিদ্যালয়ের জন্য কিছু কাজ কর, তখন আমার উত্তর ছিল—"আর্যসমাজের কাজ আমি করতে চাই কিন্তু আপাতত এই সম্বল নিয়ে বেশী কিছু করতে পারব না। আমাকে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করতে হলে আরো কিছু পড়াশোনার প্রয়োজন আছে।"

আমার চিঠি যাগেশের আবার ছোঁয়াচে রোগ এনে দিল এবং আমি আগ্রা থেকে চলে আসার আগেই সে মুসাফির বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল।

৩

লাহোরের পথে (১৯১৬ খ্রী)

আগ্রায়ই স্থির করেছিলাম, আরো সংস্কৃত পড়ব এবং লাহোরে পড়ব। আমার ভ্রমণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আমার অস্তিত্বকে ভুলিয়ে দিতে চায়নি। তাই সোজা লাহোর না গিয়ে কিছুটা ঘুরেফিরে যাওয়ার ছিল। ভগবতী ভাইয়ের কাছ থেকে-তাঁর গ্রাম কোটার নাম শুনেছিলাম। ভাষাতত্ত্বের সঙ্গে এখন পর্যন্তও আমার কোনো পরিচয় ছিল না। তবু যেখানে সাধারণ মানুষ হিন্দি বলে এমন জায়গা দেখতে এবং সেখানকার মানুষদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে উৎসুক হয়েছিলাম। আমরা পড়াশোনা করে হিন্দি বলতাম কিন্তু তাতে সেই সজীবতা সেই নমনীয়তা ছিল না যা জন্ম থেকে যারা হিন্দি বলে তাদের ভাষায় আছে। মুরাদাবাদের সারস্বত, ক্ষত্রিয়দের ও তাদের পরিবারের ভাষায় আমার কাছে একটা বিশেষত্ব ধরা পড়ত। কিন্তু মুরাদাবাদের সাধারণ শহর ও গ্রামের মানুষ হিন্দি বলত না। কোটা এমন গ্রাম যেখানকার লোক বস্তুত সেই হিন্দি বলত যার পরিষ্কৃত রূপ আমরা বইয়ে পড়তাম এবং ব্যবহার করতাম। মুরাদাবাদের পাঠকজীর প্রারম্ভিক সঙ্গ থেকেই আমার ভাষার ত্রুটিগুলিকে পরখ করেছিলাম। উচ্চারণে সেকেন্ডের হাজারতম ভাগ—তথা উচ্চারণস্থানের একচুল ব্যবধানের ভেতর থেকে ভাষার স্বাভাবিকতা, কৃত্রিমতা ও বক্তার বাসস্থানের ঠিকানা বোঝা যায়—একথা আমি কলকাতার আগে আমার অন্যত্র প্রবাসের সময় থেকেই জানতে পেরেছিলাম। নিজের চেষ্টায় ভাষার উচ্চারণে করায় কতটা সফলতা অর্জন করেছিলাম, তা আমি জানি না। শেষ পর্যন্ত নিজের চেহারার মতো নিজের কণ্ঠস্বরকেও কেউ দেখতে পায় না। যখন মন উচ্চারণের চেষ্টায় ব্যস্ত থাকে, তখন শ্রোতার সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকে না। দর্পণের মতো নিজের সঠিক প্রতিবিম্ব (প্রতিধ্বনি) যদি কেউ সামনে রাখতে সক্ষম হয় তবে হয়তো সে সত্যকে জানতে পারবে। শব্দ প্রয়োগের ওপরেও দৃষ্টি রাখতাম, কেননা ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ানোর ফলে বুঝতে পেরেছিলাম যে এক জায়গার বহু প্রচলিত শব্দ অন্য জায়গায় অজানা থাকতে পারে। আমাদের মুরারিভাই প্রায়ই এই ধরনের ভুল করে বসত। সেই কারণে ভগবতীভাই ঝট করে তার ওপর হামলা করে বসত। তারপর এই গ্রাম্য দোষ দূর করার জন্য আমি সংস্কৃত প্রতিশব্দ খুঁজে বার করার চেষ্টা করতাম। যে শব্দ শুদ্ধ অথবা অপভ্রংশরূপে সংস্কৃতে আছে, তার প্রয়োগে আপত্তি করার হিম্মত কার থাকতে পারে।

ভাষা শোনার চেয়েও কোটা যাওয়ার আমার বেশি ইচ্ছা ছিল ভগবতী ভাইয়ের বাড়ি দেখার ও ফাল্গুনের ছোলাভাজা খাওয়ার জন্য। খুর্জা রাস্তায় পড়েছিল, বুলন্দ শহরও। কিন্তু দুই জায়গাতেই আমার দেখার বিশেষ কোনো আকর্ষণ ছিল না। দুপুরের আগেই যে স্টেশনে নেমে কোটা যেতে হয় সেখানে নামলাম। সেখান থেকে কোটা কয়েক মাইল। পাকদণ্ডীর রাস্তা ছিল এবং লোকজনকে জিগ্যেস করে যাওয়ার ছিল। খালের জলে সেচ দেওয়া গমের খেতে বড় বড় শিষ হয়েছিল। চারদিকে সবুজ আর কোথাও কোথাও পাকা মটরের হলুদ গাছের ফরাশ বিছিয়ে দিয়েছে মনে হয়। ধান সবচেয়ে ঘন, ধান দেখে মন যত প্রসন্ন হয় এমন আর কিছুতেই হয় না।

ফাল্গুনের পাকা ও পাকবে এমন ফসল দেখেই এই জ্ঞান জন্মে। আর ছোলাভাজা? দুনিয়ায় এর চেয়ে মধুর খাদ্য আর কি হতে পারে? মটর, গম, যব অথবা ছোলার সবুজ দানাসহ কাণ্ড শুকনো পাতায় ভেজে ফেলুন। তারপর যদি মিলে যায় তবে বাটা নুন ও কাঁচা লংকার সঙ্গে অথবা শুধু শুধু গরমাগরম হাতে ঘষে খেতে শুরু করুন। —এই নিয়ম। বেহেস্ত-এর মন্না ও দেবতাদের অমৃত এর কাছাকাছি আসতে পারে না।

খেতের মধ্য দিয়ে রাস্তা ছিল। যেদিকে গিয়েছে, হয়তো পথিকেরাই সেদিকে খেতের মধ্য দিয়ে জবরদস্তি করে রাস্তা বানিয়ে নিয়েছিল। কোনো লোকের ব্যক্তিগত সম্পত্তির মধ্য দিয়েও যদি একবার রাস্তা হয়ে যায় তবে প্রত্যেক পথিকের জন্যই বৈধ পথ। গমের লম্বা চারাগাছের আড়াল থেকে হঠাৎ এক যুবতী এসে সামনে দাঁড়াল। সে কর্কশ আওয়াজে জিগ্যেস করল—"কোথায় যাবে?"

স্ত্রীলোকের গলার স্বর যে এত কর্কশ হতে পারে, তা আমি আগে কখনো ভাবতেও পারিনি। মনে হচ্ছে, শব্দ নয়, একসঙ্গে দশ-দশটা লাঠি কানের পর্দার ওপর পিটাচ্ছে। প্রথমে ভেবেছিলাম হয়তো আমি ওর খেতের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি তাই ও নারাজ হচ্ছে। কিন্তু এতে আমার কি দোষ? রাস্তা আগে থেকেই বানানো ছিল। আটকাতে চাইলে কাঁটার বেড়া দেয়নি কেন? আর এখন ফসল কাটার সময় রাস্তা আটকে দিলেই কি কোন নতুন চারা শিষ নিয়ে উঠবে?

'কোটা যাচ্ছি।' আমি খুব নরম সুরে যুবতীকে উত্তর দিলাম। ওর চেহারা ওর আওয়াজের মতো কর্কশ ছিল না। অলংকার শাস্ত্রের মন্তব্য অনুযায়ী আঠারো বছর বয়সে তো "গর্দভী হ্যপ্সরায়তে" (গর্দভীও অপ্সরাতুল্য)। কিন্তু এখানে সৌন্দর্যও যথেষ্ট ছিল।

ঘাগরা, ওপরে ওড়না, গায়ে চোলি। ওড়না মাথা হয়ে পিঠে পড়েছিল— চোলীর ভেতর থেকে গোল গোল স্তন যেন ফেটে বেরিয়ে আসছিল। ওর শরীরের ওপর দৃষ্টি রেখে ওর কথা ও স্বরের প্রতিধ্বনি তখন শুনতে ও তা নিয়ে ভাবতে ভাবতে ওর কাছে কোটার রাস্তা জিগ্যেস করলাম। ওই যুবতীর আকৃতি ও শরীরের সংকেত প্রকাশ করার জন্য আমার হালের 'গাথা সপ্তসতীর' কথা মনে হল। প্রাকৃত তো ততটা জানতাম না, কিন্তু সংস্কৃতের ছায়াতে আমি তা পড়েছিলাম। আমার বিশ্বাস, হয়তো এই অবস্থার ওপরে কোনো গাথা ওখানে নিশ্চয় থাকবে কিন্তু এর সত্যতা যাচাই করার কোনো সুযোগ মেলেনি। স্বাস্থ্যে ভরপুর যৌবনের মূর্ত স্বরূপ সেই আহীর যুবতী অনেক বছর কেটে যাওয়ার পরও আরো আকর্ষণীয় হয়ে উঠছিল। এই জায়গা কোটা থেকে বেশী দূরে ছিল না।

ভগবতী ভাই কোটাতে ছিলেন না, মাণিক এই সময় কোথায় ছিল মনে নেই। আমার বাবার মতো ভগবতীর বাবারাও দু-ভাই ছিল। আমার মার মতো ভগবতীর মাও আগেই মারা গেছেন। আমার মতো তারও এক কাকীমা ছিল। ভাইপোর প্রতি তাঁর ব্যবহারও ভাল ছিল। বয়সে ভগবতী আমার চেয়ে হয়ত কিছুটা বড় ছিল। বড় না হলেও আমি তাকে বড় ভাই বানিয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক মানুষ লাভের কাজই করে। বৌদি পেলে লাভ অথবা ভাইয়ের স্ত্রী, যার ওপর ভুলক্রমে দৃষ্টি পড়লেও পাপ হয়। আর কখনো ভুলবশত তার শরীরের ছোঁয়া লেগে গেলে যমরাজও আশ্রয় দেবেন না। ভগবতী ভাই বলে হয়তো বৌদির দর্শন কোনো না কোনো ভাবে হয়ে যেতেও পারত—হয়তোই বলছি; কেননা চব্বিশ বছর আগে কেন, আজও তরুণ দম্পতির বড়দের সামনে কতটা স্বাধীনতা আছে, তা আমি জানি। হ্যাঁ, বৌদির হাতে রুটি খেয়েছি, বড় মিঠে লাগত। একদিন ভুট্টার রুটি হয়েছিল। আমি ভাবতেও পারিনি ভুট্টার আটা অতটা মিষ্টি আর তার রুটি এমন মিঠে হতে পারে। বৌদির সেই রুটির কথা

এখনো আমার মনে পড়ে। কিন্তু পরে একথা জেনে আপসোস হয়েছিল যে ঘোমটার আড়ালে চাকীর ওপর যে হাত চলত, সেই হাত আর দুনিয়ায় নেই।

হোলির দিন ছিল। রাত্তিরে ফাগের গানের বাহার লেগেছিল। আর্যসমাজের ব্যক্তি গ্রামেও পৌঁছে গিয়েছিল এবং সংযম-নিয়মের নামে জনতার মনোরঞ্জনের সব উপায়ের ওপর কুঠারাঘাত করা হচ্ছিল—ফাগ অশ্লীল, এই গান গাওয়া উচিত নয়, নাচা অসভ্যতা, বেশ্যাদের কাজ, তার কাছাকাছি যাওয়াও ঠিক নয়। কোনো সময় গ্রামের অধিকাংশ জাতি-স্ত্রীপুরুষ দুইই—এই উপলক্ষ্যে গাইত, নাচত। কিন্তু সেসব কথা এখন বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছিল। তা সত্ত্বেও কোটার থেকে ফাল্গুনের এই বাহার লুপ্ত হয়ে যায়নি। আমি কি দেখেছিলাম তা ভুলে গেছি।

কোটাতে এসে ছোলাভাজা খুব খেয়েছিলাম। ভগবতী ভাইয়ের ছেলেবেলার সাঙ্গাতদের সঙ্গে খেতেই বেশী সময় কাটাতাম। আমার মনে নেই, আমার উপদেশের মহিমা দেখাবার সামান্য চেষ্টাও করেছিলাম কিনা। হোলির এক অথবা দুই দিন পরে আমি কোটা ছাড়লাম। পায়ে হেঁটে সিকন্দরাবাদে গেলাম। এক রাত্রি গুরুকুলে থাকলাম। সম্ভবত শর্মাজীর (পণ্ডিত মুরারিলাল) দেহাবসান হয়ে গিয়েছিল।

সিকন্দরাবাদ থেকে সোজা দিল্লী গেলাম। কেল্লা, কুতুব ও কিছু অন্য দর্শনীয় স্থান দেখলাম। আর ট্রেনে গুরগাঁওয়া রওনা হলাম। বৃন্দাবন গুরুকুলের বার্ষিক উৎসবে সোহনার এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি তাদের ওখানের উষ্ণ প্রস্রবণ তথা পাহাড়ের বর্ণনা করেছিলেন। ব্যস, তা দেখার জন্য রেলপথ ছেড়ে এদিক-ওদিক ঘুরছিলাম। গুরগাঁওয়া থেকে সোহনার দিকে পাকা সড়ক চলে গেছে। সোহনা যখন পৌঁছলাম তখনো খেতে সবুজ গমের গাছ দাঁড়িয়েছিল। শীতের দিন ছিল। গরম ঝরণায় স্নান করে ভাল লাগল। বৃন্দাবনে যে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল কিনা মনে নেই। কিন্তু বেশীর ভাগ সময় আমি এক ব্রাহ্মণ পালোয়ানের ওখানে থেকেছিলাম। তার এক ছোটমতো দোকান ছিল। সে দিল্লি ষড়যন্ত্র কেসে অভিযুক্ত গনেশীলাল 'খস্তার' মামা। তাই তাকে আমার বেশী কাছের মানুষ মনে হত। তার ওখানে আহারে গাজরের আচার ও তার রস আমার এখনো মনে পড়ছে। সোহনা সুন্দর মফঃস্বল শহর। এর আশেপাশের এলাকা মেও লোকের বসতি। তাঁরা প্রায় সবাই মুসলমান। শহরের পাশের পাহাড়ে এক বাদশাহী কেল্লা ছিল যার বেঢপ পাথরের একটা বুরুজ ও দেয়াল তখনো দাঁড়িয়েছিল। ছোট ছোট পাহাড় ও তার ওপর ইতস্তত বসতি। একদিন কারো সঙ্গে আমি এক মেও মৌলবীর ওখানে গেলাম। আশেপাশের এলাকায় ঈশ্বরভক্ত হিসেবে তাঁর বেশ খ্যাতি ছিল। কিন্তু তিনি ততটা মৌলবী ছিলেন না যতটা ছিলেন এক ভজনানন্দী সুফী। হিন্দুরাও তাঁর সমাদর করত এবং তিনি হিন্দুদের পানভোজনের জন্য আলাদা বাসন রাখতেন। ইসলাম ও কোরান পড়ে এখন আমি সদ্য পালোয়ান হয়েছিলাম এবং তর্কের কোনো সুযোগ করে নেওয়ার চেষ্টায় থাকতাম। কিন্তু সেই বৃদ্ধ সেজন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি তার জন্য কোনো মৌলবীর নাম করেছিলেন। আমাকে সসম্মানে বললেন। বহুক্ষণ কথা বলতে লাগলেন। তর্ক করার সাধ তো আমার মেটেনি কিন্তু আমি গৃহকর্তার ভদ্রতায় খুব প্রভাবিত হয়েছিলাম। ফেরার সময় বিকেলে এক কুয়ার ধারে পৌঁছলাম যার কাছে একটা ধর্মশালা ছিল। কয়েকশ' হাত নিচে জল না দেখলে আমার বিশ্বাস হত না যে একটা কুয়া খুঁড়তে হাজার টাকা খরচা হতে পারে।

সোহনা থেকে আবার আমি পায়ে হেঁটেই গুরগাঁওয়া পৌঁছলাম। রাস্তায় কোনো শিক্ষিত ভদ্রলোকের এক সুন্দর বাংলো অথবা বাড়ি ছিল। তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। তিনি সাগ্রহে

খেয়ে যেতে বললেন। আখেরে দুপুরের ভোজন কোনো না কোনো জায়গায় খেতেই হত। সেখানেই প্রথম পাঞ্জাবী খানা খেলাম। ক্ষীর, রুটির ফুলকা, কলিয়া (বাটি)-তে পেঁয়াজের সঙ্গে ঘিয়ে ভাজা তরকারি (ভাজি) এবং হয়তো দইয়ের লস্যি। ভদ্রলোক পাঞ্জাবী ছিলেন না। গুরগাঁওয়া প্রভৃতি আম্বালা কমিশনারীর জেলাগুলি ভাষার টানে যুক্তপ্রদেশের সঙ্গে সম্পর্কিত, পাঞ্জাব প্রদেশে থাকায় শিক্ষিতদের বেশভূষায় ও পানভোজনের ওপর পাঞ্জাবের প্রভাব পড়েছে।

দিল্লি হয়ে থানেশ্বর এলাম। রামগোপালভাই এখানেই উপ প্রতিনিধি সভার হয়ে আর্যসমাজের প্রচার করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করা, থানেশ্বর-কুরুক্ষেত্র দেখা—এই ছিল এখানে আসার বিশেষ কারণ। কুরুক্ষেত্র গুরুকুলও হয়ে এলাম। সেই সময়ে বিষ্ণুদত্ত এর মুখ্য অধিষ্ঠাতা ছিলেন। যদিও মুসাফির বিদ্যালয়ের কর্ণধারদের কাবড়ী-গুরুকুলের বিদ্যালয়ের কর্ণধারদের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গিয়েছিল। আর তাঁদের সহানুভূতি মহাবিদ্যালয় জ্বালাপুর-এর অনুকূলে তথা গুরুকুল কাংড়ীর বিরুদ্ধে ছিল। সেখানে গুরুকুলকে বুদ্ধ বানানোর ফ্যাকটরি বলা হত। তা সত্ত্বেও আমার তাঁর প্রতি সহানুভূতি ছিল। শেষ পর্যন্ত বেদ ও বিজ্ঞানের পূর্ণ শিক্ষার কোনো স্থান তো থাকা দরকার।

রামগোপাল ভাইয়ের সঙ্গে শাহাবাদও গিয়েছিলাম। লালা রামপ্রসাদের ব্যাখ্যান আগ্রায় শুনেছিলাম। মহাত্মা হংসরাজের আত্মবিসর্জনের যে চিত্রণ তিনি তাঁর ব্যাখ্যানে করেছিলেন তা আমাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। আজকাল লালাজী বাড়িতেই থাকতেন। রামগোপালজীর সঙ্গে আমিও তার কাছে গেলাম কিন্তু এক অর্ধশিক্ষিত তরুণ ছাড়া তিনি আমাকে আর কি ভাবতে পারতেন।

শাহাবাদ থেকে রামগোপাল ভাইয়ের থানেশ্বর ফিরে যাওয়ার কথা ছিল আর আমার যাওয়ার কথা ছিল লাহোর। আমার টাকা শেষ হয়ে গিয়েছিল। আর লাহোর পর্যন্ত টিকিট কেটে দু'বার টাকা দিয়ে দেওয়াই রামগোপালজীর পক্ষে খুশীর ব্যাপার ছিল। আমাদের ঘনিষ্ঠতা সাধারণ বন্ধুর মতো ছিল না। থানেশ্বর আসার ব্যাপারে তিনি আমার সম্মতি নিয়েছিলেন। তিনি চাকরি করে পরিবার পালন করতে আসেননি। বরং স্ত্রীকে কিছু লেখাপড়া শিখিয়ে মুক্ত হয়ে বৈদিক মিশনারির গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য পালন করার ভবিষ্যৎ প্রস্তুতির জন্য এসেছিলেন।

আগ্রা থেকে রওনা হওয়ার সময় 'মুসাফিরের' ম্যানেজার কুঁঅর বাহাদুর সিংহের কাছ থেকে লাহোরে তাঁর দুই পরিচিত ব্যক্তির নামে পত্র লিখিয়ে নিয়েছিলেন। কুঁঅর বাহাদুর সিংহও ফুর্তিবাজ মানুষ ছিলেন। সিন্দ-তে অনেকদিন ছিলেন। তারপর মুসাফির-এ চলে আসেন। আগের বছর সুখলালের ব্যাখ্যানে উত্তেজিত হয়ে তাঁর জেলা জালৌন-এর কোঞ্চ শহরের মুসলমানেরা তাঁর ওপর হামলা করেছিল, তাতে তিনি খুব আঘাত পেয়েছিলেন। 'আর্যগেজেটের' সম্পাদক মহাশয় খুমহাল চন্দ 'খুর্সন্দ'-কে তিনি একটি চিঠি লেখেন এবং দ্বিতীয় চিঠি লেখেন এক তরুণ পাঞ্জাবিকে যিনি সম্প্রতি বুন্দেলখণ্ডের এক রাজপুত বিধবাকে বিয়ে করেছিলেন এবং কোনো অফিসে শর্টহ্যান্ড রাইটার ও টাইপিস্ট ছিলেন। স্টেশনে নেমে প্রথম আনারকলী আর্যসমাজে গেলাম। সম্ভবত ঐ দিন 'খুর্সন্দ' সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কিন্তু প্রথম কটা দিন এই টাইপিস্ট মহাশয়ের ওখানে মৌরী দরবাজার ভেতরের এক অন্ধকার ঘরে ছিলাম। সেখানের এক ঘটনা মনে আছে। সেখানের গৃহকর্ত্রী বুন্দেলখণ্ডী মহিলা পাঞ্জাবে এসেছেন মাত্র পাঁচ-ছয় মাস। কিন্তু এরই মধ্যে তিনি নিজের ভাষার অনেক শব্দ প্রয়োগ করা ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি বললেন, —"দু' পয়সার পকৌড়ী নিয়ে এসো, বতাউকী—"

আমি বাক্যের অন্তিম অংশের প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। তিনি আবার বললেন, 'হ্যাঁ, যান না

দরওয়াজার বাইরে থেকে দু'পয়সার পকৌড়ী নিয়ে আসুন, বতাউকী—।"

পাছে বেকুব না মনে করে তাই আমি আর অপেক্ষা করা পছন্দ করিনি এবং "আচ্ছা" বলে আমি সেখান থেকে চলে গেলাম। ভাবলাম, শ্রীমতীর ফরমায়েশ ছিল পকৌড়ীর, 'বতাউকী' এমনি দু'বার মুখ ফসকে বেরিয়ে এসেছে। বাক্য তো ওখানেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমি পেঁয়াজের পকৌড়ী কিনে এনে তাঁর সামনে রাখলাম। সে আশ্চর্য হয়ে বলল—"এটা কি? আমি তো বতাউকী পকৌড়ী আনতে বলেছিলাম।"

"বতাউকী—"আবার কোন্ আপদ?"

"আরে বেগুন, বেগুন।"

মনে মনে বললাম একেই বলে, 'দেশী বুড়িয়া মরাঠী বোল।' কিন্তু তাঁর চেয়েও আমার নিজের ওপর বেশী রাগ হয়েছিল। সন্দেহ্ থাকলে সঙ্কোচ ছেড়ে জিগ্যেস করে নাওনি কেন। আমি আপসোস করে বললাম—

"মাপ করুন, বতাউ-এর অর্থ বুঝতে পারিনি।"

"না, তাতে কি, আমারই ভুল হয়েছে।"

৪

আর্যসমাজের গড়ে লাহোরে (১৯১৬)

মহাশয় খুশহালচাঁদ 'খুর্সন্দ'-এর সেই সময়ের নবীন চেহারা আমার মনে আছে। তিনি সত্যিই 'খুর্সন্দ' (প্রসন্ন) ছিলেন। কখনো আমি তাঁর বিষণ্ণ মুখ দেখিনি। হাসির মৃদু রেখা চব্বিশ ঘণ্টাই যেন তার ঠোঁটে লেগে থাকত। তাঁর 'নমস্তে জী মহারাজ' বলার ধরন এবং "খুর্সন্দ তো হ্যায়?" বলে কুশল জিগ্যেস করা এক পুরোপুরি দিলখোলা বন্ধুর তুলনাহীনতার প্রমাণ দিত। সেই সময় 'আর্যগেজেটের' অফিস আর্য সমাজ মন্দিরের হলের বাঁদিকের কুঠরিতে ছিল। সেখানে 'খুর্সন্দ'জী থাকতেন। আমিও যতদিন বৈদিক আশ্রমে ভর্তি ছিলাম, ততদিন আর্যসমাজেরই ওপরের কোঠা ঘরে থাকতাম। 'খুর্সন্দ'জীই লাহোরে আমার প্রথম পরিচিত ব্যক্তি। আমি বন্ধুহীন ও সহায়কহীন হয়ে এই বড় শহরে এসেছিলাম। এতে সন্দেহ নেই যে এভাবে আমি কয়েক বছর ধরে ভ্রমণ করছিলাম। তাই আমার যথেষ্ট সাহস ছিল। কিন্তু 'খুর্সন্দ'জী যেভাবে প্রথম থেকেই সহায়তা করেছিলেন ও উৎসাহ দিয়েছিলেন তাতে লাহোর আর পরদেশ থাকেনি। 'পয়সা আখবার'-এর সামনের সারিতে এক ছোটমতো বৈষ্ণব-হোটেল ছিল। সেখানে তিনি খেতে যেতেন। তিনি আমাকে একটুও সংকোচের অবসর না দিয়ে আমাকে টেনে সেখানে খেতে নিয়ে গেলেন। নিজের ঘি-এর কৌটার চাবি আর একটি বানিয়ে একটি আমার হাতে দিলেন, বললেন, "আমি যদি সঙ্গে না আসতে পারি, তবে এ কৌটো রইল, ঘি বার করে খানা খেয়ে নেবেন।" মনে রাখতে হবে, সেই সময়ের 'খুর্সন্দ' আজকের 'রোজানা মিলাপের' মালিক ও সম্পাদক ছিলেন না বরং তিনি প্রাদেশিক-প্রতিনিধি-সভার 'আর্যগেজেট' থেকে শুধু জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য কিছু টাকা পেতেন।

এক সপ্তাহের মধ্যেই আমি ডি·এ·বি কলেজের সংস্কৃত বিভাগে ভর্তি হয়ে গেলাম। বিশারদ শ্রেণীতে আমার নাম লেখা হল। পণ্ডিত ভক্তরাম বেদতীর্থ, পণ্ডিত নৃসিংহদেব শাস্ত্রী আমাদের অধ্যাপক ছিলেন। আর্যসমাজ ভবনে আমি বেশী দিন থাকতে পারিনি এবং কিছুকাল পরেই ছাত্রবৃত্তিসহ কলেজের ছাত্রাবাস 'বৈদিক আশ্রমে' আমাকে ভর্তি করে নেয়। তার কাছাকাছি সময়েই আমার ডি·এ·বি· কলেজের হোস্টেলে পাচকদের পড়ানোর কাজ মিলে গেল। দুপুরে এক ঘণ্টা যেতে হত এবং দশ-বার টাকা মিলে যেত, যা খাওয়া-দাওয়ার খরচার জন্য প্রয়োজনের চেয়ে বেশী ছিল।

আগ্রা থেকে চলে আসার সময় একথা মনে ছিল না যে, বলদেও চৌবেও বৈরাগ্যের ফাঁদে ফেঁসে গিয়ে লাহোর পৌঁছে গেছে। হ্যাঁ, তবে তার বৈরাগ্য শুধু এই ব্যাপারেই ছিল যে আত্মিক উন্নতি—তত্ত্বজ্ঞান-এর জন্য সংস্কৃত পড়ার প্রয়োজন, ইংরেজী শুধু বেনেদের বিদ্যা। সে থাকত আনারকলীর বংশীধরের মন্দিরে, কোনো ছত্রে খানা খেত এবং লঘুকৌমুদী পড়ত। আমি আসতেই তার সিদ্ধান্তর ওপর আঘাত দিতে শুরু করলাম—সংস্কৃত পড়ুন, ভাল, কিন্তু ম্যাট্রিকের জন্যও নাম লেখান।" নতুন বছর থেকে সে ডি·এ·বি· হাই স্কুলের দশম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে গেল। বংশীধরের মন্দিরে বলদেওজীর সঙ্গে আর একটি যুবক মিস্টার কনকদণ্ডী বেংকট সোময়াজুলু থাকতেন। আমরা তাকে মিস্টার বলতাম। তিনিও আমার লাহোরের কনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন। এই দুই বন্ধুর জন্য আমি প্রায়ই বংশীধরের মন্দিরে যেতাম। সেই সময় মন্দিরের মালিক মন্দিরকে একেবারে ব্যবসার মাধ্যম করে তোলেননি। বংশীধর মহারাজা রণজিৎ সিংহের পুরোহিত বংশীয় ছিলেন। মন্দিরের সঙ্গেই সড়কের ওপর কিছু দোকান ছিল যা থেকে ভাল ভাড়া পাওয়া যেত। ভেতরের দু-তিনটা কামরা, কুঠরি ও বারান্দা—সংস্কৃত পাঠশালা ও ছাত্রদের জন্য ছিল। বলদেও ও সোময়াজুলু একটা বারান্দায় থাকত। দেয়ালে হয়তো মালপত্র রাখার জন্য দুটো আলমারি ছিল। গরমের দিনে পরিচ্ছন্ন মার্বেল পাথরের মেজেতে বসতে গড়াগড়ি দিতে ভাল লাগত। সেখানেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিজেদের ভবিষ্যৎ, দেশের ভবিষ্যৎ ও আর্যসমাজের কাজ সম্পর্কে আলোচনা হত। এই আলোচনায় চতুর্থ এক পাগল মহেশলালজী যোগ দিতেন। এই আলোচনা থেকেই ঠিক হয়েছিল যে বলদেওজী তার বোন মহাদেবীকে নিয়ে এসে কানপুরে কোনো শিক্ষণ-সংস্থায় ভর্তি করে দেবেন। এখানেই প্রথম পণ্ডিত সপ্তরামের সঙ্গে দেখা হয়, যা পরে চিরস্থায়ী বন্ধুত্বে পরিণত হয়। পরে ভাই মহেশপ্রসাদজী ও রামগোপালজী এসে যাওয়ায় বংশীধরের মন্দির তো আমাদের সকলের সম্মিলন মন্দির হয়ে যায়।

মুসাফির বিদ্যালয়ে প্রবেশ, ভাই মহেশপ্রসাদের সঙ্গ এবং মহাযুদ্ধ মিলে আমার সামনে এক বিশাল জগৎ মেলে ধরল। আগ্রায় থাকাকালীন কানপুর থেকে গণেশ শংকর বিদ্যার্থী 'প্রতাপ' বার করেছিলেন, অথবা, অন্তত ঐ সময় আমার তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তারপর তো প্রায়ই আমি তা পড়তাম। এখানে লাহোরে উর্দুর কয়েকটি দৈনিকপত্র 'দেশ', 'বুলেটিন', 'পৈস', 'আখবার' ইত্যাদি এবং ইংরেজী কাগজ 'ট্রিবিউন' বার হত। আমি এখন খবরের কাগজে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। ভাল করে না বুঝতে পারা সত্ত্বেও আগ্রায় আমি 'লীডারের' সঙ্গে লেগেছিলাম। তার ফল এখন পাচ্ছিলাম। এবং ইংরেজী কাগজ থেকেও আমার খবর জানার সুবিধা ছিল। ইচ্ছেমতো খবরের কাগজ পড়ার জন্য প্রায় প্রত্যহ আমি 'গুরুদত্ত ভবনে' যেতাম। হিন্দি-উর্দুর রাজনৈতিক পুস্তক সম্ভবত পড়া হয়ে গিয়েছিল। তাই এ সময়ে তা পড়তে সময় দিতে হত না। কিন্তু সেই সঙ্গে এখন ডি·এ·বি· কলেজ ও কলেজ আর্যসমাজের মনস্বী বিদ্বান পণ্ডিত ভগবদ্দত্ত ও পণ্ডিত রামগোপাল শাস্ত্রীর সংস্পর্শে আসার সুযোগ মেলে। বিশেষত

পণ্ডিত ভগববদ্দত্তের নিষ্ঠা ও অনুসন্ধিৎসা আমার মনে আর এক প্রেরণার জন্ম দেয়, যদিও অন্বেষণের পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর কাছে আমার শেখার সুযোগ মেলেনি। পণ্ডিত ঋষিরাম ও প্রফেসর রামদেব এম·এ· ঐ সময়ে বি·এ· ক্লাসের ছাত্র ছিলেন এবং বৈদিক সাহিত্য ও আর্যসমাজের কাজে তাঁদের বিশেষ আকর্ষণ ছিল।

আচারীদের অতি সংকীর্ণ ও বৈরাগীদের অপেক্ষাকৃত উদারতা সত্ত্বেও সংকীর্ণ বায়ুমণ্ডল থেকে বেরিয়ে আর্যসমাজে আসার পর আমি মানসিক চিন্তার স্বাধীনতার মূল্য বুঝতে লাগলাম। মুসাফির বিদ্যালয়ে 'কোটি বছর' ধরে চলে আসা আচার, সম্বন্ধীয় পরম্পরা সম্পর্কেও আমরা খোলাখুলি বিরূপ সমালোচনা করতে পারতাম। 'যস্ত ভবানুসন্ধতে স ধর্ম বেদ নেতরঃ' এই মহামন্ত্র শুনে আমার প্রতিটি রোম আর্যসমাজ ও স্বামী দয়ানন্দের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল। এখনো সোজা বেদ পাঠ ও তার ওপর বিচার করার সুযোগ মেলেনি। তা সত্ত্বেও যা কিছু জেনেছিলাম ও শুনেছিলাম, তাতে আমার বিশ্বাস জন্মেছিল যে, আর্যসমাজের সিদ্ধান্ত ধ্রুবসত্য। আমি নিঃসংশয়ে জানতাম যে আমাকে আমার জীবন আর্যসমাজের প্রচারে সমর্পণ করতে হবে। একদিন আমি স্বামী দয়ানন্দের প্রতি আমার হৃদয়ের উদ্গার প্রকাশ করে বললাম, 'আমি স্বামী দয়ানন্দের প্রত্যেক বাক্যকে বেদবাক্য বলে মানি।" পণ্ডিত ভগবদ্দত্ত সহমত হওয়া সত্ত্বেও বললেন, 'এতটা তাড়াহুড়া করবেন না। প্রথমে পড়ে তো দেখুন।"

আমাদের সংস্কৃত বিভাগের ছাত্রদের মধ্যে পণ্ডিত ঈশানন্দ ও পণ্ডিত তুলসীরামও ছিলেন। তুলসীরামের অধ্যবসায়কে আমি খুব প্রশংসনীয় বলে মনে করতাম। কোনো সময়ে মজদুরী করতে সে পাঞ্জাব থেকে পূর্ব আফ্রিকার কেনিয়া প্রদেশে চলে গিয়েছিল। সম্ভবত মিস্ত্রীর কাজ করত। সেখানেই আর্যসমাজের সংস্পর্শে আসে। লেখাপড়ার ইচ্ছা বলবতী হয়। কাজ ছেড়ে লাহোরে চলে আসে এবং নিচের শ্রেণী থেকে শুরু করে আজ শাস্ত্রী শ্রেণীর ভাল ছাত্রদের একজন। ঈশানন্দের বা বিরালসীর গুরুকুলের প্রধান স্তম্ভ ছিলেন। ঈশানন্দজী প্রথমে সেখানেই পড়াশোনা করেন। কাশীর ব্যাকরণাচার্যের এক খণ্ডও তিনি পাস করেন এবং এখন তিনি শাস্ত্রী পরীক্ষার্থী। আমার বিশারদ শ্রেণীতে ছিল রামপ্রতাপ, দেবদত্ত-দ্বয়, যশপাল ও পণ্ডিত ভক্তরামের ছোট ছেলে। রামপ্রতাপ পড়াশোনাতেও ভাল ছিল ও সেই ধরনের পরিহাস প্রিয় ছাত্র ছিল যে নিজের ঠোঁট সেলাই করে লুকিয়ে রাখতে পারতো। তার ঠাট্টার নিশানা অব্যর্থ ছিল কিন্তু তা পুরোপুরি আঘাত দিত না। পণ্ডিত ভক্ত রামজী বুড়োমানুষ ছিলেন। চোখে খুব কম দেখতেন আর পড়ার জন্য বইকে একেবারে চোখের কাছে নিয়ে যেতে হতো। সংস্কৃতের পণ্ডিত, তার ওপর বুড়ো, কথার চাতুরীতে এমনিতেই তাড়াতাড়ি জড়িয়ে পড়ার মতো। কিন্তু যেদিন আমাদের পড়ায় মন লাগত না রামপ্রতাপ কোনো কথা শুরু করে দিত। পণ্ডিতজী ভুলে গিয়ে অন্য কোনো কথায় চলে যেতেন। আমাদের ঘণ্টা শেষ হয়ে যেত। কখনো কখনো পণ্ডিতজী আমাদের চালাকী ধরে ফেলতেন। কিন্তু তাঁর টিপ্পনী শব্দে নয়, বরং তাঁর পাতলা করে ছাঁটা গোঁফের ওপরে টান-পড়া এবং তার চেয়েও বেশী তাঁর গালে উপচে-পড়া হাসির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হত। যশপাল এমন ছাত্র ছিল যে ভুল করে বিদ্যার কুঞ্জে এসে পড়েছে। তার ভেতরে প্রতিভার অভাব ছিল না কিন্তু পড়াশোনায় তার একেবারেই মন লাগত না। সে এমন এক রঙ্গীলা মেজাজের যুবক ছিল যে তার ধারণা হয়েছিল যে জীবনকে হেসে খেলে কাটিয়ে দেওয়া উচিত। এই ধরনের মানুষের নিজের এক তরফা ধারণার ওপর প্রচণ্ড ধাক্কা লাগার ভয় থাকে যে সে নিজের নৌকার ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে না। যশপালের একবার এমন একটা ধাক্কা লেগেছিল যে সে আফিং খেয়ে নিয়েছিল। যা হোক, প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল। কোনো অনিষ্ট হলে আমাদের সাধারণ আঘাত লাগত না। সহপাঠীদের মধ্যে প্রাণ-মাতানো অদ্ভুত যুবক

ছিল যশপাল। সে আমাদের মজলিসের প্রাণ ছিল। তার ভাই শ্রীরামদাসজী হোসিয়ারপুর ডি·এ·বি· হাইস্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন। তার বড় ইচ্ছা ছিল যে যশপাল ভালভাবে সংস্কৃত পড়ে। গোটা মাসের জন্য যশপাল যে খরচা পেত, তা দিয়ে এক সপ্তাহের বেশী চালানো সে পাপ বলে মনে করত।

দেবদত্ত দু'জন ছিল—ফর্সা, ছোট। ফর্সা দেবদত্ত গৌরবর্ণ ছিপছিপে শরীরের, তার রঙ পশ্চিম য়োরোপীয়দের মতো না হলেও পূর্ব য়োরোপীয়দের মতো তো ছিলই। সে মহাত্মা হংসরাজের জন্মস্থান (বেজওয়াড়া)-এর নিবাসী ছিল। পুরনো স্মৃতির দোষ হল এই যে প্রথম মোহরের ওপর নতুন মোহর পড়ে যায় অথবা ফিল্মের ফটোর দ্বিতীয় এক্‌সপোজারের মতো তার ছাপ অস্পষ্ট হয়ে যায় যখন তার ওপর কোনো নতুন ছোপ পড়ে। কয়েক বছর পরে দেবদত্তের সঙ্গে আবার দেখা হওয়ার সুযোগ হয়েছিল, যখন সে শাস্ত্রী শেষ করে বি·এ· পড়ছিল। তাই সেই প্রারম্ভিক দিনের স্মৃতি ম্লান হয়ে গিয়েছিল। সে এমন যুবকদের একজন ছিল যে কোনো মজলিসে নায়কের ভূমিকা নিত না কিন্তু তাকে ছাড়া মজলিস সফল হতে পারত না। ছোট দেবদত্তের কানে সোনার কুণ্ডল ছিল। আমাদের শ্রেণীতে সে আর রামপ্রতাপ ছিল কুণ্ডলধারী। তার "না উধোর কাছ থেকে নেবও না, মাধোকেও দেব না" মনোবৃত্তি সত্ত্বেও সহপাঠীদের মজলিসে থাকার অনুপযুক্ত সে ছিল না। শিবলালজীও আমার এক সহপাঠী এবং গুরগাঁওয়া (হরিয়ানা) জেলা নিবাসী। এভাবে আমার সহপাঠীদের মধ্যে আমি ছাড়া আরো অনেক ছাত্র ছিল যাদের অজ গ্রামেই জন্ম হয়েছিল কিন্তু আমরা সবাই শহুরে হয়ে গিয়েছিলাম। শিবলালই এমন একটি ছেলে ছিল যার ভেতর থেকে কাঁচা নতুন চাষ করা ক্ষেতের গন্ধ আসত। সে ডালকে ডাল্লা, কালোকে কাল্লা বলত।

এখন সংস্কৃত বিভাগের ক্লাস হত ডি·এ·বি· কলেজ হলের ওপরের ঘরে। আমরা বৈদিক আশ্রমে যাওয়ার সময় হয় দেবসমাজের দিক থেকে যেতাম অথবা সেক্রেটারিয়েটের ভেতর থেকে। বৈদিক আশ্রমের ফটক থেকে কয়েক পা হেঁটেই আনারকলীর কবর। তার সরু ইট, চুনের গম্বুজ আমরা রোজ দেখতাম। আমরা শুনেছিলাম যে এখানে সেই সময়ের অদ্বিতীয়া সুন্দরীর বলপূর্বক জীবন থেকে বঞ্চিত শরীর শুয়ে আছে। তাঁর অপরাধ ছিল এই যে, আকবরের যুবরাজ সেলিম তাকে চোখের আড়াল করতে পারত না। তা সত্ত্বেও আনারকলীর সমাধি আমাদের তরুণ হৃদয়ে কোনো আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারেনি। কারণ শুধু রসের অনভিজ্ঞতাই তার কারণ হতে পারে না, বরং এই সমাধি সরকারী দপ্তরের একটা অংশ হয়ে গেছে বলেও হতে পারে। এই সমাধির পিছনে সেক্রেটারিয়েটের অনেক ছোট ছোট কর্মচারী দুপুরে নমাজ পড়তে আসত।

শর্টকাট করলে আমরা দেবসমাজের দূর পর্যন্ত ছড়ানো বাড়িঘর হয়ে আসতাম। বিকেলে এ দিক হয়ে গেলে অনেকবার দেবগুরু ভগবানকে (শ্রী সত্যানন্দ অগ্নিহোত্রী) আমরা টাঙ্গায় বেড়াতে যেতে দেখতাম। কখনো কখনো তাঁর সঙ্গে তাঁর স্ত্রীও থাকতেন। দু'জনের বয়েসের অনেক পার্থক্য ছিল। দেবসমাজ সম্বন্ধে দু'চারটি পুস্তকও আমি পড়েছিলাম। তাঁর সাপ্তাহিক "জীবনতৎ"ও কখনো কখনো দেখার সুযোগ হয়েছিল। কিন্তু দেবসমাজ ও দেবগুরু আমার কাছে রহস্যই থেকে গেলেন। শুনেছিলাম দেবসমাজ ঈশ্বর মানত না, ঐশ্বরিক প্রেরণা মানত না, বিজ্ঞান মানে, বিবর্তনবাদকে মানে, যোগ মানত না, ধ্যান মানত না, দেবগুরুকে বিকাশের সর্বোচ্চ বিভূতি বলে মানে। আচার সম্পর্কিত ভুলের জন্য অপরাধ স্বীকার করার ওপর জোর দিত ইত্যাদি। এই সব মতবাদ আমার কাছে শুধু পরস্পর বিরোধী বলেই মনে হত তাই নয়, বরং

কখনো কখনো আমার মানুষের বুদ্ধি সম্পর্কেও করুণা হত। আমার কাছে তা কিছু লোকের আরামে জীবন কাটাবার জন্য খোলা দোকান বলে মনে হত।

রবিবার জলখাবারের পর আমরা আনারকলী সমাজে পৌছতাম এবং বিশেষভাবে হোমে হাত লাগাতাম। প্রত্যেক সপ্তাহে কোনো না কোনো প্রোফেসর, পণ্ডিত অথবা প্রভাবশালী বক্তার ব্যাখ্যান হত। মহাত্মা হংসরাজের উপদেশ উদ্দীপক হত না কিন্তু তাঁর সাদাসিধা শব্দের পেছনে ছিল পঁচিশ বছরের অদ্ভুত ত্যাগ ও তপস্যার জীবন। যার জন্য তিনি সোজা আমাদের অন্তঃস্থলে পৌছে যেতেন। প্রোফেসর দীওয়ানচন্দ কখনো কখনো প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের তুলনা করতেন যাতে আমাদের জ্ঞান বাড়ত। পণ্ডিত রাজারাম শাস্ত্রীর ব্যাখ্যানে বেদ ও উপনিষদের বাক্য অনেক থাকত। কিন্তু আমাদের মতো ছাত্রদের ওপর তাঁর প্রভাব বিশেষ পড়ত না, যারা জানত যে, তিনি বৃদ্ধ অবস্থায় অল্পবয়স্ক কুমারী বালিকাকে বিয়ে করেছিলেন। জাতপাতের বিরুদ্ধে যে মনোভাব মুসাফির বিদ্যালয়ে আমার ভেতরে জন্ম নিয়েছিল, তা স্থায়ী হয়েছিল। পণ্ডিত রাজারামের মত এ বিষয়ে অনেক পেছনে ছিল, তা আমি জানতাম। পণ্ডিত ভক্তরামজীতো কখনো কখনো বিরক্ত হতেন, যখন আমি জাতপাতকে বিশ্রীভাবে খণ্ডন করতাম। তিনি বলে উঠতেন, "কুল-কলঙ্ক", —তিনি জানতেন যে আমি ব্রাহ্মণ বংশের ছেলে।

প্রথম দিকের দিনগুলিতে যাঁদের উপদেশ আমি খুব প্রশংসা করতাম, তাঁদের মধ্যে স্বামী সত্যানন্দজীও ছিলেন। আগ্রায় তিনি একবার মুসাফির বিদ্যালয়েও এসেছিলেন। লাহোর গিয়ে আমি একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে 'অমৃতধারায়' গিয়েছিলাম। রায় ঠাকুরদত্ত ধওয়ান তাঁর পাশে বসেছিলেন। গুরুকুল-পার্টি আর্যসমাজের দুই পক্ষের মধ্যে ঐ সময় জোরদার মতবিরোধ চলছিল, যাতে সংখ্যালঘু পক্ষের নেতা রায় ঠাকুরদত্ত ছিলেন। আমার মনে আছে, কোনো প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন—

"বদনাম যদি হয় তাহলে কি নাম হবে না।"

স্বামীজী লেখাপড়া বিষয়ে জিগ্যেস করেছিলেন। চলে আসার সময় আমি 'না' করা সত্ত্বেও তিনি কিছু টাকা দিয়ে বলেছিলেন—"ছাত্রদের প্রয়োজন হয়।"

লাহোরের গরম আগ্রার থেকে বেশী ছিল। কিন্তু এখনো গ্রীষ্মকালেও ঠাণ্ডা থাকা দেশের হাওয়া আমার গায়ে লাগেনি। তাই গরম ততটা অসহ্য মনে হত না। পিপাসা পেত। কিন্তু বরফ-বাতাসা দিয়ে তৈরী দুনিয়ার সেরা পানীয় দই-এর লস্যি এখানে পাওয়া যেত। আর তা কেনার পয়সাও ছিল আমার কছে। আখ, নুনমাখা খোসা ছাড়ানো শশা, ফলসা ও জাম গরমের তাপকে অনেক নরম করে দিত। কতবার আমরা বইপত্র নিয়ে খালের জল দিয়ে সেচ করা সবুজ বাগানে চলে যেতাম। সকালে কতবার বট গাছতলায় তাঁর আখড়ায় গামাকে লড়তে দেখতাম।

পাঞ্জাবের অধিকাংশ নরনারীর লম্বা-চওড়া শরীর দেখে আমার খুব ভাল লেগেছিল। আমার বাবা ও দাদুর ঘরে বেঁটে মানুষের অস্তিত্ব ছিল না। হয়তো সেই জন্যই এই পক্ষপাতিত্ব আমার মনে এসেছিল। পুরুষের মাথায় টেরি-কাটা চুল, উপরন্তু কাটা-ছাঁটা মেহেদি রঙের দাড়ি নতুন জিনিষ হলেও তা দৃষ্টিকটু লাগত না। কিন্তু যুবতী স্ত্রীলোকের বিরাট ঘের-অলা চোখ-ধাধানো সালোয়ার, ওড়না এবং মাথার পেছনে ছুঁচলো খোপাকে যুক্তপ্রদেশের বিশ্রী ওড়না-ঘাঘরার সম্প্রসারণ বলে আমার মনে হত। বিশেষ করে চুলকে দড়ির মতো পাকিয়ে পাকিয়ে বেণী বাঁধা তো আমি বালিকাদের শাস্তি বলে মনে করতাম। লম্বা লুংগী-পরা, বড় পাগড়ী বাঁধা প্রশস্ত ছাতিওলা যে গুজররা দুধ নিয়ে আসত, তার চেয়ে পুরুষেরই মতো চওড়া হাতাযুক্ত কুর্তা-লুংগী

পরা হৃষ্টপুষ্ট গুজরণীদেরকে দেখে মনে আনন্দ হত। আমি বলতাম—হিন্দুস্থানে এই রকম স্ত্রীপুরুষেরই সন্তান জন্ম দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত।

মে মাস ছিল, অভিলাষ লাহোর এল। মুসাফির পরিবারের ভাইদের একের সঙ্গে অন্যের দেখা হলে অত্যন্ত উল্লসিত হওয়ার অনেক কারণ ছিল। তাছাড়া অভিলাষের উড়ানের ডানা আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। আমি চাচ্ছিলাম সে খুব উড়ুক। তার নিজস্ব দিশায় উড়ুক। আমার উড়ানের একটা বিশেষ লক্ষ্য ছিল। আমি চাইনি যে সবাই এই লক্ষ্যের দিকে উড়ুক। সাহসকে আমি জীবনের সারমর্ম মনে করতাম। অভিলাষের যন্ত্রপাতির দিকে বিশেষ মন ছিল। আমি খুব খুশী হলাম যখন সে বলল আমি লাহোরে মোটর ড্রাইভারী শিখতে এসেছি। মোটর ড্রাইভারী খুব বড় বিদ্যা নয়। কিন্তু আমি তাকে এগিয়ে যাওয়ার সিঁড়ি বলে মনে করতাম। ঐ সময়ে মোটর ও মোটর ড্রাইভার এমনিতেই কম ছিল।

মনে হয়, জুন মাস শেষ হয়ে আসছিল, যখন কলেজ গরমের লম্বা ছুটির জন্য বন্ধ হয়ে গেল তখন ছুটিতে লাহোরের গরমে সতী হওয়াটা ভাল মনে করিনি। কোনো বন্ধু সঙ্গে কাংড়া যেতে বলল, কেউ বলল পাঞ্জাবের গ্রামে। ঈশানন্দজীর প্রস্তাব হল, বিরালসী যাওয়ার। তার প্রস্তাবই আমার সবচেয়ে ভাল লাগল। সেখানে আম খাওয়ার মজা হবে এবং পড়াশোনাও করা যাবে।

(৫)

রাস্তার ভুলভুলাইয়া

ঈশানন্দ ও আমি যখন সাহারানপুরে নামলাম তখন সেখানে দুয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়েছিল। আর সাহারানপুরে পাকা আম এসে গিয়েছিল। সাহরানপুরে দুয়েকদিন থেকেছিলাম কিনা, মনে নেই। এও মনে নেই কোন স্টেশনে নেমে আমরা বিরালসী গিয়েছিলাম। হয়তো থানা ভবন মফঃস্বল শহর আমাদের রাস্তায় পড়েছিল। পণ্ডিত ভোজদত্তের এখানেই জন্ম হয়েছিল। ঈশানন্দজীর বাবার নাম মনে নেই। ঠাকুরদের থেকে তাঁর বিশেষত্ব এই ছিল যে তাঁর চোখ একেবারে মোঙ্গলদের মতো, যেমন ঈশানন্দের ছিল। সে লম্বা-চওড়া হৃষ্টপুষ্ট জোয়ান। সে উচ্চস্তরের চাষী জমিদার ছিল। অনেক চাষবাস হত, গরু-মোষের দুধের প্রাচুর্য ছিল, ভাল জাতের ঘোড়া পোষা হত, তাদের ওপর রেজিমেন্টের নম্বর লাগানো থাকত এবং তারা অনেক বড়সড় বাচ্চার জন্ম দিত। কাছাকাছি একটা ভাল আমবাগান ছিল—হয়তো ডালিম—ন্যাসপাতির বাগানও ছিল। কিন্তু ঐ সময় আমার সম্পর্ক ছিল আমের সঙ্গে। আমের ফসল পর্যন্ত আমার লেখাপড়া তাকেই তোলা থাকল। বাগানে চলে যেতাম। গাছপাকা ফলের স্তূপ থেকে বেছে কয়েক ডজন আম জলভরা বালতিতে ফেলা হত, আর আমি, ঈশানন্দ তথা দুয়েকজন নতুন তরুণ বন্ধুও চারদিকে ঘিরে বসে যেতাম।

কারুরই এতে পরোয়া ছিল না যে ঘরে হাত পুড়িয়ে রুটিও তৈরী হচ্ছে। ঠাকুর সাহেব জোর দিয়ে বলতেন—আম খেয়ে দুধ অবশ্যই খেতে হয়। তাই এক গ্লাস দুধ কোনোরকমে খেয়ে

নিতাম। রুটি তো খেতাম শুধু লোক দেখানোর জন্য। ঈশানন্দের বাড়িতে আমি তার পরিবারেরই একজনের মতো ছিলাম। তার সঙ্গে রান্নাঘরে খানা খেতাম। মেয়েদের পায়জামা পরতে দেখে আমি বুঝতে পারলাম যে এই প্রথা শুধু মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ঈশানন্দের আত্মীয়রা কিছুটা শিক্ষাও পেয়েছিল। ঠাকুর রঘুবীর সিংহ (?) গ্র্যাজুয়েট ছিলেন এবং তিনি সরকারী চাকরির খোঁজ করছিলেন। তাঁর ছোট ভাই এফ·এস·সি· করে লখনৌ-এ ডাক্তারি পড়ছিল। এইভাবে, গ্রামে থেকেও শিক্ষিতদের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না।

বিরালসী গ্রাম থেকে কিছুটা হেঁটে গেলে বিরালসী গুরুকুল। স্বামী দর্শনানন্দের ভিত্তিহীন সংস্থা খোলার রোগ ছিল। বিরালসী, সিকন্দারবাদ, জ্বালাপুর, চোয়াভক্তা (রাওয়ালপিণ্ডী)-র গুরুকুলগুলি তিনি খুলেছিলেন এই সূত্রানুসারে—'মাথা মুড়িয়ে দিয়েছি। ভিক্ষে করে খাও।' একবার সংস্থা খুলে ফেলার পর আশেপাশের লোকের লজ্জা-সরম হয় এই তত্ত্ব তিনি জানতেন। এই তত্ত্বানুসারেই বিরালসীর গুরু-কুলও কোনো রকমে চলছিল। ছাত্রদের সংখ্যা ছিল চোদ্দ-পনের। অধ্যাপক ছিলেন একজন। তিনি হিন্দি টীকার সাহায্যে অষ্টাধ্যায়ী পড়িয়ে দিতেন। একটি রান্না করার লোক ছিল যার প্রতিদিন সন্ধ্যায় দুশ্চিন্তা হত যে আজ তো কোনোরকমে একটা সন্ধ্যা শুকনো রুটি মিলে গেছে। কিন্তু কাল কী হবে। আমের ফসল শেষ হওয়ার পর অথবা তার আকর্ষণ কমে যাওয়ার পর এবং পড়াশোনা করার দিকে মন যাওয়ায় আমি গুরুকুলে গেলাম। গুরুকুলের খুবই সাধারণ বাড়িতে যে ক'জন লোক ছিল, তা তাদের থাকার জন্য যথেষ্টই ছিল। তার পাশে এত খেত ছিল যে কুয়ার ব্যবস্থা করে যদি ঠিকমতো চাষ করা হত তাহলে খাদ্যশস্যের জন্য কারো কাছে হাত পাততে হত না। পাশে অনেক জঙ্গল ছিল যার আবাদ হত না। সেখান থেকেও গুরুকুলের জন্য কিছু পাওয়া সম্ভব ছিল। পাশে দু'চারটা গাই ছিল, সম্ভবত সেগুলি দুধ দিত না। আমি একদিন গরু-বলদের একটা বড় দলকে জঙ্গলে দৌড়তে দেখেছিলাম। একবার এই দল গুরুকুলের পাশেও এসেছিল। 'জংলী গাই' শুনে আমার জিজ্ঞাসা আরো বেড়ে গেল। এ বিষয়ে বলা হল—দুয়েকটা গরু জঙ্গলে হারিয়ে গিয়েছিল। তাদেরই সন্তানের সংখ্যা বেড়ে এত হয়েছে। এরা স্বাস্থ্যবতী। পরিচ্ছন্ন ও দর্শনীয় ছিল।

ধর্মীয় বিষয়ে 'চিন্তার স্বাধীনতা'-র অহংকারের সঙ্গে আর্যসমাজী সংকীর্ণতা থাকা সত্ত্বেও সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রে আমার চিন্তা সংস্কারের সীমার বাইরে চলে যাচ্ছিল। আমার চিন্তা আমি অত্যন্ত নির্ভীকভাবে প্রকাশ করতাম। ধীরে ধীরে আমার চিন্তার প্রভাব অধ্যাপক ও করণিক যে রান্নাও করতো—তার ওপরেও পড়তে লাগল। তারাও স্বাধীনভাবে প্রশ্নোত্তর করতে শুরু করেছিল। আমি তা পছন্দ করতাম, কেননা মাইনের তো কোনো প্রশ্নই ছিল না। কিন্তু পেটে কিছু না পড়লেও ওরা গুরুকুলে ডাঁটের সঙ্গে ছিল। তারাও আমার কথায় কিছু বিশেষত্ব নিশ্চয় পেয়েছিল, তবেই না এত প্রভাবিত হয়েছিল। কথা বলার সময় আমি একথা অবশ্যই মনে রাখতাম যে তা যেন অন্যকে বিদ্রূপ করা ও ছোট করার জন্য না হয়। বিচার পরিবর্তনের জন্য যে রোজ রোজ বৈঠক হত, একদিন তার পরিসমাপ্তি ঘটল অন্তঃস্থলের গিঁট খুলে দেওয়ায়।

● পণ্ডিতজী বললেন—কি করব, সমাজ অনেক গুরুতর অপরাধ ও মহাপাপের কারণ। একটা মানুষ তার সীমাহীন শক্তির মোকাবিলা কীভাবে করবে? আমার তরুণী বিধবা মেয়ে আছে। আমি নিজের থেকে জানি যে, এই অবস্থায় সে ব্রহ্মচর্য পালন করবে এমন আস্থা রাখা ভয়ানক আত্ম-প্রবঞ্চনা। কিন্তু কিছু আর্যসমাজী মতবাদ মেনে নিলেও নিজের জাতের নিয়ম ভাঙার হিম্মত নেই আমার, আর বিধবা-বিবাহ দিতে পারি না। পরিণাম? —কিছু জিগ্যেস করবেন না।

বিগত চার-পাঁচ বছরে তিন-চার বার গর্ভপাত করা হয়েছে। আমার মেয়ে সে, কাম-বাসনা স্বাভাবিক জিনিষ, পিতা হয়ে এবং হৃদয় আছে বলে তাকে প্রাণদণ্ড দেওয়ার হিম্মত নেই আমার। ভাবছি, সর্বশক্তিমান সমাজ যখন আমাকে এই কাজ করতে বাধ্য করছে তখন ন্যায়পরায়ণ ভগবান এই পাপকেও সমাজের খাতায় লিখবে।

পাচক-করণিক ব্রাহ্মণ নিজের কথা বলতে লাগল—আমরা তিন ভাই। আমরা জোয়ান ছিলাম, যখন বৃদ্ধ পিতা এক অল্পবয়সী কন্যাকে বিয়ে করার সংকল্প করলেন। তখন লোকজন নিষেধ করেছিল, আমরাও বারণ করেছিলাম। কিন্তু বাবা আমাদের ইচ্ছার একেবারে উল্টো অর্থ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি কারো কথা না শুনে সেই অবোধ বালিকাকেই বিয়ে করেই ফেললেন। এই বালিকা ভাল করে যৌবনে পা দেওয়ার আগেই বাবা মারা গেলেন। আমার সৎমার যৌবনের কথা না ধরলেও তিনি সুন্দরী। কয়েক বছর পরে জানা গেল, প্রতিবেশী একটি লোকের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, ভয় হতে লাগল, কারো সঙ্গে সে পালিয়ে না যায়। বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলে সমাজ একথা বলবে না, "পচা অঙ্গকে কেটে ফেলে দেওয়া ভালই হয়েছে", বরং সমাজ আমার পরিবারকে চিরকাল লাঞ্ছনা দিয়ে বলবে—"এই ঘরের মেয়ে বেরিয়ে গেছে।" আপনার কাছে গোপন করব কেন? শেষ পর্যন্ত আমি ভাবলাম—এর একটাই ওষুধ আছে, যার জন্য সৎমাকে কুলে কলঙ্ক লাগিয়ে পালাতে হবে, সেই কামনা আমিই পূর্ণ করি না কেন। দু'বার গর্ভপাত করানো হয়েছে। বলুন, আমি কি করব?

পণ্ডিতজীকে তো আমি পরামর্শ দিয়েছিলাম, নিজের জেলায় সাহস না হলে দূরের কোনো জেলায় মেয়েকে বিয়ে দিয়ে আসুন। অন্য সজ্জনের সমস্যার কী সমাধান করেছিলাম, তা আমার মনে নেই।

গুরুকুলের পাশে জঙ্গল। সত্য মিথ্যা জানি না লোকে বলত কখনো কখনো বাঘ আসত। মুজফ্‌ফরনগরের এক স্থানে নেকড়ে বাঘের প্রকোপে গ্রাম শূন্য হওয়ার কথাও বলছিল। বলছিল, সন্ধ্যা হতেই নেকড়ের দল গ্রামে চলে আসে। ঘরবন্দী হয়ে গেলে দরজার চৌখাট খুঁড়েও ঢুকে যেত।

বর্ষার মাস দিনে দিনে শেষ হয়ে আসছিল। এবার আমাদের পড়াশোনার কথা মনে এল। ঈশানন্দজীর সঙ্গে কথাবার্তা হল। আমরা মুজফ্‌ফরনগর চলে যাব এবং সেখানেই পণ্ডিত পরমানন্দের কাছে পড়ব।

মুজফ্‌ফরনগরে আমরা আর্যসমাজের মন্দিরে ছিলাম। মন্দির ছিল শহরের বাইরে বাগানের মতো একটা জায়গায়। সন্ধ্যায় পণ্ডিতজীর কাছে আমরা পড়তে যেতাম। 'আর্যসমাজের মন্দিরে আর একটি প্রজ্ঞাচক্ষু যুবক থাকতেন। আগে তিনি খ্রীষ্টান ছিলেন, হালে শুদ্ধ করে আর্য বানানো হয়েছিল। আজমীর ও আরো কোন্ কোন্ জায়গায় তিনি থেকে এসেছেন। অন্ধের জন্য লিখিত বই পড়তেন তিনি।

মজফফরনগরে থাকার সময়ে কোনো বিশেষ ঘটনা ঘটেনি। গড্ডী (গাড়ি), রোট্টী (রোটী), সাগ্গী (জায়েগী)-র সঙ্গে আমরা বিরালসীতে যথেষ্ট পরিচিত হয়ে গিয়েছিলাম। এখানকার শিক্ষিত লোক এই ধরনের উচ্চারণ করত না। তথাপি আমার এখানকার দেহাতের এই হিন্দি বেশি সজীব মনে হত।

মুজফ্‌ফর নগরে আমরা লাহোরে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবছিলাম। পড়াশোনা কিভাবে হবে, বন্ধুদের সঙ্গে কেমন করে দেখা হবে. আগামী বছর বিশারদ পরীক্ষায় বসা ছাড়া কি প্রোগ্রাম

হবে। এই সময় ভাই সাহেবের চিঠি এল আগ্রা থেকে। তিনি সেখানে তাড়াতাড়ি যাওয়ার জন্য লিখেছেন।

আমি বইপত্র সামলে সোজা আগ্রার রাস্তা ধরলাম। কাজের ব্যাপারেও ভাই সাহেব হয়তো কোনো আভাষ দিয়ে থাকবেন। যদি তাই হয়ে থাকে তবে আমি ঈশানন্দজীর কাছে আমার লাহোর যাওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হয়তো প্রকাশ করে থাকব।

আমি লাহোর যাওয়ার পরে ভাই সাহেবও পৌঁছে গেলেন। তিনি গভর্ণমেণ্ট অরিয়েন্টাল কলেজের আরবীর মৌলবী-আলম শ্রেণীতে নাম লিখিয়েছিলেন। ছুটিতে তিনিও লাহোর ছেড়ে আগ্রা নামনের-এ ছিলেন। ভাই সাহেবের প্রস্তাব ছিল—এখন সময় এসে গেছে। আমাদের এখন বৈদিক মিশনরি তৈরী করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে হবে। মুসাফির বিদ্যালয়ে থেকে এই কাজ হবার নয়। কিন্তু সব কাজে টাকা দরকার হয়। তাই চাঁদা আদায়ের জন্যই নয়, চাঁদা আদায়ের কতটা সম্ভাবনা আছে দেখার জন্য তোমাকে উত্তর প্রদেশের কিছু কিছু জায়গায় ঘুরতে হবে। আমাদের এই পরিকল্পনায় মুসাফির বিদ্যালয়ের পরিচালকদের সঙ্গে কিছুটা অসহযোগের গন্ধ ছিল। বিদ্যালয় পরিচালনায়, ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও অত্যন্ত কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে তাঁরা বিদ্যালয় চালাচ্ছিলেন। টাকা ও যোগ্য ছাত্র মেলা যে কত মুশকিল, সে অভিজ্ঞতা আমাদের ছিল না। তাই আমরা তাঁদের মর্যাদা দিতে পারিনি। মাঝখানে পড়া ছেড়ে দেওয়া আমার ভাল লাগার কথা নয়, কিন্তু ভাই সাহেবের প্রস্তাবই বা কিভাবে এড়ানো যায়।

আগ্রা থেকে যশওয়ন্তনগর, ইটওয়া-এর আর্যসমাজ হয়ে আমি কানপুর পৌঁছই। সেখান থেকে আবার লখনৌ আর্যসমাজে। সব জায়গায়ই আর্যসমাজে থাকতাম। বিশেষ বিশেষ লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলতাম। কোথাও কোথাও ভাষণও দিতাম। কথবার্তার মধ্যে বৈদিক ধর্ম প্রচারের আবশ্যকতা ও তার জন্য যোগ্য মিশনরি তৈরীর সমস্যার কথাও বলতাম। লখনৌ আর্যসমাজে সে সময় আজমীরের রামসহায়জী নামে এক তরুণ যুবক উঠেছিলেন। তাঁর ফর্সা, বেঁটে, পাতলা দেহ। ভেতরের দিকে বেশী ঢুকে যাওয়া চোখ এবং সদ্য বার হওয়া বিরল গোঁফ থেকে তার যা প্রকৃত বয়স তা থেকে কম মনে হত। তাঁকে খুব উৎসাহী নবযুবক বলে মনে হল। সংস্কৃত পড়ার জন্য বেরিয়ে ছিলেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত সন্তোষজনকভাবে পড়ানোর অধ্যাপক তাঁর মেলেনি। এখানে কারো কাছে আমি শুনেছিলাম যে এখানে এক বৌদ্ধ বিহার আছে এবং একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু সেখানে থাকেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ধর্মপ্রচারের অনুরাগের কথা আমি বক্তৃতায় অনেক শুনেছি। নালন্দার মতো ধর্মপ্রচারকের জন্ম দেওয়ার কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে। এই ধারণার অংকুর আমাদের হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে বসে গিয়েছিল। তাই যখন বৌদ্ধ ভিক্ষু থাকার কথা শুনলাম, তখন একদিন সন্ধ্যায় আমি বিহারে গেলাম। অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। আলো বিশেষ ছিল না অথবা স্মৃতির বিভ্রম হতে পারে, মন্দির ও ঐ সময়ের স্বামী বোধানন্দের আকৃতি-প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু খেয়াল নেই। তাঁর সঙ্গে প্রধানত ঈশ্বর, বেদ ছাড়াও বৌদ্ধ সাহিত্য, ত্রিপিটক ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা হয়। ঈশ্বর নেই তা তিনি খোলাখুলি বলেন নি। হয়তো তিনি পুরনো চিন্তাধারার ওপর ধীরে ধীরে আঘাত করতে চেয়েছিলেন। বৌদ্ধসাহিত্য সম্পর্কে বাংলায় ছাপা বৌদ্ধ পুস্তক ও বঙ্গীয় বৌদ্ধদের মাসিক পত্রিকা 'জগজ্জ্যোতির' ঠিকানা দিলেন। পালি ত্রিপিটকের প্রাপ্তিস্থান সম্পর্কে অনাগরিক ধর্মপালের কাছে লিখতে বললেন। এই সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারের সময় একথা মনে হয়নি যে, এই সাক্ষাৎকারে যা জেনেছিলাম তা আমার জীবনে বিশেষ ভূমিকা নিতে চলেছে।

লখনৌ থেকে মলীহাবাদ, বিলগ্রাম, জায়স ও সণ্ডীলা গিয়েছিলাম। সণ্ডীলায় তহসীলী স্কুলের হেডমাষ্টারের কাছে থেকেছিলাম। সন্ধ্যায় নদীর তীরে কেল্লার উঁচু জায়গায় বসে

নানারঙের মেঘের মধ্যে ঈশ্বরের সৃষ্টির চমৎকারিত্ব দেখতে দেখতে আহ্নিক করতাম। সণ্ডীলা থেকে হরদই পৌঁছই। আর্যসমাজের পঁচিশ-ত্রিশজন লোকের কাছে ভাষণ দিলাম। থম্‌রাওয়ার রায়সাহেব কেদারনাথ মুসাফির বিদ্যালয়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে ছিলেন। তাই তাঁর ওখানে যাওয়া জরুরী ছিল। এখনো বর্ষা একেবারে শেষ হয়নি। আমি হেঁটেই থম্‌রাওয়া পৌঁছলাম। বড় লোকদের কাছে যাতায়াত করতে হলে বিশেষ সম্ভ্রান্ত বেশভূষা ও বাহনের দরকার হয়। কিন্তু এই ধারণা আমার কাছে হাস্যাস্পদ বলে মনে হয়। তাই আমি কখনো বড়লোকদের নিজের দিকে টেনে আনার চেষ্টা করিনি এবং তাতে সফলও হইনি।

থম্‌রাওয়ার রায়সাহেব বড় জমিদার ও পুরনো রইস লোক ছিলেন। গরীবদের ঝুপড়ির সঙ্গেই তাঁর পাকা মহল ছিল যাতে ডজন খানেক চাকর-বাকর ঘোরাফেরা করত। তাঁর আস্তাবলে বেশ কিছু ভাল জাতের ঘোড়া বাঁধা ছিল। হয়তো হাতি ও ঘোড়াগাড়িও ছিল।

আমি যেভাবে মালপত্র ছাড়াই চলে গিয়েছিলাম তাতে কোনো জায়গায় থাকতে দিলে আমার অভিযোগ করার অধিকার ছিল না। কিন্তু রায়সাহেবের তাঁর শ্রেণীর অন্যান্য রইস থেকে কিছু বিশেষত্ব ছিল। বিশেষত্ব না থাকলে তিনি আর্যসমাজের দিকে ঝুঁকবেনই না কেন। তিনি যখন শুনলেন যে আমি আগ্রার 'আর্য মুসাফির', তখন তিনি আমার থাকার জন্য দোতলার এক কামরা খুলে দিলেন, সেখানে কিছুকাল পণ্ডিত অখিলানন্দ শর্মা থেকে তাঁর পুত্রকে সংস্কৃত পড়াতেন। কায়স্থ রইস হয়ে সংস্কৃতের দিকে এতটা দৃষ্টি দেওয়ার মধ্যে তাঁর ধর্মীয় প্রবণতা প্রকাশ পাচ্ছিল। ছেলে ভাল পড়াশোনা করছিল কিন্তু মৃত্যু তাকে ছিনিয়ে বাপের ইচ্ছার অন্ত ঘটিয়েছিল। রায়সাহেবের চেহারায় আজও তার জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুর শোকচিহ্ন থেকে গেছে। আমি ওখানে দু'চারদিন ছিলাম এবং আমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম। সে সময়ে আমার কিছু চাওয়ার ছিল না, তাই আমি স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারতাম। চাঁদা অথবা ভিক্ষা যা-ই চাই না কেন, সেই সময়ে রহিমের এই দোহার যাথার্থ্য আমার কাছে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—'রহিমন ওয়ে নর মরি চুকে জে কহুঁ মাঁগন জাহি।' একদিন আমি ও রায়সাহেব চেয়ারে বসে ছিলাম। তাঁর ছয়-সাত বছরের ছেলে এল। এই এখন তাঁর একমাত্র ছেলে যাকে অনেক আদরযত্নে পালা হচ্ছিল। তার কালো বার্ণিশকরা জুতায় সামান্য ধূলা লেগেছিল। সেদিকে রায়সাহেবের নজরও পড়েনি। কিন্তু সেখানে উপস্থিত এক ব্রাহ্মণ পুরোহিত ঝট করে নিজের চাদরের কানা দিয়ে জুতা মুছতে শুরু করে দিল। রায়সাহেব দাঁড়িয়ে তাঁর হাত সরিয়ে দিলেন এবং তাঁর এই কাজে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। বলতে পারি না আমার উপস্থিতির জন্যই তাঁর সংকোচ হয়েছিল কিনা এবং সেই জন্য তিনি পুরোহিতের কাজে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন কিনা। অথবা তিনি হয়তো স্বভাবতই এই ব্যবহার পছন্দ করতেন না। আমার ব্যবহারে তাঁর এই কথা বুঝতে অসুবিধা বোধহয় হয়নি যে আমি খোশামুদির কলায় একেবারে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি। পুরোহিতের এই আচরণ ব্রাহ্মণধর্মকে আমার চোখে আরো নিচে নামিয়ে দিল।

থম্‌রাওয়াঁ থেকে যাওয়ার সময় রায়সাহেব বাহন দেওয়ার কথা বললেন। ঘোড়ার কথা উল্লেখ করায় আমি আনন্দিত হয়ে ঘোড়াই পছন্দ করলাম। কিন্তু বড় ঘোড়ার মধ্যে কোনটাকেই না পাওয়ায় একটি টাট্টু ঘোড়া পাওয়া গেল। শেষ পর্যন্ত গ্রাম থেকে কিছু দূর আমি তাতে চড়ে এলাম এবং তারপর ঘোড়াসহ সহিসকে ফিরিয়ে দিলাম। তাতে আমার ভাল ঘোড়ায় চড়ার স্বাভাবিক সখে ধাক্কা লাগল। কিন্তু রায়সাহেব কী করে জানবেন যে আমার ঘোড়ায় চড়ার অত সখ।

ফেরার সময় আবার লখনৌ এলাম। স্বামী বোধানন্দের সঙ্গে আবার দেখা হয়েছিল কিনা মনে নেই। লখনৌ থেকে রায়বরেলী। সেখানে আর্যসমাজের মন্ত্রী অথবা সভাপতি ছিলেন

কোনো ব্রাহ্মণ উকিল। তাঁর বাড়িতেই আমি উঠেছিলাম। ভাষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার কোনো প্রয়োজন হয়নি। কোনো দিনকে উপলক্ষ্য করে কো-অপারেটিভ ব্যাংকের দালানে হিন্দি ভাষার ওপর বক্তৃতার কথা ছিল যাতে সনাতন ধর্মের এক প্রসিদ্ধ মহোপদেশক বাণীভূষণ পণ্ডিত নন্দকিশোরজীর বলার কথা ছিল। সেখানে আমার ভাষণও রাখা হল। তৈরী করে যারা বক্তৃতা দেন তাদের কিছু সুবিধা থাকে, মুশকিলও থাকে। তৈরী করে ভাষণ দেওয়ার অভ্যাস ছিল রামগোপাল ভাইয়ের। তার কয়েকটা ভাষণ একেবারে কণ্ঠস্থ ছিল যা সে সোৎসাহে ভাষণ মঞ্চে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে ঝুলি উজাড় করে দিত। আমি ভাষণের জন্য লিখিত সাংকেতিক নোট পর্যন্ত ব্যবহার করতাম না। তাতে সুবিধা ছিল এই যে, একেবারে নতুন বিষয়ের ওপরেও আমি দশ বিশ মিনিট কিছু বলতে পারতাম। বাণীভূষণজী তাঁর তৈরী ভাষণ শোনালেন যার মধ্যে হিন্দি ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন কথাই বেশী ছিল। তিনি অনেকক্ষণ বলেও ছিলেন। আমি পনের-বিশ মিনিটের বেশী বলিনি। শুধু হিন্দি ভাষা ও সাহিত্যের ওপরই বলেছিলাম। এমন সব কথা বলেছিলাম যাতে সংস্কৃত শাস্ত্রের দোহাই কম এবং নতুন আলোর কণিকা কিছু বেশী ছিল। শিক্ষিতদের আমার ভাষণ বেশী পছন্দ হয়েছিল, এই ছিল আমার আশ্রয়দাতা উকিল সাহেবের রায়।

রায়বরেলী থেকে অমেঠী পৌঁছই। দাদুর মুখে অমেঠীর বলশালী সেপাই দবন সিংহের নাম অনেক শুনেছিলাম। কিন্তু আমি সেখানে দবন সিংহ ও তার পরিবারের খোঁজে আসিনি। মুসাফির বিদ্যালয়ের লক্ষ্যের প্রতি সহানুভূতিশীল অমেঠীর দ্বিতীয় রাজকুমার রণবীর সিংহের সঙ্গে আমার দেখা করার কথা ছিল। একজন করণিকের বাড়িতে আমি ঐ দিন থেকে গেলাম। সন্ধ্যায় তার মহলের প্রাঙ্গণে কুমার সাহেবের সঙ্গে আলোচনা হল। সম্ভবত সেই দিন পুরনো ধরনের কবিতা পাঠও হচ্ছিল। কুমার রণবীর বিদ্যা, ব্যায়াম ও উদার মত ভালবাসতেন। তাঁর শরীর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও হৃষ্টপুষ্ট ছিল। পূর্ণ যৌবন সত্ত্বেও তিনি এখনো বিয়ে করেননি। পাঁচ মিনিটে নিজের পরিচয় দেওয়ার কলা আমি জানতাম না। আর ওখানে কিছুদিন বসে থেকে মোসাহেবি করার জন্যও আমি যাইনি। আশেপাশে যে সব খোশামুদেরা তাঁকে ঘিরে থাকতো কুমার রণবীর তাদের বিদ্রূপ করতেন। কিন্তু তাদের শিকার হতেন না তা নয়। আমার বেশভূষা দেখে নয়, বরং এক প্রগতিশীল যুবক মনে করেই তিনি আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলেছিলেন। চাকরদের আমাকে কোনো অতিথিশালায় রাখার কথা বললেন। তার পাশে কুকুরের ঘর ছিল। সেখানে ভিন্ন ভিন্ন জাতের অনেক কুকুর খাটিয়ার ওপর পড়ে থাকতো। আর্যসমাজকে আমি বেশ গুরুত্ব দিয়েই গ্রহণ করেছিলাম। বৈরাগীপন্থার মতো তাকে "গ্রামং গচ্ছন্ তৃণান্ স্পৃশতি" (গ্রামে গিয়ে ঘাস ছোঁয়)-এর মতো হাল্‌কা মেজাজে গ্রহণ করিনি। তাই যথাশক্তি আর্যসমাজের মতবাদ অনুসারে চলার চেষ্টা করতাম। একজন কট্টর আর্যসমাজী হিসেবে আমি মাংস খাওয়া এবং বলিদানকে অন্যায় বলে মনে করতাম। আর যখন জানতে পারলাম যে, দেবীর কাছে বলি বন্ধ হলেও ছাগকে হত্যা করে বাঘকে খাওয়ানো হয়, তখন এই ব্যাপারে আমি কুমার সাহেবেরব কাছে অভিযোগ করেছিলাম। কিন্তু মুশকিল ছিল যে বাঘ দেবীর মতো পাথরের ছিল না। কুমারের বড় ভাই সাদাসিধে ঢিলেঢালা মানুষ। ব্রহ্মা যখন সৌভাগ্য বণ্টন করছিলেন তখন তিনি নিশ্চয় তাঁর কাছে আগে পৌঁছেছিলেন। কিন্তু বুদ্ধি ও শক্তি বিতরণের সময় নিজের তিন ভাইয়ের পেছনে গিয়েছিলেন তিনি। নিজের দুই ছোট ভাইয়ের ওপর কুমার রণবীরের বড় প্রভাব ছিল। সন্ধ্যায় তারা কুমারের সঙ্গে ঘোড়া চড়ার জন্য বেরোতেন। তাদের শরীরে মধ্যযুগীয় রাজপুতের প্রভাবের ঝলক দেখা যেত।

এরপর গন্তব্য ছিল প্রতাপগড়। সেখানে এক তরুণ ছাত্রের বাড়িতে উঠলাম। তার বাবা

কাছারিতে সাধারণ কর্মচারী ছিলেন। এখানকার আর্যসমাজেও অওয়ধের আর্যসমাজের মতো দুর্বল ছিল। কিন্তু কিছু যুবকদের মধ্যে উৎসাহ ছিল। তাঁরা সড়কের কিনারে চট বিছিয়ে দিল। সন্ধ্যায় কিছু লোক এল এবং আমি আর্যসমাজের কোনো সিদ্ধান্তের ওপর ভাষণ দিলাম। রাত্রিতে তরুণ ছাত্রটির বাড়িতে খেলাম। কায়থ-ভাই ছিল। আর্যসমাজের ফেরে পড়ে সে মাংস ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু মন থেকে তা এত তাড়াতাড়ি চলে যায় না। বেসনের কোনো তরকারী এমনভাবে রান্না করা হয়েছিল যে তাতে একেবারে মাংসের স্বাদ এসে গিয়েছিল, আমার ভারী ভ্রম হয়েছিল কিন্তু আর্যসমাজী বাড়িতে মাংস হতে পারে না। এই কথা ভেবে আমি আমার ভ্রমকে দমন করেছিলাম এবং সংকোচবশত এ বিষয়ে জিগ্যেসও করিনি।

বেনারসে রওনা হওয়ার সময় যাগেশকে একটা চিঠি দিয়েছিলাম। গরমের সময় যাগেশ পণ্ডিত ভোজদত্তের সঙ্গে মুসৌরি অথবা দেরাদুন গিয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর সে বাড়ি চলে আসে। সেই সময় স্বামী বেদানন্দ বেনারসে পড়তেন। আমার সঙ্গে দেখা হয়নি। কিন্তু আমরা পরিচিত ছিলাম। তাঁর ওখানেই উঠলাম। এক বেলার ভোজন গোপাল মন্দির থেকে আনা হত। সেখানে সস্তায় অনেক রকমের ভাল ভোজন পাওয়া যেত। হ্যাঁ, এ ব্যাপারে পরে যে সব হিন্দু ভোজনালয় ও হিন্দু হোটেল হয়েছিল গোপাল মন্দির তার পথ প্রদর্শক ছিল। শ্রদ্ধাশীল ভক্তদের কাছ থেকে এবং মন্দিরের সম্পত্তি থেকে ভোগ দেওয়ার জন্য প্রতিদিন চাল, আটা, ঘি, দুধ, মিঠাই, কেশর, চন্দন, সব জিনিষের মাত্রা সেখানে নির্দিষ্ট। প্রতিদিনের ভোগে কয়েকশ' টাকা লাগত। মন্দিরের প্রত্যেক কর্মচারীর বেতনের একটা অংশ দিয়ে এক অথবা একাধিক পাতার থালায় খাবার পাওয়া যেত। অনেকেই তা ছোঁয়াছুঁয়ির ভয়ে অথবা পয়সার জন্য বেচে দিত। কনৈলার রামাধীন পাণ্ডে (সম্পর্কে আমার দাদা)—গোপাল মন্দিরে অধিকারী ছিলেন। বেনারসে পড়াশোনা করার সময় আমি মাঝে মাঝে তাঁর ওখানে যেতাম। রামাধীনজী ছোঁয়াছুঁয়ির ভয়ে নিজের পাতার খাবার খেতেন না, এইটুকু আমি জানতাম। কিন্তু সে সময় আমি জানতাম না যে, এই পাতার খাবারগুলি নিয়মিত বিক্রি হয়।

অনেক ব্যাপারে স্বামী বেদানন্দ তীর্থ আমার সমধর্মী ছিলেন। তাঁরও আমার মতো তীব্র জ্ঞানতৃষ্ণা ছিল। তিনিও বেদের উচ্চ তত্ত্বজ্ঞানে বিশ্বাসী। সেই জ্ঞান লাভের জন্য তিনি যত্নশীল ছিলেন এবং সারা সময় তিনি সংস্কৃত অধ্যয়নে লাগাচ্ছিলেন। আমার মতো তিনিও উচ্চ যোগ্যতা অর্জন করেন এবং যথেষ্ট প্রস্তুতির সঙ্গে দেশান্তরে বৈদিক ধর্ম প্রচারের পক্ষপাতী ছিলেন। 'খুব নিবহেগী জো মিল বৈঠেংগে দিওয়ানে দো'—এর মতো ব্যাপার ছিল, তাই আমাদের মধ্যে চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব না হওয়ার কোনো কারণ ছিল না।

বেনারস আর্যসমাজে আমি একটি ভাষণও দিয়েছিলাম। আমি এখনো সেখানেই ছিলাম। হঠাৎ যাগেশ শ্যামলালকে (আমার ছোট ভাই) নিয়ে এসে হাজির হল। শ্যামলালকে দেখে আমি যাগেশের ওপর কিছুটা বিরক্ত হলাম। কিন্তু সে কোনো একটা ছুতো দেখিয়ে দিল। দুজনেই ধরে বসল, কয়েকদিনের জন্য কনৈলা অবশ্য যেতে হবে। আমাকে রাজী হতে হল। কনৈলা পৌঁছনোর পর কয়েকবার চেষ্টা করে অসফল হয়েও বাবা আবার নজরবন্দীর অস্ত্র ব্যবহার করলেন। ক্ষণিক বৈরাগ্য এখন স্থায়ী আদর্শবাদের রূপ ধারণ করছিল। তাতে তিনি বেশী শংকিত হয়েছিলেন। মুখের ওপর 'আমি থাকব না' এই সাফ জবাব দেওয়ার সাহস ছিল না আমার। কেননা তাতে সারা গ্রামের বুড়োরা জড়ো হয়ে যেত এবং আমার বোকামি নিয়ে মজা করত এবং বারবার আজ্ঞা মেনে চলা ইত্যাদি উপদেশ ঝাড়তে থাকত। আমি কিছুদিনের জন্য আমার পালানোর ইচ্ছা লুকিয়ে রাখলাম। কিন্তু ঠিক করলাম যে যদি একবার মুক্তি পাওয়া যায় তবে আজমগড় জেলায় আসার আর নাম নেব না। জিগড়সণ্ডীতে শ্রী মর্যাদ দুবের নামে যে

জমিদারি কেনা হয়েছিল, তার উসুল—তহসিলের জন্য আমিও হাত লাগাতে শুরু করলাম। এক সপ্তাহ কাটতে কাটতেই একদিন একা জিগড়সণ্ডী যাওয়ার সুযোগ পেলাম। এখন আর ফিরে কনৈলা যাবে কে। সোজা জখনিয়া অথবা সাদাত স্টেশনে যেতে এখনও আমি ভয় পেতাম। তাই আমি সেখান থেকে বীরপুরে পণ্ডিত মুখরাম পাণ্ডের ওখানে চলে গেলাম। তিনি ব্যাকরণতীর্থ ও কাব্যতীর্থ হয়ে এখন বাড়িতেই থাকছিলেন। বড় হল বাজারে বলে কয়ে একটা সংস্কৃত পাঠশালা খোলাবার ব্যবস্থা করছিলেন। আজ পাঠশালা আরম্ভের মুহূর্ত। পাঠশালা শুরু হওয়ার সময় কিছুক্ষণের জন্য আমি আবার পুরনো গুরুর ছাত্র হয়ে গেলাম। উপনিষদের খুদে সংস্করণ আমার কাছে ছিল, তা দিয়ে পাঠ শুরু হল। মনে নেই, বাড়ী থেকে ফিরে গিয়ে আমি রাতটা বীরপুরে কাটিয়েছিলাম অথবা সেখান থেকে সোজা দুলহপুর স্টেশনে গিয়েছিলাম। যাহোক, যেভাবেই হোক আমি আবার বেনারস পৌঁছে গেলাম।

বেনারসে বেশী থাকাটা বিপদজনক ছিল। বাবা যে কোনো সময়ে এসে হাজির হতে পারতেন। স্বামী বেদানন্দজীও আমার এই ধারণার সঙ্গে একমত ছিলেন। তিনিও সম্প্রতি অহরৌরা (মির্জ্জাপুর) থেকে ফিরে এসেছেন। সেখানকার অনেক আর্যসমাজী যুবক তাঁকে কিছুদিন থাকার অনুরোধ করে। তিনি আমাকে সেখানে যাওয়ার কথা বলেন। রেলপথ থেকে বেশ কয়েক ক্রোশ দূরে বিন্ধ্যাচলের এই গর্তে বাবা যেতে পারবেন না এ বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এই রহস্য অন্য এক গুজরাতী জানত। মুসাফির বিদ্যালয়ের ছাত্র হওয়ায় তার ওপরে আমাদের বিশ্বাস ছিল। সে বাবার কাছে এই রহস্য ফাঁস করে দেয়। অহরৌরায় পৌঁছে নিশ্চিন্ত হয়ে তরুণদের কাছে ধর্মপ্রচার শুরু করে দিয়েছিলাম। দু'তিন দিন পরে একদিন সন্ধ্যায় দেখলাম, বাবা ভয়ানক কালের চেহারায় আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। যাহোক, তিনি ঐ সময় সকলের সামনে কোন ফয়সালা করতে চাননি। হয়তো তিনি আমার এই দুর্বল অবস্থানের কথা বুঝতে পারেননি। তিনি আলাদা আমার সঙ্গে দেখা করলেন। আমি বললাম,—আমি এখানে এক মাস থাকব। আপনি অন্য কোথাও যান। এখন আমাকে বিরক্ত করবেন না। নিজের চেষ্টায় অসাফল্য সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাস হতে চলেছিল। কিন্তু তবু স্নেহ তাঁকে নিশ্চেষ্ট থাকতে দিতো না। আরো একবার হৃদয় উন্মুক্ত করে তিনি আমার কাছে তাঁর ব্যথা মেলে ধরার চেষ্টা করলেন। ভোজন ইত্যাদি সম্পর্কে গ্রামীণ ব্যবস্থা আরো কিছুটা সরস করার প্রস্তাব দেন। আমি বললাম—আমার কাছে এখন সবচেয়ে বড় আকর্ষণ জ্ঞানার্জন যা কনৈলা বা বছওয়লে পাওয়া যাবে না। কথা অল্পই হয়েছিল। বাবা এক সাধুর কুটিরে বাস করে দূর থেকে শুধু আমার ওপর নজর রাখা পর্যন্তই নিজের কাজ সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। এতে আমার আনন্দ হল।

অহরৌরায় যার বাড়িতে আমি থাকতাম তিনি ছিলেন পহরী জাতির। এই জাতির নাম আমি প্রথম শুনলাম। এই নাম সংস্কৃতের প্রহরী শব্দ থেকে এসেছিল বলে মনে হয়েছিল। তিনি উৎসাহী আর্যসমাজী ছিলেন। কোনো এক সময়ে তাঁর বাড়ির খুব ভালো অবস্থা ছিল। বিন্ধ্যাচলের জঙ্গলে শুকনো কুল সংগ্রহ করে এবং তামাককে ঢেকিতে কুটে তাঁর ওখানে ভালো জাতের তামাক তৈরী হত। যখন লাক্ষার ব্যবসা বেড়ে যায় তখন তা থেকে যথেষ্ট উপার্জন হত। কয়েক হাজার টাকা সুদে খাটানো হত। এভাবে এক সময়ে এক সমৃদ্ধ নাগরিক-এর মতো তার বাড়ির লোকদের জীবন কাটত। এখন লাক্ষা থেকে আয় শেষ হয়ে গেছে। লেনদেনের টাকা থেকে কিছু আসত না। কারণ যারা ঋণ নিয়েছিল তারা ফেরৎ দিত না। তাই সেই রাস্তাও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। টিকেছিল শুধু তামাক। তামাকের ব্যবসায় লাভ থাকা সত্ত্বেও তাঁর নতুন ব্যবসায়িক পদ্ধতি জানা ছিল না। বিদেশে তামাক পাঠানোর জন্য সম্পর্ক স্থাপন করার দিকেও

তাঁর কোনো খেয়াল ছিল না। কেটে কুটে পুরনো ধরনের পুরনো প্রয়োজন অনুসারে তামাক তৈরী করে রাখতো। অহরৌরায় যা বিক্রি হত, তার ওপরেই তাঁর পরিবার দিন গুজরান করত। বাবার একমাত্র সন্তান ছিলেন তিনি। বাড়িতে মা ও স্ত্রী ছাড়া দুটি শিশু ছিল। তামাকের সাধারণ দৈনিক আয় থেকেই তাদের খরচ চলতো। কিন্তু তাঁর বাবার সময় থেকেই তাঁর পরিবারের কিছু আত্মীয়েরও ভরণপোষণও তাঁর বাড়িতেই হত। আজ উপার্জনের বড় রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর এই যুবকের হৃদয়ের এই সাহস ছিল না যে তার আশ্রিত আত্মীয়দের আলাদা করে দেয়। জীর্ণশীর্ণ দুর্বল নৌকো-আরোহীদের ভারে কোনো নদীতে স্বয়ং ডুবতে চাইছিল। কিছু আরোহীকে সরিয়ে দিলে নৌকো বেঁচে যেতে পারে তা জানা সত্ত্বেও যেমন কোমলহৃদয় নৌকার মালিক নৌকো থেকে সঙ্গীদের সরিয়ে দেওয়ার চেয়ে এক সঙ্গে ডুবে যাওয়া ভাল মনে করে, মনের ঠিক ঐ অবস্থাই ছিল এই যুবকের। তাঁর প্রতি আমার খুব সহানুভূতি ছিল এবং তাঁর কঠিন অবস্থা দেখে কখনো কখনো আমার মন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠত। তাঁর বাড়ীতে থাকায় এই ধরনের অবসর অনেক এসে যেত। বকেয়া টাকা উসুল করার জন্য আদালতে নালিশ করা প্রয়োজন ছিল। নালিশ করা, কাছারিতে মোকদ্দমা লড়া গান্ধীযুগের অনেক আগে ঐ সময়েও তাঁর পছন্দ ছিল না। আর পছন্দ হলেও তার জন্য অনেক টাকার দরকার হত।

সন্ধ্যায় শুধু ভাষণের দ্বারা নয়, কিছু ক্লাসের দ্বারাও আমাদের কার্যক্রম চলতো। আমার ভাষণে ধর্মের কথার সঙ্গে জাতীয়তার রঙও লাগতে শুরু করেছিল। অনেক জায়গায় গোয়েন্দা পুলিশ রিপোর্ট করেছিল, সে বিষয়ে আগ্রায় পুলিশ অনুসন্ধান করেছিল। সে কথা এক পুলিশ অফিসার মিত্রতাবশত ভগবতী ভাইকে বলেছিল। মাসখানেক আমার কথা শুনেও অহরৌরার যুবকদের যদি বিরক্তি না এসে থাকে, তবে তার জন্য দায়ী হল শুধু সাময়িকতা। আমার আশ্রয়দাতা যুবকের ওখানেই আমি খেতাম। কিন্তু তহসিলী স্কুলের হেডমাষ্টার যিনি আর্য সমাজপ্রেমী হয়েও জাতপাতের ভয়ে কাঁপতেন, দুয়েকবার তাঁর ওখানেও খেতে গিয়েছিলাম। যে ঘরে আমি থাকতাম, সেই কামরায় সাদা চুণকাম করা ছিল। বেশ হাওয়া খেলত। কয়েকটা ছবি ও আয়না টাঙানো ছিল। যুবক উপন্যাসের ভক্ত ছিল। গোয়েন্দা উপন্যাস তো সারি সারি সাজানো ছিল। এখানে শ্রী গোপাল রাম গহমরীর লংকা যাত্রার ওপর এক বই পড়ি। আমার লংকা যাওয়ার আগে তা আমি প্রায় ভুলে গিয়েছিলাম। চন্দ্রকান্তা, চন্দ্রকান্তা সন্ততি এবং এই ধরনের অনেক তৎকালীন উপন্যাস এখানে ছিল। আমার কাছে পড়ার মতো গুরুগম্ভীর পুস্তক ছিল না। যথেষ্ট নিজস্ব সময় ছিল। তাই এই রাশি রাশি বইয়ের সবই একবার পড়ে শেষ করে ফেললাম। হিন্দি উপন্যাসে মগ্ন হয়ে পড়ার আমার কাছে এই ছিল প্রথম ও শেষ সুযোগ।

অহরৌরার অবস্থান বিন্ধ্যাটবীর মুখে। এখান থেকে একটা রাস্তা সর্গুজা হয়ে দক্ষিণাপথের দিকে গেছে। পাশেই পাহাড় ও জঙ্গল শুরু হয়ে গেছে যেখানে বাঘ ও চিতা থাকে। সর্গুজা ও দক্ষিণ মির্জাপুর থেকেএখানে সওদা বোঝাই হয়ে শত শত বলদ আসতো। ঐ সময় পরসায় শোনা শোভনায়ক (নয়কা) যাযাবরের গীতময় কাহিনী আমার মনে পড়তো। ঐতিহাসিক সমাজের মানসচিত্রের রচনা এখন কিছু কিছু আমার মাথায় আসছিল। অহরৌরার দক্ষিণ থেকে মালবহনের জন্য যে বলদ আসত তাতে এই চিত্র তৈরী করার সহায়ক হয়েছিল। জঙ্গলে আবলুস ও খয়েরের হাজার হাজার গাছ ছিল। খয়ের কাঠের রস থেকে খয়ের তৈরী করা যেত কিন্তু আবলুস গাছ দিয়ে এখানে কোনো কাজ হত না। অহরৌরাতে কাঠের তৈরী ও লাক্ষার রঙ দিয়ে রঙ করা অনেক সিঁদুরদান খেলনা ইত্যাদি তৈরী হত। এই সবের বেশীর ভাগ তৈরী করা হত সাধারণ ভেজা কাঠ লেদ মেসিনে ফেলে এবং এগুলি শুকিয়ে যাওয়ায় ফেটে যেত। আমি কাঠের এক কমণ্ডলু তৈরী করিয়েছিলাম যা থেকে এক মাসের মধ্যেই জল চোঁয়াতে লাগল।

দু'চার বার আমি পাহাড়ের কিছুটা ভেতর পর্যন্ত গিয়েছিলাম। একবার বেনারসের মহারাজার শিকারগাহতে গিয়েছিলাম। পাকা দেয়ালের ভেতর সুরক্ষিতভাবে বসে এবং বিপদের নামগন্ধও যেখানে নেই সেখানে সিংহ শিকারে কি আনন্দ, তা তো আমি বুঝতে পারতাম না। এই শিকারগাহগুলি দেখে আমার জঙ্গলের রাখালদের গোষ্ঠের কথা মনে আসত। অহরৌরার খাল যে জলাশয়ের চারদিক থেকে বেরিয়ে এসেছে একবার তাও দেখতে গিয়েছিলাম।

ধীরে ধীরে ডিসেম্বর মাস শেষ হতে চলেছিল। জানুয়ারির সঙ্গে সঙ্গে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ আসছিল। অহরৌরার স্বামী বেদানন্দের চিঠি প্রত্যেক সপ্তাহ আসত। সবই সংস্কৃতে লেখা চিঠি। আমার উত্তরও যেত সংস্কৃতে। তাঁর সুন্দর অক্ষর দেখে আমার ঈর্ষা হত। ডিসেম্বরের শেষে সাধুজীর (ভাই মহেশপ্রসাদ) এক চিঠি পেলাম। তাতে লেখা ছিল, মহেশপুরার এক বৈশ্য আর্যসমাজী ধর্মপ্রচারক তৈরীর উদ্দেশ্যে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য কয়েক হাজার টাকা দিতে চাইছেন। তুমি সেখানে গিয়ে কাজ শুরু কর। আমি যে বিদ্যালয়ের স্বপ্ন দেখতাম, তা মহেশপুরার অল্প টাকায় ও আমার নিজের স্বল্প জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় স্থাপন করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু আমি জানতাম যে নতুন দুনিয়ার দিকে আমার চোখ খুলে দিয়েছিলেন ভাই সাহেবই। তাই তাঁর কোনো সিদ্ধান্তকে অবহেলা করার সাহস ছিল না আমার। আমি মহেশপুরা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম।

নতুন বন্ধুদের উপহার দেওয়ার জন্য আমি জংলী বাঁশের দশ বারোটি লাঠি সঙ্গে নিলাম। আমার চলে যাওয়ার কথা আমি একেবারেই গোপন রেখেছিলাম। কারণ আমি জানতাম যে, বাবা যদি খবর পেয়ে যান তবে বড় রকমের বিঘ্ন হবে। একদিন আমি চুপচাপ এক্কায় বসে অহরৌরা রোড স্টেশনের দিকে পালিয়ে গেলাম। স্টেশনে পৌঁছে জানতে পারলাম যে গাড়ি আসতে দেরি আছে। আমার হৃদয় বিপদের ভয়ে কাঁপতে লাগলো, ততক্ষণে বাবা না এসে যান। মন বলছিল, যদি একবার এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারি, তবে আমাকে খুঁজে বার করার সাধ্য কার? আমি কখনো যাগেশকে কখনো বেনারসে গুজরাতী ছাত্রবন্ধুকে দোষ দিচ্ছিলাম।

যে ভয় করেছিলাম শেষ পর্যন্ত তাই হল। তখনো টিকিট কাটা হয়নি এরই মধ্যে বাবা প্লাটফর্মে এসে হাজির। তিনি হাঁপাচ্ছিলেন। তিনি নয় দশ মাইলের পথ ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে অথবা অত্যন্ত দ্রুতবেগে এসেছেন নয়তো এত তাড়াতাড়ি কিভাবে এলেন? কখনো আঁচও করতে পারিনি যে আমার আশ্রয়দাতার মা আমার বাবার হয়ে অবৈতনিক গোয়েন্দার কাজ করছিলেন। তিনি আমাকে দেখেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন এবং অভিযোগ করতে লাগলেন। প্ল্যাটফর্মে লোক জমা হয়ে গেল। তিনি চিৎকার করে বলছিলেন—কেন তুমি আমাকে মারছ। আমাকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে চল, ইত্যাদি। তাঁর কথার মধ্যে গত বছরের অর্ধ-উন্মত্ততার কিছুটা প্রভাব ছিল। নয়তো তাঁর স্বাভাবিক গাম্ভীর্যকে পরিত্যাগ করে তিনি এতটা অধীর ও কাতর হয়ে কাঁদতে ও চিৎকার করতে পারতেন না। আমি একবার সাহস সঞ্চয় করে বললাম—আচ্ছা, কতকাল আপনি আমাকে এভাবে বেঁধে রাখবেন। কিন্তু প্ল্যাটফর্মের সব মানুষ আমার বিরুদ্ধে ছিল। পারলে ওরা আমাকে পাথর মেরে সেখানেই শেষ করে দিত। সবাই আমাকে ছি ছি করতে লাগল। আমি মহেশপুরার দিকে যাত্রা স্থগিত করলাম এবং দুটো টিকিট কেটে বেনারসের দিকে রওনা হলাম। ট্রেনে এবং তার চেয়েও বেশী বেনারস স্টেশনে আমি ঠাণ্ডা মাথায় তাঁকে বোঝাতে লাগলাম—আমি আপনার মনের কথা, আপনার অস্থিরতা বুঝতে পারি। কিন্তু সেই সঙ্গে আমার জীবনেও ভবিষ্যতের কামনা আছে, যার অস্ফুট সংকেত আমার কাছে আসছে। সেই কারণে ভীষণ থেকে ভীষণতর বিপদ, সাক্ষাৎ মৃত্যুও আমাকে আমার পথ থেকে বিচলিত করতে পারবে না। আমি কর্নেলার যোগ্য নই, আমি আপনার কোন কাজে

আসবো না। যদি আপনার তাই ইচ্ছা ছিল তবে আমাকে গরু-মোষের রাখালের কাজে লাগিয়ে দিতে পারতেন। আমার দুনিয়া কনৈলায় সীমাবদ্ধ হয়ে যেত। এখন জবরদস্তি করলে তার পরিণাম ভয়ঙ্কর হবে। আপনাকে আমার জীবন থেকে হাত ধুয়ে ফেলতে হবে।

আমি এই সব কথা ধীরে ধীরে বললাম যাতে তিনি তাঁর কথা বলার সুযোগ পান। আমার কথা তাঁর মনে প্রভাব বিস্তার করল। তাঁর মুখ থেকে যে শেষ কথা হঠাৎ বেরিয়ে এল, তা আমি আশা করতে পারিনি। তিনি বললেন—আর আমি তোমার পথের প্রতিবন্ধক হব না। কিন্তু আমিও আর কনৈলায় ফিরে যাব না। বেনারসেই আমার জীবন কাটিয়ে দেব।

তাঁর প্রতিশ্রুতির প্রথমার্ধ তিনি পালন করেছিলেন। এই ছিল তাঁকে আমার শেষ দেখা।

আমি প্রতিজ্ঞা করলাম—এখন থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আমি আজমগড় জেলার সীমানার মধ্যে পা রাখবো না।

৬

মিশনারি তৈরী করার এক প্রয়াস (১৯১৭ খ্রী)

বেনারস ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে যখন টিকিট কাটতে গেলাম তখন ছোট লাইনের জানালায় যে সব যাত্রী টিকিট কাটছিল তাদের ছাপরার বুলি বলতে শুনলাম। ঘরের কথা জিগ্যেস করায় তারা বলল, একমা-মুইলী। আমার পরসার কথা মনে পড়ে গেল। কিভাবে বড় বড় স্বপ্ন নিয়ে আমি সেখানে গিয়েছিলাম, কিভাবে পরসায় নিবাস আর এই সম্পর্ক ভারতের সব জায়গায় আমার জন্য ভোজন ও আবাসের নিশ্চিন্ততা দিয়েছিল। কিভাবে আমার শত দোষ সত্ত্বেও মোহন্তজী আমাকে খুব স্নেহ করতেন। আমাকে পেয়ে নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিলেন। এখনো আমার সঙ্গী বরদরাজ—যে আমার জন্যই সেখানে গিয়ে সাধু হয়েছিল—পরসার বন্ধন ছিন্ন করেনি। এই চিন্তা আসতেই কিছুক্ষণের জন্য আমার দৃষ্টিভঙ্গির বড় ধরনের পরিবর্তনের কথা ভুলে গেলাম, মনে হল পরসার দিক থেকে এসে এক সোনালি রজ্জু আমার হৃদয়কে বেঁধে ফেলছিল। ধীরে ধীরে তার টান আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। বি· এন· ডব্লিউর জানালার দিকে পা এগোতে চাইল। ঠিক এই সময়েই হাওয়া আবার দিকবদল করলো। আমাকে দিয়ে আর মোহন্তগিরি হবে না। জীবনের ধারাকে উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার শক্তি আমার নেই। আমার পকেটে ভাই সাহেবের চিঠি অনুভব করতে লাগলাম। আমার চোখের সামনে বড় বড় অক্ষরে দেখা দিতে লাগল—মহেশপুরা গিয়ে কাজ সামলাতে হবে, ভগবতী ভাই সেখানে সারা গ্রীষ্মকালটা ঘুরে ঘুরে প্রচার করছেন।

আমি মহেশপুরা যাওয়ার জন্য কোঁচের টিকিট কাটলাম।

কানপুর, কাল্পী, উরই, এটা ইত্যাদি স্টেশন দেখতে দেখতে আমি কোঁচ স্টেশনে নামলাম। ভাই সাহেব চিঠিতে পণ্ডিত কৃষ্ণগোপালজীর ঠিকানা দিয়েছিলেন। কুঁঅর বাহাদুর সিংহ মহেশপুরার স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে চিঠি দিয়ে ভাই সাহেবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

একদিকে এই ধরনের একটি সংস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কিছু শিক্ষিত যুবক অধীর হয়ে উঠেছিল, অন্যদিকে এইরকম একটি কাজের জন্য কিছু টাকা জমেছিল, তাই এই দুয়ের মেলবন্ধন এমন কিছু কঠিন কাজ ছিল না। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী এবং তাঁর ছেলে শ্রী পান্নালালজী আমার আসার খবর পণ্ডিত কৃষ্ণগোপালজীকে দিয়ে রেখেছিলেন। তাই কোঁচে থাকার জন্য ইতস্তত ঘুরে বেড়ানোর দরকার হয়নি।

কোঁচ থেকে মহেশপুরার কাছাকাছি পর্যন্ত একটা কাঁচা সড়ক গেছে। একটি লোকের ওপর মালপত্র চাপিয়ে আমি পায়ে হেঁটেই মহেশপুরার দিকে রওনা হলাম। জানুয়ারি (১৯১৭) মাস। জোয়ার-বাজরা ধরেছিল এমন বড় বড় গাছ খেতে দাঁড়িয়েছিল। নতুন ফসল বোনা হয়ে গিয়েছিল। মহেশপুরার কাছাকাছি পৌঁছনোর পর হাতে কাটা জমির স্বাভাবিক খানাখন্দ হয়ে উতরাই চড়াই করতে হল। বাড়ির টালি চওড়া দেয়াল কাঁচা, লেপা-পোছা পরিচ্ছন্ন দরজা। স্ত্রীলোকের পায়ে তিলকিত মল, মোটা আঁট-সাঁট শাড়ি এবং সুগঠিত শরীর দেখে আমার বাজরার সংস্কৃত প্রতিশব্দ বজ্রান্নের কথা মনে পড়ে গেল।

রামদিন পাহাড়িয়ার (স্বামী ব্রহ্মানন্দের গৃহস্থাশ্রমের নাম) খ্যাতির জন্য তাঁর বাড়ির ঠিকানা খুঁজে বার করা শহরেও কঠিন ছিল না, আর এতো গ্রাম। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী, তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র পান্নালাল, আর হয়তো কনিষ্ঠ পুত্র শ্যামলাল-এর সঙ্গেও তাঁদের বাড়িতেই দেখা হল। অন্দর মহল থেকে দূরে এক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বড় বাড়ি ছিল যার সামনের দিকটা পাকা। দরজায় ভেতর থেকে বন্দুকের নিশানা লাগানোর জন্য ছিদ্র করা ছিল, যা আমি রাস্তায় অনেক বাড়িতে দেখেছি। কিন্তু একথা শুনিনি যে, এখনো এই এলাকায় কখনো কখনো সশস্ত্র ডাকাত পড়ে এবং সেই সময় গৃহস্বামী নিজের সুরক্ষার ভার পুলিশের ওপর সঁপে দিয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারে না। মহেশপুরা গোয়ালিয়র রাজ্যের একেবারে সীমান্তে অবস্থিত। গ্রাম থেকে কিছুটা দূরে পশ্চিমে যে নদীতে আমি প্রত্যহ স্নান করতে যেতাম, তার এক তীর গোয়ালিয়র রাজ্যে ছিল। নদীর এক তীরে লাইসেন্স হীন বন্দুক রাখলে এক বছরের জন্য জেলে যেতে হত; অন্য তীরে ঢাকনা দেওয়া বন্দুক ও লাঠি একই সমান মনে করা হত। মহেশপুরার অল্প দূরেই ছিল নদী-গাঁও, যা দতিয়া রাজ্যে ছিল আর দক্ষিণে একটি গ্রাম ছিল সমথর রাজ্যে।

আমাদের রাজনৈতিক চিন্তাও ছিল। দেশের স্বাধীনতার জন্য যে বীরেরা অস্ত্র ব্যবহার করে ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দিল তাঁদের জন্য আমাদের প্রশংসার সীমা ছিল না। তবু আমরা এই ধরনের কোনো ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে মহেশপুরাকে বেছে নিইনি। আমরা জেনে-শুনে মহেশপুরার এক ধনিক বৈশ্যকে স্বার্থত্যাগের জন্য প্রস্তুত করিনি। শ্রীরামদিন পাহাড়িয়া তাঁর বাবার একমাত্র সন্তান। সামান্য খাতা লিখতে পড়তে পারেন এমন এক গ্রাম্য মহাজন। স্বামী দয়ানন্দের সমাজ সংস্কার এবং ধর্ম প্রচারের গুঞ্জন উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের অনেক জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল। চিন্তাধারার ডানা দ্রুতগামী হয়ে থাকে আর কোনোভাবে তা মহেশপুরার যুবক বৈশ্য রামদিনের কাছে পৌঁছে যায়। বাবার উপার্জিত কিছু বিত্ত তাঁর কাছে ছিল। কাপড়ের ব্যবসা ছিল আর ছিল বন্ধকী ও টাকা সুদে খাটাবার কারবার। তিনি আর্যসমাজী বই পড়তে শুরু করেন, সেই দৃষ্টিভঙ্গির খবরের কাগজ যেখানে বেরোত সেখান থেকে তিনি তা আনাতেন। আর্য-সমাজে তিনি আলো দেখতে পেলেন। মূর্তিপূজা, শ্রাদ্ধ, পুরাণের গল্পে তাঁর আর শ্রদ্ধা থাকলো না। কিন্তু শুধু নেতিবাচক কর্মে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তিনি নিয়মিতভাবে সন্ধ্যা করতে শুরু করলেন এবং হোমও তার মধ্যে যুক্ত হল। তারপর পত্নীকে অক্ষর পরিচয় করিয়ে তাকে যথার্থ সহধর্মিণীতে পরিণত করলেন। শুধু তাই নয়, লোকাচারের পরোয়া না করে স্ত্রীকেও পৈতা দিলেন। এই সব বাহ্য আচারকে আর্যসমাজ প্রাধান্য দিত না। প্রাধান্য দিত মানসিক আচারের।

মিথ্যা বলার মতো পাপ নেই, সত্যের চেয়ে বড় ধর্ম নেই—এই সব তিনি অনেক পড়েছিলেন। তিনি এই সব বিধিনিষেধ অনুসরণের সিদ্ধান্ত নিলেন। ব্যবসায়ীর জন্য এ বড় মুশকিলের কথা। কিন্তু রামদিন অটল রইলেন। খদ্দের কাপড়ের দাম জিগ্যেস করত। জবাব পেতো—"এগার পয়সা গজ।"

"কিছু কম করুন ভাইয়াজী।"

"এক দাম।"

"আরে, এ কি কথা।"

"না আমি তো বলেছি, এক দাম।"

প্রথমদিকে এতে কিছু অসুবিধা হয়েছিল। কিন্তু পরে লোকজন দেখতে পেল যে রামদিনের দোকানের জিনিষের দাম কোঁচের দামের চেয়েও সস্তা এবং দর কষাকষি করে ঠকে যাওয়ার ভয় নেই। ফল হল এই যে, মহেশপুরার দোকান খুব ভাল চলতে লাগল। সুদ ও ব্যবসা থেকে লাভ পাপের উপার্জন এই ধারণা রামদিনের ছিল না। তাই তাঁর শ্রীবৃদ্ধি ধর্মের উপার্জন থেকে হয়েছে বলা যেতে পারে।

রামদিনজীর দুই ছেলে, তিনটি অথবা চারটি মেয়ে। আর্য সমাজ নারীশিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিত। কিন্তু মহেশপুরার মতো গ্রামে তার ব্যবস্থা করা মুশকিল ছিল। পুত্রদের শিক্ষার বিশেষ করে সংস্কৃত শিক্ষার দিকে তিনি দৃষ্টি দিয়েছিলেন। তিনি ফররুখাবাদের এক পণ্ডিতকে নিজের বাড়িতে এনে রেখেছিলেন। গ্রামের বাইরে নিজের বাগানে আশ্রম তৈরী করে সেখানে ছেলেদের পড়া শুরু করালেন। বড় ছেলে শ্রীপান্নালাল সংস্কৃতে ভালোভাবে এগিয়েছিল এবং যদি আরো কিছুদিন পড়াশোনা এভাবে চলত, তবে সে নিজের প্রতিভা ও অধ্যবসায়ের ফলে বড় পণ্ডিত হত। ছোট ভাই দেরিতে পড়াশোনা শুরু করেছিল। এবং বড় ভাইয়ের মতো প্রতিভাও তার ছিল না।

পড়াশোনা সমাপ্তির পর ছেলেদের বিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এক মেয়ে ছাড়া অন্য মেয়েদের বিয়েও হয়ে গিয়েছিল। বাড়ির কাজকর্মের ভার ছেলেরা নেওয়ার পর রামদিন পাহাড়িয়ার মনে হল—"গৃহকর্মের নানা জঞ্জাল" ছেড়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করা ভাল এবং তিনি সন্ন্যাসী হয়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দ নাম নিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দের ঘর ছেড়ে বাইরে ঘোরার সুযোগ হয়নি। কারো কাছে তিনি হাত পাতেন নি, তাই সন্ন্যাসী হয়েও ভাত-কাপড়ের জন্য নিজের পরিবারের অধীন হয়েই থাকতে চাইলেন। তাঁর প্রেরণাতেই ছেলেরা চার হাজার টাকা বিদ্যালয়ের জন্য দিতে স্বীকৃত হয়েছিল। স্থির হয়েছিল যে টাকা এক সঙ্গে না দিয়ে প্রতি মাসে তার সুদ হিসেবে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ টাকা দেওয়া হবে।

এই টাকাতে বিদ্যালয়ের কাজ চলতে পারে না। তাই মহেশপুরা পৌঁছোনোর পর আমি ও ব্রহ্মানন্দজী স্থির করলাম যে বিদ্যালয়ের জন্য মাস দেড়েক ঘুরে চাঁদার প্রতিশ্রুতি আদায় করা হবে। অযোধ্যার অভিজ্ঞতা অনুসারে আমার মনে হয়েছিল যে যথেষ্ট টাকা পয়সার প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পরই আমাদের বিদ্যালয় খোলার সাহস করা উচিত।

মহেশপুরা থেকে রাওসাহেবের বংগরা, জালৌন প্রভৃতি ঘুরে আমরা পায়ে হেঁটেই মহেশপুরা ফিরে এলাম। স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁর ধর্মপ্রাণতার জন্য যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। জায়গায় জায়গায় তাঁর পরিচিত লোকও ছিল এবং সেই কারণে সব জায়গাতেই অনায়াসে চাঁদার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছিল। আমরা দিনে তিন চারটা গ্রামে যেতাম। বিদ্যালয় কিভাবে ধর্ম, বিদ্যার প্রসার ও দেশোন্নতির জন্য প্রযত্নশীল হবে, তা আমরা বোঝাতাম এবং তারপর চাঁদার খাতায় নাম লেখানোর জন্য আবেদন করতাম। লোকজন নগদ অথবা শস্যের মাপে চাঁদার

পরিমাণ লেখাত। স্বামীজী তাঁর বুন্দেলখণ্ডী ভাষায় বলতেন। তাঁর বক্তৃতা প্রভাবশালী হত। চাঁদার তালিকায় যেভাবে গ্রামের পর গ্রাম এবং নামের পর নাম আসছিল, তা দেখে আমাদের খুব আনন্দ হচ্ছিল। অন্তত খাদ্য-বস্ত্রের জন্য তো আমরা এখন নিশ্চিন্ত থাকব।

আমি আসার আগে ভগবতী ভাই এখানে এসে পৌঁছেছিলেন। তিনি জেলায় ও গোয়ালিয়র রাজ্যের অনেক গ্রামে ঘুরে ঘুরে খুব প্রচার করেছিলেন। তিনি আমার মতো পরিবারের ভার থেকে মুক্ত ছিলেন না। তাই তিনি আর এখানে থাকতে পারেননি। আমাদের ছাত্রের সঙ্গে আর একজন অধ্যাপক-এরও প্রয়োজন ছিল। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়ার পর পাণিপথের মুকুন্দলাল, আজমীরের রামসহায়, মথুরার যশওয়ন্ত, এক সন্ন্যাসী এবং পুরনো পরিচিতদের মধ্যে মহাদেব প্রসাদজী, যাগেশ, মাণিক মহেশপুরা চলে আসে। গ্রীষ্মকালের আগেই মহেশপুরা, বৈদিক-বিদ্যালয় শুরু হয়ে গেল। পড়াশোনা হত বৈঠকখানায়, রান্নার ও খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল শ্রীপান্নালালজীর গোশালায়। কাউকে বেতন দেবার দরকার ছিল না, শুধু আট-দশ জন লোকের ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা করলে হত। ফসল কাটার পর আমরা যখন চাঁদা আদায় করতে চাইলাম, তখন বুঝতে পারলাম যে তালিকায় চাঁদার পরিমাণ লেখানোর থেকে তা উসুল করা কত কঠিন। যে সব লোক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তাদের মধ্যে খুব কম লোকই চাঁদা দিল। চাঁদা আদায় করতে যে সময় লাগত, তাতে আদায় করা চাঁদার পরিমাণ দেখে সব চাঁদাদাতার কাছে যাওয়ার চিন্তাই আমরা ছেড়ে দিলাম। চৈত্র-বৈশাখে মহেশপুরারই কাছাকাছিই আমরা ঘোরাঘুরি করলাম। তাতে যথেষ্ট খাদ্য শস্য পাওয়া গেল।

এখানেও পড়াশোনা হত প্রায় মুসাফির বিদ্যালয়ের মতোই। প্রধানত আরবী, সংস্কৃত পড়ানো হত। ভাষণ ও শাস্ত্রীয় বিতর্ক হত। তিন-চারটি হিন্দি ও উর্দু আর্য সমাজী কাগজ আসত। যে সব যুবক রাজনীতি নিয়ে চিন্তা করত তাদের জন্য 'প্রতাপ' তো প্রায় বাধ্যাতমূলক ছিল। প্রথম যে সব ছাত্র এসেছিল তাদের মধ্যে রামসহায়জী ছিলেন। তাঁর সংস্কৃত পড়ার খুব ইচ্ছা ছিল। কিন্তু দু'তিনবার চেষ্টা করার পর তিনি হতাশ হয়ে যান। লখনৌ-এ তিনি আমাকে নিজের চিন্তার কথা বলেছিলেন। আমি তাকে উৎসাহ দিয়ে বলেছিলাম, যদি কোন এক জায়গায় আমার থাকার সুযোগ হয় তবে তোমাকে লিখব।' রামসহায়জী ছেলেমানুষ ছিলেন না। ছেলেবেলায় রমশা বাদসাহের নামে আজমীরের সেই মহল্লা কাঁপত। যেখানে তিনি থাকতেন সেই মহল্লার গোটা বালসেনা রমশা বাদসাহের অবৈতনিক সেবার জন্য প্রস্তুত ছিল। সেই সময়ও কোনো অধ্যাপক ভয় দেখিয়ে রমশা বাদসাহকে পড়াতে পারেনি। যাহোক, আমি তাকে স্বাভাবিকভাবে সংস্কৃত পড়াতে শুরু করলাম। গল্প কথায় যে সব সজীব শব্দ চলে আসে তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম। এই কাজে পণ্ডিত সাতওয়ালে করের 'সংস্কৃত স্বয়ং শিক্ষক' খুব কাজে এসেছিল। রামসহায়জীর আত্মবিশ্বাস বাড়ছিল। কিন্তু তিনি তখনই পুরোপুরি সন্তুষ্ট হলেন যখন তিনি গোয়ালিয়র জেলার এক গ্রামে পাণিনীয় ব্যাকরণ (সিদ্ধান্ত কৌমুদী) পড়ছিলেন এমন এক পণ্ডিতকে সংস্কৃত বলায় পরাস্ত করে দিলেন।

এ সময়ে মহাযুদ্ধ চলছিল। জিনিষপত্রের দাম খুব বেড়ে গিয়েছিল। তবু মানুষের এই বিশ্বাস হয়নি যে এতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিশেষ ক্ষতি হতে পারে। ভারতের ভাগ্যের ওলটপালট হতে পারে একথা তো কেউ ভাবতেই পারেনি। শিক্ষিতদের মধ্যেও খুব কম লোকেরই রাজনৈতিক চেতনা ছিল। একশ বছর কেটে গেছে, ইংরেজ শাসন সব বিরুদ্ধতাকে দমন করে যে রকম দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখা সাধারণ মানুষের কাছে অসম্ভব বলে মনে হত। মহেশপুরা থাকাকালীন 'প্রতাপ' থেকে জাতীয় প্রগতির কিছু ধারণা হচ্ছিল। রাশিয়ার ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের অত্যন্ত অস্পষ্ট খবর ভারতে এলো। বস্তুত আমরা ততটা খবরই জানতে

পারতাম, যতটা ইংরেজ প্রভুরা জানাতে অনুমতি দিতেন। ইংরেজ হারছে, আমাদের এই ধারণা সংবাদের ভিত্তির ওপর ততটা ছিল না, যতটা ছিল আমাদের মনের আকাঙ্ক্ষার ওপর।

১৯১৭-তে কোঁচ-এর মন্নু মহারাজের ডাকাতের দলের আতঙ্ক ছিল আশেপাশের এলাকায়। তারা অনেক জায়গায় খবর দিয়ে ডাকাতি করতে যেত। অনেকে এই ডাকাতের দল আর তার সর্দারের বাহাদুরী ও গরীবের ওপর দয়ার প্রশংসা করত আবার কেউ তাদের অত্যাচারী বলত। শীতকালে অনেক দিন পর্যন্ত তো মহেশপুরায় ভীষণ আতঙ্কের ছায়া পড়েছিল, যদিও মহেশপুরা তেমন নিরস্ত্র ছিল না। দেশীয় রাজ্যের সীমানায় থাকার ফলে সেখানে বে-আইনী ঢাকনা দেওয়া ডজনখানেক বন্দুক ছিল। কিন্তু লুকিয়ে রাখা এক ডজন বন্দুক জমা করে মরার ও মারার জন্য প্রস্তুত ডাকাতের মোকাবিলা করা সহজ ছিল না। যা হোক মহেশপুরায় ডাকাত পড়ার পরিস্থিতি হয়নি।

গ্রামের এক ঠাকুরের ছেলের বিয়ে গোয়ালিয়র রাজ্যের এক গ্রামে হওয়ার কথা ছিল। বরযাত্রীর মিছিলে বাহন ছিল উট ও ছাউনি দেয়া গরুর গাড়ি। আমি এক মাদী উটে চড়ে গিয়েছিলাম। বরযাত্রীর মিছিল বাগানে দাঁড়িয়েছিল। নাচ ছিল না। থাকলে আমি যেতাম না। বরযাত্রীদের কাছে অনেক বন্দুক ছিল। দিনের বেলা বিয়ে হচ্ছিল, যা আমার কাছে নতুন বলে মনে হয়েছিল। কনের কথা বলতে পারছি না কিন্তু বরের বয়স নয় দশ বছরের বেশী ছিল না। দুপুরবেলা যখন বিয়ের মন্ত্র পড়া হচ্ছিল, ঘুমে তার চোখ বুজে আসছিল। দুপুরের পরে, বরযাত্রীরা যখন খেতে যাচ্ছিল তখন গ্রামের দুষ্টু ছেলেরা রাস্তার এবড়ো-খেবড়ো জায়গায় এক মহুয়া গাছে মাটির পাত্র, শুকনো লংকা আরো অনেক জিনিষ টাঙিয়ে রেখেছিল। এই সব লক্ষ্যভেদ না করে খেতে যাওয়া বরযাত্রীর পক্ষে লজ্জার কথা ছিল। বরযাত্রীরা নিজেদের বন্দুক তুলে নিশান দাগতে শুরু করলো। আর সব লক্ষ্যই ভেদ করা হল, কিন্তু একটি মাটির খুরি গাছের মাথায় এমন জায়গায় টাঙানো হয়েছিল যে কেউই লক্ষ্যভেদ করতে পারছিল না। পঙ্‌ক্তি ভোজনের দেরি হয়ে যাচ্ছিল। সন্ধ্যা হয়ে আসছিল দেখে বরযাত্রীরা অবৈধভাবে লক্ষ্যভেদ করতে চাইলো এবং একজন বরযাত্রী বন্দুকে গুলির জায়গায় দড়ি ভরছিল। আমি সবই দেখছিলাম। আমি বললাম, আমাকে বন্দুকটা দাও তো। একটা টোটা ভরা বন্দুক আমার হাতে দেওয়া হল। লোকজন পণ্ডিতজীর দুঃসাহস দেখতে দাঁড়িয়ে গেল। আমি তাক করে বন্দুকের কিনারা, চোখের কোনা সোজা মাটির খুরি সঙ্গে মেলালাম এবং ঘোড়া টেনে দিলাম। দুম করে আওয়াজ হল এবং মাটির খুরি ভেঙে চুরমার। যদি কোনো রাজকন্যার স্বয়ংবর হত, তবে জয়মাল্য আমার গলায় পড়ত। তবু লোকজনের বাহবায় আমি জয়মালা পরার চেয়ে কম খুশী হইনি। সেখানে এই ব্যাপারটা ভাগ্যবশতঃই হয়ে থাকতে পারে কিন্তু এমনিতেই আমার টিপ ভালো ছিল। আশেপাশে বন্দুকের প্রাচুর্য দেখে আমার লক্ষ্যভেদ করার উৎসাহ হয়েছিল। গোয়েন্দা পুলিশ জানতে পারলে আমাকে কোনো বোমা-পার্টির লোক মনে করত। এই বরযাত্রীর মিছিলে আর একটা ঘটনাও ঘটেছিল। একটা মাদী উটের একটা ছোটমতো বাচ্চা ছিল। কিছু দুষ্টু ছেলে বাচ্চা-উট ও আকারে ছোট তার মায়ের পিঠে চড়ত এবং মা ও বাচ্চা বসতে সুযোগ পেতো না। পাশে ছিল একটা বড় মাদী উট যাতে আমি সওয়ার হয়ে এসেছিলাম। বড় শয়তান ছিল এই মাদী উটটা। সে পাশে বাঁধা ছিল এবং ছেলেদের বজ্জাতিতে মনে মনে ফুঁসছিল। ঘোরাতে ঘোরাতে একবার সে তার নাকের দড়ি খুলে ফেলে একটা দুষ্টু ছেলের পেছনে ছোটে। বাগানের গাছে চক্কর মারতে মারতে আগে তের বছরের ছেলে দৌড়চ্ছিল এবং পেছনে ছুটছিল মাদী উটটা। অধিকাংশ বরযাত্রী খেতে চলে গিয়েছিল। আরো দুয়েকজন লোক ও আমি যারা ওখানে ছিলাম তাদের বুদ্ধি কাজ করছিল না। গাছ না থাকলে

উটনী অনেক আগেই ছেলেটাকে ধরে ফেলত। কিন্তু ছেলেটা দ্রুত গাছটায় ঘুরপাক খাচ্ছিল কিন্তু উটনীর তা করতে দেরি হচ্ছিল। ছেলেটা বেদম হয়ে গিয়েছিল এবং যে কোনো সময়ে সে পড়ে যেতে পারত। এই সময় আমার পাশে দাঁড়ানো একটা ছেলে তাক করে কটা ইটের টুকরো ছুঁড়ল। উটনী থেমে গেল। দেখলাম তার একটা চোখ থেকে রক্তের ধারা বইছে।

নিজের উটকে কানা দেখে মালিক ছেলেটার ওপর অত্যন্ত রেগে গেল। আমি তাকে বোঝালাম যে ওর একটা চোখ না গেলে ছেলেটার নিশ্চয় প্রাণ যেত। তাতে বেচারী শান্ত হল। উটনীর ক্রোধ দেখার এই এক সুযোগ হয়েছিল আমার।

মহেশপুরা বেশ বড় গ্রাম। জমিদার ছিলেন ঠাকুর (রাজপুত) তিনি মারপিট করতেন এবং তাঁর রাজপুতী ঠাঁঠ ছিল। তাদের মধ্যে কারো কারো পান্নালালজীর বাড়ির সঙ্গে শত্রুতাও কখনো কখনো হত। কিন্তু আমরা সবার সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক ভাল রাখতে চাইতাম। তাতে আমরা যথেষ্ট সফলও হয়েছিলাম। গ্রামের আশেপাশে এখন আর বড় জঙ্গল ছিল না। কিন্তু বুন্দেলখণ্ডের অন্যান্য নদীর মতো মহেশপুরার পাশের নদীটাও বইত অনেকটা নিচ দিয়ে। নদীর কাছাকাছি কঠিন মাটি একশ বছর ধরে কাটতে কাটতে উঁচু পাড় ও খাদে পরিণত হয়েছিল। এই সবের মধ্যে নেকড়ে থাকত।* আমি প্রায়ই সন্ধ্যায় নদীতে শৌচ ইত্যাদির জন্য যেতাম। ফেরার সময় কোনো মাটির পাহাড়ের ওপর বসে সন্ধ্যা করতাম। জ্যোৎস্না রাতে বিশেষ করে আরো দেরি হত। এভাবে আমি আমার মৌখিক আস্তিকতাকে বাস্তবে রূপ দিতে চেষ্টা করতাম। আর্য সমাজের উগ্রপন্থীদের সমর্থক হওয়ায় হামেশাই জাতপাতের কড়া আলোচনা করে আমি স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ ব্যক্তিদেরও ছিন্ন ভিন্ন করে দিতাম। তাঁরা বলতেন—যদি আপনাকে ছেলেমেয়ের বিয়ে দিতে হত, তবে বুঝতেন।

বর্ষার সময় কম লোকই মহেশপুরা থেকে কোঁচ আসা-যাওয়া করত। জল পড়তেই কালো মাটি পিচ্ছিল এটেল মাটির গভীর স্তরে পরিণত হয়ে যেত এবং তাতে জুতা পরে চলা অসম্ভব হত। কাদার গভীর দহে কাদামাখা চাকা-অলা গাড়ি বলদ টানতে পারত না। মাদী উটতো বর্ষায় শুধু মরুভূমিতেই চলতে পারত। সেই জন্য পান্নালালজীর মাদী উটও বেকার হয়ে যেত। বর্ষার চার মাস কৈলিয়া থেকে আমরা আমাদের ডাক পেতাম। কৈলিয়ার দারোগা ঐ সময় ভূত প্রেত ঝাড়ায় খুব খ্যাতি লাভ করছিলেন। জুমার দিন (?) সেখানে মেলা বসে যাওয়ার মতো অবস্থা হত। দারোগা সাহেবের পুলিশের কাজ করার অবসর কোথায়? ওপর-অলা অফিসাররা জানতে পেরে তাঁকে লাইনে হাজির করিয়ে দিলেন। দারোগাজীর আশীর্বাদে যেসব স্ত্রীপুরুষের লাভ হচ্ছিল তারা খুব অসন্তুষ্ট হল। কিন্তু সরকার এদের কথা শুনতে যাবে কেন?

মহেশপুরা থাকাকালীন খবরের কাগজে রুশ বিপ্লবের খবর আমার ওপর এক নতুন প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করলো। এই সব খবর থেকে জানতে পেরেছিলাম যে সেখানে গরীব, মজদুর, কিষাণ-এরও একটা পার্টি আছে যা গরীবের অধিকারের জন্য লড়ছে, তারা ভোগ ও শ্রমের সমান বিভাজনের প্রচার করছে। খবরের কাগজের বিভিন্ন সংখ্যায় পড়ে এই ধারণা শুধু বীজরূপেই বুঝতে পেরেছিলাম। তখন পর্যন্তও আমি হিন্দি বা উর্দুতে সাম্যবাদ সম্পর্কে একটি বইও পড়িনি। হয়তো তা ছিলই না। জানেশোনে এমন লোকের সঙ্গে আমি আলাপ আলোচনা করিনি। তবু ভোগ-শ্রম-সাম্য-এর সিদ্ধান্ত অতি দ্রুত আমার স্বভাবের অংশ হয়ে গেল। মনে

*এক ধরনের জানোয়ার;

হচ্ছিল, কোনো মানুষ হয়তো নিজের অজ্ঞাতসারে এমন একটি জিনিষের সন্ধানে ছিল যার আকৃতি এবং নামও সে ভুলে গিয়েছিল আর সেই জিনিষ একদিন অকস্মাৎ সে পেয়ে গেল। আমি সেই বীজকে নিজেই চিন্তা করে বিকশিত করলাম। আশপাশের মানুষকে আমি তার গুণের কথা বোঝাতাম এবং যুগপৎ আর্য সমাজী সিদ্ধান্ত ও সাম্যবাদের সমন্বয় করার চেষ্টা করতাম।

স্বামী বোধানন্দ আমাকে পালি ত্রিপিটকের ব্যাপারে অনাগরিক ধর্মপালের ঠিকানা দেন। তাকে লেখার পর তিনি বর্মী, সিংহলী ও শ্যামী অক্ষরে ছাপা ত্রিপিটক গ্রন্থের প্রাপ্তিস্থান লিখে জানান। তার মধ্য থেকে সিংহলী ও বর্মী লিপিতে ছাপা কিছু পালি গ্রন্থ আমি আনিয়েও নিলাম। মহাবোধী সোসাইটির ডঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ-এর ইংরেজী অনুবাদ-সহ নাগরী অক্ষরে ছাপা 'কচ্চান', ব্যাকরণ আমি আনিয়ে নিলাম যার ফলে সিংহলী, শ্যামী, বর্মী লিপি শেখা সহজ হয়ে যায়। এখানে পড়ানোর লোক তো কেউ নেই। অবসর সময়ে আমি স্বয়ং কিছু পৃষ্ঠা পড়তাম।

বর্ষাকাল (১৯১৭) শেষ হতে হতেই একথা বোঝা গেল যে এখানে যদি বিদ্যালয় চালাতে হয়, তবে তা গ্রাম থেকে সরিয়ে রেলপথের পাশে কোনো বড় জায়গায় নিয়ে যেতে হবে। আমি এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে জোর দিইনি কেননা তাতে পান্নালালজী ও অন্যান্যরা কষ্ট পাবেন। ধীরে ধীরে একথা ওদের কাছেও স্পষ্ট হতে লাগল, বিশেষ করে স্বামী ব্রহ্মানন্দেজীর কাছে। একবার হয়তো ভগবতী প্রসাদ অথবা অন্য কারো সঙ্গে তিনি কাল্পী গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি বললেন—বিদ্যালয়ের জন্য উপযুক্ত স্থান কাল্পীই হতে পারে।

বর্ষার পর অবশিষ্ট খাদ্যশস্য গাধার পিঠে বোঝাই করে আমরা কোঁচ রওনা হলাম। মহেশপুরার মানুষ ও আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় দুঃখ হয়েছিল। কিন্তু যদি বিয়োগ না হয় তবে নতুন স্নেহসূত্রও তো গড়ে উঠতে পারে না।

ট্রেনে আমরা কাল্পী পৌঁছলাম। আমাদের বন্ধু আগেই এসে ওখানকার ঠাকুরাণীর একটা লম্বা-চওড়া বাসভবন নিচের ও ওপরের দালান ও আলাদা বৈঠকখানা ভাড়া করেছিল। পাকা ও পরিচ্ছন্ন দালান বেশ হাওয়া খেলত। আমরা প্রতিদিন সকালে যমুনায় স্নান করতে যেতাম, সন্ধ্যায় দুই-আড়াই মাইল হেঁটে বেড়াতাম। কখনো রেলের সড়ক দিয়ে পুল পার পর্যন্ত কখনো বা কাল্পীর জনশূন্য প্রান্তরের দিকে। কাল্পীতেও একটি পুরনো আর্য সমাজ ছিল যার নিজস্ব মন্দির ছিল এবং তার কিছু উৎসাহী সদস্যও ছিল। পণ্ডিত শিবচরণ লাল আর্যপুরোহিত অনেকদিনের পুরনো আর্যসমাজী এবং সমাজ সংস্কারের ব্যাপারে আমাদের মতো উগ্র না হয়েও আর্য সমাজের প্রবল সমর্থক ছিলেন। তিনি সারস্বত ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাই ক্ষত্রিয় যজমান ছাড়া তাঁর কাল্পীতে আসাই সম্ভব হত না।

কাল্পী আসার আগে মহেশপুরার গোষ্ঠী থেকে ভগবতী ভাই বাড়ি যাচ্ছিলেন। যাগেশ তাঁর সঙ্গে আমার সবচেয়ে ছোট ভাই শ্রীনাথকেও নিয়ে এসেছিল। আমি ভাবলাম, এখন ওর পড়াশোনা করার বয়স, তাই কিছু পড়াশোনা করলে ভালই হবে। কিন্তু পড়াশোনায় ওর মন লাগেনি। দ্বিতীয়তঃ আমি বিদ্যালয়ে শুধু তাদেরই ভার বহন করতে প্রস্তুত, যারা মিশনরি কাজের জন্য তৈরি হবে। শ্রীনাথের একমাত্র যোগ্যতা ছিল এই যে সে আমার ভাই। তাকে ভগবতী ভাইয়ের সঙ্গে সিকন্দরাবাদের পাঠানোর খরচার জন্য আমি তার হাতের রুপোর বালা বিক্রী করিয়ে দিলাম। এতে আমার কোনো কোনো বন্ধু মন্তব্য করল—"ছোট ছেলের গয়না বেচা উচিত হয়নি।" কিন্তু আমি তো কোনো বেতন নিতাম না। অতএব কোন ফাণ্ড থেকে ওর পথের খরচা দিতাম। শ্রীনাথ সিকন্দরাবাদেও থাকেনি। লেখাপড়া, পানভোজনের উপযুক্ত ব্যবস্থা হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও মিথ্যা কষ্টের কথা লিখে শ্যামলালকে আনায় এবং বাড়ি ফিরে যায়।

কাল্পীতে ঃ হাটের ? দিন আমরা ধর্মপ্রচার করতে যেতাম। মুকুন্দলাল ও যশবন্তের ভজন হত হারমোনিয়াম বাজিয়ে এবং আমাদের মধ্যে অনেকেরই আর্যসমাজী পদ্ধতিতে ভাষণ হত। তাতে মাঝে মাঝে জাতীয়তার মিশেল দেওয়া হত। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মাঝে মাঝে বাইরে বেড়াতে যেতেন নয়তো এখানেই থাকতেন। ১৯১৭-র শেষ মাসে হোমরুলের আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। এ্যানি বেসান্ত ও আরুণ্ডেলের নজরবন্দী হওয়ায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল। লোকমান্য তিলকের মুক্তিতে চরমপন্থী অংশ দেশে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। হোমরুল আন্দোলনকে জনতার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য পণ্ডিত বেংকটেশনারায়ণ তেওয়ারীর সম্পাদনায় অনেক ছোট ছোট পুস্তিকা বেরিয়েছিল, যাঁর মধ্যে জালৌন জেলার এক রাজনৈতিক কর্মীর দীর্ঘ বর্ণনামূলক পুস্তিকাও ছিল। 'ভারত-ভারতী'র প্রথম থেকেই হিন্দিভাষীদের মধ্যে হিন্দি ভাষাভাষী জনতার প্রিয় হয়েছিল কিন্তু এখন তা রাজনৈতিক সংগীত পুস্তকের রূপ ধারণ করেছিল। কোঁচে আমার এক ব্রাহ্মণ বন্ধু তার শিশু সন্তানদের ভারত-ভরতীয় অনেক অংশ কণ্ঠস্থ করিয়ে দিয়েছিলেন। আরম্ভ হওয়ার পর থেকেই তো আমি 'প্রতাপ' পড়তে শুরু করেছিলাম। কিন্তু কাল্পীতেই আমি প্রথম সেখানকার এক ধর্মশালাতে শ্রীগণেশ শংকর বিদ্যার্থীর ভাষণ শুনেছিলাম। তার কৃশ মুখে চশমা-পরা চোখ অসাধারণ জ্বলজ্বলে মনে হয়েছিল।

শীতের কিছু সময় কেটে যাওয়ার পর জানতে পারলাম যে পোখরায়াতে (কানপুর জেলা) প্লেগ শুরু হয়ে গেছে। লোক প্রচুর মরছে। প্রারম্ভিক যুগে আর্যসমাজীদের মধ্যে নির্ভীকভাবে রোগী, অনাথ ও গরীবের সেবা যারা করত, সেই সব বীরদের অনেক কাহিনী আমি শুনেছিলাম। পণ্ডিত রলারাম বেজওয়াড়িয়া ছিলেন রেলের এক সাধারণ পয়েন্টসম্যান। তিনি এমনি সেবা করেই আর্যসমাজের এক শ্রদ্ধেয় পুরুষ হয়ে গিয়েছিলেন। নিজের সাত-আট টাকা বেতন থেকে বাঁচিয়ে কিছু পুস্তক বিতরণ করতেন। এবং কিছু টাকা দিয়ে প্লেগের দিনে রোগীদের সেবা করতেন। এই সময় সারা উত্তর ভারতে প্লেগের ভয়ানক প্রকোপ ছিল। এক জৈন পরিবার সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, সেই পরিবার আর্য সমাজীদের ভারী বিদ্রুপ করত। একবার সেই পরিবারের সবাইকেই রোগে ধরেছিল। কেউ কেউ মরে গিয়েছিল, অবশিষ্টদের জল দেওয়ারও লোক ছিলনা। পণ্ডিত রলারাম সেখানে পৌঁছন। দুয়েকদিন তাঁকে পতিত মনে করে তাঁর হাতের ওষুধও তারা খেতে চায়নি। ঘরের এক যুবকের গাঁটে গাঁটে পেকে গিয়েছিল। তখন ডাক্তার কোথায় পাওয়া যাবে? পণ্ডিত রলারাম চিরে দেওয়ার জন্য তাঁর ছুরি বার করলেন। কিন্তু তাতে মরচে পড়েছিল। তিনি গাঁটে মুখ লাগিয়ে পুঁজ চুষে বার করে দেন। এতে পরিবারের মানুষের ওপর অসাধারণ প্রভাব পড়ে এবং তখন থেকে পণ্ডিত রলারামকে তারা দেবতার মতো মানত। রাজপুতানার আকালে সেবা করার সময় বিতরণের জন্য ঝোলায় ছোলার ডালের বোঝার ভারে কিভাবে একবার মহাত্মা হংসরাজ পড়ে গিয়েছিলেন, তাও আমি শুনেছিলাম। আমি থাকার কয়েকবছর আগে আগ্রায় প্লেগে তিন দিনের মরা শবকে বার করে তার সংকারের সাহস দেখিয়ে কিভাবে এক আর্য-সমাজী জেনেশুনে মৃত্যুকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলো এতো আমার কাছে তাজা ঘটনা ছিল। এভাবে আর্যসমাজ শুধু মুখের কথা বলেই নয় প্রাণের আহুতি দিয়ে পীড়িতের সেবা করে এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রচনা করেছিল। এই ধরনের সেবা আমার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষার বস্তু ছিল।

আমি এবং যাগেশ পোখরায়া গেলাম। আমরা বন্ধুদের কাছ থেকে কিছু টাকা চেয়ে এনেছিলাম। পোখরায়ার ডিস্‌পেন্‌সারির ডাক্তার বড় সজ্জন ছিলেন। তিনি স্বয়ং রোগীদের বাড়ি যেতে পারতেন না। কিন্তু তিনি আমাদের বলে দিয়েছিলেন যে ওষুধের যা দরকার হবে আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে। আমাদের টাকা থেকেই আমরা দুধ-সাবুদানার ব্যবস্থা করে

দিয়েছিলাম। বাজারের অনেক লোক ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। অনেকে ভাগ্যের ওপর সব ছেড়ে দিয়ে ঘরেই পড়েছিল। আমরা একটি খালি গোলায় ছিলাম। রোগীদের টেম্পারেচর নেওয়া, ওষুধ দেওয়া ও তাদের পাশে বসে কিছু সেবা করা ছিল আমাদের কাজ। কারো কারো গুরুতর অবস্থায় রোগ সম্পর্কে ডাক্তারের পরামর্শ নিতাম। আমাদের খালি পা, প্লেগের কোনো টিকা ফিকাও নিইনি, মৃত্যু আমাদের জন্য ভয়ের ব্যাপার ছিল না। তাই আমরা নির্ভয়ে রাতদিন ঘুরে বেড়াতাম। একদিন জানতে পারলাম যে সরাইখানার লোকটিকে রোগে ধরেছে। দেখলাম, ঘরের কাঁচা বারান্দায় ভাঙা খাটে ২৪-২৫ বছরের এক শ্যামবর্ণ নওজোয়ান পড়ে আছে। ঘরেই নয়, সরাইয়েও কেউ ছিলনা। সম্ভবত দুদিন ধরে ওকে জল দিতেও কেউ আসেনি। যখন ধনীদেরও এই রোগের সময় জল দেওয়ার লোক দুর্লভ ছিল তখন গায়ে খেটে দিন গুজরান করে এমন সরাইঅলাকে কে মনে রাখে? হয়তো শেষ পর্যন্ত আমরা তাকে অচৈতন্য দেখেছিলাম। আমরা তার পাশে থাকার দায়িত্বভার নিলাম। রাত্রিতে লণ্ঠন নিয়ে তার কাছে পড়ে থাকতাম। ডাক্তার সাহেবের থার্মোমিটার লণ্ঠনের কাছে নিয়ে নিয়ে দেখার সময় তা গরম কাচে ঠেকিয়ে দিয়েছিলাম। দেখলাম পারা থার্মোমিটার ভেঙে উড়ে গেল। সেজন্য ডাক্তার সাহেব কিছু বলেননি। দুতিন দিনের অবিরাম সেবা সত্ত্বেও সরাইঅলা বাঁচল না। তবু এ ব্যাপারে আমাদের এই পরিতৃপ্তি ছিল যে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিন্দুমাত্র পার্থক্য না করে আমরা সেই গরীবের সেবা করেছিলাম। আর একটি শোচনীয় মৃত্যু হয়েছিল এক স্বচ্ছল পরিবারের নওজোয়ান ছেলের যার যুবতী স্ত্রী চিরকালের জন্য বিধবা হয়ে যাওয়ার জন্য সেখানে ছিল। আমাদের সেই বাড়িতে উপস্থিতি তাদের সান্ত্বনা দিত। আমি তাদের কিছুটা আশা ও সাহস দিতাম। তারা দেখত যে, আমরা প্রাণের মায়া ছেড়ে সেই আগুনে রাতদিন ঘুরে বেড়াতাম। দুধ-সাবুদানার পয়সা আমাদের কম পড়েনি। আমাদের মধ্যে একধরনের অদ্ভুত উৎসাহ এসেছিল।

যুদ্ধ আরো গুরুতর হয়ে উঠছিল। কাল্পীর মাড়োয়ারী শেঠের গিরনী ফ্যাকটরি (তুলার গাঁট বাধার কারখানা) এখন ভূষির গাঁট বেঁধে লড়াইয়ের ময়দানে পাঠাচ্ছিল। কাল্পীর তহসীলদার সাহেবের আর্য সমাজের প্রতি কিছুটা সহানুভূতি ছিল এবং আমাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কও ভাল ছিল। গিরনী ফ্যাকটরিতে একাধিক বার ব্রিটিশের বিজয় কামনা করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা হয়েছিল। তার এক-আধবার প্রার্থনা করার ভার আমার ওপরেও পড়েছিল। আমার প্রার্থনায় ব্রিটিশের নামগন্ধও থাকত না এবং সত্য ও ন্যায়ের ওপর যে শক্তি দাঁড়িয়ে আছে তার বিজয় কামনা করতাম—এই কথা কিছু লোক বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করেছিল।

শীতের দিনে কখনো কখনো জেলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভাষণ দিতে যেতে হত। উরই-এর তরুণ আর্য সমাজীরা পুকুরপারের এক শিবালয়কেই আর্য সমাজ ও তার পুস্তকালয়ে পরিণত করেছিল। সেখানে আমি প্রায়ই ভাষণ দিতে যেতাম। রায়সাহেব পণ্ডিত গোপালদাস আর্যসমাজের এক শ্রদ্ধাশীল ভক্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁর সরকারপ্রীতির জন্য আমি তাঁকে ঘৃণা করতাম। জালৌনের ডিসপেনসারির ডাক্তার সেখানকার আর্যসমাজের কাজে অনেকটা অংশ গ্রহণ করতেন। সরকারের চাকর হওয়ায় তাঁর অসহায়তার কথা আমি জানতাম। তাই তার সঙ্গে আমার বেশ জমত। সেখানকার আর্যসমাজের সভায় স্থানীয় পাদ্রী জনসন (দর্য়াব সিংহ) সমস্যার সমাধানের জন্য আসত। আমার বিশেষ প্রতিভা ছিল সমস্যা সমাধানে যা সবাইকে মানতে হত। কয়েক বছর পরে পাদ্রী জনসন একমা থেকে বদলী হয়ে গেল। তার সঙ্গে আমার খুব ভালবাসা ও মেলামেশা ছিল। আমাদের ব্যবহার ছিল প্রগাঢ় বন্ধুত্বপূর্ণ। সেই সময়টা ছিল হিন্দুসভার ক্ষমতার যুগ। এই সভা যথেষ্ট খ্যাতিও অর্জন করেছিল। বস্তুত, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে

যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করায় এবং হিন্দুসভার প্রতিপত্তির যুগে যে লোক মানুষকে খ্রীষ্টান বানায় তার প্রতি সহানুভূতির আশা করা যেত না। পরে মিশনের কাছে আর কোনো টাকা-পয়সা ছিল না এবং পাদ্রী জনসনকে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা করে অত্যন্ত কষ্টেসৃষ্টে দিন কাটাতে হত। তার সেই অবস্থার সঙ্গে আমি যখন তাঁর জালৌনের অবস্থার তুলনা করতাম তখন আমার বড় দুঃখ হত। কাশীতেও মেথডিস্ট মিশনের এক পাদ্রী থাকতেন। তার সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। বিতর্কের সময় আমরা পরস্পরের কঠিন থেকে কঠিনতর সমালোচনা করতাম। সেই আমরাই যখন তাকে বিনা শুদ্ধিতে আমাদের সঙ্গে বসিয়ে ডাল-রুটি খাওয়াতাম, তখন প্রথম দিকে এর অর্থ বোঝা তার পক্ষে কঠিন হত।

ধৌলপুরে আর্যসমাজের মন্দির ভেঙে রাজা ঘোড়ার আস্তাবল বানিয়েছিল। তার খবর যখন বাইরের আর্যসমাজীদের কাছে পৌছল তখন সোরগোল বেধে গেল। সত্যাগ্রহের প্রস্তুতি শুরু হল। অনেক আর্য সমাজী ধৌলপুর পৌছে গেল। তাদের মধ্যে আমি এবং ভাইসাহেবও ছিলাম। পরে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ মাঝখানে পড়ায় একটা বোঝাপড়া হয়ে যায়।

১৯১৭ শেষ হয়ে যাচ্ছিল। তখন একদিন স্বামী ব্রহ্মানন্দজী প্রস্তাব করলেন এবং আমিও হালকা মেজাজে পরসায় একটা পোস্টকার্ড লিখে দিলাম। তৃতীয় অথবা চতুর্থ দিন মোহন্তজীর তার এল—জরিপের কাজে মঠের জমিদারির দেখাশোনা করার জন্য তোমাকে খুব দরকার। অবিলম্বে চলে এস। সম্ভবত তারের সঙ্গে কিছু টাকাও ছিল। আমি তো কুশল প্রশ্ন করে এবং বরদরাজের কাছে কিছু জানতে চেয়ে চিঠি লিখেছিলাম। ভাবিনি এরকম হতে পারে। স্বামীজী জোর করতে লাগলেন—যাও। আমি বললাম, আমি আর্যসমাজী, এখন বৈষ্ণব মঠের সঙ্গে সম্পর্ক কি? তিনি জোর করতে লাগলেন, আমি অটল রইলাম। এরই মধ্যে মোহন্তজীর বিস্তারিত চিঠি এল। এতদিন আমার কোনো খবর না পেয়ে তিনি খুব চিন্তায় আছেন। বৃদ্ধ হয়েছেন, তিনি এখন স্বল্পকালের অতিথি মাত্র। যদি মঠের সম্পত্তি এখন না সামলাই, তবে এর খেসারত তোমাকেও দিতে হবে, ইত্যাদি। এই চিঠি তাঁর অক্ষমতা ও সহায়তার জন্য করুণ আহ্বানে ভরা ছিল। এবার যখন ব্রহ্মানন্দজী জোর করলেন, তখন তা ব্যর্থ হল না। মঠের সম্পত্তি রক্ষা ও বৃদ্ধ মোহন্তজীর কিছুটা সহায়তা করায় আপত্তি কিসের—একথা ভেবে আমি পরসা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম।

ট্রেনে উঠে মাথায় এল যে, বৈরাগী বেশে যেতে হবে। দ্বিধা হতে লাগল। কিন্তু এখন তো পা বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। রাস্তায় কোথাও কণ্ঠী নিয়ে গলায় বাঁধলাম এবং মাথা ও মুখ কামিয়ে বানারস হয়ে পরসা পৌছলাম। ঐ সময় পরসা, বাহ্‌রৌলী ও জানকীনগরে জরিপের কাজ চলছিল—কোথাও গর্ত বোজানো হচ্ছিল, কোথাও যাচাই করা হচ্ছিল। জরিপের আমিন আলাদাভাবে নিজের আয়ের জন্য কাগজে মিথ্যা বিবরণ ঢুকিয়ে দিচ্ছিল। আর মঠের দেওয়ান-পাটোয়ারি আলাদা। মঠের সবচেয়ে বড় গ্রাম—বহরৌলীতে অনেক আপত্তিপত্র পড়েছিল। কিষাণরা গোঁ ধরেছিল, মোহন্তজীও ঘাবড়ে ছিলেন। আমি পৌছনোতে তিনি ভারী খুশী হলেন। শীত শুরু হচ্ছিল। মোহন্তজী ফ্লানেলের চৌবন্দী তৈরী করার প্রস্তাব দিলেন। আমি মোটিয়া (খদ্দরের) মেরজাইয়ের কথা বললাম। মোহন্তজী বললেন, এরকম করলে আমার বদনাম হবে। লোক বলবে, আমি কঞ্জুষ। তাই আমি আমার প্রধান শিষ্যকে মোটিয়ার কাপড় পরাচ্ছি। শেষ পর্যন্ত সমঝোতা হল, স্বদেশী পশমের হবে। মোটা মেরজাইও আমি আলাদা বানিয়ে নিলাম। শৌখিনতা, চাকর-বাকরদের সঙ্গে ব্যবহারের আদব কায়দা সব পালটে গিয়েছিল। যখন জমিদারির গ্রামে পৌছলাম তখন আমি বলে দিলাম যে এক ছটাক তরকারি অথবা এক আজলা দুধও বিনা পয়সায় নেওয়া হবে না। এতে চাকরদের চেয়েও বেশি বিস্মিত

হল ও আপত্তি করল প্রজারা। তারা বলতে লাগল—আপনি সাধু মহাত্মা। আমি উত্তর দিলাম—ঠিক, যখন আমি সাধু মহাত্মা হিসেবে আসব, তখন আমার পানভোজনের জিনিষ বিনা পয়সায় নিতে আপত্তি হবে না। এখন তো আমি এসেছি তোমাদের জমিদার হয়ে।"

জরিপের কাগজ যখন আমার হাতে এল, তখন তো তা আমার কাছে নতুন জিনিষ এবং বিবাদ ও পুরনো জরিপের বিপুল সংখ্যা দেখে আমার মাথা ঘুরে গেল। কিন্তু তখন আর কোনো উপায় ছিল না। কাগজ দেখতে শুরু করলাম। মঠের দেওয়ান ও গ্রামেব পাটোওয়ারী আমাকে কাগজ পত্র বুঝিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে ঐ কাগজপত্রের জঙ্গলে ফাঁসিয়ে দেওয়ার জন্য বেশি উদগ্রীব ছিল। পুরনো জরিপের কাগজের সঙ্গে নয়া কাগজ মিলিয়ে দেখতে শুরু করলাম। যে সব খেত নিয়ে ঝগড়া হচ্ছিল তা নিয়ে খোঁজখবর নিতে শুরু করলাম এবং মঠের তরফ থেকে যে সব মিথ্যা আপত্তি করা হয়েছিল, তা যখন তুলে নিতে শুরু করলাম, তখন মঠের আমলারা মোহন্তজীর কাছে ছুটে গিয়ে বলল—পূজারীজী তো হাজার হাজার টাকার সম্পত্তি জলে ফেলে দিতে চাচ্ছেন। কিন্তু আমাদের আপত্তি তুলে নেওয়ার পর প্রজারাও তাদের মিথ্যা আপত্তি তুলে নিতে শুরু করল। আমি তা দেখিয়ে বললাম যে মিথ্যা আপত্তি করে আমাদের বেশী লাভ হবে না। মোহন্তজী আমলাদের আমার কাছেই এসে সব মিটিয়ে ফেলতে বলেছিলেন। দেওয়ানের দেওয়া অনেক রসিদ আমি ধরে ফেললাম যা ঘুষ নিয়ে খেতের ওপর প্রজাদের অধিকার প্রমাণ করার জন্য লেখা হয়েছিল। এই ধরনের একটা রসিদ এক জোলা ডেপুটির সামনে পেশ করেছিল। দেওয়ান তা প্রথমে পাটওয়ারীর নামে লিখিয়েছিল। আমি তা জাল বলে রসিদকে হেপাজতে রাখতে বললাম। ডেপুটি আমার ব্যবহার দেখে বুঝে গিয়েছিলেন যে আমি আমার সব শক্তি দিয়ে যা সত্য তা জানার জন্য তাঁর চেয়েও বেশী চেষ্টা করছিলাম। তাই তিনি আমার কথা খুব বিশ্বাস করতেন। যখন রসিদ হেপাজতে রাখা হল এবং জাল রসিদের ওপর মোকদ্দমা চালানোর উপক্রম হল, তখন বৃদ্ধ প্রজা আমার কাছে দৌড়ে এল এবং তার জোয়ান ছেলেকে খুব ধিক্কার দিতে দিতে খুব মিনতি করতে লাগল। আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। দ্বিতীয় ঘটনা ছিল বহরৌলীর পলক ওঝার। তিনি টাকা দিয়ে জরিপের সময় মালিকের পতিত জমির শিশুগাছের বন নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছিলেন। শিশু খুচরা গাছ। আর জমি মালিকেরই ছিল। অতএব তা পলক ওঝার কি করে হতে পারে? আমি আপত্তি করলাম। ডেপুটি আমার কথার ঔচিত্যকে স্বীকার করে নিলেন। কিন্তু এদিকে আপত্তি করেছিল এমন অনেক লোক আমার পক্ষে রায় দিতে দিতে এখন তারা দুয়েকটা রায় প্রজাদের পক্ষে দিতে চেয়েছিল। তাদের সেই সব আপত্তির কথা মনে হয়নি যা আমি ফেরৎ নিয়েছিলাম। যাহোক, তারা মালিকের পতিত জমির খুচরো গাছের কাঠের অর্ধেক প্রজার নামে লিখিয়েছিল। আমি পলক ওঝাকে বোঝাবার অনেক চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু তিনি 'ঘরের লক্ষ্মীকে' ফিরিয়ে দিতে রাজী ছিলেন না। আমি তার কাগজ আবার দেখতে শুরু করলাম। দেখলাম পুরনো খাজনায় পুরনো জমির আয়তন থেকে আধা একর বেশী জমি বর্তমান জরিপের সময় তার নামে লেখা হয়েছে। আমি সেই বড় আয়তনের জমিকে পুরনো জমাবন্দি থেকে আলাদা করে নতুন খাজনা স্থির করার জন্য চাপ দিলাম। ডেপুটি তা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন কারণ পলক ওঝার কাছে কাগজ ছিল না। এইভাবে শিশুগাছের কাঠ ততটা পাননি, যতটা বার্ষিক খাজনা তার মাথায় চেপে গেল। বস্তুত আধা একর বাড়তি জমি মালিকে তাকে দিয়েছিল ভাল জমির বদলে। কিন্তু এই সব যে আপোষে হয়েছিল, পলক ওঝার কাছে তাঁর কোনো প্রমাণ ছিল না। বহরৌলীর হাজার একরের বেশী জমি শত শত প্রজার হাতে গিয়েছিল। কিন্তু এটাই ছিল একমাত্র মামলা যাতে আমি পলক

ওঝাব প্রতি অন্যায় করেছিলাম। অবশ্য তার কারণ সে নিজেই। যদি শিশুগাছের ওপর মিথ্যা দাবি না করত, তাহলে আমারও জেদ হত না।

যে সময়ে বহরৌলীতে জরিপের কাজ চলছিল, তখন কঠিন ইনফ্লুয়েঞ্জাও চলছিল। এক কোইরী ভগতের কথা আমার মনে পড়ে। সে নিরক্ষর মেহনতী কিষাণ ছিল। কারো সঙ্গে মেলামেশা করে সে রাধাস্বামী মতবাদ মেনে নিয়েছিল বলে আমার মনে হয়েছিল। আমি তার সঙ্গে রাধাস্বামী মত সম্পর্কে কথাবার্তা বলতাম। আগ্রা ও লাহোর থাকাকালীন এবিষয়ে আমি যা জেনেছিলাম, তা কোইরী ভগত কি করে জানবে? সে সোৎসাহে আমার কথা শুনত এবং আমিও তার কাছ থেকে রাধাস্বামী মতের কিছু ভজন শুনতাম। জরিপের ক্যাম্পে এক শনিবার আমি তাকে দেখেছিলাম। আর সোমবার জানতে পারলাম যে সে মরে গেছে। প্রচণ্ড আঁধিতে যেমন আম মাটিতে পড়ে, ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগও তেমনি মানুষের মৃতদেহ ধরিত্রীকে ছেয়ে ফেলেছিল। লোকজন অনেক নদী সম্পর্কেও বলত যে তাতে মানুষের শব এত বেশী ছিল যে নভচর-জলচর প্রাণীও তা খেত না। জলে মানুষের দেহের চর্বি তেলের মতো ভাসত।

পরসাতে মোহন্তজী জ্যোতিষীদের জন্ম পত্রিকা দেখাচ্ছিলেন। বলছিলেন—"এখন আমার বাঁচা মরার কথা বলা যায় না। রাম উদারের নাম লিখে পড়ে দিতে হবে।" আমি মোহন্তজীকে স্পষ্ট করে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে আমি কিছুতেই মোহন্ত হব না। আমি মঠের সম্পত্তি রক্ষার জন্য এসেছি। আমাকে পড়াশোনা এবং দেশের কাজ করতে হবে। মোহন্ত যদি আপনাকে বানাতেই হয়, তবে আপনি বরদরাজকে বানান। তিনি অন্যান্য শিষ্যদের মধ্যে সবচেয়ে উপযুক্তও।

বহরৌলীর কাজ শেষ হতেই আমি যাওয়ার অনুমতি চাইলাম। কলকাতার বেদ-মধ্যমা পরীক্ষার ফর্ম আমি কাশীতেই ভর্তি করেছিলাম। তা তিনি জানতেন। আর আমার পড়াশোনায় তিনি বাধাও দিতে চাননি। তাই তিনি আমাকে আটকাননি। বেদ মধ্যমা পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আমি কাশীর এক ছাত্র হরদত্তকে উৎসাহিত করেছিলাম। সে অনেক বছর ধরে গুরুকুল কাংড়ীতে পড়ছিল। তাকে পড়ানোর সময় আমার নিজের পরীক্ষার জন্যও প্রস্তুতি হয়েই যেত। তাই হরদত্ত আমার নামে এবং আমি অন্য কোনো গুরুর নামে জব্বলপুর কেন্দ্র থেকে পরীক্ষার ফর্ম ভর্তি করেছিলাম। জব্বলপুর রওনা হওয়ার সময় একদিন আগে পাথেয় হিসেবে মিষ্টি পাউরুটি বানাতে চেষ্টা করলাম। মিষ্টি পাউরুটি তো হল না, হয়ে গেল মিষ্টি পরোটা। আমরা জব্বলপুর গিয়ে পরীক্ষা দিলাম। দুজনেই পাস করলাম। আমি প্রথম শ্রেণীতে এবং সম্ভবত হরদত্তও প্রথম শ্রেণীতেই।

পরসাকে আবার ভুলে গেলাম। আমি কাশীতে পড়ার আর পড়ানোর কাজে লেগে গেলাম। ১৯১৮-এর প্রথম পাদে কাট-ছাঁট হয়ে রুশ শ্রমিক বিপ্লবের অনেক খবরই আমার কানে এসেছিল। কাশীতে উর্দু-হিন্দি-ইংরেজী খবরের কাগজ মিলত এবং তিন লাইনের রাশিয়া সম্পর্কিত খবরও আমাকে চিন্তার অনেক খোরাক জোগাত। আমি এই সব উড়ো খবর এবং মাঝে মাঝে সংবাদে শোনা সাম্যবাদ সম্পর্কে অনেক বিকৃত খবর আমার বুদ্ধি দিয়ে শুধরে নিয়ে এক সাম্যবাদী জগতের কল্পনা করতে শুরু করলাম। ১৯১৮-এর প্রথম মাসগুলিতেই আমি এ বিষয়ে একটা বই লিখতে চেয়েছিলাম এবং তার ছকও তৈরি করে ফেলেছিলাম। কিন্তু বিদ্যালয় বন্ধ করার পর এই ছক আমার নোটবইয়ের সঙ্গে যাগেশের কাছে ছিল। তারপর তা হারিয়ে যায়। এই বইকেই ১৯২২-এ আমি অন্যভাবে সংস্কৃত পদ্যে লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তাও কয়েক সর্গ পর্যন্তই লেখা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত এই বই 'বাইসবী সদী' নামে ১৯২৩-২৪ খ্রীষ্টাব্দে হাজারীবাগ জেলে শেষ হয়েছিল।

মহেশপুরাতেই বিদ্যালয়ের রূপ দেখে মনে হয়নি ভবিষ্যতে উন্নতি হতে পারে। কাল্পীতে আমরা সুদিনের আশায় ছিলাম। কিন্তু এখানেও অবস্থা শোধরায়নি। আর্থিক অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছিল। শ্রীপান্নালালেরই দান স্থায়ী ছিল। অন্য কোনো দিক থেকে আমরা কোনো উৎসাহ পাইনি। দালানে আমরা প্রথম বৈঠকখানার দখল ছেড়ে দিলাম। পরে দোতলার ঘরের অর্ধেকটা ছেড়ে দিলাম। পাচককে জবাব দিলাম এবং আমরা নিজেরাই পালা করে রান্না করতে লাগলাম। খাবার কম হতে হতে যব-ছোলা রুটি এবং ডাল অথবা আলুর তরকারির মধ্যে একটা বানাতাম। দুপুরের খাবার থেকেই রাত্রির জন্য কিছুটা রেখে দিতাম। নিজের জন্য আমার তো কোনো চিন্তা ছিল না কেননা ঘুরে বেড়ানোর সময় আমি এর চেয়েও অনেক খারাপ খানা খেয়েছি। কিন্তু আমার বন্ধু মুকুন্দরাম ও যশওয়ন্তকে রুটির টুকরা গ্লাসের জলে ভিজিয়ে গলাধঃকরণ করতে দেখে কখনো কখনো মনে বড় ধাক্কা লাগত, যদিও আমি বরাবর সব বিষয়ে সমান ভাগ নিয়ে তাদের উৎসাহিত করতে চেষ্টা করতাম। রামসহায়জী কাল্পী আসার কিছু আগে চলে গিয়েছিলেন এবং যুবক সন্ন্যাসী স্বামী তারও আগে গিয়েছিল। যশওয়ন্তের জন্য চিঠির পর চিঠি আসছিল। সে এখানে ফিরে আসার দৃঢ় ইচ্ছা জানিয়ে বাড়ি গেল। কিন্তু সে আর ফিরে আসতে পারেনি। এখন এখানে তিন-চারজন টিকে ছিল।

পড়ানো ছাড়া আমাকে কখনো কখনো প্রচারের জন্য বাইরেও (বেশীরভাগ জালৌন জেলার ভেতরই) যেতে হত। দাতাদের খুশী করার জন্য কখনো কখনো বরযাত্রীর মিছিলেও যেতে হত। একবারের কাহিনী মনে আছে। বরযাত্রীর মিছিল কয়েক মাইল দূরে গিয়েছিল। আমাদের রেলগাড়িতে যেতে হয়েছিল। আমার সঙ্গে বিদ্যালয়ের ভজন গায়করাও ছিল। সেখানে গিয়ে জানতে পারলাম কন্যাপক্ষ আলাদাভাবে বেশ্যার (বেড়িনী) নাচের ব্যবস্থা করেছে। আমরা সংযমবাদী, আমাদের পক্ষে এখানে থাকা মুশকিল। কিন্তু চলে আসার অর্থ হল ভজন-মণ্ডলীর যে টাকা মিলত তার ক্ষতি। ভজন মণ্ডলীকে প্রতি মাসে আমাদের চল্লিশ টাকা দিতে হতো। অথচ আমি নাচেই বা কি করে যাই? যেখানে আমরা ছিলাম সেখান থেকে বেশ্যার গান শোনা যেতো। সে একটা স্থানীয় ভজন (হয়তো লেদ) গাইছিল যার রাগ আমার ভাল লেগেছিল। জনসংগীতের প্রতি আমার প্রীতি বেড়ে যাচ্ছিল। তার কারণ হয়তো রাজনৈতিক চেতনা ও সাম্যবাদের প্রতি আমার ক্রমবর্ধমান রুচি। সেই গ্রামে আজমগড় জেলার একটি ছেলে থাকতো। যদিও যে প্রদেশে আমার জন্ম হয়েছে আমি সেখানেই ছিলাম তবু জন্ম-জেলার সঙ্গে আরো কাছাকাছি সম্পর্ক। তাই যখন আমি শুনলাম যে যুবকের গ্রাম মন্দুরীর কাছে, তখন আমি এক আজব ধরনের টান অনুভব করলাম। সেও দুনিয়াদারীতে অনভিজ্ঞ, তার মেজাজও ভ্রমণ পিপাসু। জ্যোতিষীতে তার কিছু পয়সা আসে। সুন্দর পাগড়ী, শিকারের যোধপুরী পাতলুন, কোট, বুট পরে সে খুব ঠাটবাটের সঙ্গে থাকত। অল্পবিস্তর সংগীতেরও সখ ছিল, ঘরে হারমোনিয়মও ছিল। উপার্জন ও ওড়ানো এই ছিল তার আদর্শ।

জালৌন আর্যসমাজের বার্ষিক উৎসবে ইন্দ্রবর্মাও যোগ দিয়েছিলেন। এক বছর কিংবা দুই বছর আগে তার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। কিন্তু আমি তাঁকে স্বাভাবিক বক্তা মনে করতাম। বিশালদেহের সঙ্গে তাঁর গভীর গর্জনের বিশেষত্ব ছিল। কিন্তু যখন তিনি নিজের বিষয়ের সজীব চিত্রের বর্ণনা করতেন, তখন জনতাকে কাঁদানো, হাসানো তার 'বাঁ হাতের খেলা' ছিল। এখন হালে তিনি মহোবাতে কিছু ভাষণ দিয়েছিলেন যাতে সনাতনী ও খ্রীষ্টানদের মতের কিছুটা খণ্ডনও করেছিলেন। সনাতনীরা শাস্ত্রীয় বিতর্ক করার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর ছিল। বিতর্কের নিয়মকানুন স্থির করার জন্য লেখাপড়া হচ্ছিল। ইন্দ্রবর্মা বিতর্ক-আলোচনায় এবং সংস্কৃতে আমার যোগ্যতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তাই তার ইচ্ছা ছিল যে আমি যেন তাঁর

সঙ্গে অবশ্যই মহোবা যাই। মহোবার ঐতিহাসিক নাম গৌরবময় ছিল। কিন্তু তার চেয়েও বড় আকর্ষণ ছিল পাদ্রী জ্বালাসিংহের সঙ্গে বিতর্কের সুযোগ। আমিও তাঁর সঙ্গে মহোবা গেলাম।

"সনাতনীধর্মীরা শাস্ত্রীয় বিতর্ক নিয়ে বিরোধ শুরু করছিল—" সংস্কৃততেই শাস্ত্রীয় বিতর্ক হওয়া উচিত। আমরা বললাম—"তাহলে জনতা কি হাঁদার মতো বসে থাকবে? সংস্কৃত ও হিন্দি এই দুই ভাষাতেই শাস্ত্রীয় বিতর্ক হোক" ইত্যাদি, ইত্যাদি। খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে যে আক্রমণ করা হয়েছিল, তার জবাব দেওয়ার জন্য তারা পাদ্রী জ্বালাসিংহকে ডেকে এনেছিল। সন্ধ্যায় আলো জ্বলার পর খোলা জায়গায় পাদ্রী জ্বালাসিংহের ভাষণ হল। ভাষণের পর তিনি প্রশ্ন আহ্বান করলেন। আমি প্রশ্ন করতে শুরু করলাম। প্রশ্ন করার সময় মুসাফির বিদ্যালয়ে শোনা স্বামী দর্শনানন্দের প্রতিদ্বন্দ্বী শাস্ত্রী জ্বালাসিংহের প্রতাপ আমাকে প্রভাবিত করেছিল কিন্তু দুয়েকবার প্রশ্নোত্তরের পরেই সেই প্রতাপ কেটে যেতে লাগল। আমি ছিদ্রান্বেষণের দৃষ্টিতে ভাল করে বাইবেল পড়েছিলাম। তার পুরানো ভাগের ওপর আমার কাছে বিপজ্জনক নোট ছিল। আমি প্রশ্ন করতে শুরু করলাম। পাদ্রী সাহেব একটারও জবাব দিতে পারলেন না। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে আমি আরো তিনটি নতুন প্রশ্ন করে বসলাম। ধীরে ধীরে জনতা বুঝতে পারল যে পাদ্রী জবাব দিতে পারছেন না। পাদ্রী বিতর্কের ক্ষমতার জন্য খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন এবং যথেষ্ট বেতন পেতেন। এক ছোকরার এই ধরনের আক্রমণে নিজের প্রতিষ্ঠাকে ধূলায় মিলিয়ে যেতে দেখে তিনি তা সহ্য করতে পারলেন না। আর আমি সত্যি আমার কানকে বিশ্বাস করতে পারিনি যখন পাদ্রী সাহেব ক্রুদ্ধ হয়ে এসে নিজের সত্যের ওপরে জোর দিয়ে বলে উঠলেন—"যদি আমি ভুল করে থাকি, তবে হুকার জল খাইয়ে আমাকে পাঁচ জুতা মার।" পাদ্রী জ্বালাসিংহের যে চিত্র আমার স্মৃতির পরদায় আঁকা ছিল, তা আজ চুরমার হয়ে গেল। দ্বিতীয় দিন আবার আলোচনার সময় ঘোষণা করে সভা শেষ হল।

সকালে ইন্দ্রবর্মার মিশন হাসপাতালে ওষুধ নেওয়ার কথা ছিল। সেই উপলক্ষে আমরা দুজন আমেরিকান পাদ্রীর বাংলোয় গিয়েছিলাম। পাদ্রী জ্বালাসিংহও সেখানে ছিলেন। তিনি খুব অমায়িকভাবে আমাকে গ্রহণ করলেন। আমার মনেই হল না যে রাত্রিতে আমরা দুজন ঐ রকমভাবে পরস্পরকে আক্রমণ করছিলাম। আমি তো ধর্মীয় বাদ-প্রতিবাদ ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের ব্যাপারে নিজের জন্য একটা মাপকাঠি নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলাম, কিন্তু বৃদ্ধ পাদ্রী জ্বালাসিংহের শিষ্টাচার দেখে আমার খুব ভাল লাগল। আমেরিকান পাদ্রীর মেম ডাক্তার ছিলেন। তিনি ইন্দ্রবর্মার জন্য ওষুধ লিখে সেই কম্পাউণ্ডারকে দেওয়ার জন্য আমার হাতে দিলেন। দরজা পেরিয়েই ইন্দ্রবর্মা কৌতূহল বশতঃ বললেন, "একটু পড়ুন তো"। আমি চিঠিটা খুললাম। মেম দেখছিলেন। তিনি রেগে বললেন—"এই চিঠি তোমার জন্য নয়।" আমি লজ্জিত হয়ে গেলাম। য়ুরোপীয় শিষ্টাচারে অনভিজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ বুদ্ধিতেও আমি আমার কাজকে অনুচিত বলে বুঝতে পেরেছিলাম। ইন্দ্রবর্মা এই কথাকে সঠিক বলে মনে করেননি। ওষুধের জন্য লেখা কাগজে এমন কি গোপনীয় কথা থাকতে পারে? সেই দিন রাত্রিতে বৃষ্টি হতে লাগল। সেই জন্য বিতর্কের স্থান মহোবার বিশাল গিরিজা হলে স্থির করা হয়েছিল। সারা হল মানুষে ভরে গিয়েছিল। তার মধ্যে অনেক খ্রীষ্টান মহিলাও ছিলেন। আলোচনা শুরু করার মুহূর্তে পাদ্রী জ্বালাসিংহ মহিলাদের দিকে লক্ষ্য করে বললেন—'বিতর্ক ও আলোচনার কারো মুখ থেকে অনুচিত শব্দ বেরিয়ে আসতে পারে। তাই মেয়েরা যদি এখানে থাকাটা অপছন্দ করেন, তাহলে ভালই হয়।'

ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতারই পাঠ আমি প্রথমে বেশি পেয়েছিলাম। কিন্তু এখানকার দু-তিন বছরের আদর্শবাদী শিক্ষা ভেতরে ভেতরে তার যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। পাদ্রী সাহেবের এই

কথা আমার কানে তীরের মতো বিধল। এই জন্য নয় যে এই কথা মিথ্যা। আর্যসমাজী উপদেষ্টাদের মধ্যেও এই ধরনের লোকের সংখ্যা যথেষ্ট ছিল, যাদের কাছে অশ্লীলতার মর্যাদাকে অতিক্রম করা সাধারণ কথা ছিল। কিন্তু আমার সম্পর্কেও এই রকম ধারণা থাকবে, এ কথা আমার পক্ষে অসহ্য ছিল। আমি মাথা ঠাণ্ডা রেখে বললাম;—আমাদের পক্ষে এটা বড় লজ্জার কথা হবে, যদি আমাদের মা-বোনদের সামনেও আমাদের জিভকে সংযত রাখতে না পারি। আমার এই আশা আছে যে মহিলাদের এই সভা থেকে চলে যাওয়ার প্রয়োজন হবে না। যুবক প্রতিদ্বন্দ্বী মনের কথা বলছিল।

শাস্ত্রীয় বিতর্ক শোনার সুযোগ পেয়ে মহিলারা সবচেয়ে বেশী খুশী হলেন। দু-তিন ঘন্টা বিতর্ক চলল আমাদের দুজনের মধ্যে। যদিও গতকালের মতো "হুঁকার জল ও পাঁচ জুতা"র আজ দরকার পড়েনি, তবু আমি আমার গতকালের সফলতাকে আজও বজায় রাখতে পেরেছিলাম।

দু-তিন দিন পরে সনাতনীদের সঙ্গেও শাস্ত্রীয় বিতর্ক হল। সনাতন ধর্মের পক্ষে সম্ভবত পণ্ডিত অখিলানন্দ ও আর্যসমাজের পক্ষে যুক্তপ্রান্তের প্রতিনিধি সভার কোনো উপদেষ্টা ছিলেন। শাস্ত্রীয় বিতর্কে যে তথ্য ব্যবহার করা হয়েছিল, তাতে বিশেষভাবে আমার হাত ছিল এবং শাস্ত্রীয় আলোচনাকে পুস্তকের আকার ও সম্পাদনার কাজ ঝাঁসিতে লালা লদ্ধারামের বাড়িতে থেকে আমাকেই করতে হয়েছিল।

কাল্পীতে ফিরে আবার বিদ্যালয়ের দুর্বল নৌকা চালানোর চেষ্টা করতে লাগলাম। এই রকম আমি নিয়মিত হোম যজ্ঞ করার সঙ্গে সারা বছর শুধুমাত্র সংস্কৃতে কথা বলার প্রতিজ্ঞা করলাম। যদি এই প্রতিজ্ঞার অর্থ (৩৬০ X ২৪) ঘন্টা নিদ্রা হয়ে থাকে তবে তা অবশ্যই সম্পূর্ণ হয়েছিল। নয়তো এটা সেই সব প্রতিজ্ঞার মধ্যে ছিল যা মানুষ ভাঙার জন্যই করে থাকে।

তিনজনকে নিয়ে বিদ্যালয়ের নামে নিজের সময় নষ্ট করা আমার ভাল লাগেনি। ধীরে ধীরে ভাই সাহেবও আমার সঙ্গে একমত হলেন। ঠিক হল যে বিদ্যালয় বন্ধ করে আমি আবার আমার পড়া শুরু করবো। স্বামী ব্রহ্মানন্দও শ্রীপান্নালালজীর কাছে এই ব্যবস্থা দুঃখজনক মনে হয়েছিল। সত্যি কাল্পী স্টেশনে বিদায় নেওয়ার সময় আমার মন ভারী হয়ে গিয়েছিল।

৭

দ্বিগুণ ধর্ম (১৯১৮-১৯১৯)

স্থির করলাম, এই বছর আমি শাস্ত্রী পরীক্ষায় বসবো। কানপুরের এক সংস্কৃত পাঠশালায় গেলাম। এ সময় সেখানে পণ্ডিত শশীনাথ ঝা পড়াতেন। কিন্তু সেখানে শাস্ত্রী পরীক্ষার সব পাঠ্যপুস্তক পড়ানোর ব্যবস্থা ছিল না। বেনারসে কনৈলার কোনো মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ার ভয় ছিল। এই অবস্থায় আমাকে অযোধ্যা যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হলো। আবার আমাকে আর্যসমাজের নিরাকার পোষাকের বদলে সাকার বৈরাগী সাজতে হল। পণ্ডিত

বল্লভাশরণ আমি এসেছি শুনে সানন্দে তাঁর স্থানে আমাকে জায়গা দিলেন। ন্যায়, বাৎসায়ন- ভাষ্য, নিরুক্ত, ঋগ্বেদ সায়ণ-ভাষ্যের ভূমিকা, নৈষধ ও সিদ্ধান্ত কৌমুদীর শেষের কিছু অংশ বিশেষভাবে পড়ার প্রয়োজন ছিল। নৈষধ পড়ানোর জন্য পণ্ডিত সূর্যনারায়ণ শুক্লাকে পেয়ে গেলাম। তখন তিনি ব্যাকরণাচার্য হয়ে রাজগোপাল পাঠশালায় পড়াতেন এবং ন্যায়াচার্য পরীক্ষায় বসছিলেন। যুবক হওয়া সত্ত্বেও অযোধ্যায় তাঁর প্রতিভার খ্যাতি ছিল। তাঁকে ঐ সময় কৃশ, দুর্বল ও দীর্ঘকায় মনে হত। মীমাংসা শাস্ত্রের সঙ্গে ঋগ্বেদ-সায়ণ ভাষ্যের ভূমিকার অনেকাংশের সম্বন্ধ আছে। তার জন্য মহীশূরের এক দ্রাবিড়-বেদান্তী পণ্ডিত মিলে গেল, যিনি আমাদের এই বেদান্ত-পাঠশালায় অধ্যাপক হয়ে এসেছিলেন এবং যিনি এখন বড় জায়গার হাতে চলে গেছেন। তিনিও তাঁর বিষয়ে বড় বিদ্বান ছিলেন এবং তিনি খুব উৎসাহ নিয়ে আমাকে পড়াতেন। সিদ্ধান্ত কৌমুদীর পণ্ডিত সরযূদাসজীও ছিলেন। কিন্তু নিরুক্ত ও ন্যায়শাস্ত্রের জন্য বড় অসুবিধা দেখা দিল। অনেক খোঁজ করার পর গোলাঘাটে এক ব্রহ্মচারীকে পাওয়া গেল। তিনি কাশীর ন্যায়োপাধ্যায় (ন্যায়াচার্য) ছিলেন। কিন্তু নব্যন্যায়ের পড়াশোনা তিনি অনেক দিন ছেড়ে দিয়েছিলেন। প্রাচীন ন্যায়ের পঠন-পাঠন প্রণালী কয়েক শতক ধরে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাই এই সময় তা পড়ানোর লোক বেনারসেও পাওয়া যেত না, অযোধ্যার মতো ছোট শহরের কথা তো ওঠেই না। ব্রহ্মচারীজী শুধু সেটুকুই শেখাতে পারতেন যা আমি নিজেই পুস্তকের সাহায্যে শিখতে পারতাম। ব্রহ্মচারী এখন গৃহস্থ। তাঁর গুরু ছিলেন এক অতিবৃদ্ধ ব্রহ্মচারী যার কোনো এক সময়ে স্বামী দয়ানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়েছিল এবং কিছু দিনের জন্য তারা একসঙ্গে ভ্রমণ করেছিলেন। সেই সময় স্বামী দয়ানন্দ ততটা খ্যাতিলাভ করেননি। মতভেদ সত্ত্বেও ব্রহ্মচারী স্বামী দয়ানন্দের খুব প্রশংসা করতেন। নিরুক্ত পড়ানোর লোক পাওয়া আরো বেশী মুস্কিলের ব্যাপার ছিল। অনেক পরে যখন আমার অযোধ্যা ছেড়ে যাওয়ার কথা, তখন ব্রহ্মচারী ভগবদ্দাসের নাম জানতে পারলাম। তিনি বেদতীর্থ হয়েছিলেন এবং এখন বড় জায়গার মোহন্তের শিষ্য হয়ে এই নামে থাকতেন। ব্রহ্মচারী ভগবদ্দাসজীর ক্ষীণ দুর্বল শ্যামবর্ণ চেহারা আমার আজও মনে আছে। ১৯১৪-তে প্রথমে দিব্যদেশের বেদান্ত পাঠশালায় তাঁকে প্রথম দেখি। কীভাবে তিনি ধার-করা কণ্ঠী পরে ও আনাড়ী হাতে সাদা রেখায় ১০১ নম্বর মাথায় এঁকে প্রায় অনুপস্থিত গোঁফ সহ বৈরাগীর বেশ নিয়ে নিজেকে পাঞ্জাবের এক বৈরাগী বলে পরিচয় দিয়েছিলেন এবং আমার সহপাঠীরা তার ওপর বৃষ্টির মতো প্রশ্ন বর্ষণ করছিল। আমিই ছিলাম একমাত্র লোক যে দেশ-কাল ইত্যাদি নামের ব্যাখ্যা করে তার সমর্থন করতে চেয়েছিলাম। ঐ সময় আর্যসমাজের সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগই ছিল না, তবু কোনো ব্যাপার ছিল যাতে এই অজানা তরুণটির প্রতি আমার সহানুভূতি হয়েছিল। ব্রহ্মচারী ভগবদ্দাস এখন পণ্ডিত, বড় মোহন্তের চেলা এবং আচার-ব্যবহারে নিঃস্নাত বৈরাগী সাধু। আমি উড়ো খবর পেয়েছিলাম যে ভেতরে ভেতরে তাঁর চিন্তাধারা আর্য সমাজী। তাই বড় জায়গার মোহন্তের উত্তরাধিকারী হয়েও তাঁর ঐ বেশভূষায় থাকাটা আমি পছন্দ করতে পারিনি। নিরুক্ত পড়ার জন্য শুধু দু'বার আমি তার ওখানে যেতে পেরেছিলাম।

অযোধ্যা থেকে কেউ পরসাতে লিখে দিয়েছিল যে আমি আজকাল সেখানে বল্লভাশরণের স্থানে আছি। তার ফল এই যে মোহন্তজীর একটি চিঠি আমার কাছে এল এবং দ্বিতীয় দীর্ঘ চিঠিটি এল পণ্ডিত বল্লভাশরণের কাছে। জরিপের সংকট ছিল। মঠের সম্পত্তি নাশের দোহাই দিয়ে পণ্ডিত বল্লভাশরণকে আমাকে পাঠিয়ে দিতে লিখেছিলেন। পড়াশোনার অসুবিধা থেকেও বোঝা যাচ্ছিল যে পরীক্ষার প্রস্তুতি লাহোর থেকেই সঠিকভাবে হতে পারবে। তাহলে পরসা গিয়ে সেখানকার কাজ খতম করে লাহোরে চলে যাই না কেন—একথা ভেবে আমি পরসা

যেতে রাজী হলাম। লকড়মণ্ডী ঘাট থেকে গাড়িতে চড়ার সময় দেখলাম পণ্ডিত সরযূদাসজীও ঐ ট্রেনেই যাচ্ছেন। তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়েছিল, তিনি তাঁর শ্রাদ্ধে যাচ্ছিলেন। মনকাপুরে গাড়ি আসতে দেরি ছিল। তাই তিনি কয়েকটা পদ্য লিখে দিতে বলেন। আমি 'মাতা মানকরী গতা হতসুখা হা হন্ত! বর্তামহে।' এই রকম কিছু পদ্য লিখে দিলাম। পরসা পৌঁছনোর পর সংস্কৃত ভাষণের প্রতিজ্ঞা ছাড়তে হল।

এবারের মামলা জানকীনগরের ছিল। মোহন্তজী তাঁর মামলা চালানোর জন্য গোরক্ষপুরের এক যুবক ব্রাহ্মণকে আমিন রেখেছিলেন। সে সত্য-মিথ্যা দু-তিন শ' আপত্তি দিয়ে রেখেছিল। প্রজারা এই অন্যায় কিভাবে বরদাস্ত করবে? প্রথমে তারা মোহন্তজীর কাছে আবেদন করেছিল। কিন্তু সেখানে দলিলপত্র বোঝার শক্তি কোথায়? রাগে লাফঝাঁপ করে দু'চারটা কটুকথা বলে তাদের তাড়িয়ে দিলেন। ফল হয়েছিল এই যে প্রজারাও জমিদারের গাছ, খেত এবং পতিত জমির ওপরে পর্যন্ত আপত্তি জানাল। আমি এসে কাগজপত্র দেখলাম। গত বছর বহরৌলীর বিরাট জঙ্গল জয় করেছি, তার সামনে জানকীনগরের ছোটমতো গ্রাম কোনো ব্যাপারই ছিল না। কাগজপত্র দেখে আমি রায়তদের ডেকে সব খবর জানালাম এবং একশ'র মধ্যে পঁচাত্তরটা আপত্তি মিথ্যা মনে হলো। আমি ডেপুটি সাহেবকে বলে সেই সব আপত্তি তুলে নিলাম। —তিনি তাজ্জব হয়ে গেলেন। এ আমি কি করছি? আমি বললাম যে মঠের আমলারা কিষাণদের কাছ থেকে টাকা উসুল করার জন্য এই সব মিথ্যা আপত্তি দিচ্ছে। আমিন সাহেব ছুটতে ছুটতে পরসা গেলেন। মোহন্তজী তাকে খুব ধমকালেন এবং সেখানেই ঐ কাজ থেকে তাকে জবাব দিয়ে দিলেন। আমার আপত্তি তুলে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের সমস্ত আপত্তি তুলে নেওয়া হল। আমার মনে নেই, বহরৌলীর মতো এখানে কোনো একটা আপত্তির জন্যও কোনো ঝামেলা হয়েছিল কিনা। ডেপুটি সাহেবের কাছে আমার বাক্য ছিল সত্যের কষ্টিপাথর।

এটা সেই সময় ছিল যখন চম্পারণের গান্ধীজীর কাজের চারদিকে ধূম পড়ে গিয়েছিল। জানকীনগরের কিষাণরাও যখন তখন গাড়িতে মিষ্টিআলু ভর্তি করে ধানের সঙ্গে বিনিময়ের জন্য চম্পারণ যেত। তারা এই খবর ভালোভাবেই জানত। তারা জানাতো যে কিভাবে চম্পারণের নীলের গোরাদের ইজ্জত ধূলায় মিশে গেছে। এখন সেখানে সড়কের মাঝখান দিয়ে বলদের গাড়ি চালাতে আর কেউ কিভাবে বাধা দিতে পারবে? কীভাবে সব হরি-বেগারী গান্ধী সাহেব তুলে দিয়েছেন। তবেই না আজ তিনি মহাত্মা গান্ধী হয়েছেন। সেই সময়ের অর্ধশিক্ষিতদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কর্মবীর গান্ধী নয় গান্ধী সাহেব নামেই চম্পারণ ও সারণের কিষাণরা তাঁকে জানত। জানকীনগরের কিষাণরা কাছারিতে (জমিদারের ছাউনী) বরাবরই যাতায়াত করত। রাত্রিতে তো বিশেষভাবে ভিড় হত। পূজারীজীর (আমার) ন্যায় নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল; তিনি দুধ, তরকারি পর্যন্ত পয়সা না দিয়ে নেন না; কারো কাছে থেকে এক পয়সাও ভেট-পূজা নেওয়া অন্যায় বলে মনে করেন; এমনই মিশুক যে ছোট বাচ্চাদের সঙ্গেও কথা বলেন; তিনি রায়তের স্বার্থে হাজার হাজার টাকা ঘাটতির কোনো পরোয়া না করে সব আপত্তি তুলে নিয়েছেন।

রাত্রিতে জানকীনগরে পঁওযারা গাওয়ার দল ডেকে আনা হত। কখনো 'কুঁঅর-বিজয়ী' হত। কখনো 'সোভনয়কা', কখনো 'সৌরঠী' অথবা কখনো 'লোরকাইন'। 'পূজারীজী'র এই গ্রামীণ রুচির 'শিক্ষিত'দের উপর তো অবশ্যই খারাপ প্রভাব পড়তো, কিন্তু ভাগ্য ভাল জানকীনগরে একজনও শিক্ষিত লোক ছিল না। সাধারণ জনতার কাছে বিচিত্র বলে নিশ্চয়ই মনে হত, কিন্তু একে তারা অনুচিত বলতে প্রস্তুত ছিল না। আমি দুয়েকজন ভাল গায়ককে গান্ধীজীর জীবনী শুনিয়ে তাকে ছন্দোবদ্ধ করে সৌরঠীর মতো গাওয়ার প্রেরণা দিয়েছিলাম, কিন্তু তাতে আমি

সফলতা লাভ করিনি, হয়তো তা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার ছিল এবং আমার কাছে ততটা সময় ছিল না।

পরসা মঠের সামান্য জমি মুন্নীপুর গ্রামে পড়তো। কেউই ঐ সামান্য জমির খেয়াল করেনি। তাই বিগত জরিপের সময় তা হথুয়া রাজ্যের অন্তর্গত বলে দেখানো হয়েছিল। মঠের লোকেরা হাকিম-হুকুমদের আমার কথা মেনে নিতে রাজী দেখে সেই কবর দেওয়া মড়াকেও তুলে ধরল। আমি সেই এলাকার এ্যাসিস্ট্যান্ট সেট্‌লমেন্ট অফিসারের কাছে গেলাম। তিনি মুন্‌সিফ ছিলেন। জরিপের কাজ শিখতে এসেছিলেন—সম্ভবতঃ নাম ছিল অঞ্জনী কুমার। আমার হিন্দি ছিল পরিচ্ছন্ন, বিশুদ্ধ যুক্তপ্রান্তীয় হিন্দি। বোলচালে সংকোচের নামগন্ধও ছিল না। তার ওপর হরপুর জানের গুরুকুলের কোনো উপদেষ্টার কাছ থেকে তিনি জানতে পেরেছিলেন যে আমি আর্যসমাজের মতবাদে বিশ্বাসী। তিনি ও তার মুসলমান পেশকার আবদুর রহীম দুজনেই আর্যসমাজের অনুরাগী ছিলেন। আমাকে তাঁরা খুব খাতির করলেন। কবর-দেওয়া মড়া সম্পর্কে জানা গেল যদি হথুয়া রাজের আমলারা রাজী হয় তবে বিগত জরিপের লেখা ওপরওয়ালার আদেশ এনে সংশোধন করা যেতে পারে। হথুয়া-রাজের আমলারা প্রসন্নমনেই স্বীকার করে নিল যে, এই জমি-পরসা মঠের এবং ভুলক্রমে রাজার নামে লেখানো হয়েছে। বাবু অঞ্জনী কুমারের আগ্রহে একদিন আমি তাঁরই সভাপতিত্বে সমাজ-সংস্কার সম্পর্কে ওই ক্যাম্পে ভাষণও দিয়েছিলাম।

জরিপের কাজ শেষ হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু মোহন্তজী আবার মোহন্তপদ লেখাপড়া করে দেওয়ার প্রশ্ন তুললেন। আমি আবার সেই একই কথা বললাম—আমি কখনোই মোহন্ত হবো না। যদি বরদরাজকে মোহন্ত করা হয়, তবে সে নিজেকে এই পদের যোগ্য প্রমাণ করবে। চাকর-বাকর ঘিরে থাকত, তাই পালিয়ে যাওয়া মুশকিল হয়ে পড়ল। একদিন শুধু একটি চাকরকে নিয়ে আমি ছাপরা গেলাম। কোনো একটা কাজের অজুহাতে চাকরকে পরসা পাঠালাম এবং সেই দিনই প্রয়োগ ও লাহোরের টিকিট কাটলাম এবং সেখানে পৌঁছলাম।

ছাপরা থেকে চলে আসার পরই সংস্কৃতে কথা বলার প্রতিজ্ঞা আবার কার্যকর হয়ে গেল।

ডি·এ·বি· কলেজের সংস্কৃত বিভাগ এখন (১৯১৯-এর শুরুতে) বৈদিক আশ্রমে চলে গিয়েছিল এবং এখানেই পড়ার ঘরও তৈরি হয়ে গিয়েছিল। প্রধান অধ্যাপক এখনো পণ্ডিত ভকতরামই ছিলেন। কিন্তু পণ্ডিত নৃসিংহদেব ওরিয়েন্টাল কলেজে চলে গিয়েছিলেন এবং তাঁর জায়গায় এসেছিলেন যুক্ত প্রান্তীয় এক পণ্ডিত যিনি বর্ণ ব্যবস্থা ও জাতিভেদের ওপর তীক্ষ্ণ ভাষা (আক্রমণ) শুনে অস্থির হয়ে উঠতেন। শাস্ত্রী শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে গেলাম এবং পরীক্ষার ফর্মও ভরতি করে চলে গেলাম। অন্য বিষয় আয়ত্তের মধ্যে মনে হয়েছিল। কিন্তু ন্যায়শাস্ত্র ও ব্যাকরণ ক্লাসে সবচেয়ে তীক্ষ্ণধী হওয়া সত্ত্বেও তা আমার কাছে অসাধ্য মনে হতে লাগল। ন্যায়ভাষ্য অসাধ্য মনে হত তা পড়ানোর অধ্যাপকের অভাবে আর ব্যাকরণ কণ্ঠস্থ করার সময় ও রুচির অভাবে। পণ্ডিত নৃসিংহদেব শাস্ত্রীর দর্শন-জ্ঞানের দারুণ অহঙ্কার ছিল। কিন্তু আমি যখন তাঁর কাছে পড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম, তখন তিনি দু-একবার আমাকে ডেকেছিলেন এবং কিছুটা শুরুও করেছিলেন। কিন্তু পরে সময়াভাবের কথা বলে এড়িয়ে যান। আমি বুঝতে পেরে গেলাম যে এর কারণ ছিল তাঁর পড়ানোর অক্ষমতা৷

আমার বিশারদ-এর বন্ধুরা এখন শাস্ত্রীর বন্ধু। কয়েক বছর পরে সারা টিমকে এক জায়গায় দেখে ছাত্রদের আনন্দ হয় এবং তাদের মধ্যে যদি কেউ কিছুটা এগিয়ে যায় তবে তাতে খুব দুঃখও হয়। রামপ্রতাপের চুটকি গল্প এখনো আগের মতোই ছিল সজীব। দুই দেবদত্ত এখনো আগের মতোই চিত্তাকর্ষক ছিল। সত্যপাল আজও ছিল সেইরকমই বেপরোয়া যুবক শাহজাদা।

ক্লাসের বাইরের সঙ্গীদের মধ্যে 'খুর্সন্দ'জী এখনো 'আর্যগেজেটের' চেয়ারে ছিলেন। ভাইসাহেব 'মৌলবী আলিম' হয়ে 'মৌলবী-ফাজিল'-এর জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। ভাই রামগোপাল টুইশন ও ভাই সাহেবের সহায়তার জন্য কিছু পড়ছিল। মুন্সী মুরারিলাল এখানেই প্রতিনিধি সভার উপদেষ্টার কাজ করছিলেন। তাই মাঝে মাঝে দেখা করত। বলদেওজী ও সোময়াজুলু আজও বংশীলালের মন্দিরেই গেঁড়ে বসে আছেন এবং দুজন ক্রমশ এফ·এ· ও বি·এ·র শেষ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

থাকার জায়গা খুঁজে সত্‌থা বাজারে জায়গা পেলাম। কিছু যুবক সেখানে একটি ছোটমতো আর্যসমাজ খুলেছিল। সাদাসিধাভাবে থাকা সত্ত্বেও কিছু দামী স্বদেশী কাপড়-চোপড় পরসায় আমি পেয়েছিলাম। তা এখানেও আমার কাছে ছিল। রেশমী চাদর; খুব দামী পশমের কাপড়ের ওয়েস্টকোট, মূল্যবান সাদা আলোয়ান এবং রেশমী পাগড়ী একমাত্র পরসাতে পরলেই ক্ষমার যোগ্য হতে পারত। এ সবের কিছু বিতরণ করলাম, কিছু বিক্রী করলাম, কিছু এমনিই কাছে রেখে দিলাম।

খবরের কাগজ পড়া, দেশ-বিদেশের রাজনৈতিক খবরকে বিশ্লেষণ করে দেখা, ভারতের রাজনৈতিক বিপ্লবের কামনা, রুশ বিপ্লব ও সাম্যবাদ—এই সব ছিল আমার প্রিয় বিষয়। সাম্যবাদের ওপর কোন বই পড়ার এখন পর্যন্ত সুযোগ হয়নি, কিন্তু এই বিষয়ে অনেক চিন্তা ও তর্কবিতর্ক করতাম। তবুও এখনো আমার সাম্যবাদ আর্যসমাজের ধর্মের উদার ব্যাখ্যার সঙ্গে সম্মিলিত হবার যোগ্য ছিল। কয়েক বছর ভালভাবে পড়াশোনা করে পূর্বের দেশে—চীন ও জাপানে আমি বৈদিক ধর্ম প্রচারের জন্য যাব, এর জন্য ব্যাকুল হয়ে ছিলাম। আমার এই প্রোগ্রামে যখন আমার কোনো সন্দেহ ছিল না, তখন অন্যের সন্দেহের প্রশ্নই ওঠে না। নতুন অভিজ্ঞতা ছাড়াও মানুষ নিরন্তর বদলায়—এই তত্ত্বের ওপর তখনো আমার ভাবনা যায়নি।

মহাযুদ্ধের শেষ দু'বছরে হোমরুলের জন্য আন্দোলন শুরু হয়েছিল, যদিও এখনো তা সাধারণ মানুষ পর্যন্ত পৌঁছয়নি। তবুও তা নরমপন্থী কংগ্রেসের মতো উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। যুদ্ধের সময় মানুষের খবরের কাগজ পড়ার আগ্রহ হল, সংবাদপত্রের সংখ্যা বেড়ে গেল সেইসঙ্গে তাতে উত্তাপও এলো। মানুষের ভেতর কিছুটা ভয়শূন্যতা আসতে দেখা গেল। ইংরেজ সরকার স্বায়ত্ত শাসনের ঘোষণা করলো এবং ভারত বিষয়ক মন্ত্রী মিষ্টার মণ্টেগু স্বয়ং ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার অধ্যয়নের জন্য এলেন। লড়াইয়ের খবর থেকে বোঝা যেতে লাগলো যে এই জগতে ইংরেজই সর্বশক্তিমান নয়, তাদের মোকাবিলা করার শক্তি জার্মানিরও আছে এবং অ্যামেরিকার মুখ চেয়ে বসে থাকাই চলছিল।

১৯১৮-র শেষ হবার সঙ্গে যুদ্ধেরও শেষ হল। কিন্তু যুদ্ধ মানুষের মনোভাবে যে পরিবর্তন এনেছিল তার শেষ হয়নি। যতক্ষণ মাথার ওপরে সংকট ছিল, ইংরেজ শাসক নানারকমের মিষ্টি কথা বলেছে। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নতুন ভারতের চেহারা দেখে তাঁর মনে নানা রকমের শংকা উৎপন্ন হতে শুরু করলো। যুদ্ধের সময়ে ইংরেজ ভারতরক্ষা আইন করে তাদের বিরুদ্ধে যে কোন বিক্ষোভ দমন করার বন্দোবস্ত করে নিয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধের পর ভারতরক্ষা আইন তুলে নেওয়া উচিত ছিল। অন্যদিকে যুদ্ধের সময়েও সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের কাজ বন্ধ হয়ে যায়নি বরং আগে যেখানে এর ক্ষেত্র ছিল শুধুমাত্র বাংলা পর্যন্ত, এখন তা যুক্তপ্রান্ত ও পাঞ্জাব পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। সরকার জাস্টিস রাউলাটের সভাপতিত্বে সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য কমিটি গঠন করে। তার রিপোর্টের ভিত্তিতে ভারতের সব স্বাধীন কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য, প্রত্যেক চরমপন্থী রাজনৈতিক সংগঠনকে মুছে দেওয়ার জন্য রাউলাট আইন

তৈরি করে। জনতার প্রতিনিধিরা প্রতিবাদ করেছিল কিন্তু বিজয়ের নেশায় উন্মত্ত সরকার তার পরোয়া করবে কেন? আইন পাস হয়ে গেল।

ভেতরের বাইরের পড়াশোনার সঙ্গে রাজনৈতিক ঘটনা সমূহের ওপরও আমার নজর থাকতো। যখন বংশীধরের মন্দির অথবা লাহোর-দরওয়াজার পাশের বাগানে আমাদের জমায়েত হত তখন রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথাবার্তা হত। হ্যাঁ, আমার সংস্কৃত বলার প্রতিজ্ঞা চালু ছিল। পণ্ডিত ভগবদ্দত্তের গবেষণা বিভাগে কখনো সখনো যেতাম এবং গবেষণা সংক্রান্ত পত্রিকা ও গ্রন্থ থেকে গবেষকদের বিস্তৃত দুনিয়ার সঙ্গেও পরিচিত হচ্ছিলাম। পণ্ডিত ভগবদ্দত্তজী সব বিজ্ঞান ও আবিষ্কারকে বেদ থেকে বার করে দেখাতেন না বটে, কিন্তু স্বামী দয়ানন্দের এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাঁর সন্দেহ ছিল না। অনেক কিছু তিনি বেদ থেকে নিশ্চিত পেয়েছিলেন এবং বাকী সবই গবেষণা সম্পূর্ণ হলে অবশ্যই বেদ থেকে বেরিয়ে আসবে এই বিশ্বাস তাঁর ছিল। লাহোরে প্রথম কোন সভায় ভাষণ দিয়েছিলাম আমার মনে নেই। এখন কলেজের (ইংরেজী বিভাগ) সংস্কৃত পরিষদে ভাষণ দিতে বলা হয়েছিল এবং তাতে আমার কোনো দ্বিধা ছিল না। উর্দু লেখাতো লাহোরে প্রথমবার এসেই আমি 'আর্যগেজেটে'ই লিখেছিলাম।

বোন মহাদেবীকে লেখাপড়া শেখাবার জন্য কানপুর পাঠানোর সিদ্ধান্ত আমার সম্মতি নিয়েই করা হয়েছিল। তখন কানপুরের ঐ প্রতিষ্ঠানে যতটা শেখার ছিল তা শেষ হয়েছিল। কিন্তু বোন লেখাপড়ায় আরো অগ্রসর হতে চেয়েছিল। এরই মধ্যে পণ্ডিত সন্তরামজী এসে গেলেন। তিনি এ সময়ে জলন্ধরে কন্যা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি বললেন, "পাঠিয়ে দিন, ওখানে একটা ছাত্রবৃত্তিও পাওয়া যাবে। বলদেওজীর বড় ভাই প্রথম সিঙ্গাপুরে কাজ করতেন। যুদ্ধে ড্রাইভার হয়ে তিনি মেসোপটামিয়ায় চলে গিয়েছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে বলদেওজীকে টাকা পাঠাতেন। তাই তাঁর বিশ্বাস ছিল যে দরকার হলে তিনি বোনকেও সাহায্য করতে পারবেন। রামগোপালজী তাঁর স্ত্রীকে শিক্ষার জন্য হমীরপুর আর্যসমাজের প্রাণ পণ্ডিত রামপ্রসাদের ওখানে রেখেছিলেন। তাঁকেও লাহোর এনে আরো পড়াবার পরামর্শ দিয়েছিলাম আমরা। ঠিক হল, পরীক্ষা শেষ হতেই আমি কানপুর হমীরপুর চলে যাব এবং বোনকে ও বৌদিকে (রামগোপালজীর স্ত্রী) নিয়ে আসব।

স্কুলের পরীক্ষায় আমি সব ছাত্রদের মধ্যে প্রথম হয়েছিলাম। ব্যাকরণে দুর্বল হলেও পাস করতে কোনো অসুবিধা হয়নি। য়ুনিভার্সিটির পরীক্ষায়ও এই আশা করা যেত। যতই এপ্রিল মাস ও পরীক্ষার দিন এগিয়ে আসতে লাগল ততই দেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডল গরম হতে লাগল। চম্পারণের ও খেড়ার আন্দোলনের সময় থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ বিজেতা কর্মবীর গান্ধীর যশ ও প্রভাব ভারতে বেড়ে যাচ্ছিল। যতদিন কাউনসিলের মঞ্চ থেকে মঞ্চযোদ্ধা নেতারা রাউলাট বিলের বিরোধিতা করছিলেন, ততদিন দেশে তেমন জাগরণ আসেনি। কিন্তু যখনই জানা গেল যে, গান্ধীজী স্বয়ং রাউলাট এ্যাকটের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংগঠিত করতে যাচ্ছেন, তখন পরিস্থিতি দ্রুত পাল্‌টাতে লাগল। লাহোরে ছাত্র, শিক্ষিত মধ্যবিত্তই শুধু নয়, দোকানদার পর্যন্ত এতে উৎসাহিত হয়ে উঠল।" 'পৈসা-আখবার'-এর সড়কে আনারকলীর পাশের হোটেলে আমি ঐ সময় খেতাম। তখনই আমি প্রথম ঐ ধরনের হোটেলের মালিককেও দৈনিক সংবাদপত্র রাখতে দেখেছি। খবরের কাগজ পড়ার আকাঙ্ক্ষায় অনেক লোক ঐ হোটেলে খানা খেতে পছন্দ করত।

আমার পরীক্ষা ৩১ মার্চ শুরু হয় এবং ৪ এপ্রিল (শনিবার) শেষ হয়। পরীক্ষা তেমন খারাপ হয়নি কিন্তু যখন পরীক্ষক ছাত্র ফেল করাবে বলেই গোঁ ধরে মুখিয়ে বসে থাকে, তখন তার কি

জবাব হতে পারে? সেই বছর ডি·এ·বি· কলেজ থেকে শাস্ত্রী পরীক্ষায় এক জনও ছাত্র পাস করেনি।

৬-এপ্রিল (১৯১৯ খ্রী) ছিল রবিবার। ঐ দিন সারা ভারতে রাউলট অ্যাক্ট বিরোধী দিবস পালনের কথা গান্ধীজী ঘোষণা করেছিলেন। সেই দিন লাহোরের অবস্থা সম্পর্কে আর কি বলা যায়? সারা আনারকলী সড়কের শেষ পর্যন্ত কালো খালি মাথায় ভরে গিয়েছিল। লোকজন নানান স্লোগান দিচ্ছিল। মিছিল ঘুরে ফিরে বেলা বারটার পরে ব্র্যাডলা হলে পৌঁছয়। খুব গরম ছিল। লোকজনকে জল খাওয়াবার জন্য অনেক জল দেওয়ার জায়গা তৈরি হয়েছিল। সেখানে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোনো ব্যবধান ছিল না। একই গ্লাসে তারা জল খাচ্ছিল। জাতীয়তার প্রথম বন্যায় ছোঁয়াছুঁয়ি খালে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। যদিও এই ফেলে দেওয়াটা স্থায়ী হয়নি, তবু এতে কতটা শক্তি ছিল, তা অনুমান করা যায়। ব্র্যাডলা হলের বিশাল হলে সব মানুষ ঢুকতে পারেনি। তাই হলের বাইরের সীমানার মধ্যে জায়গায় জায়গায় সভা করা হয়েছিল। তখনো লাউড-স্পিকারের যুগ শুরু হয়নি। তবুও বক্তারা কোনোক্রমে তাদের কথা জনতার কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন।

৬-এপ্রিলের স্মরণীয় দিবসের সেই স্মৃতি নিয়ে ৭-এপ্রিল আমি লাহোর থেকে রওনা হলাম। মানিক চাঁদ (ভগবতীপ্রসাদের ভাই) জ্বালাপুর মহাবিদ্যালয়ে সংস্কৃত পড়ছিল। ভাই ভগবতীও কোনো কাজ নিয়ে হরিদ্বারে থাকত। প্রথমে হরিদ্বার গেলাম, তারপর জ্বালাপুর এবং আবার গুরুকুল কাংড়ীতেও (তার পুরনো স্থানে)। ক্রমবর্ধমান গরম ও গঙ্গার বরফ গলা জল সেই সময়ের এই দুটি জিনিষই আমার মনে পড়ে। হরিদ্বার থেকে রওনা হয়ে তিল্‌হর স্টেশনে নেমে ঢকিয়া বরায় অভিলাষচন্দ্রের গ্রামে গেলাম। অভিলাষচন্দ্রের সঙ্গে দেখা হলে আমার বরাবরই ভাল লাগত। তার মধ্যে এমন কিছু সজীবতা, এমন সাহসিকতা ছিল যা আমার কাছে খুব মূল্যবান মনে হত। অভিলাষ মোটর ড্রাইভারী পাস করেছিল। ফোটোগ্রাফীও বেশ ভালই জানত। সে বৈঠকখানায় অনেক দেবদেবীর ছবি টাঙিয়ে রেখেছিল। সেখানে মদের বোতল এবং গ্লাসও জমা ছিল। বুঝতে পারলাম—হজরত, এগোতে, এগোতে গোয়েন্দা বিভাগের চোখের কাঁটা হয়ে উঠেছিল এবং এখন নিজের অধঃপতনকে প্রকাশ করার জন্য ও তার সাহায্যে গোয়েন্দা বিভাগের চোখে ধূলা দেওয়ার জন্যই সে এই ছলের আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু কোনো পার্ট যখন নৈর্ব্যক্তিক হয় তখনই তার প্রভাব পড়ে। এদিকে এখনো ছয় ঘড়ার রিভলবার তার কাছে ছিল, সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে সংযোগ রাখার বই ছিল। চরমপন্থী, রাজনৈতিক মতবাদ সত্ত্বেও এখনো আমার সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না। আমার অন্তরে সাম্যবাদের প্রভাবই হয়তো এর কারণ। হয়তো বিদেশে ধর্মপ্রচারের বাসনা ও প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। অভিলাষ সম্প্রতি বিয়ে করেছে। আমাকে সে জানিয়েছিল কিভাবে পিস্তলের সাহায্যে আমি আমার স্ত্রীকে নিষ্ঠুর মানুষদের কয়েদ থেকে মুক্ত করেছি। তার স্ত্রী পর্দা তেমন মানত না এবং আমিও বৌদি সম্পর্ক পাতাতে দেরি করিনি। ঢকিয়া বরার যে জিনিষ আমাকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করেছিল তা হল অভিলাষের মার বাৎসল্যপূর্ণ ব্যবহার। ছেলেবেলা থেকেই আমি মায়ের স্নেহ থেকে বঞ্চিত। বরং বলা চলে যে মায়ের স্নেহ কেমন হয় আমার তা দেখার সুযোগই হয়নি। আমরা পরস্পরকে ভালবাসি, অভিলাষের মা তা জানতেন। তাই খাওয়ানো দাওয়ানোতে, কথাবার্তায় তাঁর মধ্যে মায়ের হৃদয়ের ঝলক দেখতে পেতাম। তিনি গ্রামের অশিক্ষিত স্ত্রীলোক ছিলেন। যদিও অভিলাষের দাদু সাধারণ চৌকিদার থেকে উন্নতি করে পুলিশ ইন্‌স্‌পেকটর হয়েছিলেন। তবু বাবার দিকে তাকালে মার মধ্যে ঐ ধরনের বিনীত, গম্ভীর ও পরিচ্ছন্ন ব্যবহার আশা করা যায় না। যাগেশের মাও তাঁর ছেলের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতার

পাওয়া যাচ্ছে। একটুও দেরি না করে (১৭ই এপ্রিল) আবার দুটো টিকিট কাটলাম এবং আম্বালায় রওনা হলাম। সাহারানপুর থেকে আমাদের গাড়িতে ভয়ানক ভিড় হয়েছিল। হরিদ্বার থেকে বৈশাখী স্নান সেরে অনেক নরনারী ফিরে আসছিল।

আম্বালা ছাউনিতে গিয়ে জানতে পারলাম, আগের টিকিট বন্ধ। বোনকে সঙ্গে নিয়ে আম্বালা ছাউনির আর্যসমাজে পৌঁছলাম। থাকার জন্য ঠিক ঠিক জায়গা পাওয়া গেল। দশ-পনের দিন থাকতে হলেও আমাদের থাকা খাওয়ার কোনো কষ্ট হত না। কিন্তু এভাবে রাস্তায় এবং তার ওপর আমার লাহোরের সঙ্গীদের থেকে দূরে থাকা আমার অসহ্য মনে হতে লাগল। লাহোরেও গুলি চলেছিল। সেই খবরও পেয়েছিলাম। আর পাঞ্জাব বলে নানা খবর হাওয়ায় উড়ছিল। আমি দিনে বেশ কয়েকবার স্টেশনে গিয়ে জলন্ধরের ট্রেন সম্পর্কে জিগ্যেস করতাম। ১৮ই এপ্রিলই জানা গেল ডাকগাড়ির প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জলন্ধরের টিকিট পাওয়া যাচ্ছে। ভিড়ের কথা আর বলে কাজ নেই। বোনকে তো মোটগাঁট দিয়ে মেয়েদের দ্বিতীয় শ্রেণীতে কোনোরকমে বসিয়ে দিলাম। আমি আমার কামরায় ঢুকতে পারলাম এই জন্য যে আমার সঙ্গে কোনো মালপত্র ছিল না। আমি এখন ছাব্বিশ বছরের ছিপছিপে জোয়ান। এপ্রিলের দুপুরের গরমে বাতাসহীন ঐ কামরার উপছে পড়া ভিড়ে বসা ও দাঁড়ানো যাত্রীদের দম বন্ধ হয়ে আসছিল। তবু গাড়িতে জায়গা পাওয়াটা আমি সৌভাগ্য বলেই মনে করেছিলাম। নিরস্ত্র সাধারণ আন্দোলন, জালিয়ানওয়ালাবাগের রোমাঞ্চকর নর-সংহার, মার্শাল ল এবং যাতায়াতের এই অব্যবস্থা এ সব দেখে যুদ্ধের দিনে য়ুরোপীয় জীবনের কিছু ধারণা হল। বহু শতাব্দী ধরে প্রবহমান নির্জীব শান্ত জীবনকে আমার একেবারেই ভাল লাগত না। অশান্ত জীবনে আমার পার্ট কি হওয়া উচিত, তা আমি স্থির করতে পারিনি। তবু আমি তা পছন্দ কবতাম। তা থেকেই পরিবর্তনের আশা ছিল এবং এই জীবনের জন্য আমি দাম দিতে প্রস্তুত ছিলাম।

জলন্ধর ছাউনিতে নেমে মনে হলো, কন্যা মহাবিদ্যালয় জলন্ধর শহরের কাছাকাছি। যাইহোক, অন্য ট্রেনের জন্য চব্বিশ ঘণ্টা প্রতীক্ষা এবং গাড়িতে ঢোকার কথা আর চিন্তাও করতে পারছিলাম না। আমি আর্যসমাজের (গুরুকুল বিভাগ) জন্য একটা টাঙ্গা ঠিক করলাম এবং বোনকে নিয়ে রওনা হলাম। কানপুর থেকে আমি মানসিক উত্তেজনায় অস্থির ছিলাম। এক-আধবার যখন পরের যাত্রার টিকিটের কথা বোনকে জিগ্যেস করতাম, তখন সে 'হাঁ' করে দিত। আমি তার মনের ভাব জানার কখনো চেষ্টা করিনি। মার্শাল ল'র দিনে, গোরা ও সৈনিকদের রাজত্বে এভাবে যাওয়া আমার পক্ষে পরোয়া করার মতো ব্যাপার ছিল না। কিন্তু যেভাবে বোনকে নিয়ে আমি নিশ্চিন্তভাবে ইতস্তত ঘুরে বেড়ানোর মতো যাচ্ছিলাম, তা কখনো উচিত বলা চলে না। তবু বোন একটুও ভয় পায়নি। হয়তো বিপদ সম্পর্কে তার ততটা জানা ছিল না।

টাঙ্গাঅলাকে পুরবিয়া মনে হল। বালিয়া অথবা আরা জেলা থেকে তার বাপ-দাদা এখানে সহিসের কাজ করতে আসে এবং এখানেই থেকে যায়। আমি জানতাম যে, এই পুরবিয়াদের মধ্যে শিবনারায়নী পন্থার বিশেষ প্রচার আছে। আমি তার কাছে সংঘের 'লিখনীচন্দ', 'প্রধান' প্রভৃতির সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। টাঙ্গাঅলা ধরে নিল আমিও শিবনারায়নী। কেননা শিবনারায়নী না হলে কারো পক্ষে ঐ গুপ্ত শব্দ জানা সম্ভব নয়। সে আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইল। কনৈলার বুড়ী চামারনী গরিবিয়ার কথা ঐ সময় আমার মনে পড়ল। চার সালের আকালে তার ঘর উজাড় হয়ে গিয়েছিল। শুধু একটা মেয়ে বেঁচে ছিল যার বিয়ে হয়েছিল পাঞ্জাবের এই ধরনের কোন একটা ছাউনির লোকের সঙ্গে। তাকে আমি মাঝে মাঝে কনৈলায় দেখেছি।

আমরা আর্যসমাজে উঠলাম। সন্তরামজীর সঙ্গে দেখা হল এবং বোনকে আশ্রমে ভর্তি করতে কোনো অসুবিধা ছিল না। লাহোরের রাস্তা বন্ধ ছিল। 'মার্শাল ল' চলছিল কিন্তু এখন গুলি চলছিল না। অমৃতসর কাছাকাছি হওয়ায় সেখানকার ব্যাপারে লোকজনেরা বলছিল—ডায়ার ও ডায়ারের গুলির নিশান হয়েছিল কম হলেও হাজারের চেয়ে বেশী স্ত্রী-পুরুষ-শিশু। ডঃ সত্যপাল, ডঃ কিচলুর নেতৃত্বে অমৃতসরের জনতা কিরকম নির্ভীকতা দেখিয়েছিল তার অতিরঞ্জিত খবর আমরা পেতে লাগলাম।

লাহোর এখন দূরের কথা। বলদেওজী ও রামগোপালজীর চিঠিতে খবর পেলাম যে আমার সব পরিচিতরা বেঁচে গেছে। এখন জলন্ধরে কোনোরকমে দিন কাটানোর ছিল। সন্তরামজীর সঙ্গে আগে কয়েকবার কথাবার্তা বলার সুযোগ মিলেছিল। কিন্তু একসঙ্গে থাকার এই প্রথম সুযোগ ছিল। আমাদের পরস্পরের মেজাজের সঙ্গে মিল ছিল, তার আভাসও আমি পেয়েছিলাম। সন্তরামজী থাকার জন্য বাড়ি নিয়েছিলেন কিন্তু এখন পর্যন্ত রান্না করার কোনো বন্দোবস্ত করেননি। রোজ সন্ধ্যায় আমরা স্টেশনে তন্দুরী রুটি খেতে যেতাম। তন্দুর থেকে বার করা গরমাগরম মুচমুচে রুটি পেঁয়াজের চাটনির সঙ্গে কি যে মিঠে লাগে, তা একমাত্র যে তা খেয়েছে সেই বুঝতে পারে। স্বাদ ও স্বাস্থ্য এই দুই দিক থেকে দেখলে জগতে এই রকম খাদ্য মেলা কঠিন।

জলন্ধরের অস্থায়ী নিবাসে কিছু নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় হল। আমার লাহোরের পুরনো বন্ধু এ সময়ে এখানে সদ্য খোলা ডি·এ·বি· ইন্টার মিডিয়ট কলেজের প্রোফেসর ছিলেন। তিনি তার সঙ্গী প্রোফেসর জ্ঞানচন্দের সঙ্গে একই বাড়িতে থাকতেন। সেখানে পেঁয়াজ দিয়ে তন্দুরে তৈরি রুটি মাখন মেখে মাঠঠার সঙ্গে খেয়েও 'মান্না' মনে হত না। বরং দুই প্রোফেসরের যোগ-ধ্যান সম্পর্কিত নতুন এ্যাডভেঞ্চার-এর কথা বড় চিত্তাকর্ষক মনে হত। যোগ, মন্ত্র, দেবতার আকর্ষণ থেকে আমি অনেকদিন বেরিয়ে এসেছি। তাই আমার সেই দিকে কোনো টান ছিল না। কিন্তু আমি দেখতাম যে স্বয়ং ভুক্তভোগী ছাড়া কোনো মানুষ এই আকর্ষণের বিরুদ্ধে কিছু শুনতে রাজী ছিল না। প্রোফেসর রামদেও বি·এ· (অনার্স, পরে এম·এও) এবং প্রোফেসর জ্ঞানচন্দ এম·এ· হয়ে স্বামী দয়ানন্দের গ্রন্থে যোগের মহিমা পড়ে সেই মহান সাধনায় অনুপ্রাণিত হয়েছিল। এক কান থেকে আর এক কান হয়ে একটা উড়ো খবর তার কাছে পৌঁছোয়।—'আজকাল স্বামী সিয়ারাম নামে এক মহান যোগী হৃষিকেশের আশেপাশে থাকে। তিনি সিদ্ধপুরুষ। এই সব বিরল মহাপুরুষ জগতে জন্ম নিয়ে মায়ের কোলকে পবিত্র করেন। তিনি এম·এ·। প্রফেসর ছিলেন।'

চুম্বক যেমন লোহাকে টেনে নেয়, তেমনি এই দুই তরুণ স্বামী সিয়ারামের কাছে ছুটে গেলেন। স্বামী সিয়ারাম তো প্রথম বেশ কিছুদিন শিষ্যদের শ্রদ্ধার পরীক্ষা করলেন। তাদের অধিকারী দেখে যোগ আরম্ভ করার পূর্বের সাধনা শুরু করালেন। বেশ কিছু মাস মুগের রস খাইয়ে অনাহারে রাখলেন। আরো নানারকম ব্রত করালেন। আর যোগধ্যানের কথা আর কি বলবো? দুই প্রোফেসারের কথা অনুসারে—তাঁর প্রতি অটল শ্রদ্ধার উপদেশ দিতেন এবং যোগধ্যানের পরিবর্তে তিনি যমরাজের কাছে আমাদের পাঠাতে চেয়েছিলেন। যাহোক! সময়ের আগেই দুজনের চোখ খুলে গেল। সিয়ারাম ও যোগের ফাঁদ থেকে বেঁচে তারা ঠিক ঠিক ফিরে এলেন এবং এখন তাঁরা প্রোফেসরের কাজ করছেন।

লালা দেওরাজের কাছেও আমি প্রায়ই যেতাম। তাঁর কথাবার্তা খুব চিত্তাকর্ষক হত। কিন্তু আমাদের বয়সে এক যুগের ব্যবধান ছিল। তাই সেখানে ততটা মনোরঞ্জন হত না যতটা হত দুই প্রোফেসারের কাছে। হ্যাঁ, তবে এ সময়ে আমার বয়সী এক ব্যক্তি জলন্ধরে ছিল যে যৌবনের

সরোবরকে শুকিয়ে, জীবন্ত উদ্যানকে জ্বালিয়ে ব্রহ্মচর্যের কঠোর পুরনো পথ অবলম্বন করেছিল। আমিও ঋষি দয়ানন্দের ভক্ত ছিলাম। বিদেশে ধর্ম প্রচারের জন্যই নিজেকে তৈরি করছিলাম। কিন্তু সারাজীবন মনের ওপর খবরদারী করতে আমার ভাল লাগত না। সন্তরামজীও ছিলেন রসিক (আমুদে) মানুষ। ব্রহ্মচারীর ব্যবহার আমার কাছে উপহাসাস্পদ বলে মনে হয়েছিল, যদিও আমি তার নিয়মের বিরুদ্ধতা করার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না; বরং আমি তাঁর ত্যাগের প্রশংসা করতাম। ব্রহ্মচারী মুজফ্‌ফরপুর নিবাসী যুবক। সে স্বামী দয়ানন্দ ও আর্যসমাজের বই পড়ে আর্যসমাজী হয়ে যায়। তারপর আর্যসমাজের আদর্শ অনুযায়ী জীবন কাটানোর এবং স্বামী দয়ানন্দের শিক্ষা অনুসারে বেদবিদ্যা পড়ার জন্য ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসার আগে নিজের সমস্ত সম্পত্তিকে—যা তার জীবন কাটানোর জন্য যথেষ্ট ছিল—দান করে দেয়। ইতস্তত ঘুরতে ঘুরতে সে জলন্ধর আসে। এখানে দশ আর্যসমাজী গৃহস্থের ঘরে মাধুকরী করে আহার করত। ব্রহ্মচারীদের মত কটিবস্ত্র ও ল্যাঙ্গট পরত এবং কাঠের খড়ম পরে হাঁটত। পড়াশোনার ব্যাপারেও ঋষি দয়ানন্দ যেমন বলে গেছেন তদনুসারে পড়তেন। সিদ্ধান্তকৌমুদী প্রভৃতি অনার্য গ্রন্থের ছায়া থেকেও দূরে থাকতেন। ঐ সময় অষ্টাধ্যায় ও মহাভাষ্যের মতো আর্য-গ্রন্থ পড়াতে পারেন এমন পণ্ডিত দুর্লভ ছিল। তা তিনি নিজেই এই সব গ্রন্থের স্বাধ্যায় করতেন। কন্যা মহাবিদ্যালয়ের ধর্মশিক্ষক ভক্ত রৈমলজী, আর্যসমাজের সভাপতি ও অনেক শ্রদ্ধাশীল আর্যসমাজী ব্রহ্মচারীজীকে খুব শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতেন। আমিও যে তাঁর প্রতি সর্বদা বীতশ্রদ্ধ ছিলাম, তা নয়। তবু কিছু বিষয় আমার কাছে অতি পুরনো মনে হত। যদি গ্রামের সব স্ত্রীলোককে 'ভবেহ' (ছোট ভাইয়ের স্ত্রী) মনে করে নেওয়া হয়, তবে শেষ পর্যন্ত হাসিঠাট্টা করা যাবে কার সঙ্গে?

গরমে ব্রহ্মচারীজীর কাংড়া পাহাড়ে যাওয়ার কথা ছিল। সন্তরামজী ও আমি পরামর্শ করলাম যে, ব্রহ্মচারীজীকে একটি বিদায় ভোজ ও অভিনন্দন পত্র দেওয়া হবে। ভক্ত রৈমলকে এতে ডাকা হয়নি। আর্যসমাজের সভাপতিকে শুধু সংখ্যা বাড়াবার জন্য নেওয়া হয়েছিল। আমরা দুজনে মিলে একটা অভিনন্দন পত্র লিখলাম। ভোজের জন্য শুধু তেলেভাজা পেঁয়াজের পকৌড়ি রাখলাম। খড়ম পায়ে, কটিবস্ত্র পরে, চাদর উড়িয়ে খালি মাথায় ব্রহ্মচারীজী এসে চেয়ারে বসলেন। সর্ব সাকুল্যে পাঁচজনের বেশী লোক উপস্থিত ছিল না। কাজ শুরু করার আগে আমি বললাম, "যেহেতু এই পদের জন্য আমার চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি কেউ নেই, তাই আমি সভাপতির আসন অলংকৃত করছি।" এতে অনেকের কান খাড়া হয়ে উঠছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু তাঁরা ততটা দূর পর্যন্ত ভাবতে পারেননি। তারপর পণ্ডিত সন্তরামজী অভিনন্দন পত্র পড়তে শুরু করলেন—

"...যখন আপনার খড়মে খটখট করা চেহারা স্মরণ হবে, তখন তা মনে করে আমরা ছটফট করে মরব।...

...যখন আপনার গগনচুম্বী শিখা......"

ব্রহ্মচারীজী চেয়ার থেকে উঠে পালাতে চাইলেন। সভাপতি ও অভিনন্দনপত্র পাঠক মিনতি করে তাকে আটকালেন। কিন্তু সভাপতি আলাদা চোখ রাঙাচ্ছিলেন—"ব্রহ্মচারীকে তেলের পকৌড়ি খাওয়ানো কোন্ শাস্ত্রে লিখেছে?"

আবার অভিনন্দন পত্র শুরু হল। আবার অনুপ্রাসের ছটা এবং নখ-শিখ বর্ণনা। আবার ব্রহ্মচারী পালাতে গেলেন। মনে নেই, তৃতীয়বার আমরা ব্রহ্মচারীজীকে ফেরাতে পেরেছিলাম কিনা? অভিনন্দন পত্র হয়তো সমাপ্ত হতে পেরেছিল। সভাপতি তো আগেই সটকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

সেই দিন বড় মজা হল। পরদিন ভক্ত রৈমলজী যখন এই খবর পেলেন, তখন তিনি আমাদের তিরস্কার করতে শুরু করলেন—"ব্রহ্মচারীকে নিয়ে মজা করা?" "মজা নয়? জিনিষপত্র ছাড়া ভোজ, অভিনন্দনপত্র দান।"... "ব্রহ্মচারীকে তেলেভাজা পকৌড়ি? কোন্ শাস্ত্রে?" আমরা মাথা অনেকটা নিচু করে শুনতে লাগলাম। এই ঘটনার পরে আর্যসমাজের সভাপতি মশাই ও ভক্ত রৈমলজী স্থির ধারণা করে নিলেন যে বিদেশে কিংবা দেশে ধর্ম প্রচারের উপযুক্ত লোক আমরা নই।

কয়েকদিন অপেক্ষা করার পরেও যখন লাহোরের রাস্তা খুলল না, তখন সন্তরামজী বাড়ি ঘুরে আসার পরামর্শ দিলেন। আমরা ট্রেনে হোসিয়ারপুরে নামলাম। পুরনো বসতি সেখান থেকে বেশী দূরে নয়। সন্তরামজী গ্রামে না থেকে তাঁর বাগানবাড়িওলা ঘরে থাকতেন। বাগানে সফেদা, লুকাট ইত্যাদির অনেক গাছ ছিল। সেখানে এক ইয়ারখন্দের তুর্কী মালী কাজ করত। সন্তরামজীর স্ত্রী (প্রথমা স্ত্রী) ঘরের কাজকর্মে অসাধারণ পটু ছিলেন। দৈনিক প্রাতঃরাশ, মধ্যাহ্ন ভোজন, রাত্রির আহার তিনি স্বয়ং তৈরি করে খাওয়াতেন। একদিন সকালে পাত্র নিয়ে দুধ দোহাতে গেছেন, দুপুরে শুনলাম মেয়ে হয়েছে। আমার বিশ্বাস হয়নি কিন্তু ঘটনাটা সত্য। হোম করার পুরুত ছিলাম আমি এবং মেয়ের গার্গীর মতো বৈদিক নাম বেছে দেওয়াটাও আমার কাজ ছিল। তারপর আমি গ্রামে খেতে যেতাম।

সন্তরামের ভাই বন্ধুরা পঞ্চাশ বছর ধরে চীনা তুর্কীস্তানের ব্যবসায়ী। তার পরিবারে অন্তত কয়েক ডজন লোক এমন ছিল যারা ইয়ারখন্দ, খোটান, লাদাখে অনেক বছর থেকে এসেছে এবং আবার যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে বসেছিল। তারা তুর্কী ও তিব্বতী ভাষা ফরফর্ করে বলত। দূর দেশের নাম, সেখানকার বাড়িঘর, গ্রাম-শহর, রীতি-রেওয়াজের কথা হতে থাকবে আর 'সৈর কর দুনিয়াকী' এই সূক্ত আমার কানে গুঞ্জন করবে না কেন? রায়সাহেব (সন্তরামজীর কাকা) বললেন—যাওয়া মুশকিল নয়। পাসপোর্ট (?) নিতে হবে, 'তার ব্যবস্থা আমরা করে দেব।' এখানকার কালো কিন্তু মিছরির দানার মতো ঝকঝকে দানার গুড় দিয়ে দই খেতে বড় স্বাদু লাগত এবং সর্ষের শুকনো শাক এমন সুস্বাদু হতে পারে, তা আমি আগে কখনো ভাবতেও পারিনি। ঐ সময়ে হলায়ুধের এই শ্লোক বারবার আমার মনে আসত—

"নূতন সর্ষপশাকং পিচ্ছলীনি চ দধীনি।
অল্পব্যয়েন স্বাদু গ্রাম্যজন মিষ্টমশ্নাতি।।"

সন্তরামজীর দুটি অথবা তিনটি ভাইপো এবং তাদের ফর্সা গোলাপী রঙ দেখে আমার মনে হল যে য়ুরোপীয়দের মতো সুন্দর রঙ ভারতেও দেখা যায়। এ পর্যন্ত কাশ্মীরের পণ্ডিতদের আমি দেখিনি।

পুরনো বসতি থেকে আমরা হোসিয়ারপুর পর্যন্ত পায়ে হেঁটে এসেছিলাম। তারপর টাঙ্গা বদলাতে বদলাতে জলন্ধর শহরে পৌঁছে গেলাম। কয়েকদিন পর টিকিট পাওয়া গেল এবং আমি লাহোর পৌঁছে গেলাম।

লাহোরেও লাহোরী দরওয়াজায় গুলি চলেছিল। তাতে যারা মরেছিল তাদের মধ্যে মুন্সীরাম শাস্ত্রী নামে এক তরুণ ছাত্র ছিল। এই-বছরই সে শাস্ত্রী পরীক্ষা দিয়েছিল। পরীক্ষার ফল খুব খারাপ হওয়া সত্ত্বেও সে পাস করেছে জানা গেল, যদিও এই খবর শোনার জন্য সে আর ছিল না। মুন্সীরাম অনাথালয়ে পালিত এক প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন নওজোয়ান ছিল। —'হসরত উন ফুলো পে হ্যায়, জো বিন খিলে মূর্ছা গয়ে।' তার দেহে বেশ কয়েকটা গুলি লেগেছিল। তার যে সব সঙ্গী তা দেখেছিল, তারা বলেছিল যে সবগুলিই সামনের দিক থেকে তার বুক, বাহু ও জঙ্ঘায়

লেগেছিল। মুন্সীরামের মতো অনেক বীরই মার্শাল ল-এর ফলে ক্রোধান্ধ ব্রিটিশ শাসকের হাতে প্রাণ দিয়েছিল।

এখনো মার্শাল ল জারী ছিল, যখন আমি লাহোর পৌঁছলাম। পড়ার জন্য খবরের কাগজ খুব কম পাওয়া যেত। জায়গায় জায়গায় ফৌজী আদেশ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল—লোকজন কখন হেঁটে যেতে পারবে, তাদের কখন শুতে হবে, দোকানদারকে কি দামে জিনিষপত্র বেচতে হবে। ...অন্যথায় কি দণ্ড হবে। এই সময় পাঞ্জাবের লেফ্‌টেনান্ট গভর্ণর ও ডায়ারের হৃদয়হীনতার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়ার সুযোগ মিলেছিল। সৈন্যবাহিনী নিরস্ত্র স্ত্রী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধদের ওপর যে অত্যাচার করেছিল তার কথা শুনেই রক্ত টগবগ করে ফুটতে থাকত। মিউজিয়ামের দিকে মার্শাল ল-এর আদালত বসত। যে সব লোককে বন্দী করা হয়েছিল তাদের ভাগ্যে কি আছে দেখার জন্য, তাদের হাজার হাজার আত্মীয় জমা হত এবং নিরপরাধের ফাঁসি ও লম্বা লম্বা সাজা শুনে শুনে আমাদের মতো লোকেদের নিজেদের অসহায়তার জন্য রাগ ও গ্লানি হত। ভগবানে বিশ্বাস এখনো আমার একেবারে নষ্ট হয়ে যায়নি। তা হলেও ভাবতাম—তাঁর ন্যায়বিচার এখন হচ্ছে না কেন? আজ এই আদালতের ওপর বজ্র পড়ছে না কেন? প্রথমে গুলিগোলা, কচিকচি শিশুদের রক্তে হাত লাল করে বিমান থেকে ফাঁসি-যাবজ্জীবন কারাবাসের হুকুম যারা দিচ্ছে সেইসব আততায়ীদের জিভ কেন হাজার টুকরো হয়ে খসে পড়ছে না? এই অত্যাচারী জাতির নৌবহর মহাযুদ্ধে চিরতরে ডুবে যায়নি কেন?

গরমকালে পাঞ্জাবে লস্যি (মাট্‌ঠা) খাওয়ার রেওয়াজ খুব বেশি। কিন্তু দই নটা বাজতে বাজতে শেষ হয়ে যেত। ফৌজী অফিসাররা দর বেঁধে দিয়েছিল। তার বেশি দামে বেচলে কঠিন শাস্তি ও জরিমানা হত। লোকজন সকালেই দইয়ের দোকানে ভিড় করত। হ্যাঁ, কেসরীদাসের লেমনেড, লাইম-জুস এ সময়ে সারা শহরে প্রসিদ্ধ ছিল। এই দোকান বংশীধরের মন্দিরের একেবারে কাছে ছিল। তাই আমরা প্রায়ই সেখানে পৌঁছে যেতাম।

রাউলাট এ্যাক্টের বিরুদ্ধে যে ঘনীভূত বিদ্রোহের ভাবনা জন্ম নিয়েছিল তাতে প্রাণ-সঞ্চার করেছিল অসংখ্য মানুষের শবদেহ। কিন্তু মার্শাল ল-এর দিন অনেক শবদেহকে পচা লাশে পরিণত করেছিল। কালকের রঙীন সিংহের আসল রূপ আজ দেখা দিতে লাগল। কাল যার নামে উত্তেজনামূলক বিজ্ঞপ্তি ছাপা হত, সে আজ সরকারকে তোষামোদ করে বিজ্ঞপ্তি বার করেছিল। সে ও'ডায়ার শাহীর খোশামোদের জন্য নিজেদের শহীদের লাশে পা দিয়ে এগোতে একটুও দ্বিধা করছিল না। পাঞ্জাবে এদের 'কুত্তে' 'ঝোলীচুক্ক' খেতাব দিয়েছিল এবং তার আঘাত থেকে এদের মার্শাল ল-ও বাঁচাতে পারেনি। সেই সময়ে এই 'ঝোলীচুক্ক'দের সরকারের কৃপা করা স্বাভাবিক ছিল এবং তাদেরই সরকার স্যার, মিনিস্টার ও আরো অনেক কিছু বানিয়েছিল। কিন্তু দেশ কি এদের পাপকে ভুলে যাবে? যে দেশ তার বিশ্বাসঘাতকের তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি না দেয়, সেই দেশ তার ইজ্জত ও স্বাধীনতাকে টিকিয়ে রাখতে পারে না।

মানুষের ওপর মার্শাল ল-এর আতংক ছেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই আতংকের সামান্য প্রভাবও আমাদের ওপর পড়েনি। গোয়েন্দার জাল বিছানো থাকা সত্ত্বেও আমাদের বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে আমাদের টিপ্পনি আগের মতোই হত। ইংরেজ শাসনের প্রতি আমাদের ঘৃণা অনেক গুণ বেড়ে গিয়েছিল এবং 'ঝোলীচুক্ক' আমাদের মানসিক ক্রোধের আগুনে বিশ্রীভাবে ভস্ম হয়ে যাচ্ছিল। পাঞ্জাবের খবরের কাগজ প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমরা খবরের জন্য অন্য প্রদেশের কাগজের অপেক্ষায় থাকতাম। দিল্লীর 'বিজয়' (সম্পাদক ইন্দ্রজী)-এর কপি আসার সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি হয়ে যেতো। কিছুদিন পরে যখন জানতে

পারলাম যে দিল্লির এক পণ্ডিত, যিনি খোশামুদি করে মহামহোপাধ্যায় হয়েছিলেন, তিনি বিজয়ের খবর ও লেখা পরীক্ষা করে দেখার জন্য সেলর্ড হয়েছেন, তখন তাঁর ওপর আমাদের ঘৃণার অন্ত ছিল না। আমি ভাবতাম—কোনো স্থায়ী কাজের জন্য এই সব লোক শেষ পর্যন্ত এত নিচে নেমে যায়। পেটের ভাবনা তো তাদের নেই। কিছু পয়সা বেশী পেয়েছিল। কিন্তু তাও তো চিরকাল পাওয়া যাবে না। ওই সময়ে দেশদ্রোহ থেকে যারা হাজার হাজার টাকা কামিয়েছে, পরে দেখা গেছে তাদের মধ্যে কিছু লোকের ভাতও জোটেনি।

মার্শাল ল উঠে যায়। কিন্তু এই সময় ইংরেজ-আফগান যুদ্ধের খবর আসতে লাগলো। গোটা বেলজিয়াম, অর্ধেক ফ্রান্স এবং তাদের মিত্রদের দেশ শত্রুদের হাতে চলে যাওয়া সত্ত্বেও যখন ইংরেজ সারা দুনিয়ায় তার বিজয়ের খবর ছড়িয়ে দিচ্ছিল, তখন আফগানিস্তানের যুদ্ধ সম্পর্কে সঠিক খবর মেলার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। তবু যুদ্ধ সম্পর্কে আমাদের রায় সর্বদাই ইংরেজের বিরুদ্ধে ছিল।

ঘটনার উত্তাপের মধ্যে থেকে আমরা ঐ বছর৺গরম কালটা বুঝতে পারিনি। বলদেও ও সোমযাজুলু বাড়ি চলে গিয়েছিল। পরীক্ষার ফল জানিয়ে দিতে বলে গিয়েছিল। ক্রমশ ফল বেরোল। আমি আমার সমস্ত শাস্ত্রী দলের সঙ্গে অনুত্তীর্ণ, বলদেও পাস, সোমায়াজুলু ফেল। বর্ষা শুরু হতে যাচ্ছিল। পড়াশোনা শুরু হতে এখনো দুমাস বাকী ছিল। ঘামের পর দেহে ছোট ছোট ফুসকুড়ি দেখা দিয়েছিল। আমার লাহোরে নিজেকে বিষণ্ণ মনে হতে লাগল। ঐ সময় পণ্ডিত গোবিন্দদাসকে আমি একটা চিঠি লিখি। তিনি সাগ্রহে আমাকে তাঁর কাছে চলে যেতে লিখলেন।

৯

চিত্রকূটের ছায়ায় (১৯১৯-২০ খ্রী)

জুহী থেকে আমি বান্দার লাইনে যাওয়ার সময় দেখলাম ডোবা-পুকুর সব ভরে রয়েছে। আড়াই মাস আগে এখানেই লোকজনকে গাছের পাতা খাইয়ে পশুদের প্রাণরক্ষা করতে দেখেছিলাম। মহোবা স্টেশন পেরিয়ে যাওয়ার সময় আমার পাদ্রী জ্বালাসিংহের আলোচনার কথা মনে এল। কিন্তু এবার আমার এখানকার কোনো আর্যসমাজীর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা ছিল না। কর্বীতে স্টেশন থেকে বেরিয়ে মোহন্ত জয়দেব দাসের মঠে পৌছলাম। অযোধ্যার পরিচিত মিত্রদের মধ্যে শুধু দেখা হল পাঠশালার প্রধান অধ্যাপক পণ্ডিত গোবিন্দদাসের সঙ্গে।

চিত্রকূট মণ্ডলের বৈরাগী মোহন্তদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী ও প্রতিষ্ঠিত ছিলেন মোহন্ত জয়দেবদাস। ধনী হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে অহংকার ছুঁতে পারেনি। বেশভূষাতে তো মনে হত তিনি কোনো সাধারণ রমতা সাধু। খানাপিনারও কোনো সখ ছিল না তাঁর। যদিও তিনি সামান্য হিন্দির বেশী কিছু জানতেন না, তবু বিদ্যার প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল। তাই তিনি সংস্কৃতের এক বড় পাঠশালা খুলে রেখেছিলেন। শ্রাবণ মাসে রাসলীলা ও সংস্কৃত পাঠশালা এই দুটি ছিল তাঁর সখের জিনিষ। এই দুয়ের জন্যই তিনি কিছু সম্পত্তি আলাদা করে রেখেছিলেন। রাসলীলার জন্য

পাথরের স্তম্ভের এক খোলা বারদুয়ারী নির্মাণ করেছিলেন। তাতে পাঠশালার ক্লাসরুমের কাজও হত। ছাত্রদের থাকার জন্য মঠের বাইরে বারান্দাসহ আরো অনেক ঘর ছিল যাতে মঠ ও আবাসে যারা আসতে পারত না এমন সাধু বিদ্যার্থী থাকত। এই সব কুঠরির বারদুয়ারীর তৃতীয় অথবা চতুর্থ কুঠরীতে আমার থাকার জায়গা হয়েছিল। গৃহস্থ (ব্রাহ্মণ) ছাত্রদের জন্য বারদুয়ারীর দক্ষিণে একটা বাড়ি ছিল। সেই সময় পণ্ডিত গোবিন্দদাস ছাড়া পণ্ডিত জগদীশ ত্রিপাঠী ও পণ্ডিত শিবনারায়ণ শুক্লা এই দু'জন অধ্যাপকও ছিলেন।

আমার ইচ্ছা ছিল কলকাতার কোনো পরীক্ষায় বসার। বেদমধ্যমা পাস করেছিলাম, তাই বেদতীর্থ পরীক্ষায় বসতে পারতাম। কিন্তু এখানে তার কোনো গ্রন্থের কোনো অধ্যাপক ছিলেন না। পাঠশালার ছাত্রদের বেশীর ভাগ কাশীর সরকারী পরীক্ষা দিতো। পণ্ডিতজীর রায় হল যে আমি সম্পূর্ণ ন্যায়মধ্যমা পরীক্ষায় বসি। স্মরণশক্তি এখনো আমার ক্ষীণ হয়নি। কিন্তু মুখস্থকে আমি ভারী ঘৃণার চোখে দেখতাম। সেই জন্য সাফল্য সম্পর্কে সন্দেহ ছিল। আরো এগিয়ে সাংখ্য মধ্যমা (বিহার), সাধারণ দর্শন-মধ্যমা (কলকাতা), মীমাংসা-প্রথমা (কলকাতা)-র জন্যও ফর্ম ভর্তি করেছিলাম, যাতে বিহারের পরীক্ষায় তো দ্বিতীয় পরীক্ষার জন্য এই সময় পড়াশোনা করলেও বসতে পারতাম না। সেই বিষয়ে প্রথমা যে পাস করেনি, সে মধ্যমার জন্য বসতে পারতো না। এই নিয়মানুসারে সাধারণ দর্শন-মধ্যমায় বসার আমার অনুমতি মেলেনি।

শ্রাবণে রাসলীলা শুরু হওয়ার আগেই আমি কর্বী পৌঁছই। আগে রাসলীলা অনেকবার দেখেছি কিন্তু রাসলীলা দেখার এই প্রথম সুযোগ। রাত্রিতে দর্শক নর-নারীর খুব ভিড় লেগে যেত। মথুরার মণ্ডলী ছিল এবং পরখ করার লোকেরা খুব তারিফ করছিল। আমার কাছে তো তাদের সংলাপ অস্বাভাবিক, বেশভূষা অশিষ্ট এবং গান অশ্লীল মনে হয়েছিল। আমি তো একটা ব্যাপার দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম যে মণ্ডলীর অধ্যক্ষ তার ছেলে ও ভাইপোদের মধ্যে একজনকে রাধা আর একজনকে কৃষ্ণ সাজিয়ে এই প্রেমাভিনয়ে নাটকের অনুমতি কিভাবে দিতে পারে? কিন্তু এই ভাব প্রকাশ করার সময় আমি ভুলে যেতাম যে বাইরে থেকে দেখলে আমাকে বৈরাগী বলে মনে হত কিন্তু ভেতরের আর্যসমাজী চিন্তাধারা তাঁর বিরুদ্ধে যেত।

ন্যায়ের দুয়েকটি গ্রন্থ আমি পণ্ডিত গোবিন্দদাসজীর কাছে পড়েছিলাম এবং যোগসূত্র ও সাংখ্যকারিকা মুখস্থ করেছিলাম। শাস্ত্রী পরীক্ষায় ফেল করে এসেছিলাম কিন্তু পাঠশালার ছাত্র ও সাধুদের পক্ষ থেকে আমি শাস্ত্রীর অনারারি উপাধি পেয়েছিলাম। মোহন্তজীর ইংরেজী কাগজপত্র পড়াতে হলে, তিনি আমার খোঁজ করতেন এবং ঠিক সময়েই আমি তাঁর কাছে যেতাম। অন্য সময় তাঁর উত্তর কোণের দু-মহলা বৈঠকখানায় আমাকে কেউ কখনো যেতে দেখেনি। মোহন্তজী হয়তো একে বিদ্যার এবং পয়সার মতো বড় মঠের উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য আমার অহংকার বলে মনে করতেন। কিন্তু সহবাসী ছাত্র, অধ্যাপক ও সাধারণ সাধু একথা ভাবার মতো ভুল করতে পারত না। আমি সকলের সঙ্গে মিশতাম, সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলতাম, প্রয়োজন হলে সবাইয়ের সেবার জন্য প্রস্তুত থাকতাম। আশ্বিন মাস ছিল। দুপুরে এক যুবক সাধু হরিনারায়ণ দাসের প্রচণ্ড মাথা ব্যথা হতে লাগল। লোকজন তাঁকে ধরে রেখেছিল এবং সে পাকা মেজেতে মাথা ঠোকার চেষ্টা করছিল। লোকজন কোনো ওষুধের ব্যবস্থা করতে চাচ্ছিল। আমি বললাম,—'ডাক্তার ডাকতে হবে।' কিন্তু ডাক্তার ডাকতে যাবে কে? আমি যেতে রাজী হলাম। এই কাজে ফররুখাবাদের এক তরুণ সাধু আমার সঙ্গে এল। কর্বীতে এক বাঙালি ডাক্তার প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতেন। তাঁকে আমরা ডেকে নিয়ে এলাম। তিনি কয়েক ঘড়া ঠাণ্ডা জল হরিনারায়ণের মাথায় ঢাললেন। ধীরে ধীরে ব্যথা কমতে লাগল। সেই সময় আমরা জানতাম না যে আশ্বিনের কড়া রোদ এমন ভয়ংকর হতে পারে। সেই দিনই অযোধ্যা থেকে

মীমাংসকজী (মহীশূরের তামিল পণ্ডিত) এসে গেলেন। আমি তাঁর সঙ্গে ভরতকূপ ইত্যাদি তাঁকে দর্শন করাতে চলে গেলাম। কিন্তু এদিকে ফররুখাবাদী সঙ্গীকে কঠিন রোগে ধরল। তৃতীয় অথবা চতুর্থ দিন দুপুর নয়টায় যখন আমি ফিরে এলাম, তখন এ বিষয়ে জানতে পারলাম। তার কুঠরির দিকে গিয়ে দেখে ভাল লাগল যে সে আজ বিছানা থেকে উঠে বাইরে দাঁতন করছে। তার কপালে হাত রাখলাম। কপাল বরফের মতো ঠাণ্ডা, হাতও শীতল। তবু তাঁকে উঠে বাইরে দাঁতন করতে দেখে এবং বড় খিদে পেয়েছে বলতে শুনে তার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়াতে কোনো চিন্তা হয়নি। ফিরে যেই ঘরে এসেছি, অমনি খিচুড়ি রান্না করছিল যে সঙ্গীটি সে ছুটে এসে বলল—"দেখুন, সে তো পড়ে গেছে।" গিয়ে দেখলাম সেই নির্ভীক বন্ধু মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসা রক্ত মিশ্রিত কফে দুই আঙুল কাপড় ভিজে গেছে। তার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, নাড়ি ও হৃদ্‌যন্ত্রের গতি বন্ধ হয়ে গেছে। আশ্বিনের সেই বিপজ্জনক দুপুরে তাকে কেন আমি নিয়ে গিয়েছিলাম—তা নিয়ে আপসোস করলে আর কি হবে? যে সময় সব সহবাসী সাধুদের মধ্যে একজনও ডাক্তার ডাকতে আমার সঙ্গে যেতে রাজী হয়নি, তখন সে স্বেচ্ছায় গিয়েছিল। সে তার ছোট মঠে মোহন্ত হয়ে সর্বজনীন কাজ করার ব্যাপারে আমার সঙ্গে অনেক আলোচনা করেছিল। সেই সব কথা শীগগির ভুলে যাওয়ার নয়। আজ এই বন্ধুর শব দাহ করতে হবে। ওখানকার সাধুদের ব্যবহার দেখে আমার ক্রোধ ও ঘৃণা হয়েছিল। ত্যাগ ও বৈরাগ্যের এইসব ঠিকাদার, ভক্ত ও ভগবানের এইসব বিজ্ঞাপন-লাগানো সেবক তাদের এক সঙ্গীর শবকে মঠের পেছনে নদীর তীরে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে আসতেও তৈরি ছিল না। কাঠ যাই হোক মঠেই পাওয়া গেল। অনেক বলা কওয়ার পর দুয়েকজন সঙ্গী পাওয়া গেল। শবকে নিয়ে গিয়ে আনাড়ী হাতে তার চিতা তৈরি করলাম এবং তার ওপর অন্তর্লীন নতুন উদ্দীপনায় অনুপ্রাণিত এই তরুণের অচেতন দেহ রেখে আগুন জ্বালিয়ে দিলাম।

কর্বী থেকে চিত্রকূট ও আশেপাশের পাহাড় ও সাধুদের আশ্রম কাছেই ছিল। আমি বেশ কয়েকবার চিত্রকূট পরিক্রমা করতে গিয়েছি। তীর্থের উদ্দীপনা তো আর্যসমাজ মন থেকে দূর করে দিয়েছিল। বাল্মীকির যুগের এক ঐতিহাসিক স্থান হিসেবে এখনো তার প্রতি শ্রদ্ধা জন্মেনি। কিন্তু প্রকৃতি দেবীর বৈচিত্র্যের আকর্ষণ নিশ্চয় ছিল, যদিও হিমালয় দর্শনের ফলে তার সীমা পরিমিত হয়ে থাকতে পারে। চিত্রকূট পাহাড়ের পরিক্রমায় যে শতশত মন্দির, মঠ আর তাদের দোকানদারী, তাদের বাহ্য যোগ ও অন্তরভোগ আমার মনকে এখন আর ততটা বিকল করছিল না, কেননা আমি ধার্মিক জগতের 'খাওয়ার দাঁত ও দেখানোর দাঁত' সম্পর্কে ভালভাবেই জানতাম। চিত্রকূটের চূড়ায় উঠতে আমার খুব আনন্দ হত। পরিক্রমার অনেক স্থান পরিচিত হয়েছিল। তাই কোনো জায়গায় দুই গ্লাস জল খেতাম। কোথাও মধ্যাহ্নভোজন করতাম, কোথাও আধ ঘণ্টা গল্প করতে করতে পরিক্রমা সকাল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে সম্পূর্ণ হত।

যদিও এখানে সেই নদী ছিল যা কর্বীতে আমাদের পাঠশালার পাশ দিয়ে বয়ে যেত। কিন্তু আমার "চিত্রকূট কে ঘাট পর ভই সন্তনকী ভীড়" মনে পড়ত না। নদীর আরো ওপরে চিত্রকূট থেকে কয়েক মাইল পরে জানকীকুণ্ড। এখানে নদী পাথুরে জমির ওপর দিয়ে কলকল করে বয়ে যেত। জল স্বচ্ছ যাতে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ সাঁতার দিত। সাধুরা এখানে এক গ্রামই বসিয়ে দিয়েছিল। অধিকাংশ কুটির মাটির ঢিবি খুঁড়ে তৈরি করা হয়েছিল যা ভেতর থেকে শীতল মনে হত। এই ধরনের কুটির দেখেই তুলসীদাস তাঁর ঋষিদের আশ্রমের চিত্রণ করে থাকবেন। জানকীকুণ্ডের 'ঋষি' অনেক ব্যাপারে ভেদ রেখেও অনেক ব্যাপারে তাঁর পূর্বজদের সঙ্গে সমতা রাখতেন। আগের ঋষিদের মতো এঁরা সকলত্র ছিলেন না। কিন্তু এঁরা তাঁদের মতোই সপরিগ্রহ ছিলেন। আগের ঋষিদের মতো এঁরা শুধু বন্য কন্দমূল খেয়ে বাঁচতেন না। কিন্তু এঁরা তাদের

মতোই যূথবদ্ধ হয়ে অরণ্যে বাস করতেন। ইঙ্গুদি তেলকে এখানে কেউ পুঁছতো না।—এখানে তো রসিক সন্তদের (সখী-সন্তরা) সুদীর্ঘ কেশ থেকে চামেলী ও গুলরোগান চুঁইয়ে পড়ত। শেষতক যে সগুণ পূজাকে এরা একমাত্র পূজা বলে মনে করত, তাতে যৌবনের আনন্দ উপভোগ করেন যে সীতারাম, তাঁর অনুরূপই তো ভোগের সামগ্রী সংগ্রহ করা প্রয়োজন ছিল। জানকীঘাটে মাঝে মাঝে সীতারামদাস নামক এক যুবকের সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমার বড় ভাল লেগেছিল। সে বেশ প্রতিভাশালী ছাত্র ছিল। সে সিদ্ধান্তকৌমুদী প্রায় সমাপ্ত করেছিল। পড়াশোনা থেকে বৈরাগ্য এসেছিল। কিন্তু এখন আশেপাশের জঙ্গল, রাজাপুর, বান্দা প্রভৃতি জায়গায় মালপত্র ছাড়া ঘুরে বেড়াতে তার আনন্দ হত। সগুণ উপাসনা ও সখী দর্শনের প্রতি তাঁরও আমার মতো খুব ঘৃণা ছিল। সন্ত মোহন্তদের মোসাহেবী দেখে তারও বিরক্তি হত। কর্বীর বাজারে (কিরানা বাজার) এক রসিক সাধু এসেছিলেন। রসিক হওয়া সত্ত্বেও তিনি কিছুটা লেখাপড়া জানতেন। তাই তিনি লেখাপড়া জানা সাধুর সম্মান করতেন। সীতারামজীর সঙ্গে আমাকেও কয়েকবার তাঁর ওখানে যেতে হয়েছিল। কিরকম সৎসঙ্গ হত আমার মনে নেই। তবে সেখানে যেতে হলে খেয়ে আসতে হত। সীতারামজীর সঙ্গে একবার রাজাপুরও গিয়েছিলাম। যমুনায় স্নান এবং 'গোস্বামীজীর হাতে' লেখা রামায়ণের দর্শন করলাম। কয়েক পরত কাপড় সরিয়ে পূজারী হাতে তৈরী কাগজে লেখা খোলা পাতার পুস্তক দেখিয়ে বললেন—"কোনো সাধু এই পুস্তক চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল। ধরা পড়ার ভয়ে নদীতে ফেলে দেয়। তাই এতে জলের দাগ আছে।" আমার ঐ সময় কনৈলায় কৈথীতে লেখা রামায়ণ পুঁথির কথা মনে এল যা আমার ছেলেবেলায় বেশী না হলেও একশ' বা দেড়শ' বছরের পুরনো তো ছিলই এবং যা থেকে 'গোবিন্দ সাহেবের' নিচে রামায়ণ গান করা হত।

কর্বীর পূর্বে কিছুটা দূরে এক ব্রহ্মচারীর কুটির ছিল। একদিন সীতারামদাসজীর সঙ্গে আমরা সেখানে গেলাম। কুটিরের দেয়াল ও মেজে কাঁচা ছিল, কিন্তু তা খুব সাফ-সুতরো ও গেরিমাটিতে রঙ করা ছিল। কিছু ফুলগাছের চারা, পরিচ্ছন্ন ছোটমতো উঠান খুব সুন্দর লেগেছিল। বৈষ্ণব-বৈরাগীদের মুলুকে এই গেরুয়াধারী ব্রহ্মচারী কোথা থেকে এল? ব্রহ্মচারী সীতারামজীর বন্ধু ছিলেন। হয়তো সেই দিন তার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়নি। রাস্তায় আমরা বাজরার খই খেয়েছিলাম এবং আরো এগিয়ে পাহাড়ের কোনো গুহায় গিয়েছিলাম। শুনেছিলাম, রাত্রিতে এখানে বাঘ আসে। পাহাড়ের মধ্য হয়ে আমরা জানকীকুণ্ডের দিকে গেলাম। রাস্তায় ইঙ্গুদী, চিরৌঞ্জী ও অনেক রকমের ফলবান গাছ দেখলাম। সম্ভবত পাহাড়ের শেষে একটা কুটির ছিল। কোনো নির্জনতাপ্রিয় যোগী তা তৈরি করে থাকতে পারে। যোগীর বিচারে পরিবর্তন এলো, সে রামের যুগের ঋষিদের মতো সহযোগী হয়ে গেল। কিন্তু আজ দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় প্রজন্মে গৃহস্থরা একে সাধারণ দরিদ্র গৃহস্থের বাড়িতে পরিণত করেছিল। এই কুটিরের অঙ্গনে এখন নগ্ন বাচ্চারা খেলা করছিল এবং ছেঁড়া শাড়ি পরা মেয়েদের সঙ্গে দারিদ্র্য ও দৈন্য চলাফেরা করছে তা দেখা যাচ্ছিল।

চিত্রকূট থেকে দণ্ডকারণ্যের রাস্তায় যাওয়ার আকর্ষণ খুব বেশী ছিল আমার। কিন্তু এত বড় কঠিন কাজের সময় পাব কি করে? অনসূয়ার আশ্রমে আমি একবার গিয়েছিলাম। পাহাড় ও ঘন জঙ্গল, সব জায়গায়ই জংলী জানোয়ারের সম্ভাবনা ছিল, তবু এই জংলী গ্রামগুলিতে গরু-মোষ অনেক দেখা যেত। চারণভূমি যথেষ্ট থাকলে বাঘ নেকড়েরা গরুর সংখ্যা কমাতে পারেনা। বিন্ধ্যাটবীতে ঢোকার সময় বাণের হর্ষচরিতে বোনের খোঁজে হর্ষ ও দিবাকর মিত্রের আশ্রম ঘুরে বেড়ানোর কথা মনে এলো এবং জঙ্গলে এক কৃষ্ণকায় ব্রাহ্মণকে দেখে কাদম্বরীর জরদ দ্রবিড় ধার্মিকের কথা মনে এল। 'আশ্রম' ছিল নদীর বাঁ দিকে। সেখানে একটা ধর্মশালা ছিল। আমরা

রান্না করতে শুরু করছিলাম, আকাশে ধোঁয়া মেঘের ছবি আঁকছিল, তখন দেখা গেল পেছনের পাহাড়ের পাথরের গায়ে কাল-কাল, বড়-বড় মৌচাক (মধুচ্ছত্র) ঝুলছে। সময়ের ভাগে আমরা সজাগ হয়ে গিয়েছিলাম এবং আগুনকে অন্যদিকে নিয়ে গেলাম, নয়তো এই লম্বা মৌমাছি যদি আমাদের অপরাধকে তাদের মর্যাদার অপমান বলে মনে করত, তা হলে আমাদের সেখান থেকে প্রাণ নিয়ে চলে আসা মুশকিল হত। আমি শুনে বিস্মিত হলাম যে গ্রামের লোক রাত্রিতে মশাল জ্বালিয়ে বাঁশ অথবা দড়ি দিয়ে কয়েক'শ হাত উঁচুতে পাথরের চাঙ্গড়ে ঝুলন্ত মৌচাক ভেঙে মধু সংগ্রহ করে, আমি তো এটা ভেবেই ভয় পাচ্ছিলাম। ভালুকও এই মৌচাক-এর মধু খায়, একথা আমি নতুন জানলাম, যার ফলে পরে এর রুশী নাম মেদ্বেদের (মধু-অর) অর্থ বোঝা সহজ হল।

কর্বীতে থাকার সময়ই জানকীঘাটের (অযোধ্যা) এক সাধু একটা হস্তলিখিত পুস্তক এনেছিলেন। বলেছিলেন এই গ্রন্থের পরিচয় সংক্রান্ত অংশ বাদ দিয়ে কপি করুন। আমরা একে বেদান্তসূত্রের রামানন্দ ভাষ্য বলে প্রকাশ করব। আমি এই বইয়ের অনেকটা পড়েছিলাম। এই বইটি কোনো মহাত্মা তুলসীদাস রচিত বেদান্তভাষ্য ছিল যাতে অদ্বৈত বেদান্ত খণ্ডন করে দ্বৈতবাদের প্রতিপাদন করা হয়েছিল। আর্যসমাজী মতবাদ গ্রহণের পর আমি শংকরের অদ্বৈতবেদান্ত ছেড়ে দ্বৈতবাদী হয়ে গিয়েছিলাম। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী এই ভাষ্য ও টীকার বক্তব্য আমার ভাল লাগত। কিন্তু তুলসীদাসের নাম বাদ দিয়ে এই বই রামানন্দের নামে প্রকাশিত করা অনুচিত বলে মনে হয়েছিল। তাই আমি তা করতে রাজী হইনি। পরে জানতে পেরেছিলাম, এই কাজ অন্য কেউ করেছিল।

কর্বীর সঙ্গীদের মধ্যে পণ্ডিত ইন্দিরারমণ আমার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তাঁর ব্যবহারিক বুদ্ধি কম ছিল জেনেও তাঁর অধ্যয়ন প্রতিভাকে আমি শ্রদ্ধা করতাম। এ ছাড়াও আর একটা বিষয় ছিল যা আমাকে তাঁর অজ্ঞাত অনুরাগীতে পরিণত করেছিল। ইন্দিরারমণজীর জন্ম হয়েছিল ছাপরা জেলার এক গোসাঁই বংশে। গোসাঁই বংশের হিন্দুদের মধ্যে কত উঁচু স্থান তা এতে স্পষ্ট যে বেশ বয়স্ক ব্রাহ্মণও গোসাঁই বংশের ছোট ছেলেব কাছে মাথা নত করে। পন্দহাতে আমার দাদুর এক গোসাঁই বন্ধু আসতেন। তাঁর কালো বড় বড় গালের গুচ্ছ গোঁফ ও গলায় রেশমের এক সুতোয় গাঁথা রুদ্রাক্ষ আমার এখনো মনে পড়ে। দাদুর শিক্ষা অনুসারে তাঁকে দেখলেই 'নম্মো নারায়ণ' (নমো নারায়ণ) বলে উঠতাম। আমার পক্ষে অনেক আগে থেকেই একথা বিশ্বাস করা অসম্ভব ছিল যে গোসাঁই ছোট জাতি। এখন তো ভেতরে ভেতরে আমি পাকা আর্যসমাজী। সাধুদের গোসাঁই বলে তাদের হীন মনে করা আমার পক্ষে অসহ্য ছিল। হয়তো বৈরাগী বৈষ্ণবরা জন্মসূত্রে শংকর মতানুযায়ী হওয়ায় তাদের গোস্বামী গৃহস্থদের সম্পর্কে এই ধরনের বিরুদ্ধতা ছিল। ইন্দিরারমণজীর বন্ধু তাঁকে ব্রাহ্মণ-বংশীয় বলতেন। আমিও ব্রাহ্মণ বলে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের তিরস্কার করতাম। যেহেতু আমি স্বয়ং ছাপরা জেলার এক মঠের 'উত্তরাধিকারী', তাই আমার কথার কোনো জবাব ছিল না তাঁদের কাছে। তা দেখে আমার কখনো কখনো চিন্তা হত। মাঝে মাঝে তাঁদের কথায় ইন্দিরারমণজীর যন্ত্রণা হত। কিন্তু তখন মনে হয়নি যে এই অপমান তাঁকে সাধুর স্বাধীন জীবন থেকে সরিয়ে কর্বীর গৃহস্থ জীবনের জঞ্জালে ফাঁসিয়ে দেবে। অথচ এই জীবন তার বৃদ্ধ অবস্থার জন্য অত্যন্ত সহায়ক হতে পারত। ছাপরায় রাজনৈতিক কাজ করার সময় প্রথম প্রথম যখন এই ব্যাপারটা বুঝতে পারি, তখন আমার খুব বড় ধাক্কা লেগেছিল। গৃহস্থ হলে লোকের নুন-তেল-কাঠ থেকে ছুটি মেলে না। সে নিজের জীবনকে বিশেষ কার্যের জন্য কিভাবে তৈরি করতে পারে?

কর্বীর সঙ্গীদের মধ্যে আর এক সীতারামদাস (মিথিলাবাসী) ছিল। তিনি লেখাপড়ায় দুর্বল

ছিলেন। কিন্তু তাঁর হৃদয় অত্যন্ত কোমল ছিল। সর্বজনীন সেবার ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে বরাবর আলোচনা হত। রোগী সাধুদের কি রকম অনাথ করে ছেড়ে দেওয়া হয় সে অভিজ্ঞতা আমার চেয়ে তাঁর বেশী ছিল। আমি তাঁকে বললাম—আপনি এমন কোনো জায়গা তৈরি করুন যেখানে রুগ্ন সাধুদের ভালভাবে সেবা শুশ্রূষা হয়। তিনি সে জন্য পরিকল্পনা তৈরি করতে শুরু করেন। আমার মন থেকে আমি এই ব্যাপারে বুঝতে পেরেছিলাম যে, দেশ পর্যটনের সাধ প্রথম পূর্ণ না করলে হয়তো পরে তাকে নিজের কাজ বন্ধ করে বেরোতে হবে, তাই প্রথম এই সাধ পূর্ণ করে নিতে তাঁকে পরামর্শ দিই। দুয়েকবার প্রয়াগ, বেনারস, হয়তো বা জব্বলপুরও আমার সঙ্গে তিনি ঘুরে এসেছিলেন। কবীর শেষ দিনগুলিতে আমার কাছে দুটো ল্যাঙ্গট, একটা আঁচলা (যা পরে এক কম্বলের আলখাল্লায় পরিণত হয়েছিল) এক গামছা ও এক লাউয়ের কমণ্ডলু মাত্র থাকত। আমি আমার সঙ্গীকে বললাম—ব্যস, এই বেশ ধারণ কর আর টাকাকড়ি কিছু না নিয়ে 'চারো মুল্ক জাগীরীমে' বলে মনে কর। পরে ভ্রমণের সময় এক জায়গায় সীতারামজীর শুধু একবার খোঁজ পেয়েছিলাম। কিন্তু কখনো দেখা হয়নি।

ন্যায়মধ্যমা পরীক্ষায় সিদ্ধান্তলক্ষণ ও 'সিংহব্যাঘ্রলক্ষণ'-এর ওপর জাগদীশী টীকাও ছিল। তা পড়বার জন্য আমাকে বেনারসে যেতে হয়েছিল। নন্দন সাহুঁর গলিতে স্বামী বেদানন্তজীর ওখানে উঠেছিলাম। পড়াশোনার জন্য রণবীর পাঠশালাতে (হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়) আমি উৎকল পণ্ডিত শ্রীকর শাস্ত্রীর ওখানে যেতাম। শ্রীকর শাস্ত্রী পুরনো পণ্ডিতদের সেই প্রজন্মের অবশেষ ছিলেন যাঁদের পুত্র ও শিষ্যের প্রতি স্নেহের মধ্যে বিশেষ ব্যবধান আছে বলে মনে হত না। পাঠ হয়ে যাওয়ার পর আলোচনা শুরু হত। তিনি কাশীতে পড়তে এসেছিলেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর এখানেই থেকে গেছেন। কাশীর কোনো বড় পণ্ডিত পয়সার লোভে কাশীর বাইরে যেতে চাইতো না। আমি যখন মোতিরাম বাগিচায় থাকতাম তখন অস্সীর তীরে শ্রীকর শাস্ত্রীর মতোই এক বৈয়াকরণ পণ্ডিত থাকতেন। তাঁর রোজ ভাঙের গোলা দরকার হত। তিনি ব্যাকরণের ভাল পণ্ডিতদের মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি নগওয়াতে ১০ অথবা ১২ টাকা বেতনে পড়াতেন। একবার এক রাণী তাঁকে মাসিক ৬০ অথবা ৭০ টাকা এবং আহার ও কাপড়-চোপড়ের বিনিময়ে তাঁর রাজধানীর পাঠশালায় পড়ানোর জন্য পাঠান। কিন্তু দেখা গেল পণ্ডিতজী একমাসের মধ্যেই ফিরে এসে অস্সী সঙ্গমস্থলে ভাঙ তৈরি করছেন। বলছিলেন—ষাট টাকার জন্য আমি সব পড়াশোনা ও পড়ানোর বিদ্যা ভুলে যাওয়ার জন্য ওখানে থাকব? ওখানে তো লঘুকৌমুদীর বেশী পড়ছে এমন ছাত্রই পাওয়া যায় না। আবার আমার 'পরিষ্কার' ও ফক্কিকা-বিমর্ষ তো শিকেয় তোলা থাকত। কাশীতে তাঁর একটা নিজস্ব বাড়ি হোক, এর বেশী কোনো কামনা শ্রীকর শাস্ত্রীর ছিল না। আমি দুয়েকমাস তাঁর কাছে পড়েছিলাম কিন্তু এরই মধ্যে আমি তাঁর প্রিয় শিষ্যদের একজন হয়ে গিয়েছিলাম।

কাশীতে যেতেও আমি ভয় পেতাম। তাই সেখানে থাকার তো প্রশ্নই ছিল না। কেননা সেখানে কনৈলার আশেপাশের কোনো মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ার ভয় ছিল। একদিন টাউন হলের সীমানার মধ্যে আর্যসমাজের বার্ষিক উৎসবে গেলাম। দেখলাম, আমার পেছনের সারিতে এক চেয়ারে রামাধীন পাণ্ডে বসে আছেন। আমার নজর সেদিকে যেতেই চোখাচোখি হয়ে গেল। তিনি জিগ্যেস করলেন, "বাড়ি যাবে না?" কী জবাব দিয়েছিলাম, মনে নেই। কিন্তু বিপদের ঘণ্টা যে বেজে গেছে তাতে আর কোনো সন্দেহ রইল না। ভাগ্য ভালো, আমার পাঠ্যপুস্তকগুলি সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

কবীতে ফিরে গিয়ে আবার পরীক্ষার জন্য তৈরি হতে লাগলাম। কিন্তু সম্পূর্ণ ন্যায় মধ্যমাতে যত গ্রন্থ মুখস্থ করার ছিল, তা এই অল্প সময়ে সাধ্য ছিল না।

শীতকালে কর্বীর জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার খরেঘাট বিয়ে করে ফিরেছিলেন। ঐ সময়ের বড় লোকেরা কোনো উপলক্ষে বড় হাকিমকে ভোজ দেওয়া তাঁদের কর্তব্য বলে মনে করতেন। এই ব্যাপারের ঐতিহ্য ও নিয়ম তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এদিকে মোহন্ত জয়দেব দাসজী হালেই অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন। অভিজ্ঞ লোকেরা পরামর্শ দিলেন, জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেকটর সাহেবকে ভোজ দেওয়া উচিত। ভোজের প্রস্তুতিও চললো। ছাপরা যাতায়াত করেন এমন একজন সাধু মোহন্তজীর মোসাহেবদের মধ্যে ছিলেন। যখন তাঁর কাছে জানতে পারলাম যে, প্রয়াগের এক ইংরেজ কোম্পানীর (কেলনর?) ওপর ভোজের খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করার ভার দেওয়া হবে, তখন বুঝতে পারলাম যে তাতে গোমাংসও থাকবে। ওদিকে পাশের মঠ রামবাগের মোহন্তের সঙ্গে আমাদের মোহন্তের বিশেষ প্রীতির সম্পর্ক ছিল না। আমি ভেবে দেখলাম, এই খবর তাঁর কাছেও পৌঁছে যাবে এবং তিনি তা খবরের কাগজে ছাপিয়ে দেবেন। যদিও এখনও আমি ষোল আনা উগ্র জাতীয়তাবাদী ছিলাম এবং এই ধরনের ইংরেজ ও তাদের খোশামুদেদের প্রতি আমার ঘৃণা ছিল, তবু মোহন্ত জয়দেবদাসজীর মধ্যে অনেক গুণ ছিল। সেই কারণেই আমি তাঁর এই একটি দুর্বলতার দিকে নজর দিতাম না। তাই শুভকামনার প্রবর্তনাতেই আমি তাঁর মোসাহেবকে বলেছিলাম, "ইংরেজরা তাদের খাবারে গোমাংসকে আবশ্যিক বলে মনে করে না। বিশেষ করে, মোহন্তজীর মতো ধার্মিক ব্যক্তির তরফ থেকে তা প্রস্তুত হলে তারা ভেতরে ভেতরে তাঁকে ঘৃণা করবে, তাই খাদ্য তালিকা থেকে তা বাদ দেওয়া উচিত। মোহন্তজী ইতস্তত করছেন দেখে তাঁর 'রাজভক্ত' শিষ্যরা যাদের এই ধরনের ভোজের ব্যবস্থা করে ধন্য হওয়ার সুযোগ মিলেছিল, তারা মোহন্তজীকে এই বলে ভয় পাইয়ে দিল যে, তা করা হলে কালেকটার সাহেব সেটাকে নিজের অপমান বলে মনে করবেন। তাহলে যে দেবতার মৃদু হাসির প্রতীক্ষা করা হচ্ছিল, তার লাল চোখ কে দেখতে চায়? মোহন্তজী বলে দিলেন, "আমরা জমিদার, আমাদের সরকারের দরবারেও কাজ থাকে। তাই ভোজে যে সব জিনিষ দরকার তা আনা হবে।" আমার মনে এর বিশ্রী প্রভাব পড়েছিল। হিন্দুদের মধ্যে গো-ভক্তি যে কতটা মৌখিক এ তার এক জ্বলন্ত প্রমাণ।

যদিও ভোজ হচ্ছিল খরেঘাট সাহেবের বিবাহ উপলক্ষে কিন্তু এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল অনারারী ম্যাজিস্ট্রেটের পদ দেওয়ার জন্য বান্দার কালেকটারকে (ইংরেজ) ধন্যবাদ দেওয়া। তবু খরেঘাট দম্পতির নামেই অভিনন্দন ইত্যাদি তৈরি করার কথা ছিল। পণ্ডিত গোবিন্দদাস ও পণ্ডিত জগদীশ ত্রিপাঠীর অভিমত হলো যে, এই সময় কিছু সংস্কৃত পদ্য খরেঘাট সাহেবকে দেওয়া হোক। তাঁর পাঠশালার সার্থকতাও এতে হবে বলে মোহন্তজী মনে করলেন। তিনি পণ্ডিতদের এই প্রস্তাবকে মেনে নিলেন এবং পণ্ডিতদের ওপর তাঁর প্রসন্নতার কথাও জানালেন। অন্য লোকেরা পদ্য লিখতে শুরু করে দিল কিন্তু তাতে কেউই সফল হল না। অতএব এই ভার পড়ল 'শাস্ত্রী'জীর (আমার) ওপর। মনে নেই, কত পদ্য লিখেছিলাম কিন্তু পাঁচ ছয় পাতার কম লিখিনি। হাতের লেখা ভাল হওয়ায় কবি ও লেখক এই দুয়েরই কাজ আমাকেই করতে হল। সংস্কৃত কবিতাতে গোমুত্রিকা, মৃদঙ্গ, পদ্ম ইত্যাদি কয়েকটি পদ্যবন্ধ রচনা করেছিলাম, একটি গীতিকাও ছিল এবং শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার মিশ্রিত কোনো রচনা ছিল। হিন্দির একটি গদ্য সংস্কৃত ছন্দে ছিল যাতে আমি খরেঘাটের পার্সী বংশের প্রশংসা করতে গিয়ে দাদাভাই নওরোজী, স্যার ফিরোজশাহ মেহতা ও স্যার দীনশা ওয়াচার গুণের ব্যাখ্যা করেছিলাম। লাল-কালো কালিতে সাদা মসৃণ মোটা কাগজে লেখা হওয়ার পর যারা অর্থ বোঝেনি তাদেরও কাগজের এই পৃষ্ঠাটি দেখতে ভাল লেগেছিল। এই সময়ে কেউ মোহন্তজীকে গিয়ে বলে দিল, কবিতায় দাদাভাই নওরোজী প্রভৃতি সরকার বিরোধীদের নাম আছে।

'ঝোলী-চুক্কে'র দল মোহন্তজীকে পরামর্শ দিল। —তখন তো 'পুত মাংনে গই পতি খা আই'—এর মতোই কথা হবে। মোহন্তজী পণ্ডিত জগদীশ তেওয়ারীকে বললেন যে, কবিতা থেকে ঐ অংশ বাদ দেওয়া হোক। একথা শুনে আমার বড় ক্ষোভ হল কেননা আমি নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মোহন্তজীর ইচ্ছা পূরণের জন্যই এই সব করছিলাম। আমি ত্রিপাঠীজীকে বলে দিলাম যে, মোহন্তজী অন্যায়ভাবে এই সব খোশামুদে অর্থলোভীদের পাল্লায় পড়েছেন। যদি স্বয়ং খরেঘাট সাহেবকে আপনারা জিগ্যেস করেন, তবে তিনি তাঁর প্রসঙ্গে দাদাভাই নওরোজী প্রভৃতির নামের উল্লেখ গৌরবের বস্তু বলেই মনে করবেন। কবিতার ঐ অংশ বাদ দেওয়ার ইচ্ছা দেখে আমি বলে দিলাম, "আমি একটা পৃষ্ঠাও দেব না।" তাঁরা জানতেন যে আমার বন্ধু পণ্ডিত গোবিন্দদাসজীর আহ্বানেই আমি কর্বীতে এসেছি, তাই কাউকে খুশী করার জন্য আমি অতদূর যাব না। ভোজের দিন খরেঘাট দম্পতি ঘণ্টা দেড়েক আগে এসেছিলেন। জগদীশ পণ্ডিত তাঁদের মঠের অনেক অংশ দেখাতে নিয়ে গেলেন। সেই সময় তিনি দাদাভাই নওরোজীর নাম যুক্ত কবিতার উল্লেখ করেছিলেন। খরেঘাট সোৎসাহে বললেন, "কোনো বাধা নেই। কালেক্টার কি ক্ষুণ্ণ হবেন?"

কবিতা পড়া হল। দ্বিতীয় দিন কবিতার অর্থ বোঝানোর জন্য খরেঘাট আমাকে তাঁর বাংলোয় ডেকে পাঠালেন।

কাশীর ন্যায়মধ্যমা পরীক্ষা দিতে যেতে হয়েছিল প্রয়াগে এবং কলকাতার মীমাংসা প্রথমার জন্য জব্বলপুরে। মধ্যমাতে অনুত্তীর্ণ, মীমাংসা প্রথমাতে পাস করেছিলাম প্রথম শ্রেণীতে।

মার্চের শেষে আমরা জঙ্গলে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে ফিরে আসার পর জ্বর এল। এদিকে ভাই সাহেব লাহোরে শাস্ত্রী পরীক্ষার ফি দিয়ে দিয়েছিলেন। গোটাবছর এই বইগুলি পড়ার সুযোগই মেলেনি। অতএব ফর্ম ভর্তি করলে কি হবে, পরীক্ষায় পাস করা যাবে কিভাবে? এখন এক লম্বা যাত্রায় বেরিয়ে পড়ার ইচ্ছা ছিল। সেই সঙ্গে লাহোরের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করার অবকাশও ছিল।

১০

আবার ঘুমক্কড়ীর: ভূত (১৯২০ খ্রীঃ)

কর্বী ছেড়ে আসার সময়ও জ্বর আমাকে ছাড়েনি। পয়সা ছিল না। তাই গোটা যাত্রাটা 'দশ-আনা-ছ-আনায়' করার ছিল। 'দশ-আনা-ছ-আনা' বিনা টিকিটে রেলযাত্রার নাম। ধরে নেওয়া হয় যে, সব সম্পত্তির ছয় আনা রাজার অংশ এবং ট্রেনে সফর করার সময় আমরা সেই ছয় আনার অধিকার কার্যকর করি। পুরো যাত্রাতে আমি কোনো স্টেশনে লুকিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করিনি এবং কোথাও টিকিট চেকারের হাত থেকে বাঁচতে চাইনি। দিল্লিতে লাহোরগামী ডাকগাড়িতে যেতে বাধা দিয়েছিল কিন্তু আবার কি মনে করে টিকিট কালেক্টর আমাকে ছেড়ে দিল।

জ্বর সত্ত্বেও পরীক্ষায় বসলাম। ব্যাস, পরীক্ষার ব্যাপার এই পর্যন্তই মনে আছে। বলদেও, রামগোপাল ও ভাইসাহেবের সঙ্গে দেখা হল। কয়েক বছরের জন্মে-ওঠা ভাব আমার মনে বুদ্ধের প্রতি পরম শ্রদ্ধা জাগ্রত করেছিল। এদিকে তাঁর জীবনী পড়ার পর বুদ্ধের জীবনের সঙ্গে যে সব স্থানের সম্বন্ধ ছিল তা দেখার জন্য ঔৎসুক্য বেড়ে ছিল। এবার তা দেখার সিদ্ধান্ত নিলাম। ফেরার সময় জলন্ধরে নামলাম। সন্তরামজী আমার ইচ্ছার কথা শুনে এইসব স্থান সম্পর্কে 'ভারতী'র (কন্যা মহাবিদ্যালয়ের মুখপত্র) জন্য লিখতে বললেন। 'ভাস্করের' পরে এই হিন্দিতে আমার প্রথম লেখা এবং ভ্রমণ সম্পর্কে তো এই সবচেয়ে প্রথম লেখা।

জলন্ধর ছাড়া আর কোথাও নেমেছিলাম কিনা আমর মনে পড়ছে না। বেনারস পৌঁছনোর পরও দেহ থেকে জ্বর যায়নি। স্বামী বেদানন্দজী পণ্ডিত ছন্নু লাল বৈদ্যর ওখানে নিয়ে যান। তাঁর ওষুধে নিশ্চয় লাভ হল কারণ এর পর আর জ্বরের কথা আমার মনে নেই।

আবার সারনাথ গেলাম। ঐ সময় পুরনো ধ্বংসাবশেষ, অশোক স্তম্ভই প্রধান দর্শনীয় স্থান ছিল। মহাবোধি সভার একটা ছোটমতো দালান এবং তাতে ছোট পাঠশালা ছিল। সারনাথ থেকে সোজা তহসীল দেওরিয়া হয়ে কসয়া যেতে আজমগড় জেলা পড়ে। তাই আমাকে ছাপরার রাস্তা ধরতে হল। পরসা সেই রাস্তায় হওয়ায় সেখানে দুয়েকদিন থাকলাম। মোহন্তজী আমার সম্পর্কে নিরাশ হয়ে উত্তরাধিকারী করার জন্য নিজের ভাইপোকে চেলা করে নিয়েছিলেন। এতে শুধু আমার একটা ব্যাপার খারাপ লাগল যে বরদরাজ ও বীররাঘবের মতো মোহন্তপদের উপযুক্ত দুই শিষ্য আগে থেকেই সেখানে ছিল। আমি রাজী না হওয়ার পর তাদের দুজনের মধ্যে একজনকে উত্তরাধিকারী বানানো উচিত ছিল। কিন্তু যে রাজনৈতিক আদর্শবাদের দিকে আমি পা বাড়িয়েছিলাম, তার পরিপ্রেক্ষিতে পরসা মঠের কু ব্যবস্থা অথবা সুব্যবস্থার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল না।

সন্ধ্যা নাগাদ আমি তহসীল-দেওরিয়া স্টেশনে নামলাম। রাত্রিতে বাজারের বাইরে কোনো মন্দিরে উঠলাম। সকালে সেখান থেকে কসয়ার পথ ধরলাম। এপ্রিলের শেষ অথবা মে-র প্রথম। রোদ ও বোঝা ভ্রমণের সময় আমার সবচেয়ে বড় শত্রু। বোঝার ব্যাপারে আমি নিশ্চিত ছিলাম। হাঁটু ছাড়িয়ে একটা পাতলা কম্বলের আলখাল্লা ও দুটি ল্যাঙ্গট ছাড়া একটা গামছা ব্যস, এই আমার কাপড়চোপড়। জল খাওয়ার জন্য লাউয়ের এক কমণ্ডলু। খালি মাথা, খালি পা। হয়তো দুয়েকটা বই ছিল। হাঁ, রোদের ভয় অবশ্যই ছিল এবং তার একই ওষুধ ছিল—বেলা নয়টা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত চলাফেরা না করা। দুপুরে আমি রাস্তার কোনো একটা মাদ্রাসায় উঠলাম। সেখানে গোরখপুর জেলার ম্যাপ দেখতে গিয়েছিলাম। পরে শিক্ষক আমাকে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করলেন। বিকেলে সড়কের বাঁ দিকে এক নতুন আমবাগান দেখলাম। কুয়া ও এক পাকা চত্বরও ছিল। আরো কিছুটা দূরে জমিদারের পাকা বাড়ি এবং গ্রাম। আমার খেতে ইচ্ছে করছিল না। তাই গ্রামে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল না। সেখানে চত্বরে শুয়ে বিকেলের ঠাণ্ডা দমকা হাওয়া আমার খুব ভাল লাগছিল।

সকালে চলার সময় খিদে হচ্ছিল। সড়ক থেকে বাঁ দিকে এক বৈরাগী মঠের কথা শুনেছিলাম, তাই প্রথম সেখানে গিয়ে খিদে মেটানোটাই খুব জরুরী মনে হয়েছিল। গ্রাম থেকে রামাভারের (মুকুটবন্ধন—বুদ্ধ-শবদাহ) পুকুর কাছেই ছিল। হয়তো মঠের কিছু দালানে পুরনো ধ্বংসাবশেষের ইটও লাগানো হয়েছিল। সাধু বলছিলেন যে মাথাকুঁঅর রাজকুমার ছিলেন। তাঁর বোনের নাম ছিল রামা। কুশীনগরের কালো পাথরের বুদ্ধমূর্তি ছিল রাজকুমার। মাথাকুঁঅরের এবং বুদ্ধের চিতাস্তূপ রাজকন্যার (রামাভারের) স্থান। আমি মাথাকুঁঅর (কুশীনগর) যাব বলায় তিনি বলে উঠলেন—তুমি কি বর্মীদের দেবতাকে দর্শন করতে যাবে?

কসয়াতেও ।এক   বৈরাগী মঠে উঠলাম। তাতে স্কুলের মিড্‌ল ক্লাসের কিছু ছেলেও থাকত। আমি মজা করার জন্য কিছু প্রশ্ন করলাম। তা থেকে ছেলেরা বুঝতে পারল যে আমি স্কুলের লেখাপড়া জানা লোক। এতে আমার মর্যাদা বেড়ে গেল।

বিকেল পাঁচটার পরে বুদ্ধের নির্বাণস্থানে (মাথাকুঁঅর) গেলাম। দিনের রোদের দহনতা তেজ হারিয়ে এখন সোনালি রঙে পরিণত হয়েছে। ভূমিও আমার খালি পায়ের পক্ষে অসহ্য ছিল না। শিশু গাছের সদ্যোজাত কোমল পাতা অনেক দূর পর্যন্ত ভূমিকে তার ছায়ায় ঢেকে রেখেছিল। আমি বুদ্ধের জীবনীগুলি পড়েছিলাম। অবশ্য মূল প্রাচীন ভাষায় নয়। সেই ভূমিতে পা দেওয়ার সময় আমার হৃদয়ের টান পড়েছিল। আড়াই হাজার বছর পূর্বের সেই মহান ভারতীয়-এর দিকে, যে তার জন্মভূমির নাম সারা জগতে ছড়িয়ে দিল, এবং জগতের এক-তৃতীয়াংশ মানুষের জন্য ভারতকে পুণ্যভূমি বানিয়ে দিল।

ধ্বংসাবশেষের বাইরে শিশুগাছের পাশে সাদা সাদা না ছোঁয়া ভস্ম দেখলাম। জিগ্যেস করে জানতে পারলাম মহাবীর মহাস্থবির সদ্য মারা গেছেন। তাঁকে এখানে দাহ করা হয়েছে। মহাবীর স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে না পারায় আমার আপসোস হল। কয়েকশ' বছরের মধ্যে তিনিই প্রথম উত্তর ভারতীয় ছিলেন যিনি ভিক্ষুসঙ্ঘে প্রবেশ করেছিলেন। মহাবীরসিংহ, কুঁঅরসিংহের আত্মীয়ের মধ্যে ছিলেন এবং ১৮৫৭-র স্বাধীনতার সংগ্রামে তিনিও কুঁঅরসিংহের সঙ্গে ছিলেন। পরে অন্যান্য বীরের মতো তাঁকেও বেশভূষা পালটে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতে হল। তিনি পালোয়ান ছিলেন। তাই রাজাদের ওখানে কুস্তির কৌশলাদি দেখাতেন। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে তিনি লংকায় (সীলোন) পৌঁছন। ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়ায় এক ভিক্ষু তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করেন এবং এই ভিক্ষুর কাছ থেকেই তিনি বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে পরিচিত হন। বর্মার পতনের আগে তিনি সেখানে গিয়ে ভিক্ষু হয়েছিলেন। বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা মহাবীর স্বামীকে ভক্ত বানিয়ে দিয়েছিল। তিনি বৌদ্ধধর্মের মহিমময় ইতিহাস শুনে আবার একবার এই আত্মবিস্মৃত দেশে বুদ্ধের স্মৃতিকে জাগ্রত করতে উৎসুক হয়ে ওঠেন। এই অভিপ্রায়েই তিনি কুশীনগরে মঠ স্থাপন করেন এবং শেষ জীবন এখানেই কাটান।

মহাস্থবির চন্দ্রমণি ততটা বৃদ্ধ হননি। মহাবীর বাবার তিনি সহায়ক ও উত্তরাধিকারী ছিলেন। তার সঙ্গে দেখা হওয়ায় বুদ্ধের জীবনী ও কুশীনগরের মল্লদের ব্যাপারে এবং আরো অনেক বিষয়েজানতে পারি। তিনি দরজা খুলে নিদ্রিত বিশাল মূর্তিকে দেখালেন। তাঁকে পূজা করার জন্য আমার মাথা, হৃদয় ও হাতকে আর্যসমাজী মতবাদও বাধা দিতে পারেনি। এর ব্যাখ্যা আমি এভাবে করলাম—আমি ঈশ্বরের মূর্তিকে তো পূজা করছি না। আমি এক ঋষির প্রতি আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছি।

রাতটা কসয়াতে কাটিয়ে সকাল বেলা আবার আমি দেওরিয়া রওনা হলাম। দুপুর কাটল তরকুলহওয়াতে। আমার এক কবীর বন্ধুর জন্মস্থান এরই আশেপাশের কোনো গ্রামে ছিল। আমি তাকে খ্যাপাতাম—রামসুন্দর দাস, তরকুলহিয়া ভবানীর তৈরি ব্রাহ্মণ। আশেপাশের অনেক লোক যাদের বাড়িতে যজ্ঞোপবীত-সংস্কার করানোর না আছে টাকা, না তারা বিন্ধ্যাচলেও যেতে পারে এবং মা-বাবা যাদের জন্য মানত করেছিল, তারা তরকুলহিয়া ভবানীর স্নানের জলের নালায় পৈতা ডুবিয়ে পরে নেয়। রামসুন্দর দাস বুঝতে পারতেন যে পৈতা নিয়ে তার সঙ্গে মজা করা হচ্ছে। আসলে তাকে বিন্ধ্যবাসিনীর নালায় পৈতা ডুবিয়ে তা পরানো হয়েছিল। রামসুন্দর দাস আমার হৃদয়ের একটি উত্তম স্থান অধিকার করেছিল কেননা কবীঁতে সেই ছিল একমাত্র লোক যে ইন্দিরারমণজীর পক্ষ খোলাখুলি সমর্থন করত।

দেওরিয়া থেকে গোরখপুর স্টেশনে নেমে যখন আমি বাইরে যাচ্ছিলাম, তখন টিকিট

কালেকটর টিকিটের জন্য বিশেষভাবে জিগ্যেস করেননি। কিন্তু আমার নিবাস স্থান সম্পর্কে জিগ্যেস করতে চাইলেন। যখন 'রমতা' সাধু বললাম, তখন তাঁর আরো দৃঢ় ধারণা হয়ে গেল যে আমি গোয়েন্দা পুলিশের অফিসার। তিনি নরম সুরে বললেন, 'না, আমি আপনার অসুবিধা করতে চাচ্ছি না, কিন্তু আপনি একথা মনে করবেন না যে আমি আপনাকে চিনতে পারিনি।' হয়তো আমার লম্বা-চওড়া দেহ ও শুদ্ধ সাহিত্যিক ভাষাই এই ভ্রমের কারণ।

গোরখপুরে কোনো বৈষ্ণব মঠে উঠেছিলাম। দ্বিতীয় দিন যখন নওগঢ়রোড স্টেশনে নামলাম, তখন গরম ছিল না। কিন্তু দিনের আলো কম ছিল। জিগ্যেস করে জানতে পারলাম, রুম্মিনদেই (লুম্বিনী) তখনো অনেকটা দূরে। ককরহওয়া বাজারের দিকে বাঁক নেওয়া সড়কে না গিয়ে আমি আরো কিছুটা আগে গিয়ে সড়কের বাঁ দিকের গ্রামে গেলাম। সম্ভবত গ্রামটা ছিল কুর্মীদের। রাত্তিরে খাওয়ার ইচ্ছা নেই বলা সত্ত্বেও তারা আমাকে কিছু খাইয়েছিল। কাকভোরে ককরহওয়া বাজারে পৌঁছোলাম। লোকজন ভগবানপুর হয়ে রুম্মিনদেই যাওয়ার রাস্তা বলে দিল।

হয়তো ভগবানপুরই ছিল নেপালের সীমানার ভেতরে প্রথম গ্রাম। এ পর্যন্ত আমি শুধু নেপালের নাম ও গুণাবলী শুনে এসেছি। এখন আমি সাক্ষাৎ নেপাল শাসিত ভূমিতে পা রাখলাম। কয়েক বছর আগে ভগবানপুর গোর্খা অফিসারদের হেড কোয়ার্টার ছিল। আজও ওখানে নেপালী ধরনে তৈরি অনেক ঘর আছে। কিন্তু অফিসাররা চলে যাওয়ায় গ্রাম শ্রীহীন হয়ে গেছে এবং বেনেরা আশ্রয়বিহীন হয়ে গেছে। জিগ্যেস করে জানতে পারলাম, উত্তরদিকে একটা আম বাগানে এক সাধুনীর কুটীর আছে। ছোটমতো কুটীর ছিল এবং গাছের ঘনছায়া। রোদের তেজ বাড়ছিল। এ সময়ে লুম্বিনী যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। সাধুনী প্রৌঢ়া ছিলেন। তাঁর দীর্ঘ দেহ, গৌরবর্ণ, দীর্ঘ কৃষ্ণ কেশ বলে দেয় তাঁর যৌবনের অপরাহ্ন বেশী দিন আসেনি। চেহারার রেখা সাক্ষী দেয় যে যৌবনে সম্ভবত এই সৌন্দর্যের আকর্ষণ ছিল। প্রৌঢ়া যোগিনী ছিলেন আচারী বৈষ্ণব। তবু কোনো কাজে এখানে এসে নেপালী ব্রাহ্মণের হাতে খেতে তিনি দ্বিধা করতেন না। আমাকে জিগ্যেস করায় আমিও নিজেকে পরমহংস বলে দিলাম। সেই গরমে নেহাত বোকা ছাড়া উনুনে ফুঁ দিতে কেই বা রাজী হবে।

দিন যখন বেশ ঠাণ্ডা হয়ে গেল তখন লুম্বিনী পৌঁছলাম। একটা ছোট পুকুরের টিবির ওপর কাঁটা ঝোপ এবং বেল ও অন্যান্য গাছ ছিল। একটা ছোটমতো মন্দির ছিল যার অঙ্গনে পাঁঠা, মুর্গী ইত্যাদি বলির প্রাণীদের রক্তের রঙ লেগেছিল। মন্দিরের ভেতরের মূর্তি অস্পষ্ট। মন্দিরের পেছনে কয়েক পঙক্তি লেখ-এর সঙ্গে অশোকের শিলাস্তম্ভ ছিল। যিনি জীবে দয়ার ওপর এমন গুরুত্ব দিয়েছিলেন সেই গৌতমবুদ্ধের জন্মস্থানে এই পশুবলি, এই রুধিরে রক্তিম প্রাঙ্গন—সত্যিই এতে হৃদয়ে বড় ধাক্কা লেগেছিল। কেউ ছিল না সেখানে। বেশ কিছুক্ষণ বসে এখানকার অতীতের কথা চিন্তা করছিলাম। ওখান থেকে উত্তরে দূরে দেখা যাচ্ছে যে হিমালয়, তার শ্বেত শৃঙ্গের ওপর নজর পড়তেই, সে আমাকে 'এস' 'এস' বলে ডাকছে মনে হল। একবার ভাবলাম, এখান থেকে এদিকেই বুটওয়ালের দিকে চলে যাই। কিন্তু এখন সূর্যাস্তের আর দেরি নেই। বুটওয়াল পৌঁছনোর সময় ছিল না। সন্ধ্যায় আবার যোগিনীর কুটিরে চলে এলাম। নেপালী ব্রাহ্মণ অল্পবিস্তর সংস্কৃতও জানতেন। তাই সে আমার সঙ্গে মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার করল। তার কাছ থেকে আমি নেপাল ও হিমালয়ের তীর্থ, বসতি ও রাস্তা সম্পর্কে জেনে নিলাম।

কপিলাবস্তু দেখা বাকি ছিল, তাই আমার বুটওয়ল যাত্রা স্থগিত রাখতে হলো। সকালে তিলৌরাকোটের (কপিলাবস্তু) দিকে রওনা দিলাম। কোনো বোঝা ছিল না তবু ধীরে ধীরে যাচ্ছিলাম। ন'টা বেজে গিয়েছিল, একটা ছোটমতো গ্রাম পার হয়ে আমি একটা অশ্বত্থ গাছের

ছায়ায় বিশ্রাম করছিলাম। কিছু পরে একটি মুসলমান কিষাণ এল। তার সঙ্গে কিছু কথাবার্তা হলো। সে বলল—খুব রোদ, চলুন আজ এই গ্রামেই দুপুরটা কাটাবেন। তার গোশালায় খাটিয়া পেতে দিল। মনে হল, গ্রামের অধিকাংশ বাসিন্দাই মুসলমান। রান্না করার জন্য সে এক হিন্দুকে ডেকে আনল। রান্না এদিকে হচ্ছিল, আমরা কথাবার্তাও বলছিলাম। কিছুটা বেলা হওয়ার পর এক 'মৌলবী' সাহেবও এসে গেলেন। তিনি গ্রামের লোকজনকে নমাজ-রোজা শেখাতেন। কুরাণ কিছুটা ঠেকে ঠেকে পড়ে নিতেন। আমার সামনে যখন কুরাণ রাখা হল, তখন আমি যে ফরফর করে পড়তেই শুরু করলাম তাই নয়, আয়াতের অর্থও করে দিতে লাগলাম। এর খুব প্রভাব পড়েছিল মৌলবী সাহেবের ওপর। আর গ্রামের সাধারণ অশিক্ষিত মুসলমানতো সাধুবাবার আলখাল্লা ও কমণ্ডলু দেখে প্রথম থেকেই প্রভাবিত হয়েছিল।

পিপরহওয়ার কাছে শুনে আমি তিলৌরাকোট থেকে আগে সেখানে যাব ঠিক করলাম। সেখানে খনন কার্যের ফলে বেরনো কৌটো, পাথরের সিন্দুক ও অন্যান্য জিনিসের ফটো যতটা সুন্দর মনে হল, সেখানকার ধ্বংসাবশেষ ততটা নয়। আগে পড়া না থাকলে ধ্বংসাবশেষ যে ওখানে আছে তা বুঝতেই পারতাম না।····· নেপালের সীমানা থেকে একটু দূরে ক্ষেত আর গাছপালার কিনারে একটু উঁচু জমি ছিল, যেখানে কিছু ভাঙাচোরা ইঁট ও ছোট ডোবার চেহারায় খোদাইয়ের চিহ্ন ছিল। শাক্যরা তাদের বংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষের (বুদ্ধ) ধাতুর (হাড়ের) ওপর সেখানে কোনো স্মৃতিচিহ্ন তৈরি করেছিল, যার অভিলেখ ভারতের ব্রাহ্মী লিপির সবচেয়ে পুরনো নমুনা হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে। এই কথা এই স্থান দেখে চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে না।

এখনো ছিল।তাই আমি তৌলিহওয়া বাজারের দিকে তিলৌরাকোটের রাস্তায় আরো কিছুটা এগিয়ে যেতে চাইলাম। সন্ধ্যায় এক সমৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ঘরে পৌঁছলাম। তার অনেক গরু, অনেক ধানের 'গোলা' (ঠেক) ও বড় ঘর ছিল। ব্রাহ্মণ দেবতা আমাকে ভোজন করালেন। আশেপাশের পুরনো ইটের ঢিবি সম্পর্কে জানালেন এবং সকালে আমাকে নিয়ে গিয়ে তাঁর গ্রামের চেয়েও কিছুটা প্রাচীন বিধ্বস্ত কক্ষের ভিত্তি দেখালেন যা হয়তো পুরাতত্ত্ব বিভাগ খনন করেছিল।

তৌলিহওয়া বাজারে বড় অফিসার ও তাঁর কাছারি ছিল। কিন্তু আমি অফিসার ও তাঁর কাছারি দেখতে যাইনি। দুপুরে কোনো জায়গায় ভোজন ও বিশ্রাম করে যখন তিলৌরাকোট পৌঁছলাম তখন পাঁচটার বেশী বাজেনি। দূর পর্যন্ত বিস্তৃত সেই গড় যার অনেকটা পেছন জুড়ে বসতির চিহ্ন, ইট, পুকুর, পরিখা, ভিটের চেহারায় বিরাজ করছিল, তার মধ্যে বুদ্ধের বাল্যগৃহ ও শুদ্ধোধনের প্রাসাদ খুঁজে বার করা সম্ভব ছিল না। আমার সন্তুষ্টির জন্য এই যথেষ্ট ছিল যে এই রজঃকণার মধ্যে বুদ্ধের চরণধূলিও আছে।

সেই সন্ধ্যায় নিগলি হাওয়ার পুকুরে খণ্ডিত অশোকস্তম্ভ ও তার অভিলেখ দেখলাম। রাত্রিটা থাকলাম পাশের গ্রামে। এখন আমার দৃষ্টি হিমালয়ের সাদা চূড়ার ওপর কিন্তু ঐ দিকে যাওয়ার আগে রাস্তা সম্পর্কে আরো ভাল করে জানা দরকার ছিল—নেপালের পাহাড়ের ভেতর ইচ্ছামতো ঢুকে যাওয়া যায় না। ওখানে সব জায়গায় বাধা দেওয়ার লোক আছে।

সকাল সাতটা-আটটা নাগাদ বাণগঙ্গার (তিলৌরাকোটের পাশেও এই নদী আছে) বসতি থেকে দূরে আমবাগানে এক পাকা শিখরহীন মন্দির দেখা যাচ্ছিল। সেখানে গেলাম। সেখানে এক বৈরাগীদের মঠ স্থান ছিল। মন্দিরে সম্ভবত রাম-লক্ষ্মণ-সীতার মূর্তি ছিল। বাইরে ছোট বারান্দা বা জগমোহন ছিল। মন্দিরের পূব দিকে এক দালান এবং পশ্চিমে এক শুকনো ঘাসের ঝুপড়ি ছিল। মন্দিরের অধ্যক্ষ এক বৃদ্ধ বৈরাগী যার চোখ ও চেহারা তিনি যে গোর্খা তার সাক্ষ্য দিচ্ছিল। তিনি স্থান ইত্যাদি ব্যাপারে জিগ্যেস করলেন। তারপর পশ্চিমের ঝুপড়িতে ধুনির কাছে

থাকতে দিলেন। আসার সময় পূজাপাঠের জন্য আসা আরো কিছু ব্যক্তিও ছিলেন। তাঁদের মধ্যে এক পাটোয়ারী আমাকে উর্দু পড়িয়ে দেখল। তারপর আমার বিদ্যাবত্তার জবরদস্ত সার্টিফিকেট মোহন্তের কাছে পেশ করল। ভক্ত, দর্শকরা চলে যাওয়ার পর বোঝা গেল যে এই স্থানে বৃদ্ধ মোহন্তজী ছাড়া তাঁর অতি প্রৌঢ়া যোগিনী ও এক বোবা বৃদ্ধা দাসী—এই তিন ব্যক্তি থাকেন। যোগিনীর হাতের রান্না আমি খেতে পারি—মোহন্ত এই কথা বলায় আমি এতে সম্মতি দিলাম। যোগিনীর হাতের ভাজা অত্যন্ত সুস্বাদু ছিল, তা তো প্রথমবার খেয়েই বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু তাঁর কারণ বোঝা গেল পরে যখন মাটির ভেতরে-রাখা পচানো শুকনো কাঁঠাল ও মূলার টুকরা দেখলাম। তৌলিহওয়ার ছোট-বড় সব নেপালী মোহন্তজীকে মানত এবং যখন তিনি সেখানে যেতেন তখন সারা সপ্তাহের খরচা তুলে আনতেন। মোহন্তজী ভারতের বড় বড় তীর্থে গেছেন। এ ব্যাপারে আমি তার খুব পেছনে ছিলাম না। কিন্তু যখন তিনি উত্তরাখণ্ড ও নেপালের কথা বলতেন, তখন আমাকে মাথা নোয়াতে হত।

মোহন্তজীর অভ্যাগতের প্রতি স্নেহ ধীরে ধীরে উত্তরাধিকারীর স্নেহে পরিবর্তিত হতে লাগল। তাঁর কেউ শিষ্য ছিল না। আমিও তাঁর শিষ্য ছিলাম না। কিন্তু এক সম্প্রদায়ের হওয়ায় উত্তরাধিকারী হতে পারতাম। মঠকে ডুবে যাওয়া থেকে বাঁচাতে পারতাম। তিনি তার পঞ্চাশটি আমগাছ, কিছুটা দূরে অনেক একর ধানের খেত দেখালেন। মঠের আরো স্থাবর সম্পত্তিও দেখালেন। সবশুদ্ধ তা দশ-পনের একরের বেশী হবে না। অস্থাবর সম্পত্তি তো ছিলই না। তিনি বড় গর্বের সঙ্গে বলছিলেন—আমার গুরুদেব এসে এখানে এই মঠ তৈরি করেছিলেন। প্রথমদিকে চোর-বদমাস লোক চায়নি যে সাধুর আস্তানা এখানে হোক এবং তাদের ব্যবসায়ে বাধা পড়ুক। কিন্তু গুরুজী খুব লম্বা তাগড়া জোয়ান ছিলেন, সঙ্গে আরো সাধুও রাখতেন। এই মন্দিরের ভেতরে রাখা বন্দুক ও তলোয়ার সেই সময়েরই। রাত্রিতে মোহন্তজী মন্দিরের ছাদে ঘুমোতেন। সেখানে বন্দুক ও বর্শা ছাড়া প্রচুর ইটের স্তূপ থাকত। তাঁর যোগিনী ও দাসী পূবদিকের রান্না ঘরে তালাবন্ধ করে ঘুমোতেন। আর আমি পশ্চিমের ঝুপড়ি খোলা রেখেই। আখেরে, ডাকাত এসে আমার কিই বা নিত?

ধীরে ধীরে নিজের বিশ্বাসকে বাড়িয়ে তাঁর অসহায়তা দেখিয়ে যদি কেউ স্নেহের ফাঁদে জড়াতে চায় তবে তা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা—সাফ না করে দেওয়া—বড় মুশকিল হয়ে পড়ে। মোহন্তজী ধীরে ধীরে 'এই মুশকিলই' আমার কাছে উপস্থিত করলেন। মোহন্তপদ নেওয়া তো উপহাসের ব্যাপার ছিল। আধবুড়ী যোগিনীর 'রাঁড় বামনী ভাঙা অশ্বত্থ' এদের ওপর অধিকার ফকিরদের হয়—এই নিয়মানুসারে তিনি চলতেন। ব্রাহ্মণী না হয়েও অতিথিনী হয়ে তিনি এক পা এগিয়ে ছিলেন। তিনিও আমার খাওয়া দাওয়ার দিকে খুব নজর দিতেন। ভাঙ-গাঁজার ওপর এখানে কোনো বাধা ছিল না। তাই তা ঘাসের দামে বিকোত। 'লেখাপড়া' থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য মোহন্তজীর গোষ্ঠীতে মিলিত হয়ে সময় কাটানো আমার বড় সহায়ক হয়েছিল। একদিন এক প্রৌঢ়া বিধবা এসেছিল ঘাস কাটতে। আধবুড়ী যোগিনী তার সম্পর্কে বললেন—মোহন্তজী এক নওজোয়ান সাধুকে তাঁর উত্তরাধিকারী করে রেখেছিলেন। কিন্তু এই কালামুখীর 'শনির দৃষ্টি' তার ওপর পড়ল। আর এখন সে এর ঘরে খাওয়া-দাওয়া করছে।

সোজা অস্বীকার না করায় মোহন্তজীর আকাঙ্ক্ষা দৃঢ়তর হচ্ছিল। সেই সময় আমি বললাম—আপনার স্থান আমার পছন্দ হয়েছে তা ঠিক। কিন্তু এখন আমাকে উত্তরাখণ্ড যেতে হবে। আমি ভুটিয়াদের মুলুকে যেতে চাই। সেখান থেকে ঘুরে আসতে দিন। তারপর আপনার সঙ্গে থাকব। এই উত্তরে তিনি সন্তুষ্ট হননি। কিন্তু পুরোপুরি আশাভঙ্গও হয়নি। তাঁকে জিগ্যেস করে আমি পথের ঠিকানা লিখে নিলাম। প্রথম আমাকে তরাই পার হয়ে ডাং-দেখুর যেতে হবে।

সেখানে কোনো সিদ্ধ মহাত্মার নাম বলে দিলেন তিনি। তারপর কোন্ কোন্ গ্রাম ও নদী পার হয়ে আমি ভুটিয়াদের আবাসভূমিতে পৌঁছব। হলা ডোগো (গ-লা ডো-গী—কোথায় যাবে?) এই রকম পুরোপুরি অশুদ্ধ চল্লিশ-পঞ্চাশটি ভুটিয়া শব্দও তিনি লিখিয়ে দিলেন।

একদিন সকালে উঠে নদী পার হয়ে আমি উত্তর দিকে চলতে শুরু করলাম। দুয়েক মাইল যাওয়ার পর খরবুজার খেত এল। কয়েকটি ছেলে পাহারা দিচ্ছিল। দুচার পয়সা দিয়ে তাদের কাছ থেকে খরবুজা নিলাম। খাওয়ার সময় আমার মন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার চিন্তায় তন্ময় ছিল। —"এ একেবারে খারাপ রাস্তা। রাস্তা বলে দেওয়ার জন্য এখানে কোনো লোকও পাওয়া যাবে না। জানতে পারলে নেপাল সরকার ধরে ফেলবে। এ দিক দিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। জেতবনবিহার ও লৌরিয়া নন্দনগড়ের অশোকস্তম্ভও দেখিনি। তা দেখে রকসৌলের রাস্তায় যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে।" আমি সেখান থেকে ফিরে চললাম।

মোহন্তজীর স্থানে না গিয়ে তৌলিহওয়া বাজারের পাশে অন্য এক স্থানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম। সেখানেও সাধুর সঙ্গে যোগিনী। হিন্দু রাজ্য হওয়ায় আমার ধারণা হয়েছিল যে, সেখানে ধর্মপালনে কড়াকড়ি থাকবে। কিন্তু সব জায়গায় যোগী-যোগিনীকে আশ্রম চালাতে দেখে তা আমার কাছে অদ্ভুত ব্যাপার বলে মনে হল। রাত্রিতে শোহরতগঞ্জে থাকলাম।

সকালে যে গাড়ি ছাড়ে তাতে বলরামপুর পৌঁছলাম। কুশী নারাতেই সেখানের বাসিন্দা ভিক্ষু বরসম্বোধির ঠিকানা পেয়ে গিয়েছিলাম। সেই সময় তিনি ধর্মশালা বানাচ্ছিলেন। তখন দেওয়াল পর্যন্ত হয়েছিল এবং তিনি তার দেখাশোনা করছিলেন। এক অর্ধ নির্মিত কুঠরিতে ইটের ওপর বসে আমরা কথা বলছিলাম। বরসম্বোধিজী তাঁর পাইপ টানছিলেন। এরই মধ্যে চাকর এসে বলল, —"মাছ আধসের নিয়ে নিয়েছি।"

"ঠিকমতো দেখে নিয়েছ তো?"

"হ্যাঁ, কোনটাই জীবন্ত নয়।"

জীবন্ত হলে মাছ পুকুরে ছেড়ে দিতে হত। তাতে পয়সার লোক্সান।

সেখান থেকে রেলের অন্য লাইন এক উদাসী মঠের দিকে গিয়েছে। মোহন্ত আমাকে আমার রান্না করে নিতে বললেন। আমি রুটি বানালাম, তিনি দুধ দিলেন। রান্না করার ভার যখন আমার কাঁধে পড়ে তখন আমি তাতে যত কম পরিশ্রম ও সময় লাগে তার পক্ষপাতী।

সহেট-মহেট রওনা দিলাম শীতের মধ্যেই। সেই সময় দেবীপাটনের মেলার জন্য অনেক 'নরনারী' পায়ে হেঁটে যাচ্ছিল। সড়কে সর্বত্রই যাত্রীর দেখা পাওয়া যেত। সন্ধ্যা হয়ে আসছে দেখে সড়ক থেকে ডানদিকে কিছুটা এগিয়ে একটা গ্রাম দেখতে পেলাম। সেখানে পৌঁছনোর পর মনে হল ব্রাহ্মণের বাড়ি। তাঁর কাছে এক অবধূতিনী ছিলেন, যিনি অনেক তীর্থ পর্যটন করেছেন। তাঁর সঙ্গে তীর্থ সম্পর্কে এবং সংস্কৃতের 'ক-খ'-জানা এক ব্যক্তির সঙ্গে সংস্কৃত সম্পর্কে কথাবার্তা হল। অতএব আলখাল্লা-কমণ্ডলু ধারী মহাত্যাগী সাধুর ভক্ত না বাড়ার তো কারণ নেই।

সকালেই সহেট-মহেট পৌঁছলাম। জেতবন শ্রাবস্তীর বিশেষ ঐতিহাসিক জ্ঞান ঐ সময় আমার ছিল না। তাড়াতাড়ি করে জেতবনের কুটির দেখে শ্রাবস্তীর ধ্বংসাবশেষের দিকে গেলাম এবং জঙ্গল ঘুরে ঘুরে হয়রাণ হয়ে উত্তর দিকের এক গ্রামে পৌঁছলাম। সেখানে একটা প্রাইমারি স্কুল ছিল। সেখানেই মাষ্টার সাহেবের তৈরি করা ভোজন হল। দুপুরের বিশ্রামও হল।

বেলা পড়ে যাওয়ার পর বলরামপুরে ফেরার সময় এক বৈরাগী সাধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমি কপালে চন্দন কমই লাগাতাম কেননা বৈরাগী ও আর্যসমাজী—এই দুটি পার্ট আমাকে একসঙ্গে করতে হত। আমার বেশভূষা থেকে আমি বৈষ্ণব সাধু কিনা এ বিষয়ে তাঁর

সন্দেহ হয়ে থাকবে। দণ্ডবত-প্রণাম করলাম। তিনি আজ তাঁর কুটিরে বিশ্রাম করার জন্য খুব আগ্রহ করে আমার প্রতিশ্রুতি আদায় করলেন। তিনি অন্য কোনো কাজে যাচ্ছিলেন। তিনি গ্রাম ও কুটিরের ঠিকানা দিলেন। সেখানে গিয়ে কিছুক্ষণ প্রতীক্ষার পর সেই স্থানের মহাত্মা এলেন। গ্রামে যতটা অতিথি সংকার করা সম্ভব তা করলেন।

পরদিন বলরামপুর থেকে ট্রেন ধরলাম। গোরখপুর থেকে নরকটিয়াগঞ্জ নিশ্চয় গিয়েছিলাম। কিন্তু যতটা মনে পড়ে ছিতৌনী ঘাটে হেঁটে যেতে হয়নি অর্থাৎ রেলের পুল ছিল। নরকটিয়াগঞ্জের সংস্কৃত পাঠশালার প্রতিষ্ঠাতা ব্রহ্মচারীজী। যখন তিনি তাঁর শিক্ষকের কাছে আমার সংস্কৃত সম্পর্কে শুনলেন, তখন তিনি অনেক করে আমাকে সেখানে থাকতে বললেন। কিন্তু আমি লৌরিয়া নন্দনগড়ে যাত্রা করলাম। বেশী রোদ না থাকলে খালি হাতে পায়ে হেঁটে যেতে বেশ মজা লাগে। সড়ক থেকে বিশাল শিলাস্তম্ভ ও তার সিংহকে দেখেই কাউকে না জিগ্যেস করেই আমি বুঝতে পারলাম অশোক স্তম্ভ। এবারের যাত্রার আগেই আমি এ বিষয়ে কিছু বই অবশ্যই পড়েছিলাম। তাই তো লৌরিয়া (যষ্ঠী-পাষাণ যষ্ঠী) দেখেই ফিরে যাইনি। নন্দনগড়ও দেখতে গিয়েছিলাম। গড়ের পাশেই এক ছোটমতো বৈরাগী মঠ ছিল। সন্ন্যাসীদের থেকে কয়েক শতাব্দী পর সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও বৈরাগী মঠ এত বেশী কেন? এ বিষয়ে চিন্তা করে আমার তো এই মনে হয় যে এর কারণ সগুণোপাসনা (সাকার ঈশ্বরের পূজা)। বেদান্তপ্রেমী সন্ন্যাসীদের মূর্তি ছাড়াও পূজা চলে। কিন্তু বৈরাগীদের জন্য মূর্তি চাই, মহাবীরজী চাই, আর কিছু না থাকলে শালগ্রাম তো চাইই। তাছাড়া তাদের পূজার জন্য কিছু ধূপদীপ, কিছু বালভোগ (সকালের জলখাবার), রাজভোগ (মধ্যাহ্ন ভোজন) এবং সান্ধ্য ভোজনও চাই। পূজার পূজাও হল, চব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়র সঞ্চয়ও হল। এই সঞ্চয় থেকে কিছুটা উপস্থিত ভক্তদের দেওয়া যেতে পারে। তা দেখে আমার ছেলেবেলার রাণীকীসরাইয়ের ছেলেদের হুঁশিয়ারী মনে পড়ত। আম পাকার সময় ছেলেরা কাঁচা আম ছুঁড়ে দিত কোনো বাঁদরকে, সে তা চাটত, তারপর গাছের ডালে চড়ে ঝাঁকাত তাতে কিছু পাকা আম মাটিতে পড়ত। বৈরাগীদের পূজা,তাদের রাগ-ভোগ সাধারণ মানুষের বোধগম্য ছিল। তাই বৈরাগীরা বেশী সফল হতে পেরেছিল।

নন্দনগড়ের ঐ মঠে হয়তো দুয়েকজন সাধু ছিল। "দর্শনীয় ত্যাগী" মহাত্মাকে তাঁরা সমাদর করলেন। নেপালী বাবা অভ্যাস করিয়ে দিয়েছিলেন এবং এখন নওয়াজিন্দা আমার ওপর সওয়ার হয়েছে; তাই ভাঙ-গাঁজাকে স্বাগত জানানো হচ্ছিল। স্থানীয় সাধুরা যখন আদর করে আমার দিকে কল্‌কে এগিয়ে দিতেন, তখন আমি তাদের অবজ্ঞা করতে পারতাম না। 'দম' (টানা) তখনো খতম হয়নি, এমনি সময়ে এক প্রৌঢ়া বৈরাগিনী এসে হাজির। তিনি অনেক ঘুরে বেড়িয়েছেন বলে মনে হল। নিঃসঙ্কোচে কথা বলছিলেন তিনি। তিনি দুই কল্‌কে গাঁজা উড়িয়ে দিলেন। কল্‌কে তৈরি হতে থাকে, গল্পও চলতে থাকে। মনে হল,তিনি নেপালের তরাইয়ে বীরগঞ্জের কাছে কোথাও থাকেন। তৌলিহওয়ার কাছাকাছি আমি যোগভোগের একত্র উপস্থিতি বেশ কয়েকটি মঠে দেখেছি। তাই অবধূতিনীর কথাবার্তা ও তাঁর মঠের সমৃদ্ধি সম্পর্কে আমার কোনো সন্দেহ হয়নি। আমার তো এখন নেপালের ব্যবস্থাই ভাল মনে হল; যোগীদের যোগিনীদের একসঙ্গে থাকার অনুমতি দিয়ে সেখানকার সমাজ সাধুদের অনেক বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। যদি তাতে জন্ম-নিয়ন্ত্রণও থাকত তবে তো সোনায় সোহাগা। মঠে কাচ্চা-বাচ্চা বেড়ে গেলে তার মাহাত্ম্য নষ্ট হয়ে যায়। গাঁজায় দম দেওয়ার ব্যাপারে অবধূতিনী অভিজ্ঞ বৈরাগীদেরও কান কেটে দিতে পারত।

যাচ্ছিলাম তো বুদ্ধের পুণ্যস্থান দেখতে কিন্তু নওয়াজিন্দা সোজা রাস্তায় চলতে দেয় তবে তো? নন্দনগড় থেকে স্টেশন হয়ে রকসৌল যাবার ছিল। কিন্তু জানি না দুই দিনেরও কম

সময়ে আমি কোন স্টেশনে পৌঁছেছিলাম। একদিন তো সূর্যাস্তের সময় এক কবীরপন্থীর কুটিরে পৌঁছলাম। বাইরে মহুয়া গাছের নীচে চাটাই নিয়ে আসন পাতলাম। কুটিরে এক মধ্যবয়স্ক মহাত্মা ও তাঁর আধবুড়ো যোগিনী থাকতেন। আমি হয়তো খুব বেশী হেঁটেছিলাম ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। যোগিনী আমাকে দেখে সব বৈরাগীদের সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন—"এদের খুব মাথামোটা। পাথর পূজা করতে করতে বুদ্ধিও পাথর হয়ে গেছে।" তাঁর কবীর সাহেবের নির্গুণের অহঙ্কার ছিল। ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে আমি তাঁর 'শব্দ' ও 'সুরত'-এর সৎসঙ্গে সামিল হইনি, তাই এই মন্তব্যের প্রয়োজন হয়েছিল।

রকসৌল নামার পর মনে হল, বীরগঞ্জের রাস্তায় নেপালী পুলিশ থাকে। বাইরের লোককে ভেতরে যেতে দেয় না। আমি পুল পার হয়ে সড়ক থেকে পূবে নদীর তীরে অবস্থিত বৈরাগী স্থানে চলে গেলাম। ঘর তো অনেক ছিল। কিন্তু এক পূজারী ও এক রমতা সাধু ছাড়া সেখানে আর কেউ ছিল না। পূজারী বলল—যদি আপনি দু'দিন আগে আসতেন তবে আপনি থাপাথলীর মোহন্তের সঙ্গে যেতে পারতেন। তিনি ওপরেই গিয়েছেন। এখন ঐরকম কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি থাকলে তবে আপনি রাহাদারী (পাস) পেতে পারেন। রমতা সাধু অনেক ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাঁর অন্য সব কথাও আমি খুব উৎসাহ নিয়ে শুনতাম। কিন্তু তিনি যখন রুশ দেশের জ্বালামাই সম্পর্কে বলতে লাগলেন তখন আমার জ্বর এসে গেল—'জ্বালামাই, স্বয়ং আগুন। রাগ-ভোগ রেখে দেওয়া হয়, মা নিজের জিভ দিয়ে তা গ্রহণ করেন।' সে বলছিল যে সে সেই জ্বালামাই থেকে কাশ্মীরের রাস্তায় পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে নেপাল এসেছে। তার এই সবই মিথ্যা কথা বলে আমার মনে হল। যদিও তা অসম্ভব ছিল না। রাশিয়ায় গৃহযুদ্ধ চলার সময় সে বাকু থেকে মধ্য এশিয়া এবং সেখান থেকে চীনী তুর্কীস্তানের রাস্তায় অথবা সিধা কাশ্মীর হয়ে জম্মু, চম্বা, কুল্লু হয়ে অথবা লাদাখ থেকে মানসসরোবর হয়ে নেপাল পৌঁছতে পারে।

দেখলাম, দুচারদিন অপেক্ষা করে নেপাল যাওয়ার কোনো ব্যবস্থা করা যাবেনা। তাই আমি সেখান থেকে পূর্বদিকে চললাম। কিছুটা পাকদণ্ডী, তারপর রেলের সড়ক ধরলাম এবং শেষে ট্রেনে ঘোড়াসাহন নামলাম। একটা পয়সাও আমার কাছে ছিল না, তবু কখনো খানাপিনার কষ্ট হয়নি এবং ঝুড়ি ঝুড়ি প্রশংসা ও সম্মান প্রায় রোজই পাওয়া যেত।

নেপালের শেষ নেওয়ার রাজাদের পূর্বজ কোনো সময়ে সেমারৌনগরে রাজত্ব করতেন। প্রথমে তিনি কর্ণাটক থেকে পালিয়ে এখানে এসেছিলেন, এটা আমার জানা ছিল। ইতিহাস অধ্যয়ন ও ঐতিহাসিক বস্তুর প্রতি ভালবাসা আমাকে ধীরে ধীরে আর্য সমাজ থেকে আগে নিয়ে যাচ্ছিল। এ বিষয়ে ঐ সময়ে আমার কোনো ধারণা ছিল না। কিন্তু ব্যাপারটা এই রকমই ছিল। ডি· এ· বি· কলেজের গ্রন্থাগারে আমি প্রায়ই এই ধরনের বই পড়তাম।। পুরনো বস্তুর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান সম্পর্কে গ্রন্থাগারে অনেক বই আসত। পণ্ডিত ভগবদ্দত্তের সঙ্গে মিশে আমার ঐদিকে ঝোঁক এসেছিল। কিন্তু তিনি আমাকে নিয়ে যাচ্ছিলেন একেবারে উল্টো দিকে। যেখানে পণ্ডিত ভগবদ্দত্তজী ইতিহাসের চেয়ে সাইন্সকে বেদের বিভূতি মনে করার চেষ্টা করছিলেন, সেখানে আমি এমন একটা পথে চলছিলাম যা আমাকে 'নৈরুক্ত' থেকে ঐতিহাসিক তৈরি করে ছাড়ত।

ঘোড়াসাহন থেকে আমি খেতের মধ্য দিয়ে পায়ে হেঁটে সেমরোনগরের দিকে যাচ্ছিলাম। সেই সময় এক বেনেও একটা ঘোড়ায় সওদা বোঝাই করে যাচ্ছিল। মাথায় এল, এই জন্যই তো ঘোড়াসাহন বলে।

সেমরোনগরে পুকুরের ধারে দেবীস্থানে উঠলাম। মঠ সেখান থেকে পশ্চিমে। এখন দুয়েকটা আম পাকছিল। হয়তো মে মাসের দ্বিতীয়ার্ধ চলছিল। দেবীস্থানে কিছু মূর্তি ছিল। কিন্তু মূর্তিবিদ্যা

ও মূর্তিকলার সঙ্গে আমার এখনো পরিচয় হয়নি। মঠের বড় অঙ্গনে নেপালী ধরনের এক মন্দির দাঁড়িয়েছিল।। অঙ্গনের চারদিকে বারান্দা ও সম্ভবত অনেক বাড়ি ও কক্ষ ছিল। প্রথমদিকে থাপাথলী (নেপাল) ও সেমরোনগরের একই মোহন্ত হত। কিন্তু কোনো অভিযোগের জন্য বৃদ্ধ মোহন্তকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাঁকে আমি ১৯১৩-তে শোলাপুরে এবং তার এক বছর পরে অযোধ্যায় দেখেছিলাম। এ সময়ে সেমরোনগরের তাঁর শিষ্য মোহন্ত ছিলেন। তাঁর বড় বড় জটা ও লম্বা-চওড়া শরীরের খুব প্রভাব পড়ত ভক্তদের ওপর। মঠের আমদানি যাতে ঠিকমতো ব্যয় হয় সেজন্য নেপাল সরকারের এক অফিসার—ডীঠা (দ্রষ্টা)—সেখানে বরাবর থাকতেন। খাওয়া-দাওয়ার ভাল বন্দোবস্ত ছিল। সাধুদের সংখ্যা বেশী ছিল না। ডীঠা সাহেবের সঙ্গে আলাপ ছিল। তিনি আমাকে থাকার জন্য খুব আগ্রহ দেখালেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল আমি তাঁর ছেলেকে পড়াই। মন্দিরে রাণা জংবাহাদুর বা তাঁর ছেলে গোরা জর্নেল এঁদের একজনের বা দুজনেরই মূর্তিও ছিল।

দুচার মাইল দূরে এক গ্রাম থেকে শিষ্য করার জন্য মোহন্তজীর কাছে এক সোনার ভক্তের নিমন্ত্রণ এসেছিল। লোকজন বলছিল, এই চতুর্থ ও পঞ্চমবার বুড়া কণ্ঠীমন্ত্র নিচ্ছে। বেচারা কণ্ঠীমন্ত্র নিত। কিন্তু মাছের দিন এলে যখন বাড়ির লোক তেলে ভেজে হলুদ-সর্ষে দিয়ে মাছ রান্না করতো এবং তার সুগন্ধ ঘরের চারদিকে ব্যাপ্ত হয়ে স্বর্গের দেবতাদেরও টেনে আনতে পারতো, তখন দরজায় বসে ঠুক ঠুক করতে নিজের হাতের ওপর বুড়ো সোনারের মন কি করে বসবে? সে কণ্ঠী গলা থেকে খুলে খোঁটায় রেখে বলে উঠতো—'নিয়ে এসো, আজ তো মনছড়ি (মন হরণকারী),খেয়ে নিই।' আমার তখন জানকী নগরের (পরসা মঠের গ্রাম) প্রদীপ সাহুর কথা মনে এল। ১৯৫৭-র সেনা বিদ্রোহের সময় সে আর রেখা মাহাতো পুরো জোয়ান ছিল এবং প্রদীপের মোটা তাগড়া চেহারা দেখে একবার তাকে 'বিদ্রোহী' সেনায় নেওয়ার কথা ঠিক হয়েছিল। পরসার তৎকালীন বুড়ো অধিকারী (ম্যানেজার) প্রদীপকে কণ্ঠীমন্ত্র দিয়েছিলেন। একাধিক বার মনছড়ির আকর্ষণে প্রদীপ কণ্ঠী ছিঁড়ে ফেলেছিল। এবার যখন অধিকারীকে এই খবর দেওয়া হল, তখন তিনি তৎক্ষণাৎ একটি দোঁহা বলেন—

"কণ্ঠীমালা তোরিকে, গঙ্গ দিয়ো দহওয়ায়।
অধিকারীজীকে····· সে পরদিপওয়া মছরী খায়॥"

সোনার ভক্তকে আবার কণ্ঠীমন্ত্র দেওয়া হল। মোহন্তজীর পূজা এবং সাধুদেরও কিছু বিদায় মিলল। অন্য লোকজন সব মঠে চলে গেল। কিন্তু এক জটাধারী সাধুর সঙ্গে পর্যটনের পরিকল্পনা করে ও গাঁজা খেয়ে আমি দুতিনদিন ইতস্তত ঘুরতে লাগলাম। যেদিন আমি সেমরোনগর ফিরছিলাম, সেই দিন দেখলাম পুকুর থেকে কিছুটা পূবে এক গ্রামে আগুন লেগে গেছে। এখানে বাড়ি-ঘরের ছাদ ঘাসের। হাওয়া না থাকলেও এক ঘরের ছাদ থেকে অন্য ঘরের ছাদে আগুন লেগে যাওয়া সহজ। দেখছিলাম, কিছু লোক নিজেদের ছাদের ওপর জল নিয়ে বসে আছে এবং কিছু লোক যাদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই ছিল বেশী—চিৎকার করতে করতে পশু, বাক্স—পেটারা ও অন্যান্য সামগ্রী ঘর থেকে বার করে গ্রামের বাইরে রেখে দিচ্ছিল। সৌভাগ্যবশত হাওয়া সেই দিন বন্ধ ছিল।

ঘোড়াসাহন থেকে আমি সীতামঢ়ী গিয়েছিলাম। হয়তো সেই দিনই আমার বয়সী এক ভবঘুরে সাধুও স্টেশনে নেমে সেখানে পৌঁছেছিল। এখন মাড়োয়ারী ভক্তের পুরী-হালুয়া খেতে কার ভাল লাগে। তরুণ আসাম থেকে দ্রুত চলে এসেছে। সে তার ঝোলা থেকে গাঁজার হলুদ পাতা বার করে দেখাল। ভেতর থেকে নওয়াজিন্দা বলতে লাগল, তৌলিহওয়া বাজারে যদি এর

সঙ্গে দেখা হত, তাহলে আমি এরই মধ্যে ডাং দেওখুর থেকে অনেকটা এগিয়ে ভুটিয়াদের দেশে পৌঁছে যেতাম। আমাদের পরামর্শ হল জনকপুর চলে যাওয়ার।

পুপরীরোডে যখন নামলাম তখনো বেলা শেষ হয়নি। সন্ধ্যা নাগাদ আমরা চোরউত মঠে পৌঁছলাম। কাশীতে যখন ছাত্র ছিলাম তখন চোরউতের মোহন্তকে বিশাল শ্বেতছত্রের (মেঘডম্বুর) নিচে গঙ্গায় অর্ঘ্য দিতে দেখেছি, তখন তিনি অন্য কোনোখানে কথা বলতেন ও চোখ অন্য কিছু দেখতো তার স্মৃতি আছে। আমরা দুজনই টাকশালী সাধু ছিলাম। অর্থাৎ পন্থের কায়দা-কানুন সম্পর্কে পুরা ওয়াকিবহাল এবং আমরা দেশও দেখেছি। আমাদের কাছে খুব কম মালপত্র ছিল। তিরহুতের মঠে খবাস (খিদমতগারদের) রাজত্ব। মোহন্তের উত্তরাধিকারী তাঁর ভাইপো হয়ে থাকে। এভাবে মঠের সম্পত্তির বেশীর ভাগ এক পরিবারের হয়ে যায়। গদী নিশ্চিত হয়ে যাওয়ায় মোহন্ত হওয়ার আগে তাঁর তীর্থ পর্যটন ইত্যাদির অভিজ্ঞতা থাকে না এবং সে বড়ই কূপমণ্ডূক ও অহংকারী হয়ে থাকে। বেশভূষা ও মঠের আমদানি দেখে সে মানুষকে সম্মান দেয়। আমাদের দুজনকে এখানে থাকার জন্য যেখানে জায়গা দিয়েছিল, তা মোহন্তজীর আস্তাবলের চেয়ে ভাল ছিল না। রাতের খাবার দেখে তো আমার সঙ্গের ঠোঁটকাটা সাধু কড়া বিরূপ মন্তব্য করে বসলো। আমাদের মনে হলো, এইরকম অযোগ্য মোহন্তের হাত থেকে মটিহানীর সত্তর-পঁচাত্তর হাজার টাকার আয় ছিনিয়ে নিয়ে নেপাল সরকার ভাল কাজই করেছে।

চৌরউত ব্রিটিশ এলাকার মুজফ্ফরপুর জেলায় এবং মটিহানী নেপাল রাজ্যে। এই দুই জায়গার মধ্যে তিন-চার ক্রোশের বেশী ফারাক ছিল না। দ্বিতীয় দিন আমরা মটিহানী গেলাম। সেখানে সাধুদের সংখ্যা পঞ্চাশ ষাটের বেশী ছিল। তাদের মধ্যে কিছু লেখাপড়া জানা সাধু দেখে আমার ভাল লাগল। নেপাল সরকার তাঁর বিরুদ্ধে লাম্পট্য ও স্বজন পোষণের অভিযোগ শুনে মঠ থেকে মোহন্তকে বার করে দেয়। এক নতুন মোহন্ত ছিলেন এবং তাঁর ওপর নজর রাখার জন্য একজন ডীঠা থাকত। ভাল ব্যবস্থা করার জন্য খুব চেষ্টা করা হয়েছিল। চার অথবা পাঁচ জন ভাল পণ্ডিত পাঠশালায় পড়াতেন। ছাত্রদের জন্য ছাত্রবৃত্তি, সাধুছাত্রদের জন্য আহার-বস্ত্র-পুস্তক দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। দিনে কাঁচা রান্না এবং রাত্রিতে পাকা রান্না—ক্ষীর-পুরীর ব্যবস্থা ছিল। এখানে চৌরউতের মতো সাধুদের অপমান সহ্য করতে হত না। তথাপি ছাত্ররা সন্তুষ্ট ছিল না। তাদের মধ্যে একজন কর্বীর শাস্ত্রীজীর সম্বন্ধে শুনেছিল। তাই সবাই শাস্ত্রীজীকে আন্তরিক স্বাগত জানাল। তারা তাদের অভিযোগগুলি আমাকে জানাল। রাত্রিতে আহার করার সময় দেখলাম যে, পুরী খাওয়ার জন্য লোহার দাঁত দরকার। ছাত্রদের ভোজন সামগ্রী থেকে মোহন্ত 'ডীঠা' ও পাচকের খাওয়াই হত।। পুরীতে যত কম সম্ভব ঘি ঢালার ফল হল এই পাথরের পুরী। ক্ষীরে যত কম সম্ভব দুধ-চিনি ঢালার পরিণাম হল গলা বিস্বাদ ভাত। মোহন্তজী টাকা জমিয়ে ব্রিটিশ ভারতে এক স্থান তৈরি করতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। 'নেপালে মোহন্ত পদের কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। এখানকার অধিকারীদেরতো চোখ নেই, তারা তো শুধু কানে শোনে',—একথা সাধারণভাবে বলা যেতে পারে। মটিহানীর আয় ভাল ছিল, তাই বলা হয়ে থাকে যে তা লুঠ করতে ডীঠা ও স্থানীয় অফিসার পর্যন্ত যোগ দিত। আমি ছাত্রদের শুধু এই কথা বললাম যে যদি নেপাল যাওয়ার সুযোগ হয়, তবে আমি এই সব অভিযোগ উচ্চ অধিকারীদের জানাব।

জনকপুরে আমরা টীকমগড়ের কেল্লার মতো ঠাকুরবাড়ী—জানকীভবন অথবা জানকী মন্দিরে উঠেছিলাম। এখানকার মোহন্তের শিষ্যের সঙ্গে কর্বীতে দেখা হয়েছিল। তাই আমাকে এখানে সসম্মানে রাখা হয়েছিল। সম্ভবত এখানকার স্থানে গাঁজা চলত না। সেজন্য আমার সঙ্গী

গাঁজায় অভ্যস্ত হওয়ায় তাঁকে অন্য মঠে যাতায়াত করতে হত। আমার কাছে গাঁজা অনিবার্য ছিলনা কিন্তু টিমের ভাবকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করাও তো জরুরী ছিল।

জনকপুরে অনেক মঠ এবং জানকীর সঙ্গে সম্পর্ক থাকায় মঠের অধিকার ছিল বৈরাগীদের। একমাত্র রামমন্দিরই ছিল সন্ন্যাসী মঠ। তারও প্রচুর আয় ছিল এবং মোহন্তকে মঠ থেকে সরিয়ে দিয়ে নেপাল রাজার তরফ থেকে একটা ভাল পাঠশালা ও ছাত্রাবাস তৈরি করা হয়েছে। ওখানকার ছাত্রদের সঙ্গে থেকে মেলামেশার সুযোগ হয়নি। তাই সেখানের অভিযোগের ব্যাপার জানতে পারিনি।

দুতিন দিন পরে আমি 'ধনুষার' দিকে রওনা হই। জঙ্গলে গাছের মোটা শিকড়ের মতো কোনো পাথুরে বস্তু ছিল। সীতার স্বয়ম্বরে রামজী যে ধনুক ভেঙে ছিলেন, একেই লোকে সেই ধনুক বলে। ধনুষা থেকে এবার পাহাড়ের মধ্য দিয়ে নেপালে পৌঁছনোর ইচ্ছা ছিল আমার। এখানে জঙ্গল কেটে নতুন বসতি তৈরি হয়েছে এমন বসতি বেশী ছিল। তাদের মধ্যে সারুদের আধিক্য ছিল। জঙ্গলে ধোবার অভাব সত্ত্বেও স্ত্রীলোকদের পরিচ্ছন্ন ধোয়া কাপড় তাদের সুরুচির পরিচায়ক ছিল। রাত্রিটা কাটালাম এক সাধুর কুটিরে। কতদিনে পাহাড়ের গোড়ায় পৌঁছেছিলাম তা আমার মনে নেই। আমরা শুধু সকালে ও বিকেলে কয়েক ঘণ্টা চলতাম। গাঁজা প্রচুর ছিল, তাই সর্বদাই 'দম' লাগানো হত। কমলা পার হওয়ার আগে সকাল আটটা-নয়টার সময় গোর্খাদের এক গ্রামে গেলাম। এরা এখানে নতুন বসতি করেছে। আমাদের খাবার জন্য ভুট্টার ভাত পাওয়া গেল। আমার সঙ্গে থেকে অথবা আগে থেকেই শিখে বুঝে নেওয়ায় আমার সঙ্গীও গোর্খাদের হাতে ভাত খেতে আপত্তি করেনি। কমলার জল ঠাণ্ডা ছিল এবং ঐ গরমে ভাল লেগেছিল। নদীর স্রোত গভীর ছিল না। সেই দিন ভর দুপুরে আমরা চলা শুরু করলাম। তাই বড় কষ্ট হয়েছিল। আমি আগে থেকেই জানতাম যে পাহাড়ের গোড়ায় একটা কুটির আছে। লেপা-পোছা খুব পরিচ্ছন্ন কুটির, রোদ থেকে নিষ্কৃতি, হাল্‌কা বাতাস, ক্লান্ত পরিশ্রান্ত মানুষের অন্য আর কোন কথা মনে থাকতে পারে? আমরা শুয়ে পড়লাম এবং সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম।

ঘুম ভাঙার পর দেখলাম এক মধ্যবয়স্ক সাধু কোমরে গামছা বেঁধে উঠান ঝাড় দিচ্ছেন। আমাদের ঘুম ভেঙেছে দেখে তিনি কাছে এসে বললেন—"এখানে তো সব জিনিষ পড়ে ছিল। আমি তো কোনো ঘরে তালা লাগাই না, এই জন্য যে যদি কোনো সাধু-অভ্যাগত আসেন, তিনি রান্না করবেন, খাবেন। আমি গ্রামের সেবায় বাইরে চলে যাই, কখনো কখনো দেরিতে আসি। আপনারা রান্না করে খাননি কেন?"

আমরা তাঁকে সত্যি সত্যি বললাম,—"ঐ অবস্থায় আমাদের মনে হয়নি যে শোয়ার চেয়ে ভাল জিনিষ কিছু থাকতে পারে।"

সকালেও আমার সঙ্গীর ভুট্টার ভাত ভাল লাগেনি আর এ বেলাও তাই রান্না করে খাওয়ার জন্য দেওয়া হয়েছে। আমার সঙ্গী দ্বিধা করছিল। কিন্তু ভুট্টার ভাত রান্নাও একটা নতুন ব্যাপার বুঝে আমি তাকে স্বাগত জানালাম। মহাত্মা এটুকুই বলেছিলেন যে, জল গরম করে তাতে ভুট্টার দালিয়া ফেলে দিতে হবে। কতটা জলে কতটা দালিয়া দিতে হবে তা আমার জানা ছিল না। মহাত্মাও বলে দেননি। আমি জলে ভাঙা ভুট্টাগুলো ছেড়ে দিলাম। তা ফুলে উঠে সারা পাত্র ভরে ফেললো। কিন্তু তখনো তা সেদ্ধ হয়নি। আমি কিছুটা বার করে পাত্রে রাখলাম। জল দিলাম। কিছু পরে আবার বাসন ভরে গেল। আবার কিছু মণ্ড বার করে পাত্রে রাখলাম। তবু 'চাউল' সেদ্ধ হল না। শেষ পর্যন্ত খিদেয় অস্থির হয়ে আমি আধসেদ্ধই তা নামিয়ে রাখলাম। দুধ অথবা দইয়ে মেখে আমি তো ভরপেট খেলাম, কিন্তু আমার সঙ্গী আধপেটাও খেতে পারেনি।

আমরা কুটিরের নিচে গোশালায় রান্না করেছিলাম। আমাদের খাওয়া শেষ হতে হতেই গরুরা এসে গেল এবং সব ঘর ভরে গেল। গোশালার ছাদ ও দেয়ালে ঘন ঘন মজবুত কাঠের গোঁজ বাধা হয়েছে। রাখালেরা বলল, এখানে রাত্রিতে বাঘ আসার ভয় আছে। তা থেকে বাঁচানোর জন্য এই ব্যবস্থা। রাত্তিরে গোশালারই কোনো মাচানে ঘুমোলাম। সঙ্গীর চেহারা দেখে মনে হল যে তার সাহস হারিয়ে বসেছে। কিন্তু যাত্রা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত সে রাত্রিতে বলেনি।

সকালে সঙ্গীর সিদ্ধান্ত শুনে আমি পেছনের দিকে পা চালানোই পছন্দ করলাম। কেননা লোকজন বলছিল যে সামনের পাহাড়ে প্রহরী আছে। তারা বিনা রাহাদারীতে আগে যেতে দেয় না।

আবার ধনুষা, আবার জনকপুর। জনকপুর থেকে সঙ্গীতো স্টেশনের দিকে গেল এবং আমি এক-আধ দিন থেকে বরাহী (জিঃ মুজফ্‌ফরপুর) মঠের দিকে গেলাম।

এখানের মোহন্ত যদিও তিরহুতের মোহন্তের মতো কাকা-ভাইপোর পরম্পরা বজায় রেখেছেন, তবুও তাঁর চিন্তা ভাবনা কিছুটা উন্নত ছিল। তিনি তাঁর সবটা আয় খাওয়াস ও খাওয়াসিনদের জন্য খরচ করার পরিবর্তে অবিদ্যা ও সাধু সেবায় খরচ করা পছন্দ করতেন। মঠে একটা ভাল সংস্কৃত পাঠশালা ছিল। তাতে তিন-চার জন ভাল পণ্ডিত পড়াতেন। যে সব সাধুরা পড়তেন তাদেরও উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হত। মোহন্তজী স্বয়ং সবার সঙ্গে পঙ্‌ক্তিতে বসে ভোজন করতেন এবং সাধুদের যা প্রয়োজন হত সে বিষয়েও তাঁর দৃষ্টি ছিল। তিনি নিজে লেখাপড়া জানা বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন না এবং তাঁর আশেপাশের তিরহুতের মঠেও এমন কোনো ঐতিহ্য ছিল না। এই অবস্থায় তাঁর কাজকে আমি খুব প্রশংসনীয় বলে মনে করেছিলাম।

এখানেরও কোনো এক ছাত্র আমার নাম জানত। তাই আমি আসার সঙ্গে সঙ্গেই মোহন্তজী তা জেনে গিয়েছিলেন এবং আমার থাকার জন্য একটা ভাল ঘর দেওয়া হয়েছিল। তাতে নেওয়ারের বড় খাট, পাখা ও চেয়ার পাতা ছিল। ভোজনের পর মোহন্তজী পাঠশালা মঠের সংস্কার ইত্যাদি বিষয়ে কথাবার্তা বলতে থাকেন। সময়ের গতি তিনি কিছু কিছু বুঝতে পারছিলেন বলে মনে হল। তাই তদনুযায়ী তিনি অন্তত কিছুটা চলতে চাচ্ছিলেন। তথাপি তিনি উত্তরাধিকারী হিসেবে তার ভাইপোকেই বেছে নিয়েছিলেন। কয়েক বছর পরে মোহন্তজী মরে যাওয়ার পর এক কংগ্রেসী নেতা বংশের দোহাই দিয়ে মঠের সংরক্ষক হয়ে যান।

চলে যাওয়ার সময় মোহন্তজী আমাকে বিশ অথবা পঁচিশ টাকা এবং স্টেশনে যাওয়ার জন্য হাতি দিলেন। হাতিতে বসতে গিয়ে আমি একটা ভুল করেছিলাম। লেজের দিকে মুখ করে উলটো হাতে দড়ি ধরেছিলাম। ফলে দমাস করে মাটিতে পড়ে গিয়েছিলাম। লোকজন বুঝতে পেরেছিল যে আমি হাতিতে চড়তে জানি না। সুরসণ্ডের গড় রাস্তা থেকে দূরে ছিল না। কিন্তু আমার সেখানে কোনো কাজ ছিল না। আমি বিডরখে উঠলাম এবং হাতি ফিরিয়ে দিলাম। আমের ফলন এখন ভালরকম শুরু হয়ে গিয়েছিল।

বিডরখ এসে আমি বুঝতে পারলাম যে আমার এবারের ভ্রমণের শেষ হবে তিরুমিশীমে। তাই পুপরীরোডে আমি আমার বইগুলি (যা তিন-চারটি ছোট বইয়ের বেশী ছিল না) তিরুমিশীতে হরিপ্রপন্ন স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

আমার কাছে এখন টাকা ছিল। তাই 'দশ আনা-ছ আনায়' যাওয়া এখন পাপ। আমি টিকিট কেটে দ্বারভাঙ্গা গেলাম। রাজ-লাইব্রেরি দেখলাম। শহরের কিছুটাও দেখলাম। রাত্রিতে কোনো মঠে না থেকে স্টেশনে চলে এলাম।

রাস্তায় পাতেপুর-জৈতপুরা মঠে দুয়েকদিন কাটালাম। পরসা মঠের সঙ্গে এই মঠের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং রামানন্দ স্বামী থেকে এ পর্যন্ত পরম্পরা সম্পর্কে আমি কিছু তথ্য জমা

করছিলাম। [illegible] আমি সেই মঠে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে কোনো নতুন জিনিস্ পাওয়া গেল না এবং ধরনী [illegible]র পরম্পরায় চৈনপুরা মঠ হয়েছে—আমার এই ধারণায়ও ধাক্কা লাগে।

পাতেপুর থে[illegible] আমি বসাঢ়ের রাস্তা ধরলাম। বসাঢ় পৌঁছনোর আগেই এক বৃদ্ধা ভক্তিমতী পান ভোজনের [illegible] করেছিল। দুপুরে সড়কের প্যাশে অবস্থিত এক ইংরেজী স্কুলের শিক্ষক, যিনি হয়তো পো[illegible]রও ছিলেন, ভোজনের জন্য অনেক অনুরোধ করলেন। কর্বী ছেড়ে আসার পর এখন [illegible] কখনো দিনরাত সংস্কৃত বলার পাগলামি চেপে বসত। এই দিন আমি সেই পাগলামি নি[illegible]াম। শিক্ষকের ওপর সংস্কৃত ভাষণের প্রভাব পড়েছিল। তাঁর কাছ থেকে বসাঢ়ের কেল[illegible]থা জানতে পারলাম। কিন্তু অশোক স্তম্ভ সম্পর্কে আমি তাঁর কাছে জিগ্যেস করেছিলাম [illegible] ঠিক মনে পড়ছে না।

বসাঢ়ের গড় দেখলা[illegible]জী গণতন্ত্রের যে অপূর্ণ স্বরূপ আমার মনে আঁকা ছিল, তার ওপর দৃষ্টি দিলাম। অশোক স্ত[illegible]র্কে নানারকমের কথা শুনে আমি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। গড়ের পশ্চিমে এক ঠাকুর[illegible] রাত কাটালাম। সেখানে অনেক ভাঙা পুরনো মূর্তি ছিল। মন্দিরের পূজারী এক বৃদ্ধ রা[illegible]ছিলেন। অযোধ্যা সম্পর্কে কথা বলার সময় তিনি নিজেকে পণ্ডিত রঘুবরদাসের বাবা বল[illegible]আমি কিছুটা বিস্ময়ের ভাব দেখালাম। তিনি করুণ স্বরে বললেন—যদি তাঁর এই সম্বন্ধের[illegible]লতে লজ্জা হয়, তবে তার বলার প্রয়োজন কি? আমি তো প্রসঙ্গবশত বলে ফেলেছি।

বসাঢ় থেকে আমার পাটনা আসার[illegible]। আমি রাস্তার ম্যাপ দেখে কিছু স্থির করিনি। রাস্তায় পাঁচ-দশ মাইল কমবেশী হয়ে গেলেও [illegible]মি পরোয়া করতাম না। কারণ কোনো জায়গায় পৌঁছনোর কোনো নিশ্চিত তিথি তো আ[illegible]র করে রাখিনি। গণ্ডকের ঘাট হয়ে মকের, পরসা (থানা) হয়ে শীতলপুর থেকে বেলে দি[illegible] এলাম। পাটনা কখনো আসিনি। আর জানি না কোন্ সংস্কার বশে আমি মনে করেছিলাম [illegible]দিঘওয়ারা থেকে নদী পার হলে পাটনা পৌঁছনো যায়। স্টেশনের সামনে হালুইকরের কাছ [illegible] চাটাই নিয়ে রাত্রিতে সেখানেই শুয়ে রইলাম। এদিকে গাঁজার ছিলিমে কিছু অভ্যাস তো [illegible]ল, তাই দেখাদেখি এক বাক্স সিগারেট কিনে সিগারেট খাওয়া শেখার জন্য মাথার কা[illegible]খ দিয়েছিলাম। সকালে কোনো ধার্মিক লোকের তার ওপর নজর পড়ায় তিনি ধমকে বল[illegible]—"কি রকম সাধু, সিগারেট খাচ্ছ?" সত্যি তো সাধুদের মুখে শংকরের গাছ গাছরা গাঁজা-[illegible]ই শোভা পায়। সিগারেট ছুঁয়ে আমি ধর্মের মর্যাদা নষ্ট করেছি। এক আধ বার সিগারেট খাও[illegible]া নিশ্চয় করেছিলাম। কিন্তু তার ধোয়ায় মুখের স্বাদ ও মাথার অবস্থা এমন হয়ে যেত [illegible] করতে পারিনি। চেলাগিরির কষ্ট বরদাস্ত না করে কি কেউ ওস্তাদ হতে পা[illegible]

নৌকায় যখন আমি গঙ্গা পার হলাম, তখন খুব রোদ ছিল। এখন শুধু বালির চর আর চর। দানাপুর তখনো অনেক দূর। শেষ চরে পৌঁছনোর সময় বালি অত্যন্ত তপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং আমি দৌড়ে তল-পায়ের জ্বালা নিয়ে অনেক কষ্টে তা পার হয়েছিলাম। পায়ের তলা জ্বলে যাচ্ছিল। ফোস্কা পড়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু বেঁচে গেলাম।

দানাপুরে কোনা উদাসী সাধুর কুটিরে উঠেছিলাম। পরদিন বাঁকীপুরে ভীখমদাসের ঠাকুরবাড়িতে থাকলাম। ঐ সময় ঠাকুরবাড়িতে রোজ মালদার আম আসত। এই আমের রাজা পাটনার বিশেষ জিনিব, তা আমি জানতাম না। আমি দু-তিনদিন পাটনায় ছিলাম। সাধুদের যতটা সম্ভব পায়খানাকে বয়কট করে শহরের আশেপাশে খোলা হাওয়া ও খোলা জমি ব্যবহার করা উচিত—এই শাস্ত্র অনুসারে সেই বাগানের আশেপাশে সেই সব খেতে ডোলডাল (পায়খানা যেতাম,) সেখানে এখন নতুন কদমকুঁআ বসতি হয়েছে।

পাটনা থেকে বক্তিয়ারপুর হয়ে বিহারশরীফ কাছারিতে নামলাম। ডাকবাংলোর সীমানার মধ্যে গুপ্ত যুগের পাষাণস্তম্ভ ও তার শিলালেখ দেখতে, পড়তে নয়—কেননা এখনো পুরালিপির সঙ্গে পরিচয় হয়নি—মফঃস্বল শহরের কোনো ঠাকুরবাড়িতে রাত্রিতে থাকলাম।

সামনে নালন্দা পর্যন্ত পায়ে হেঁটে গেলাম। সেই সময় খোঁড়া হয়েছিল, কিন্তু বিহার এত বেশি উদ্‌ঘাটিত হয়নি। চীনা পরিব্রাজকদের—ফাহিয়েন, হিউয়েনসাঙ, ইৎসিঙ-এর লেখা আমি মনোযোগ দিয়ে পড়েছিলাম। কাশীতে থাকার সময় ফাহিয়েনের ভ্রমণবৃত্তান্তের অর্ধেকটা আমি অনুবাদ করেছিলাম যা ওঙ্কার প্রেসের (প্রয়াগ) লোকেরা নিয়ে কোথাও গুম করে ফেলেছিল। তাই বৌদ্ধ তীর্থে ভ্রমণের সময় আমার অনেকটা অন্তর্দৃষ্টি এসেছিল। এখন পর্যন্ত একাধিক লেখা আমি "ভারতী"-কে দিয়েছিলাম। সেই সময় নালন্দার পাশে লাল কমল বিছানো বিশাল হ্রদকে সত্যিই পদ্মক্ষেত্র বলে মনে হত। মিউজিয়াম দেখার জন্য গিয়েছিলাম। তখন পণ্ডিত (ডক্টর) হীরানন্দ শাস্ত্রী নালন্দায় খননকার্য করছিলেন। মিউজিয়াম দেখতে ইচ্ছুক এক সাধু এসেছেন শুনেই তিনি চলে আসেন এবং খননকার্যের ফলে যা বেরিয়েছে তা দেখান। আমি ঐ জায়গার গরমের কথা জিগ্যেস করলাম। তিনি বললেন,—"গরম তো আছে, তবে তাতে স্বাস্থ্যের কোনো ক্ষতি করে না। আমি এক-আধ বছর কাশ্মীরে থেকে এসেছি কিন্তু এখানে আসার জন্য আমার ছেলেপিলেদের বিশেষ অভিযোগ নেই।"

নালন্দা থেকে রাজগীর গেলাম। (ব্রহ্মকুণ্ড-বৈভার পর্বত)-এর পাশে ছোট বৈষ্ণব মঠে উঠলাম। সে সময়ে সেখানে এক বৃদ্ধ সাধু থাকতেন। রাজগীর-এ তখন এত বাড়ি অথবা ধর্মশালা হয়নি। বর্মী (?), জাপানী বিহারও ছিল না। মঠে আর এক যুবক সাধু ছিলেন যিনি কিছুটা লেখাপড়া জানতেন। আমার পাহাড়ে ঘোরা ও দর্শনীয় স্থান দেখার ব্যাপারে তিনি বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন। আমি ফাহিয়েন-হিউয়েনসাঙ-এর ভ্রমণবৃত্তান্ত পড়ে বেরিয়েছিলাম। তাই এখন অনেক কিছু মনে পড়ছিল এবং ভ্রমণের আনন্দও পাচ্ছিলাম। গয়া যাওয়ার জন্য আমি সিধা রাস্তার কথা জিগ্যেস করলাম। যদি বুদ্ধের বোধগয়া থেকে রাজগীর যাওয়ার পথ জানতে পারতাম—যা আমি আমার বুদ্ধ চর্যায় দিয়েছি—তাহলে আমি সেই রাস্তায়ই যেতাম। আমাকে পাহাড়ের সেই রাস্তার কথা বলা হল যা রাজগীর থেকে নওয়াদার দিকে গিয়েছে। পাহাড়ের এক জায়গায় রাস্তা ভুলে যাওয়ায় জৈন মন্দিরের এক পূজারী বলে দিলেন—পাহাড়ের ওপর ইতস্তত ছড়ানো জৈনমন্দিরে পূজার জন্য এমন কিছু পূজারী গ্রামের পাণ্ডাদের মধ্যে রেখে দেওয়া হয়েছে। পাহাড় পেরিয়ে আরো অনেকটা চলার পর সন্ধ্যায় আমি কোনো একটা স্টেশনে পৌঁছলাম। সেখান থেকে গয়া। গোলপাথরের কাছে একটা বৈরাগী স্থানে উঠলাম।

বুদ্ধগয়া যাওয়ার জন্য কয়েকজন বৈরাগী সাধুও জুটে গেল। আমরা স্থির করলাম যে রাস্তা পায়ে হেঁটেই যাব। পরে অন্তত এক ডজন বার গয়া যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম, তাই এই প্রথম দেখার ছাপ অনেকটা মুছে গেছে। তবু বুদ্ধের প্রতি আমার ভক্তি দয়ানন্দের চেয়েও বেশী ছিল তা মনে আছে। তবে ঐ সময় আমার এই ভুল হয়েছিল যে, বুদ্ধ দয়ানন্দের মতোই বৈদিক ধর্মপ্রচারক ঈশ্বর বিশ্বাসী ঋষি ছিলেন। গরমের দিন ছিল, তাই ঐ সময়ে সেখানে কোনো বিদেশী বৌদ্ধের সঙ্গে দেখা হয়নি। আমার সঙ্গীরা বুদ্ধগয়ার মোহন্তের কাছ থেকে সদাব্রত নিয়ে নৈরঞ্জনার তীরে আর এক ধর্মশালায় রান্না করত। দুপুরের ভোজন সেখানেই হত।

গয়া থেকে ট্রেনে ভাগলপুর পৌঁছলাম। কলেজের পুরনো ইমারতের পাশে এক বৈরাগী স্থানে উঠলাম। মোহন্ত ব্রজবাসী, ক্ষীণকায় ও দুর্বল বুড়ো। দু-এক পসলা বৃষ্টি হয়েছিল। খুব আম খেতে পাচ্ছিলাম। মোহন্তজীও থাকার জন্য সাগ্রহে বলছিলেন। আমিও ভাবলাম আমের

ফসল শেষ করে এখান থেকে সামনে যেতে হবে। মঠের বাইরের ফুল বাগানে অনেক সবুজ নারকেল গাছ ছিল যা দেখে আমার মনে হয়েছিল যে আমি বাংলাদেশে পৌঁছে গেছি। মঠের একটা শাখা ছিল চম্পানগর নালার অন্য পারে গঙ্গাতীরের কোনো গ্রামে। সে সময়ে গঙ্গার ধারা গ্রাম ভাঙছিল। তাই অনেকে কাঠের লোভে অনেক আম গাছ কেটে ফেলছিল। বর্ষার সময় থেকে গ্রামের লোকেরা আশা করেছিল যে হয়তো তাদের ঘরবাড়ি বেঁচে যাবে। মোহন্তজী গাঁজা-ভাঙ নিয়মিত ভাবে সেবন করতেন এবং এখন আমিও তাতে যোগ দিতাম। নেচে নেচে 'হরে রাম' বলতে বলতে হরিকীর্তন করা আমি এখানেই দেখতে পেলাম। ভাগলপুরের (এবং বিহারেরও) বিখ্যাত কীর্তনাচার্য ক্রিস্টোবাবু কীর্তনের জন্য এসেছিলেন। দর্শকদের বড় ভিড় হয়েছিল। কীর্তনের সময় ছিল রাত্রিতে। মোহন্তজী ভাঙের গুলি কিছুটা বাড়িয়ে সরবতে গুলে দিয়েছিলেন। তাই আমার নেশা খুব চড়ে গিয়েছিল এবং ক্রিস্টোবাবুর কীর্তনের আনন্দ উপভোগ করতে পারিনি।

ভাগলপুরের মঠে এক মাসের কিছু কম সময় ছিলাম। এখানে মঠের দরজার সামনে সড়কের অন্য দিকে একটা গ্রন্থাগার ছিল যেখানে বই ও খবরের কাগজ পড়ার কিছু সুবিধা ছিল।

ভাগলপুর থেকে আমার মুর্শিদাবাদ যাওয়ার ইচ্ছা হল। টাকা-পয়সা ফুরিয়ে যাওয়ায় এখন 'দশ-আনা-ছ-আনায়' চলতে হল। রাতের গাড়িতে উঠলাম। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। যখন ঘুম ভাঙল, দেখলাম, ভোর হচ্ছে এবং আমি মুর্শিদাবাদ জংশন অনেকটা পেরিয়ে চলে এসেছি। বাংলায় কিছুটা পায়ে হাঁটার ইচ্ছা ছিল, তাই সেখানেই নেমে পড়লাম। পাশের গ্রাম কাশিমবাজারের রাজা সাহেবের। সেখানে তাঁর তৈরি একটি হাই স্কুলও ছিল। আমার খিদে পেয়েছিল। এক ব্রাহ্মণের কুটিরে গিয়ে জিগ্যেস করলাম—"মা কিছু খেতে দেবে?" ঘাসের সুন্দর ছাদ-অলা সাধারণ কিন্তু পরিচ্ছন্ন ঘরে ঝোলানো বারান্দার নিচে সিমেন্টের মেজেতে ব্রাহ্মণী চাটাই পেতে বসতে দিলেন। রান্না হতে দেরি হবে তাই আমি গুড়সহ মুড়িই (লাই) পছন্দ করলাম। বাড়িতে কোনো লেখা-পড়া জানা লোক ছিল। সে সদ্য উপার্জন করতে শুরু করেছিল এবং সিমেন্টের মেজে ও ঘরের কিছু সংস্কার করেছিল। কিন্তু মৃত্যু এসে হানা দিল। এখানে বাড়িতে দুই প্রৌঢ়া ও এক বৃদ্ধা বিধবা থেকে গেছেন।

ভাগীরথীর কোনো প্রবাহ পেরিয়ে আবার সড়ক ধরলাম। এবার আমি আসল বাংলায় এলাম। লোকজনের তেল-চোঁয়ানো টেড়িকাটা চুল, পানে কালো হয়ে যাওয়া দাঁত, ম্যালেরিয়ায় ভাঙা স্বাস্থ্য। অনেক জায়গায় গৃহস্থ ধানখেতে নিড়েন দিচ্ছিল। সন্ধ্যার আগেই আমি পলাশী অথবা তার পাশের স্টেশনে পৌঁছলাম। মনে হল মুর্শিদাবাদ পিছনে ফেলে এসেছি। কিছুটা এগিয়ে গেলেই রাণাঘাট আসবে। আমি ভাবলাম, ভালই হয়েছে একেবারে আসাম হয়ে যাব। স্টেশনের ছোট-খাট চাকরিতে কিছু বিহারী ছিল। তারাই রাত্রিতে ভোজন করাল।

সকাল সাতটা কিংবা আটটায় রাণাঘাট নামলাম। কাউকে জিগ্যেস করিনি। আমি নিজেই ঠিক করে নিলাম যে আমি ব্রহ্মপুত্রের তীরে এসে গেছি এবং ব্রহ্মপুত্রের তীর থেকে আসামের ট্রেন ধরা ঠিক হবে। তখনো হাতমুখ ধোয়া হয়নি। তাই আমি 'গঙ্গাতীরের' রাস্তার কথা জিগ্যেস করলাম। লোকজন একটা সড়কের কথা বলে দিল। কিছুটা এগিয়ে দেখলাম কোথায় ব্রহ্মপুত্র? এখানে তো একটা ছোটমতো নদী যার ওপরে একটা নৌকার পুল বাঁধা আছে। সড়ক শান্তিপুরে গেছে। বললাম—চল, এদিকেও যজমানী আছে। নদীর তীরে হাত মুখ ধুয়ে এগিয়ে গেলাম। রোদ ছিল না। আকাশ মেঘে ভরে ছিল। চারদিকে সবুজ ক্ষেত আর গাছপালা দেখা যাচ্ছিল। শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির মনোহারিণী ছবি বর্ষার জন্য এখন যৌবনবতী। বাংলাতো আমি কিছুটা

পড়তে পারতাম। কিন্তু এখন পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র অথবা অন্য কোনো মহান উপন্যাসকারের লেখা পড়িনি। তা হলে হয়তো বাংলার প্রকৃতিকে দেখে আরো আনন্দ হত।

দশটা অথবা এগারটা নাগাদ ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিলাম। এক পাকা কিন্তু মেরামতীহীন বাড়িতে গিয়ে বুঝতে পারলাম যে সেখানে যে পুরুষ মানুষটি থাকেন তিনি কিছুটা পাগলাটে। সেখান থেকে এগিয়ে হয়তো সেই গ্রামেই অন্য একটা বাংলোর মতো বাড়ি পেলাম। ভিক্ষুকের মতো গলায় নয় একেবারে বিপরীত গলায় বৃদ্ধ গৃহস্বামীকে বললাম—"কি, কিছু খেতে দেবেন?" বৃদ্ধ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, নিশ্চয়। আসুন।"

তিনি বৈঠকখানায় এক আরাম কেদারায় আমাকে বসালেন। ঘরে অনেক টেবিল চেয়ার ছিল। দেয়ালে অনেক ছবিও ছিল। কিন্তু তাদের অবস্থা দেখে মনে হল তাদের কদর করার কেউ নেই। রান্না হতে তখনো কিছুটা দেরি ছিল। বৃদ্ধ এক আট-দশ বছরের ছেলেকে ডেকে এনে আমাকে প্রণাম করালেন। তারপর একটা ফটো দেখিয়ে বললেন—"এ হল ওর বাবা। আমার একমাত্র ছেলে। উকীল হয়েছিল, কাজও বেশ ভালই করছিল। কিন্তু ভগবান ডেকে নিলেন। এখন এই এক পৌত্র আমার বংশের অবলম্বন। আমি স্টেশন মাষ্টার ছিলাম। কিছু পেনসন (?) পাই। কিছু খেত-টেতও আছে। ভগবানের কৃপায় খাওয়া-দাওয়ার কোনো দুঃখ নেই। কিন্তু পুত্র বিয়োগ, পুত্রবধূর বৈধব্য সর্বদাই যন্ত্রণা দিচ্ছে।" আমি তাঁকে বৈরাগ্যের উপদেশ অথবা অন্য কোনোভাবে সান্ত্বনা দিয়েছিলাম কিনা আমার মনে নেই। গৃহস্থের ঘরে বাঙালি আহারের এই হয়তো আমার প্রথম সুযোগ। কোনো দ্বিধা না করে যে কাঁঠালের কোয়া সেরদেড়েক খেয়ে ফেলে তার সামনে অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে দুতিনটি কোয়া গুণে বাটিতে রাখা হাসির ব্যাপার নয়? রান্না সুস্বাদু, তার মধ্যে কমলা রঙেব আচার আরো বেশী সুস্বাদু, যা দুতিনবার কেটে খাওয়ার পর জানতে পারলাম তা হল গল্দা চিংড়ী। যাহোক্ "হরেরিচ্ছাবলীয়সী" এই মৎসাবতার ধারণ করে যদি তিনি সব জায়গায় পৌঁছতে থাকেন তবে আমি দুর্বল মনুষ্য কি করতে পারি?

ভোজনের পরে যখন আমি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম, তখন গৃহস্বামী দুয়েকদিন থাকার জন্য অনেক বললেন। কিন্তু আমি অকৃত্রিমভাবে তা অস্বীকার করে আগে চলতে শুরু করলাম। সম্ভবত সেই দিনই সন্ধ্যায় শান্তিপুর পৌঁছলাম। সাধুদের জায়গা কোথায় জিগ্যেস করায় শহরে একটা পুকুরের ধারে এক সাধুর কথা শুনলাম। তিনি এক পাঞ্জাবী উদাসী ছিলেন। লাল ল্যাঙট, হলুদ খোলা জটা, গলায় কালো পশমের মালা, নবীন দীর্ঘদেহে বিভূতিমাখা। এখানকার ভাষার সঙ্গে পরিচয় নেই, অনেকটা নিরক্ষর এই সাধু সম্প্রতি এসেও এখানে বেশ ভাল ব্যবস্থা জমিয়ে নিয়েছেন। গাঁজারও কোনো অভাব ছিল না; আর গাঁজার গন্ধে তো গৃহস্থও মৌমাছির মতো ভেঙে পড়ত। মাছ-মাংসের জন্য মহাত্মা ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারে খুব নজর রাখতেন। ব্যস ধুনির ওপরই একটা বড়মতো রুটি সেঁকার তাওয়া রেখে দেওয়া হত এবং তাতে রুটির সঙ্গে ঘি চিনি দুধ দিয়ে সর্বদা ভোজন হত। ধুতীর শান্তিপুরী পাড়ের কথা আমি অনেক শুনেছি কিন্তু এটা শুনে আপসোস হল যে আজ ঐ পাড়ের বেশীর ভাগ ম্যাঞ্চেষ্টারে তৈরি হয়ে আসে।

রাত্রিতে আমি স্টেশনের দিকে যাচ্ছিলাম। তখন কোনো রসিক গান গাইতে গাইতে যাচ্ছিল। গজলের সুর কিন্তু ভাষা বাংলা। আমি বললাম—যাক অন্তত একটা ব্যাপারে বাঙালিরা আমাদের কাছ থেকে কিছু নিয়েছে। ট্রেনে তো রওনা হলাম। কিন্তু কতদূর তা ঠিক ছিল না। একটা রাত কৃষ্ণনগরে কাটালাম শহরের বাইরে সড়কের ওপর এক পান-সিগারেট-অলার দোকানে। রাত্রিতে সে মাছভাত খাওয়াল। ছেলেবেলার মৎস্যপ্রেমকে আজ গল্দা চিংড়ীর আচার জাগিয়ে দিয়েছিল।

গঙ্গা পার হয়ে নামার সময় মাঝিকে যখন পয়সা দিতে গেলাম তখন সে ছাপবার বলিতে

বলল—"না বাবা, আমি তোমার কাছ থেকে পয়সা নেব না।" এখানে, এত দূরে ছাপরার লোক ঘাটের ঠিকা!"

নদীয়াতে (নবদ্বীপ) আমি এক গৌড়ীয় সাধুর স্থানে থাকলাম। ন্যায়শাস্ত্রে নদীয়ার কীর্তি কাশী এবং তার থেকেও দূর পর্যন্ত পৌঁছেছিল। সেখানে কিছু বিহারী সংস্কৃত ছাত্রের সঙ্গে দেখা হল। তাদের সঙ্গে সংস্কৃতে কথাবার্তা হল। আমি সম্প্রতিই নব্যন্যায়ের কিছু গ্রন্থ পড়েছিলাম তাই ন্যায়ের সেই ছাত্রদের আমার পরিচয় দিতে অসুবিধা হয়নি। হিন্দি ভাষাভাষী ছাত্রদের সংখ্যা খুব কম ছিল। তাই আমাকে দেখে তারা খুব খুশী হল এবং সেখানে থেকে পড়াশোনা করার জন্য ঐকান্তিক ইচ্ছা প্রকাশ করল। মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ সম্পর্কে আমি অনেক শুনেছিলাম। ন্যায় বাৎসায়ন ভাষ্য পড়তে যখন অসুবিধা হয়েছিল, তখন তাঁর নাম অনেকবার শুনেছিলাম। তাঁর চেহারার খুব ক্ষীণ স্মৃতি থেকে গেছে। হয়তো তিনি মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর ভট্টাচার্যের মতো ক্ষীণকায়, দুর্বল ও মাঝারি গড়নের বৃদ্ধ ছিলেন। তাঁর হাতের নারকেলের খেলো হুকা থেকে মুখ দিয়ে যে ধোঁয়া বেরোত তা আজও আমার মনে আছে। তিনি খাটিয়া অথবা চেয়ারে বসতেন না। ছাত্ররা আমার পরিচয় দিয়েছিল উত্তর ভারতের নতুন ছাত্র হিসেবে। যে বিদ্যাবৈভবের কথা আমি কানে শুনেছিলাম, তা চোখে দেখে নিজেকে ধন্য ধন্য মনে করলাম। হয়তো নদীয়াতে ছাত্র কম হয়, তাই মহামহোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে সাগ্রহে থাকতে বললেন। বেনারসে নিশ্চয় মধ্যমা ও আচার্যের এক-আধ খণ্ড শেখা ছাত্রকে পড়াতে কামাখ্যানাথের মতো পণ্ডিত এতটা আগ্রহ করতেন না। বিশেষ করে প্রথম দর্শনে। তবে, কাশীতে সারা ভারত থেকে ছাত্রধারা যায় এবং নদীয়াতে আসে শুধু বাংলা থেকে যেখানে কলকাতায় এক প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থা সংস্কৃত কলেজ আছে। সংস্কৃতের বিদ্বানদের কঠোর জীবন ছাত্রাবস্থার পরে শেষ হয়ে যায় না। পণ্ডিত অবস্থায় যদি যোগ্য ছাত্র না মেলে তবে পড়ার ও পড়ানোর বিদ্যা ভুলে একেবারে মুছে যাওয়ার ভয় থাকে।

নবদ্বীপের অনেক মন্দির দেখলাম। সেই মঠও দেখলাম যার সঙ্গে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর (চৈতন্য) সম্পর্ক আছে। এক ভজনাশ্রমে পঞ্চাশজন বিধবা স্ত্রীলোককে আধসের চালের জন্য 'হরেরাম' 'হরেরাম' করতে দেখেছি। ভজনাশ্রমের লোক খুব অভিযোগ করছিল। যেমন উত্তর ভারতের কুলীন তরুণীদের মুক্তি হয় কাশীতে, তেমনি বাংলায় হয় নবদ্বীপে। তাই বেচারা ভজনাশ্রম বদনাম থেকে অব্যাহতি পাবে কি করে? বিকেলে ঘুরে বেড়ানোর সময় উত্তর ভারতীয় বৈরাগী মঠও মিলে গেল। আমি তো ঠিক করলাম—দক্ষিণে পড়াশোনা করতে যাওয়ার পরিবর্তে, এখানেই পড়ব। ন্যায়মীমাংসাই সই।

রাত্রিতে যখন মশার ফৌজ হামলা শুরু করে দিল, তখন সন্ধ্যার সিদ্ধান্ত জবাব দিতে লাগল। কোনোক্রমে রাতটা কাটালাম। সকালে সারা শরীরে মশার কামড়ের দাগ, ডান হাতের তর্জনীর মাঝখানে তো খুব খুজলী হয়ে গেল।

সকালে উঠেই আমি স্টেশনের রাস্তা ধরলাম। বিদায় নিতেও যাইনি কারো কাছে।

এবার কলকাতার জগন্নাথ মন্দিরে (জগন্নাথ ঘাট) উঠলাম। কলকাতায় আগেই অনেক মাস থেকে গিয়েছিলাম, তাই দেখাশোনার আর কিছু বাকী ছিল না।

ভাবছিলাম, সময় বাঁচানোর দিকে খেয়াল রাখা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু তা সত্ত্বেও যত বেশী সম্ভব মঠ ও প্রদেশ দেখে যেতে হবে।

হাওড়া থেকে আমি বি· এন· আর-এর লাইন ধরলাম। প্রথম রাত এক গ্রামে থাকলাম। সেখানে যাত্রা (রাসলীলা) হচ্ছিল। কতদিনে খড়্গপুরে পৌঁছেছিলাম মনে নেই। শেষ দিন এক গ্রামের ব্রাহ্মণ ছোট মাছ দিয়ে ভাত খাইয়েছিল। খড়্গপুর থেকে খুর্দা ট্রেনে গিয়েছিলাম।

তারপর সামনে পায়ে হেঁটে পুরী পর্যন্ত। উড়িয়া গ্রামের দারিদ্র্য দেখলাম। এক বড় জমিদারের ওখানে সদাব্রত নেওয়া যেত। কিছু সাধুর সঙ্গে আমিও সেখানে গিয়েছিলাম। সেখানে এক সুন্দর শিখরঅলা মন্দির ছিল। যখন সাধুদের সদাব্রত দেওয়া হচ্ছিল তখন, কোনো রাতে জীবন্ত মাগুর মাছ ভেট দিয়েছিল। আমার মনে পড়ল,'মাগুর মাছের ঝোল। ভর যুবতীর' কোল। বোল হরিবোল।' রামকৃষ্ণ পরমহংসও বেশ রসিক ছিলেন মনে হয়।

সাক্ষীগোপালে রাত কাটালাম। কিন্তু এখনো এই নামের পুরো স্মৃতি থেকে গেছে। কারণ হাজারীবাগ জেলে পণ্ডিত গোপবন্ধুদাসের দর্শন হয়েছিল এবং সাক্ষীগোপালে তার প্রতিষ্ঠিত স্কুলের কথা শুনেছিলাম। পুরীতে এখন যে ডাণ্ডিয়া সেই জগন্নাথ দাসের মঠে ছিলাম। ডাণ্ডিয়া জগন্নাথের হাজার হাজার ভক্তের সমাবেশ। মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র বাদে সারা ভারতে ধুমধাম করে ঘুরে বেড়ানোর জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাঁরা সর্বদাই চলমান। শুধু বর্ষার তিন মাস কোনো বড় শহর দেখে চাতুর্মাস্যা করতেন। জগন্নাথদাস এই গোষ্ঠীর বড় মোহন্ত ছিলেন। তাঁর নিচে ছিলেন আরো এগারজন মোহন্ত। যার ফলে তাঁদের বার ভাই ডাণ্ডিয়া বলা হত। প্রত্যেক কুম্ভে এই ডাণ্ডিয়াদের জমায়েত যেত এবং তখন মানুষের সংখ্যা কয়েক হাজারে পৌঁছে যেত। জমায়েতে চলমান মন্দির (তাঁবু), সাধুদের থাকার জন্য বড় বড় ছাতা, তাঁবু ও সামিয়ানা থাকত। এত বড় সমাবেশের ব্যবস্থা ঠিকমতো রাখা এবং বিনা পয়সায় পানভোজনের ব্যবস্থা করা সহজ ব্যাপার ছিল না। মোহন্ত জগন্নাথ দাস মানুষের 'মন ভোলাতে' একেবারে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর মিষ্টি কথা, বিশাল জটা দেখে কেউ প্রভাবিত না হয়ে পারত না। তাঁর গোষ্ঠী যেত পায়ে হেঁটে। দুয়েকদিন আগেই সামনে যেখানে যাওয়া হবে সেখানে খবর চলে যেত যে গোষ্ঠী আসছে। তারপর সেই গঞ্জ অথবা শহরের গৃহস্থ ঘি, আটা, চিনি ও টাকা জমা করতে লেগে যেত। একসঙ্গে হাজার হাজার জটা-বিভূতি ধারী সাধু দেখে গৃহস্থরা গদগদ হয়ে যেত। তাহলে আর সাধুদের পান ভোজনের কষ্ট হবে কেন? পূজার টাকার অনেকটা ভাগই থাকত মোহন্তের। মোহন্ত জগন্নাথ দাস তাঁর সেই টাকা থেকে এই মঠ তৈরি করেছেন, যা এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। বৈরাগী সাধুরা ছোঁয়াছুঁয়ি ও এঁটো খুব মেনে চলত। কিন্তু যেভাবে জগন্নাথজীতে (পুরী) একাদশীকে উলটো বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, তেমনি ছোঁয়াছুঁয়িকেও করা হয়েছে। মঠে জগন্নাথজীর ভোগের কিছুটা চলে আসত। পরিবেশনকারী সাধু পরিবেশন করার সময় মাঝে মাঝে নিজেও এক গ্রাস খেয়ে নিত। আমার মনে হয়েছিল—সারা ভারতই যদি পুরী হয়ে যেত তাহলে কত ভাল হত।

পুরীতে নদীয়ার মশার কামড় খাওয়া আঙুল পেকে উঠেছিল। কিন্তু আমি তার পরোয়া করিনি। অন্ধ্রে দুতিন জায়গায় গ্রামের স্টেশনে নেমে কিছুটা পায়ে হেঁটে গেছি। রাজমহেন্দ্রীতে গোদাবরী তীরে ঐ সময় এক বড় মেলা লেগেছিল। গৃহস্থ ছাড়া অধিকাংশই ছিল দক্ষিণের সাধু। উত্তরের সাধুদের সঙ্গে তুলনা করলে এদের পুরোপুরি ভিখিরি বলে মনে হত। উত্তরের সাধুদের আচার বিচারের মধ্যে অনেক অলিখিত নিয়ম আছে। বেশ ভূষা করা সাধুর খোলাখুলি অবহেলা করার সাহস ছিল না। কিন্তু এখানে সবাই নিজেই আচার্য। মেলায় কিছু উত্তর ভারতীয় সাধুও এসেছিল যাদের কাছে আমি উঠেছিলাম। দুয়েকদিন হাসপাতালে গিয়েছিলাম আঙুল ধোয়াতে। কিন্তু আঙুল ভাল হয়নি। ভিজাগে দুয়েকদিন থেকে আঙুল ধুইয়েছিলাম। তারপর তিরুপতী পৌঁছলাম।

তিরুপতী মঠে এখন কিছু নতুন নতুন নিয়ম চালু করা হচ্ছিল। সাধুকে মঠের বাইরে থাকতে হয়। বালাজী হয়ে এলে মঠের ভেতরে থাকতে দেওয়া হত। আমিও পেছনের এক বারান্দায় থাকলাম। ঘটনাক্রমে দারাগঞ্জের (প্রয়াগ) তুলসীদাস-এর স্থানের বাবা রামটহলদাস (সিতারচী)

ভেতরে উঠেছিলেন। তিনি আমাকে দেখে ফেলেন। —"শাস্ত্রীজী। আপনি কোথায়?" তারপর তিনি মঠের কোনো অধিকারীকে বলে আমাকে ভেতরে নিয়ে যান। সেই সময় জলগোবিন্দ (?) স্থানে এক পরমহংস বৈরাগী সাধু—যিনি জন্মসূত্রে বাঙালি—উঠেছিলেন। তাঁর সঙ্গে চন্দননগরের (ফরাসী) একটা ছেলে ছিল। মোহন্তজী চেলা বানানোর জন্য একটা ছেলেকে নিয়ে আসতে বলেছিলেন। তাই পরমহংসজী এই ছেলেটাকে নিয়ে এসেছিলেন। ছেলেটা মিড্‌ল পর্যন্ত পড়েছিল। আমার পুরনো পরিচিতদের মধ্যে এখন আর কেউ ছিল না। তিরুপতী সংস্থা এক সংস্কৃত কলেজ খুলেছে শুনে আমি তা দেখতে গিয়েছিলাম। প্রধানাচার্য শ্রীদেশিকাচার্যের সঙ্গে দেখা করলাম। দক্ষিণে দেশিকাচার্য বিরাট পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্য সম্পর্কে আমি আগেই শুনেছিলাম। তিনি পাঠশালা দেখালেন এবং বেদান্ত মীমাংসার পড়াশোনার কথা হওয়ায় ওখানে থেকেই পড়াশোনা করতে বললেন তিনি সর্বপ্রকারে সহায়তা করতে প্রস্তুত ছিলেন। এমন গুরুর কাছে পড়তে আমিও কম লালায়িত ছিলাম না এবং বালাজী থেকে ফিরে এসে পড়াশোনা আরম্ভ করার কথা বলে চলে এলাম। এখানেই লোকমান্য তিলকের মৃত্যুর খবর পেলাম এবং শোকসভা দেখলাম।

বালাজীতে এখন সেই মস্তানা বাবা "কৃষ্ণ কন্‌হৈয়া তুম্‌হী তো হো"-কে পেলাম না। বাতাস পাখি কি কখনো এক জায়গায় থাকে? আগের বার যে রঘু বরদাস (?) লঘুকৌমুদীর কিছু পৃষ্ঠা মুখস্থ করছিল, সে এখন অনেক বড় হয়ে গেছে তাঁর পাণ্ডিত্যের অহংকার ছিল তাঁর যোগ্যতার চেয়ে বেশী। ছাপরা জেলায় তার জন্ম হয়েছিল, তা মনে করে এবং আগের পরিচয়ের জন্যও আমি কিছুটা কাছের মানুষের মতো কথা বলতে শুরু করেছিলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলাম যে আমার বন্ধু অনেকটা উঁচু থেকে কথা বলছে। এই ব্যবহার সহ্য করা আমার প্রকৃতি বিরুদ্ধ ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে এর জন্য কথা কাটাকাটি করাও বড় মূর্খের কাজ বলে মনে করতাম। রঘুবরদাসজীর (অথবা যা তাঁর নাম ছিল) হালে জ্বরের মতো হয়েছিল এবং মোহন্তজী ডাক্তার ডেকে এনেছিলেন। বলছিলেন—"বড় গরম ছিল, সোডাওয়াটার আর বরফ যতই খাই না কেন কিছুই ফল হচ্ছিল না।" সোডাওয়াটার ও বরফ এই কথাটা এমনভাবে বলছিল, যেন তা ইন্দ্রপুরীর অমৃত কলস। তার দেহে সাধুর সাধারণ আঁচলা ছিল না। বরং ছিল ভাল কাপড়ের কামিজ, যদিও তা মাঝে মাঝে কোঁচকানো ছিল। তার ঐ সম্ভ্রান্ত বেশের সামনে আমার কম্বলের আলখিল্লাকে সে ধর্তব্যের মধ্যে আনবে কেন? সংস্কৃত কলেজের কথা বলার সময় সে এমনভাবে কথা বলতে লাগল যেন এ ব্যাপারে হর্তাকর্তা সবই সে। আমি দেখলাম বিগত সাত বছরকে এই লোকটি নষ্ট করেনি কিন্তু তাঁর বিদ্যার অহংকার 'জেস থোড়ে ধন··· বোড়াঈ'-এর মত ব্যাপার ছিল। আমি তখনই ঠিক করলাম যে আমি তিরুপতিতে থাকলে নিজস্ব ইন্দ্রের গদী হারানোর ভয় থাকবে। অতএব সোজা তিরুমিশী যাওয়াই ভাল।

পাহাড় থেকে নেমে আমি সোজা স্টেশনে পৌঁছলাম। মঠে যাওয়ার দরকার ছিল না। তাহলে আবার জলগোবিন্দের পরমহংসের সঙ্গে দেখা হত এবং মোহন্ত এলে তাঁর সঙ্গেও কথাবার্তা বলতে হত।

এখন আর আমার দিব্যদেশ দেখার ইচ্ছা ছিল না, পর্যটনেরও লালসাও ছিল না। তিরুপতীতে আংগুল ধোয়াতে হাসপাতালে যেতে হয়েছিল। মাঝে কয়েকদিন না ধোয়ানোতে বেশী পেকে গিয়েছিল। ভেতরে ভেতরে শংকিত হলেও বাইরে মুচকি হেসে ডাক্তারের কাঁচির সামনে আংগুল বাড়িয়ে দিলাম। কিন্তু রামটহলদাস সেখান থেকে পালিয়ে গেল। বালাজীতে দুতিনদিন আংগুল ধুইনি তাতে পুঁজ আবার বেড়ে গিয়েছিল। আর কোথাও না গিয়ে আমি সোজা তিরুমিশীতে পৌঁছলাম।

১১

তিরুমিশীতে দ্বিতীয়বার (১৯২০-২১)

স্বামী হরি প্রপন্নাচার্য এখন কিছু বেশী মোটা হয়ে গিয়েছিলেন এবং বাইরে থেকে স্বাস্থ্যবান মনে হলেও ভেতরে ভেতরে তিনি আর বেশী দিন বেঁচে থাকার আশা করছিলেন না। কর্বী থেকে পাঠানো এক পত্রের উত্তরে তিনি জীবনের অনিশ্চয়তার কথা লিখে আমাকে শীগ্‌গির যেতে লিখেছিলেন। আমি স্থানে থেকে পড়ার সহায়তা নিশ্চয় চাইছিলাম। কিন্তু মোহন্ত হতে রাজী ছিলাম না। আষাঢ় মাসে তিনি নতুন মন্দিরে নতুন সব মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই সময় তিনি তাঁর উত্তরাধিকারীর নামও ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন। আমি না যাওয়ায় তিনি বদায়ুঁ অথবা বিজনৌর জেলার এক ব্রাহ্মণ ছেলেকে উত্তরাধিকারী শিষ্য বানিয়েছিলেন। আমি দেরিতে যাওয়ায় এই ব্যবস্থা করে ফেলেছেন বলে তিনি আপসোস করলেন। এ জন্য যে আমি খুশী হয়েছি তা প্রকাশ করে বললাম, "অন্য কেউ মোহন্ত হোক এই তো আমি চেয়েছিলাম। আমি চাই বিদ্যার্জন, ব্যস সেইজন্য আপনার আতিথ্য চাই।" তিনি ভালবেসে আমার থাকার ভাল ব্যবস্থা করে দিলেন। আগেকার এক-মহলা পশ্চিমের দালান এখন দো-মহলা হয়ে গেছে। ওপরে সাদা সিমেন্টের মেঝেও পাকা দেয়ালের কয়েকটি ঘর, এরই একটায় আমাকে থাকতে দেওয়া হল। দেবরাজজী এখনো হরিপ্রপন্নাচার্যের বিশ্বাসের পাত্র এবং ভগবানের পূজা-রান্না নিয়ে আছেন। তাঁর রীওয়াঁর গুরুভাই মাদ্রাজের এক বেশ্যার ফাঁদে পড়ে এবং এখন সে চিরকালের জন্য সিফিলিস নিয়ে বসে আছে, তার জিভ মুচড়ে গেছে, শব্দের উচ্চারণ বিকৃত হয়ে গেছে।

বিগত সাত বছরে মঠের অনেক উন্নতি হয়েছে। শুধু দুটো ভাল ঘরই হয়ে যায়নি। উপরন্তু মাদ্রাজে মাসিক চাঁদা থেকে আয়ও প্রতি মাসে দেড়শ'র ওপর হয়ে গেছে। আদায়ের ঝামেলা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য হরিপ্রপন্ন স্বামী আর তাকে বাড়াতে চাননি। নয়তো আরো দাতা পাওয়া যেত। পঁচিশ-ত্রিশ হাজার থেকে বেশি টাকা সুদে খাটছিল। অনেক ধানখেতও কিনে নেওয়া হয়েছিলা। মঠের মোট সম্পত্তি ষাট হাজারেরও বেশী ছিল।

মোহন্তপদের প্রার্থী আর একজন আছে তা জেনেশুনে আমি যেভাবে নিজের মনোভাব প্রকাশ করলাম, তাতে হরিপ্রপন্ন স্বামীও প্রভাবিত হয়েছিলেন। পরের দিন থেকে আমি বন্ডে করে (বলদের টাঙ্গায়) পুন্নমলে আংগুল ধোয়াতে যেতাম। আট-দশ দিন পরে নদীয়ার মশার কামড়ের ঘা সেরে গেল, যদিও তার চিহ্ন সারা জীবনের জন্য সে রেখে দিয়ে গেল।

আমার ইচ্ছা ছিল বেদান্ত ও মীমাংসা পড়ার। স্বামী হরিপ্রপন্নের ইচ্ছা ছিল যে "অষ্টাদশরহস্য" গ্রন্থগুলিও আমি দ্রাবিড় ভাষায় পড়ি। পুরনো সহপাঠী ভক্তি—এখন টি· বেংকটাচার্য-এর বাবা শ্রীনিবাস আচার্য আমাকে বেদান্ত পড়াতে রাজী হলেন। ভক্তি স্বয়ং এখন 'মীমাংসা শিরোমণি' হয়ে গিয়েছিলেন। তাই তাঁর সঙ্গে শাস্ত্রদীপিকা ইত্যাদি পড়া স্থির হয়েছিল। আমি রোজ 'ভক্তি'র বাড়িতে পড়তে যেতাম। বিয়ের কিছুটা বিরোধী হওয়ায় ভক্তির বিয়ের খবরে আমি বিশেষ খুশী হতে পারিনি। এই বিয়ের ফলে তাঁর আপন পিসীমা তাঁর শাশুড়ী

হলেন। আমার আসার খবর পেয়ে পণ্ডিত ভাগবতাচার্য খুব খুশী হয়েছিলেন। তিনিও —শ্রীনিবাস আচার্যকে আমার জন্য পত্র লেখেন। আমি মন দিয়ে পড়তে শুরু করলাম। শ্রুতপ্রকাশিকার কিছু অংশ দেখতে দেখতে রামানুজভাষ্য ও শাস্ত্র দীপিকার পাঠ খুব ভালভাবে চলতে লাগল। ভক্তি বেদান্ত, মীমাংসা ভালভাবে পড়েছিলেন। গত কয়েক বছর সেই জন্য তিনি বেশীর ভাগ সময় মেলাপুর বিদ্যালয়ে ছিলেন। কিন্তু আর্যসমাজ ও বাইরের হাওয়া লাগায় আমার তর্ক শুধুমাত্র পুস্তকের যুক্তির মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে থাকত না। অনেকবার আমরা দুজনে একসঙ্গে রামানুজভাষ্য পড়তাম। প্রথম রামানুজ থেকে —শ্রীনিবাস পর্যন্ত গুরুপরম্পরার শ্লোক পড়ে দণ্ডবত করতাম এবং আবার আরম্ভ করতাম। রামানুজের দ্বৈত সিদ্ধান্ত এ-সময়ে আমার নিজস্ব সিদ্ধান্তও ছিল কারণ তা আর্যসমাজী সিদ্ধান্তের সঙ্গে মিলে যেত। তবু অন্যান্য ব্যাপারে আমি অনেকবার রামানুজের কথায় আপত্তি করে বসতাম। একবার ভক্তি উত্তর দিতে দিতে শেষে নিরুত্তর হয়ে গেলেন। আমার বড় বিস্ময় ও করুণা হল যখন দেখলাম, ভক্তির চোখ জলে ভরে গেছে এবং তিনি আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলছেন—"আচার্যের যুক্তি দুর্বল হতে পারে না, হতে পারে না।" আমার বয়সী যুবকের এত ধর্মভীরুতা! তখন থেকে আমি প্রশ্নকে বেশী দূরে নিয়ে যেতাম না। অনেক প্রশ্নকে শুধু বইয়ের ওপর লিখে নিতাম। হ্যাঁ, তর্কপাদ (শাস্ত্রদীপিকাকে) এর তর্ককে আমরা দুজন অত্যন্ত নির্দয়ভাবে প্রশ্নোত্তরের বিষয় বানাতাম।

সেপ্টেম্বরের শুরুতেই আমি তিরুমিশী পৌঁছেছিলাম। শীতকালের প্রভাব আর কি বলব, আমার তো দোতলার ঘরে ঘামের জন্য যন্ত্রণার একশেষ। এরই মধ্যে হরিপ্রপন্নাচার্যের মন নতুন উত্তরাধিকারীর ওপর থেকে উঠে গেল এবং তিনি আবার অস্পষ্টভাবে আমার দিকে ঝুঁকতে লাগলেন। প্রথম তিনি আমাকে রান্নাঘরে খাওয়ার জন্য পণ্ডিত ভাগবতাচার্যকে বললেন। তাতে পড়াশোনা বিঘ্ন হবে বলে তিনি মানা করেছিলেন। পরে স্বামী হরিপ্রপন্ন বলায় তিনি আজ্ঞা দেন। পরে মন্দিরের পেছনের ঘরে দুটো বড় বড় জানালা বানিয়ে দিলেন যাতে ঘরে হাওয়া খেলে এবং আমাকে সেই ঘরে যেতে বলা হল। আমি তাকে সর্বান্তঃকরণে স্বাগত জানালাম। হরিপ্রপন্ন স্বামী এখন আমাকে তাঁর উত্তরাধিকারী বলে ভাবতে লাগলেন। আমি রুশ বিপ্লবের উড়ো খবরের ওপর নির্ভর করে বিপ্লবপ্রসূত জগতের একটি চিত্র আমার মনে এঁকেছিলাম। কখনো কখনো মোহন্ত, জমিদারির সম্পত্তির কি পরিণতি হবে তা আমি মোহন্তজীর কাছে তুলে ধরতাম—এটা ভেবে যে আমি আমার মতবাদকে নয় বরং বাস্তব পরিস্থিতিকেই উপস্থিত করছি—এতে বেচারী হরিপ্রপন্নাচার্য ঘাবড়ে যেতেন। আখেরে, একটা একটা করে পয়সা জড় করে তিনি এই সম্পত্তি ও ঠাকুরবাড়ি করেছেন।

তিরুমিশীর সংস্কৃত বিদ্যালয়ে এখন উত্তরার্ধিমঠে দুই ঘর পূবে নিজস্ব ঘরে উঠে এসেছে। এখানকার বৃদ্ধ অধ্যাপকের কাছে আমি "অষ্টাদশ রহস্য" পড়তে যেতাম। রামানুজ সম্প্রদায়ের দুই শাখা—তিংগল ও বঠ়ল। এই দুইয়ের মধ্যে 'তিংগল শাখার' অষ্টাদশ রহস্য পুস্তিকার লেখক ছিলেন পিল্লে লোকাচার্য। তিনি রামানুজীদের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান বেদান্তাচার্যের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। এই রহস্যগ্রন্থ সূত্র রূপে 'মণিপ্রবাল' ভাষায় লেখা হয়েছে। মণিপ্রবাল (মণি মুংগা) এমন তামিল ভাষার নাম যাতে সত্তর-আশী শতাংশ বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ রয়েছে। রহস্যে এই ভাষাই প্রয়োগ করা হয়েছে। আমি রহস্য শুরু করার আগে তিন-চারটি তামিল রীডার সমাপ্ত করেছিলাম। তাই এই ভাষা আমি অনায়াসে বুঝতে পারতাম। মাঝে মাঝে যে সব তামিল শব্দ আসত তারই শুধু অর্থোদ্ধার করতে হত। রহস্যের শিক্ষককে সাধারণ শিক্ষকের চেয়ে বেশী ধর্মগুরুর মতো মানা হয়। আমার যোগ্যতা সম্পর্কে জেনে গুরুজী খুশী হয়ে আমাকে সযত্নে পড়াতেন। 'রহস্য' গোপনীয় গ্রন্থ, যদিও এই বই তামিল ও তেলেগুতে ছাপা অক্ষরে পাওয়া

যায়। তাই অনেক দেখে শুনে তা পড়ানোর নিয়ম। তথাপি তামিল দেশের ব্রাহ্মণ একে ততটা গুরুত্ব দিত না। আমার এই বই উত্তর ভারতে আসার সঙ্গে সঙ্গেই গুম হয়ে গেল। তাই আবার এই বইয়ের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার সময় পাইনি। কিন্তু দুটো কথা এখনো মনে আছে। রামানুজ সম্প্রদায়ের অনেক পরমপুজ্য আলওয়ার (ঋষি) ও মহাত্মা এবং স্বয়ং রামানুজের গুরু শূদ্র ও মহাশূদ্র জাতিতে জন্ম নিয়েছিলেন। তাই বর্ণাশ্রমের সমর্থকরা এ বিষয়ে কুৎসা করত। আর পরের রামানুজীয় ব্রাহ্মণও জাত-পাতের ব্যাপারে অন্যের চেয়ে দশ পা এগিয়ে গেল। এর জন্য তাঁদের মনে সন্দেহ হত। এর সমাধানে বলা হয়েছে গুরুর জাতির খোঁজ নেওয়া মাতৃযোনি পরীক্ষার মতো। তেমনি "সর্বধর্মান" পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" (সব ধর্ম ছেড়ে শুধু আমার শরণ নাও, আমি তোমাকে সব পাপ থেকে মুক্ত করব, শোক কর না।) ভগবদ্গীতার এই বাক্যে ধর্মকর্মের আশা ছেড়ে শুধু ভগবানের শরণ নেওয়া মাত্রই মুক্তি পাওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই কথাকে চরমে নিয়ে যাওয়ার গুপ্ত মতবাদে ভক্তির চেয়েও বেশী জোর দেওয়া হয় প্রপত্তির (শুধু ইষ্টদেবের দয়ার ওপর ভরসা করে নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকার) ওপর। এতে বর্ণাশ্রম ধর্ম ও ব্রাহ্মণদের সব ধর্মীয় আচার আচরণ প্রত্যাখ্যান করা হয়। তবু হিন্দুদের সব সম্প্রদায় 'হাতির খাওয়ার দাঁত একরকম ও দেখানোর দাঁত আরেকরকম' ব্যাপারে তো একে অন্যের কান কাটে। শংকরাচার্যও 'ন বর্ণা ন বর্ণাশ্রমাচার ধর্মাঃ' বলেছেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত 'ব্যবহারে ভাট্টনয়' দ্বারা সব প্রতারণাপূর্ণ কৌশলকে থাকতে দিয়েছেন। রামানুজপন্থীরা শংকরপন্থীদের চেয়েও নিজেদের অধিকতর আস্তিক প্রমাণ করে;

("বেদোঽনৃতো বুদ্ধকৃতাগমোঽনৃতঃ,
প্রামাণ্যমেতস্য চ তস্য চানৃতম্।
বোদ্ধাঽনৃতো বুদ্ধিফলে তথাঽনৃতে,
যূয়ং চ বোদ্ধাশ্চ সমানসংসদঃ।")

যাহোক, শংকর বেদান্তের সাধারণ গ্রন্থই আমি পড়েছিলাম কিন্তু রামানুজভাষ্য ও তার টীকা শ্রুতিপ্রকাশিকা পড়ার সময় শংকর বেদান্তের অন্য সব গ্রন্থকে দেখার সুযোগ পাওয়া গেল। আর্যসমাজের প্রভাব থাকায় আমার সিদ্ধান্ত দ্বৈতবাদী রামানুজের সমর্থক ছিল। তার অনেক মাস পরে কুর্গ-তে থাকার সময়, গুরুকুল কাংড়ী থেকে যে ইংরেজী পত্রিকা—'বৈদিক ম্যাগাজিন' বেরোত, তাতে আমি ব্যাস ও উপনিষদকে শংকরীয় অদ্বৈতের বিরুদ্ধ প্রমাণ করে দুটো লেখা লিখেছিলাম। এই দার্শনিক বিতর্কের বলে বৌদ্ধধর্মের সম্পর্কে নানা জিজ্ঞাসা মনে উৎপন্ন হয়ে গেল। রামানুজ ও শংকরের দিক থেকে অন্তত বর্ণাশ্রম ধর্মের শ্রাদ্ধ করে দার্শনিক খণ্ডনের দ্বারাই বৌদ্ধদের বিরুদ্ধতা করা হত। দার্শনিক সিদ্ধান্ত অনুসারে রামানুজপন্থীরা শংকরকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলত। অতএব বৌদ্ধ ধর্ম কি—এ বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যিক ছিল। পূর্বপক্ষ হিসেবে উদ্ধৃত কিছু বাক্যে আমার তৃপ্তি সম্ভব ছিল না। কিন্তু অন্যান্য কাজ বিশেষ করে রাজনৈতিক পরিস্থিতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সেই কারণে আমি বেশী সময় এদিকে দিতে পারিনি।

তিরুমিশী থেকে মাসে দুয়েকবার আমি মাদ্রাজ যেতাম। আমার বন্ধু বেংকটাচার্য ও অন্য এক তরুণ বন্ধু সেখানকার উত্তর ভারতীয় হোটেল আনন্দভবনের মিঠাইকে লুকিয়ে চেখে এসেছিলেন। তাঁদের কাছ থেকেই জানতে পেরেছিলাম যে মাদ্রাজে এক নাস্তিক সমাজ—আর্যসমাজের—প্রচার করা হচ্ছে। মাদ্রাজে খোঁজ নেওয়ার পর জানতে পারলাম যে সেখানে আর্যসমাজের প্রচারক আমার পরিচিত বন্ধু পণ্ডিত ঋষিরামজী (লাহোর)। এরপরে তো যখনই মাদ্রাজ যেতাম তাঁর সঙ্গে দেখা হত। তিনি প্রচারের কাজ হাতে নেওয়ার ওপর জোর

দিতেন। আমিও বৈদিক প্রচারক হওয়ার ইচ্ছাকে এখনো অস্বীকার করিনি, তবে 'হচ্ছে-হবে' করতে থাকি। পণ্ডিত ঋষিরামজীর কাছ থেকে আর্যসমাজ সম্পর্কে ইংরেজী বই—গুরু দত্ত গ্রন্থাবলী ইত্যাদি নিয়ে যেতাম এবং এক তীর্থবাসী দেউলিয়া বুড়ো শেঠের (চেট্টী) সঙ্গে তা পড়তাম। শেঠজী তাদের যুক্তির প্রশংসা করতেন।

মাঘ মাসের কাছাকাছি সময়ে তিরুমিশী দিব্যদেশের বার্ষিক মহোৎসব এল। স্বামী হরি প্রপন্নাচার্যের কৈং-কর্য (সেবা) এখন অনেটা এগিয়ে গেছে। উৎসবের তিন চার দিনের জন্য তাঁর মঠ এক বিরাট অতিথিশালার রূপ ধারণ করত। সব ঘর, কুঠরি মাদ্রাজ ও অন্য জায়গার যাত্রীতে ভরে যেত। যাত্রীদের অধিকাংশই হতো অব্রাহ্মণ। এটা দু'পক্ষের জন্যই ভাল ছিল। উত্তর ভারতে ভুক্তভোগী হওয়ার কারণে হরিপ্রপন্ন স্বামী সব অব্রাহ্মণকে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে একেবারে অচ্ছুতের মতো মনে করতে পারতেন না। আবার অন্য দিকে অব্রাহ্মণ, চেট্টী, নায়ডু, মুদালিয়র প্রভৃতিরাই তো ধনী ও ধর্মবিশ্বাসী হয়। অতএব বিত্ত লাভের রাস্তাও ঐ একই। যে গৃহস্থ একবার উৎসবের দিনে হরিপ্রপন্ন স্বামীর মঠের 'ভুজ্যতাং' 'পীয়তাং' দেখে গেছে, সে কি হরিপ্রপন্ন স্বামীকে কখনো খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে পারে?

উৎসবের দুয়েক সপ্তাহ আগে হরিপ্রপন্ন স্বামী মাদ্রাজে গেড়ে বসতেন। এবার তাঁর সেবকদের দেখানোর জন্য তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন। বড় কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছিল। রোদে মাদ্রাজের দূর দূরের মহল্লায় দৌড়ে বেড়ানো বড় কষ্টসাধ্য ছিল। হরিপ্রপন্ন স্বামী রিক্সা বা বণ্ডীতে (বলদের গাড়ি) একপয়সাও খরচ করা পছন্দ করতেন না। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুরতে ঘুরতে আমি তো ক্লান্ত হয়ে যেতাম। কোথাও থেকে দুই বস্তা নিলৌরের পাওয়া যেত, চাল, কোথাও থেকে এক টিন ঘি, কেউ কয়েক হাজার পাতার থালা দিত এবং কেউ তেঁতুল ও মরিচ। তেলেগু ভাষাভাষী চেট্টানীদের এ বিষয়ে অনুরাগ ছিল মাড়োয়ারী শেঠানীদের মতো। আমার বিরক্তি লাগত, কেন হরিপ্রপন্ন স্বামী এদের কাছে তাঁর ভাষণ সংক্ষেপে করতেন না। খাওয়ার এত জিনিষ জমা করা সত্ত্বেও খিদে ও পিপাসার জ্বালায় আমরা মরে যাচ্ছিলাম, কেননা অব্রাহ্মণ বাড়ির অন্নজল তো ছুঁতেও পারতাম না। হরিপ্রপন্ন স্বামীকে যারা দান করত তাদের মধ্যে এক বেশ্যাও ছিল। সে প্রত্যেক বছর অতিশয় শ্রদ্ধাভরে তার সাধ্যেরও বেশী মরিচ মশলা ও অন্য কোনো জিনিষ দিত। সে তিরুমিশীতে ভগবানের দেবদাসী ছিল। উৎসবের সময় সেখানে যেত কিন্তু বাকী সময় ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য মাদ্রাজে থাকত। বেশ্যাবৃত্তি তো একটা ব্যবসা মাত্র, সেজন্য তার ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ক্ষীণ হয়ে যায়নি।

উৎসবের সময় যাঁরা এলেন তাঁদের মধ্যে অনেক উত্তর ভারতের তীর্থযাত্রী আচারী ও আচারিণীও ছিলেন, আর ছিল মাদ্রাজের এক গৃহস্থ পরিবারও। হরিপ্রপন্ন স্বামীর এক শিষ্য সেই বাড়িতে যাতায়াত করত। কয়েক শ' বছর ধরে উত্তর ভারতের পুরুষেরা এদিকের মেয়েদের বিয়ে করে নিজস্ব আলাদা পরিবার তৈরি করে নিয়েছে যা হিন্দুদের পারম্পরিক ধর্ম অনুসারে এক স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হয়ে গিয়েছে। এই সব পরিবার সব সময় এই চেষ্টা করে যে তাদের সন্তানদের হিন্দিভাষাভাষীদের সঙ্গে বিয়ে হোক। আমাদের আচারীও এই ফেরে পড়ে এই ঘরে বিয়ে করে বসেছে এবং এখন ঘর জামাই হয়ে আছে। স্ত্রীর সামনে রূপ ও বয়স এই দুই ব্যাপারেই তাকে মানাত না। কিন্তু কুলের কথা মনে রেখে মা-বাবা মেয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন। ভবঘুরে তরুণ সাধুদের পথে এক নয় শত শত বাধা। যখন কোনো সময়ে আমি অতীত জীবনের দিকে তাকাই, তখন একটা কথা স্পষ্ট বুঝতে পারি—আমার জীবনের সফলতা নির্ভরশীল ছিল বিবাহ-বন্ধন ও স্ত্রীর ভালবাসা থেকে মুক্ত থাকার ওপর। আমি একটা নয় পঁচিশটা উদাহরণ দেখেছি যাতে স্ত্রীর ভালবাসা যুবকদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার ওপর জল ঢেলে

দিয়েছে। তিরুপতিতে কানপুরের এক প্রৌঢ়া শেঠানী এসেছিলেন, তিনি এক সাধুকে নিজের 'পূজারী' বানিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমার এক বন্ধু তাঁর প্রেমিকাকে পাওয়ার জন্য আলহা-উদলের মতো পরাক্রম দেখিয়েছিল, কিন্তু পরিশেষে তার উন্নতি সেখানেই খতম হয়ে গিয়েছিল। লংকায় এক জম্মুবাসীকে দেখেছিলাম এক কালো তামিল স্ত্রীর জন্য সে নিজের পাখা কেটে ফেলেছে। যতদিন উড়ানের ইচ্ছা; যতদিন নিজের আদর্শের সহায়ক সাধনায় মানুষ সিদ্ধ না হয়, ততদিন তাঁর দোপেয়ে থাকা সবচেয়ে জরুরি, এই তত্ত্ব আমি অবশ্যই কিছুটা বুঝেছিলাম। কিন্তু শুধু এর ওপর নির্ভর করেই আমি দোপেয়ে থাকতে সফল হতাম না। শেষ পর্যন্ত আমি স্বাস্থ্যবান যুবক, দেখতে শুনতেও খারাপ না, বরং লোলার কথা মেনে নিলে আমি সুন্দর। আমার লেখাপড়ার, ভ্রমণের অভিজ্ঞতার প্রভাবও মানুষের ওপর পড়ে যেত। ধনের ব্যবহারকে আমি সেই সময়ের প্রয়োজন বলেই মনে করতাম, তাই ধনী হওয়ার ফাঁদ থেকে বাঁচা কিছুটা সহজ ছিল। কিন্তু যা মুক্ত থাকতে সবচেয়ে বেশী আমাকে সাহায্য করেছিল তা হল লজ্জা ও সংকোচ। যদি মানুষের দৃষ্টিতে হেয় হয়ে যাওয়ার ভয় না থাকত, যদি স্ত্রীলোকের সামনে কথা বলা, বিশেষ করে প্রেমালাপের দিকে নিয়ে যায় এমন কথা বলায় সংকোচ না থাকত, তবে শুধু আদর্শের জন্য দোপেয়ে থাকা অপরিহার্য, এই জ্ঞান আমাকে বাঁচাতে পারত না। কেননা কামের বেগ বিশেষ বিশেষ অবস্থায় জ্ঞান বিবেককে তৃণের মতো ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আমার জীবনের দুচারটে ঘটনা আছে যা থেকে আমি এই জন্য বেঁচে গেছি যে কামের সাংকেতিক ভাষা প্রয়োগের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না এবং তা বুঝেছি কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ থাকত। এই জীবনীতে জীবনের এই অংশের ওপর আমি আরো লিখতাম। কেননা মাটির বাসন দেখে ছোট ছেলেদের পাথর ছুড়ে তা ঝন ঝন চরচর করে ভাঙতে দেখে যেমন মজা পায়, ব্যক্তি পূজা ভেঙে দেওয়ার জন্য আমার মনও তেমনি চুলবুল করে ওঠে। সমাজের ভড়ং আমাকে ক্রোধান্ধ বানিয়ে দেয়। আমার বিশ্বাস আছে হয়তো এই ভড়ং অথবা সমাজের অস্তিত্ব থেকে যাবে। তাই সমাজের ভড়ং-এর ও সেই সঙ্গে নিজের ব্যক্তিত্বকেও ভেঙে চুরমার করে আমি আনন্দিত হতাম। তাতে আজ অনেক লোক আমার সঙ্গে অন্যায়ও করত কিন্তু ভবিষ্যতে যারা আমাকে কদর করবে তাদের সংখ্যার সামনে এরা নগণ্য। তবু আমার বন্ধু ও স্নেহাস্পদদের আগ্রহে এ বিষয়ে আমাকে কলম থামাতে হয়। সংক্ষেপে বলা চলে যে বিগত ৩০ বছরের স্বচ্ছন্দ জীবনে আমার শুধু একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ এসেছিল এবং কিছু ঘটনা তো বালিতে পদচিহ্নের মতো সেই সময়ও ঘটেছিল। এই সব ঘটনাকে যদি সেই সব সিদ্ধ ও মহাত্মাদের জীবনের ঘটনাবলীর মুখোমুখী নিয়ে আসা যায় যাদের আন্তর-জীবন জানার কিছু সুযোগ আমি পেয়েছিলাম, তাহলে তা নগণ্য মনে হবে। মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, বুন্দেলখণ্ডবাসীদের কাছ থেকে এই ধরনের বিপদ এসেছিল কিন্তু আদর্শের প্রতি ভালবাসার সঙ্গে লজ্জা ও সংকোচ আমাকে তা থেকে বাঁচিয়েছে।

তিরুমিশীতে সারা সময়টাই পড়াশোনা করতাম। টী· বেংকটাচার্য তাঁর বাবা টী· শ্রীনিবাসাচার্য ও 'রহস্য'-শিক্ষক বিনা দ্বিধায় আমাকে তাঁদের সময় দিয়ে উদারতা দেখাতেন। ভাই সাহেব, রামগোপাল ও বলদেওজীর চিঠি যথা সময়ে আসত। 'প্রতাপ' (কানপুর) এবং আরো দুয়েকটা উত্তর ভারতীয় সংবাদপত্রও আমি আনাতাম। বই ছাড়াও দেশ বিদেশের খবর, ভারতের রাজনৈতিক প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সাম্যবাদের দ্বারা সারা জগতে ওলট-পালট হয়ে যাওয়া সম্পর্কে আমাদের প্রায়ই আলোচনা হত। শুনতে শুনতে জমিদারী ও মোহন্তদের সম্পত্তি চলে যাওয়ার ব্যাপারে স্বামী হরি প্রপন্নাচার্যর এমন বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে তিনি কলিযুগের মতো এও অবশ্যম্ভাবী ভেবে নিয়ে চোখ বুজে সন্তুষ্ট হয়ে থাকতে চেয়েছিলেন। আর্যসমাজের ব্যাপারে

আমি "অন্য পুরুষের" মতো তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলতাম, কেননা আর্যসমাজকে নাস্তিকতা বলে তিনি বড় ঘৃণার চোখে দেখতেন। আর আমার আর্যসমাজী ভাবনার কথা শুনে তাঁর মনে বড় ধাক্কা লাগত। বেংকটাচার্য ও অন্য যুবকদের এ্যানি বেশান্টের হোমরুল ও সাম্প্রতিককালের রাজনৈতিক প্রগতির আবছা জ্ঞান ছিল। তাতে তাঁদের মনে হয়েছিল সমাজে কোনো বিপ্লব হতে যাচ্ছে এবং আর্যসমাজের উদার মতবাদ তারই এক অঙ্গ ভেবে তাঁরা বিশেষ ক্ষুব্ধ হত না।

মীমাংসা, বেদান্ত ও রহস্যগ্রন্থ এখন সমাপ্তির দিকে যাচ্ছিল। স্বামী হরিপ্রপন্নজীকেও আমি বলছিলাম, এই মঠের পরিচালনা আমার আয়ত্তের মধ্যে নয়। তাঁকে একথাও বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলাম যে এই কথা আমি পয়সার মোহন্তীর লোভে বলছি না। আমার উগ্র রাজনৈতিক মতবাদ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তাঁর এই ধারণা হয়েছিল যে, আমি জেলখানা ও কালাপানিতে যাওয়ার মানুষ। এভাবে ধীরে ধীরে যখন আমি বিদায়ের কথা তাঁকে বললাম, তখন তাতে তাঁর ততটা দুঃখ হয়নি। 'ভক্তির' সঙ্গে আমার 'নর্মসচিবের' সম্পর্কে ছিল। ১৯১৩-তেই আমাদের বন্ধুত্ব হয়েছিল যখন আমরা দু'জনে মিলে কত না কাব্য, নাটক ও চম্পূ সমাপ্ত করেছিলাম। 'মালতী মাধবে' যেখানে বাতায়ন থেকে মালতী মাধবকে পথ ঘুরে বেড়াতে দেখত, তা আমরা বড় সুর করে পড়তাম। সাত বছর পরে এখন আমরা আর ১৯-২০ বছরের তাজা তরুণ ছিলাম না। তবু আমাদের ভালবাসা প্রগাঢ় হয়ে গেছল। 'ভক্তি' (টী· বেংকটাচার্য)-এর সঙ্গে বিদায় নেওয়ার সময়ই আমার সবচেয়ে বেশী দুঃখ হয়েছিল।

১২

কুর্গে চারমাস (১৯২১ খ্রীঃ)

তিরুমিশী ছেড়ে চলে আসার আগেই পণ্ডিত ঋষিরাম কুর্গে যাওয়ার জন্য আমাকে প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। কর্বীতে একবার 'মিস্টার' সোময়াজুলুর চিঠি মালাবার থেকে আমার কাছে এসেছিল। তাতে তিনি নারকেল সুপারির সুন্দর গাছের সারিতে ছায়াঘন এবং পুষ্করিণী ও জলাশয়ে আচ্ছাদিত কেরল ভূমির সুন্দর বর্ণনা করেছিলেন। সোময়াজুলু বৈদিক মিশনারি হয়ে কিছুদিন কুর্গে থেকে ছিলেন এবং এখন সেখানকার যুবকেরা কোনো উপদেশককে পাঠানোর জন্য ক্রমাগত অনুরোধ করছিল। বন্ধুর তৈরি করা ভূমিতে যাওয়ারও আকর্ষণ ছিল। অন্য আকর্ষণ ছিল নতুন দেশ দেখার। ঋষিরামজী মডিকেরিতে (মর্কারা, কুর্গ) চিঠি লিখে দিলেন। একদিন আমি মাদ্রাজ থেকে রওনা হয়ে গেলাম।

বাঙালোরে স্নাতক সত্যব্রত এবং তাঁর বন্ধু অন্য এক স্নাতক গুরুকুল পার্টির তরফে প্রচার করছিল। কলেজ-পার্টি যখন মাদ্রাজ থেকে ঋষিরামজীকে পাঠাল তখন গুরুকুল-পার্টি কেন পিছিয়ে থাকবে? তাঁরা বাঙালোর শহরে এক ভাড়া বাড়িতে থাকত। সত্যব্রতজীর সহকারী বিদেশ যাওয়ার জন্য অত্যন্ত লালায়িত ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে মহীশূরের কিছু আর্যসমাজীর খোঁজ পাওয়া গেল। তিলকের দেহাবসানের পর গান্ধী ভারতের সর্বজনমান্য নেতা হয়েছিলেন।

নাগপুর কংগ্রেসে অসহযোগের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। মহীশূরের আর্যসমাজ ধর্মপ্রচারের সঙ্গে হিন্দি প্রচারের ভারও নিয়েছিল। স্বামী পূর্ণানন্দ (আমার স্মৃতি ভুল না করলে এই তাঁর নাম ছিল) ও যুক্তপ্রান্তের এক কাব্যতীর্থ পণ্ডিত সেখানে আর্যসমাজের হয়ে কাজ করতেন। স্বামীজী শুধু হিন্দি জানতেন কিন্তু তাঁর সঙ্গী সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। মহীশূরের ভাষা কন্নড় (কর্ণাটকী) যার পঞ্চাশ-ষাট শতাংশ ছিল সংস্কৃত শব্দ। তাই সেখানকার মানুষের সংস্কৃত মিশ্রিত হিন্দি শেখার খুব সুবিধা ছিল। কলেজ ও স্কুলের অনেক ছাত্র হিন্দি শিখত ও হিন্দি প্রচার করত। তারা একে রাজনৈতিক আন্দোলনের এক অঙ্গ বলে মনে করত। মহীশূর শহরে হিন্দি ভাষাভাষী অনেক হিন্দু পরিবার ছিল। তারা হয় উত্তর ভারত থেকে এসেছিল অথবা মিশ্রিত বিবাহের ফলে তাদের জন্ম হয়েছিল। যুক্ত প্রান্তের এক বড় ব্যবসায়ী ছিলেন, যিনি এখানকার দুই বোনকে বিয়ে করেছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠা স্ত্রী নাগপুর গিয়ে গান্ধীজীর দর্শন করে এসেছিলেন। রাজনৈতিক কাজেও তাঁর খুব উৎসাহ ছিল।

মহীশূর টাউনহলে তিন-চার দিনের জন্য কয়েকটি ভাষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাতে ভিন্ন ভিন্ন আর্যসমাজী অভিমত সম্পর্কে বক্তৃতামালার প্রস্তাব করা হয়েছিল। আমার বলার কথা ছিল হিন্দিতে, কাব্যতীর্থজীর সংস্কৃততে। প্রথম ভাষণ তো সমাপ্ত হলো। কিন্তু দ্বিতীয় ভাষণের সময় আমার সঙ্গী অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাই সংস্কৃততেও আমাকেই বলতে হল। সভাপতি ছিলেন এক সংস্কৃতজ্ঞ এন্‌জিনিয়র। তাঁর আমার সংস্কৃত ভাষণের স্বাভাবিকতা ও শব্দের ভাণ্ডার বেশী ভাল লেগেছিল। তিনি বললেন—গতকালও আপনিই কেন সংস্কৃততে ভাষণ দেননি? এমনিতেও সংস্কৃত ভাষণে ও লেখায় আমার বেশ অগ্রগতি হয়েছিল। এক বছরের সংস্কৃত ভাষণের প্রতিজ্ঞা এবং দ্বিতীয়বার দীর্ঘ মাদ্রাজ প্রবাসের সময় অনবরত সংস্কৃত বলায় আমার খুব সুবিধা হয়েছিল। মহীশূরের রাজকীয় পাঠশালার পণ্ডিতদের সঙ্গে মত বিনিময় করতাম। কিন্তু তাঁদের জন্য আর্যসমাজের কাছে এমন কোনো আকর্ষক সাহিত্য—দার্শনিক অথবা শুদ্ধ সাহিত্যিক ছিল না। আর্য সমাজের সমাজ সংস্কারের কথা তাঁরা অতিলৌকিক, স্থূল, শিষ্টাচারবহির্ভূত বলে কাটিয়ে দিতেন আর তার দ্বৈতবাদী বেদান্তকে মাধ্বাদের ও রামানুজীদের কাঁচা নকল বলতেন।

মহীশূর থেকে মডিকেরী যাওয়ার জন্য মোটর লরী পাওয়া গেল। প্রথমে তো দক্ষিণ ভারতীয় সাধারণ পাণ্ডুভূমি ছিল। কিন্তু যখন পাহাড়ের চড়াই শুরু হল, তখন দৃশ্যাবলী আমার মনকে আকৃষ্ট করতে লাগল। কোথাও ছায়াঘন রৌপ্যবৃক্ষের (সিলভার ট্রি) নিচে বেলীর মতো গাছের ঝোপ দূর পর্যন্ত চলে গেছে, কোথাও বিশাল বৃক্ষ বেয়ে গোল মরিচের সবুজ লতা উঠে গেছে। কোথাও অরণ্য পর্বতের বক্ষকে ঘিরে রেখেছে। জায়গায় জায়গায় জলের ঝরণা। উঁচুতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া ঠাণ্ডা হচ্ছিল। এ পর্যন্ত যত পাহাড়ে উঠেছি, সবই উঠেছি পায়ে হেঁটে। যুদ্ধের পর মোটর লরী চলতে শুরু করেছে এবং তিরুমিশী থেকে মাদ্রাজ যাওয়ার সময় পুন্নমলী থেকে স্টেশন পর্যন্ত অনেকবার মোটর-বাসে গেছি কিন্তু এই হলো প্রথমবার যখন পাহাড়ে বাসে চড়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম।

সন্ধ্যা নাগাদ আমাদের বাস মডিকেরী পৌঁছল। পুবৈয়্যা, উত্তপ্পা, মণ্ডন্যার লজ খোঁজ পেতে অসুবিধা হল না।

লজ (বাসা) ছিল এক বাংলোতে যা চার-পাঁচজন তরুণ ভাড়া নিয়ে রেখেছিল। বাংলোর চারদিকে কফি ও চায়ের বাগান। এখানে খোলা হাওয়াতেই শুধু নয়, খোলা সমাজে শ্বাস নিয়ে সজীবতার এক অদ্ভুত ধরনের প্রসন্ন অনুভূতি হত। লজের সবাই কুর্গের যুবক। তাঁদের মধ্যে ছোঁয়াছুঁয়ির নামগন্ধও ছিল না। আর্যসমাজী উপদেশক হওয়ায় আমার নিরামিষাহারী হওয়া

আবশ্যিক ছিল। লজের যুবকেরাও অধিকাংশ নিরামিষাহারী এবং রান্নাঘরে মাছ-মাংস রান্না করাই হত না। পেঁয়াজ-রশুনের ব্যাপারে কোনো বাধা ছিল না। খাওয়া হত টেবিলের ওপরে। হিন্দুস্তানী ইংরেজী ধরনে, মিলিয়ে মিশিয়ে। মডিকেরিতে বরফ পড়ত না। তবে দার্জিলিঙ ও নৈনিতালের মতো এটা দক্ষিণের সুন্দর পার্বত্য শীতল নিবাসের মধ্যে একটা। এ রকম জায়গায় চা-কফি খেতে আনন্দ হয়। এখানে এসেই আমি প্রথম কফি দেখলাম। কফির চারা বেড়ে উঁচু হয়ে গেলে ফল পাড়তে মুশকিল হয় এবং ফলের সংখ্যা ও আকারও কমে যায়। তাই হাত দেড়েকের মতো গাছ ছেঁটে দিয়ে ঝোপের আকারে রাখা হয়। তার বেলীর মতো সাদা ফুল এবং ডালে লাল ফুলের মতো গোল গোল ফলের লম্বা ছড়া দেখতে খুব সুন্দর লাগে। আমাদের খাওয়ার জন্য প্রায়ই কফির ফল অর্ধেক পুড়িয়ে ও ভেজে এবং তারপর পিষে চূর্ণ করে তৈরি করা হতো।

লজের সঙ্গীদের মধ্যে পী·এম· উত্তপা গ্র্যাজুয়েট, অন্য সবাই প্রায় ম্যাট্রিক পাশ এবং সরকারী কাছারিতে ক্লার্কের কাজ করত। তাদের চেহারা দেখলেই মনে হয় যে মাদ্রাজীদের থেকে আলাদা এক জাতির দেশে এসে গেছি। যেমন পাহাড়ের নিচে তেমনি এখানকার প্রবাসীদের মধ্যে আশী-নব্বুই শতাংশ স্ত্রীপুরুষ কালো ও বেঁটে। কিন্তু এদের সকলের গায়ের রঙ গমের মতো, পুরুষেরা অপেক্ষাকৃত লম্বা। এরা ইংরেজী পোশাকও পরত। কিন্তু অফিসে যাওয়ার সময় অথবা কোনো বিশেষ দিনে এই পোশাকের ওপর তাদের জাতীয় চোগা, কোমরবন্ধ এবং তাতে ভোজালি লাগাত। তারা হিন্দুত্বের জন্য টিকি বাধ্যতামূলক বলে মনে করত না। প্রথম প্রথম তাদের স্ত্রীলোকদের গাঢ়োয়ালী স্ত্রীলোকদের মতো ডান-কাঁধের ওপর কুঁচনো চাদরকে সূঁচ দিয়ে গেঁথে পরতে দেখে আমার মনে হল হিমালয়ের একটা টুকরো শুধুমাত্র বনপর্বতকে উঠিয়ে নিয়ে আসেনি, সেখানকার সমাজের অর্ধেক অঙ্গকেও নিয়ে এসেছে। আশপাশ থেকে ভিন্নতা সত্ত্বেও কুর্গী ভাষার দ্রাবিড় বংশের সঙ্গে সম্পর্ক আছে। তবু কুর্গের লোকেরা নিজেদের উত্তর ভারত থেকে আগত বলে। তাদের রঙ, দেহের গঠন, স্ত্রীলোকদের শাড়ি পরার ঢঙ, মাথায় বাঁধা রুমাল, ঘরে ব্যবহৃত বাসন এবং বাড়ির নির্মাণরীতি তো নিশ্চয়ই তাদের হিমালয়ের বিশেষ করে গাঢ়ওয়াল অথবা কুল্লুর সঙ্গে সম্বন্ধ করে। মডিকেরি হাইস্কুলের সীমানার মধ্যে ছাত্রদের ড্রিলের মতো বাজনার সঙ্গে নাচতে দেখে আমার তখন তো ভাল লাগেনি। কিন্তু কয়েক বছর পর এই ব্যবস্থা ভারতীয় স্কুলগুলির পক্ষে অনুকরণীয় বলে মনে হতে লাগল।

সোময়াজুলু এখানকার কিছু তরুণদের মধ্যে আর্যসমাজের মতবাদ প্রচার করেছিলেন। তারা ছাড়া শহরের পিল্লে নামে এক উকীল প্রথম থেকেই কিছুটা আর্যসমাজী মতবাদ পোষণ করতেন, যদিও এখন তাঁর মতবাদ কিছুটা পুরনো হয়ে গিয়েছে। পিল্লে মহাশয়ের বাড়ির সীমানার মধ্যে সড়কের ধারে একটি কামরা আমরা সংস্কৃত ক্লাস ও আর্যসমাজী ভাষণের জন্য নিয়ে রেখেছিলাম। সে সময়ে তিলক স্বরাজ ফান্ডের চাঁদা এবং সারা দেশে অসহযোগের প্রস্তুতির এমন ধূম পড়ে গিয়েছিল যে আমার বক্তৃতার দরকার আছে বলে বোধ করিনি। তবে সংস্কৃত ক্লাস ও সৎসঙ্গ নিয়মপূর্বক হচ্ছিল। মণ্ডন্না ইত্যাদির মতো চার-পাঁচ জন তরুণ পড়তে আসত। আর্যসমাজী মতবাদের চর্চা এখানে আর লজেও বরাবর হত। মডিকেরিতে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি শাখা ছিল। মাদ্রাজে রামকৃষ্ণ মিশন শুধু একটি ভাল ছাত্রাবাসই খোলেনি, উপরন্তু সেখান থেকে 'বেদান্তকেশরী' নামে এক ইংরেজী মাসিক পত্রও বেরোত। এভাবে যে সব তরুণের স্বামী বিবেকানন্দ ও রামতীর্থের 'আমেরিকা বিজয়' এবং বেদান্তের সূক্ষ্মতার কিছু ধারণা হয়েছে, তাদের আর্যসমাজে আনা মুশকিল ছিল। এখানেই আমি স্বামী রামতীর্থ ও

বিবেকানন্দের সমস্ত গ্রন্থ পড়লাম। আমার মনে হল—রামতীর্থ সঠিক বেদান্তী কিন্তু পাগল, আর বিবেকানন্দ বেঠিক বেদান্তী কিন্তু চালাক। লজের এক সদস্য পুর্বৈয়্যা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বড় ভক্ত ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে প্রায়ই আমার গরমাগরম তর্ক হত কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার সঙ্গে তাঁর প্রীতির সম্পর্কের ওপর কোনো মন্দ প্রভাব পড়েনি। শংকরের বেদান্ত যে ব্যাস ও উপনিষদের মতের বিরোধী তা প্রমাণ করার জন্য 'বৈদিক ম্যাগাজিনে' দুটো লেখা ছেপেছিলাম।

মডিকেরিতে একটা ভাল বাজার ছিল। কুর্গের লোকদের মধ্যে শিক্ষার অনেক বিস্তার ঘটেছে। শুধু ছেলেদের মধ্যেই নয়, মেয়েদের মধ্যেও। রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসিনীরা তাদের জন্য কনভেন্ট প্রতিষ্ঠা করেছে। নিজেদের মধ্যে ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারটা না থাকায় কুর্গের অনেক মেয়ে সেখানে পড়তে যেত। অথচ তাদের মধ্যে কেউ খ্রীস্টান হয়েছে বলে আমি শুনিনি। কাছাকাছি কলেজ না থাকায় মেয়েদের গ্রাজুয়েট হওয়ার সুযোগ কম ছিল। তখন একটিমাত্র গ্রাজুয়েট তরুণী ছিলেন কুমারী পূবয়্যা যিনি জলন্ধরে কন্যা-মহাবিদ্যালয়ে পড়াতেন। আমার বন্ধু সপ্তরামজী তাঁর সম্পর্কে আমাকে লিখেছিলেন।

অতখানি শিক্ষা পাওয়া সত্ত্বেও কুর্গের লোকদের দৃষ্টি ছিল শুধু করণিক-এর চাকরির দিকে। তারা সরকারী অফিসে অথবা চায়ের প্ল্যান্টারদের কাছে লেখা পড়ার কাজ করত। সারা কুর্গে ব্যবসা ছিল বাইরের লোকের-কোংকনী মুসলমান, কর্ণাটক জংগম ও অন্যান্য লোক-এর হাতে। এখানকার এক বড় দোকানদার কোংকনী মুসলমানের সঙ্গে আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তিনি আমার কাছে হিন্দি পড়তে শিখেছিলেন এবং তার দোকান তো আমার রাজনৈতিক ক্লাসের এক মজবুত আড্ডায় পরিণত হয়েছিল। এখন পর্যন্ত যে প্রগতিশীল জ্ঞান অর্জন করেছিলাম এখানে আমি তো খোলাখুলি প্রচার করতাম। মুখে মুখে জমা খরচের হিসাব করে দেওয়া ছাড়াও যখন দেখত যে আমি তাদের সঙ্গে একই টেবিল ক্লথের ওপর রুটি তরকারী খাচ্ছি, তখন তাদের মনে আমার প্রতি বিশেষ ভালবাসা জন্মানো স্বাভাবিক ছিল। যাবার সময় জীবনের প্রথম অভিনন্দন পত্র এই মুসলমান বন্ধুরাই আমাকে দিয়েছিল।

মডিকেরিতে এসেই আমি কন্নড় শিখতে শুরু করে দিই। তেলেগু অক্ষর আমার পরিচিত হওয়ায় কন্নড়ের অক্ষর পরিচয় অনায়াসে হয়েছিল। আমি দেখেছিলাম যে এই ভাষায় সংস্কৃত শব্দ বেশী ছিল। অতএব সেখানে পৌছনোর দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় দিন আমি আমার কুর্গের অধ্যাপকের সঙ্গে বাজি রাখলাম—'ল্যাণ্ড হোল্ডার' এ্যাসোসিয়েসানে (জমিদার সভা) কন্নড় ভাষণের সারাংশ আমি আপনাকে শুনিয়ে দেব। বিশ বাইশ দিন পরে কনফারেন্স হয়েছিল এবং আমি যা বলেছিলাম তা করে দেখালাম। বস্তুতঃ আমার ভাষা অধ্যয়নের দক্ষতা নয়, বরং এর জন্য অধিকতর প্রশংসা 'কন্নড়ের' মণিপ্রবালত্ব'র প্রাপ্য। কনফারেন্সে অনেক কুর্গ ও কন্নড় নেতাদের বক্তৃতা হল। বক্তাদের মধ্যে এক ইংরেজ প্ল্যান্টার মিস্টার গ্রীন প্রাইসও ছিলেন। কনফারেন্সে কুর্গের জন্য এক নির্বাচিত কাউনসিল প্রতিষ্ঠার "গরম প্রস্তাব" পাস হল। সে সময়ের কুর্গীদের কাছে এই প্রস্তাব গরম প্রস্তাব ছিল। গান্ধীজীরও দোহাই দেওয়া হয়েছিল। এই সময়েই প্রথম তা শোনার সুযোগ হয়েছিল আমার। ১৯১৯ এর ৬ এপ্রিলে ব্র্যাডল হলের সভায় তাঁর নামের সঙ্গে সেই প্রভামণ্ডল ছিল না, কেননা তখনো ভারতের বুড়ো চাণক্য বাল গঙ্গাধর জীবিত ছিলেন।

এমনিতেই তো সারা কুর্গ পার্বত্য দৃশ্যে ভরা, কিন্তু দোদা-বেটা ও কাবেরী স্রোত বিশেষ দর্শনীয় স্থান।

কাবেরি দক্ষিণের গঙ্গা। গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রীর মতো এর স্রোতকেও পবিত্র মনে করা হয়।

কাবেরীর স্রোত কুর্গের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ে না হলেও মোটামুটি উঁচুপাহাড়েই। কিন্তু হিমালয়ের নদীর স্রোতের বাহার এখানে কোথায়? হিমালয়ে চিরন্তন শ্বেত তুষার প্রথমেই নদীগুলিকে বিগলিত রূপোর প্রবাহে পরিণত করে দেয় এবং যেখান থেকে নদীগুলি বেরিয়ে আসে, সেখানে তো যত্রতত্র ঝরণা ও কুণ্ড। সবুজ অরণ্য ও বিশাল বৃক্ষে আচ্ছাদিত হওয়া সত্ত্বেও সদা সবুজ বৃক্ষরাজ দেবদারুর অভাবে এই পাহাড় নাগাধিরাজ হিমালয়ের কাছাকাছি যেতে পারে না। কাবেরী স্রোতের পাহাড়ের পাশে ছোট এলাচের জঙ্গল দেখলাম। এলাচের চারাগাছ কচুরীপানা অথবা হলুদের গাছের মতো। চারাগাছের শাখা থেকে বেরিয়ে আসা শিকড়ে এলাচ নিবিড়ভাবে গ্রথিত হয়ে থাকে। এই সময়ে কুর্গে অনেক কফি হত। কিন্তু কোনো রোগে কফির বাগান নষ্ট করে দিয়েছিল, তা এখন চায়ের বাগানে পরিবর্তিত করা হয়েছে। প্রায় সব চায়ের বাগানই ইংরেজদের হাতে। চন্দন এখানে রাজবৃক্ষ। সাধারণভাবে চন্দন জঙ্গলে হয়। কিন্তু যদি কারো খেতে চন্দন গাছ জন্মায় তবে মালিক তা কাটতে পারে না, পরে তার কাঠও নিতে পারে না। এলাচের বাগানেও কুর্গের লোকদের অধিকার বিশেষ ছিল না। জঙ্গল বিভাগ তো সরকারের হাতেই। এভাবে কুর্গবাসীদের এই সব প্রাকৃতিক সম্পত্তির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। দিন গুজরানের জন্য তাদের সেই পাহাড়ী চাষবাস দেওয়া হয়েছে।

দোদাবেটা কুর্গের এবং সম্ভবতঃ সম্পূর্ণ মাদ্রাজ প্রান্তের সর্বোচ্চ পর্বত শিখর। একজন যুবকের সঙ্গে আমি তা দেখতে গিয়েছিলাম। উঁচুতে লাল ফুলের কাঁটা-অলা ঝাড় দেখেছিলাম যা হিমালয়ের তিন চার হাজার ফুট ওপরে দেখা যায়। যাওয়ার সময় একদিন আমার সঙ্গীর বাড়িতে থেকেছিলাম। এখানে ধান চাষ হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও কুর্গের লোকেরা রুটি খুব ভালবাসে। চায়ের সঙ্গে চালের রুটি অবশ্যই পেতাম। দোদাবেটা সাত হাজার ফুট থেকেও বেশী উঁচু। ওপরের জঙ্গলে বড় বড় জোঁক। মানুষের পায়ের শব্দ পেলেই এই সব হাজার হাজার অন্ধ প্রাণী তাদের সুচের মত সরু মুখ সেদিকে ঘোরাতে শুরু করে। আমরা তাই অনেক লেবু নিয়ে গিয়েছিলাম এবং মাঝে মাঝে লেবুর রস পায়ে মেখে নিতাম। ভাগ্য ভাল ছিল সেই দিন বৃষ্টি হয়নি। নয়তো জোঁক অনেক গুণ বেড়ে যেত। লেবুর রসও ধুয়ে যেতো। দোদাবেটা শিখরের কোনো বৈচিত্র্য ছিল না; তা ছিল সমরস পর্বতের ওপর এক মামুলী চাটানের মতো। আমরা তার ওপর চড়ে নিচে বিস্তৃত বনস্থলী দেখলাম।

কুর্গ দেশ, এখানকার লোক, পাহাড় ও বনের যথাযথ সাদৃশ্য পরে আমি লংকার কাণ্ডীতে দেখেছি—যেখানে কাণ্ডীর লোকেরা সিংহল হিন্দি-আর্য ভাষা বলে, সেখানে এরা বলে একটি দ্রাবিড় ভাষা।

কুর্গ ইংরেজদের হাতে এসেছে মাত্র একশ' বছরের আগে। নিজেদের রাজবংশের ভ্রাতৃহত্যা ও কুব্যবস্থা থেকে বিরক্ত হয়ে এখানকার লোকজন নিজেরাই তাদের শাসনভার কোম্পানির হাতে তুলে দেয়। তারই পুরস্কার হিসেবে কুর্গের লোকদের হাতিয়ার নিয়ে নেওয়া হয়নি, লংকার মতো এখানেও বন্দুক রাখায় কোনো বাধা নেই। রাজার প্রাসাদ মডিকেরিতে। কিন্তু মডিকেরি থেকে কিছু দূরেও তাঁর একটা উদ্যান প্রাসাদ আছে। দুটি প্রাসাদ-এর মধ্যে এখন শুধু মন্দির ব্যবহৃত হচ্ছে। বাকীটা সরকার মেরামত করে দেখার জন্য রেখে দিয়েছে।

যেখানে হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও কুর্গের লোকেরা উদারপন্থী, সেখানে এখানকার পুরনো রাজবংশ লিংগায়ত (বীরশৈব) ছিল, যারা নিজেদের কট্টর রক্ষণশীলতার জন্য বিখ্যাত। সম্ভবত কুর্গের লোকেরা লিংগায়তদের বিজাতীয় মনে করেও শাসন পরিবর্তন মেনে নিয়েছিল।

কুর্গের (কোড়গু) লোকদের দুটি শাখা—'অমা' কোড়গু ও সাধারণ কোড়গু। অন্য শাখার বিপরীতে অমা কোড়গু লোকদের মধ্যে বিধবা বিবাহ হয় না, তারা শুয়োর পালন করে না, ফলে

তাদের উঁচু বলে ধরা হয়। এই সময় মানবতত্ত্ব আমার অধ্যয়নের বিষয় হয়ে ওঠেনি। কিন্তু আমি মনে করি, কোড়গু লোকদের আচার ব্যবহার আশেপাশের লোকদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও তারা নিজেদের অনেক পুরনো বিশেষত্বকে রক্ষা করে আছে।

দেখতে দেখতে অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাব ধীরে ধীরে কুর্গের ওপর পড়তে শুরু হল। সভা হতে লাগল, যাতে কোড়গু লোকেরাও সম্মিলিত হতে থাকে। আমি থাকাকালীনই তারা 'কোড়গু' নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকা কন্নড় (?) ভাষায় বার করে।

বলদেওজীর চিঠি ক্রমাগতই আসত। এবার তাঁর ও মোহন লালজীর চিঠি এল যে এখন আমরা অসহযোগ করতে যাচ্ছি। আমি তাড়াতাড়ি দুটি চিঠি লিখে জানালাম এখন আপনাদের বি· এ· পরীক্ষার দু-তিন মাস বাকী। পরীক্ষা শেষ করে অসহযোগ করুন। কিন্তু তা তারা মানবে কেন? গান্ধীজী তো "সালভরমে স্বারাজ্য" (এক বছরে স্বরাজ) এনে দেওয়ার ঠিকা নিয়ে নিয়েছিলেন। স্কুল কলেজকে শয়তানের বিদ্যালয় মনে করে তার প্রতি অসহযোগ এবং এক বছরে স্বরাজ প্রথম থেকেই আমি এই দুয়ের বিরোধী ছিলাম, যদিও অন্যদিকে রাজনৈতিক জাগৃতি ও সংঘর্ষের আমি জবরদস্ত পক্ষপাতী ছিলাম। কুর্গে আমার সঙ্গীদের সঙ্গে কথাবার্তার বেশী সময় কেটে যেত রাজনৈতিক আলোচনায়।

ধর্মপ্রচারের ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে এখন আমার অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক ভাবনা বাইরের পরিমণ্ডল অনুকূল দেখে উথলে উঠতে লাগল। যদিও কুর্গে গান্ধীর আঁধি ততটা প্রচণ্ড হয়ে আসেনি, তবুও কুর্গের লোকেরা তার ছোঁয়া পেয়েছিল। তাছাড়া আমি তো দৈনিক 'হিন্দু' ও অন্যান্য খবরের কাগজ নিয়মিতভাবে রোজ পড়তাম। তবুও তাড়াহুড়ো করে কুর্গ ছেড়ে চলে যাওয়া আমি উচিত বলে মনে করিনি। কেননা পণ্ডিত ঋষিরামজীকে আমি এর জন্য কথা দিয়েছিলাম। ঠিক এই সময়ে যাগেশের চিঠি এল। তাতে বাবার মৃত্যুর খবর ছিল। আমি কিছুটা স্তব্ধ মতো হয়ে গেলাম। কিন্তু আমার চোখে অশ্রুর কোনো চিহ্ন ছিল না। লজের সঙ্গীরা সেখানে বসে ছিল। যখন আমি স্বাভাবিকভাবে তাদের বাবার মৃত্যুর কথা বললাম, তখন অন্য কেউ কিছু না বললেও শ্রীযুক্ত পুবেয়া ভর্ৎসনা করে বললেন— "তোমার কি রকম হৃদয়, বাপের মৃত্যুর জন্য দুফোটা চোখের জল ফেললে না।"—তিনি আমাকে পণ্ডিতজী বলতেন। সেখানে আমায় সাধু-সন্ন্যাসীর বেশ ছিল না, তাহলে হয়তো তিনি একথা বলতেন না।

বাবার মৃত্যুর খবর শুনে ছুটি নেওয়ার অজুহাত পেলাম, আর রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করার স্থির সিদ্ধান্তও নিয়ে নিলাম।

চতুর্থ পর্ব

রাজনীতিতে প্রবেশ (১৯২১-২৭ খ্রীঃ)

১

ছাপরার উদ্দেশে প্রস্থান (জুন ১৯২১ খ্রীঃ)

সেই সময় পর্যন্ত অসহযোগ-আন্দোলন কার্যে পরিণত হয়েছিল। হাজার হাজার ছাত্র কলেজ-স্কুল ছেড়ে দিয়েছিল। অনেক উকিল, ব্যারিস্টার তাঁদের প্র্যাকটিস বন্ধ করে দিয়েছিলেন। গান্ধীজী তিলক-স্বরাজ ফান্ডের এক কোটি টাকা জমা করে ফেলেছিলেন। রাজনীতিতে প্রবেশ করতে হবে এটা তো ঠিক করে নিয়েছিলাম, কিন্তু কোথায় এই প্রশ্নের মীমাংসা করতে দু-চারদিন লেগে গেল। আজমগড়ে যাওয়া সম্ভব নয়। বাকি জায়গাগুলোর মধ্যে জালোন জেলা আর ছাপরা এই দুই-ই আমার সামনে ছিল, আমি ছাপরার পক্ষে ফয়সালা করলাম।

আমার বইগুলো মাদ্রাজে পণ্ডিত ঋষিরামজীর কাছে ছিল, সেগুলো বাঙ্গালোরে পাঠিয়ে দেবার জন্য লিখে দিলাম আর মডিকেরির বন্ধুদের কাছ থেকে শোকপূর্ণ হৃদয়ে বিদায় নিলাম। বইগুলো বাঙ্গালোর থেকে কোঁচ-এ শ্রী পান্নালালজীর কাছে পাঠিয়ে দিলাম এবং আমার আসা ও যোগ্য সেবা করার বিষয়ে জানিয়ে ছাপরা জেলা-কংগ্রেস-কমিটির সেক্রেটারিকে চিঠি দিলাম।

অসহযোগ-আন্দোলনের ফলস্বরূপ শোলাপুরে হালেই এখন গুলি চলেছিল, তাই গুলি যেখানে চলেছিল সেই জায়গাটা দেখবার জন্য আমি সেখানে নামলাম। সেইসময় গান্ধীজী মহাত্মা গান্ধী তো হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু এখনও তিনি গান্ধী টুপি এক-বোতাম-খোলা-গলার জামা পরতেন। বোম্বাইতে তাঁর এই বেশে ফটো খুব প্রচলিত ছিল। বোম্বাইতে আমি দু-তিন দিন থাকলাম। চৌপাটীর কিছু সভায় যোগ দিলাম। একটি সভায় কোটগড়ের স্টোক সাহেব বলছিলেন—হিমালয় থেকে কুমারী পর্যন্ত সমস্ত ভারতভূমিকে হিমশুভ্র খাদি দিয়ে ঢেকে দেওয়া উচিত। জনতা গম্ভীর করতালি ধ্বনিতে বক্তাকে স্বাগত জানিয়েছিল।

খাণ্ডোয়াতে এক গোশালায় উঠলাম। লোকেরা বাজার-চক এ আমার বক্তৃতার ব্যবস্থা করেছিল। এটা ছিল আমার প্রথম রাজনৈতিক বক্তৃতা। কি বলেছিলাম তা আমার মনে নেই, কিন্তু বলার জন্য তখন পর্যন্ত আমার কাছে যথেষ্ট জিনিষ ছিল, এতে সন্দেহ নেই।

কোঁচ (জালোন)-এ শ্রী পান্নালালজীর ওখানে উঠলাম। এখন তাঁর পরিবার মহেশপুরা ছেড়ে এখানে চলে এসেছিল, আর স্ত্রীদের ঝগড়ার চোটে দুই ভাই দুই বাড়িতে থাকতেন। চার বছরের ব্যবধানের ছাপ তো সব মুখে পড়ারই কথা। এখানে চৌরাস্তায় এক রাজনৈতিক বক্তৃতামালাই শুরু হয়ে গেল, যা তিন অথবা চার রাত ধরে চললো। মডিকেরিতে আমি খদ্দরের জামা সেলাই করিয়েছিলাম, এখানে আমি খদ্দরের আঁচলা (সাধুদের ধুতি) পেয়ে গেলাম।

বেনারসে স্বামী বেদানন্দ এখনও ছিলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করে সোজা ছাপরা পৌঁছলাম।

সলেমপুরের সেই পাকা বাড়িটা এখনও আছে, যেখানে সেই সময় জেলা কংগ্রেস কমিটির দপ্তর ছিল। আমি আমার সেই আঁচলা পরে কমণ্ডলু হাতে খালি মাথা, খালি পায়ে দপ্তরে পৌঁছলাম, সেখানে শুধু ভরত মিশ্রই আমার পরিচিত ছিলেন। সবাই শতরঞ্চিতে বসেছিল, আমিও একপাশে বসে পড়লাম। আমার চিঠি পৌঁছে গিয়েছিল, কিন্তু কিছু বন্ধু তাকে এক অখ্যাত সাধুর ধৃষ্টতা বলে মনে করেছিল—যে চিঠি দিয়ে তার বিশেষত্ব দেখাতে চায়। রাজনৈতিক কাজের বিষয়ে আমার কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করার ছিল। জেলায় তিলক-স্বরাজ-ফাণ্ডের সংগ্রহের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। জানতে পারলাম যে এখন চরকা-খদ্দর আর মাদক দ্রব্য-নিষেধ-এর উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। নিজের কাজ গ্রামের ছোট জায়গায় শুরু করার ব্যাপারে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, আর তারজন্য আমার কাছে পরসার থেকে ভালো আর কোন জায়গা হবে? জিজ্ঞেস করায় আমি আমার পরসায় যাবার সিদ্ধান্তের কথা বললাম। কিছু সাথী সন্তুষ্ট হল যে সাধু জেলাকেন্দ্রে কাজ করার ধৃষ্টতা দেখায়নি। আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও একমা থানা কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারিবাবু প্রভুনাথ সিংহকে অফিসের তরফ থেকে এক পরিচয় পত্র লিখে দেওয়া হল। রাতের বেলায় আমি একমা স্টেশনে নামলাম। সেই সময় আশ্রমে গিয়ে লোকেদের তুলে দেওয়াটা ভালো না মনে করে চিঠিটা তো আমি লোকের হাতে সেখানে পাঠিয়ে দিলাম, আর নিজে সোজা পরসা মঠে গেলাম।

সামনেই ভাদ্রের কৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী। তাই ততদিন পর্যন্ত পরসার বাইরে যাবার প্রশ্নই ছিল না। শুধু ওঠা ছাড়া মঠে আর কোন আগ্রহ ছিল না। জানতে পারলাম যে কয়েক মাস আগে বরদারাজ এখানে ছিলেন সেই সময় আন্দোলনে তিনি কিছু কাজ করেছিলেন। পরসার কিছু

যুবক সেবা-সমিতিতে যোগ দিয়েছিলেন, আর প্রথম মাসগুলোতে তাঁরা লণ্ঠন হাতে পাহারা দেবার কাজও করেছিলেন, কিন্তু এখন সেই উৎসাহে ভাঁটা পড়েছে। ছ মাস আগেই ঘটে যাওয়া ব্যাপারকে মনে হচ্ছিল যেন এক যুগ আগে হয়েছে। বরযাত্রীরা ফিরে যাবার পরে যেমন অবসাদ বোধ হয়, তেমনই সেই সময় মনে হচ্ছিল, কিন্তু এখনও চেতনা সম্পূর্ণ শেষ হয়নি। চারদিকে স্বরাজ আর গান্ধীবাবার ধূম লেগেছিল। পরসার এক তরুণ খুব উৎসাহের সঙ্গে বলছিল—গাঁজা-মদ-বলিদান লোক ছাড়ছিল না। আমি একদিন দেবতা আসার নাটক করলাম, দেবতা আমার মাথার কাছে এসে ঘোষণা করলো—'আমরা সব দেবতা গান্ধীবাবার সঙ্গে আছি, আমরা বলি চাইনা, গাঁজা না, মদ না, গান্ধীবাবার হুকুমের বিরুদ্ধে যে এই সব জিনিষ আমাদের দেবে আমরা তাকে নাশ করে দেবো' আর এর প্রভাব খুব ভালো হল।

জন্মাষ্টমীর দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় দিন পরসাতে বাবুলালের নতুন তৈরি গোলায় গ্রামের লোকদের সভা হল। থানার তরুণ কর্মীরাও এলেন, আর রামউদার বাবার (আমার) সভাপতিত্বে বক্তৃতা হল। পরসাবাসীরা পূজারীজীর বক্তৃতা এই প্রথম শুনতে পেলো। মোহন্তর প্রধান শিষ্য হবার দরুণ পরসাতে আমার খুব সম্মান ছিল। ভাষণ শুনে থানার তরুণ কর্মীদের উপরও প্রভাব পড়লো। তাঁরা একমাতেই থাকার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলেন। এটাও এখন নিচে থেকেই কাজ করার মতই ছিল, তাই আমি আপত্তি করলাম না। একমাতে সেই সময় মদ গাঁজার দোকানে ধর্ণা চলছিল। কিছু নির্লজ্জ লোকই শুধু দোকানে কিনতে যেতো। ঠিকেদার পানাসক্তদের কাছে মদ পৌছে দেবার চেষ্টা করতো।

একমাতে স্কুল ছেড়ে আসা তরুণদের এক ভালো দলের সঙ্গে আমার কাজ করার সুযোগ হল। প্রভুনাথ আর লক্ষ্মীনারায়ণ ম্যাট্রিক থেকে অসহযোগ করে এসেছিলেন। গিরীশ তার স্কুলের অত্যন্ত ভালো ছাত্র ছিলেন, আর ম্যাট্রিক পাশ করে তিনি স্কুল ছেড়েছিলেন। ফুলনদেব কলেজের প্রথম বছর থেকে পড়া ছেড়েছিলেন। হরিহর, রামবাহাদুর ও বাসুদেবও হাইস্কুল থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। ষাট-সত্তর হাজার জনসংখ্যার থানা হিসেবে এমন আধ ডজনের বেশি তরুণ কর্মী পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার ছিল। পড়া ছেড়ে আসা ছাত্ররা ছাড়াও পণ্ডিত নগনারায়ণ তিওয়ারী (রসুলপুর), পণ্ডিত ঋষিদেব ওঝা (হুসেপুর), রামনরেশসিংহ (অতরসন) সেই সময় তাঁদের সমস্ত সময় রাজনৈতিক কাজে লাগাতেন। সবে সাথীদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া এবং দু-চারটে সভায়—যার মধ্যে অতরসন-এর সভাও ছিল—বলারই সুযোগ পেয়েছিলাম, তখন একটি গ্রামের সভায় ভরতজী এলেন। জেলার নেতাদের মধ্যে প্রোগ্রাম ভাঙ্গায় তিনিও যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেছিলেন; তাই তিনি আসায় কর্মীদের আনন্দ হল। তিনি আমাকে ধরে ছাপরা নিয়ে গেলেন। মদের দোকানে ধর্ণা দেওয়া হচ্ছিল, আমি একটা দোকানে গিয়ে দাঁড়ালাম, একজন মদ্যপ আমার অনুনয় বিনয়ের পরোয়া না করে ভিতরে চলে গেল। তার পরেরদিন বন্যায় সেই ঘর ভেঙ্গে পড়লো, লোকেরা গুজব ছড়ালো সাধু-মহাত্মাকে ধাক্কা দিয়ে যাবার এই ফল হয়।

ভরত মিশ্র সোনপুরে সভার প্রোগ্রাম করেছিলেন, নিজে তিনি যেতে চাইতেন না তাই কাজের বাহানা করে আমাকে সেখানে পাঠালেন, হয়তো সেই কারণেই তিনি আমাকে ধরে এনেছিলেন।

সন্ধ্যেবেলা থানার এক গ্রাম·······এ মহীর রেলপুলের পাশে ছোট একটা সভা হল। দ্বিতীয় দিনের সভার জন্য আমি স্বরাজ্য-আশ্রমে অপেক্ষা করছিলাম—স্বরাজ্য-আশ্রম তখনও এই জায়গাতেই ছিল, কিন্তু তার মুখ রাস্তার দিকে ছিল না। সকাল আটটা অথবা নটার সময় কেউ এসে বললো—ভীষণ বন্যা এসেছে, ছাপরা তো ডুবতে বসেছে। এমন সময় উপযুক্ত সেবকের

কতো প্রয়োজন পরে, তা আমি জানতাম। সাথীদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আমি সঙ্গে সঙ্গে ছাপরার দিকে রওনা হলাম।

২

বন্যাপীড়িতদের সেবা (সেপ্টেম্বর ১৯২১ খ্রীঃ)

লোক প্লাটফর্ম আর রেলওয়ে রাস্তায় অল্পস্বল্প জিনিষ নিয়ে বসে ছিল। কচহরী স্টেশন থেকে ভগবান বাজার (ছাপরা) স্টেশন পর্যন্ত রেলওয়ে রাস্তার একদিকে জল উপর পর্যন্ত পৌছেছিল, কয়েক আঙ্গুল আর বাড়লে তা অন্যদিকে পরতে শুরু করতো, আর তাহলে ছাপরা শহরের আর আশা থাকতো না। ভগবানবাজার স্টেশনেও ঘর থেকে পালিয়ে আসা নর-নারীর ভীড় ছিল। আমি বন্যার ভীষণতার কিছু চেহারা তো দেখে নিলাম, এবার সাহায্য কি করে করা যায়, তা জানার জন্য কংগ্রেস অফিসের রাস্তা ধরলাম। স্টেশন থেকে ভগবানবাজারের রাস্তা ধরে, জেলখানা, জিলাস্কুল, ইলিয়ট পুকুর, মিউনিসিপ্যালিটি হয়ে অফিসে পৌছলাম। ছাপরার রাস্তাগুলো ছোটখাটো নদীর চেহারা নিয়েছিল। জেলের আশেপাশে তো আমাকে কোমর জলে চলতে হল। কাঁচা দেয়ালের বাড়ি ভেঙ্গে গিয়েছিল। পাকা দেয়ালের বাড়িগুলোতেও জল ঢুকে গিয়েছিল, আর লোকেরা পালিয়েছিল। জনশূন্য মহল্লাগুলোর নিস্তব্ধতা ভয়ঙ্কর লাগতো। বাড়িগুলোর খাপরার ছাতে এক-আধটা বেড়াল আর কোথাও কোথাও ক্ষুধার্ত কুকুরের করুণ ক্রন্দন শোনা যাচ্ছিল।

অফিসে সেই সময় একজন কি দুজন লোক ছিল। সন্ধ্যেবেলা বারান্দার বাইরে সিঁড়ির দিকে আমাদের নজর ছিল। দুটো সিঁড়ি ডুবে গিয়েছিল, জ্যোৎস্না রাতে আমরা কম্পিত হৃদয়ে তৃতীয় সিঁড়ির দিকে শনৈঃ-শনৈঃ জল বাড়তে দেখছিলাম। যখন জল বাড়া বন্ধ হল তখন আমাদের ধড়ে প্রাণ এলো।

আমি এখন একেবারে অপরিচিত লোক ছিলাম, তাই পীড়িতদের সাহায্যের জন্য আমি কি বিশেষ ব্যবস্থা করতাম, তবুও চুপ করে বসে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কংগ্রেসওয়ালারা কিছু নৌকো পেয়েছিল। আমরা খোঁজ পেলাম, কচহরী স্টেশনের পশ্চিমে অনেক গ্রাম ডুবে যাচ্ছে। একটা নৌকো নিয়ে আমি সেদিকে রওনা হলাম। একটা গ্রামে গিয়ে জানতে পারলাম লোকেরা পুকুরের উঁচু পাড়ে পশুপ্রাণী নিয়ে চলে এসেছে, আর এখন তাদের বিপদ নেই। অপর কিছু গ্রামের লোকদের বয়ে বয়ে রেলওয়ে লাইনে পৌছতে লাগলাম। একটি লোককে গ্রামের লোকদের বার করে আনার জন্য একটা নৌকা দিয়ে দিয়েছিলাম। সে সেটাকে তার নিজস্ব সম্পত্তি বলে মনে করে নিল আর ঘরের মানুষদের আর বাক্স সিন্ধুক বওয়ার পর ভুসি বইতে শুরু করেছিল। গ্রামের কতো মেয়ে-বাচ্চা-বুড়ো তাদের খাপরার ছাতের উপর ভয়ভীত বসে ছিল, ছাতের নিচে তিন-তিন চার-চার হাত জল, আর এখন তা বাড়ছে। দেয়াল যেকোন সময় পড়ে যাবে, আর সেই রাতে খুব কম লোকেরই ডোবার হাত থেকে বাঁচার আশা

ছিল। এমন ভীষণ অবস্থায় একটা মানুষ প্রাণ বাঁচানোর জন্য পাওয়া নৌকোতে ভুসি বইছে!! আমার খুব রাগ হল, আর যেই স্টেশন থেকে নৌকো আসতে দেখলাম ওমনি আমার নৌকো নিয়ে তার উপর লাফিয়ে পড়লাম। সেই হৃদয়হীন লোকটাকে ভালো মন্দ কথা শুনিয়ে নৌকো কেড়ে নিলাম। অন্য সঙ্গীদের প্রথম নৌকার দায়িত্ব দিলাম। কাজ কাজকে শেখায়, চার-পাঁচ ঘণ্টা ধরে আমার সঙ্গে কাজ করা সঙ্গীদেরও ঢং বোঝা হয়ে গেল। আমিও তো এখানে কাজ আর তার অভিজ্ঞতা শিখছিলাম। গ্রামে পৌঁছে আমি লোকেদের নৌকোয় উঠতে বললাম। যতজন ধরে ততজন বসলো। একটি স্ত্রীলোককে লোকেরা আসতে বলছিল, কিন্তু সে ছাতের উপর থেকে বলছিল—ঘরের ভিতর থেকে সিন্দুক না নিয়ে আমি নৌকোয় চড়ব না। ছাতের উপর বসে থাকা লোকের এখন প্রাণের আশঙ্কা ছিল, রেলওয়ে লাইনে তাদের নামিয়ে আমাদের এদের নেবার জন্য আবার আসতে হত, আর এই স্ত্রীলোকটি বুক জলে ঘরের ভিতর গিয়ে সিন্দুক আনার কথা বলছিল। যদি এরমধ্যে কোনরকমে দেয়াল ধ্বসে যায় তাহলে যে সিন্দুক আনতে যাবে সে ভিতরে থেকে যাবে, তারজন্যও কোন পরোয়া ছিল না তার। কিন্তু কি করবে? তার দেওর অথবা ভাসুর কাঁধ পর্যন্ত জলের ভিতর ঢুকে গেল। সিন্দুক নিয়ে নৌকোয় রাখা হল তবে আমরা রওনা হলাম।

বন্যার খবর শুনে দেহাত থেকে কর্মীরা আসতে লাগলো। একমাত্র তো সমস্ত দলটা পৌঁছে গেল। সাহায্যের জন্য ছাতু, ছোলা, চিড়া, চাল ইত্যাদি চারদিক থেকে আসতে লাগলো। কতো জায়গা থেকে মানুষ পুরিও পাঠাতো। ইলিয়ট পুকুরের কাছে রেলওয়ে লাইনের পাশে কংগ্রেস-সাহায্য ক্যাম্প খুললো, যেটা ছাপরা কেন বিহারের ইতিহাসে এই রকম প্রথম প্রচেষ্টা ছিল। কর্মী প্রয়োজনের বেশী ছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে সংগঠন ছিল না, দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকের সংখ্যা বেশী ছিল। মৌলবী সালেহ, সর্বশ্রী মথুরাপ্রসাদ, নারায়ণপ্রসাদ, হরিনন্দন সহায়, গোরখনাথ, জলেশ্বর প্রসাদ, বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ, ইত্যাদি জেলার প্রধান কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন, আর যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা খুব কাজ করছিলেন। আমি রাত-দিন নৌকো নিয়ে ছুটোছুটি করছিলাম। সম্ভবতঃ দ্বিতীয়দিনের কথা, মাঝরাতে জানা গেল মসরখ লাইনের পাশে এক গ্রামে লোকেরা গাছের উপর ক্ষুধার্ত অবস্থায় বসে আছে। আমি আমার একমাত্র একজন অথবা দু জন সঙ্গীর (যাদের মধ্যে রামবাহাদুরলালও ছিলেন) সঙ্গে কিছু ছাতু-ভাজা, চাল নিয়ে রওনা হলাম। কমতা, 'সখীজী' আর একজন সাধুর সঙ্গে দুটি গাছের উপর রাখা বাঁশের মাচায় বসেছিলেন। ছাতু-ভাজা নিতে বলায় তিনি তার সঙ্গী সাধুকে জিজ্ঞেস করে দিয়ে দিতে বললেন। মসরখের রেলওয়ে লাইন ভেঙ্গে গিয়েছিল। জল পড়ার শব্দ ডানদিকে খুব জোরে শোনা যাচ্ছিল। কাছ দিয়ে গেলে টানে পড়ে নৌকোর সেদিকে চলে যাবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু আমরা ছিলাম অন্য এক নেশায়। সাবধান ছিলাম, কিন্তু তা মৃত্যুর জন্য ভয়ভীত হয়ে নয়। সেই গ্রামে পৌঁছলাম। লোকেরা গুমটির কাছে রেলওয়ে লাইনের উপর পড়ে ছিল। দু-চারজন প্রতিষ্ঠিত লোককে ডাকিয়ে আনলাম, আর তাদের সমর্থন অনুযায়ী খাওয়া-দাওয়ার জিনিষ বিতরণ করলাম।

সেখানেই জানা গেল, রাস্তার অপরদিকের গ্রাম রাস্তা ভেঙ্গে যাওয়ায় বিপদে পড়ে গেছে। কিন্তু আমাদের নৌকো তো এপারে? তারা কলার গুড়ি দিয়ে ভেলা বানিয়েছিল। একজন পথপ্রদর্শক নিয়ে আমি তাতেই উঠে বসলাম। গ্রামটা একটু উঁচুতে ছিল, আর লোকেরা জল ঢোকার পথগুলোতে মাটি ফেলে রেখেছিল। জল এগোনর পথ বন্ধ ছিল, তাই খুব শিগ্গিরী ততটা বিপদ ছিল না। কারোর খাবারের প্রয়োজন থাকে তো, এসো—বলে কিছু লোককে সঙ্গে

নিয়ে আমি আবার নৌকোর জায়গায় গেলাম। সেদিন রাত তিনটে বাজার পর কচহরী স্টেশনের পশ্চিমে এক তালগাছে নৌকো বেঁধে আমরা ঘুমোলাম।

কাজের সময় আলসেমি আমার অসহ্য মনে হয়। অনিচ্ছাসত্ত্বেও এমন সময় আমি এগিয়ে যাই, আর হতে পারে, এমন সময় আমার সাথীরা আমাকে ভুল বোঝে। এই বন্যা-ত্রাণের সময়েও এমন সুযোগ হল। কিন্তু আমার খুশী হয়েছিল যে কোন সাথীর ভুল বোঝাবুঝি হয়নি। কচহরী স্টেশনের কাছে চার পাঁচ হাত জলের পিছনে একটা নৌকো দাঁড়িয়েছিল। সব বাবুলোকেরা বলছিলেন—নৌকোটা আসা উচিত; কিন্তু নৌকো তো মানব ভাষাভিজ্ঞ প্রাণী নয়। আমি কাপড়-জামার পরোয়া না করে ঝাঁপ দিলাম। নৌকোটা ধরে আনলাম। বাবুলোকেরা লজ্জিত হলেন। একজন সাধুবাদ দিলেন।

অফিসে কার্যরত কর্মীদের মধ্যে কৌডিয়ার এক তরুণ কায়স্থের তৎপরতার আমার উপর খুব প্রভাব পড়েছিল। তেমন যদি আধ-ডজন লোকও থাকতো, তাহলে কতো সুব্যবস্থিতভাবে কাজ হত। সরকারী কাছারীর কোন চাকরি ছেড়ে এসেছিলেন তিনি পরে বী· এন· ডবলিউ· আর-এ গার্ড হয়ে গিয়েছিলেন। পরে কখনও কখনও তাঁর সঙ্গে দেখা হবার সুযোগ হয়েছিল, আর তখন মনে হত—যদি কখনও আবার তেমনই তন্ময় হয়ে আমাদের একসঙ্গে কাজ করবার সুযোগ হত।

বন্যার জলবৃদ্ধি বন্ধ হয়ে গেল, রেলওয়ে লাইন ভেঙ্গে যাওয়ায় জলও কম হতে লাগলো, এইভাবে ডুবে যাবার বিপদ দূর হয়ে গেলো; কিন্তু মানুষের কষ্ট কম হয়নি। শহরে গোলামালিকদের ফসল বস্তার ভিতরেই পচে গিয়েছিল। ভগবানবাজারের মালগুদামের পাশ দিয়ে যেতে গেলে দম বন্ধ হয়ে আসতো, পচা ফসল থেকে কড়া দুর্গন্ধ বেরোচ্ছিল। মসরখ ছাড়া আর সব লাইনই চালু ছিল, তাই বাইরে থেকে খাবার জিনিষ আসছিল। শহরে কাজ করার লোকের অভাব ছিল না, তাই আমি গ্রামগুলির সাহায্যের দায়িত্ব নিলাম। লোকেরা ভূগোল পড়েছিল, নকশা দেখেছিল। কিন্তু তা কাজে লাগাতে এখনও শেখেনি। একদিন রাতে যখন আমি নকশা আঁকছিলাম, তখন অনেক সঙ্গীই তাকে বেকার পাগলামি মনে করছিলেন। গ্রামগুলোতে চা-ডাল, ছাতু-ভাজা, ছোলা ছাড়াও কেরোসিন তেল, নুনও বিতরণ করতে হত। অনেক লোকই প্রয়োজন থাকলেও লজ্জাবশত মাগনা নিতে অস্বীকার করতেন।

এই বন্যার প্রভাব একমা, সিসওয়ন আর রঘুনাথপুর থানার কিছু ভাগের উপরও পড়েছিল। সেখানকার খেতে ফলে থাকা ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, আর কাজ না পাওয়ায় গরীবদের অবস্থা খারাপ ছিল। ছাপরাতে আরো কর্মী এসে পড়ায় আমি একমা চলে এলাম। এদিককার থানাগুলিতে বিতরণ করার জন্য দু-এক বস্তা মোয়া-ভাজা নিয়ে রাতে আমি একমাতে নামলাম। অভ্যাসবশত আমার সঙ্গীরা কুলীর প্রতীক্ষা করছিলেন। আমি নিঃসঙ্কোচে মোয়ার বস্তা মাথায় তুলে নিলাম। প্রভুনাথ বললো—বাবা ঠিক সাম্যবাদী। কিন্তু দিনের বেলা এইরকম নিঃসঙ্কোচে 'বাবা' বস্তা মাথায় তুলতে পারতেন না, এ আমি জানতাম। কোন কাজে সৈনিক স্পিরিটের সঙ্গে কাজ করলে মজা পাওয়া যায়। একমার সমস্ত সাথীরা শুধু আমার সম্মানই করতেন না, বরং সঙ্গে কাজ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। সিসওয়ন থানাতে পীড়িত সাহায্যের বেশি প্রয়োজন ছিল, তাই গিরীশকে সেখানে যেতে বললাম। সেই ব্যাপারেই বাসুদেবসিংহ রঘুনাথপুর থানায় যেতে রাজী হল। একমার জন্য প্রভুনাথ, লক্ষ্মীনারায়ণ ও অন্য সব কর্মীরা ছিলেন। আমি নিজে নৌকোয় খাবার-দাবার নিয়ে বহু গ্রামে ঘুরে বেড়ালাম।

প্রথম সাহায্যের কাজ শেষ হল। দেশের নেতাদের আপীলে রাজ্য ও দেশের জনতা খাদ্য ও অর্থ দিয়ে খুব সাহায্য করলো, আর এখন রবি ফসলের জন্য বীজ, ম্যালেরিয়ার ওষুধ, আর

ক্ষুধার্তদের জন্য অন্ন-বস্ত্রের প্রয়োজন ছিল; তবুও সেইসব কাজের জন্য এখন ঘণ্টা মিনিটের তাড়া ছিল না।

কার্তিক মাসে ধারে দেবার জন্য বীজ একমাতেও এলো। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাড়লো, আর ম্যালেরিয়া মিক্সচারের ডজন ডজন বোতল আমরা বিতরণ করতাম। শীতের জন্য মারোয়ারী রিলিফ সোসাইটির তরফ থেকে কম্বল-কাপড় নিয়ে এক গারোয়ালী তরুণ জোশী এলেন। ফাল্গুন পর্যন্ত লোকেদের কষ্ট, আর সমস্ত ঘরে আমরা সাহায্য পৌঁছতে পারতাম না, তাই আমি ভাবলাম, এই সময় চরকা আর তাঁত সহায়ক হতে পারে। আমাদের একমাত্র গান্ধী-স্কুলে তাঁত ছিল, কিন্তু এখন সেটা ৪ × ৪ হাত জমি ঘেরার জন্য থেকে গিয়েছিল। আমি ভাবলাম, যদি লোকেদের চরখা দিয়ে তাদের দিয়ে সুতো কাটিয়ে নেওয়া যায়, আর সেই সঙ্গে জোলাদের দিয়ে কাপড় বুনিয়ে নেওয়া যায় তবে লোকেদের বেশী সাহায্য হতে পারে। আমি লেখায় গিরীশ চারশো টাকু বানিয়ে চেনপুর থেকে পাঠালো। ছুতোরকে চরখা বানানোর কাজ দিয়ে দিলাম। রামপুর (বিন্দালালের)-এ এক পুরনো প্রাসাদে পুরনো শালের কাঠ দেখে দশ-বারো টাকায় একশো তাঁত বানানোর মত কাঠ কিনে আমি পরসায় পাঠালাম, তার মধ্যে কিছু তো ছুতোরকে জমিতে বসে চালানোর ফ্লাই-শাটল-তাঁত বানানোর জন্য দিয়ে দিলাম, আর কিছু পুরনো ভাটিওলার ঘরে জমা রেখে দিলাম। কয়েক শত চরখা তৈরী হল, আর বিতরণ করা হল, তিরিশটা তাঁত বানানো হল আর তাদের মধ্যেও অনেকগুলি বিতরণ করা হল। কিছু টাকা ব্যয় করে একটা খদ্দর ডিপো খুললাম, যার ইনচার্জ হল ফুলনদেব। কিছু সুতো এলো। তা দিয়ে কিছু কাপড়ও তৈরী হল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের লেখা 'রং' বইয়ের থেকে আমি কিছু রং-এর অভিজ্ঞতা লাভ করলাম। কিন্তু ডিপোতে আসা কাপড় খুব কম বিক্রি হত। তাহলে আর নতুন চরখা আর তাঁত বিলিয়ে কি লাভ? তাঁত, চরখা আর কয়েকশো টাকু তেমনি পড়ে রইল। জমা পড়ে থাকা কাঠগুলোকে পরসার ভাটিওলা নিজের সম্পত্তি মনে করে নিল। খদ্দর অর্থশাস্ত্রে এখানেই শেষ হয়ে গেল।

সাহায্যের জন্য পাওয়া জিনিষগুলির মধ্যে কিছুর অপব্যবহারও হল, আর কর্মীদের মধ্যে কারো কারো সত্য ভ্রষ্ট হয়েছিল, কিন্তু এমন লোকের সংখ্যা খুব কম ছিল, তবুও জনতার উপর এর খারাপ প্রভাব পড়লো, আর তার থেকেও বেশী খারাপ প্রভাব পড়লো নিষ্ঠাবান সৎ কর্মীদের উপর। এমন বিচার করার সময় আমরা প্রায়ই ভুলে যাই যে, যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় আমরা বেঁচে আছি, তার বুনিয়াদই অপহরণ আর বেইমানীর উপর হয়েছে, যতদিন মূলের উচ্ছেদ হবে না, ততদিন পর্যন্ত এই সব ক্রটির জন্য আমাদের তৈরি থাকা উচিত। আমার দায়িত্ববান সাথীরা সকলেই তাদের কর্তব্য খুবই তৎপরতা ও সততার সঙ্গে পালন করলো।

৩

সত্যাগ্রহের প্রস্তুতি (১৯২১ খ্রীঃ)

জালিয়ানওয়ালা বাগ আর মার্শাল-লর অত্যাচারের কথা শুনে সমস্ত ভারতে রোষের তুফান উঠলো। জালিয়ানওয়ালা বাগের বিশাল সভা আর ৬ এপ্রিল ১৯১৯-এর প্রদর্শন জানিয়ে দিল, যে মহাযুদ্ধের পর দেশ কোথায় চলে গেছে। আত্মগ্লানি আর প্রতিশোধের ভাবনা দেশে এতো উগ্র হয়ে উঠেছিল, যে যদি কোন বিশ্বাসপাত্র নেতা এগিয়ে আসতো, তো জনতা তাকে সঙ্গ দিতে প্রস্তুত ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার আন্দোলনের বিষয়ে শুনে ভারতের শিক্ষিত জনতা গান্ধীজীকে চিনতো। চম্পারণ আর খেড়ার আন্দোলন তাঁকে ভারতের সাধারণ জনতার মধ্যে প্রসিদ্ধি ও সর্বপ্রিয়তা প্রদান করলো। রোলট এ্যাক্ট-এর বিরোধ নিয়ে গান্ধীজীর এগিয়ে আসাটা ঠিক সময়ে হল। জনতা—বিশেষ করে কিসান ও নিম্নমধ্যম শিক্ষিত জনতাকে নিজের দিকে আকর্ষিত করার পদ্ধতি তাঁর সময়ের সমস্ত ভারতীয় নেতাদের মধ্যে গান্ধীজী—তিলককে ধরে—বেশি জানতেন। এইভাবে ভারতব্যাপী আন্দোলনের নেতৃত্ব করার জন্য তিনি নিজেকে যোগ্য প্রমাণিত করলেন। অমৃতসর (১৯২০), কলকাতা (১৯২১), নাগপুর (১৯২১) কংগ্রেসে গান্ধীজীর নক্ষত্র ক্রমেই উঁচুতে উঠতে লাগলো, আর বিদেশী সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষ করতে তাঁকেই এগিয়ে আসতে দেখে জনতা অসহযোগ ও সত্যাগ্রহকে স্বাগত জানালো। ছ মাসের ভিতর তিলক স্বরাজ ফান্ডের জন্য এক কোটি টাকা জমা করে দেওয়া, ভারতীয় জনতার কাছে এই প্রথম ঘটনা ছিল।

'একবছরে স্বরাজ'-এর কথায় বিশ্বাস করাটা তো যাদুমন্ত্রে বিশ্বাসী গ্রাম্য জনতার কাছে কঠিন ছিল না; কিন্তু আমার অবাক লাগতো সেইসব শিক্ষিতদের বুদ্ধিতে, যাঁদের মধ্যে জেলে পড়ে থাকা অনেকেই ৩১শে ডিসেম্বর ১৯২১-এর মধ্যরাত্রে স্বরাজ সরকার দ্বারা জেলের ফটক খুলে যাবার প্রতীক্ষা করছিলেন।

জুলাই (১৯২১) এ যখন আমি বিহারে এলাম, সেইসময় উৎসাহ কমে আসতে শুরু করেছিল, কিন্তু তা শুধু এই অর্থে যে লোকেরা অতিরিক্ত প্রোগ্রাম—রাত্রে পাহারা দেওয়া, হুঁকো-তামাক-মাছ-মাংস ছেড়ে দেওয়া, পঞ্চায়েত দিয়ে মোকদ্দমার ফয়সালা করা, মুষ্টি (প্রতিদিন এক মুঠো চাল) তুলে রাখা ইত্যাদি—ভুলতে শুরু করেছিল।

একমাতে সৌভাগ্যবশত আমি খুব ভালো সঙ্গী পেয়েছিলাম। জীবনের সেইসব দিনগুলো আমার বড়ই মধুর মনে হয়, যখন প্রভুনাথ, গিরীশ, লক্ষ্মীনারায়ণ, হরিহর, মধুসূদন, রামবাহাদুর, দুবীলা, বাসুদেবের মত একডজন শিক্ষিত তরুণ কষ্ট আর বিপদের একদম পরোয়া না করে চব্বিশ ঘণ্টা রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যয় করছিলেন। একমা থানার কোণে কোণে আমরা চষে ফেলেছিলাম। জেলার অন্য জায়গাগুলিতে আন্দোলন শিথিল প্রায় হয়ে এসেছিল, মুষ্টিতোলা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু একমাতে জাগৃতি ছিল। এখানে মুষ্টি তুলতে লোকেদের আপত্তি ছিল না। (আপত্তি তো হয়তো কোথাও হত না)—আর আমরা তাই জমা করে স্বরাজ আশ্রম একমার খরচ চালাতাম। একমাতে এক গান্ধী বিদ্যালয় খোলা হয়েছিল। তাঁত আর চরখাও রাখা

হয়েছিল। পড়ানোতো রামউদার রায়, রামবাহাদুর আর আমার মধ্যে যে সময় পেতাম, পড়াতাম। বিদ্যালয়ের বিষয়ে আমরা এইটুকু সন্তোষ প্রকাশ করতে পারতাম যে ছাত্রদের সময় নষ্ট হতে পারতো না। বিদ্যালয়ে রামদাস গৌড়ের হিন্দি বই পড়ানো হত, যা সেই সময়ের সরকারী পাঠ্য পুস্তকগুলি থেকে অনেক ভালো ছিল। ইংরেজি পড়ার জন্য আগে ছেলেদের দূরে যেতে হত, কিন্তু এখানে আমাদের বিদ্যালয়ে তারও ব্যবস্থা ছিল। রামদাস গৌড়ের বইগুলি আর খলীলদাসের ভজন 'ভারত জননী তেরী জয় তেরী জয় হো" ছাড়া অন্যান্য পাঠ্য বিষয়ে অন্য সরকারী স্কুল থেকে কোন প্রভেদ ছিল না, তবুও আমরা 'রাজদ্রোহী'দের স্কুলে পড়ি,-এর প্রভাব ছেলেদের উপর পড়া অবশ্যম্ভাবী ছিল। একবার আমাদের বিদ্যালয়ের দুটি ছোট ছোট ছেলে রামচন্দ্র আর মঙ্গল তাদের গ্রাম (একমা) দলের সঙ্গে 'গান্ধী মহাত্মা কী জয়', 'ভারতমাতা কী জয়" ইত্যাদি ধ্বনির সঙ্গে মিছিল বার করে ৬ থেকে ১২ বছরের ছেলেদের সভা করছিল। রামচন্দ্র সভাপতি হল আর মঙ্গল বক্তৃতা দিতে শুরু করলো। সামনে পনেরো বিশজনের 'জনতা' বসে ছিল। বক্তৃতা সবে শুরু হয়েছে, কি রামচন্দ্রের মার নজর পড়লো সেদিকে। সে শুনেছিল, পুলিশ এর জন্য ধর-পাকড় করে। দৌড়ে এল, আর মুখ থেকে কথা বেরোনর আগেই সভাপতি রামচন্দ্রের পিঠে দু-তিনটে থাপ্পড় পড়লো। সভা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। বাচ্চাদের ভিতরে পর্যন্ত এইরকম উৎসাহ জাগানোতে গান্ধী বিদ্যালয়ের মত বিদ্যালয়গুলির কম হাত ছিল না।

একদিনের কথা আমার মনে আছে। সম্ভবত আমরা অতরসনের সভা থেকে রাত্রে ফিরছিলাম। খেতে সবুজ ধান হয়েছিল। জ্যোৎস্না রাতের নিরভ্র আকাশে ছড়িয়ে থাকা তারা আর দিগন্তে কাজল মাখানো বৃক্ষ-বাগান চোখে পড়ছিল। আমাদের তাড়া ছিল না, তাই এক একলা অশ্বত্থ গাছের সামনে বসে অথবা দাঁড়িয়ে আমাদের কথাবার্তার হাওয়া ভূতেদের দিকে ঘুরে গেল। সঙ্গে কে কে ছিলেন, সে কথা তো মনে নেই, কিন্তু গিরীশ অবশ্য ছিলেন। আর্য সমাজের প্রভাবের জন্য ভূত-প্রেত থেকে আমার বিশ্বাস চলে গিয়েছিল, কিন্তু ভূতেদের গল্প বলতে বা শুনতে আমার খুব মজা লাগতো। গল্প আমি শুরু করলাম, কিন্তু গিরীশ তাঁর গল্প দিয়ে আমাকেও মাত করে দিলেন। তিনি রাকস (রাক্ষস), ব্রহ্মপিশাচ, জিন, ইঁড়কসবা (গর্ভগিরা), পেত্নী, বুড়া (জলে ডুবে মরা), তেলিয়া-মশান, সৈয়দ, দৈত (দৈত্য) ইত্যাদি কতোরকম ভূতের রকম গোনালেন, তারপর তাদের মধ্যে কারো কারো গল্পও বললেন। অনেক রাতে আমরা একমা পৌঁছলাম। এইরকমই আর এক রাত্রি-যাত্রা বালিয়া (চেনপুরের রাস্তায়) থেকে একমা পর্যন্ত হয়েছিল। সভা শেষ করে খেতে খেতে অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু পরের দিনের প্রোগ্রামের কথা চিন্তা করে আমরা রাতে সেখানে থাকতে পারতাম না। সেদিন গল্প তো হয়নি কিন্তু আমার তো মনে হচ্ছিল, ঘুমিয়ে পথ চলছি।

বন্যার পর আমার সঙ্গীরা একমা ছাড়া রঘুনাথপুর, সিসওয়ন থানার কাজও সামলেছিল, আর একমার পাশের মাঝী থানার গ্রামে কাজ করাটাও আমি নিজের ঘাড়ে নিয়েছিলাম। বস্তুত আমার দৃষ্টি তো ছিল সমস্ত জেলার উপর, কিন্তু সংগঠন ভেঙ্গে গিয়েছিল। অভিজ্ঞতা থেকে আমি এটাই বুঝতে পারছিলাম, যে একজন শিক্ষিত চতুর তরুণকে থানায় চব্বিশ ঘন্টা কাজ করতে পাওয়া যাবে না, সেখানে স্থায়ী কাজ হতে পারবে না। এই কথা চিন্তা করে গিরীশ আর বাসুদেবকে আমি দুটো থানায় পাঠিয়ে ছিলাম। এক থানা থেকে অপর থানার গ্রামগুলিতে পায়ে হেঁটে পৌঁছন মুস্কিল ছিল, তাই একটা এক্কা-ঘোড়া রাখতে হল। কতোবার আমার সঙ্গে পণ্ডিত নগনারায়ণ তিওয়ারীও থাকতেন। তিনি আমাদের থানা কংগ্রেস কমিটির সভাপতিই শুধু ছিলেন না, বরং ভালো বক্তা, গায়ক ও গণভাষার কবি ছিলেন। ছাপরাতে পৌঁছেই আমি নিয়ম করে নিয়েছিলাম, যে ছাপরার ভাষা (মল্লী অথবা ভোজপুরী) তেই ভাষণ দেবো। এর প্রভাব

আমার সঙ্গীদের উপরও পড়েছিল। পণ্ডিত নগনারায়ণের গলায় খুব জোর ছিল, আর বলার ঢংও ভালো ছিল। কয়েক বছর আগে তাঁর দৃষ্টি চলে গিয়েছিল, কিন্তু তিনি কোন দৃষ্টিবান কর্মীর থেকে কাজ করায় কিছু কম ছিলেন না। ভোজপুরী (মল্লী) ভাষার অনেক গান তিনি বেঁধেছিলেন, যেগুলোর মধ্যে কিছু; মেয়েদেরও ছিল, যেগুলো তিনি সভাগুলিতে গাইতেন। দিনে দুটি সভা—সন্ধ্যা আর রাতে হত, কখনও কখনও তিনটিও। সিসওয়ন থানা হয়ে আমরা রঘুনাথপুরে চলে গিয়েছিলাম। এই থানার ব্রাহ্মণদের একটি গ্রামে কার্তিক কৃষ্ণপক্ষে ছটের রাতে আমরা থেকেছিলাম। রাতে ছট-পূজার জন্য মেয়েরা পুকুরে জমা হয়েছিল। এমন সুযোগ নগনারায়ণজী কি করে ছাড়েন? তিনি গানের সাহায্যে বিদেশী জিনিষ আর শাসনের বহিষ্কারের কথা বোঝালেন। রাতে প্রায়ই মেয়েদের পর্দা-সভা হত। ছাপরার ভাষায় বলার জন্য আমার শব্দগুলো তারা হয়তো বুঝে যেতো, কিন্তু তারা একে কোন জগতের কথা বলে মনে করতো, যখন আমি বলতাম—'তোমাদের রাজকার্য চালাতে হবে। পুরুষের জুতো খাওয়া ছেড়ে, নিজেদের সমান অধিকারের জন্য লড়তে হবে। তোমাদের জজ আর ম্যাজিস্ট্রেট হতে হবে।' আমার বক্তৃতায় তাঁত, চরখা-তাঁত-প্রচার মাদক-দ্রব্য-নিষেধ এর অংশ খুব কম থাকতো। আমি বিদেশী শাসনের শোষণ-অত্যাচার, দেশের জন্য সংগঠন আর আত্মবলির উপর বেশী জোর দিতাম।

বন্যার পরে জেলার অন্য নেতারা আমাকেও দলে শামিল করে নিলেন, আর তিন-চারটি থানার সংগঠনের কাজ আমি আমার দায়িত্বে নিলাম। গান্ধীজী সত্যাগ্রহের প্রস্তুতি আরম্ভ করেছিলেন। বিহার প্রান্তে স্বয়ং সেবক-বোর্ড তৈরি হয়েছিল; আর সত্যাগ্রহী স্বয়ংসেবকদের ভর্তির আদেশ পাওয়া গিয়েছিল। আমরা স্থির করলাম একমা, সিসওয়ন, রঘুনাথপুরে চার-চার শত উর্দিধারী স্বয়ংসেবক তৈরি হওয়া উচিত। একমাতে তো আমরা সবাই ছিলাম। সিসওয়ন-এ গিরীশ প্রস্তুতি নিল। বন্যার সেবা ও তাঁর কার্যক্ষমতার জন্য সেখানে গিরীশের খুব প্রভাব ছিল। আশ্রম (হেড-কোয়ার্টার) তিনি চৈনপুরে রেখেছিলেন। সমস্ত থানার উর্দিধারী স্বয়ংসেবক আর জনতার একটি বড় সভা ডাকা হল, যাতে আমি ছাড়া জেলারও অনেক নেতা এলেন। এই প্রথম অভিজ্ঞতা, তাই মন শঙ্কিত হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু যখন খদ্দরের পাজামা, খদ্দরের কুর্তা, গান্ধী টুপি, ঝোলা, আর লাঠি নিয়ে চারশোর বেশী স্বয়ংসেবককে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াতে দেখলাম, তখন আনন্দের ঠিকানা রইল না। লোকেরা নিজেরাই শান্ত হয়ে শোনার জন্য প্রস্তুত না হলে, কয়েক হাজার জনতার সামনে বিনা লাউডস্পীকারে বলা অসম্ভব হত। উর্দির রং সম্ভবতঃ হলুদ রামরজের ছিল।

মুরারীপট্টির বাগানে রঘুনাথপুরের বড় সভা আর চারশো স্বয়ংসেবকের দল একত্র হয়েছিল।—বাসুদেবও তাঁর কাজে সফল প্রমাণিত হলেন আর আমার খুশীর জন্য এতোটা বলাই যথেষ্ট হবে সারা জীবনে শুধু এই সভাতে আমি ভাবাবেশে এসে স্বরের ওঠানামার সঙ্গে উত্তেজক বক্তৃতা দিয়েছিলাম। আমাকে ছাপরার ভাষায় বলতে দেখে, বাবু মথুরাপ্রসাদও চেষ্টা করলেন, কিন্তু মাঝে মাঝে উর্দু শব্দ ব্যবহার করা আটকাতে পারলেন না। চারশোর বেশি রঙিন উর্দিধারী স্বয়ংসেবকদের দেখে এই থানার দিকে জেলার নেতাদের মনোযোগ বিশেষভাবে আকর্ষিত হওয়াটা অবশ্যম্ভাবী ছিল।

একমার স্বয়ংসেবক সম্মেলন আরো জবরদস্ত হল। একমাতে এসে মিলিত হওয়া চারটি সড়ক ধরে গ্রাম-গ্রাম থেকে মিছিল এলো। তারপর এক বিরাট মিছিলের চেহারা নিয়ে বিশ-পঁচিশটা হাতি শত শত হাজার হাজার ঝাণ্ডা পতাকাসহ তা পঞ্চম সড়ক ধরে মাধবপুরে গেল। এক বিশাল গণপ্রবাহ হাজার পায়ে হেঁটে, হাজার কণ্ঠে গগনভেদী ধ্বনি তুলে গণশক্তির

পরিচয় দিচ্ছিল। নির্দিষ্ট স্থানে বিশ হাজার মাথা একত্রে দেখা যাচ্ছিল। জলেশ্বরবাবু জেলা থেকে বিশেষভাবে বক্তৃতা দিতে এসেছিলেন। তিনি থানার কর্মীদের আর জনতার উৎসাহের প্রশংসা করলেন। চারশোর বেশি উর্দিধারী স্বয়ংসেবককে সম্ভবতঃ তিনি প্রথম দেখলেন, তাই তার উপর এর বিশেষ প্রভাব পড়লো; কিন্তু আমি সিসওয়ন আর রঘুনাথপুরের রঙিন উর্দিধারী স্বয়ংসেবকদের দেখেছিলাম, তাই গিরীশ আর বাসুদেবের স্বয়ংসেবক সেনার থেকে আমাদের সাদা উর্দির এই সেনাকে একটু কম লাগছিল, তবুও অন্য বিষয়ে একমা অনেক বেশি ছিল।

সরকার স্বয়ংসেবকদলকে ক্রিমিনাল-ল-সংস্কার আইনের বলে বে-আইনি ঘোষণা করে দিল। তাকে অবহেলা করে জেলা কমিটির বৈঠকের সময় ছাপরাতে রামলীলার ছোট মঠে (জেলখানার কাছে) এক সভা হল, জেলার প্রমুখ কর্মীরা স্বয়ংসেবক দলে নিজেদের নাম লেখাতে শুরু করল, আর পুলিশ গ্রেপ্তারি শুরু করল। ভরত মিশ্র গ্রেপ্তার হলেন, বা মাধব সিংহ উকিল, আরো কত নেতা ও কর্মী গ্রেপ্তার হলেন; কিন্তু ছাপরার তৎকালীন কালেক্টর মিস্টার লুইস হুঁশিয়ার লোক ছিলেন, তিনি মজঃফরপুরের কালেক্টরের মত শত শত জনকে ধরে জেলে পাঠানো পছন্দ করলেন না। আট-দশ জন মানুষকে গ্রেপ্তার করার পর যারা নিজেদের স্বয়ংসেবক ঘোষণা করেছে তাদের নামটুকুই পুলিশ নোট করতে লাগলো। যারা নাম ঘোষিত করেছিলেন সেইসব মানুষের মধ্যে বাবু নারায়ণপ্রসাদও ছিলেন।

ডিসেম্বর (১৯২১) এ জেলার অনেক প্রতিনিধি আমেদাবাদ-কংগ্রেসে গেলেন। আমি গ্রেপ্তারির আগে জেলায় ঘুরে জাগৃতি আনায় নিজের সময় দেওয়া পছন্দ করলাম—আমার কাছে তো আর আমেদাবাদ আর অন্য শহরের কোন আকর্ষণ ছিল না, কংগ্রেস দেখার আরো সুযোগ আসবে। আমার এক্কা-টমটম নিয়ে আমি একমা থেকে বেরোলাম। পচরুখীতে সেই সময় চিনির মিল তৈরী হয়নি, বাজারে ভাষণ দিলাম। সীওয়ান, মীরগঞ্জে বক্তৃতা দিতে দিতে হথুয়া পৌঁছলাম। সেখানে কলেজ ছেড়ে আসা এক তরুণ-জগতনারায়ণ—খুব নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করছিলেন। ভোরে থানাতেও একজন স্কুলত্যাগী ব্রাহ্মণ তরুণ কাজ করছিল, তাই সেখানেও ছোটখাটো কর্মীদের নিয়ে সে থানার জাগৃতি রক্ষা করছিল। কটয়াতে মহেন্দ্রসিংহ চলে যাওয়ায় কিছুটা শিথিলতা এসেছিল, কিন্তু কর্মী সেখানেও ছিল। কুচায়কোট-এ জালালপুরের আশ্রম কাজ করছিল, আর সেখানেও এক উৎসাহী নবযুবক ও থানার প্রধানবাবু ভুলনশাহী উৎসাহপূর্বক কাজ করছিলেন। বাবু ভুলনশাহীর সাদা-সিধে অশিক্ষিত, কিন্তু ভাবুকতাপূর্ণ হৃদয়ের জন্য স্বরাজ আন্দোলনকে ধার্মিক সাধনার মত মনে হত। স্বরাজ-আশ্রমে আসার সময় তিনি কখনও খালি হাতে আসতেন না। কয়েক বছর পরে যখন আমি হাজারীবাগ থেকে ছাড়া পেয়ে, সেখানে গেলাম, তখন ভুলনশাহীর সৌম্য বৃদ্ধমূর্তি না দেখে আমি তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম, আর তাঁর মৃত্যুর খবর শুনে এক স্থায়ী শোক হল। কখনও যখন আমি জালালপুর যাই, অথবা সেদিক দিয়ে যাই, ভুলনশাহীকে স্মরণ না করে থাকতে পারি না। সেই যাত্রাতেই আমি গোপালগঞ্জ, বরৌলী, রেওতিথ, বসন্তপুরও গেলাম। বরৌলীতে কলেজের ছাত্র বা. শিবপ্রসাদসিংহ খুব ভালোভাবে কাজ সামলাচ্ছিলেন। মীরগঞ্জ, ভোরে, কুচায়কোট, গোপালগঞ্জ, বরৌলী ছাড়া বাকি থানাগুলিতে বেশি শিথিলতা ছিল।

একমা আসায় জানতে পারলাম, আমার গ্রেপ্তারির ওয়ারেন্ট বেরিয়েছে। নামের সাদৃশ্যের জন্য রাম উদার রায়কে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। লোকে অবাক হল, কারণ রাম উদার রায় স্বয়ংসেবক-এ নাম লেখায়নি। পুলিশেরও ভুলের সন্দেহ হয়, এইভাবে তাঁকে ছেড়ে দিল, আর ওয়ারেন্ট রামউদার দাসের নামে ঠিক হল। পাটনা (প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির মিটিং) থেকে

আমি সেইদিনই ছাপরা পৌঁছলাম,আর জেলা কংগ্রেস কমিটির বৈঠক ৩১ জানুয়ারী ১৯২২-এ আমার সভাপতিত্বে চলছিল, যখন পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করতে এলো।

কখনও সাহেবগঞ্জ থেকে ভগবানবাজার (ছাপরা) স্টেশন যেতে জেলের ফটককে বরাবর বাইরে থেকে দেখেছি; কিন্তু সেই ফটকের ভিতর এক অন্য দুনিয়া আছে, এর অভিজ্ঞতা আমার প্রথমবারই হল। ভয় আর দ্বিধার ব্যাপার ছিল না। ১৯১৫ তেই আমি বিপ্লবীদের জীবনী তাদের জেলযাতনার বিষয়ে অনেক পড়েছিলাম-শুনেছিলাম, আর আমার তাতে ভয় হতো না, প্রলোভন হত।

একমাতে কাজ শুরু করার অল্পদিন পরেই আমি আমার আঁচলার বেশ বদল করে আবার কম্বলের আলখাল্লা পছন্দ করলাম। সোনপুরের মেলা থেকে একটা সাহারানপুরী কালো কম্বল নিয়ে, মাঝখানে মাথা গলানোর জন্য ছেঁদা করে, সেটাকে আলখাল্লায় পরিণত করে ফেললাম। গ্রেপ্তারির সময়ও আমি সেই কালো আলখাল্লাতে ছিলাম। সারাদিন হাজতে রাখার পর সন্ধ্যাবেলা আমাকে জেলের ভিতর অন্য কয়েদিদের থেকে আলাদা জেলে রাখা হল। ছাপরার কয়েকজন কর্মীকে সাজা দিয়ে বক্সার সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। নারায়ণবাবু আমেদাবাদ কংগ্রেসে চলে গিয়েছিলেন, ফিরে এলে পর আমার দশদিন পরে (৯ ফেব্রুয়ারী) তিনিও গ্রেপ্তার হয়ে এলেন। মনে নেই, আমাকে এক-দুই দিন বালিভরা আটা, চুল আর খোসা ভর্ত্তি ডাল আর অর্দ্ধেক ঘাসের সঙ্গে সিদ্ধ করা শাক খেতে হয়েছিল কি না। নারায়ণবাবু আসাতে আমাদের দুজনের নিজের হাতে রান্না করার জন্য খাবার জিনিষ দেওয়া হত। পরসাতে আমি দু-একরকম মিষ্টান্ন বানাতে নারায়ণবাবুকেও শিখিয়েছিলাম। একা থাকলেও আমি পড়া-লেখাতে ব্যস্ত থাকতাম। এখানেই ট্রট্স্কীর 'বলশেভিকি ও সংসার-শান্তি' ইংরেজিতে পড়তে পাই। কোন বলশেভিক গ্রন্থকারের এটাই ছিল প্রথম বই। আমি কিছু সময় সংস্কৃতর সাধারণ পদ্য রচনায় ব্যয় করেছিলাম, যার মধ্যে একটা ভজন এইভাবে শুরু হত—'শৃণু শৃণু রে পান্থ, অহমিহ ন হ্যেকাকী।' নারায়ণবাবু সেইসব নেতাদের মধ্যে ছিলেন যাঁদের সার্বজনিক জীবন অসহযোগ আর গান্ধী যুগের সঙ্গে আরম্ভ হয়নি। তাঁরা ইংরেজি শিক্ষা পাননি, দেশভ্রমণের সুযোগও পাননি, তবুও মানুষের কর্তব্য তাকে খাওয়া-শোওয়ার থেকে উপরে উঠিয়ে নিয়ে যায়, তা তিনি ভালোরকম বুঝে গিয়েছিলেন। তিনি এক মধ্যবিত্ত সমৃদ্ধ পরিবারের প্রধান ছিলেন। বাপ তাঁর জন্য জমিদারী ছাড়া অনেক নগদ টাকাও রেখে গিয়েছিলেন। যৌবন, ধনসম্পত্তি, প্রভুত্ব এইসবই তাঁর ছিল, যদি অবিবেকও সঙ্গে থাকতো, তাহলে অন্য বাবুদের মত তিনিও বিলাসের জীবন কাটাতে পারতেন। কিন্তু সে জায়গায় তিনি তাঁর জীবনকে একদম অন্য ছাঁচে ফেলেছিলেন, আর সেও অনেকটাই শুধু নিজের বুদ্ধির ভরসায়। স্টেশন থেকে বারো মাইল দূরে, শহর বাজার থেকে বহু দূরে একেবারে এক দেহাতী গ্রাম গোরয়াকোঠিতে তিনি একটি ইংরেজি স্কুল স্থাপিত করেন, আর সেই সময়ের প্রতিকূল তথা বহুব্যয়সাধ্য পরিস্থিতিতে তাকে হাইস্কুল পর্যন্ত তোলেন। ছাপরাই শুধু নয়, সারা বিহারে সেই ধরনের সেটাই একমাত্র স্কুল ছিল। নারায়ণবাবু হিন্দি পত্র-পত্রিকা ও বই খুব পড়তেন, আর লোকমান্য তিলকের খুব ভক্ত ছিলেন। এই রাষ্ট্রীয় তুফান থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবেন, এমন হৃদয় তিনি পাননি, তাই অত্যন্ত পরিশ্রমে রোপণ করে এবং আরো বাড়িয়ে হাইস্কুল পর্যন্ত পৌঁছানো নিজের স্কুলকে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে জাতীয় করে দিতেও দ্বিধা করেননি। এমন মানুষের প্রতি আমার প্রথম থেকেই শ্রদ্ধা হয়ে যাবে, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আর এখন ভাগ্যক্রমে আমাদের একসঙ্গে থাকতে হল। তিনি সেই সময় জেলা কংগ্রেসের সেক্রেটারি ছিলেন।

দ্বিতীয় দিন (১১ ফেব্রুয়ারীতে) আমাদের মকদ্দমার ফয়সালা হল। আমরা সরকারী

অভিযোগ স্বীকার করলাম। মিস্টার লুই আমাদের দুজনকে বিনাশ্রম ছ'মাসের সাজা শোনালেন। আমি তাঁকে 'ধন্যবাদ' বললাম। তেরোদিন ছাপরা জেলে থাকার পর, এবার (১২ ফেব্রুয়ারী) দুজন কনস্টেবলের সঙ্গে আমাদের বক্সারের জন্য রওনা করে দেওয়া হল। কনস্টেবলদের কাছে হাতকড়ি ছিল, কিন্তু তারা আমাদের হাতে লাগায়নি। বিপ্লবীদের গল্পে হাতকড়ি আর বেড়ির কথা শুনে এক মুহূর্তের জন্য হলেও হাতে হাতকড়ি পরানোর লোভ হল আমার। অনেক দ্বিধার পরে সিপাই অল্প সময়ের জন্য সেটা হাতে পরালো। আমি লোহার সেই কঙ্কণ দেখে বললাম—দাদুর রূপোর খাড়ু যা ছোটবেলায় হাতে পরেছিলাম, তার থেকে তো এটা খারাপ বলে মনে হচ্ছে না, তফাৎ শুধু এই যে দুটো হাত কাছাকাছি আটকানো থাকায় এ দিয়ে কাজ করা যায় না।

রাত্রে আমরা পাটনা হয়ে দ্বিতীয়দিন রাত চারটের সময়ই বক্সার পৌঁছে গিয়েছিলাম। রামরেখাঘাটে গঙ্গায় স্নান করে দশটার কাছাকাছি বক্সার জেলে ভর্তি হলাম। ছাপরা জেল থেকে এটা কয়েক গুণ বড় ছিল, কিন্তু আমাদের জেল দেখানোর জন্য থোড়াই আনা হয়েছিল।

অফিসের মামুলী কাজ হয়ে যাওয়ার পরে আমাদের একটা ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হল। সে সময়ে সাড়ে তিনশর মতো রাজবন্দীকে বক্সার জেলে রাখা হয়েছিল। কামরার বাইরে রোদ ও ছায়াতে সেখানে একশ'রও বেশী লোক ছিল। দরজা খুলতেই তাদের দৃষ্টি আমাদের ওপর পড়ল। নবাগতকে পরলোক থেকে ফিরে আসা মানুষের মতো মনে করে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত রাজবন্দী এসে আমাদের চারদিকে ঘিরে ফেলল। যাদের সঙ্গে ঘনিষ্ট পরিচয় ছিল তারা জড়িয়ে ধরল। অন্যেরা অভিবাদন জানাল। বাইরের আন্দোলন সম্পর্কে খবর জিজ্ঞেস করল। আমরা নিজেরাও তিন সপ্তাহ ধরে আটক ছিলাম, তবু আমাদের যা কিছু জানা ছিল আমি বললাম। আমাদের ছাপরার লোকদের এই ক্ষোভ ছিল যে জাতীয় আন্দোলনে এগিয়ে থাকা সত্ত্বেও আমাদের জেলার চেয়ে বেশী বন্দী ছিল অন্য অখ্যাত জেলার। কিন্তু আমাদের জেলার কসুর কি? মুজফ্ফরপুর জেলার খুব গর্ব ছিল যে সেখানে এই জেলার কয়েদী সবচেয়ে বেশী ছিল। কিন্তু তা নিয়ে গর্ব করার মানে কি? যদি মজফ্ফরপুর জেলার মতো উদার কালেক্টার অন্য কোনো জেলায় থাকত, তবে দু-চারশ বাহাদুরকে জেলে পাঠানো এমন কিছু মুশকিলের ব্যাপার হত না।

মুজফ্ফরপুর জেলা ও অন্য দুয়েকটা জেলা থেকেও কিছু সাধারণ স্বেচ্ছাসেবক এসেছিল। তাছাড়া অন্য সব রাজবন্দীরাই ছিলেন জেলার অথবা থানার মুখ্য নেতা। আমাদের সঙ্গীদের মধ্যে প্রভুনাথ এখানে পৌঁছেছিলেন। মান্‌ঝির সভায় আমার পরিবর্তে বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলেন, সেখানেই রংগেশ ও বৃদ্ধ বিরজানন্দ পণ্ডিতের সঙ্গে ধরা পড়েছিলেন। রাজ্যের প্রমুখ নেতাদের মধ্যে রাজেন্দ্র বাবু বেঁচে গিয়েছিলেন এই জন্যে যে গভর্ণরের এক্‌জিকিউটিভ কাউন্‌সিলের একমাত্র ভারতীয় সদস্য শ্রীসচ্চিদানন্দ সিংহ তার গ্রেপ্তারে মত দেননি। মুজফ্ফরপুরের এক খ্যাতনামা উকিল ও প্রমুখ নেতা মৌলবী শফী সেখানে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন মৌলবী ওয়দুদ, তরুণ মঞ্জুর, গংগয়ার বাবু মথুরাপ্রসাদ, বরুয়াজের রাজমঙ্গলশাহী ও ব্রজনন্দনশাহী, ঠাকুর রামনন্দন সিং এবং অন্যান্য অনেক প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন যুবক যাঁরা ভবিষ্যৎ উন্নতির আকাঙ্ক্ষাকে স্কুল কলেজের লেখাপড়ার সঙ্গে বিসর্জন দিয়ে এসেছিলেন। এখানে চম্পারণের বাবু দেবীপ্রসাদ সাহু, দ্বারভাঙার মৌলানা ওয়াহাব ও আরো অনেক জেলার প্রধান নেতারাও ছিলেন।

৪

বক্সার জেলে ছয় মাস (১৩ ফেব্রুয়ারী-৯ আগষ্ট ১৯২২ খ্রীঃ)

এতে তো কোনো সন্দেহ নেই যে, এই রাজবন্দীদের অধিকাংশই বন্দীজীবনের জন্য প্রয়োজনীয় মানসিক শিক্ষা পায়নি। তাই এদের নির্জনতা কিছুটা অসহ্য বলে মনে হত। কিন্তু সৌভাগ্যবশত সবাইকে এক জায়গায় রাখা হয়েছিল। দিনে বাইরে জেলের সীমানার মধ্যে গাছের নিচে অথবা রোদে একসঙ্গে থাকতাম, রাত্রিতে এক একটা ঘরে একসঙ্গে সাতাশ জন করে বন্ধ করে রাখত। তখন, তাস, দাবা খেলা, পড়াশোনা, কাথাবার্তা হত। শুধু তাই নয় মথুরা বাবু (গংগয়া) তাঁর আখড়াও তৈরী করে নিয়েছিলেন এবং প্রত্যহ সকালে দু-তিন ঘণ্টা করে কুস্তি হত। তিনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় পালোয়ান ও আখড়ার খলিফা ছিলেন। যারা কুস্তি করত তাদের তিনি অনেক মার প্যাঁচ কথা বলে অথবা হাতের ইশারায় বলে দিতেন। কয়েকদিনের মধ্যেই আমরা একত্র খাওয়ার উপায় বার করে নিলাম। জেল থেকে জিনিষ পাওয়া যেত, বাড়ি থেকেও জিনিষ আসত এবং পয়সা দিয়েও লোক আমাদের সাহায্য করত। দেখা গেল খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে মথুরাবাবু সিদ্ধহস্ত। মথুরাবাবু আমাদের ঘরেই থাকতেন। তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব অটুট রাখার জন্য এবং তাঁকে খেপাবার জন্য আমি মাঝে মাঝে সঙ্গীতে তাঁর মতামত নিয়ে আক্ষেপ করে বসতাম, আর যখন তাঁর শীতল মস্তিষ্ক কিছুটা গরম হয়ে যেত, তখন নিজের সাফল্যে খুব আনন্দিত হতাম। এতে সন্দেহ নেই যে, এ আমার অনধিকার প্রয়াস ছিল। আমি সঙ্গীতের ক-খও শিখিনি এবং কোনো গায়ককে তাঁর সুরের কৌশল দেখাতেও শুনিনি। রাগ-রাগিনীর নাম পর্যন্ত আমার মনে নেই। তার সুর-তাল-লয় তো অনেক দূরের কথা। পক্ষান্তরে মথুরাবাবু স্বয়ং গায়ক না হলেও গায়কদের অনেক সঙ্গ করেছেন এবং সঙ্গীত নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। একদিন মিষ্টি মনমাতানো গানগুলিকে ছোকরা-ছুকরিদের গান বলে বুড়ো ওস্তাদদের তারিফ করছিলেন। সেখানে অন্যান্য ব্যক্তিদের মধ্যে নারায়ণবাবুও ছিলেন। আমি খুব জবরদস্ত বিদ্রূপ করলাম—'মথুরাবাবু, আমি আপনার সব কথা মেনে নিতে রাজী কিন্তু এমন ব্যক্তিকে আমি গায়ক বলতে পরি না যার আলাপ অসহ্য মনে করে পাশের গাছে বসা শান্ত পাখিও উড়ে যেতে বাধ্য হয়। আমি তাঁকে সঙ্গীত শাস্ত্রজ্ঞ বলতে পারি, সঙ্গীত শাস্ত্রাচার্য বলে মানতেও আমার আপত্তি নেই; কিন্তু গায়ক বলব তাঁকেই যাঁর গান শুনে গান জানে না এমন লোকও মোহিত হয়।' এতে মথুরাবাবুর ক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক ছিল। আমি আনাড়ীর মতো কথা বলছিলাম। মথুরাবাবুর চটে যাওয়ায় আমার সঙ্গে নারায়ণবাবুও মজা পাচ্ছিলেন। রান্না এবং আখড়া ছাড়া মথুরাবাবুর ব্রজবাবুর ব্রজভাষার কবিতার রস অলংকার শোনা ও পড়ারও সখ ছিল। তাঁর ভাগ্য ভাল বলতে হবে, কারণ কয়েকদিন পরে গয়ার পণ্ডিত বজরংগদত্ত শর্মা এসে গেলেন। অতএব এর পর 'ভানু' কবির সাহিত্য গ্রন্থের পড়ায় তাঁর অনেকটা সময় চলে যেত।

মনোরঞ্জনের জন্য আমরা নানারকম ব্যবস্থা করেছিলাম। সম্ভবত প্রতিদিন অথবা সপ্তাহে কয়েকদিন বিকেলে সারি বেঁধে স্নান করায় সিমেন্টের মেজেতে কবি সম্মেলন হত। অনেকে

স্বরচিত কবিতা শোনাত। বাবা নর সিংহ দাস তো ছিলেন ব্রজভাষাভাষীই। তাই ব্রজভাষীর কবিতায় তাঁর উৎসাহ থাকবে না কেন? একদিন আমরা দুজনে মিলে 'ফাইল' (File) ও 'কালো' নিয়ে কবিতা রচনা করেছিলাম। তার কিছুটা এই রকম ছিল।

"ফাইলে বসে রুটি, ফাইল শুদ্ধ চায়,
ফাইলের ভাতের জন্য নাচ বড় কঠিন কাজ।
কাপড়ের ফাইল, কুর্তা কম্বলের জন্য ফাইল হয়,
নিজে ঘুরে পুরো ফাইল দেখে নেয় জেলর।।
স্নানের জল ফাইলে আসে,
ফাইল সব বলে দেয় তবে জেল গেট পার হয়।
ভনত নরসিংহ শুধু ফাইল সামলাও,
ফাইল ছাড়া সবকিছু ফেল, সবই অসমাপ্ত।।

কারো করীনমে হ্যায় কুলতার ঔ কারোই কম্বল চারি··· কয়লা কালো, কালো সব্জী, কালো কড়াইয়ে ডারি (ডাল) সেদ্ধ কর থালা কালো, পানীয় কালো, দরজায় কালো রঙ লাগাও, কালো কারাগার, নৃসিংহ এই কালোকে (কারাগার) জন্মস্থান বলে।

ফাইল জেলখানার বহু অর্থে ব্যবহৃত শব্দ। সারি, নির্দিষ্ট পরিমাণ, প্রচলিত রীতি ইত্যাদি অনেক অর্থ ফাইলের হয়। একদিন রাত্রিতে নিজের ঘরে বসে আমরা পুলিশের ধরপাকড় ও অসহযোগীদের মোকদ্দমার ফয়সালার অভিনয় করেছিলাম। এতে বেশ মজা হয় দেখে দু-চারদিনের প্রস্তুতির পর (৮ জুন) ভারতেন্দুর 'অন্ধের নগরীর' অভিনয় করেছিলাম দিনের বেলাই। আমি এর ব্যবস্থাপকদের মধ্যেই শুধু ছিলাম তা নয়, আমি পার্টও নিয়েছিলাম। আমাদের ছাপরার মুনমুন (দেবনাথ সহায়) ও জগদীশ পুরের (শাহাবাদ) সোমেশ্বর সিংহের পার্ট খুব সুন্দর হয়েছিল। অভিনয়ে সোমেশ্বর সিংহের স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল। তিনি কুঁঅর সিংহের বংশজাত ছিলেন এবং রেজিস্ট্রার বাবার কান্না-বিলাপকে পরোয়া না করে কলেজ ছেড়ে জেলে পৌছেছিলেন।

বাবু ব্রজনন্দন শাহী এম· এ-র থেকে অসহযোগ করেছিলেন। ওয়রুরাজের পুরনো জমিদার বংশের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল। এই ধরনের পরিবারে বাদশাহী যুগে ছেলেবেলা থেকে ফারসী পড়ানোর রেওয়াজ চলে আসছিল। তদনুযায়ী তিনিও ফারসী পড়ছিলেন। আমারও ফারসী পড়ার সখ হল, আর ব্রজনন্দনবাবু আমাকে শেখ সাদীর গুলিস্তাঁর অনেকটা পড়ালেন। বর্ষার সময় পাকা চত্বরে শেওলা জমে যেত। পায়খানার পাশের চত্বরে তা আরো বেশী ছিল। তাতে রোজই পা পিছলে দুয়েকজন পড়ে যেত এবং তাদের ধুতি-কুর্তা নোংরা হয়ে যেত আর অন্যরা হাসিতে ফেটে পড়ত। একদিন ব্রজনন্দন বাবুরও এই দশা হল। তিনি কিছুটা বেশী মোটা ছিলেন। তাই তাতে অন্যদের আমোদ বেশী হল।

ফাল্গুন মাসে হোলির গান গাওয়া উত্তর বিহারে খুব রেওয়াজ ছিল। এতে সন্দেহ নেই যে অনেক জায়গায় গ্রামের লোক পাগলের মতো হাত-মাথা দুলিয়ে গলা ফাটিয়ে হুলস্থুল করাকেই হোলির গান মনে করে। তবু তাতে তাদের মনোরঞ্জন হলে আমাদের তাকে বিশ্রী বলার কি অধিকার? একদিন মুজফ্ফরপুরের কিছু স্বেচ্ছাসেবকদের ফাল্গুনের গ্রামের কথা মনে পড়লো। তারা 'মহেরেওয়া (মৈরওয়া) তে হো-া, হো-ে-----" কেবল শুরু করেছে, তখনই পাশের চত্বরে শুয়ে-থাকা এক সজ্জন ধমকে দিলেন। এ ব্যাপারটা আমার কাছে খারাপ লাগল। এই বেচারাদের মনোরঞ্জনের সামগ্রী আমাদের থেকেও কম, তাই এদের এই সাধারণ মনোরঞ্জনের উপায় থেকে বঞ্চিত করা কিভাবে উচিত বলা যেতে পারে? ঘোড়াসাহনের নিরসুলাল এক

সাধারণ দেহাতী কর্মকর্তা। আমাদের পছন্দ না হলে তাতে যোগ দেবার জন্য কেউ আমাদের বাধ্য করে না। বাইরে থেকে জিনিষ আনানোর অধিকার ছিল আমাদের। কিন্তু সবার তা আনানোর সামর্থ্য ছিল না। তাই জেলের জিনিষ আরো বেশি পাওয়ার লালসা অনেকেরই হত। নিরসুলাল একদিন এই কমবেশী নিয়ে অভিযোগ করল। আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না যখন দেখলাম এক সম্ভ্রান্ত বি· এ· পড়া ব্যক্তি রেগে গিয়ে নিরসুর কাঁধে হাত দিয়ে এমন ঝট্‌কা মারল যে সে বলের মতো চক্কর দিয়ে দশ বার হাত দূরে চলে গেল। সন্তুষ্ট হলাম যে পাতলা শরীর থাকায় সে আঘাত পেল না। যে লোকটি ধাক্কা দিয়েছিল তার বুদ্ধির উপর আমার করুণা হল।

জেলে পড়ার মতো অনেক বই ছিল, কারণ অনেকেই শিক্ষিত ছিলেন। তাছাড়া সবাই কিছু কিছু বই নিয়ে এসেছিলেন এবং বাইরে থেকেও আনাতেন। সাধারণ মনোরঞ্জন ছাড়া আমি লেখাপড়ায় আমার সময় দিতাম। দলবদ্ধ হয়ে থাকলে পড়াশোনায় কম সময় পাওয়া যায় দেখে জেলারকে অনুরোধ জানিয়ে (২৬ ফেব্রুয়ারি) সেল-এ চলে গেলাম। সে সময় গ্রীষ্ম এসে গিয়েছিল। ওয়ার্ডের খোলা কামরা এবং জায়গায় জায়গায় গাছসহ জেলের কম্পাউণ্ডের চেয়ে সেল অনেক গরম ছিল। তখনো আমার পরনে সেই কালো কম্বলের আলখিল্লাই ছিল। গরমকে আমি তিতিক্ষার বস্তু বলে মনে করতাম। কাশীতে থাকাকালীন (১৯১৮) সাম্যবাদী সমাজকে চিত্রিত করে আমি একটি বই লিখতে চেয়েছিলাম। তার ছক যে নোট বুকে ছিল, তা আমি যাগেশকে রাখতে দিয়েছিলাম, তার কাছ থেকে সেই নোটবুক হারিয়ে গিয়েছিল। এখন আবার সেই বই লেখার ইচ্ছা হল। ইচ্ছা হল এই বই সংস্কৃতে লিখব। এই বেঅকুবির জন্য বিস্মিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। মানুষের মধ্যে জ্ঞানের চেয়ে অজ্ঞান লাখ-কোটি গুণ বেশি আছে। যদিও নতুন বিষয় শেখার জন্য আমার মন সর্বদাই তৈরি থাকত, তবু শিক্ষার উপায় তো সব সময় সুলভ হয় না। সাম্যবাদ প্রচারের জন্য আমি বই লিখতে চেয়েছিলাম এবং একথা নিশ্চিন্ত যে সংস্কৃতে পদ্যে লেখা এই ধরনের বই কোনো কাজে লাগত না। এ পর্যন্ত সাম্যবাদ বিষয়ে 'প্রতাপ' ইত্যাদি হিন্দি পত্রিকাতে কিছু লেখা—বিশেষত রুশ বিপ্লব সম্পর্কে মাঝে মাঝে ছাপা কয়েক লাইন খবর-ছাড়া প্রায় কিছু পড়িনি বলা চলে। 'বলশেভিকী ও বিশ্বশান্তি' থেকে কি জ্ঞান লাভ করেছিলাম তাও বলতে পারি না। কোনো ইউটোপিয়ার (Utopia) তো নাম পর্যন্ত শুনিনি। কিন্তু ১৯১৭-র শেষে রুশ বিপ্লবের যে খবর আমি 'প্রতাপে' পড়েছিলাম এবং তারপর যা জানতে পেরেছিলাম, তার ওপর নির্ভর করে আমি এক সমাজের কল্পনা করেছিলাম, যা আমি এই বইয়ে বর্ণনা করতে চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম আজকের সমাজ থেকে সেই সমাজে পৌঁছনোর পথসহ সেই সমাজের বর্ণনা করি। আর সেই অনুসারে এক যুবা তপস্বী বিশ্ববন্ধুকে হিমালয়ের দিকে পাঠালাম। এর চেহারা ও নিস্পৃহতা আমি নিয়েছিলাম স্বামী রামতীর্থের কাছ থেকে। 'বিশ্ববন্ধু প্রদীপকে' আমি ছন্দোবদ্ধ কাব্য হিসেবে লিখতে শুরু করলাম, তার পাঁচ-ছয় পর্ব শেষও করলাম। সন্ধির গণ্ডগোল ও অন্যান্য ত্রুটি পরে সংশোধন করব বলে ছেড়ে দিয়ে আমি এগিয়ে গেলাম। দ্বিতীয়বার যখন জেলে এলাম তখন জ্ঞান হল যে সংস্কৃত ব্যবহারযোগ্য নয়। তাছাড়া ভয় হল আজকের সমাজের সঙ্গে সাম্যবাদী সমাজকে মেলানোর চেষ্টা করলে বই বড় হয়ে যাবে, তাই এই বইকে আমি 'বাইসবী সদী'র রূপে লিখলাম। 'বিশ্ববন্ধু প্রদীপের' মতো 'কুরাণসার' নামে একটি গ্রন্থ সংস্কৃতে এখানেই লিখতে শুরু করেছিলাম এবং প্রায় শেষ করে এনেছিলাম, দ্বিতীয়বার জেলে এসে সেটারও হিন্দি করলাম। তৃতীয় হিন্দিগ্রন্থ বেদান্তসূত্রের হিন্দি টীকা আমি পড়ানোর সময় লিখিয়েছিলাম। বিন্দাবাবু ও আরো কয়েকজন সঙ্গী বেদান্তপ্রেমী ছিলেন। তাঁরা বেদান্তের গ্রন্থ পড়তে চাইলেন। আমি বললাম, তাহলে উপনিষদ

আর[1] বেদান্ত সূত্রই পড়ুন না কেন। পড়ানোর সময় হিন্দিতে টীকা লেখাতে থাকলাম—এই টীকা যাঁরা লিখেছিলেন, তাঁদের কাছেই রইল। সংক্ষেপে, বক্সার জেলে আমার এই ছিল লেখা-পড়ার কার্যক্রম।

আমরা রাজনৈতিক বন্দী। কিন্তু জেলে আমাদের অধিকাংশের যে দিনচর্চা ছিল, তা থেকে বোঝা যেত না যে রাজনীতিতে তাদের বিশেষ উৎসাহ আছে। ডন-কসরত, কাবাডী খেলা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল এবং এতে বুড়োরাও যদি ছেলে-ছোকরা সাজতো তাও স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব ভাল। কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের পূজা-পাঠ ও ধর্মীয় গ্রন্থের অধ্যয়নে লেগে যাওয়া থেকে বোঝা যেত আমাদের সঙ্গীরা রাজনীতিকে কি রকম হাল্‌কা মেজাজে নিয়েছিলেন। সম্ভবতঃ তাদের ধারণা ছিল যে স্বরাজ তো এসে যাবেই, তখন ইহলোকের চিন্তা শেষ হয়ে যাবে, তাই পরলোকের জন্য কিছু সম্বল জমা করে রাখা যাক না কেন। গোপালগঞ্জের বাবু মহেন্দ্রসিংহের হাত সর্বদা (মালা রাখার) থলিতে থাকত। তিনি মনে করতেন, তিনি হনুমতনিবাসের (অযোধ্যা) গুরুদ্বারেই চলে এসেছেন। বাবু জগতনারায়ণ লাল এখন নবীন যুবক, এবং অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি রামতীর্থ ও রামকৃষ্ণ পরমহংস হতে চাইতেন। মৌলানা শাফী দাউদী কোরাণ পাঠ ও নমাজের বড় ভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। কিছু রাত থাকতেই যখন সবাই মিঠে ঘুমে আচ্ছন্ন থাকত, তখন মৌলানা ওয়াহাব তার দূরগামী আওয়াজে আজান দিতেন "অস্‌সলাতো খৈরুন্ মিনন্নৌম্" (নমাজ নিদ্রার চেয়ে ভাল)। এ বিষয়ে যারা ঘুমোচ্ছিলেন তারাই বলতে পারত, কিন্তু আল্লার ভয়ে ও লোকলজ্জায় অনেক লোককে অনিচ্ছুক হওয়া সত্ত্বেও সেই ভোরে কটু নমাজে যোগ দিতে হত। রাজনৈতিক সাহিত্যের অধ্যয়নে আকর্ষণ ছিল এমন লোক তো সেখানে আমার চোখে পড়েনি। জেলের অফিসারদের সঙ্গে কয়েকবার ঝগড়া-ঝাঁটিও হয়েছিল। জেলের ভেতরে গান্ধী টুপি বে-আইনী। ২৪-মে, বিহারের জেলের ইন্‌সপেক্টর জেনারেল কর্নেল বনাতওয়ালা জেল পরিদর্শনে আসেন। জেলের অধ্যক্ষ আমাদের সঙ্গীদের গান্ধী টুপি ছিনিয়ে নেন। যখন বনাতওয়ালা এলেন, তখন সবাই গামছা ছিঁড়ে ছিঁড়ে সেলাই না করা গান্ধী টুপি বানিয়ে তা মাথায় পরে নিল। সম্ভবত তাঁর সামনে আমরা দাঁড়াতেও যাইনি। বনাতওয়ালা একটা লেকচার দিলেন। ইন্‌স্‌পেক্‌টর জেনারেল হয়ে এত বছর সরকারের নুন খেয়ে আমাদের সাচ্চা রাজনীতির পথ দেখানোর অধিকার হয়েছিল তাঁর। আমার তো এই লোকটিকে একেবারেই বাজে মনে হয়েছিল। ভারতীয় হওয়ায় নিজের অসহায়তার কথা মনে রেখে তাঁর জিহ্বাকে সংযত রেখে বলা উচিত ছিল। কিন্তু সে 'একাং লজ্জাং পরিত্যজ্য ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ'-এর নাটক করছিল।

চম্পারণ জেলার এক মলং (কবীর পন্থী মুসলমান সাধু কবিলাস) একই অপরাধে বন্দী হয়েছিলেন। কিন্তু অন্য স্বেচ্ছাসেবকদের থেকে তাকে আলাদা রাখা হয়েছিল। তা নিয়েও ঝগড়াঝাঁটি হল। মলং-এর দাঁড়ানো হাতকড়ার (ছ ফুট উঁচুতে টাঙানো হাতকড়া দুই হাত বাঁধা অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকা) সাজা হল। ব্যাপারটা বাড়তে বাড়তে এমন অবস্থায় পৌঁছল যে তাকে প্রচণ্ড মারপিট করা হয়। এই খবর আমরা পেলাম। মৌলানা মজহরুল হক্ পাটনা থেকে তাঁর দৈনিক 'মাদারল্যান্ড' বার করেছিলেন। আমাদের সঙ্গীদের মধ্যে কেউ জেল থেকে বার হওয়ার পর হক্‌সাহেবকে এই খবর দেয়। সব খবর 'মাদারল্যান্ড'-এ বেরিয়ে যায়। ভীষণ হৈচৈ বেধে

১ উপনিষদ আরম্ভ, ২০ জুন, বেদান্তসূত্র আরম্ভ, ১০ জুলাই

গেল। "মাদারল্যান্ড"-এর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করা হয় এবং হক্ সাহেবের সাজা হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে অস্থায়ী জেলর সন্তোষ কুমারেরও বদনাম হল। এরপরে তো তার ভবিষ্যতই নষ্ট হয়ে গেল। কোথায় সে প্রথম শ্রেণীর জেলর হতে যাচ্ছিল, আর কোথায় তাকে তৃতীয় বা সবচেয়ে নিম্নশ্রেণীতে নামিয়ে দেওয়া হল। সন্তোষবাবুর কড়া মেজাজ ছিল। জেলে কয়েদীদের সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করা হয় তাতে যে কোনো জেলের অধ্যক্ষের মনোবৃত্তি প্রভাবিত না হয়ে পারে না। হাজারীবাগ জেলে পরে আমারও সন্তোষ বাবুকে দেখার সুযোগ হয়েছিল। তার তখনকার অবস্থা দেখে তাঁর প্রতি আমার সহানুভূতি হয়েছিল।

চোরদের সৎ মানুষ বানাবার জন্য জেল তৈরী করা হয়েছে বলা হয়। যদি তা নাও হয়ে থাকে তবে অন্তত জেলের কর্মচারীদের চোরদের চেয়ে ভাল হওয়া উচিত; কিন্তু এখানকার ছোট-বড় কর্মচারী সবাই চোর। কয়েদীদের খাদ্যদ্রব্যের ব্যাপারে তাদের ব্যবহার এমন ছিল যা রাজাদের পালিত পশুর সঙ্গে তাঁর চাষাদের হয়ে থাকে। কয়েদীদের তরকারি থেকে ভাল ভাল জিনিষ চলে যেত সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্‌টের ঝুড়িতে, জেলর, এ্যাসিস্ট্যান্ট জেলর, ডাক্তার, জমাদার এমন কি অবশিষ্ট থাকলে সেপাইদের কাছেও পৌছে যেত; অতএব কয়েদীরা বালি মেশানো আটা, কাঁকর-খোসা সহ ডাল-চাল শাকের পরিবর্তে কাঠ ঘাস পাবে না কেন? বক্‌সর-এ এক বুড়ো ডাক্তার ছিলেন। হাসপাতালের জিনিষ তিনি নিজের বলে মনে করতেন। রোগীদের জন্য আনা একটা মুর্গী, তিনি নিজের পকেটে করে বাইরে যাচ্ছিলেন। জেল গেটে পৌছেছেন, তখন সুপারিন্‌টেনডেন্‌ট এসে পড়ল। কথা বলার জন্য দাঁড়াতে হল, সেই সময় পকেট থেকে মুর্গী কুড়-কুড় ডেকে উঠল। সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট মজা করে বললেন—, 'ডাক্তারবাবুর পকেটে মুর্গী ডাকে।"

পুরো ছয় মাস সাজা ভুগে ১০ আগষ্ট আমি ও নারায়ণবাবু এক সঙ্গে জেল থেকে বেরোলাম।

৫

জেলা কংগ্রেসের সেক্রেটারী (১৯২২)

ছাপরা এসে দেখলাম, সব দিকে ঢিলেমি। জেলের ভেতর থাকাকালীনই আমরা তা অনুমান করেছিলাম যখন শুনেছিলাম যে চৌরিচৌরার ঘটনার ফলে গান্ধীজী বারডোলিতে সত্যাগ্রহ স্থগিত করে দিয়েছেন। এত বড় দেশে পক্ষের অথবা বিপক্ষেরও কেউ না কেউ যদি হিংসা করে বসে তবে সত্যাগ্রহ বন্ধ করে দেওয়া হবে, এই শর্তে কি কখনো সত্যাগ্রহ হতে পারে? অন্য জেলার মতো সারন (ছাপরা) জেলাতেও সত্যাগ্রহ স্থগিত করার মন্দ প্রভাব হয়েছিল এখন লোক কিসের জন্য তৈরী হবে? গান্ধীজী জেলে যাওয়ার সময় বলে গিয়েছিলেন—চরখা-তাঁত চালাও, মাদক দ্রব্য সেবন বন্ধ কর, পঞ্চায়েতে ঝগড়া ঝাঁটির ফয়সালা করাও, সরকারী শিক্ষণ

সংস্থাকে বয়কট কর। এই সবকে সরকারের সঙ্গে লড়াইয়ের প্রস্তুতি মনে করে মানুষ অনেক কিছু করেছিল। কিন্তু এখন তো আর সেই লড়াইয়ের আশাও নেই। গান্ধীজী জেলে চলে গেছেন। অতএব মানুষের আর সেই প্রোগ্রামে মন লাগবে কেন? কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা আমাদের স্থায়ী ধ্যেয় ছিল, গান্ধীজী জেলে যাওয়ার পরও আমরা তা ছেড়ে দিতে পারতাম না, এই ধ্যেয়ের জন্য সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী ছিল। গণজাগৃতি ও সংগঠন ছাড়া সংগ্রাম সম্ভব নয়, তাই আমরা সেইদিকে দৃষ্টি দিলাম। জেল থেকে আসার পরই সেই বর্ষাতেই বাবু মাধবসিংহ ও আমার প্রোগ্রাম কুআড়ী পরগণার (মীরগঞ্জ, ভোরে কটয়া, কুচায়কোটের থানাগুলি) জন্য তৈরি হল। মীরগঞ্জ, ভোরে ছেড়ে আমরা (৭ সেপ্টেম্বর) কাটিয়ার দিকে রওনা হলাম। আমাদের দুজনের জন্য ১৪৪ দফা অনুযায়ী ভাষণ-নিষেধ এর আজ্ঞা জারী হয়েছে তা আমরা জানতে পেরেছিলাম। আমরা ঠিক করলাম নোটিশ আসার আগেই আমরা লোকজনকে কিছু বলে দিই। এখনই আমরা নোটিশকে অগ্রাহ্য করতে চাইনি। উপস্থিত জনতাকে নিয়ে আমরা কটয়ার পূর্বে এক পুকুরের উঁচু পাড়ে গেলাম এবং যা বলার ছিল তা সংক্ষেপে তাদের বলে দেওয়ার পর থানার সাব-ইন্‌সপেক্টর নন্দী এসে পৌছলেন। তিনি নোটিশ জারী করলেন। পঞ্চায়েত, মাদকদ্রব্য নিষেধ, খদ্দরের পক্ষে নন্দী একটা ছোটখাট বক্তৃতা দিলেন। তিনি বললেন, সরকার এই সবের বিরোধিতা করছে কোথায়? আপনারা এসব করুন না। দারোগা নন্দী পুলিশের সেইসব কর্মচারীদের মধ্যে ছিলেন, কাজলের কৌটোর মধ্যে থাকলেও যার শরীরে কালি লাগে না। পুলিশে কাজ করে ঘুষ না খাওয়া অসম্ভব মনে হয়, কিন্তু নন্দী এই অসম্ভবকেই সম্ভব করেছিলেন। ভোরে, কটয়া থানাগুলি গোরখপুকুরের জেলার সীমান্তে পড়ে। জেলা পুলিশের হেড কোয়ার্টারের রিপোর্ট দেখলে বোঝা যাবে যে এগুলি হল জেলার সবচেয়ে বেশী চোর বদমাশের থানা। এখানে যে কেউ নতুন দারোগা আসতো, সে সেই কথার সমর্থন করতো এবং ১১০ দফার আরো দশ-বিশ জন তৈরি হয়ে যেতো। এর একটা পরিণামই চোখে পড়ে, তা'হল এই যে জেলা পুলিশের প্রত্যেক সাব-ইনস্‌পেক্টরই এই দুটো থানায় আসার জন্য উৎসুক হয়ে থাকতো। যে ভোরে অথবা কটয়ার থানাদারী পেয়ে যায় তার ভাগ্য খুলে গেল ধরে নেওয়া যেতে পারে। দুই তিন বছরে দশ-বিশ হাজার জমিয়ে ফেলা তার পক্ষে খুবই সহজ। এই থানার এত বড় আকর্ষণের মধ্যে থেকেও ঘুষ না নেওয়ার প্রতিজ্ঞা কত কঠিন, তা অনায়াসেই বোঝা যায়; আর নন্দী তার প্রতিজ্ঞা পুরোপুরি রক্ষা করেছিলেন। তাই সব দিক থেকে যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও নন্দী কোর্ট সাব ইন্‌স্‌পেকটরের ওপরে আর যেতে পারেননি। যদি প্রথম শ্রেণীর প্রতিভা নিয়ে তিনি প্রথম শ্রেণীর ঘুষখোর ও বেইমান হতেন তাহলে তিনি ডেপুটি সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট নয়, সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট হয়ে পেনসন নিতেন।

২৯ শে অক্টোবরের নতুন নির্বাচনে আমি জেলা কংগ্রেসের সেক্রেটারি নির্বাচিত হলাম। আমাকে কিছু বলার অবকাশই দেওয়া হয়নি। সওয়া বছর আগে যখন আমার চিঠি দক্ষিণ থেকে এসেছিল এবং আমি স্বয়ং কংগ্রেস অফিসে গিয়েছিলাম, তখন কেউ ভাবতে পারেনি যে এই বোকামতো সাধুটা থানার প্রধান কর্মকর্তা হতে পারে। কিন্তু আজ তাকেই লোকেরা সেক্রেটারি বানাল। কিন্তু আমি সেক্রেটারি হতে রাজী হয়েছিলাম এই কারণে যে জেলা কমিটিকে সুদৃঢ় করতে হলে সম্পূর্ণ পরিশ্রম প্রয়োজন ছিল। জেলা কংগ্রেস কমিটির কাছে অফিসের চিঠিপত্র লেখার পয়সাও ছিল না। ভাড়া দিতে না পারায় বাড়ি ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, আর কংগ্রেস অফিস এখন কলেজিয়ট স্কুলে উঠে গিয়েছিল, যার রাষ্ট্রীয়করণ হয়েছিল কিন্তু এখন বন্ধ ছিল। আমি খুব ঘুরে বেড়াতে শুরু করলাম। সিসওয়ান ও একমার সংগঠন মজবুত ছিল এবং কর্মীরাও ছিল কার্যপরায়ণ। ভোরের অবস্থা ভালো ছিল। কুচায়কোটের সেক্রেটারি চলে

গিয়েছিলেন, সেখানে আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষা না দিয়ে চলে আসা উৎসাহী তরুণ রুদ্রনারায়ণকে রেওতিথ থেকে পাঠালাম। কলেজের অসহযোগী ছাত্র মহেন্দ্রনাথ সিংহকে মহারাজগঞ্জে এবং আর এক যুবককে মশরখে পাঠালাম। এইভাবে কিছু থানায় নতুন কর্মী পাঠানোতে সাধারণ মানুষ উৎসাহিত হয়ে উঠতে লাগলো। বাস্তব অবস্থা ছিল এই যে অনেক জায়গাতেই সাধারণ মানুষ প্রস্তুত ছিল কিন্তু সেখানে পথপ্রদর্শক কর্মী ছিল না। অনেক কর্মী কাজ করতে প্রস্তুত ছিল কিন্তু তাদের উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র ও পরামর্শদাতা ছিল না। এই কথা মাথায় রেখে আমি কাজ শুরু করেছিলাম। আর তার ফল দেখা যেতে লাগল। জেলা কংগ্রেসের কাছে টাকা আসতে লাগল। গ্রামে সভা হতে লাগল, সর্বত্র না হলেও অনেক থানাতে আবার জাগৃতি দেখা দিল যার মধ্যে ছিল কুআডীর চারটি থানা ও বরোলী, একমা, সিসওয়ন, মহারাজগঞ্জ প্রধান ছিল।

এবছর কংগ্রেস গয়ায় হওয়ার কথা ছিল। ১৬ ডিসেম্বর আমি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কাছে প্রস্তাব পেশ করলাম, বোধগয়ার মহাবোধি মন্দির বৌদ্ধদের এবং তাদের তা পাওয়া উচিত। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর গয়ার বৈঠকে প্রাদেশিক কংগ্রেস প্রস্তাব মেনে নিয়ে গয়ায় কংগ্রেসে তা পাঠানো অনুমোদন করল। বৌদ্ধধর্মের প্রতি আমার সহানুভূতি আরো এক পা এগিয়ে গেল।

গয়া কংগ্রেসের জন্য মহাধূমধাম করে প্রস্তুতি শুরু হল। আমাদের জেলার মথুরা বাবু, গোরখনাথ ত্রিবেদী, হরিনন্দন সহায় প্রভৃতির মতো প্রধান কর্মীরা অভ্যর্থনার কাজে যোগ দেওয়ার জন্য গয়া চলে গেলেন। জেলায় কংগ্রেসের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব অন্যান্য লোকের ওপর ছিল। সত্যাগ্রহ স্থগিত করে গান্ধীজী জেলে চলে যাওয়াতে যে শিথিলতা আসলো, তাতে কংগ্রেসে দুটি দল হয়ে গেল। নিজেদের গান্ধীজীর পাক্কা অনুগামী বলে দাবী করা অপরিবর্তনবাদী লোকেরা বলছিলেন, 'মহাত্মাজী যে গঠনমূলক কার্যক্রম আমাদের সামনে রেখেছেন, আমাদের উচিত আমরা সেই কাজ করেই মহাত্মাজীর আসার প্রতীক্ষা করি।' এই দলের নেতা ছিলেন শ্রীরাজগোপালচারী যাঁকে গয়া কংগ্রেসে ডেপুটি মহাত্মা পদবী দেওয়া হয়েছিল। অন্য দল পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রোগ্রামের পরিবর্তন চাইতো আর বলতো, 'যদি আমরা বাইরে থেকে সংগ্রাম করতে না পারি তবে নতুন সংস্কার অনুযায়ী স্থাপিত এ্যাসেম্বলী ও কাউন্সিল আমাদের অধিকার করা উচিত আর গভর্নমেন্টের কাজে বাধা দেওয়া ও জনতাকে নিজেদের পক্ষে জাগ্রত করা উচিত। মহাত্মাজীর বাইরে আসার প্রতীক্ষায় আমরা চুপচাপ ছয় বৎসর বসে থাকতে পারব না।' এই পরিবর্তনবাদী দল বা স্বরাজ পার্টির নেতা ছিলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহরু,, বিট্ঠলভাই প্যাটেল এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। দেশবন্ধু দাসই গয়া কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। গয়া কংগ্রেসে দুই দলের সংঘাতের পূর্বলক্ষণ দেখা দিচ্ছিল। সারণ জেলায় আমি ও নারায়ণবাবু পরিবর্তনবাদী পক্ষের সমর্থক ছিলাম। নারায়ণবাবু তো তিলকবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সমর্থন করছিলেন। কিন্তু আমি তিলকবাদী ছিলাম না। যে বাদ আমার মনের মতো ছিল তা হল সাম্যবাদ। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমার সাম্যবাদের কোনো জ্ঞান ছিল না।

আর্যসমাজের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমি ছোঁয়াছুঁয়ি ও জাতপাতের বিরোধী ছিলাম। যদিও এখনো রামউদার বাবা হিসেবে বৈষ্ণব সাধু বলেই ধরে নেওয়া হত, কিন্তু পরসা থেকে একমা যখন আমার হেডকোয়ার্টার হল, তখনই আমি খাওয়া দাওয়ায় ছোঁয়াছুঁয়ি ছেড়ে দিয়েছিলাম। পরসা মঠের লোকেরা বৈষ্ণব ব্রাহ্মণেরও হাতের কাঁচা রান্না খায় না। আমাকে এরকম করতে দেখে মোহন্তজীর খারাপ লাগলো। অন্য লোকেরা তো আমি 'পরমহংস' এই বলে আমার

আচরণের ব্যাখা করল। আমার ভাল লাগতো এই দেখে যে আশ্রমে মুসলমানসহ সব জাতির লোক এক সারিতে বসে খেত, যদিও অন্যের ছোঁয়া জিনিষ খেত এমন লোক খুব কম।

সোনপুর মেলায় গত বছর প্রিন্স অভ্ ওয়েলসকে স্বাগত জানানোর বিরুদ্ধে আমরা অনেক বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিলাম। স্বেচ্ছাসেবকদের বড় মিছিল বেরিয়েছিল। এবারের মেলায় ধূমধামই ছিল আলাদা। করাচীতে মহম্মদ আলি, শওকত আলির সঙ্গে শংকরাচার্য স্বামী ভারতী কৃষ্ণতীর্থের বিরুদ্ধেও মোকদ্দমা চলেছিল, আর সেই সময় রাজনীতিতে অংশগ্রহণকারী ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে তার নামও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এবার তিনি হরিহরক্ষেত্রের (সোনপুর) মেলায় এলেন। জরির ছত্র, স্বর্ণখচিত রুদ্রাক্ষ এবং সোনা রূপোর আরো অনেক জিনিষ নিয়ে অনেক শিষ্যও সেবক তাঁর সঙ্গে ছিল। সেকেন্ড ক্লাস থেকে নামার পর তাকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা জানানো হল। ৩ নভেম্বর (১৯২২) চমৎকার ইংরেজীতে তিনি ঘণ্টাখানেক ভাষণ দিলেন। শ্রোতাদের ওপর তার প্রবল প্রভাব পড়ল। তিনি আসার আগে বটেজী নামে এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ গোরক্ষার ভার নিয়ে সোনপুরে উপস্থিত হয়েছিলেন। খিলাফৎ আন্দোলনে হিন্দুরা যোগ দেওয়ায় হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক খুব ভাল হয়ে গিয়েছিল। তাই এই গোরক্ষা বিশেষ করে দানাপুরের গোরাদের জন্য গরু কেনার বিরুদ্ধে ছিল। মহুরাপারের বাগানে বটেজী গোবর্ধনাশ্রম খুললেন। কলকাতা থেকে দুয়েকটা ভাল জাতের ষাঁড় আনালেন। গোবর্ধনাশ্রমে বিশেষ প্রস্তুতি হয়েছিল কারণ শঙ্করাচার্যের সেখানে আসার কথা ছিল। আমরা জেলার সব জাতীয় কর্মীরা এতে অংশগ্রহণ করলাম। আমি ও বাবু হরিনন্দন সহায় একদিন বিহার সরকারের একজন মন্ত্রী বাবু মধুসূদন দাসের কাছে গোরক্ষার ডেপুটেশন নিয়ে গেলাম। তিনি খুব ভদ্রতা সহকারে আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন এবং গোরক্ষা সম্পর্কে কথাবার্তা বললেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, গোরক্ষার প্রকৃত অর্থ অন্ধ-খোঁড়া গরু জমা করা নয়, বরং অধিকতর ভাল জাতের গরুর বংশ বৃদ্ধি করা। এ বিষয়ে আমরা একমত ছিলাম, কিন্তু সব গোরক্ষাবাদী থোড়াই এতে একমত হত।

গোবর্ধনাশ্রমে স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মীদের জন্য যে ভোজনালয় তৈরী করা হয়েছিল আমরা সেখানে ছোঁয়াছুঁয়ি দূর করার চেষ্টা করেছিলাম। রান্নাবান্নার ব্যবস্থাপক নানা জাতির লোক ছিল। তাদের মধ্যে ধর্মপরসার এক ব্রাহ্মণ যুবকও ছিলেন। কিন্তু কেউ জিজ্ঞেস করলে আমি তাঁকে শ্রীবাস্তব ব্রাহ্মণ বলতাম। শ্রীবাস্তব (কায়স্থ) ব্রাহ্মণের নাম শুনে সবাই হকচকিয়ে যেত। কিন্তু আমি এমন কাউকে দেখিনি যে ভোজনালয় বয়কট করেছিল। শঙ্করাচার্যের রাজকীয় জাঁকজমক ছিল। পদ ও প্রতিষ্ঠা কমে যাবে এই ভয়ে তাঁর অন্য কিই বা করার ছিল?

সোনপুরের ভোজনালয়ের অভিজ্ঞতা থেকে আমার মনে হল ছোঁয়াছুঁয়ি দূর করার জন্য হোটেলের খুব দরকার। মাঝীর সভাপতি সিংহকে পরামর্শ দিলাম, যে এবার গয়ায় তোমার "সুদামা ভোজনালয়" হোক। সভাপতি সিংহ এক অসাধারণ যুবক ছিল। অসহযোগেরও আগের কথা। সে সময় ছাপরায় এক গোরা পুলিশ ইন্‌সপেক্টর এসেছিল। তার খুব কড়া মেজাজ ছিল, পথ দিয়ে আসা যে কোন লোককে ঠোকর মেরে দিত। সভাপতি সেই সময় হাই স্কুলের ছাত্র ছিল। তার বড় ভাইয়ের মতো সে অবশ্য পালোয়ান ছিল না, কিন্তু তাঁর গাট্টাগোট্টা মজবুত শরীর ছিল। ইন্‌সপেক্টরের এই অত্যাচার তাঁর সহ্য হল না। বৃষ্টির দিন ছিল। একদিন ইন্‌সপেক্টর সাইকেলে আসছিল, সভাপতি তার সামনে যাচ্ছিল। ইন্‌সপেক্টর গাল দিল। সভাপতিও ধমক দিল এবং সাইকেল থেকে নামিয়ে তাকে পেটাতে শুরু করল। তার সাইকেল ভেঙে জলভরা ডোবায় ফেলে দিল, আর মারতে মারতে তাকে একেবারে বেহুঁশ করে ছেড়ে দিল। সেই সময় গোরাকে মারার অর্থ ছিল ইংলণ্ডের সম্রাটের ওপর হাত ওঠানো। সভাপতি পালিয়ে

গেল এবং কারো পরামর্শে চম্পারণে কি হচ্ছে দেখতে গান্ধীজীর কাছে চলে গেল। মোকদ্দমায় কিছু হল না। এবার সভাপতি দুষ্টের দমনের জন্য ছাপরায় এক 'রিপোর্টপার্টি' তৈরী করল। এই পার্টিতে শুধু গাট্টাগোট্টা তরুণই ভর্তি হত, যাদের মধ্যে কারো কারো নাম কোনো কোনো স্কুলের রেজিষ্টারেও ছিল। টাকা পয়সা চাইলে ছাপরার কোনো ধনী 'রিপোর্টপার্টিকে' না বলতে পারত না। সেইসব অত্যাচারী ও অন্যায়কারীর দণ্ড দেওয়াই ছিল পার্টির কাজ—যারা সরকারের আইনকে এড়িয়ে যেতো। 'রিপোর্টপার্টির' নিজস্ব ভোজনালয় ও বিশ্রামগৃহ ছিল যেখানে পার্টির সদস্যরা থাকত। পার্টির এমন প্রভাব ছিল যে পুলিশও 'রিপোর্টপার্টির' সঙ্গে লাগতে সাহস পেত না। 'রিপোর্টপার্টির' কৃষ্ণ পক্ষ ছিল না, একথা বলা চলে না। অসহযোগ ও গান্ধীযুগের প্রথম দিকে পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা সভাপতি প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি পার্টিকে ভেঙে দিলেন এবং স্বয়ং জাতির কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। কিন্তু তিনি যে কাজের যোগ্য ছিলেন তা কখনো পাননি। যে কোনো সেনার নির্ভীক পরিচালক হতে পারত, সে আজ এক দেহাতী পাঠশালার শিক্ষক। যাহোক, বাবু সভাপতি সিংহের 'সুদামা ভোজনালয়' গয়া কংগ্রেসে গেল। বাবু মাধবসিংহ তাঁর নিজস্ব পাচককে রান্না করার জন্য দিয়েছিলেন, আর অভিজ্ঞতা থেকে জানা গেল যে সমাজ সংস্কারসহ ভোজনালয় লোকসানের কারবার নয়। আমি সভাপতিকে এই ভোজনালয় প্রত্যেক বছর সোনপুরের মেলায় নিয়ে যেতে বলেছিলাম; আর পরের বছর যখন আমি জেলে ছিলাম,— তখন তা সেখানে গিয়েওছিল। ছাপরা জেলায় এটি প্রথম হিন্দু ভোজনালয় ছিল। এই বছরই সোনপুরে আমরা একটি বিহার-প্রাদেশিক কিষাণ সভা প্রতিষ্ঠা করলাম।

গয়া কংগ্রেসের দুটি বিষয়ে আমার উৎসাহ ছিল, এক, স্বরাজ পার্টির প্রচার, দুই, বুদ্ধগয়া মন্দিরকে বৌদ্ধদের দেওয়ার ব্যাপারে কংগ্রেসের স্বীকৃতি। প্রথমটির জন্য আমিও বিহার প্রদেশের ক্যাম্প-এ যথেষ্ট কাজ করলাম, বক্তৃতা দিলাম, এবং তাছাড়া বড় নেতাদের ভাষণ তো ক্রমাগতই ছিল। বুদ্ধগয়া মন্দির সম্পর্কে প্রস্তাবটি ছিল আমারই, তাই এ ব্যাপারে খুব প্রচার করা আমার অবশ্য কর্তব্য ছিল। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে প্রস্তাবটি গৃহীত করাবার সময় আমি কিছু বৌদ্ধ ভিক্ষুকে ডেকেছিলাম। তাঁদের পালি ভাষণের অনুবাদ আমাকেই করতে হয়েছিল। কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় মহাবোধি সভার প্রতিষ্ঠাতা অনাগরিক ধর্মপাল ভিক্ষু শ্রীনিবাস ছাড়া ভিক্ষু ধর্মপালাকেও পাঠিয়েছিলেন। ব্রহ্মদেশেরও কয়েকজন ভিক্ষু এসেছিলেন। আর্যসমাজের প্যান্ডেলে এ বিষয়ে এক বড় সভা হয় যেখানে আমার এবং অন্য কয়েকজন বৌদ্ধ ও হিন্দু সাধুদের ভাষণ হয়েছিল। পালি, ইংরেজী, সংস্কৃতের অনেক ভাষণের অনুবাদ করার দায়িত্ব আমার উপর পড়ল, লোকেরা আমাকে "অনন্ত ভাষাজ্ঞ" বানিয়ে দিল।

একদিন ব্রজকিশোর বাবু ও রাজেন্দ্র বাবু সভাপতি দেশবন্ধু দাসের বাসস্থান থেকে ফিরে আসেন। তাঁরা জোর দিয়ে বললেন, 'আমরা দাস সাহেবকে আপনার প্রস্তাব সম্পর্কে বলেছি।' আপনার সম্পর্কেও বলেছি। আপনি একবার গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করুন যাতে পরিবর্তনবাদী ও অপরিবর্তনবাদীদের ঝগড়ায় আপনার প্রস্তাবটা চাপা না পড়ে থাকে।'

২২ ডিসেম্বর আমি দাস সাহেব যে বাংলোয় উঠেছিলেন, সেখানে গেলাম। খবর দেওয়ার পর বারান্দায় বসার হুকুম হল। বাইরে বারান্দায় বসে রইলাম। আধ ঘণ্টা পরে আবার খবর দিলাম। আবার বসার হুকুম হল। ত্রিশ-চল্লিশ মিনিট পরে আবার খবর দিলাম, আবার বসার হুকুম হল। ভেতরে অনেক স্ত্রী-পুরুষ বসে হা-হা-হী-হী করছিল এবং কাজে ব্যস্ত এই অছিলায় আমাকে বসে থাকার আদেশ দেওয়া হচ্ছিল। আমার ভীষণ রাগ হল এবং সেখান থেকে সোজা ফিরে এলাম।

১৯২২-এর ২২ ডিসেম্বর আমি ডায়েরিতে লিখলাম—'ব্রজকিশোর প্রেসিতোৎগচ্ছং চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় সমীপে। মহতা কৃচ্ছ্রেন পদ্মায়ামগচ্ছম্, কিন্তু, হন্ত! ধনিক সম্প্রদায় এব দোষী ন কাচিদ্ ব্যক্তিঃ। চিরমতিষ্ঠম্। পশ্চাৎ 'ন সময়' ইত্যুক্তম্।...ধনিকেষু শ্রেষ্ঠানামিয়ং দশা। মনস্যতীবানু তাপঃ। কথং স্বসিদ্ধান্তমুত্থিত্য তত্রাগচ্ছম।... আঢ্য-সম্প্রদায় এবাতীব হানিকরঃ যেন চিত্তরঞ্জনসদৃশো জনা অপি তথা কর্তু সমর্থা ভবন্তি। কদাপি ন অনির্ধনঃ অশ্রমজীবী বা....শ্রমজীবিনাং পক্ষং গ্রহীতুং সমর্থঃ। বহুধা তত্র বন্টনৈব স্যাৎ।' বড় লোকদের থেকে আলাদা থাকা ও অপরের মনোভাবের খেয়াল করা এই দুই ব্যাপারে আমার এই ঘটনা থেকে ভাল শিক্ষা হয়েছিল, এক রকমভাবে বড়লোকদের প্রতি চিরকালের জন্য ঘৃণা জন্মাল।

গয়া কংগ্রেসে পরিবর্তনবাদ ও অপরিবর্তনবাদের মধ্যে জোরদার ঝগড়া চলল। তাই বোধগয়া মন্দিরের প্রস্তাব উঠলই না। এই ব্যাপারে আমার বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সঙ্গে কাজ করার যে সুযোগ হয়েছিল, তার ফলে নিজেকে বৌদ্ধ ধর্মের আরো কাছে পেয়েছিলাম।

২০ জানুয়ারী (১৯২৩)-তে জেলা কংগ্রেসের বৈঠক জালালপুর (স্টেশন)-এ হওয়ার কথা ছিল। গয়া কংগ্রেসের পর পরিবর্তনবাদী হওয়ায় আমি জেলা কংগ্রেসের সেক্রেটারি পদ থেকে ইস্তফা দেব ঠিক করেছিলাম, কিন্তু কাজ তো আমাকে এমনিতেই করতে হত। কুআড়ীর চার থানায় সংগঠনের কিছু প্রগতি হয়েছিল। রুদ্রনারায়ণ কুচায়কোটে অনেক কাজ করেছিলেন এবং তাঁর উৎসাহেই জেলা সভার বৈঠক জালালপুরে ডাকা হয়েছিল। ২৩ জানুয়ারীর তখনো কিছু বাকী ছিল তাই আমি মকর সংক্রান্তিতে ত্রিবেণী (নেপাল) চলে গেলাম। গোরখপুর জেলার সিমওয়া স্টেশনে নেমে কিছুটা গরুগাড়িতে গিয়ে আমরা—আমার সঙ্গী দর্পনারায়ণ আর আমি—পায়ে হেঁটে ত্রিবেণী পৌঁছলাম। ত্রিবেণী গঙ্গাদ্বারের (হরিদ্বার) মতো গণ্ডকদ্বার। গণ্ডক এখানেই পাহাড় থেকে নিচে নেমে এসেছে। রাস্তায় তরাইয়ের অনেকটা জঙ্গল কেটে আবাদ করা হয়েছে। ত্রিবেণীতে চারদিকেই জঙ্গল। এই জঙ্গলে ও গণ্ডকের দুই তীরেই মেলা বসে, যেখানে গোরখপুর চম্পারণ জেলা ও নেপালের পাহাড়ের অনেক নরনারী আসত। মেলার প্রধান ভাগ থাকে গণ্ডকের ডান তীরে। বাঁ তীরে এক ছোট মতো পাহাড়ী নদী এসে মেশে। সেই জন্যই একে ত্রিবেণী (ত্রিধারা) বলে। ছোট নদীটা নেপাল ও ব্রিটিশ সীমান্তের বিভাজন রেখা এবং ব্রিটিশ সীমান্তের ভেতরের সমস্ত জমি বেতিয়া রাজের জমিদারি।

মেলাতে যেসব জিনিষ বেচতে নিয়ে এসেছিল তার মধ্যে নেপালী কমলালেবু ও কলা ছিল খুব মিষ্টি ও সস্তা। নেপালী টাট্টু ঘোড়া, কম্বল ও ভোজালি এবং আরো কিছু জিনিষ বিক্রী হচ্ছিল। নীল স্বচ্ছ জল গণ্ডকের। আমি গণ্ডকের তীর ধরে দু-তিন মাইল ওপরে গেলাম। কিন্তু আমার তো জালালপুরে ফিরে যেতে হবে, তাই আরো কি করে এগিয়ে যাই? বাঁ তীরে বেতিয়ার জঙ্গলে কয়েক মাইল পর্যন্ত গেলাম। দুয়েকটা সাধুর থান দেখলাম, আর এই ঘন জঙ্গলে আশ্রম দেখে আমি খুব আকৃষ্ট হলাম। একটা পুরনো মন্দিরে বেতিয়ার কোনো পুরনো মহারাজের শিলালেখ দেখলাম।

ফেরার সময় পায়ে হেঁটে স্টেশনে যাওয়ার পরিবর্তে আমাদের নৌকায় বগহা যাওয়া ভাল মনে হল। সমতল থেকে মাল নিয়ে অনেক নৌকা ত্রিবেণী এসেছিল। আমরা সস্তায়ই জায়গা পেয়ে গেলাম। (১৭ জানুয়ারীর) দুপুরের পর আমাদের নৌকো রওনা হল। আমরা গণ্ডকের প্রবল স্রোতে নিচের দিকে যাচ্ছিলাম। তাই মাঝি মাল্লাদের বিশেষ পরিশ্রম করতে হয়নি; তবে যেখানে ঢেউ উঠছিল সেখানে নৌকা সাবধানে চালাতে হচ্ছিল। ত্রিবেণীর কিছুটা নিচে বাঁদিকে বেতিয়ার খাল বেরিয়ে গেছে। এই জলের চমৎকার ব্যবহার হচ্ছিল। মেলার জায়গায় আমি এক পরিত্যক্ত কাঠ চেরাইয়ের কারখানা ও তার পরিত্যক্ত মেশিন দেখেছিলাম যা কোনো এক সময়

অনেক টাকা ব্যয় করে নেপাল সরকার তৈরি করে থাকবে। রাত্রিতে নদীর তীরে বালির চরে আমরা নামলাম। সেখানে কয়েকজন ভারী (মহাদেবের মাথায় ঢালার জন্য বাঁকে করে যারা গঙ্গাজল নিয়ে আসে) আমাদের জন্যও খাবার তৈরি করে দিল। তরাইয়ের জঙ্গল বেশী দূরে ছিল না, কিন্তু দু-তিনটি নৌকোর লোকজন ও জ্বলন্ত আগুনের সামনে হামলা কোনো হুঁশিয়ার বাঘ করবে না—চরে ওপর থেকে বয়ে নিয়ে আসা শুকনো গাছ ও কাঠের অভাব ছিল না। হয়তো দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় দিন আমরা বগহা পৌঁছলাম। যাত্রা খুব মনোরঞ্জক ছিল। কখনও আমরা আশেপাশের তীরের ঢেউ খেলানো ক্ষেত দেখতাম, কখনো বালিতে রোদ পোয়ানো অবস্থায় কুমীর ও ঘরিয়ালকে শুয়ে থাকতে দেখতাম। ভারীরা শংকর ও ভৈরবলালের প্রশংসায় পুরনো গান গাইছিল। শীতের দিন। রোদ অসহ্য মনে হয়নি।

বগহা থেকে ট্রেন ধরে (১৯ জানুয়ারী) আমরা জালালপুর চলে এলাম। জেলা কংগ্রেস কমিটির বৈঠকের সঙ্গে একটি মিছিল ও বড় জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল। মিছিলে পঁচিশ-ত্রিশটা হাতি ও বিরাট জনতার সমাবেশ হল। খুব জাঁকজমক করে সভা হল। জেলার সব দিক থেকে যে সদস্যরা এসেছিলেন তাঁদের খুব ভালভাবে অভ্যর্থনা করা হল। কুআড়ীর জন্য আমার বিশেষ আপনভাব ছিল, তাই এই সাফল্যে আমার আনন্দিত হওয়ারই তো কথা। পরিবর্তনবাদী হওয়ায় আমি জেলা সভাতে ইস্তফা দিয়ে দিলাম, প্রথম দিকে আমার ইস্তফা পত্র গ্রহণ করতে তারা রাজী হয়নি, কিন্তু আমি জোর করে ইস্তফা মঞ্জুর করালাম।

২৬ জানুয়ারী প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে যোগ দিতে আমিও পাটনা গিয়েছিলাম। সেই সময়ে প্রাদেশিক কংগ্রেসের অফিস গোলাপবাগে ছিল। বৈঠকের পর এই জনসভা হয়। তাতে রাজেন্দ্রবাবু ও অন্যান্য নেতারা বললেন, এবং আমাকেও কিছু বলতে বলা হল। হালে চৌরিচৌরার মামলায় অনেক জাতীয় কর্মীকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। আমি কি বলেছিলাম, মনে নেই; কিন্তু সে সময় একটা কথা নিশ্চয় বলেছিলাম—, "দেশের স্বাধীনতার জন্য এই সব শহীদের রক্ত দেশমাতার কাছে চন্দন হয়ে যাবে।"

একমা, সিসওয়ল-ইত্যাদি জায়গায় সঙ্গীরা ভাল কাজ করছিল, আমি সেক্রেটারি পদ থেকে ভারমুক্ত ছিলাম, আর অন্যদিকে মাঝে মাঝে 'নওয়াজিন্দার' দাবি পূর্ণ করাও আমার কর্তব্য ছিল, তাই সহকারীদের কাছ থেকে নেপাল যাওয়ার জন্য দেড় মাসের ছুটি নিলাম।

৬

নেপালে দেড় মাস (মার্চ-এপ্রিল ১৯২৩ খ্রীঃ)

ভ্রমণে দুজন হলে ভাল হয়। কিন্তু তার শর্ত হল দুজনের মনের মিল। নেপাল যাত্রার সঙ্গী বেছে নিলাম মহেন্দ্রনাথকে। তিনি কলেজ ছেড়ে আসা এক উৎসাহী যুবক। আমি বলায় তিনি মহারাজগঞ্জ থানায় কাজ করতে গিয়েছিলেন। ৭ ফেব্রুয়ারী রকসৌল পৌঁছে রান্না করার জন্য আমরা কিছু বাসন কিনলাম। সে সময় রেলপথ এখানেই শেষ হত, তারপর হেঁটে যেতে হত। শিবরাত্রি মেলার সময় নেপালে প্রবেশ করার পাস পাওয়া সহজ ছিল। এই সময়ই নেপালের বাইরের হিন্দুদের কোনো রকম বাধা বন্ধ ছাড়াই রাজধানীতে যাওয়ার সুযোগ হয়, তাই ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রান্ত থেকে বিপুল সংখ্যক লোক আসত। বীরগঞ্জে এক ডাক্তার নাড়ি দেখতে যেতো,

তারপর নেপালী হাকিমের সামনে দিয়ে যাত্রীরা যেত এবং কাগজের একটা ছোটমতো টুকরো-পাস পেয়ে যেত। ঘটি, বাটি আর দুয়েকটা বাসন ছাড়া আমাদের কাছে বিশেষ মালপত্র ছিল না। তাই পথচলার কোনো ঝামেলাও ছিল না। প্রথম দিনই আমরা জঙ্গলে পৌঁছে গেলাম। দ্বিতীয় দিন চুড়িয়াঘাটী পেরিয়ে অনেকটা আগে চলে গেলাম। চুড়িয়াঘাটীর চড়াই কিছুটা কঠিন ছিল। সমস্ত মেলাটাই আমাদের সঙ্গে চলছিল। তাই এই জংলী পাহাড়ী রাস্তায় আমাদের একা যেতে হয়নি।

ভীম ফেরীতে ভয়ানক ভিড় ছিল। সব ধর্মশালা ও দোকান ভরে গিয়েছিল। সীসাগঢ়ীতে (চীসাপাণি) যাবার জন্য তখন আজকের মতো ভালো সড়ক হয়নি। আর যা ছিল তা দিয়ে না গিয়ে আমরা পাকদণ্ডীর রাস্তা ধরেছিলাম। দেখলাম, পথচলার ব্যাপারে মহেন্দ্রনাথ আমার থেকে বেশী মজবুত। সেই রাত্রিতে যখন আমরা শিঙ-তিঙ্-এ উঠলাম, তখন মহেন্দ্রনাথের গ্রাম (সিতাবদিয়র)-এ এক সাধু কৃষ্ণদাসের সঙ্গে দেখা হল। আমাদের কাছে রান্না করাটা বড় কষ্টকর ছিল, কৃষ্ণদাস সঙ্গী হওয়ায় আমাদের সেই ঝামেলা রইল না। আমি তো সেই কালিকমলি-অলাই* ছিলাম এবং কৃষ্ণদাস ছিল মোটা কিন্তু ছোট ছোট জটা ও বিভূতিমাখা তপস্বী।

চন্দাগঢ়ীর চড়াই ততটা কঠিন মনে হয়নি এবং প্রায় সকাল নয়টা নাগাদ আমরা নিচে নেমে গেলাম। আমরা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। একটি লোক এসে আমাদের মালপোয়ার সদাব্রত নিতে বলল। জল খাবার খেয়ে আমরা বৈরাগী সাধুদের স্থান থাপাথল্লীতে পৌঁছলাম। আমাদের আসন পাতলাম পাশের চত্বরের বারান্দায়। কৃষ্ণদাস কাঠ এনে ধুনি জ্বালিয়ে ফেলল এবং নেপালের মাঘের শীতেও আমরা আরাম করে তার চারদিকে জাঁকিয়ে বসলাম।

আমার ধারণা ছিল না যে এখানেও পরিচিত লোক জুটে যাবে। গয়া কংগ্রেসের সময় আর্যসমাজের প্যান্ডালে আমার ভাষান্তর ও পালি, সংস্কৃত, ইংরেজীর ভাষান্তর যে সব সাধুরা শুনেছিলেন, তাঁদের মধ্যে দুজন চালাকচতুর সাধু এখানে এসেছিলেন। একজন তো মঠেই মোহন্তজীকে প্রভাবিত করে আশ্রমেই জায়গা করে নিয়েছিলেন, অন্যজন তৎকালীন তীন সরকারের শালা এক রাজকুমারের অতিথি হয়েছিলেন। তাঁরা অনেক বাড়িয়ে রঙ চড়িয়ে আমার প্রশংসা করতে শুরু করেন। থাপাথল্লী মঠ প্রথম সেমরোনগঢ়ের মোহন্তের হাতে ছিল। মোহন্তকে বিতাড়িত করে সেমরোনগঢ়ের মতো সেখানেও ডীঠা বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং এমনি এক রমতা সাধুকে মোহন্ত করে দেওয়া হয়েছিল। যে কোনো সময় অভিযোগ হলে তাঁকেও তাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে, তাই তাঁকে অনেক ভেবেচিন্তে পা ফেলতে হত। তিনি আমার সম্পর্কে যা শুনেছিলেন, তাতে না চাইতেই ঘি, আটা, চিনি ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য প্রয়োজনের চেয়েও অনেক বেশী পরিমাণে আমাদের কাছে পাঠাতে শুরু করলেন। তাই আমাদের বৈরাগীদের ভোজন পঙ্ক্তির জন্য অপেক্ষা করার দরকার ছিল না। কৃষ্ণদাস রান্না করত এবং খাওয়া দাওয়া করে ঘুরে ঘুরে আমরা শুধু পশুপতিনাথ, গুহ্যেশ্বরী, মহাবোধাই নয়, কাঠমাণ্ডু ও পাটনের অনেক দর্শনীয় স্থান দেখতে যেতাম। একদিন (১৬ ফেব্রুয়ারী) উপত্যকার পশ্চিমে আমরা বুড়া নীলকণ্ঠ দেখতে যাচ্ছিলাম, সেখানে বিষ্ণুর বেশ বড় মতো শিলামূর্তি পড়েছিল, আর সেখান থেকে জলের পাইপ কাঠমাণ্ডু শহরে এসেছিল। রাস্তায় নদীর তীরে এক

* কালো আলখিল্লা পরা

জায়গা থেকে লোকজন কালো কালো কোনো জিনিষ উঠিয়ে খেতে দেওয়ার জন্য নিয়ে যাচ্ছিল। তা দেখে আমার সন্দেহ হল তা নরম পাথুরে কয়লা। আমি তার দু-চার টুকরো আমার কাছে রেখে নিলাম। ফিরে এসে তা ধুনিতে দেওয়ায় আমার সন্দেহ সঠিক প্রমাণিত হল—আসলে তা নরম কয়লা (Peat)। সেই সন্ধ্যাতে রাজপুত্র আর এক রাজবংশীকে সঙ্গে নিয়ে দেখা করতে এলেন-দ্বিতীয় সন্ন্যাসী অনন্তভাষাবিদ বলে আমাকে সেখানে খ্যাতনামা করে দিয়েছিল। আলোচনার সময় আমি নেপাল উপত্যকার কয়লার কথা বললাম। তাঁরা বললেন,—আমরা তো তা জানি না। আমি তার একটা টুকরা ধুনিতে জ্বালিয়ে দেখালাম এবং তাঁরা খুব বিস্মিত হয়ে গেলেন। তখন পর্যন্ত লোকেরা একে খেতের প্রাকৃতিক সার মাত্র বলে মনে করত।

শিবরাত্রির মেলায় ভারত থেকে আসা বিদ্বান, তপস্বী, যোগী, সাধু-মহাত্মাদের দর্শনের জন্য শহরের সব শ্রেণীর লোকেরাই মঠে যাতায়াত করেন। সরকারী অফিসাররা বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেন। সে সময় স্বামী সচ্চিদানন্দ নামে এক বিদ্বান সন্ন্যাসী এসেছিলেন যাঁকে রাজার অতিথি ভবনে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। এক জায়গায় ওঠার পর আমার সম্পর্কে তারা জানতে পেরেছিলেন। তবুও তাঁরা আমাকে অন্যত্র থাকার জন্য ধরে বসল। কিন্তু আমি যেখানে উঠেছিলাম, সেখানে থাকাটাই পছন্দ করলাম। যে সব ব্যক্তি দেখা করতে এসেছিলেন তাদের মধ্যে রাজগুরু পণ্ডিত হেমরাজ শর্মাও ছিলেন। তিনি (১৫ ফেব্রুয়ারীর) বিকেলে এসেছিলেন, আর শাস্ত্রীয় বিষয়ে আমাদের কথাবার্তা হয়েছিল। সান্ধ্যোপাসনার সময় হওয়ায় রাজগুরু যখন সে দিকে ইঙ্গিত করলেন, তখন আমি উদয়নাচার্যের এই শ্লোক (কুসুমাঞ্জুলির) 'উপাসনৈব ক্রিয়তে শ্রবণান্তরাগতা' বললাম। সেই সময় রাজগুরুকে আমি বড় পণ্ডিত হিসেবে দেখেছিলাম, কিন্তু নেপালের রাজনীতিতে তাঁর স্থান ও ধন বৈভবের কথা তখনো আমি জানতাম না।

শিবরাত্রিতে পশুপতি দর্শনের ভিড়, সেনা প্রদর্শন ইত্যাদি ব্যাপারে আমার দ্বিতীয়বার নেপাল যাত্রা'[১]য় (১৯২৯) লিখেছি, তাই এখানে শুধু বিশেষ ঘটনা উল্লেখ করছি। শিবরাত্রির দিন (১৩ ফেব্রুয়ারী) প্রধানমন্ত্রী মহারাজা চন্দ্রশমসেরের ঘোড়া গাড়ি ঘুরতে ঘুরতে থাপাথল্লীতে এসে গেল। তিনি তাঁর আত্মীয়ের কাছে আমার কথা শুনেছিলেন। গাড়ি দরজায় দাঁড়াল, এবং আমাকে ডাকতে একটি লোক গেল। একজন বৃদ্ধ কিন্তু সুস্বাস্থ্যবান সাদা দাড়ি ও মাথায় রুমাল বাঁধা মানুষ গাড়িতে বসেছিলেন। গাড়ির সামনে ও পেছনে অনেক সশস্ত্র পুলিশ ও সৈনিক অফিসার ছিলেন। তিনি প্রণাম করে আমার থাকা খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তাছাড়া সেই সময়ে ভারতের প্রচণ্ড উথাল-পাথাল অসহযোগ সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন, আর শেষে আমাদের কি করা উচিত সে বিষয়েও বললেন। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এ বিষয়ে নিজের মতামত ব্যক্ত করা আমি উচিত মনে করিনি এবং আমার মনও তা করতে চায়নি। তাই বেশ কয়েকবার বলা সত্ত্বেও আমি মহারাজের ওখানে যেতে রাজী হইনি। আমি দুয়েকটা কথায় উত্তর দিয়ে ছুটি নিলাম। আমি আমার আসনে চলে এলাম এবং ঘোড়াগাড়ি আগে চলে গেল।

আমি জানতাম যে শিবরাত্রির পর নবাগতরা যাতে ফিরে যায় সেজন্য পুলিশ পেছনে লাগে। কিন্তু আমি এখানে মাস দেড়েক থাকব। অতএব আমি আগে থেকেই পাঁচ দশ মাইল দূরের

১ তিব্বতে সওয়া বছর

কোনো মঠ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে রেখেছিলাম এবং দেবকালী মঠকে থাকার উপযুক্ত জায়গা বলে ঠিক করেছিলাম। শিবরাত্রির সপ্তাহখানেক পরে ২০ ফেব্রুয়ারীর আমি ও মহেন্দ্র দক্ষিণ কালীর দিকে রওনা হলাম। কৃষ্ণদাস মেলার পর ভারতের দিকে ফিরে গিয়েছিল। দক্ষিণ কালীর আশেপাশে পার্বত্যভূমি চমৎকার। চারদিকে সবুজে ভরা জঙ্গল, কলকল করে নদী বয়ে যাচ্ছিল, পাখিদের শ্রুতিমধুর কলরব। কিন্তু যখন আমরা পাঁচ মিনিটে পাঁচটা ভেড়ার মুণ্ড ধড় থেকে আলাদা করে কালীদেবীকে ভোগ দিতে দেখলাম এবং ভেড়া, পাঠা, মুর্গীর রক্ত রঞ্জিত সারা উঠান আমাদের চোখে পড়ল, তখন আমাদের মত বদলে গেল। জিজ্ঞেস করাতে ফর্পিঙ্-এর কাছে শিখরনারো ছত্রের খোঁজ পেলাম। আমরা সেখানে পৌঁছলাম।

এই জায়গাটা আমাদের রমণীয় লাগল। নিচ থেকে ওপর পর্যন্ত জঙ্গলে ভরা এক বড় পাহাড়। এর কাঠ কাটা নিষিদ্ধ। সুতরাং আশেপাশের অন্যান্য অনেক পাহাড়ের মতো এই পাহাড়ের জঙ্গল নির্মূল হয়ে যায়নি। পাহাড়ের পাদদেশে বেশ বড় স্বচ্ছ শীতল ঝরণা বেরিয়ে এসেছিল। এই জল পাইপ দিয়ে ফর্পিঙের পাওয়ার-স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। জঙ্গল কাটলে জল শুকিয়ে যাওয়ার ভয় ছিল, বোধহয় সেইজন্যই এই পর্বতের বৃক্ষ কাটা বিশেষভাবে বারণ ছিল। নবাগত সাধুদের সেবার জন্য মোহন্তজী রাজার কাছ থেকে বৃত্তি পেতেন যা থেকে পাঁচ সাত জন নবাগত সাধুর খাদ্যসামগ্রীর (পাঁচ-সাত হান্ডিয়ার) ব্যবস্থা হত। প্রয়োজনীয় কাঠ কাটারও অধিকার ছিল। পাহাড় ও গাছের মধ্য থেকে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়া একটা পাথরের চাঙ্গড় ছিল, যা দেখতে সাপের মতো ছিল। অতএব এখানকার বিষ্ণু মূর্তিকে শিখরনারায়ণ বলা হত। এই চাঙ্গড়ের একদিকে একটা ছোটমতো গুহা ছিল। তার সামনে পাথরের মেজে ছিল। কয়েকটা সিঁড়ি নিচে নেমে পুল দিয়ে ঝরণার জলকে পেরিয়ে এলে ধর্মশালা। এক দোতলা নেপালী ধরনের ইমারত এই ধর্মশালা। আমি গুহাতে থাকাই বেছে নিলাম, আর মহেন্দ্রকে বললাম, ধর্মশালার দোতলার ঘরে থাকতে। আহারের সমস্যার সমাধান করে দিল পাশের গ্রামের এক ব্রাহ্মণ গৃহস্থ। সে রান্না করা খাবার দৈনিক আমার কাছে পাঠাতে লাগল। আমি কিছুদিনের জন্য একদিন অন্তর ভাত খাওয়ার নিয়ম করেছিলাম। কিন্তু যখন তা প্রসিদ্ধ হতে লাগলো তখন দৈনিক খেতে লাগলাম।

আমরা এখানে দু-সপ্তাহ থাকলাম। ছাপরা থেকে সংস্কৃত ও ইংরেজীর পাঁচ-সাতটা বই নিয়ে গিয়েছিলাম। তা পড়া পারস্পরিক আলাপ আলোচনা এবং তারপর যে সময় বাঁচত তা চিন্তন ও মননের কাজে লাগাতাম। লোকজন বলাবলি করত যে জঙ্গলে মাঝে মাঝে ভালুক আসে। কিন্তু আমি কোনদিন ভালুক দেখিনি। তবে রাত্রিতে জানোয়ারের অপরিচিত আওয়াজ অবশ্যই শুনতে পেতাম। কোনো জানোয়ার গুহার কাছে এলে আমার আত্মরক্ষার কোনো উপায় ছিল না। ধুয়ার ভয়ে এই ছোট গুহায় আমি আগুনও খুব কম জ্বালাতাম। মহেন্দ্রের কাছে একটা কম্বল ছিল, খুব ঠাণ্ডা লাগছিল, ব্রাহ্মণ লেপ ও বিছানা পাঠিয়ে দিল। একদিন কাঠের আগুন জ্বালিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম, কিভাবে কাপড়ে আগুনের ফুলকি এসে পড়ায় সব পুড়ে গেল। ঠিক সময় ঘুম ভেঙেছিল। তাই আমি ও এই কাঠের ঘর বেঁচে গিয়েছিল।

শিখর নারায়ণ হিন্দু ও বৌদ্ধদের সম্মিলিত তীর্থ। সুতরাং কখনো কখনো এখানে তিব্বতী লামাও আসত। দুয়েকজন নেওয়ার* বৌদ্ধ তো রোজই পূজা দিতে আসত। তাদের কাছে আমি

নেপালের একটা জাতি।

কোনো বৌদ্ধ পণ্ডিতের নাম জিজ্ঞেস করেছিলাম। তারা পাটনের বজ্রদত্তের বৈদ্যের নাম করেছিল। শিখর নারায়ণে অনেক দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল বলে মনে হয়েছিল। সকালেই বাদ্যভাণ্ড নিয়ে কিছু গায়ক চলে আসত এবং বেশীর ভাগ বিনয় পত্রিকা থেকে প্রভাতী গান গাইত।

শিখর নারায়ণের জল যেত পাবর স্টেশনে। সেখানে কাজ করত এমন দুজন পাঞ্জাবী (পণ্ডিত প্যারেলাল ও ঠাকুর লাল সিংহ) আমাদের এখানে এলেন এবং তাঁদের ওখানে যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করে গেলেন। ৬-মার্চ স্থান ছাড়ার পর আমরা পাবর স্টেশনে গেলাম। এর ওপরের গ্রামগুলির অবস্থা খুব খারাপ ছিল। চাষের খেত তৈরি করার জন্য লোকেরা একেবারে পাহাড়ে চূড়া পর্যন্ত গাছ থাকতে দেয়নি। গাছ ও তার মূলের সঙ্গে ঝরণার বিশেষ সম্বন্ধ থাকে। তাই গাছের অভাবে এমনিতেই অনেক ঝরণা শুকিয়ে গিয়েছিল। যখন অবশিষ্ট জল পাওয়ার স্টেশনে বিদ্যুৎ তৈরির জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন চাষবাসের একমাত্র ভরসা ছিল বর্ষা। তাতে গ্রামের অবস্থা আরো খারাপ হয়ে যায়। পাওয়ার স্টেশনে আমরা দুপুর পর্যন্ত ছিলাম। দুজন পরিচিত ভদ্রলোকই ওভারসিয়ার, বড় এঞ্জিনিয়র ইংরেজ যাকে প্রায় বিনা কাজে মাসে হাজার টাকা করে দেওয়া হচ্ছিল, যদিও তার অনেক কম টাকায়-ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার পাওয়া যেত। সেখানে একজন ক্যাপ্টেন সাহেবও থাকতেন, যিনি হয়তো পুলিসের কাজ করতেন।

সেখান থেকে আমরা পাটন গেলাম। বজ্রদত্ত বৈদ্যের ঠিকানা অনায়াসে পাওয়া গেল। তিনি এক 'বিহারের' (গৃহসমষ্টি) আরো কিছু গুভাজু-পরিবারের সঙ্গে থাকতেন, বয়স ষাটের বেশী হবে। নেপালী বৌদ্ধদের ঐতিহ্যও পূজাপাট সম্পর্কে তাঁর কিছু জ্ঞান ছিল। কিন্তু সংস্কৃত শুধু পড়তে জানতেন, আর বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে জানার জন্য তিনি কিছু সাহায্য করতে পারেননি। তিনি নেওয়ার ও রঞ্জন অক্ষরে লেখা কিছু বই দেখালেন। যা হোক্, তিনি আমার জ্ঞানবৃদ্ধি না করতে পারলেও তাঁর কথাবার্তা বড় সুন্দর ছিল। রাত্রিতে তাঁর ওখানেই রাখলেন। সন্ধ্যায় যখন পুলিশের লোক আমাদের নামধাম লিখতে এল, তখন আমরা নেপালী পুলিশের তৎপরতা সম্পর্কে জানতে পারলাম। বজ্রদত্তজী পাটনের ভাল বৈদ্য, চিকিৎসা তাঁদের খানদানী পেশা। তার ছেলেও বৈদ্য। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর বাবা আবার নতুন বিয়ে করেছিলেন। তাই পিতা পুত্রে বনিবনা ছিল না। নেপালের বৌদ্ধদের মধ্যে সাধারণভাবে বিধবাবিবাহ হত এবং প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ বিপত্নীকের বিয়ে করার কোনো অসুবিধাও হত না। এখানেই আমার আর এক বৌদ্ধ পণ্ডিত রত্নবাহাদুরের সঙ্গে দেখা হল। তিনি কিছুটা সিদ্ধান্তকৌমুদী পড়েছিলেন, কিন্তু সাহিত্যে তাঁর অগ্রগতি না হওয়ায় সংস্কৃত ভাষা বুঝতে ও বলতে তার অসুবিধা হত। বৌদ্ধ সাহিত্যের কিছু গ্রন্থ তিনি আমাকে দেখালেন এবং সে বিষয়ে কিছু বললেন। তিনি তিব্বতে থেকেছেন এবং তিব্বতী কঞ্জুরের কিছু গ্রন্থের সূচীও তিনি তৈরি করেছিলেন। আমার পক্ষে বেশীদিন থাকা সম্ভব ছিল না তাই রত্নবাহাদুর পণ্ডিতের জ্ঞান থেকে বিশেষ লাভবান হতে পারিনি। তার মিত্র এক বড় সদাগর দুপুরের ভোজন করালেন। তিব্বতে তাঁর কয়েকটা বাড়ি আছে। তিনি বলছিলেন—যদি আপনি যেতে চান, তবে আমি আপনাকে সেখানে পাঠাতে পারি। মহেন্দ্র তো উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আমি দেড়মাস পরে ছাপরা ফিরে যাওয়ার কথা বলে এসেছিলাম।

আমরা আরো তিন চার দিন থাপাথল্লীতে থাকলাম। একদিন (১০ মার্চ) রাজগুরু হেমরাজ শর্মার ওখানে গেলাম। গ্রন্থাগারেরও তিনিই প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন। বড় মহল, দেউড়ীতে পাহারাদার, সবই রীতিমতো রাজসিক ব্যবস্থা। আগে যেদিন বিকেলে দেখা হয়েছিল সেদিন তার পশমের চাদর, নেপালী পায়জামা ও সাদা টুপি দেখে তার বৈভবের কোনো অনুমান করতে পারিনি। খবর পাঠাবার পর তিনি ভেতরে ডেকে পাঠালেন এবং স্বাগত জানাতে দরজা পর্যন্ত

এলেন। দেখলাম এক বড় সুসজ্জিত হলে মেঝেতে কার্পেটের ওপর অনেক সংস্কৃত বই পড়ে আছে এবং আরো অনেক পণ্ডিত বসে আছেন। বজ্রদত্ত বৈদ্যের কাছ থেকে আমি জানতে পেরেছিলাম যে মধ্যদেশ থেকে আগত স্বামী সচ্চিদানন্দ প্রবলভাবে পশুবলি খণ্ডন করেন এবং বলছেন যে পশুবলি বেদবিরুদ্ধ ও ধর্মবিরুদ্ধ। এর ফলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা অস্থির হয়ে পড়েছেন, মহারাজাও পশুবলির বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছেন। এখানে এই সব বই দেখে আমার বৈদ্যের কথা মনে হল এবং গুরুজীর সঙ্গে কথা বলার পর তা আরো স্পষ্ট হয়ে গেল। পশুবলির জন্য এখানে শাস্ত্রীয় প্রমাণ খোঁজা হচ্ছিল। স্বামী সচ্চিদানন্দ নিজের পক্ষের সমর্থনে বুদ্ধের বাক্যেরও উদ্ধৃতি দিতেন। ঐ সময়ে আমার কুমারিলের (শ্লোকবার্তিক) একটা শ্লোক মনে এল যাতে বলা হয়েছিল যে বুদ্ধ ইত্যাদি বেদবাহ্যদের (বেদবিরোধীদের) বাক্য উচিত হলেও কুকুরের চামড়ায় রাখা গরুর দুধের' (গোক্ষীরং শ্বদৃতৌ ধৃতং) মতো পরিত্যজ্য। গুরুজী শ্লোকের উৎসের কথা জিজ্ঞেস করলেন। আমি বই বার করে দেখিয়ে দিলাম। তিনি সাগ্রহে বললেন যেন আমি এই বিবাদে স্বামী সচ্চিদানন্দের বিরুদ্ধে অংশগ্রহণ করি, কিন্তু অন্তরে তো আমি আর্যসমাজী মতবাদ মানতাম, যা স্বামী সচ্চিদানন্দের পক্ষই সমর্থন করেছে।

আর একবার মহাবোধা গেলাম। সেখানে চীনা লামার সঙ্গে দেখা হল। চীনা লামা তখন হোম করছিলেন। তবু তিনি আমাকে বসিয়ে কিছুক্ষণ কথা বললেন। তখন আমি তাঁর ছেলেদের দেখিনি। তবে তাঁর একটি মেয়ে সেখানে নিশ্চয় ছিল। তার কানের মাঝখানে বড়মতো সোনার কানবালা ছিল। চীনা লামা বৃদ্ধ। তাঁর গলায় গলগণ্ড ছিল।

নেপাল থেকে ফেরার জন্য পাস দরকার হয়। তা পেতে কোনো অসুবিধা হল না। পাওয়ার স্টেশনের পাঞ্জাবী ভাইয়েরা ঐদিক হয়েই ফিরতে অনুরোধ করেছিলেন। তাহলে আমরা চন্দ্রগিরির তড়াই থেকেও বাঁচতে পারতাম। তাই আমরা সেই রাস্তা হয়েই ফিরলাম। তিনদিন সেখানে থাকলাম। সেখান থেকে ভীম ফেরী পর্যন্ত এক ভরিয়া (ভারবহনকারী) ও পাথেয় পেলাম। ১৮-মার্চ আমরা ভারতে রওনা হলাম। আমাদের রাস্তার পাশ দিয়ে বিদ্যুতের স্তম্ভও গিয়েছিল। কিন্তু তখনো তাতে তার লাগানো হয়নি। ভীমফেরী থেকে কাঠমাণ্ডু পর্যন্ত একটা রোপওয়ে তৈরি করা হচ্ছিল। এখান থেকে বিদ্যুৎ যাবে তার জন্যই।

ভীমফেরীর পরের চটি পর্যন্ত আমরা দুজন একসঙ্গে ছিলাম। এসময় আমার জ্বরের মত হল, এবং পথচলাও মুস্কিল হয়ে দাঁড়াল, অন্যদিকে মহেন্দ্র এ বিষয়ে কিছু না জেনে এগিয়ে গেল। আমার কাছে একটা পয়সাও ছিল না (শুধু দুয়েকটা বাসন থেকে গিয়েছিল)। একটা খালি গাড়ি আসছিল। বলায় গাড়োয়ান আমাকে তুলে নিল। রাত্রিতে আমরা চুড়িয়াঘাটী থেকে আরো নীচে জঙ্গলে থাকলাম। জঙ্গলে বাঘ ও হাতি দুই-ই ছিল। বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পঁচিশ-তিরিশজন গাড়োয়ান তাদের গাড়ি দিয়ে চারদিক সুরক্ষিত করে মাঝখানে সব বলদ রাখল এবং বড় বড় গাছের গুঁড়ি দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিল। তাদের পুরো বিশ্বাস ছিল যে আগুন থাকলে বাঘ আসে না।

বলদের গাড়ি সীমান্তের পাশে নদীর তীরে সেই কুটিরের সামনে দিয়ে গেল যেখানে আমি বড় জ্বালামাই থেকে আসা সাধুকে দেখেছিলাম, কিন্তু আমি সেখানে থাকলাম না। আমি কি করে জানব যে মহেন্দ্রনাথ সেখানে বসে আমার অপেক্ষা করছেন? রকসৌলে সেই দোকানদারকে বাসন ফিরিয়ে দিয়ে আমি দু-টাকা তের আনা পেলাম এবং (২২ মার্চ) সোজা ছাপরার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলাম।

৭

হাজারীবাগ জেলে (১৯২৩ এপ্রিল থেকে ১৯২৫)

বাবু মাধবসিংহের বাড়ি পৌঁছেই জানতে পারলাম যে পাটনার ভাষণের ব্যাপারে আমার নামে ওয়ারেন্ট বেরিয়েছে। সঙ্গীরা পরামর্শ দিল—বসে বসে দু-তিন বছর জেলে কাটাবার থেকে ভাল আমার এই সময়ে সরে যাওয়া। ওয়ারেন্টের ব্যাপারে কেউ আমাকে নেপালে চিঠিও দিয়েছিল, কিন্তু তা আমি পাইনি। তিব্বতের প্রতি আমার এমন আকর্ষণ ছিল এবং মহেন্দ্রও যাওয়ার জন্য এমন জোর দিচ্ছিল যে চিঠি পেলে হয়তো আমরা সেদিকে চলে যেতাম; কিন্তু এখন ছাপরা এসে লুকিয়ে পালিয়ে যাওয়াটা আমার পছন্দ হল না। আমি স্থির করলাম, ধরা দেব, আর পরদিন পুলিশকে খবর দিলাম—শ্রীরাজাগোপালাচারী যখন বক্তৃতা দেবেন, তখন আমি সেই সভায় থাকব, আপনারা সেখানে আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারেন।

কলেজিয়েট স্কুলের (বর্তমান বিশ্বেশ্বর-সেমিনারি) প্রাঙ্গণে বড় সভা ছিল, হাজার হাজার লোক জমা হয়েছিল; তাই পুলিশ অত বড় জমায়েতের মধ্যে আমাকে গ্রেপ্তার করতে চায়নি। প্রথমবার জেল থেকে ফিরে আসার পর ছাপরাতে বাবু মাধব সিংহের বাড়িই আমার বাসস্থান হয়ে গিয়েছিল। বিকেলে পুলিশ এসে বলল—পাটনা যেতে হবে, এবং আপনার সুবিধামতো আমরা আপনাকে গ্রেপ্তার করব। আমি বললাম, আমি প্রস্তুত আছি আর, সেই রাত্রে দুই সেপাই আমাকে নিয়ে পাটনা পৌঁছল। রাতটা বাংকীপুরের কোতোয়ালির হাজতে কাটালাম। পরদিন রবিবার ছিল, তাই ঘুরেফিরে তারা আমাকে এস· ডি· ও·-র বাংলোতে নিয়ে গেল। কড়া রোদ ছিল, তার ওপর জ্বরের দুর্বলতা ছিল, সুতরাং এক্কাতেও এতটা দৌড়-ঝাঁপ আমার ভাল লাগছিল না। দুপুরে বাঁকীপুরের (পাটনা) নির্জন সেলে আমাকে পৌঁছন হল।

শীতের মধ্যেই আমি নেপাল চলে গিয়েছিলাম, এখন সদ্য ঠাণ্ডা জায়গা থেকে গরম জায়গায় আসায় আমার কাছে গরম আরো অসহ্য মনে হচ্ছিল। তার ওপর সেলে বন্ধ করে রেখেছিল, যেখানে হাওয়া ঢোকার কোনো পথ ছিল না, আর পাটনার মশার আক্রমণের কথা আর কি বলব? পণ্ডিত বাসুদেও পাণ্ডে তখন জেলার ছিলেন। তাঁর ব্যবহার বেশ ভাল ছিল। তিনি স্কুলের জন্য একটি বর্ণমালার বই লিখেছিলেন। আমার সম্পর্কে ভাল করে জানার পর তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছা হয়েছিল যে আমি তাঁর জন্য একটি ভারতের ইতিহাস লিখে দিই। আমি শুরুও করেছিলাম, কিন্তু বই অর্ধেক হতে হতেই আমার সাজা হয়ে গেল। এক সপ্তাহ অথবা আর কিছু বেশীদিন দুর্ভোগের পরেই আমাকে একটা ওয়ার্ডে বদলি করে দেওয়া হল। এখানে রাত্রিতে কিছুটা হাওয়া আসত, কিন্তু মেজেতে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে শুয়ে মশার কামড়ে ঘুমের বারটা বেজে যেতো।

ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ (এ) ধারা অনুসারে আমার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মকদ্দমা চলল। শর্টহ্যান্ডে নেওয়া হয়নি এমন দু-তিনটি পুলিশ রিপোর্ট এবং কয়েকজন সাক্ষীকে সরকারের তরফ থেকে আমার বিরুদ্ধে পেশ করা হয়েছিল। সরকার মোকদ্দমা চালাচ্ছে এবং সরকারেরই ব্যবস্থাপক বিভাগের এক কর্মচারী—সাব্-ডিভিসনাল ম্যাজিস্ট্রেট-বিচারক হলেন, সেক্ষেত্রে

সেখানে দণ্ড ছাড়া অন্য কোনো রায় কি করে হতে পারে? আমি কোনো সাফাই দিইনি, শুধু একটা লিখিত বক্তব্য দিলাম, যাতে বক্তৃতাটা রিপোর্টের চেয়েও বেশী কড়া ছিল জানিয়ে অভিযোগ স্বীকার করে নিলাম। হয়তো আমার ভাষণ 'দেশ'-এ (পাটনা) ছাপা হয়েছিল। ম্যাজিস্ট্রেট দু-বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিলেন। ধন্যবাদ দিয়ে আমি জেলে চলে এলাম, দু-বছর জেলে বন্ধ থাকার জন্য আমার বিন্দুমাত্র আপসোস হয়নি। তার কারণ ছিল। রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে বাইরের কাজে ফেঁসে যাওয়ায় আমি কোনো গুরুত্বপূর্ণ অধ্যয়ন করতে পারিনি, অন্যদিকে দেশেও রাজনৈতিক শিথিলতা এসে গিয়েছিল, যার ফলে বাইরে থেকে বেশী কাজ করার কোনো সম্ভাবনা ছিল না, জেলে লেখাপড়া তো ভালভাবেই হবে, এই ভাবনাই তখন আমার মাথায় কাজ করছিল।

কারাদণ্ড দেওয়ার দুয়েকদিন পরেই আমাকে বক্সার জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হল। স্টেশনে আমি কয়েকটা পোস্টকার্ড লিখলাম। নেপালের সেই অল্প পরিচিত রাজকুমারকেও একটা পোস্টকার্ড লিখেছিলাম। জেলে বইয়ের প্রয়োজন হবে এবং তার জন্য কিছু টাকাও দরকার হবে—আমার এই ধারণা সঠিক ছিল, কিন্তু সেজন্য সাধারণ পরিচয়ের ওপর নির্ভর করে কারো কাছে টাকা চেয়ে বসা বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে হতে পারে না। কিন্তু এই কথা মনে এল চিঠি দিয়ে দেওয়ার পর। আর পশ্চাত্তাপ করে লাভ কি? মানুষের মধ্যে তো বুদ্ধিমানের চেয়ে বোকার সংখ্যাই বেশী।

জেলে আগের বার যে ওয়ার্ডে ছিলাম, আমাকে রাখা হল তারই এক কুঠরিতে, কামরায় নয়। মনে হল, শংকরাচার্য স্বামী ভারতী কৃষ্ণতীর্থও এখানে তাঁর মুঙ্গেরের বক্তৃতার জন্য এক বছরের কারাদণ্ড ভুগছেন, কিন্তু তাঁকে আলাদা রাখা হয়েছিল। সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট ক্যাপ্টেন বার্ক আমার কুঠরির সামনে যখন এলো আমি দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু 'সরকার সেলাম'-এই আওয়াজের সঙ্গে আমি সেলাম করিনি। বার্ক রেগে আগুন হয়ে গেল আর সাজা দেবার ভয় দেখিয়ে চলে গেল। আমি তার পরোয়া করিনি। পরে জেলার এসে বোঝাতে শুরু করলেন। আমি যখন সেলাম করতে একেবারে অস্বীকার করলাম, তখন তিনি বললেন শংকরাচার্যও তো সেলাম করেন, যদি তিনি সেলাম করতে বলেন তবে তো আপত্তি হবে না? তিনি এ ব্যাপারে শংকরাচার্যের নির্দেশ আনিয়ে দিলেন। আমার আর ঝগড়া বাধাবার ইচ্ছে হল না।

আগের বার জেলে থাকাকালীন আমি 'কুরানসার'-কে সংস্কৃতে লিখেছিলাম। এবার পাটনা থেকেই আমি এর হিন্দি অনুবাদ শুরু করলাম, আর এখানে এসে প্রথম আমি সেই কাজ শেষ করলাম। বড়জোর এক সপ্তাহ কেটেছিল তখন সরকারী হুকুম এলো যেসব বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীদের হাজারীবাগে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। এভাবে স্বামী শংকরাচার্যের, আমার এবং হয়তো মদনলাল জোশী ও রাসবিহারীলালও তখন বকসর পৌঁছে গিয়েছিলেন— হাজারীবাগে বদলি হয়ে গেল।

পাটনা জংশনে এসে জানতে পারলাম যে গয়ার ট্রেনের অনেক দেরি আছে। শংকরাচার্য গঙ্গাস্নানের প্রস্তাব করলেন। সেপাইও রাজী হয়ে গেল, মালপত্র স্টেশনে রেখে সেপাইরা উর্দী ও বেল্ট খুলে ধুতী, গামছা হাতে নিল; আমরা বাঁকীপুর ময়দান হয়ে গঙ্গার দিকে যাচ্ছিলাম, এই সময় কোনো পরিচিত লোক আমাদের এভাবে মুক্ত হয়ে সঙ্গীদের সঙ্গে যেতে দেখে এত তাড়াতাড়ি ছাড়া পাওয়ার আমাদের অভিনন্দন জানায়। আমরা যখন প্রকৃত সত্য জানালাম, তখন সে আশ্চর্য হয়ে গেল।

গয়াতেও হাজারীবাগ রোডের ট্রেনের জন্য দীর্ঘসময় প্রতীক্ষা করতে হয়েছিল। স্বামী

শংকরাচার্যের কোনো লোক বাইরে থেকে তাঁর ফলাহার ইত্যাদির ব্যবস্থা করার জন্য বক্সারে থাকত, সে এখানেও তাঁর সাথে ছিল, অতএব সরকারের দেওয়া দৈনিক আড়াই আনার মোটা অর্থে দিন কাটাবার মতো পরিস্থিতি আমাদের হয়নি।

আমাদের মোটরবাস সকালে হাজারীবাগ জেল গেটে পৌঁছল। গেটে আমাদের সব জিনিষ পরীক্ষা করা হল। আমার বইয়ের মধ্যে সিংহলী অক্ষরে পালি মজ্ঝিমণিকায় ছিল যা আমি দৈনিক এক ঘণ্টা নিয়মিত পড়তাম। জেলর লিপি ভাষা ও বিষয় বুঝতে না পেরে তা দেয়নি। সেজন্য আমি অনশন শুরু করলাম। প্রথমবার বক্‌সর জেলে থাকাকালীনও আমাকে দুয়েকদিন অনশন করতে হয়েছিল, কিন্তু সেবার জেলের কর্মচারীদের দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে সমস্ত গোষ্ঠী অনশন করেছিল। এবার আমি একা ছিলাম। জেলের গোরা জেলর মিষ্টার মীকের কড়া আচরণ সম্পর্কে আমি অনেক শুনেছিলাম। তিনি এসে ধমক দিলেন এবং অনশন করা বন্ধ করতে বললেন। কিন্তু আমি তাতে রাজী হইনি। স্বামী শংকরাচার্যকে বলায় তিনি বলে দিলেন—উনি বৌদ্ধধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, এটা তাঁর ' ধর্মগ্রন্থ , তাই এ ব্যাপারে আমরা তাঁকে বাধ্য করতে পারি না। কিছু পরে মজ্ঝিমণিকায় আমার কাছে চলে এল। কিছু অন্যান্য পালি গ্রন্থকে সেন্সরের কাছে পাঠানোর আমি বিরোধ করিনি।

জেলের গ্রন্থাগারে বই প্রায় ছিলই না বলা চলে। আমার কাছেও গোনা-গুণতি কয়েকটা বই ছিল। কাগজ, কলম, পেনসিল রাখার অধিকার ছিল না আমাদের। তা সত্ত্বেও দিন কাটানো মুশকিল ছিল না। রোজ দেড়-দু ঘণ্টা ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক বিষয়ে ইংরেজীতে ভাষণ হত স্বামীজীর। আমি তাঁর ফলাহারের ও পূজাপাঠের সঠিক ব্যবস্থার দায়িত্ব নিয়েছিলাম, তাই তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলার অনেক বেশী সুযোগ ছিল আমার। প্রথমদিকে আমাদের দু-নম্বরে রাখা হল। তখন আমাদের কুঠরিগুলোর লাগোয়া পেছনের সারি ওয়ার্ড নম্বর এক-এ উড়িষ্যার পণ্ডিত গোপবন্ধু দাস, ভগীরথ মহাপাত্র প্রমুখ ব্যক্তি থাকতেন। আমাদের একের অপরের সঙ্গে মেলামেশার অনুমতি ছিল না এবং দেয়াল নিরেট হওয়ায় আওয়াজ পৌঁছনো মুশ্‌কিল ছিল, তা সত্ত্বেও আমরা কথাবার্তা বলার উপায় বার করে নিয়েছিলাম। স্বামীজী রোজ কিছু সংস্কৃত পদ্য রচনা করতেন এবং সেজন্য তাঁকেও বাজে কাগজের টুকরো ও পেন্‌সিল 'জোগাড়' করতে হত। হয়তো এক ও দুই নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল অথবা অন্য কোন কারণে কিছু সময় পরে আমাদের 'পাঞ্জাবী' সেলে পাঠিয়ে দেওয়া হল। এর মধ্যে ভাগলপুরের সঙ্গীরা ছাড়া পেয়েছিল। যুদ্ধের সময় লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত বন্দীদের সবচেয়ে সুরক্ষিত মনে করে, হাজারীবাগ জেলে পাঠানো হয়েছিল—স্টেশন থেকে চল্লিশ মাইল দূরে, শহর থেকে একেবারে আলাদা, রাজনৈতিক জাগৃতিতে বঞ্চিত এই স্থান সেই সময় এর উপযুক্তও ছিল। সেই পাঞ্জাবী বন্দীদের দণ্ড দেওয়ার জন্য এই সেল তৈরি করা হয়েছিল, সেই জন্যই এদের পাঞ্জাবী সেল বলা হত। চারটে সেল ছিল, প্রত্যেক সেলের সামনে ৪-৫ হাত লম্বা চওড়া উঠান, তারপর ছিল ৪ হাত চওড়া এক লম্বা মতো সম্মিলিত উঠান। সন্ধ্যা হতেই আমাদের সেলে বন্ধ করে দেওয়া হত, দিনে সম্মিলিত উঠোন পর্যন্ত, আর প্রস্রাব পায়খানার জন্য তার বাইরে লোহার সিঁক দিয়ে ঘেরা জায়গায় যেতে পারতাম। অন্যান্য বন্দীদের আমাদের সামনে পর্যন্ত আসতে দেওয়া হত না।

জেলর মিষ্টার মীকের সঙ্গে প্রথমেই ঝগড়া হয়ে গিয়েছিল, তাই তিনি প্রথমদিকে আমার ওপর রেগে ছিলেন, পরে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে আমি পড়াশোনায় ব্যস্ত থাকা মানুষ, অনর্থক নিজে হয়রান হতে চায় না এবং অন্যকে হয়রান করতে চায় না। তখন তিনি নরম হয়ে

যান। প্রথম তিনি তাঁর নিজের বই থেকে অনেক বই আমাকে পড়তে দেন। পাঞ্জাবী সেলে আমার মনে হল—লেখাপড়া করার অন্য কোনো উপকরণ তো নেই, তাই এসময়টা গণিত অধ্যয়ন করে কাটানো যাক না কেন। ছেলেবেলায় গণিতে আমি খুব ভাল ছিলাম, দয়ানন্দ স্কুল (বেনারস)-এ সপ্তম শ্রেণীতে যতটুকু এলজেব্রা পড়েছিলাম তার পরে আর এগোতে পারিনি। স্বামী শংকরাচার্য সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য ও দর্শনে যেমন প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন, তেমন ইংরেজী ও গণিতেও তিনি বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি আমার এই সিদ্ধান্তে সায় দিলেন। মীককে বলায় সে আমাকে সঙ্গে সঙ্গেই স্লেট পেন্‌সিল দিয়ে দিল। এবার আমি গণিত নিয়ে পড়লাম। বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, কোঅর্ডিনেট জ্যামিতিতে আমারও খুব মন লেগে গেল। মাসের পর মাস কাটতে লাগল আর আমি আমার সারা সময়টা গণিতে ব্যয় করতে লাগলাম। এই একটানা ব্যবস্থা তখনই বন্ধ হত, যখন আমার আমাশা হত এবং তার জন্য আমাকে হাসপাতালে যেতে হত। প্রথমদিকের তিন চারমাস আমার ক্রমাগতই আমাশা হত। হাসপাতালে রেড়ীর তেল খেয়ে খেয়ে চাঙ্গা হয়ে ফিরতাম এবং কয়েকদিন পরেই আবার সেই একই অবস্থা। অবশেষে সুপারিন্‌টেন্‌ডেনট মেজর লী—যিনি হাজারীবাগের সার্জেনও ছিলেন—দুটি পাউরুটি, চিনি ও দই সব সময়ের জন্য পথ্য ঠিক করে দিলেন। সকালে আমি তাই খেতাম, দুপুরে পাচক দেড়পোয়া আটার এক মোটামতো রুটি বানিয়ে নিয়ে আসত। তারপর আমি আর কিছু খেতাম না। হাজারীবাগ জেলে যতদিন ছিলাম, ততদিন এই নিয়মই ছিল।

আমার কিছু টাকা জমা ছিল, আমি তা দিয়ে কিছু বই আনিয়ে নিলাম। পরে মীক সাহেব কাগজ, কলম, কালির জন্য সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্‌টের কাছ থেকে অনুমতি আনিয়ে দেন। কিন্তু তা পেলাম স্বামীজী ছাড়া পাওয়ার কয়েকদিন আগে। উচ্চ বীজগণিত, সরল ত্রিকোণমিতি, অপটিক্‌স্ (দৃষ্টিশাস্ত্র) ইত্যাদি শেষ করে আমি গোল-ত্রিকোণমিতি পড়ছিলাম এবং জ্যোতিষশাস্ত্রও শুরু করেছিলাম, যখন শংকরাচার্য ছাড়া পেয়ে চলে গেলেন। তিনি চলে যাওয়ায় আমার বড় আপসোস হল, কিন্তু তাঁর জেলে থেকে যাওয়াটাও তো বাঞ্ছনীয় ছিল না। আমি তাঁর সান্নিধ্যের সবটুকু লাভই আদায় করে নিয়েছিলাম। কোনো কাজ না থাকায় দিনের যে কয়েক ঘণ্টা পূজা পাঠে যেত তা বাদ দিয়ে বাকী সব সময়ই তিনি আমাকে দিতেন। তিনি সানন্দে আমাকে পড়াতেন এবং তাঁর পড়ানোর ধরনও বড় চিত্তাকর্ষক ছিল। বীজগণিতের সূত্র মুখস্থ না করিয়ে তিনি আমাকে দিয়ে সেগুলি প্রমাণিত করিয়ে নিতেন। বীজগণিতের মধ্যে অঙ্কগণিত অন্তর্হিত আছে তা তিনি আমাকে প্রথম পাঠের সময় বলে দিয়েছিলেন। পড়ানোর সময় তিনি পশ্চিমের অনেক বিরাট গণিতজ্ঞ ও দার্শনিকের কথা শোনাতেন। কখনো কখনো আমরা ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কেও আলোচনা করতাম। সামাজিক ব্যাপারে তিনি একেবারেই উদার ছিলেন না। মালাবারের নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণের ছোট পুত্র নিজ জাতিতে বিবাহের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে, নায়র-কন্যার সঙ্গে 'মুণ্ডু-সম্বন্ধ' (চার হাত চাদর ফেলে কন্যাকে নিজের একমাত্র রক্ষিতা বানানো) করার ব্যাপারে যখন আমি আক্ষেপ করতাম, তখন তিনি উত্তেজিত হয়ে বলে উঠতেন,—তোমার বাস্তবতার ধারণা নেই, ওখানে গিয়ে দেখ এই প্রথা লোক কত পছন্দ করে। তিনি একথা বোঝার চেষ্টা করতেন না যে স্ত্রীকে তো ব্রাহ্মণ পুত্রকে স্বামী বলে মেনে নিতে বাধ্য করা হল। কিন্তু পুরুষ নিজেকে সর্ববন্ধনমুক্ত বলে মনে করত, এমনকি স্ত্রীকে নিচ মনে করে তার হাতের জল পর্যন্ত খেত না। মালাবারের ব্রাহ্মণের অপরকে বঞ্চনার এই উদাহরণ দিয়ে আমি বলতাম—'কনিষ্ঠ পুত্রকে তো এই নাম্বুদিরিপাদেরা দায়ভাগের অনধিকারী বানালেন, সেই সঙ্গে নায়রদের মধ্যে সম্পত্তিতে কন্যার অধিকারই স্বীকৃত করলেন, যাতে নাম্বুদিরি ব্রাহ্মণের কনিষ্ঠ পুত্র জামাতার সুখ ভোগ করে এবং স্ত্রীর

ভরণপোষণের চিন্তা তাকে করতে না হয়।' একথা শুনে তাঁর কান লাল হয়ে যেত। কিন্তু আমার ওপর তাঁর সব কোপই অত্যন্ত বাৎসল্যপূর্ণ হত। একবার আমি উলটা পক্ষ নিয়ে বর্ণব্যবস্থাকে জন্মগত প্রমাণ করতে সত্যকাম জাবালকে জবালা ব্রাহ্মণী ও এক ব্রহ্মর্ষির সন্তান বানানোর জন্য টানাটানি শুরু করলাম। তিনি হেসে হেসে বললেন—আমাকে ধোঁকা দিচ্ছ কেন, তোমার কি মত তা আমি জানি।' তাঁর সস্নেহ ব্যবহার, বিদ্যার প্রতি অনুরাগ জন্মানোর তাঁর পদ্ধতি এমন ছিল যা ভোলা যায় না।

স্বামীজী যাওয়ার পর আমি হয়তো আবার আমাশা হওয়ায় হাসপাতালে গিয়েছিলাম। তখনই 'বাইসওয়ী সদী' লেখার খেয়াল হল, আর লেখায় আমি এতো তন্ময় হয়ে যেতাম যে অনেক রাত ভোর হয়ে যাওয়ার পর অথবা ঊষাকালে আমার কলম থামত। দিনে লিখতাম কম, পড়তাম বেশী। দিনে কখনো কখনো কয়েদীদের আত্মচরিতও শুনতাম। অমৃতসর জেলার এক ডাকাত বুঢ়সিংহ পাঁচ বছরের সাজা নিয়ে জেলে এসেছিল। সে তাঁর ডাকাতির, তাঁর প্রেমলীলার ও উদারতার কথা বলত। তার ছোট ভাই টাটানগরে কাজ করত। সে শিখ ছিল না। তার তখনো বিয়ে হয়নি। বুঢ়সিংহ বলত, মেথরাণীও যদি হয়, তবু আমি ওর বিয়ে দিয়ে ছাড়ব। বুঢ়সিংহের ছেলেপিলে ছিল না। যখন সে প্রথম কলকাতা পৌঁছল তখন শাহাবাদের দেওনন্দন ছিল এক গেঁয়ো আহীর। কিন্তু সেখানে সে গুণ্ডাদের সংসর্গে এল। সে ডাণ্ডা ও ছুরি চালানো, চুরি করে ও ধমকানি দিয়ে টাকা-পয়সা আদায়ের বিদ্যা শেখে, ভাল সাজপোশাক ও খাওয়া দাওয়ার অভ্যাস করে এবং সে গেঁয়ো দেওনন্দনের জায়গায় এক শহুরে মানুষ হয়ে যায়। সে দুবছরের জন্য এসেছিল।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পর আমাকে পয়লা নম্বরে রাখা হয়। এই সময়ে 'দেশ'-এর সম্পাদক পণ্ডিত পরেশনাথ ত্রিপাঠী দু'বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে এসেছিলেন। তিনি হিন্দিতে কয়েক ডজন বইয়ের লেখক ও অনুবাদক। ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ ছিলেন বলে তাঁর মনে খোঁচা লাগতো। ইংরেজী শেখার ইচ্ছা ছিল তাঁর, কিন্তু তা কষ্টসাধ্য বলে তিনি ভয় প্রকাশ করলেন। আমি বললাম—আমি আপনাকে এমনভাবে ইংরেজী পড়াব যে আপনি রোজ দু-তিন ঘণ্টা সময় দিলে আটমাসে সাধারণ ইংরেজী বই বুঝতে পারবেন, কিন্তু প্রথম দিকে শুধু ইংরেজী লেখা বলার চিন্তা ছেড়ে দিয়ে শুধু অর্থ বোঝার দিকে আপনার মন দিতে হবে। যে সব এম· এ·, বি· এ· পাস লোকেরা পনের ষোল বছর লেগে আছে, তারাও শুদ্ধ ইংরেজী বলতে অথবা লিখতে পারে না। সেজন্য আপনার চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন কি? তাঁর মেয়ের পড়া হয়ে গেছে এমন সব ছোটো ছেলে মেয়েদের গল্পের বই মিষ্টার মীক পাঠিয়ে দিলেন। ব্যাকরণের দিকে মন না দিয়ে আমি তাঁকে পড়াতে লাগলাম। পড়ার পর এবং পড়ার আগে একবার পাঠ দেখে যাওয়ার নির্দেশ ছিল। আট মাসের মধ্যেই ত্রিপাঠীজী দক্ষিণ আফ্রিকা এবং রুশ জাপান যুদ্ধের সম্পর্কে 'টাইমস' (লণ্ডন)-এর বিশেষ সংবাদ দাতাদের বই যখন বুঝে সমাপ্ত করে ফেললেন তখন ইংরেজী ভাষা শুধু পড়ে বোঝার কাঠিন্যও তাঁর কাছে মিথ্যে মনে হল, সংস্কৃতের কাঠিন্য সম্পর্কে যেমন রমলা বাদশাহের হয়েছিল।

এক নম্বরের এক ঘটনা। দিনে আমি পড়তাম। কিন্তু রাত্রিতে আলো ছাড়া পড়া যেত না, আর সময় নষ্ট করা আমার বড় খারাপ লাগত। চকিয়ার (ভোরে থানা, সারন) পঞ্চানন তিওয়ারী পাঁচ বছরের সাজা খাটছিলেন। তিনি সাধারণ রান্নাঘরের পাচক ছিলেন। তিনি আমার অসুবিধা বুঝতে পেরে একদিন কাউকে না জিজ্ঞেস করে সেরখানেক সরষের তেল নিয়ে আমার

সেলে[১] এলেন। সেপাই দেখতে পেয়ে হেড ওয়ার্ডার (বড় জমাদার) সরদার কৃপাসিংহকে খবর দেয়। সে এসে গেল। আমার জন্য পঞ্চানন দণ্ডিত হবে, একথা মনে হতেই আমার মন বিচলিত হয়ে উঠল। আমি কৃপাসিংহকে বলে দিলাম—রাত্রিতে প্রদীপ জ্বালব বলে আমি তেল আনিয়েছিলাম। আমার শাস্তি হওয়া উচিত। যাহোক্, ব্যাপারটা সেখানেই শেষ হল।

যুদ্ধের সময় যখন হাজারীবাগে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বন্দীরা এল, সে সময় একজন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টার মীককে জেলর বানিয়ে পাঠানো হয়েছিল। জেলের সে কি ব্যবস্থা করতে পেরেছিল তার উদাহরণ হল এই যে সব পাহারাদার থাকা সত্ত্বেও এক ডজনেরও বেশী বন্দী জেল থেকে পালাতে পেরেছিল। হাজারীবাগ জেলে হাজার কয়েক মানুষের অন্ন বস্ত্রের, থাকার ওষুধের ব্যবস্থা করতে হত। তাতে বছরে লাখ লাখ টাকা খরচ হত। বন্দীদের জন্য খরচ করার টাকা থেকে যতটা চুরি করা সম্ভব, ততটা চুরি করা যেতে পারে, জেলের এই সনাতন ধর্ম অনেকদিন থেকেই চলে আসছিল। মিষ্টার মীকও এই প্রলোভন থেকে বাঁচতে পারেনি, আর পরে তো গোরা হওয়ায় সে নির্ভয়ে বড় বড় অভিজ্ঞ জেলারের ওপর টেক্কা দিতে লাগল। সাধারণ চুরি তো তিনি চালিয়েই যাচ্ছিলেন, আমি হাজারীবাগ থাকার সময় তার বাড়ি তৈরী হচ্ছিল। জেলখানার ভেতর ইট তৈরি হত, সুরকি গুঁড়ো করা হত, কাঠ ও লোহার মালপত্র তৈরি হত। দু-তিন হাজার টাকার বীম, দরজা, ইট, পাথর, দু-তিনশ টাকায় নিলাম করিয়ে তাঁর বন্ধুর নামে নিয়ে নিতেন। দু-তিন মাস পরপরই তিনি পুরনো মোটর কিনতেন। জেলের কয়েদী, মিস্ত্রী ও মেকানিকদের দিয়ে তা মেরামত করিয়ে দ্বিগুণ তিন গুণ দামে বেচে দিতেন। তখন হাজারীবাগের সিভিল সার্জন জেলেরও সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট হতেন। তাঁর জেলে বেশী সময় দেওয়ার ফুরসতই ছিল না। এক আধ ঘণ্টার জন্য তিনি আসতেন এবং মীক সাহেব যা দেখাতে চাইতেন, তাই দেখতেন। ভারতীয় সিভিল সার্জন গোরা বলে তাঁকে ভয় পেতেন। ইংরেজ সিভিল সার্জনের চোখে মীকের মতো সৎ মানুষ আর কেউ ছিল না। ধনবান কয়েদীদের হাল ছিল অত্যন্ত খারাপ। তাদের ঘানি টানতে অথবা চাকি পিষতে দেওয়া হত। ঘানি টেনে তেল বার করা শুধু গায়ের জোরেরই ব্যাপার নয়, ছোট জায়গায় ঘুরতে হত বলে তা অস্বাস্থ্যকরও। এই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কয়েদী নিজের বাড়ি থেকে টাকা আনিয়ে জমাদার ও অন্যান্যদের দিত। ভাগলপুরের কিছু আহীর দাঙ্গাহাঙ্গামার জন্য কয়েদ হয়ে এসেছিল। তাদের মধ্যে একজন ছিল গাট্টাগোট্টা পালোয়ানের মতো। সে সময় (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯২৪) ম্যালেরিয়া হওয়ায় আমাদের হাসপাতাল যেতে হয়েছিল। এই লোকটি হাসপাতালের বারান্দায় বসেছিল, ওঠার সময় যখন তাকে মাটিতে দুই হাত রেখে উঠতে হল, তখন আমাদের সন্দেহ হল। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম তাকে তেলের ঘানিতে কাজ দেওয়া হয়েছিল; সেখানেই তাকে মারধর করা হয়েছে। মারধর করার সময় জেলের কর্মচারী লক্ষ রাখত যাতে শরীরে মারের কোনো চিহ্ন না থাকে, তাই কম্বল জড়িয়ে ভোঁতা কোনো জিনিষ দিয়ে মারধোর করা হত, তাতে ব্যথা বেশী হয় কিন্তু আঘাতটা লাগে ভেতরে। পরদিন শুনলাম যে সেই আহীর মরে গেছে। চাইবাসার দিক থেকে এক বাঙালিবাবু তহবিল তছরূপের মামলায় সাজা পেয়ে এসেছিলেন। তাঁর বড় ভুঁড়ি ছিল, তাই চলাফেরা সহজ ছিল না। বেচারার পক্ষে বেশীদূর পর্যন্ত চলাফেরা কঠিন ছিল, তার ওপর তাঁকে দেওয়া হল ঘানি

১। হাজারীবাগ জেলের অধিকাংশ ওয়ার্ডের কামরাগুলি মাঝে দেওয়াল তুলে সেল-এ পরিণত করা হয়েছে। বাংলা এবং পাঞ্জাব এর বিপ্লবীদের জন্য এটা করা হয়েছিল।

টানতে। কাজ করবে কি করে? মার খেতো। তিনিও দু-তিনবার হাসপাতাল হয়ে এসেছেন। পরে তাঁর কি অবস্থা হল আমার জানা নেই।

খুন, ঘুষ ও অত্যাচারে ঐ সময়ের হাজারীবাগ জেল অদ্বিতীয় হয়ে উঠেছিল। জামসেদপুর থেকে এক গুজরাটি যুবক শ্রমিক আন্দোলনের জন্য কয়েদ হয়ে এসেছিল। তাকে যে কতবার বেত মারা হয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই, হাতকড়ি, ডাণ্ডাবেড়ির কথা আর কি বলব? শেষ পর্যন্ত সে পাগল হয়ে গিয়েছিল।

হাজারীবাগ এসে আমি সবচেয়ে প্রথম এক ইংরেজ বইকে ভিত্তি করে বাচ্চাদের জন্য গল্পের আকারে জ্যোতির্বিদ্যার (জ্যোতিষ নয়) একটা ছোটমতো বই লিখি। শাহাবাদ জেলার পণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণ মিশ্র জেল থেকে ছাড়া পেয়ে যাওয়ার সময় বইটি নিয়ে গিয়েছিলেন; কিন্তু সেই বই আমি আর পাইনি। 'বাইসবী সদী'র পরে আমার সময় কাজে লাগালাম জ্যোতির্বিদ্যার একটি বড় গ্রন্থ ও গ্রহ-নক্ষত্রের একটি চিত্র রচনায়। আমি সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষায় জ্যোতির্বিদ্যার কিছু গ্রন্থ আনিয়ে নিলাম। কিছু পুরনো পারিভাষিক শব্দ নিয়ে ও কিছু নতুন শব্দ বানিয়ে বই লিখতে শুরু করলাম। এতে গ্রহগণিত, নক্ষত্র, নীহারিকা, ধূমকেতু ইত্যাদির ওপর অনেকটা লেখা হয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে নভোমণ্ডলের বড় বড় চিত্রও দিলাম। দুটোতে উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের নক্ষত্রমণ্ডলের হাজার হাজার তারাকে দেখিয়েছিলাম, তৃতীয়টিতে পাটনার অক্ষাংশে যে সব তারা চোখে পড়ে তা দেখিয়েছিলাম। ৯০ (অক্ষাংশের) ওপরের নক্ষত্রমণ্ডলের মধ্যে চল্লিশটির মতো নক্ষত্রের নাম সংস্কৃতে পাওয়া যায়। অনেক নক্ষত্র যা ভারতের দক্ষিণের শেষ সীমা থেকেও দেখা যায় না তাদের নাম কি করে থাকবে। আমি এদের সবাইয়ের নাম রাখলাম। ইংরেজীতে ছোট ও বড় তারা গোনার জন্য সংখ্যা ছাড়া গ্রীক ও অন্যান্য অক্ষর ব্যবহার করা হয়। আমি সে সব জায়গায় ব্রাহ্মী ইত্যাদি অক্ষর ব্যবহার করেছিলাম। গ্রন্থের অনেক অংশ শুধুই অনুবাদ ছিল, প্রথম প্রয়াস হওয়ায় লেখার ধরনেরও খুব বেশী ত্রুটি থেকে গিয়ে থাকবে, কিন্তু এই বই লেখায় আমার নগদ লাভ হচ্ছিল—আমি যে জেলে ছিলাম তা ভুলেই গিয়েছিলাম। পেন্সিল, কম্পাস নিয়ে নকসা আঁকতে দেখে সবাই জেনে গিয়েছিল যে আমি জ্যোতিঃশাস্ত্র সম্পর্কে কোনো বই লিখছি। সেপাই বেচারারা গণিত জ্যোতিষ ও ফলিত জ্যোতিষের মধ্যে পার্থক্য কি করে বুঝবে? তাদের ধারণা হয়েছিল যে জ্যোতিঃশাস্ত্রের ওপরই বই লিখছি। হিন্দুদের উঁচু জাতির মধ্যে যেখানে বাচ্চাকে কচি বয়সে বিয়ে দেওয়ার জন্য ধনীরা ছোটাছুটি করে, সেখানে গরীবেরা অনেক কষ্টে বাড়ি-জমি বেচে সেই টাকায় একটি খুকীকে কিনে বিয়ে করে নিয়ে আসে। তাদের মধ্যে অনেকে তো বিয়ে না করে থাকতে বাধ্য হয়, তা যদি দেখতে হয় তবে পুলিশ ও জেলের সেপাইদের গিয়ে দেখুন। একদিন বিকেলে এক অস্থায়ী জমাদার এসে সবিনয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন—'বাবা, এই যে দুটো তারা একসঙ্গে দেখা যাচ্ছে, তার কি ফল?' আমি যখন এ বিষয় আমার অজ্ঞানতা প্রকট করলাম, তখন তাঁর বিশ্বাস হল না, আর বললেন, 'লোকে তো বলে এবার খুব ভাল লগ্ন এসেছে, অনেক বিয়ে হবে।' পৃথিবীতে বিয়ের চেষ্টা করে করে হয়রান হয়ে গেছে, তাই এখন তার নজর গেছে আকাশের তারার দিকে।

মিষ্টার মীক আমাকে কিছু উপন্যাস পড়তে দিয়েছিলেন। হয়তো সেই সময় জ্যোতির্বিদ্যার বই লেখার কাজ শেষ হয়েছিল। আমি সময় কাটাবার জন্য সাহস যাত্রা সম্বন্ধী চারটি উপন্যাসকে হিন্দিতে স্বাধীনভাবে পরিবর্তন করে লিখলাম যা পরে 'সোনেকী ঢাল' ইত্যাদি নামে ছাপা হয়েছিল।

১৯২৪-এর কোনো মাসে 'তরুণ ভারত' (হিন্দি সাপ্তাহিক, পাটনা)-এর মালিক লালবাবু ও

তাঁর মুদ্রক হনুমান পণ্ডিতও কোনো লেখার জন্য সাজা পেয়ে চলে এসেছিলেন। বাইরের লালবাবুকে অনেক প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে দেখেছি, কিন্তু এখানে একসঙ্গে থাকার সুযোগ হল। তিনি চৌধুরী-টোলার (পাটনা) এক ধনী পরিবারের ছেলে। জাতীয় কাজে টাকা খরচ করায় তাঁর কোনো প্রকার সংকোচ ছিল না। অনেকে তাঁর সবল উদার হৃদয়ের অনুচিত সুযোগ নিচ্ছে, একথা তিনি বুঝতে পারতেন না, তাই আগের অভিজ্ঞতা থেকেও তিনি লাভবান হতে পারতেন না। তিনি আমাকে তাঁর সুখ দুঃখের কথা বলতেন এবং আমিও তাকে বাস্তব জীবনের সঙ্গে পরিচয় করানোর চেষ্টা করতাম। কিন্তু আবার বাইরের খোশামুদেদের ও প্রতারকদের ফেরে পড়ে আমার সঙ্গে আলোচনার পর আমার যে নির্দেশ তিনি নোট করে নিতেন তা তিনি মনে রাখতেন কিনা আমার সন্দেহ ছিল। কিন্তু আমার একটা কথা তিনি মনে গেঁথে রেখে দিয়েছিলেন—তিনি তাঁর ছেলে মদনমোহনকে এন্‌জিনিয়র বা ঐ ধরনের কোনো উৎপাদক দেশের জন্য উপযোগী বিদ্যা শেখানোর জন্য বিদেশে পাঠাবেন। তাঁর সঙ্গী বেচারা হনুমান পণ্ডিত তো পস্তাতেন; লোকেরা খোশামোদ করে অন্যকে ফাসিয়ে কিছু আদায় করে নেওয়ার জন্য, কিন্তু এই বেচারা নিজেই ফেসে গিয়েছিল। পুরোহিতজী কি করে জানবেন যে 'তরুণ ভারত'-এর মুদ্রক হিসেবে তাঁর নাম ছাপা হওয়াটা এমন বিপজ্জনক ব্যাপার? তবু লালবাবু পান ভোজনের ব্যাপারে তাঁর খেয়াল রাখতেন, তিনি বাড়ির চিন্তায় যাতে ব্যাকুল না হন সেজন্য তাঁকে প্রসন্ন রাখতে চেষ্টা করতেন।

আশ্বিন-কার্তিক মাসে আমি, পণ্ডিত পারসনাথ ত্রিপাঠী, লালবাবু হনুমান পণ্ডিত এই চারজন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ায় আমাদের হাসপাতালে যেতে হয়েছিল। আমাদের জ্বর কমে যাওয়ায় আমাদের লেবু দিয়ে পটলের সুপ দিতে লাগল। লালবাবুর জ্বর আগের মতোই ছিল কিন্তু তিনি জিভকে সংযত রাখতে পারতেন না। ভাল হয়ে যাওয়ায় আমাদের ওয়ার্ড নম্বর ১-এ পাঠিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু লালবাবু হাসপাতালেই থেকে গেলেন। যদি আমি তাঁর সঙ্গে থাকতাম তবে তাঁর কুপথ্য করা বন্ধ করতে পারতাম, কিন্তু হাসপাতালে থাকা তো আমার হাতে ছিল না। যারা হাসপাতালে যাতায়াত করত তাদের কাছে আমি বরাবর তাঁর খবর নিতাম, কিন্তু একথা কখনো আমার মনে হয়নি য, এই লম্বা চওড়া স্বাস্থ্যবান বলিষ্ঠ ভব্য তরুণ শরীর আর দেখতে পাব না। লালবাবু চলে গেলেন, সঙ্গে নিয়ে গেলেন তাঁর মনের অনেক মধুর সাধ।

পণ্ডিত পারসনাথ ত্রিপাঠীকে আমি বড় ভাই বানিয়েছিলাম, 'বাবাকে' ছোট ভাই বানাতে তিনি তৈরি ছিলেন। কোথায় তাঁর অভ্যেস পূজাপাঠ, কথায় কথায় ভগবতীর নামের দোহাই, আর কোথায় আমি এই সবের কট্টর বিরোধী। আমি তাঁকে মিঠে করে খোঁচা দিতাম, তাঁর ভক্তগিরি নিয়ে মজা করতাম কিন্তু তা তিনি কখনো খারাপ ভাবে নিতেন না। বছরখানেক আমরা এক সঙ্গে ছিলাম কিন্তু আমার এমন একটা দিনও মনে পড়ে না যখন আমরা মুখভার করেছিলাম। বাড়িতে তাঁর বড় ভাই পরিবারের কাজ সামলাতেন এবং তিনি তাঁর অবলম্বন ছিলেন। বড় ভাইয়ের কোনো সন্তান ছিল না। ছোট ভাইয়ের (পারশনাথ) ওপর তাঁর অসম্ভব স্নেহ ছিল। দেখা করার সময় হলে তিনি শাহপুর পট্টী (আরা জেলা) থেকে হাজারীবাগ জেলে আসতেন; সঙ্গে আচার, মিষ্টি ও এক সপ্তাহের জন্য ঠেকুআ, পকৌড়ী ও আরো অনেক জিনিষ নিয়ে আসতেন। বৌদির হাতের মিষ্টি জিনিষ পারসনাথের মিষ্টি কথায় আরো মিষ্টি হয়ে যেত। সির্কায় দেওয়া পেঁয়াজ আমার খুব ভাল লাগত এবং পারসনাথ দুটি একপোয়া শিশি তার জন্য আলাদা করে রাখতেন। লেখাপড়ার জন্য আমাদের নির্দিষ্ট সময় ছিল। তারপর আমাদের সময় কাটত আলাপ-আলোচনা ও চিত্তবিনোদনে। তিনি খুব সুন্দর কথাবার্তা বলতেন।

হাজারীবাগ জেলে আমার এক বছরেরও বেশী কেটে যাওয়ার পর জেলের জন্য আলাদা

স্থায়ী সুপারিন্টেন্ডেন্ট নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয় সরকার এবং ক্যাপ্টেন অংগরকে সুপারিন্টেনডেন্ট নিযুক্ত করে পাঠায়। সাপ্তাহিক প্যারেডের সময় একবার তাঁকে দেখতাম কিন্তু অন্য কোনো সময় তাঁর সঙ্গে কথা বলার দরকার হয়নি। তিনি আসায় জেলের কয়েদীরা খুব খুশী হয়েছিল, বিশেষ করে যখন তারা শুনেছিল যে মীকের পরামর্শ থেকে তাঁর বুদ্ধি স্বতন্ত্র। কয়েদীরা ভাল ভাত পেতে লাগল, তরকারি থেকে ঘাস উধাও হল, রুটির রঙ, চেহারা ও পরিমাণ বেড়ে গেল। নিজের প্রতিপত্তি কায়েম রাখার জন্য মীক সাহেব ও তাঁর অনুচরেরা প্রতি সপ্তাহে দু-তিন জনকে যে বেত্রাঘাতের সাজা দিতেন, তাও কমে গেল। কয়েকবার অংগর সাহেব চুপিসারে অপ্রত্যাশিতভাবে জেলের ভেতরে এসে কাজকর্ম দেখাশোনা করতেন। মীক সাহেব ও অত্যন্ত সতর্ক থাকতে লাগলেন। তিন চারমাস কাটতে কাটতেই অংগর সাহেবের প্রথম দিকের তৎপরতা কমে গেল। কয়েদীরা বলতে লাগল—অংগর সাহেবের মেম ইংরেজ। মীক সাহেবের মেম ও মেয়ে (স্ত্রীর মেয়ে) অংগরের স্ত্রীর খোশামুদী শুরু করেছে, মীকের মায়াজাল থেকে কে বেরিয়ে আসতে পারে? জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার সময় সত্যিই আমার এই বিশ্বাস ছিল না যে অংগর সাহেব জেলের সব রহস্য বুঝে নিয়ে সময়ের প্রতীক্ষা করছেন, আর তিনি কয়েক মাসের মধ্যেই মীককে এমনভাবে পাকড়াবেন যে সে গুলি করে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হবে।

হাজারীবাগ জেলে আমার দু'বছরের কয়েকদিন কম সময় এত তাড়াতাড়ি কেটে গেল যে আমি টেরই পেলাম না। এর আগে জীবনের কোনো দুটি বছর এমন মন-প্রাণ দিয়ে লেখাপড়া করায় এমন ব্যস্ত থাকিনি। লেখাপড়া ছাড়া কিছুটা ফরাসী ও অবেস্তা ও আমি অভ্যাস করেছিলাম। আমার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বিস্তৃততর হয়েছিল। আর্যসমাজী মতবাদের কট্টরতা হ্রাস পেতে লাগল এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি টান বাড়ল। বেদের অভ্রান্ততা সম্পর্কেও সন্দেহ হতে লাগলো, কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস এখনো ছিল। ভাই রামগোপালের পত্র আসত, আর জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার সময় আমি সোৎসাহে লাহোরে তাঁর কাছে একটা চিঠি লিখলাম। রামগোপালজী মরে গেছে, এই লেখা নিয়ে কিছুদিন পরে যখন সেই পত্র ফিরে এল তখন কয়েকদিন পর্যন্ত আমার কোনো কাজে মন লাগেনি।

১৮ এপ্রিল (১৯২৫) দু'বছরের পুরো সাজা ভোগার পর হাজারীবাগ জেল থেকে আমাকে ছেড়ে দেওয়া হল।

৮

রাজনৈতিক শিথিলতা (১৯২৫ খ্রীঃ)

ছাপরায় আমি দু বছর পরে পৌঁছলাম। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, জেলা কংগ্রেস কমিটির মানপত্রগুলি পেয়ে আমি প্রসন্ন হতে পারলাম না, যখন দেখলাম চারদিকে রাজনৈতিক শিথিলতা। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ছিল কংগ্রেসের হাতে, মৌলানা মজহরুল হক এর মতো লোক তার চেয়ারম্যান ছিলেন।

এতে সন্দেহ নেই যে হক সাহেবের প্রেরণা ও ডেপুটি ইন্‌সপেকটর বাবু রাধিকাপ্রসাদের সহযোগিতায় শিক্ষার ক্ষেত্রে সারন ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড অনেকটা এগিয়ে ছিল। গোটা জেলায় বিনা বেতনে মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। জেলায় খুব কম জায়গাই ছিল যেখানে ছেলেদের পাঠশালায় যাওয়ার জন্য এক মাইলের বেশী যেতে হত। এতটা হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য—আত্মীয় স্বজন ও সমর্থকদের ঠিকাদারী ও অন্যান্য আর্থিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার জন্য মেম্বররা নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করত। (২৮ এপ্রিল) ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের দেওয়া মানপত্রের উত্তরে আমি সদস্যদের এই ধরনের মনোবৃত্তির জন্য শুধু তিরস্কারই নয়, ধমকও দিই যা হকসাহেবের মতো বয়োবৃদ্ধের সামনে উচিত ছিল না। তিনি খুব মিষ্টি কথায় এই অনধিকার চর্চার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। সাধারণভাবে এ বিষয়ে না জানা ছাড়া এর আর একটি কারণ ছিল দু-বছর জেলে নির্জনবাস।

পুরনো কর্মীদের মধ্যে অনেকেই কাজ ছেড়ে বসে গিয়েছিলেন। পণ্ডিত গোরখনাথ ত্রিবেদীর মতো অনেক লোক যারা ওকালতি ছেড়ে চলে এসেছিলেন, তাঁরা পরীক্ষা পাশ করে ওকালতি শুরু করে দিয়েছিলেন। বাবু বিশ্বেশ্বর প্রসাদ, শিব প্রসাদ সিংহ, মহেন্দ্রনাথের মতো অনেক অসহযোগী ছাত্র আবার কলেজের পড়া শুরু করে দিয়েছিল। দেশে যত্র তত্র হিন্দু মুসলমান বিবাদ শুরু হয়েছিল এবং মুসলমানেরা জাতীয় আন্দোলন থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল। হিন্দু সভাও প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল যত্রতত্র। যে সব সংস্থা আমাকে মানপত্র দিয়েছিল তাদের মধ্যে সারণ জেলার হিন্দুসভাও ছিল, কিন্তু আমি তাদের নিরাশ করেছিলাম। আমার বন্ধুরা আমাকে প্রাদেশিক হিন্দু সভার উপ সভাপতি নির্বাচিত করেছিল, কিন্তু আমি এক-আধবারের বেশি তাদের বৈঠকে যাইনি।

আগে জেলায় সফর করা জরুরী ছিল, তাই গরমের কোনো পরোয়া না করে আমি বেরিয়ে পড়লাম। একমা, সিসওয়ানে তখনো কর্মী ছিলেন এবং কাজও চলছিল। মীরগঞ্জ, ভোরে থানায়, কিছু সভায় বক্তৃতা দিয়ে আমি কটয়া পৌঁছলাম। বৈশাখী পূর্ণিমা কাছেই ছিল, অতএব বুদ্ধের নির্বাণ লাভের দিন বুদ্ধের নির্বাণ লাভের স্থান কসয়া যাওয়ার ইচ্ছা হল। খুরহরিয়ার বাবু মহাদেব রায় তাঁর হাতিটি দিলেন, এবং ১৩-মের রাত্রিতে আমি কসয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলাম। রাত শেষ হতে তখনো দু-ঘণ্টা বাকী, চাঁদনী রাতে কিছুটা দূরে একটা হাতি আসছে দেখতে গেলাম। তার মাহুতকে তো দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু হাতিটির আকার অসাধারণ এবং অত্যন্ত তীব্রগতি। আমার মাহুত ভয় পেল,—কোনোভাবে হাতিটি দেখতে পেলে, আমরা নেমে পালাতে পারলেও, আমাদের হাতিটিকে মেরে নিশ্চয়ই খুব জখম করে দেবে। কিছুদূর পর্যন্ত হাতিটা আমাদের দিকে এসে অন্যদিকে মোড় নিল, সে সময় সেই হাতির পিঠে আরোহীদেরও দেখতে পেলাম, তখন আমাদেরও ধড়ে প্রাণ ফিরে এল। কসয়াতে দুয়েক বছর থেকে বৈশাখী পূর্ণিমায় (বুদ্ধের নির্বাণের দিন) মেলা বসছিল। আমার দেখে আনন্দ হল যে যেখানে ১৯২০-তে এখানকার বুদ্ধমূর্তিকে বর্মীদের দেবতা মনে করায় এখানকার লোকজনদের কোনো প্রকারের শ্রদ্ধা প্রদর্শনের কোনো প্রশ্নই ছিল না, বরং এক ধরনের ঘৃণা প্রদর্শন করতো, সেখানে এখন পূজার্থীদের ভিড়ের চাপে মন্দিরে ঢোকা মুশকিল হয়ে উঠেছিল। মন্দিরের বাইরের দ্বারে দুই কাতারে মালিরা ফুল-বাতাসা বিক্রি করছিল। মহাস্থবির চন্দ্রমণির সঙ্গে দেখা হল। পাঁচ বছর পরে এখন তাঁকে অনেকটা বেশী বৃদ্ধ মনে হচ্ছিল। এখানে এক যুবক বৌদ্ধ ভিক্ষু (বাসব) ছিলেন। আমি চম্পা বাবাকে (চন্দ্রমণি) বললাম যে ওঁর সংস্কৃত শিখে ভারতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করা উচিত। তিনি তাই তার সংস্কৃত পড়ার ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য যুবকটিকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন। কটয়া থেকে আমরা জালালপুর (কুচায়কোট) এলাম। রুদ্রনারায়ণ খুব

তৎপরতার সঙ্গে কাজ করছিলেন, তিনি থানা থেকে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে নির্বাচিত হয়। বরৌলিতে গেলাম, সেখানে এখনো শিবপ্রসাদ বাবু কাজে লেগেছিলেন, যদিও তার কলেজের পড়া শেষ করে আসার ইচ্ছা ছিল, আর রাষ্ট্রকর্মীর তা অবশ্য করা উচিত—তাই আমিও তাকে উৎসাহিত করেছিলাম। রেওতিথ থেকে এগিয়ে দিঘওয়াতে গুর্জর প্রতিহারদের প্রসিদ্ধ তাম্রপত্র এনে পড়ার চেষ্টা করলাম। জেলে নক্ষত্র মণ্ডলের চিত্র তৈরি করার সময়ই আমি ব্রাহ্মীলিপির অভ্যাস করে নিয়েছিলাম, কিন্তু এই তাম্রলিপি ছিল অন্য লিপিতে। গুরুকুল হরপুরজানে গুরুকুল ভৈসপালের আচার্য স্নাতক যুধিষ্ঠির উঠেছিলেন, তিনি সাগ্রহে বর্মীভিক্ষুকে সংস্কৃত পড়ানোর জন্য তাঁর সঙ্গে নিয়ে গেলেন। বাসব সংস্কৃতের প্রথমা পরীক্ষা পাস করেছিল এবং ভাল ভাবে হিন্দি পড়তে ও বলতে শুরু করেছিল। সেই সময়ে যুবক বেচারীকে পেটের রোগে ধরল যার ফলে তার মৃত্যু হল।

'হসরত উন গুঞ্চোপে হ্যায় জো বিন খিলে মুরঝা গয়ে।'*

১৫ আগষ্ট আমি একমা থেকে ট্রেনে উঠে কুয়াড়ীর দিকে যাচ্ছিলাম। হাজারীবাগ জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সেই ট্রেনে পঞ্চানন তিওয়ারীও আসছিলেন। তাঁর কাছ থেকে মীকের আত্মহত্যার খবর জানলাম। মীরগঞ্জ (হথুয়া) স্টেশনে নেমে দেখলাম সেখানে মহাবীরের ঝাণ্ডার মিছিল বেরিয়েছে। বাজার হয়ে যখন সীওয়ান থেকে যে সড়ক এসেছিল সেখানে পৌঁছলাম, তখন ঝাণ্ডার মিছিল কাছে আসতে দেখলাম। মফঃস্বল শহরে খুব উত্তেজনা ছিল যে আজ হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হবে। 'মসজিদের' সামনে বাজনা বাজানো চলবে না—এই ছিল মুসলমানদের দাবি, অন্যদিকে হিন্দুরা একে নিজেদের ধর্মের অবমাননা বলে মনে করত। মহাবীরের ঝাণ্ডার সার্বজনীন প্রচার সদ্য হতে শুরু করেছিল এবং মুসলমানদের উপর নিজেদের দাপট দেখবার ব্যাপারটাও কাজ করছিল। দেখলাম আমার পরিচিত এক পাঞ্জাবী উদাসী সাধু গেরুয়া কাপড় পরে মিছিলের আগে আগে যাচ্ছিলেন। তিনিই ঝাণ্ডা বার করার প্রেরণা দিয়েছিলেন এবং তার সংগঠনও করেছিলেন। সড়ক থেকে ছোট রাস্তা যেখানে বাজারের দিকে ঘুরে, আবার এগিয়ে মসজিদ পর্যন্ত পৌঁছয়, সেখানে এসে উত্তেজিত জনতার মধ্য থেকে কিছু লোক বাজারের দিকে মোড় নেয়। আমি যখন সেদিকে যেতে গেলাম, তখন স্বামীজী আমার হাত ধরে সেদিকে যেতে বারণ করলেন। আমি বললাম—এই সময় উত্তেজিত ভিড়কে শান্ত রাখা প্রয়োজন। স্বামীজী আগুন তো লাগিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এখন তিনি মার খাওয়ার ভয়ে থর থর করে কাঁপছিলেন। হাত না ছাড়ায় তার কাপুরুষতা দেখে আমার বড় রাগ ও ঘৃণা হল, আর আমি জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঐদিকে চলে গেলাম। ভিড়ের কিছু লোক আগে চলে গিয়েছিল। সামনে দিয়ে যখন তারা যাচ্ছিল, তখন মসজিদ থেকে ইট বর্ষণ করা হতে লাগল। তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে মিছিলের লাঠিয়ালরা লাঠি চালাতে শুরু করে। হিন্দুরা সংখ্যায় বেশী ছিল, মুসলমানরা কম, তাই তাদের পালাতে হল। এবার সবাই তাড়া করে তাদের মারতে শুরু করল। মফঃস্বল শহরের সব জায়গায় একা আমি কি করে পৌঁছব, কিন্তু আমি কয়েকজন মুসলমানের

*আফসোস সেই ফুলের জন্য যে ফোটার আগেই শুকিয়ে গেল।

শরীর নিজের শরীর দিয়ে ঢেকে তাদের বাঁচালাম। উত্তেজিত লাঠিধারী হিন্দুরা দাঁতে দাঁত পিষে আমাকে সরে যেতে বলছিল, কিন্তু আমারও নেশা ধরে গিয়েছিল আর মারের ও মৃত্যুর বিন্দুমাত্র ভয়ও আমার মনে না রেখে আমি নিরস্ত্র মুসলমানদের রক্ষা করছিলাম। আমার কালো আলখাল্লা, আমার নাম ও আমার রাজনৈতিক কাজকর্মের কথা সবাই জানত, তাই আমার গায়ে হাত দেওয়ার সাহস কেউ করেনি। ইতস্তত লুকিয়ে থাকা মুসলমানদের সুরক্ষিত জায়গায় নিয়ে যাওয়াটা, তাদের রক্ষা, আর গ্রামের শান্তির জন্যও অত্যন্ত জরুরী ছিল। পুলিশের ভয় ছিল এই যে, কোনো মুসলমানকে থানায় নিয়ে যাওয়ার সময়ও হিন্দুরা তাকে ছিনিয়ে মারধর করতে পারে। এই সময় থানার লোকেরা আমার উপস্থিতি ও মুসলমানদের রক্ষা করার কাজের কথা জানতে পারে। বিপজ্জনক স্থান থেকে বিশেষ করে মসজিদের কাছাকাছি বাড়ি ঘর থেকে মুসলমানদের থানায় পাঠানোর জন্য দারোগা আমার সাহায্য চান। আগে আগে আমাকে যেতে দেখে কোনো হিন্দু মারপিট করতে সাহস করেনি। সন্ধ্যা নাগাদ দাঙ্গা থেমে যায়। কিন্তু তবু উত্তেজনা ছিল। এর মধ্যে প্রাদেশিক কাউন্সিলের মেম্বর সীওয়ানের মৌলবী গণীও এসে যান। দাঙ্গার জন্য হিন্দুদের প্রস্তুত করায় ঐ স্বামীজীর যতটা হাত ছিল, লোকেরা বলছিল মুসলমানদের প্রস্তুত করায় মৌলবীরও ততটাই হাত ছিল; কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করতে পারিনি। আগে গণী সাহেব কংগ্রেসের আমার সহকারী ছিলেন, এদিকে দু বছর যে ঝড় বয়ে গেছে আমি তার কিছুই জানতাম না। আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে বাজারের সেই তিনরাস্তার মোড়ে পৌঁছলাম যেখান থেকে একটা সড়ক মসজিদ পর্যন্ত গেছে। আমরা দুজন একটা খাটিয়ায় বসে লোকজনদের বোঝাচ্ছিলাম। আমি সে সময় জানতাম না যে কিছু হিন্দু সেই মৌলবীর ওপর গায়ের ঝাল ঝাড়তে চাইছিল। যা হোক্, আমাকে সঙ্গে দেখে তারা তা করতে চায়নি। হয়তো মৌলবি গণী মুসলমানদের দাঙ্গার জন্য তৈরি করেননি, কিন্তু পৃথক নির্বাচনে কাউন্সিল নির্বাচনের সাফল্যের জন্য নিজেকে সবচেয়ে বেশী মুসলমান হিতৈষী বলে চিহ্নিত করা তাঁর পক্ষে আবশ্যিক ছিল; এবং হয়তো তাই তাঁর সম্পর্কে এই ধারণা হয়েছিল।

তখন পর্যন্ত আমার মধ্য থেকে হিন্দুয়ানির গন্ধ উবে গিয়েছিল, এমন তো বলতে পারি না, কিন্তু এর অনেক আগের 'বাইসবী সদী' লেখার সময় থেকেই আমি হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে খাওয়া দাওয়া ও বিয়ের পক্ষপাতী হয়ে গিয়েছিলাম। এভাবে মীরগঞ্জে আমি যা কিছু দেখেছিলাম তাতে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গা বাঁধিয়ে দেওয়া নেতাদের প্রতি আমার ঘৃণা জন্মে গেল। এক দিকে যদি আমি সেই কাপুরুষ স্বামীজীকে দেখতাম, তবে অন্যদিকে দেখতাম মসজিদের কাছের এক বাড়িতে লুকিয়ে থাকা এক গাট্টাগোট্টা মুসলমানের মুখ, যে আস্ফালন করে দাঙ্গা বাঁধানোর জন্য এগিয়ে এসেছিল, আর যখন তাকে বাড়ি থেকে বার করে সুরক্ষিত স্থানে যাওয়ার কথা বলা হল, তখন সে সন্ত্রস্ত পশুর মতো গড়াগড়ি দিয়ে সেখানে না পাঠানোর জন্য হাতে পায়ে ধরছিল।

অসহযোগ ও জাতীয় আন্দোলন যখন প্রবলভাবে চলছিল, তখন ভোরে-কটয়ার পুলিশ কিছুটা নরম হয়ে পড়েছিল, কিন্তু এখন রাজনৈতিক শিথিলতার সময় তারা আবার জুলুম করা শুরু করেছিল। নতুন নির্বাচনে আমি জেলা-কংগ্রেসের উপসভাপতি পদ গ্রহণে রাজী হয়েছিলাম, আর ডাক্তার মাহ্‌মুদকে আমরা সভাপতি বানিয়েছিলাম। যিনি হালে ছাপরায় প্র্যাক্‌টিস শুরু করেছিলেন। অসহযোগী পুলিশ সাব-ইন্‌স্‌পেকটর বাবু রামানন্দ সিংহ ছিলেন আমাদের সেক্রেটারি। জেলা কংগ্রেসের সারা কাজ এসে পড়েছিল রামানন্দবাবু ও আমার ওপর। পণ্ডিত গোরখনাথ ত্রিবেদী এখন ওকালতি করছিলেন। ছাপরাতে প্রথম যখন আমি রাজনৈতিক কাজে যোগ দিতে এসেছিলাম, সেইদিন থেকেই আমাদের দুজনের ঘনিষ্ঠতা বেড়ে

প্রসাদজী সর্বদা জানকীদেবীর খোঁজ-খবরও নিতেন। আমাদের ইচ্ছে ছিল জানকীদেবী শহরে কোথাও পড়ান এবং তিনি নিজেও আরো কিছু পড়াশোনা করেন। বলদেওজী দিল্লিতে তাঁর জন্য জায়গাও ঠিক করে রেখেছিলেন, কিন্তু শিশুপুত্রকে নিয়ে টাকা পয়সার ব্যাপার গুছিয়ে সে সময় তিনি যেতে রাজী হননি।

আমি লেখা সত্ত্বেও বলদেওজী বি· এ· পরীক্ষা দেননি এবং কলেজ ছেড়ে দিলেন, আমি আগেই তা লিখেছি। ১৯১৫-এব শেষে আগরা মুসাফির বিদ্যালয়ে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল, যা ১৯২৬-তে লাহোরে দেখা হওয়ার পর আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে লাগলো। নিজেদের আদর্শকে মজবুত কবতে এবং সেই অনুযায়ী আমাদের চলার সংকল্পকে দৃঢ় করতে আমাদের সেই সময়ের আলাপ-আলোচনা অত্যন্ত সহায়ক হল। বলদেওজী আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন, আমার ওপর তার খুব বিশ্বাসও ছিল, আর আমি তাঁকে আমাব কয়েকজন ঘনিষ্ঠ মিত্রদের অন্যতম বলে মনে কবতাম। বলদেওজী অসহযোগ করে সাববমতী আশ্রমে চলে গেলেন। প্রথমবার জেলে যাওযার পর লাহোরেব কৌমী বিদ্যালয় থেকে তিনি বি· এ· পরীক্ষা পাস করলেন। যখন লালা লাজপত রায় তাঁর নিজস্ব লোকসেবক সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন, তখন বলদেওজী তার সদস্য হন; আর আজকাল মীরাটে তিনি অচ্ছুত উদ্ধার ও জাতীয় কাজ করছিলেন।

বলদেওজীর সঙ্গে আমিও মীরাট চলে এলাম। তাঁর কুমার আশ্রম ছিল শহরের বাইরে, যেখানে অস্পৃশ্য জাতির কিছু ছেলের থাকার ব্যবস্থা ছিল। ভগ্নী মহাদেবীজী আর্য সমাজের কন্যা পাঠশালায় পড়াতেন। মীবাট জেলা ছিল সেই অঞ্চলে যেখানকার গ্রামীণ ভাষাই সাহিত্যিক হিন্দির ও উর্দুর বনিয়াদ, কিন্তু এখনো আমি ভাষাতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে এ বিষয়ে বিচার করার জন্য নিজেকে যোগ্য করতে পারিনি। তবে বলদেওজীর সঙ্গে বলদের গাড়িতে মওয়ানী, হস্তিনাপুর, পরীক্ষিতগড় ও আরো অনেক জায়গা দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। হস্তিনাপুরে বহুদূর পর্যন্ত ছড়ানো গঙ্গার চর এবং কিছু উঁচু-উঁচু টিলা দেখতে পেয়েছিলাম; পরীক্ষিতগড় একটি বেশ ভালো গ্রাম। আমার মন সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত হল খ্রিষ্টান মিশনারীদের এক কন্যা বিদ্যালয় দেখে, যেখানে অস্পৃশ্য মেয়েদেব পড়ানোর ব্যবস্থাও ছিল। পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ব্যক্তিগত পবিচ্ছন্নতা এবং ঘবকন্নার কাজও শেখানো হত। আমার কাছে তো হিন্দু হয়ে মনুষ্যত্ব থেকে বঞ্চিত হওয়ার পবিবর্তে তাদের এই জীবন অধিকতর শ্রেয় বলে মনে হয়েছিল।

মীরাটেই প্রথম শ্রী হরিনাম দাসের আজকের ভিক্ষু আনন্দ কৌশল্যাযন-এব সঙ্গে দেখা হল। দু-তিন দিন এক সঙ্গে থেকে কথাবার্তা বলার সুযোগ হল, কিন্তু তখন মনে হয়নি যে এই কথাবার্তা আমাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে। তাঁর শরীর তখনো কৃশ দুর্বল ছিল, সেই সময়ও তাঁর মানসিক-শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যের আভাস পাওয়া যেতো। তিনি আমাকে একটি আদর্শ বাক্য রচনা করতে বলেছিলেন, আমি লিখে দিয়েছিলাম, 'অসিনা গীতয়া চৈব জয়িষ্যে ভুবনত্রয়ম" (তরবাবি ও গীতার দ্বারা ত্রিভুবন জয় করব)। এখনো আমার ঈশ্বরে বিশ্বাস টলে যায়নি। কোনো সময়ে পড়া তিলকের গীতারহস্যের প্রভাবও চলে যায়নি। অসির (তরবারি) সিদ্ধান্তে আস্থা থেকেই বোঝা যাবে যে আমার ওপর গোটা গান্ধী যুগের কি নগণ্য প্রভাব পড়েছিল।

ভাই ভগবতী ও অভিলাষ চন্দ্র আজকাল এই জেলাতেই থাকতেন। অভিলাষ মেকানিক্যাল এন্জিনিয়ারিং পরীক্ষা পাশ করেছিল। কিন্তু তার সারা সময় কেটে যেত এক ধনী ব্যক্তির মোটর লরিগুলির দেখাশোনা করতে। যে স্ত্রীর জন্য সে নৈনাগড়' জয় করেছিল সে এখন তার

পায়ের বেড়ী হয়ে গেছিল, এখন তার আরো উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার ডানা কাটা গেছে। বিমানচালক হওয়ার বড় ইচ্ছা ছিল তার। এবং সেজন্য সে সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি ছিল, কিন্তু এখন তার জন্য অবকাশ তৈরী করে নেওয়া তার আয়ত্তের বাইরে ছিল। যদি সে স্বচ্ছন্দ একাকী থাকত, তবে সে তার জন্য বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরতে পারত, দেশ বিদেশে চষে বেড়িয়ে কোথাও না কোথাও সুযোগ পেয়েই যেত; কিন্তু স্ত্রীও ছোট বাচ্চাকে ছেড়ে যাবে কি করে? তাঁর দাম্পত্য জীবনও সুখময় ছিল না। স্ত্রীর সঙ্গে খুব ঝগড়াঝাটি হত, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে স্ত্রীর সঙ্গে সর্বদা এক থালাতেই খেত। অভিলাষের এই অবস্থা ও তাঁর অন্তর্নিহিত শক্তি দেখে আমার বড় আপসোস হল। আমি বলদেওজীর কাছে তার উল্লেখ করলাম। সে সময়ে তাঁর স্ত্রী ও বোন সেখানে ছিলেন। আমি বুঝতে পারিনি যে তিনি এ নিয়ে পরেরদিন অভিলাষের স্ত্রী এলে তাকে উপদেশ দিতে শুরু করবেন। উপদেশ শুনে স্ত্রী অভিলাষের ওপর অত্যন্ত রেগে যায়। এ জন্য অভিলাষ আমাকে কড়া কথা বলে ভর্ৎসনা করায় আমার ততটা দুঃখ হয়নি যতটা হল এই কথা ভেবে যে আমার সহানুভূতিতে অভিলাষ সান্ত্বনা পাওয়া তো দূরের কথা উলটে আমি তার মনোবেদনা বৃদ্ধির কারণ হলাম।

বলদেওজী গৃহস্থ জীবন ও সুখময় ছিল না। বিয়ে দেওয়া তো মা-বাবার কর্তব্য এবং তাঁর দশ বার বছরেই তাদের কর্তব্য সমাধা করেছিলেন। এখন সেই ছেলেকে সারা জীবন ধরে তার ফল ভোগ করতে হবে। তাঁর স্ত্রী নির্বোধ ও কলহপ্রিয়, আর তিনি স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করার কোনো উচিত অনুচিত পরিস্থিতিকে হাত থেকে ফসকে যেতে দিতেন না। বলদেওজীর স্বভাব গম্ভীর, মন শান্ত, কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা খিটিমিটির প্রভাব পড়বে না, তা হতেই পারে না। রাত-দিন জ্বলন্ত উনুনে পুড়ছে, আমি তাঁকে এমন তপস্বী বলে মনে করতাম, কিন্তু মানসিক সহানুভূতি—যা ভাষায় প্রকাশ করতেও আমার দ্বিধা হত—এছাড়া আমি আর কিই বা করতে পারতাম।

মীরাট থেকে জানুয়ারীর (১৯২৬) শেষে দিল্লি পৌছলাম। পাগলামি আবার ভর করেছিল আমার মাথায়। দিনে শহরে ঘুরতাম, আর দুয়েকটা রাত যমুনার তীরেই কাটিয়ে দিলাম। একটা কম্বল ছিল, শীতকেও কেটেছেটে আমি কম্বলের মতো করে নিয়েছিলাম। লালকেল্লা, জুম্মা মসজিদ, তুঘলকের কেল্লায় অশোকস্তম্ভ, নয়াদিল্লী, কুতুবমিনার প্রভৃতি দর্শনীয় স্থান দেখতে লাগলাম। সে সময় ফিরোজশাহের কেল্লা ভ্রমণ স্থান পরিণত করা হয়নি। কুতুবমিনার দেখে রাত্রিতে সেখানেই ধর্মশালায় থেকে গেলাম। এ্যাসেম্বলীর অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য মুজফ্‌ফরপুরের মৌলানা শফী দাউদী আজকাল দিল্লীতেই ছিলেন। একদিন তাঁর অতিথি হয়েছিলাম আর এ্যাসেম্বলীর উদ্‌ঘাটনের সময় ভাইসরয় লর্ড রীডিভের ছত্র চামরের অভিনয়ও দেখলাম। একদিন শহরে ঘুরে বেড়াবার সময় দেখলাম একটা মিছিল আসছে, তারপর ঘোড়াগাড়িতে শঙ্করাচার্য শ্রী ভারতী কৃষ্ণতীর্থ স্বামীকে দেখলাম। গিয়ে পা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম। তিনি আমাকে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন, আর তিনি আমাকে তাঁর বাসস্থানে যেতে বললেন। এখন হিন্দু সংগঠন, মুসলিম তঞ্জীমের জমানা শুরু হয়ে গিয়েছিল, অতএব এ সময়ে তিনি সেই কাজেই ব্যস্ত হয়েছিলেন। এবার তিনি নয়া দিল্লির সনাতন ধর্ম সভার বার্ষিক উৎসবে এসেছিলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে অধিবেশনে গেলাম, কিন্তু আমি বক্তৃতা দিতে রাজী হইনি, অন্তরে আর্যসমাজী মতবাদ রেখে আমি শুধু চুপ থেকেই সনাতন ধর্মীয় মূক নাট্যাভিনয় করাই সম্ভব ছিল।

স্বামী বেদানন্দজী এখন বেনারস ছেড়ে লাহোর চলে এসেছিলেন এবং গুরুদত্ত ভবনে দয়ানন্দ উপদেশক বিদ্যালয়ে অধ্যাপক ছিলেন, স্বামী স্বতন্ত্রতানন্দ ছিলেন সেখানে আচার্য।

আমিও গুরুদত্ত ভবনে উঠলাম। পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় আবার নতুন করে জাগ্রত করার অবসর পেলাম। পণ্ডিত ভগবদদত্তজী ডি· এ· বি· কলেজের লাইব্রেরীর অনেক উন্নতি করেছিলেন। ভারতীয় সংস্কৃতির অনুসন্ধান সম্পর্কিত দেশী বিদেশী মুদ্রিত রচনা ছাড়াও তিনি অনেক হস্তলিখিত গ্রন্থ সংগ্রহ করেছিলেন এবং আরো অনেক সংগ্রহ করে চলেছিলেন। তাঁর অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, দয়ানন্দের পথের প্রতি তাঁর অনুরাগ আগের মতোই দৃঢ় ছিল। আমার শাস্ত্রী পরীক্ষার সময়ের প্রতিভাশালী ছাত্র শ্রীচিম্মনলাল এখন পণ্ডিত বিশ্ববন্ধু শাস্ত্রী। আজীবন সদস্য হয়ে কলেজের সেবা করছিলেন। বিশ্ববন্ধুজী এম· এ· তে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছিলেন। বিদেশে পড়াশোনা করার জন্য তিনি সরকারী ছাত্রবৃত্তি পেয়েছিলেন। কিন্তু তা নিতে তিনি রাজী হননি। ডক্টর হয়ে ফিরে আসার পর তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর হয়ে যেতে পারতেন এবং হাজার টাকা মাসিক বেতনে আরামে জীবনযাপন করতে পারতেন। কিন্তু তিনি সুখময় জীবনকে লাথি মারলেন এবং তপস্যার জীবন বেছে নিলেন। লালা খুশালচাঁদ 'খুর্সন্দ'-এর দৈনিক 'মিলাপ' খুব ভালোভাবে চলছিল, আর এখন তিনি শহরের সম্মানিত ও প্রভাবশালী সাংবাদিক এবং আর্যসমাজের প্রধান নেতা। কিন্তু আমার কাছে এখনো তিনি সেই 'খুর্সন্দই' ছিলেন যাঁকে ১৯১৬-তে আমি 'আর্য গেজেটের' ছোট্টোখাট্টো আফিসে আমার সঙ্গে বন্ধুর মতো কথা বলতে বহুবার পেয়েছিলাম। এখনো তাঁকে সেই অকৃত্রিম রূপেই পেলাম। সে সময় তিনি আর্যগেজেটের জন্য লেখা চাইতেন, আর এখন তিনি 'মিলাপের' জন্য কিছু লিখতে বললেন। আমি 'বাইসবী সদী'র কিছু অধ্যায় উর্দুতে অনুবাদ করে 'মিলাপ'-কে দিলাম যা বেশ কিছুদিন ধরে তাতে ছাপা হয়েছিল।

গুরুদত্ত ভবন, আর্যসমাজ বচ্ছোওয়ালী ও অন্য জায়গায় আমি আর্যসমাজী ধরনের কয়েকটি বক্তৃতা দিয়েছিলাম, কিন্তু সেগুলিতে বুদ্ধের অত্যধিক প্রশংসা থাকত। প্রত্যেক বক্তৃতাতেই জাতপাতের বিরুদ্ধে অতি অবশ্যই কিছু বলতাম। আগে যখন লাহোরে ছিলাম তখন পাঞ্জাবের বিভিন্ন অংশকে দেখার বাসনা পূর্ণ হয়নি। অতএব এবার যখন আর্য প্রতিনিধি সভার যার কার্যালয় গুরুদত্ত ভবনেই ছিল—লোকেরা বাইরের আর্যসমাজগুলিতেও কিছু সময় দিতে বলেন, আমি তাতে রাজী হলাম। একবার এবং সম্ভবত সবচেয়ে প্রথম—(উর্দু) 'প্রতাপের' সম্পাদক মহাশয় কৃষ্ণের সঙ্গে নয়া দিল্লীর আর্যসমাজের বার্ষিক উৎসবে ভাষণ দিতে গেলাম। সেই সময় কন্যা গুরুকুল দিল্লীতেই ছিল, মহাশয় কৃষ্ণের সঙ্গে আমিও তা দেখতে গেলাম। আর্য সমাজের শিক্ষা সম্পর্কিত পুরনো পন্থার সঙ্গে আমি প্রথম থেকেই একমত ছিলাম না, কিন্তু তাদের উৎসাহের প্রশংসা করতেই হত।

পাঞ্জাব ও সীমান্তের বিভিন্ন স্থানের ভ্রমণের কাহিনী সেখান থেকে লিখে বাবু জগৎনারায়ণলালের 'মহাবীর' নামে যে কাগজ পাটনা থেকে বেরোত তাতে পাঠাতে থাকলাম। তার মধ্যে কিছু বাদ দিলে বাকী সবই অপ্রকাশিত থেকে যায়, পরে সেগুলি আমি 'মেরী লদাখ যাত্রায়' সংযোজিত করে দিলাম। ভ্রমণের প্রত্যাশিত অংশ এখানে দেওয়াই হচ্ছে কিন্তু সেখানে আর্য সমাজের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ আমি গুপ্ত রেখেছিলাম কেননা বিহারের লোকে আমাকে বৈরাগী বৈষ্ণব মনে করত। অতএব সেই বাদ দেওয়া অংশ সম্পর্কে এখানে কিছু বলছি। কেম্বলপুর, রাওয়লপিণ্ডী, মুলতান থেকে শুরু করে পুণছতক পর্যন্ত অনেক আর্যসমাজী বার্ষিক উৎসবে ভাষণ দিতে গিয়েছিলাম। রাওয়লপিণ্ডী উৎসবের সময় সংশয় সমাধানের ভার আমাকে দেওয়া হয়েছিল। আমি যে জবাব দিয়েছিলাম তা থেকে বুঝতে পেরেছিলাম যে মহেবাতে শেষ বার তর্ক-বিতর্কের যে প্রতিভা আমি তীক্ষ্ণ করেছিলাম তা ভোঁতা হয়ে যায়নি। শুধু আর্যসমাজীরাই স্বামী রামোদারের—এই নামই সেখানে পরিচিত ছিল—তর্ক শক্তির প্রশংসা

করছিল না, বরং যে কাদিয়ানী মৌলবী আমাকে প্রশ্ন করত সেও। আমার উপস্থিত বুদ্ধির তারিফ করেছিল।

সে সময়ের লেখা থেকে বোঝা যাবে যে আর্য সমাজের ও কিছু কিছু হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষের প্রভাবও আমার ওপর পড়েছিল।

আর্যসমাজের কিছু প্রভাবশালী নেতার সুপারিশে এবারের যাত্রায় খাইবারে লাণ্ডিকোতাল পর্যন্ত যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। যদি পুলিশ জানতে পারত যে আমি রাজনৈতিক অভিযোগে দুবার জেল খেটেছি, তবে না পাওয়া যেতো খাইবারের ভেতরে ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ, না পেতাম লাদাখ যাওয়ার পারমিট (আজ্ঞাপত্র)। রাওয়লপিণ্ডীর কিছু বন্ধু তো আমাকে ভরসা দিল যে এখান থেকে অনায়াসে পাসপোর্ট পাওয়া যেতে পারে। তার জন্য আমি দরখাস্তও দিয়ে দিলাম। নিকট ভবিষ্যতে বিদেশে যাওয়ার প্রচণ্ড ইচ্ছা ছিল আমার, কিন্তু পাসপোর্ট দেওয়া হত অনেক বাছাই করে। পুলিশ হয়তো কনৈলাতে জিজ্ঞাসাবাদ করে থাকতে পারে এবং তারা হয়তো বিহারে আমার রাজনৈতিক জীবনের খবর পেয়ে থাকতে পারে। যাই হয়ে থাক, পাসপোর্ট পাওয়া গেল না।

এসময় আমি গেরুয়া লুঙ্গী ও চাদর ব্যবহার করতাম। ঠাণ্ডার সময় গরম চাদর গায়ে দিতাম, পেশোয়ারে আমার যে ফটো নেওয়া হয়েছিল, তা থেকে তা জানা যাবে। কর্বীতে আমি প্রথম বুঝতে পেরেছিলাম যে আমি আর কৃশ ও দুর্বল নেই, যেমন আমি ছেলেবেলা থেকে ছিলাম। হাজারীবাগে আমার ওজন ১৫১ পাউন্ড পর্যন্ত হয়ে গিয়েছিল (আজকাল ১৯৪০-এর মে মাসে আমার ওজন ১৮৩ পাউণ্ড), তবু সে সময় আমাকে মোটা বলা যেত না।

শ্রীনগরে উঠলাম আর্যসমাজের মন্দিরে, কিন্তু আহারের জন্য প্রায়ই ডাক্তার কুলভূষণের বাড়ি যেতাম। ডাক্তার কুলভূষণের সাহায্যের ফলেই আমি লাদাখের পারমিট পেয়েছিলাম, আর তিনিই লাদাখের এঞ্জিনিয়র লালা রামরখামলকে চিঠি লিখে আমার পরবর্তী যাত্রার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

কর্গিলে লালা রামরখামলের সঙ্গে দেখা হল। তাঁর তিনটি ঘোড়ার মধ্যে একটি আমার জন্য রিজার্ভ হয়ে গেল, আর সেখান থেকে লাদাখ, হেমিস পর্যন্ত যাত্রা তাঁর সঙ্গে খুব আরামের করলাম। ডাকবাংলো অথবা তাঁবুতে ঘুমোতাম, বাড়ির মতো পুষ্টিকর পাঞ্জাবী খানা খেতাম। সে সময়ে আমি নিরামিষাহারী ছিলাম, যদিও নিরামিষের ওপর আমার আস্থা কমে যাচ্ছিল।

লাল রামরখামল রাজার তহশীলদার ও লেহ-এর পাঞ্জাবী মহাজনদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে পণ্ডিত সপ্তরামজীর খুড়তুতো ভাই ও লেহর অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যবসায়ী লালা শিবরামও ছিলেন। আমি সন্ন্যাসীও ছিলাম। তারও প্রভাব কম ছিল না, তাই পরের ব্যবস্থা তাঁরা করে দিলেন। লেহ্‌তে হোশিয়ারপুর জেলার অনেক ব্যবসায়ীর দোকান ছিল। তাঁদের মধ্যে লালা শিবরামজীর মতো কিছু লোকের দোকান চীনা তুর্কীস্তানের কাশগার, ইয়ারকন্দ, খোতন শহরেও ছিল। এখানে আসার পর চীনা তুর্কীস্তানে যাওয়ার বড় ইচ্ছা হয়েছিল আমার। কিন্তু প্রশ্ন ছিল পাসপোর্টের। যদি তা নিয়ে ঝামেলা না হত, তবে আমি সোজা সেদিকে চলে যেতাম। লালা শিবরাম যাত্রার সব ব্যবস্থা করে দিতে প্রস্তুত ছিলেন।

হেমিস থেকে লালা রামরখামল তো নিজের কাজে চলে গেলেন, আর আমি কিছুদিন সেখানে থাকলাম। হেমিসের লামা স্তগ্‌-সঙ্‌-রস পাকে আমাকে ভালোভাবে রাখার কথা বলে দিয়ে গিয়েছিলেন। তাই তিনি আমার খুব যত্ন করলেন। তিব্বতীরা (লাদাখের লোকেও জাতিতে তিব্বতী) মাংস ছাড়া খেতে ভালবাসে না, তাই তাদের নিরামিষ রান্না সুস্বাদু হত না, তবু মঠ থেকে রুটি, শালগমের পাতার তরকারি, দুধ, মাখন, দই ইত্যাদি এসে যেত।

কাশ্মীতে থাকাকালীন অনেক বই পড়ে ও নিজের বুদ্ধিবলে মেসমেরিজমের হাতের ভেল্‌কি অল্পস্বল্প শিখেছিলাম। একদিন লামা তা দেখাতে বলেন। আমি এক দোভাষীর (উর্দু জানা) এক ছোট ছেলের সঙ্গে লামাকে ভেতরের ঘরে ডাকলাম। ছেলেটার বুড়ো আঙ্গুলের নখে ঝক্‌ঝকে ছোটোমতো কাজলের বিন্দু লাগিয়ে দিলাম। তারপর তাতে ছেলেটাকে নিজের নিজের প্রতিবিম্ব স্পষ্টভাবে দেখে নেওয়ার সাজেশান (পরামর্শ) দিয়ে অন্যান্য জিনিষ, স্থান ব্যক্তির শব্দ চিত্র তৈরী করে তা দেখার প্রেরণা দিলাম। ছেলেটা, বোম্বাই শহর, সমুদ্র, জাহাজ, বুদ্ধগয়ার মন্দির—আমি যেমন যেমন বলে গেলাম—দেখতে লাগল। অবশেষে তাকে হেমিস গুম্বা (মঠ)-এর লামার বৈঠকে এনে সে সময়ে সেখানে যারা বসেছিল, তাদের সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। ছেলেটা পরিচিত মানুষদের নাম এবং অপরিচিত মানুষদের আকৃতি ও বসার জায়গা বলে দিল। দোভাষী দরজার বাইরে বেরিয়ে দেখল যে ছেলেটা যা বলেছে তা একেবারে সঠিক। ছেলেটি যখন সেই ঘরের ভিতর দিয়ে এসেছিল, তখন সেখানে যাঁরা বসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই চলে গিয়েছিলেন, আর কিছু নতুন মানুষ সেখানে বসেছিলেন। দোভাষীর চেয়েও বেশী আশ্চর্য হয়েছিল লামা। এই ব্যাপারটা যখন হল তখন আমার তিব্বতী ভাষা জানা ছিল না, তাই আমি সরাসরি সাজেশান দিতে পারিনি। আমার সাজেশানের ভাষা অনুবাদ করে দোভাষী ছেলেটাকে বোঝাত।

দুপুরের পর লামা স্বয়ং তাঁর সামনে এর প্রয়োগ দেখতে চাইলেন। সেজন্য আমরা মঠের নিচে সফেদার বাগানে লামার (মোহন্ত) বাংলোয় গেলাম। সেখানেও এর প্রয়োগ সফল হল। কাশ্মীতেও আমি এর তিন চারবার প্রয়োগ করেছিলাম, আর তখনো দৃষ্টি বহির্ভূত স্থানে বসা মানুষদের পরিচয়ও প্রত্যেকবার হয়েছিল, তাই সফলতা সম্পর্কে আমার নিজের ওপর আস্থা ছিল।

লেহ থেকে ফিরে খর্দোঙ পাস পেরিয়ে আমি নুব্রা উপত্যকা দেখতে গেলাম। খর্দোঙ এর চড়াই-এর এবং পরবর্তী যাত্রার এক অতি সুন্দর বর্ণনা লিখেছিলাম আমি, যা শুনে রাজেন্দ্রবাবু এতটা প্রভাবিত হয়েছিলেন যে আমার লাদাখ যাত্রা সম্পর্কিত লেখা পুস্তকাকারে প্রকাশের জন্য তিনি তাঁর বেনারসের এক বন্ধুকে পত্র লিখেছিলেন। সেই লেখা আমি কলকাতার এক কাগজকে মনে হয় 'সরোজকে' পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু মূল অথবা মুদ্রিত লেখা আমি আর পাইনি।

লাদাখের তহশীলদার সাহেব কৃপা করে তাঁর চাপরাসী গঙ্গারাম (লাদাখী হওয়া সত্ত্বেও মহারাজ রণবীর সিংহের নীতি অনুসারে এই নাম তাকে দেওয়া হয়েছিল) ও একজন মুহুরিকে আমার সঙ্গে দিয়েছিলেন। আমরা ঘোড়ায় চড়ে বিকেল নাগাদ খর্দোঙের দিকে রওনা হলাম। লাদাখ থেকে চীনা তুর্কীস্তানের রাস্তা এদিক হয়েই গেছে, অতএব ক্রমাগতই রাস্তা মেরামত করা হয়। পথিকদের জন্য জায়গায় জায়গায় সরাইখানা আছে। রাস্তায় ব্রিটিশ সরকারের চরস অফিসারের সঙ্গে দেখা হল। ভারতে ব্যবহৃত চরস অথবা সুলফা প্রায় সবটাই চীনা তুর্কীস্তান থেকে এই রাস্তা হয়েই আসে, আর তত্ত্বাবধানের জন্য সরকারের এক বিশেষ অফিসার এখানে থাকে। চরস-অফিসার খাঁ সাহেব রাত্রিতে তাঁর সঙ্গে থাকার নিমন্ত্রণ করলেন। আমরা গ্রাম থেকে অনেকটা ওপরে গিয়ে আমরা থামলাম, যেখান থেকে পাস (জোত) ৩-৪ মাইলই দূরে, এখন আর দিল্লীর মতো একটা কম্বলে শীতকে কেটেছেটে রাখা সম্ভব ছিল না, সুতরাং শীতের জন্য শ্রীনগর থেকে যে পশমী কাপড় চোপড় সংগ্রহ করেছিলাম তা এখানে বেশ বৃদ্ধি করে নিয়েছিলাম। পায়ে ইয়ারবন্দী পশ্মু জুতা, তার ভেতর ফেল্ট-এর মোজা পরে ঘুমোতাম। তাঁবুর ভেতর আমি কান ঢাকা টুপির ওপর পশমী চাদর দিয়ে মুখ কান মাথা ঢেকে এবং শরীরে চুক্‌টু ও আলোয়ান ইত্যাদি জড়িয়ে ঘুমোতাম, তা সত্ত্বেও সেখানে ভীষণ শীত করত।

খাঁ সাহেব কোনো নতুন রাস্তার খোঁজে গিয়েছিলেন। এখান থেকে তাঁর অন্য জায়গায় যাওয়ার কথা ছিল। আমিও আমার দুই বন্ধু ঘোড়ায় চড়ে বেগারখাটা কিষাণদের সঙ্গে রাত দুটোতে রওনা হয়ে গেলাম। লদাখে বরফে ঢাকা পাস পার হওয়ার জন্য এটাই উপযুক্ত সময় বলে মনে করা হয়, যাতে রোদ ওঠার আগেই বরফের রাস্তা শেষ হয়ে যায়। রোদ বাড়লে বরফ নরম হয়ে যাওয়ায় তাতে মানুষ ও পশুর পা ঢুকে যায়, এবং বরফের খাদে ফেঁসে যওয়ার ভয়, সেই সঙ্গে আশেপাশের উঁচু জায়গা থেকে লাখ লাখ মন বরফের ধস নামার ভয় থাকে। কিছুদূর পর্যন্ত নালার কিনারা থেকে সাধারণ চড়াই দিয়ে ওঠার ছিল, কিন্তু এখনও আমরা ১৪০০০ ফুট ওপরে চড়ছিলাম, এবং ঘোড়ার পিঠে না থাকলে কত ধানে কত চাল সেটা বুঝতে পারতাম। এবার আসল চড়াই শুরু হল। ঘোড়াগুলো এখন প্রত্যেক দশ পা গিয়ে নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য থামত। আরো কিছুটা গিয়ে আমরা সাদা বরফের ফরাশের ওপর দিয়ে চলতে লাগলাম, চাঁদনী রাতে বরফ খুব ঝকঝক করছিল। পাতলা হাওয়ার জন্য নিঃশ্বাস নেওয়া আর পা ওঠানোর মধ্যে কারু কথা বলার ফুরসত ছিল না, আর সেই স্তব্ধতার মধ্যে শুধু জানোয়ারদের নিঃশ্বাসের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। চড়াইয়ের শ্রম লঘু করার জন্য ঘোড়া আঁকাবাঁকা রাস্তায় চলছিল, হাঁপানোতে তাদের পেট ফুলে উঠছিল, সংকুচিত হচ্ছিল এবং পেছনের গোটা শরীরটা মনে হচ্ছিল, মুখ ঢাকে ঠেলে পায়ের থেকে সামনে টেনে নিয়ে যাবে। পশুদের কষ্ট দেখে আমরা তাদের আপন মনে চলতে দিতাম। সাধারণভাবে কিছুক্ষণ থামার পর তারা নিজেই চলতে শুরু করতো, নয়তো লাগামের সামান্য ইশারা করতে হত। সবই বেগার খাটা ঘোড়া, তাই লালা রামরথামলের মজবুত টাট্টু ঘোড়ার সঙ্গে মুকাবলা করতে পারত না। লদাখীরা কান ঢাকা টুপির ওপরে ওঠানো কানঢাকনা নিচে নামিয়ে কান ঢেকে নিয়েছিল। আর আমি?—আমি তো রাত্রির মাংকিক্যাপ দিয়ে চোখ ও নাক বাদ দিয়ে সারা মাথা ও ঘাড় ঢেকেছিলাম এবং তার ওপরে যে পশমী চাদর বেঁধেছিলাম তা একটুও সরাইনি। কাশ্মীর থেকে আসার সময় তিনটি গিরিবর্ত পার হবার সময় আমি দেখে নিয়েছিলাম কিভাবে এই ওপরের হাওয়ার জন্য শরীরের রঙ ঝলসে কালো হয়ে যায়, অতএব নাক ও তার আশেপাশের যে সামান্য অংশ খালি ছিল তার ওপর ভেসলিন লাগিয়েছিলাম। হাতে দস্তানা ছিল এবং বাকী সারা শরীর মোটা পশমী কাপড়ের অনেক স্তরে ঢাকা ছিল। এত সবের পরও ঠাণ্ডার অভিযোগ করা অনুচিত হবে কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি অনুমান করতে পারছিলাম সেখানে কি ধরনের ঠাণ্ডা পড়েছিল?

ধীরে ধীরে পা মেপে মেপে মনে হচ্ছিল যুগ যুগ ধরে রাস্তা পার হচ্ছিলাম। পনের হাজার, ষোল হাজার, সতের হাজার, আঠার হাজার ফুট পর্যন্ত পৌছনো—বলতে সোজা মনে হয় কিন্তু এই প্রত্যেক হাজার মানুষ ও পশুর ফুসফুস, পা ও পিঠের ওপর কি অসহ্য ভার চাপিয়ে দেয়, কিরকম পীড়া এনে দেয় তার আভাসও ভাষায় দেওয়া কঠিন। খর্দোঙ লা (জোত) আঠার হাজার ফুট উঁচু এবং তিব্বতের কঠিন গিরিপর্বতগুলির অন্যতম বলে ধরা হয়। উঁচু জায়গায় উষা ও সূর্যের কিরণ কিছুটা আগে পৌছয়, কিন্তু আমরা এখনো ডাণ্ডের থেকে নিচেই ছিলাম তখনই খুব আলো হয়ে গিয়েছিল। আজ হাওয়া ও বৃষ্টি ছিল না, তাই যাত্রা সুখকর হল। লদাখীরা একে দেবতার প্রতাপ বলে মনে করত।

জোতে পৌছে আমরা ঘোড়া থেকে নামলাম। এক সঙ্গী এক টুকরো আদা দিয়ে বলল—"জোতে এটা খেলে ভাল হয়, এতে বিষাক্ত ভূমির প্রভাব কেটে যায়।" এখানে হাল্কা চারাগাছের শাখার লাল-হলুদ পতাকা দিয়ে অলঙ্কৃত খর্দোঙ ডাণ্ডের দেবতার স্থান ছিল। লদাখী সঙ্গীরা শ্ শ্ বলল। আমরা কিছুটা বিশ্রাম নিলাম, তারপর ঘোড়াকে তার মালিকের হাতে দিয়ে পায়ে হেঁটেই নামতে শুরু করলাম। আমার জানা ছিল না যে খর্দোঙের উতরাই চড়াইয়ের

চেয়েও কঠিন। উতরাইয়ে এমনিতে সওয়ারী হয়ে গেলে সওয়ার ও পশু দুয়ের পক্ষেই কষ্টকর ব্যাপার হয়। দুয়েক ফার্লঙ যেতেই জানোয়ারের পিঠ কেটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। আর এখানকার চড়াই কি, এখানে তো কোথাও কোথাও কিছুটা পেছনের দিকে একটু ঝুঁকে থাকা প্রাচীর থেকে নামার মত ব্যাপার। অনেক জায়গায় তো আমাকে চতুষ্পদ হতে হয়েছিল। এদিকে কয়েক মাইল পর্যন্ত—আগের থেকে দ্বিগুণের থেকেও বেশীদূর পর্যন্ত— বরফ ছিল। কিন্তু সর্বত্র সোজা উতরাই ছিল না। খর্দোঙ ওপরের বরফ কখনো গলে না, সেখানে চিরন্তন তুষার। তুষারের ওপরের স্তর গলে যখন নীচের কঠিন, পিছিল চিরন্তন, তুষার বেরিয়ে পড়ে, তখন তা ভারবাহী পশুদের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। যদি সোজা উৎরাইতে পা পিছলে যায় তখন পাশে হাজার ফুট নিচে সরোবরে পড়ে গেলে সেখান থেকে আর তাদের উঠে আসার সম্ভাবনা থাকে না। যাহোক, এসময়ে এখানকার বরফ নতুন বরফে ঢাকা ছিল।

নটা দশটা নাগাদ আমরা রাজকীয় সরাইয়ে পৌঁছলাম। পানভোজন সেখানেই হল। কয়েক ঘণ্টা বিশ্রামের পর পশু প্রাণী যখন কিছুটা সতেজ হল, তখন দুপুরের পর আমরা যাত্রা করলাম। এখানকার পাহাড়ের সানুদেশে অনেকটা মাটিতে ঢাকা ছিল, আর হালকা হলেও বহু শতাব্দীর বর্ষার জল তা কেটে কেটে স্তম্ভ, খাদ ও গুহার আকার দিয়েছিল। এখানে জনবসতি চোখে পড়েনি। খর্দোঙে থেকে যে নালা আসছিল, তার সাহায্যে চলতে চলতে অনেকটা সময় কেটে যাওয়ার পর আমরা শিয়োক নদীর উপত্যকায় পৌঁছলাম। শিয়োক সিন্ধুনদের দুটি প্রধান প্রবাহের অন্যতম। যদিও শিয়োকের অন্য বোনটি সিন্ধু নাম পেয়েছিল। এই নদী মানস সরোবরের দিক থেকে এসে লেহর থেকে ৫-৬ মাইল নিচে দিয়ে বয়ে গিয়েছে। তা সত্ত্বেও সিন্ধুতে মাঝে মাঝে যে বিপজ্জনক বন্যা হয় তার কারণ এই শিয়োক। অক্ষয় চিরন্তন শিয়োক-তুষার গলে নিজের ভেতর থেকে একটি বিস্তৃত ধারা এই নদীর আদি প্রবাহ হিসেবে ঢেলে দেয়। এই ধারার বেরিয়ে আসার রাস্তা খোলা থাকলে তা নিরাপদ, কিন্তু যেই ঠাণ্ডা ইত্যাদির জন্য জল বরফের চাঙ্গর হয়ে এই ধারার পথ বন্ধ করে দেয়, তখন পশ্চিম পাঞ্জাব ও সিন্ধুতটবর্তী গ্রাম ও শহরগুলির বাঁচার কোনো পথ থাকে না। শিয়োক-তুষারের জন্য সরকারের চৌকিদার থাকে। এই প্রবাহের পথ খোলা আছে কিনা তা দেখাই এই চৌকিদারের কাজ। বরফের ভেতর থেকে যে ধারা আসে, তার পথ বন্ধ হতেই চৌকিদার দ্রুত তহশীলদারের কাছে লোক পাঠিয়ে দেয়। শত শত কোটি মন জল জমা হয়ে কাঁচা সদৃশ হিম-প্রাকারকে ভাঙ্গতে কিছুদিন সময় লাগে। সতর্ক থাকলে এরই মধ্যে বিপজ্জনক স্থানের খবর পাঠিয়ে দেওয়া সম্ভব। লেহর তহশীলদার যখন শিয়োক তুষার থেকে সম্ভাব্য বিপদের তার পাঠাত, তখন অন্য সব তার পাঠানো বন্ধ করে এই তারকে দিল্লী, স্কর্দো ও সীমাপ্রান্ত পাঞ্জাবে পাঠানো হবে। চৌকিদার প্রবাহের জলের গভীরতা ইত্যাদি লিখে নিয়মিত প্রতি সপ্তাহে পাঠায়। একবার গভীরতা কমে তুষারের ছিদ্র বন্ধ হতে শুরু করে। চৌকিদার রিপোর্ট পাঠায়, কিন্তু তহশীলদার সাধারণ কাগজ মনে করে তা রেখে দেয়। দুয়েকদিন পরে যখন এই কাগজের ওপর তাঁর নজর পড়ল, তখন পরিস্থিতির গুরুত্ব তাঁর কাছে ধরা পড়ে, কিন্তু তিনি যখন তার পাঠাতে লাগলেন, তখন খবর এল যে জল স্কর্দো পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

শিয়োকের বাঁ তীরে নদী থেকে কিছুটা ওপরের একটা গ্রামে রাত্রিতে থাকলাম। সেখানে ঠাণ্ডা খুব কম মনে হল। তার কারণ সম্ভবত এই যে আমরা খুব ঠাণ্ডা জায়গা থেকে এসেছিলাম। কিন্তু এমনিতেও শিয়োক উপত্যকা গরমই। গ্রামে খুবানী ইত্যাদির গাছ আছে।

সকালে চা খেয়ে আমরা আবার রওনা হলাম, ঝুলন্ত লোহার পুল দিয়ে আমরা শিয়োক নদী পার হলাম। তারপর ডান দিক থেকে আসা বেশীর ভাগ শুকনো একটি নদীর উপত্যকায় বাঁদিক

দিয়ে ঢুকলাম। আমরা নুব্রায় রি জোঙ-এর লামা সস-কুশোকের কাছে যাচ্ছিলাম। রিজোঙ-লামা লাদাখের লামাদের মধ্যে সর্বাধিক শিক্ষিত ও সংস্কৃতি সম্পন্ন ছিলেন, তাই তাঁর সঙ্গে দেখা করে বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার খুব ইচ্ছা ছিল আমার। লদাখের অন্যান্য স্থানে আমি ১৯৩৩-এ দ্বিতীয়বার গিয়েছিলাম, কিন্তু ১৯২৬-এর পর খর্দোঙ ছাড়িয়ে নুব্রা যাওয়ার সুযোগ আর হয়নি, আর আমি যা লিখছি তা পুরোপুরি স্মৃতি নির্ভর। হয়তো নুব্রা থেকে আগে সামান্য ঝোপ এর মত কিছু পেয়েছিলাম। নুব্রার চারদিকে সবুজ গমের খেত তরঙ্গিত হচ্ছিল। অনেক খুবানী, সফেদা ও বীরী গাছের বাগান ছিল। একটি সরলরেখা ধরে তৈরী লদাখী গ্রামের সাদা ঘরবাড়ি দূর থেকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল।

আমরা লামার (গুরু, মোহন্ত) বাসস্থানে গেলাম। দোভাষী আমার পরিচয় দিল। লামা তাঁর বৈঠকখানায় ডেকে পাঠালেন। বৈঠকখানা শুধু পরিচ্ছন্ন ও হাওয়াদারই ছিল না, তা অত্যন্ত সুরুচিসম্মতভাবে সাজানো হয়েছিল। লামা স্বয়ং চিত্রকর ছিলেন, আর দেওয়ালে তাঁর আঁকা গোলাপ ফুল খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। খাওয়া দাওয়ায় ছোঁয়াছুঁয়ির তো প্রশ্নই ছিল না, কিন্তু আমার নিরামিষ আহার অপরের জন্য ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার ছিল। এখানে শাকসব্জী ডাল সবই দুর্লভ ছিল। যাহোক, দুধের সঙ্গে পেটভর্তি রুটি খেয়ে নেওয়ায় কোনো অসুবিধা ছিল না।

রিজোঙ-লামার বয়স ঐ সময় ষাটের ওপর ছিল। তিনি অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন রুচির মানুষ ছিলেন। তাঁর শরীর কিছুটা কৃশ, রঙ হলদে মতো ফর্সা, মুখে মেদ কম, নাকও কম চ্যাপটা—আমাদের মাপকাঠিতেও যৌবনে তিনি সুন্দর থেকে থাকবেন। লদাখের পুরনো রাজবংশে জন্ম হওয়ায় তাঁকে সস-কুশোক, (লদাখের মঠের মোহন্ত ভিক্ষুকে কুশোক বলা হয়, যদিও মধ্য তিব্বতে তাঁকে রিম-পো-ছেকা বলা হয়।)—রাজকুমার কুশোক-বলা হয়ে থাকে। তিব্বতী ভাষা ও তার সাহিত্য নিয়ে আমাদের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা আলোচনা হয়েছিল। তিনি কঞ্জুরে অনুদিত মহায়ান মহাপরি নির্বাণ সূত্রের কিছু অংশ অর্থসহ শোনালেন, দোভাষী তার অনুবাদ করে শোনালো। আমি লামার কাছে লদাখীদের মধ্যে কিছু সংস্কারের কথা বললাম যা আমি হেমিসের কুশোকের কাছেও বলেছিলাম। তার মধ্যে মুখ্য ছিল অপরিষ্কৃত দুর্গন্ধেভরা পুরুষের লম্বা লম্বা চুল কেটে দেওয়া। বহু পতি বিবাহের জন্য লদাখী স্ত্রীলোকেরা অন্য ধর্মের পুরুষকে বিয়ে করে নেয় যার ফলে লদাখে তাদের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে, অতএব বহুপতি বিবাহের প্রথা লোপ করে প্রত্যেক ভাইয়ের আলাদা আলাদা বিবাহের প্রথা প্রচলিত করা হোক। ভিক্ষুদের পড়াশোনার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হোক। রিজোঙ আমার পরামর্শ স্বাগত করে বললেন, 'আমিও এই সব বিষয় উপলব্ধি করতে পারছি।' লামার সংস্কৃতের প্রতি ভালবাসা ছিল, বলছিলেন, এখন তো বুড়ো হয়ে গেছি, নয়তো সংস্কৃত পড়তাম।

দু-তিন দিন থাকার পর নুব্রা থেকে লেহ যাত্রা করলাম। লামা তাঁর নিজের আঁকা কিছু কিছু ছোট ছোট ছবি স্বরচিত রচনা দিলেন। আমি আবার লেহ ফিরে এলাম।

যে রাস্তায় যাই সেই রাস্তা ধরেই ফিরে আসা আমি একেবারেই পছন্দ করি না। কোন রাস্তায় ফিরতে হবে, সে বিষয়ে আমি ভেবে রেখেছিলাম, আর মন পঙ্-গোঙ ঝিল দেখে হন্‌লে, চুমুর্তি (তিব্বত), কনৌরের রাস্তায় শিমলা যাওয়া স্থির করেছিলাম। সেজন্য লালা শিবরাম টাকা কড়ির ব্যবস্থা করতে লাগলেন। হেমিস লামা হনলেতে তাঁর মঠের প্রধান কর্মচারী ও কনৌরের প্রথম বড় গ্রামের প্রধানের নামে পরিচয়পত্র লিখে দিলেন।

হেমিসে আমি মেলার সময় গিয়েছিলাম। বছরে একবার এসময়ে এখানে ধর্মীয় নাট্য ও নাচ হয়, যাকে ইংরেজ ডেভিল ড্যান্স (ভূত নৃত্য) বলে, নানা রকমের চেহারা ও পোশাকের সঙ্গে এই অভিনয় হয়, এবং তখন অনেক ইউরোপীয় ভ্রমণকারীও সেখানে আসে। এই যাত্রীদের

মধ্যে প্যারিসের শিল্পী মাদমোয়াজেল (কুমারী) লাফুজীও ছিলেন। তিনি ফরাসী ও ইংরেজী জানতেন, আর মেলা শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমিই একমাত্র মানুষ ছিলাম যে ইংরেজী জানত, তাই হেমিসে থাকাকালীন আমাদের ঘনিষ্ঠতা বেড়ে যায়। আমি যখন নুব্রা যাই সে সময় লেহতে লাফুজী এক বাগানে তাঁবুর ভেতরে ছিলেন। ফিরে এসে জানতে পারলাম তিনি ডাকবাংলোয় চলে গিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন, 'ফিরে এসে নুব্রা সম্পর্কে আমাকে অবশ্যই সব বলবেন', অতএব একদিন বিকেলে আমি ডাকবাংলোয় গেলাম। লাফুজী গুড ইভ্‌নিঙ (শুভ সন্ধ্যা) বলে খুব জোরে হাত মেলালেন। তারপর তাঁর নতুন বন্ধু মেজর মেসনের সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দেওয়ার জন্য তাঁকে ডাকতে গেলেন। বেচারীর ভারতনিবাসী ইংরেজের মনোবৃত্তি সম্বন্ধে কোনো ধারণা ছিল না। মেজর মেসন এলেন তো বটেই এবং তিনি গুড ইভনিঙ বলে হাতও মেলালেন, কিন্তু তাঁর অঙ্গভঙ্গি ও চেহারা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে তিনি লাফুজী চাপ দেওয়াতেই যন্ত্রবৎ ঐসব করছিলেন। মেজর মেসন ভারত সরকারের জরিপ বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন, কারাকোরাম পর্বতমালায় গবেষণার জন্য গিয়েছিলেন। লেহর নায়েব তহশীলদার তাঁর সম্পর্কে বলছিলেন—সামনে জোত গুলির উপর বরফ বেশী হওয়ায় রাস্তা বন্ধ, তাই বেগার খাটা ঘোড়া, ইয়াক প্রভৃতির ব্যবস্থা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এতে মেজর সাহেব রেগে লাল হয়ে যাওয়ায় আমি বললাম—সাহেব, এত জানোয়ার ও তাদের লোকজন যারা এই বিপজ্জনক জোতে যাবে, তাদের প্রাণের দায়িত্ব কে নেবে? এতে মেজর সাহেব খুব রেগে গেলেন—'এ গান্ধীওয়ালা মনে হচ্ছে।' মেজর মেসনের মতো ইংরেজ কর্মচারীরাই ভারতে ইংরেজদেরকে ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে অসহ্য করে তুলেছে। এর থেকে বেশী তাঁর সঙ্গে আমার আর কোন যোগাযোগ ঘটেনি। আমাকে কোনো ইংরেজের ঔদ্ধত্যের মুখোমুখি হতে হয়নি, একে আমি সৌভাগ্য বলেই মনে করি। নয়তো আত্মসম্মানের যে আগুন এমন সময়ে আমার মধ্যে জ্বলে ওঠে, তাতে অনর্থ হতে পারত।

লদাখের রাজার প্রাসাদ, শংকরগুম্বা, পিতোক্‌গুম্বা, ফিয়াঙ্‌-গুম্বা, মেহ্‌প্রাসাদ প্রভৃতি লেহর আশেপাশের দর্শনীয় স্থান আমি দেখে নিয়েছিলাম। লালা শিবরামজী রাস্তার জন্য একশ টাকার মতো যোগাড় করে দিলেন, আর আমি পরবর্তী যাত্রার জন্য রওনা হলাম। তহশীলদার সাহেব হন্‌লে পর্যন্ত গঙ্গারামকে আমার সঙ্গে দিয়েছিলেন। রাস্তার ঠিকসের গুম্বা দেখে রাত্রিতে চিমরে ছাড়িয়ে পুরানো রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের পাশে সরকারী সরাইয়ে উঠলাম। গঙ্গারাম চাপরাসীর কাছে লদাখের কোনো গ্রাম অজানা ছিল না। তার জন্য আমার কোনো কষ্ট হয়নি। সে গোবাকে (গ্রাম প্রধান) ধরত। যেখানে সরাই অথবা বাসস্থানের সরকারী স্থান ছিল না এবং চাঙ-লার পরে তার অভাব ছিল, সেখানে কোনো সম্পন্ন বাড়ির সবচেয়ে ভাল কামরায় আমার থাকার ব্যবস্থা হত। ঘোড়া চটিতে চটিতে বদলানো হত। খাওয়া-দাওয়ার জিনিষপত্র গ্রামপ্রধান যোগাড় করত, অবশ্য আমি দাম মিটিয়ে দিতাম। নিরামিষ আহারের নিয়ম নবদ্বীপের রাস্তায় আমি অজ্ঞাতসারে ভেঙেছিলাম। বস্তুত তা এখন আমার কাছে বোঝা বলে মনে হচ্ছিল। আমার মন থেকে তা একেবারে উবে গিয়েছিল, কিন্তু এখনো আমি খোলাখুলি তার অবহেলা করছিলাম না এবং সেইজন্যই এখানে খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহকারীদের ও আমারও অনেক কষ্ট হচ্ছিল। সরাইয়ে দুয়েকজন লদাখী অরগোন (কাশ্মীরী মুসলমানের ঔরসে লদাখী স্ত্রীর ছেলে) মুসলমানও উঠেছিল, তারা চাঙ-থাঙ্‌ (লদাখ ও তার পূর্ব সীমান্তে মানস-সরোবর ব্রহ্মপুত্র থেকে উত্তরে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত এক নির্জন প্রদেশ) ব্যবসার জন্য যাচ্ছিল। তাদের কাছে চা, কাপড়, চীনামাটির বাসন এবং অন্য কারখানার অনেক জিনিষ ছিল। চাঙ-থাঙ্‌-এর ভবঘুরেদের তারা এইসব জিনিষ পরের বছর পশম, সার্জের কাপড়, শ্যাময় চামড়া ইত্যাদি

পণ্যের পরিবর্তে দিয়ে আসত, পরের বছর আবার সামনের বছরের জন্য ঋণ দিয়ে পরবর্তী বছরে তা উসুল করত। ভবঘুরেরা সাদাসিধা এবং লদাখী গ্রাম্য মানুষের মতো সৎ হয়। অতএব দুই তিন গুণ লাভ নিশ্চিত ছিল। এখন জুলাই অথবা আগষ্ট (১৯২৬)-তাদের বাণিজ্যের সময় ছিল।

পরদিন আমরা জোতের দিকে এগোলাম। এই জোতের নাম চাঙ-লা পুরনো। স্মৃতির ওপর নির্ভর করে এই নাম বলছি আমার ভুল হতেপারে। চাঙ-লা লেহর পূব দিকে। এও খর্দোঙের মতো অনেক উচু জোত। কিন্তু এর চড়াই-উৎরাই ততটা কঠিন নয়। একদম উপরে দুইদিকে উতরাই-এর দিকে আরো বেশী দূর পর্যন্ত বরফ ছিল। সন্ধ্যার অনেক আগে আমরা অপর পারের গ্রামে পৌছলাম। ঐ গ্রাম সম্পর্কে এই পর্যন্ত মনে আছে যে পরদিন সওয়ারীর জন্য ঘোড়া ও জিনিষপত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য দুটি অথবা তিনটি স্ত্রীলোক পাওয়া গিয়েছিল। তারা সবাই সমবয়সী যুবতী ছিল। বুড়ো গঙ্গারামের ছঙ (কাচা মদ) খাওয়ার ও ঠাট্টা ইয়ার্কি করার খুব সখ ছিল। তারা তিব্বতী ভাষায় কথা বলছিল, অতএব কি বলছিল তা বুঝতে পারিনি, তবে মাঝে মাঝে অট্টহাসির রোল উঠছিল। এমনিতেই তো জোজিলা পার হতেই বনস্পতি বিশেষ করে বৃক্ষের দর্শন দুর্লভ হয়ে যায়, কিন্তু এখানে তার একেবারেই অভাব ছিল। কারণ স্থানটি ছিল খুব উঁচু ও ঠাণ্ডা। নদী সরু ছিল কিন্তু তার উপত্যকা ছিল খুব প্রশস্ত এবং চারদিকের পাহাড় একেবারে উলঙ্গ। পশ্চিম হিমালয়ের রাস্তা সম্পর্কে সরকারী জরিপ বিভাগের দ্বারা প্রকাশিত একটি ইংরেজী পুস্তক রাওয়লপিণ্ডীর এক কাবাড়িয়ার* দোকানে পেয়েছিলাম, অতএব তা থেকে রাস্তা চিনে নিতে খুব সুবিধা হচ্ছিল। সম্ভবত পরদিন আমাদের এই নদী ছেড়ে অন্য শুকনো মতো উপত্যকায় যেতে হল। রাত্রিতে এক ছোট্টমতো গ্রামে উঠলাম। এখানকার বাড়িতে কাঠের নামমাত্র ব্যবহার হত বলে সেগুলোকে এবড়ো খেবড়ো পাথরের স্তূপের মতো দেখায়। লোকজন অনেক কষ্টে সামান্য শষ্য উৎপাদন করে, নয়তো তারা দিনগুজরান করে ভেড়া ও ইয়াকের দুধ ও মাংস খেয়ে। আগুনের পাশে বসে আমরা চা খাচ্ছিলাম, পাশের ঘরে বুড়ি ঠাকুরমা প্রার্থনা চক্র ঘোরাচ্ছিলেন। কথাবার্তা বলার সময় আমি জিগ্যেস করলাম, "বুড়ি ঠাকুরমা মৃত্যুর পর কোথায় জন্ম নেওয়ার ইচ্ছা?" চটপট জবাব পাওয়া গেল গ্যগর দোর্জে-দন্ (ভারতে বুদ্ধগয়ায়)। 'আমি বললাম, 'তাহলে এখনই চল না, আমি তো ঐদিকেই যাচ্ছি।' কিন্তু জীবদ্দশায় বুড়ি ঠাকুরমা দোর্জে-দন্ যেতে প্রস্তুত ছিল না।

পরবর্তী দুটি উপত্যকা ওপরে উঠে কোনো পর্বতের পৃষ্ঠদেশে না গিশে এক ছোটমতো পুকুরকে তাদের জলবিভাজক বানিয়ে নিয়েছিল। সেখানে চড়াই উৎরাই এত কম ছিল যে তা বোঝাই গেল না। পুকুরটা ছিল খুব ছোট এবং তা শ্যাওলার মতো এক ধরনের ঘাসে ঢাকা ছিল। জল অস্বচ্ছ ছিল। পুস্তকে এর নাম দেখলাম চকর-তালাও। হিন্দিতে এই নাম আমার কাছে বড় অদ্ভুত লাগল। গঙ্গারাম বলল—কোনো সাহেব একজন পথপ্রদর্শক নিয়ে এখানে এসেছিল। সাহেবের প্রত্যেক প্রশ্নের জবাব ঝট্ করে না দিতে পারলে তিনি পথ প্রদর্শককে অযোগ্য মনে করবেন। সাহেব জিজ্ঞেস করলেন—'এই পুকরের নাম কি?' এক মিনিটও দেরী না করে পথপ্রদর্শক বলে উঠল—"চকর হুজুর।" চা-করের (পক্ষি শ্বেত) অর্থ সাদা পাখি। পথপ্রদর্শকের দৃষ্টি এই পাখির ওপরে পড়েছিল। তাই সে এই নাম রেখে দিয়েছিল।

*পুরনো পণ্য বিক্রেতা।

মন-পঙ-গোঙ্ ঝিলের কাছে উপত্যকা টেড়া বাঁকা হয়ে গেছে, আর আমরা খুব কাছে আসার পর ঝিলের ওপর নজর পড়ল। মন্-পড়্-গোঙ পঞ্চাশ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত এক টেড়া-বাঁকা ঝিল, এর অর্ধেকের বেশী অংশ তিব্বতের সীমার ভেতর। জল স্বচ্ছ দেখায়, কিন্তু তাতে কোনো মাছ নেই। লোকজন বলে, জলে বিষ আছে, তাই এখানে মাছ বাঁচে না। শীতে জল জমে যায়, তখন লোকজন তার ওপর দিয়ে পথ করে নেয়।

আমার সেদিন যে গ্রামে থাকার কথা ছিল, তা ছিল পশ্চিম-উত্তর কোণে। হয়তো দুই-তিনটা ঘর ছিল। সব ভাইয়েরই যখন একই স্ত্রীকে নিয়ে থাকতে হবে, তখন একাধিক ঘরের প্রয়োজন কি, তাই এই দুই ঘর 'সৃষ্টির আদি, থেকে চলে আসছে বলে ধরে নিতে হবে। গ্রামে পৌছনোর পর যে হাওয়া শুরু হল, তা অনেক রাত পর্যন্ত চলল, ফলে ঠাণ্ডা আরো বেড়ে গেল। গঙ্গারাম রুটি তৈরী করল, দুধসহ তা ভোজন করলাম। গঙ্গারামের তো গ্রামে পৌছনোর সঙ্গে সঙ্গেই ছঙ্ পাওয়া জরুরী ছিল লদাখের গ্রামের জন্য সে তহশীলদার সাহেবের চেয়ে কম ছিল না। পৌছনোর সঙ্গে সঙ্গেই ছঙ্-এর কলসী তাঁর সামনে হাজির হত।

পরদিন আমরা পুবে ঝিলের দিকে ঘুরলাম। কলকী উপত্যকার মুখ পার করলাম। আশেপাশের পাহাড় অত্যন্ত ছোট টিলার মতো মনে হচ্ছিল যার সানুদেশ ও পার্শ্বভাগে অনেক বালি জমা হয়েছিল। দুপুরের চা খেলাম একটা ছোট গ্রামে। এখানে খেতে শুধু ছোট মটর দেখতে পেলাম। চৌদ্দ হাজার ফুটের ওপরও যে চাষবাস হতে পারে তার নমুনা এখানে দেখলাম। ছোট মটর ছাড়া শুধু যবই এখানে পাকতে পারত। সামনেও রাস্তা ঝিলের পাশ দিয়ে ছিল। এখানে বড় বড় গাছের নিচের দিকটা জমি থেকে খুদে বার করে ফেলা হত। আজ তা এখানে বীরীর মতো নির্লজ্জ গাছই দাতনের মতো চেহারায় টিকে আছে। কিন্তু মনে হচ্ছিল আগে কোন যুগে এখানকার আবহাওয়া এত ঠাণ্ডা ছিল না; হতে পারে সে সময়ে হিমালয়ের উচ্চতাও এতটা ছিল না, তখন এখানে এই ধরনের বিশাল গাছ হত।

একটা ছোট··· পাশ থেকে আমাদের রাস্তা ডান দিকে মোড় নিল। হয়তো ঐ দিক থেকে একটা ছোট নদীও আসছিল। সামনে যে নতুন উপত্যকা পাওয়া গেল, তা সবুজ ঘাসের ময়দানের মতো মনে হল যেখানে যত্রতত্র হাজার কয়েক ইয়াক (চমরী গাই) চরছিল। তার তীর ধরে আমাদের কয়েক ঘণ্টা চলতে হল, আর বেলা চারটা নাগাদ আমরা একটা অপেক্ষাকৃত বড় গ্রামে পৌছলাম। সেখানে একটা ছোট বীরী গাছের বাগান ছিল, যা হয়তো রাজার পক্ষ থেকে লাগানো হয়েছিল। গাছ খুব ছোট ছোট ছিল। নবাগতদের—বিশেষ করে সরকারী লোকদের—থাকার জন্য এখানে একটা ছোট ঘর ছিল। চিনি ও শুকনো ফল তো আমাদের কাছে ছিল, কিন্তু এখানে শাক ও তরকারি ছিল না। শ্রীনগরে এক কাশ্মীরী পণ্ডিতের ঘরে আমি ছানার (পনীর) তরকারি খেয়েছিলাম যার স্বাদ একেবারে মাছের মতো মনে হয়েছিল। এখানে দুধের কমতি ছিল না। আমি গঙ্গারামকে ছানা দিয়ে তরকারি বানাতে বললাম। আমি নিজেও তাকে সাহায্য করলাম কিন্তু ছানার টুকরোকে ঘিয়ে ভেজে রান্নার নিয়ম না জানায় ছানা ভেঙেচুরে রাবড়ির মতো হয়ে গেল। বিকেলে আমি গ্রামের গুম্বা (মঠ) দেখতে গেলাম। বুদ্ধের মূর্তি ছাড়া সেখানে অনেক যুগ নদ্ধ (যব-যুম—মৈ থুনাসক্ত) মূর্তি ছিল। প্রথম প্রথম লাদাখে এই সব মূর্তি দেখে তিব্বতের বৌদ্ধ ধর্মের ওপর আমার খুব রাগ হত; কেননা সে সময় আমি বুঝতে পারিনি যে এও ভারতেরই দান।

পরদিন আবার আমরা নতুন ঘোড়া পেলাম। আমরা একটা জোতের (গিরিবর্ত) দিকে এগোলাম। রাস্তায় অন্য গ্রাম পড়েছিল কিনা মনে নেই। জোতের দেবতার স্থানে ঝাণ্ডা ও শতশত বছর ধরে পূজায় বলি দেওয়া ইয়াক, হরিণ ছাড়াও জংলী ভেড়ার মোটা মোটা শিঙও

ছিল। চড়াইয়ের মতো উৎরাইও অনায়াস ছিল, আর দুপুরে আমরা ইয়াক-অলাদের কালো তাঁবুতে পৌঁছলাম। লদাখের কুকুরও খুব বড় হয়, কিন্তু এখানকার লম্বা লম্বা কালো লোম-অলা বিশাল কুকুরগুলোকে খুব হিংস্র বলে মনে হত। লেহ্‌তেই শুনেছিলাম যে চাঙ্ থাঙ্-এর কুকুর খুব বিপজ্জনক, অন্য জায়গায় তো ঘোড়ার সওয়ারকে এরা ঘেউ ঘেউ করেই ছেড়ে দেয়, কিন্তু এখানে এরা লাফিয়ে হামলা করে। অতএব আমি বেশী আতঙ্কিত থাকতাম। তাঁবুর কাছে পৌঁছতেই দু-তিনটা কুকুর হাউ হাউ করে আমাদের কাছে তেড়ে এল। যাহোক্, তাঁবুওয়ালারা এসে তাদের ভাগাল। গঙ্গারামের সঙ্গে 'জু-লে' (প্রণাম) হতে লাগল। একটা তাঁবুতে আমাদের বসার জায়গা করা হল, আর অল্পক্ষণের মধ্যে আগুনে ডেকচির চা ফুটতে লাগল। অনেকটা মাখন ঢেলে চা তৈরী হল। তাতে আমার তৃষ্ণা মিটল। গঙ্গারামের জন্য ছঙের কলসী হাজির ছিল।

তাঁবু থেকে সিন্ধু তীরের পাহাড় একেবারে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু যেতে যেতে বুঝতে পারলাম যে এখানকার স্বচ্ছ বায়ুমণ্ডলে দূরত্ব মাপতে বড় দৃষ্টি বিভ্রম ঘটে। বেলা দুটো নাগাদ আমরা রওনা হলাম। সূর্যাস্ত হল, কিন্তু তখনো পাহাড় যেই দূরে সেই দূরেই রইল। অন্ধকার হল, ঘণ্টাখানেক রাতও হল, অন্ধকারে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু সিন্ধুর ধারার কোনো পাত্তা ছিল না। দূরে আগুনের আলো দেখা যাচ্ছিল। তার উদ্দেশ্যেও ঘণ্টা দেড়েক চললাম। কখনো কখনো আগুন নিভে যেতো। গঙ্গারাম ঐদিকেই যেতে চাইছিলেন কিন্তু আমি নিরাশ হয়ে কোনো জায়গায় বিশ্রাম করতে চাইছিলাম। আমি গঙ্গারামকে বললাম 'ওহে, এই আগুন কোনো মানুষ জ্বালায়নি। মনে হয় কোনো ভূত আমাদের ধোঁকা দিতে চাইছে।' গঙ্গারাম স্বীকার করলেন, 'এদিকে অনেক ভূত আছে এবং কখনো কখনো তারা মুসাফিরদের সঙ্গে এরকম ধোঁখা দেয়।' ভূতের কথা তিনি সত্যি বলে মনে করলেন, আর আমরা আবার আন্দাজে নদীর তীরের দিকে এগোলাম। রাত্রি নটা নাগাদ আমরা জলের ধারে পৌঁছলাম। গঙ্গারামের ইচ্ছা ছিল রাত্রিতেই নদী পার হয়ে যাওয়ার। কিন্তু সন্ধ্যায় তুষার থেকে গলে আসা জল কয়েকগুণ বেড়ে যায়। ঘোড়ার পিঠে চড়ে গঙ্গারাম জলের গভীরতা মাপতে গেলেন, জল বেশী ছিল। রাত্রিতে জল আরো বেড়ে যেতে পারে সেই জন্য জলের কাছ থেকে দূরে সরে এসে আমরা রাত্রির বিশ্রামের ব্যবস্থা করলাম। কাপড়-চোপড় আমাদের কাছে যথেষ্ট ছিল, অতএব ঠাণ্ডার জন্য আমাদের কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না। রাত্রিতে চায়ের ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না। তাই কিন্তু না খেয়েই আমরা ঘুমোলাম।

সকালে গঙ্গারাম ঘোড়ার খালি পিঠে চড়ে জলের গভীরতা মেপে এল। এখানে সিন্ধু গভীর ছিল না। কোমর পর্যন্ত জল ছিল। প্রথমে মালপত্র পার করে পরে আমরা নদী পার হলাম। এখন আমরা নদীর বাঁ তীর ধরে যাচ্ছিলাম। পাহাড় কখনো কাছে আসছিল, কখনো দূরে সরে যাচ্ছিল। এপাড়ে ভেড়ার (বেশীর ভাগ মদ্দা) দল পিঠে নুন ও অন্যান্য মালে বোঝাই হয়ে যাচ্ছিল। সঙ্গে দুয়েকটা গাধাও ছিল যাদের পিঠে তাঁবু, চা-দুঙ্ (চা ঘোটার লম্বা চোঙ্গা) ও অন্যান্য মাল চাপানো হয়েছিল। সঙ্গে কিছু পুরুষ ও স্ত্রীলোকও ছিল। সেই সময় আমার মনে এক প্রচণ্ড বাসনা জেগেছিল। কি ভাল হত যদি আমিও এই রকম কিছু ভেড়া, দুয়েকটা গাধা এবং এক তিব্বতী যুবতীকে সঙ্গে নিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়াতাম। যেখানে মন চাইত সেখানেই তাঁবু খাটাতাম। যুবতী এবং আমি মিলে গাধা ও ভেড়ার থেকে মালপত্র নামাতাম। দুটো বড় কুকুর আমাদের মালপত্র পাহারা দিত। যুবতী চা বানাত, সেই নির্জন, বৃক্ষহীন উলঙ্গ পার্বত্য উপত্যকায় আমরা দুজন এক নির্দ্বন্দ্ব বিচিত্র জীবন কাটাতাম। জীবিকার জন্য আমরা কিছু বিক্রী করার মতো জিনিষ রাখতাম যা এক জায়গা থেকে আর এক

জায়গায় বিনিময় করতাম। এভাবে কখনো লদাখ, কখনো মানস সরোবর, কখনো ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকায় টশীল হুনপো, কখনো লাসা, কখনো খম (চীনের কাছে পূর্ব তিব্বতের সীমান্ত) আমাদের পায়ের নিচে থাকত। আবার ভাবলাম, মানস সরোবর ও তিব্বতের ডাকাতদের হাত থেকে আমরা দুজন কিভাবে বাঁচতাম? তাছাড়া জীবনের আরো তো অনেক কামনা আছে, যৌবনও চিরস্থায়ী নয়; এতো তখনই হওয়া সম্ভব যখন জীবন হয় হাজার বছরের, যার মধ্যে যৌবনের নগদ পাঁচশো বছর হত। শুধু কামনা দিয়ে কি জীবনকে বাড়ানো যায়? এসব বুঝেও আমার লালসা কমে নি। তা এক কোণে স্থায়ী আসন পেতেছিল।

অনেক মাইল চলার পর আমরা বাঁ দিকে নালার দিকে মোড় নিলাম। এই নালা হন্‌লে থেকে আসছিল। সামনের গ্রামে তিন চারটি বাড়ি ছিল। সব দরজাই বন্ধ ছিল কিন্তু তাতে তালা দেওয়া ছিল না। গঙ্গারাম ডাকাডাকি করলেন। কিন্তু বাড়িতে কেউ থাকলে তো উত্তর দেবে। পাশে যবের খেতে হরিণ চরছিল। গঙ্গারামকে দেখে পালিয়ে গেল। এখানে ঘোড়া বদলাবার কথা এবং খিদেও পেয়েছিল খুব। নদী থেকে দু-তিন মাইল ওপরে গিয়ে গঙ্গারাম গ্রামের প্রধানকে ধরে নিয়ে এলেন। সে তাদের তাঁবুতে যেতে বলছিল। কিন্তু আমি বড় ক্ষুধার্ত ছিলাম।

খাওয়া দাওয়া ও বিশ্রামের পর আমরা আবার নতুন ঘোড়ায় রওনা হলাম। আজ হনলে পৌঁছনোর সম্ভাবনা কম ছিল। গ্রামের লোকদের তাঁবু বাঁদিকে ছেড়ে এক বিশাল উপত্যকা দিয়ে যেতে লাগলাম। সে সময় অনেক 'ঘোড়াকে' আমি দূর থেকে আমার দিকে ঘুরে তাকাতে দেখলাম। গঙ্গারাম জানালেন, ওগুলি ঘোড়া নয়, ক্যাড্ (জংলী গাধা)। আমি বললাম, এগুলি ধরে বোঝা চাপাচ্ছ না কেন? গঙ্গারাম জানালেন একে তো ক্যাড্ (জংলী গাধা) ধরা সহজ নয়, ধরলেও পোষ মানানো যায় না, যদি মারা না পড়ে তাহলে ওরা পালিয়ে যায়। ক্যাড্ (জংলী গাধা) মাঝারী সাইজের ঘোড়ার মতো, কম পেটমোটা, হালকা শরীর। কিছুটা মোটামতো মুখ ও গাধার মতো লেজের কথা ছেড়ে দিলে এগুলিকে একেবারে ঘোড়া বলে মনে হচ্ছিল। সন্ধ্যা হল, অন্ধকার ছড়িয়ে পড়লো। ঘণ্টাখানেক রাতও হয়ে গেল। এতক্ষণে গঙ্গারাম আজই হন্‌লেতে পৌঁছনোর ইচ্ছা ত্যাগ করলেন। আমাদের বাঁ দিকে কিছু তাঁবু দেখা গেল। সেদিকে ঘোড়াকে চালালাম। ডজন খানেক কুকুরের ঘেউ ঘেউ শুনে আমি তো দাঁড়িয়ে পড়লাম, গঙ্গারাম কোনো লোককে কুকুর তাড়াতে বললেন। হন্‌লের কুকুর অতিরিক্ত হিংস্র হয়, একথা আমি হেমিস লামার কাছে শুনেছিলাম।

ইয়াকের লোমের তৈরী এক কালো তাঁবুতে আমরা আশ্রয় পেলাম। তাঁবুর ভেতরে আগুন জ্বলছিল। ধোঁয়া বেরিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁবু ওপরের দিকে কিছুটা কাটা ছিল। গ্যাগর (ভারত) লামার কথা বলায় তাঁবুআলাদের ওপর বিশেষ প্রভাব পড়ল। গৃহিনী নতুন জল, নতুন চা দিয়ে ডেকচিকে আগুনের ওপর রাখল। আমি মাঠটা (ঘোল) খুব ভালবাসি, আর আমি বলায় কাঠের বড় ভাড় ভর্তি ঘন মাঠঠা চলে এল। তাঁবুর ভেতরে চারদিকে ধারে ধারে নানা জিনিষ থাক থাক করে রাখা ছিল। একটা বিশেষ জায়গায় চৌকির ওপর কয়েকটি মূর্তি রাখা হয়েছিল, যাদের সামনে পিতলের প্রদীপের ঘিয়ের আলো জ্বলছিল। খবর পেয়ে পাশের তাঁবু থেকে পায়জামা, কোট ও কানঢাকা টুপির—কানঢাকনা উলটে বানানো গোল টুপি পরে এক মধ্যবয়সী মানুষ এল। সে 'রাম....রাম' বলে হিন্দিতে কথা বলতে শুরু করল। সে কনৌর (বুশহর রাজ্য) থেকে ব্যবসার জন্য এসেছিল। দেশের পণ্যের বিনিময়ে পশম কেনাই ছিল তার ব্যবসা। তার কাছে রাস্তা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম এটা চালু রাস্তা, তিব্বতের এলাকা পর্যন্তই কষ্ট। কনৌর পৌঁছলে একেবারে দেশের মতো মনে হবে।

সকালে এক-আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা হন্‌লে গুম্বা (মঠ) পৌঁছে গেলাম। হন্‌লে গুম্বা

হেমিস গুম্বার শাখা। হেমিস লামা আমার সম্পর্কে চিঠি লিখেছিলেন এবং ওপরের তহ্‌শীলদারের চাপরাসী আমার আর্দালী, তাই খাতিরের কথা আর কি বলবো? গুম্বা একটা ছোট পাহাড়ের ওপর আছে, নিচে তার দুদিকে সবুজ ঘাসে ঢাকা উপত্যকা। আকাশে ঘিরে থাকা মেঘ, মাটিতে বিছানো সবুজ ঘাস এবং সেই স্থানের উচ্চতা সব মিলে হন্‌লেকে বেশী ঠাণ্ডা করে দিয়েছিল। লামাকে খাতির করার সবচেয়ে ভাল জিনিষ ছিল মাংস। কিন্তু তা আমি খেতাম না। অতএব তাঁরা দই ঘি ও দুধ দিয়েই অতিথি সংকার করলেন। আমাকে থাকতে দেওয়া হল সবচেয়ে সাজানো কামরায়। জম্মু থেকে পায়ে হেঁটে আসা এক যুবক সন্ন্যাসী শ্রীনগরে কুকুরের কাছ থেকে একটুর জন্য বেঁচে যাওয়ার অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছিলেন, তাই লাদাখ পৌঁছনোর আগেই স্থির করেছিলাম এক বড় কুকুর সঙ্গে রাখব। হেমিস লামার কাছে আমি একটা কুকুর চেয়েছিলাম। তিনি বললেন, 'হন্‌লের কুকুর আকারে বড় ও মজবুত হয়, আমি সেখানে চিঠি লিখে দিচ্ছি, সেখান থেকে আপনি কুকুর নিয়ে নেবেন।' চিঠি পড়ে মঠের অধ্যক্ষ কুকুরের খোঁজ করতে লাগল। তারপর সে এক পেকিনীজ (চীনা) কুকুর আমার সামনে রেখে বললো, 'বড় কুকুর বোকা হয়। এই কুত্তীটা আমার কাছে লাসা থেকে এসেছে। আপনি ভারতের লামা, আপনাকে আমি এই কুত্তীটা উপহার দিচ্ছি।' কুত্তীটা ছোট ও খুব সুন্দর ছিল। তার লোম ছিল লাল বড় বড় চোখ, কানের ঝোলা চুল খুব সুন্দর দেখাতো। মালিকের ইশারায় কুত্তী তার সামনের দুটো পা ওপরে উঠিয়ে চ্যাপ্টা নাককে আরো চ্যাপ্টা করে পেছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে বসল। আমি ডাকলাম, ঝট করে আমার কোলে চলে এল। পরের দিন তো সে আমার পেছনে পেছনে ঘুরতে লাগল। আমি তাকেই নিতে রাজী হলাম।

সামনের জোতের পরে তিব্বতের সীমায় অনেকটা যাওয়ার পর গ্রাম পাওয়া যেত। গঙ্গারাম বলল, 'এখান থেকে রওনা হয়ে গুম্বার ইয়াক-ক্যাম্প্‌-এ রাত কাটাব। সকালে আপনি ঐ দিকে চলে যাবেন। আমি লেহতে ফিরে যাব।' হন্‌লে থেকে রওনা হওয়ার সময় সেঙ্‌ টুকের(এটাই ছিল কুত্তীর নাম) গলায় পশমের দড়ি বেঁধে আমার ঘোড়ার ওপর বসিয়ে নিলাম। সে বারবার নিচে নেমে যাওয়ার জন্য জোর করছিল। আমি ভাবলাম, হয়তো গুম্বার দিকে পালাতে চাইছে, অতএব প্রথমদিকে তাকে আমি নামিয়ে দিইনি। কিন্তু দুই-আড়াই মাইল যাওয়ার পর যখন তাকে মাটিতে নামিয়ে দিলাম তখন আমাদের পেছন পেছন চলতে লাগল। গলা থেকে দড়ি খুলে দেওয়া হল, এবং তাকে পায়ে চলতে দেওয়া হল। আমরা দুপুরের চা খেলাম কালো তাঁবুতে, এবং সূর্যাস্তের আগেই গুম্বার ক্যাম্প-এ পৌঁছে গেলাম।

সেখানে গুম্বার কয়েকশ ইয়াক চড়ছিল। এক বড় তাঁবুতে পূজা, পানভোজনের সামগ্রীর সঙ্গে সঙ্গে চামড়ার ভেতরে বন্ধ মাখনের বড় বড় চাক ও ছুরার (শুকনো পনীরের) বস্তা ছিল। ক্যাম্প-এর প্রধান গুম্বার এক সাধু খুব দাপটে একডজনেরও বেশী স্ত্রী পুরুষের ওপর হুকুম চালাচ্ছিল। এই সব লোকের কাজ ছিল ইয়াক চরানো, দুধ দোহন করা, মাখন মন্থন, পনীর বানানো এবং তা হন্‌লে ও হেমিসে পাঠানো। যখন আমরা পৌঁছলাম তখন কিছু স্ত্রীলোক ঢোলকের আকৃতির মাটির বাসনে-যার ছোট মুখ লম্বা ও গোল আকারের মাঝামাঝি জায়গায় দই ঢেলে মাখন মন্থন করছিল। মাখন আলাদা হয়ে যাওয়ার পর তারা কিছু গরম জল ঢেলে মাখন তুলে নিত। এই গোটা মাঠাটা খাবে কে? মাঠাকে আবার উনুনে বসানো হত এবং জল কেটে যাওয়ার পর ছেঁকে গাঢ় অংশকে বরফির মতো কেটে সুতোয় গেঁথে রোদ বা হাওয়ায় রেখে দেওয়া হত, এটাই শুকিয়ে ছুরা হত। ছুরা খুব চিমড়ে ও খেতে কিছুটা টক। তৃষ্ণা মেটাতে তা বিশেষ সহায়ক হয়।

গঙ্গারামকে এবার ফিরতে হবে। নুব্রা এবং এদিকের গোটা ভ্রমণ তার জন্য খুব আরামে

হয়েছে, সেজন্য শুধু ভাষায়ই নয় কিছু টাকা দিয়েও আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। গঙ্গারাম খুব খুশী হলেন এবং তহ্শীলদার সাহেবকে একটা চিঠি লিখে দিতে বললেন। আমি তাঁর প্রশংসা করে একটা চিঠি দিলাম, লালা শিবরামকেও একটা চিঠি লিখলাম।

পরদিন দুটো ঘোড়া ও একটি লোককে নিয়ে সামনের দিক রওনা হলাম। জোত পর্যন্ত যেতে কয়েক ঘণ্টা লেগে গেল। চড়াই শুরু হওয়ার পর আমি সেঙ্টুক্‌কে আমার সামনের ঘোড়ার ওপর রেখে নিলাম। কিন্তু সে নেমে গিয়ে পায়ে চলার জন্য ছটফট করতে লাগল। আমি তাকে নিচে নামিয়ে দিলাম। চড়াই খাড়া ও লম্বা, জোতের উচ্চতা ১৮০০০ ফুটের চেয়ে কম ছিল না। ঘোড়া থামলে সেঙ্টুক্ থামত এবং চললে আবার চলত। বরফ সব গলে গিয়েছিল এবং তার মেরুদেশ থেকে অনেকটা দূরে বরফে-ঢাকা চূড়া দেখা যাচ্ছিল। উৎরাইও ছিল অনেকটা এবং আমরা পুরোটা না নেমেই জলের কাছে দুয়েকটা তাঁবু দেখে রাত্রির বিশ্রামের জন্য সেখানে থেকে গেলাম।

সেঙ্টুক্‌কে ছাতুর গুলি দিলাম। সে খায়নি। চুপচাপ অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে সে আমার বিছানার ওপর পড়েছিল। তাকে মাটঠা দেওয়া হল, সে খেল না। তারপর প্রতিবেশীর কাছ থেকে মাংস চেয়ে এনে দিলাম। তার এক-আধ টুকরো খেয়ে আর খেল না। সন্ধ্যা নাগাদ তার কাশি হতে লাগল। রাত্রিতে অনেকবার বিছানা থেকে উঠে পায়খানা-প্রস্রাবের জন্য যেতে লাগল। আমি বুঝতে পারছিলাম যে তার খুব কষ্ট হচ্ছে। সকালবেলা যখন নদীর তীরে হাত মুখ ধুতে গেলাম, সে আমার পেছনে এল। চা খেয়ে যখন রওনা হওয়ার জন্য ঘোড়ায় সওয়ার হলাম, তখন সেঙ্টুক দাঁড়িয়ে আমার মুখের দিকে কাতর দৃষ্টি মেলে দেখতে লাগল। তার সুদীর্ঘ কালো কালো চোখে অপার করুণা ভরা ছিল, আমি বুঝলাম এখন আর তার পায়ে চলার শক্তি নেই। আমি তাকে কোলে নিয়ে নিলাম। তার শিথিল শরীর দেখে মনে হল কালকের চড়াই ও রাত্রির খিদেতে সে শিথিল হয়ে পড়েছে। দু-তিন মাইল যাওয়ার পর যখন প্রথম বাড়ি পেলাম, তখন আমি এক বাটি দুধ আনার জন্য লোক পাঠালাম। গৃহস্বামী এক হাতা ভর্তি দুধ নিয়ে আসতে দেখে আমি সেঙ্ টুক্‌কে তুললাম। তার মাথা ঝুলে পড়ল। কম্পিত বক্ষে আমি তার শরীর, মুখ, হৃদযন্ত্রের গতি পরীক্ষা করে দেখলাম; সে নিষ্প্রাণ হয়ে গিয়েছিল। আমি এমন আকস্মিক ও এত বেশী পীড়া কখনো অনুভব করিনি। আসল অর্থে ঐ সময় আমি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে গিয়েছিলাম। শুধু একটা তীব্র যন্ত্রণা আমার বুকে অনুভব করছিলাম। আমি প্রায় সংজ্ঞাহীনের মতো হয়ে সেঙ্ টুকের মৃতদেহ সেখানেই রেখে দিলাম, আর ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে গেলাম। যে গ্রামে ঘোড়া বদল করার কথা সেখানে পৌঁছে আমার খেয়াল হল, আমি সেঙ্ টুকের মৃতদেহের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইনি, তাকে এক জায়গায় কবর দেওয়া উচিত ছিল। আমি একটি লোককে কিছু টাকা দিয়ে অনেক অনুনয়-বিনয় করে তার কাছে কথা আদায় করলাম যে সে সেঙ্ টুকের মৃতদেহ কবর দেবে। আমার মনের যন্ত্রণা বেড়েই যাচ্ছিল। বারবার আমার চোখে জল আসছিল। মা-বাবার মৃত্যুতে এবং আমার জন্য যারা প্রাণ দিয়েছিলেন, সেই দাদু-দিদিমার মৃত্যুতেও যে চোখে জল আসেনি তাতে আজ ছলছল অশ্রু উপচে পড়ছিল। সেই রাত্রিতেই আমি সেঙ্ টুকের মৃত্যুর জন্য অতিসন্তপ্ত হৃদয়ে আটটি শ্লোক (সেঙ্ টুকাষ্টক) লিখলাম, যার প্রত্যেকটি শ্লোক শেষ হয়েছিল এভাবে—"সেঙ্ টুকে! ত্বৎপ্রয়াণে।"

আমার মনে হচ্ছিল এই হাত দিয়ে আমি এই সুন্দর প্রাণটিকে হত্যা করেছি।

তিব্বতে—জোত পেরিয়ে আমি এখন পশ্চিম তিব্বতের ছু-মূর্তি এলাকায় ছিলাম। প্রাকৃতিক দৃশ্যে এখন কোনো পার্থক্য চোখে পড়ছিল না। স্ত্রী-পুরুষের পোশাকে একটু বিশেষ তিব্বতী ঝলক ছিল। গ্রামের প্রধানের বাড়িতে আমাকে রেখে ঘোড়াওয়ালা চলে গেল। সে

সময়ে আমি বুঝতে পারিনি যে এরপর সওয়ারীর ব্যবস্থা করা এখানে এতটা কঠিন হবে। প্রধান বাইরে কোথাও গিয়েছিল। গৃহিণী বললেন যে তাঁর শীগগীর আসার কোনো সম্ভাবনা নেই। এক অন্ধকার বাড়ির দোতলার কামরায় আমাকে থাকতে দেওয়া হল। অনেকটা দিন থাকতেই আমি পৌঁচেছিলাম। ছাদ থেকে বিস্তৃত উপত্যকাকে দেখে এবং অর্ধমূক বাক্যালাপে দিন কেটে গেল। রাত আসতেই পোকার পলটন যখন ক্রমাগত হামলা শুরু করল, তখন কষ্ট বাড়ল। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পোকার সংখ্যা ও কামড়ও রাড়তে লাগল, তখন কার সাধ্য ঘুমোবে? সারা শরীরে আগুন জ্বলছিল এবং যেখানে কামড়াচ্ছিল সেখানে দাগ পড়ে যাচ্ছিল। আমার কাছে সেই রাত আশেপাশের পাহাড়ের চেয়েও বড় মনে হল। আমার কাছে টাকা পয়সা ছিল এবং খাদ্যবস্তুর মধ্যে কিছু চিনি ও শুকনো ফল ছিল। ছাতু ও আটা গ্রামে পাওয়া যেত, কিন্তু তরকারির জায়গায় শুধু দুধের ব্যবস্থা সম্ভব ছিল। গৃহিণী মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক, বাড়িতে দুয়েকটা চাকর ও দুয়েকটা শিশু ছাড়া আর কেউ ছিল না। ভাষা নিয়ে বড় অসুবিধা ছিল, তা সত্ত্বেও গৃহকর্ত্রীর সম্বন্ধে বলা চলে যে তাঁর ব্যবহার রুক্ষ ছিল না। দ্বিতীয় দিনও কোনোরকমে কাটালাম, আর মশার কামড় থেকে বাচার জন্য আমি উঠানে বিছানা পাতলাম। তৃতীয় দিন প্রধানের বড় ছেলে ভেড়া চরানোর জায়গা থেকে এল। সে বলল, ঘোড়া পাওয়া যাবে না। আমার ঠিক মনে নেই, সেই গ্রামে কতদিন থাকতে হয়েছিল। কিন্তু ঝামেলা ও এগিয়ে যাওয়ার চিন্তা এত বেশী ছিল যে আমার মনে হত, কয়েক মাস না হলেও অন্তত কয়েক সপ্তাহ থাকতে হয়েছিল।

ঘোড়া পাওয়া যাবে না জেনে নিরাশ হয়ে আমি মালপত্র বহনের জন্য লোক চাইলাম, লোক পাওয়াও সহজ ছিল না। লাদাখে তো তহশীলদার সাহায্য করেছিল, লামাদের (মোহন্ত) সঙ্গেও পরিচয় হয়েছিল, কিন্তু এখানে আমার কাছে কোনো সরকারী পরিচয়পত্র ছিল না। হেমিস লামার এক সাধারণ চিঠি ছিল, এখানকার লোক সেই চিঠির এতটাই কদর করতে পারতো যাতে তাদের কোনো ঝঞ্ঝাট পোয়াতে না হয়। শেষ পর্যন্ত দ্বিগুণ তিনগুণ মজুরী দিয়ে একটি লোক পাওয়া গেল এবং সেই পোকার কথা মনে করে সেখান থেকে রওনা হলাম। গ্রামে থাকার এমনি কষ্ট ছিল যে পথ চলার সময় আমার হৃদয়ে সেঙ্ টুকের মৃত্যুর শোকের অল্পই অবশিষ্ট ছিল।

গ্রাম থেকে বেরোবার পর দেখলাম অনেক ভেড়ার ওপর মালপত্র চাপিয়ে কনৌরের এক ব্যবসায়ী আসছে। সে বলল, রাস্তা ভাল। স্পিতীর নদী ও রাস্তা পার হয়ে সন্ধ্যায় রারঙ্গ (?) জোতের আগেই ভেড়া-অলাদের এক আড্ডায় পৌঁছলাম। ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়—আমি দেওয়ালের ভেতরে না গিয়ে আমি ভেড়ার আস্তানায় বিছানা পাতলাম। কিন্তু রাত্রিতে মনে হল এখানকার পোকার কাছেও তাদের ভাইদের তার এসে গেছে। দুয়েকবার জায়গা পালটানোর পর আমি ভেড়াদের আস্তানা ছেড়ে দিলাম। মনে হল, ভেড়ারাও পোকা পোষে।

বুশহর রাজ্য—রাত কাটানো জায়গা থেকে জোত বেশী দূরে ছিল না। চড়াইও ততটা কঠিন ছিল না, উৎরাই কিছুটা কঠিন অবশ্যই ছিল। সামনের গ্রাম রারঙ্গ, যেখানে আমরা দুপুর নাগাদ পৌঁছে গেলাম। জোত পেরিয়েই আমি বুশহর রাজ্যে এসে গিয়েছিলাম। রারঙ্গের বড় গ্রাম এবং তার প্রধানের ভাল পরিচ্ছন্ন বাড়ি ও ভদ্রোচিত পোশাক দেখে আমার খুব আশা হল। হেমিসের লামা প্রধানের নামে আমার জন্য এক চমৎকার চিঠি দিয়েছিলেন, কিন্তু সেই চিঠি পড়ার পর প্রধানের মনে কোনো ভাল প্রভাব পড়া তো দূরের কথা, তার মুখে অন্ধকার নেমে এল। সে বলল—"এখানে ঘোড়া কোথায় পাওয়া যাবে?" আমি বললাম—"ঘোড়া না পাওয়া গেলে, লোকই ঠিক করে দাও।" উত্তর পাওয়া গেল—"তাও মুশকিল।"

ছাদের ওপর বাইরেই আমার মালপত্র রাখা হয়েছিল। চা-জলখাবারের ব্যবস্থা পর্যন্ত কর মুশকিল ছিল। আমি আগের তিব্বতী গ্রামের অভিজ্ঞতা ভুলিনি, অতএব এই অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে এখানে বেশী সময় নষ্ট করতে চাইনি। সুখের কথা ছিল এই যে ভাষার ব্যাপারে আমি এখন কিছুটা স্বাধীন, এখানকার অনেক লোক হিন্দি বুঝত। আমি মালপত্র এখানেই রেখে দিলাম। বোঝা বহন করার লোক ও খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থার জন্য গ্রামে বেরিয়ে পড়লাম। এক জায়গায় তাঁবু খাটিয়ে স্পিতীর কিছু লোকজন শুয়ে ছিল। আমি তাদের কাছে গেলাম। এই সব লোকেরা অমৃতসর, লাহোর ঘুরে এসেছে। তাদের ব্যবসা নাচগান করা। সেখানে একটা ছেলেকে কিছু পয়সা দিয়ে আমি বললাম, সবুজ গমের দানা ভেজে প্রধানের ঘরে পৌঁছে দাও। যখন সে গমভাজা পৌঁছতে এল, তখন প্রধানের ব্যবহারের থেকে মনে হল যে স্পিতীর এই সব গায়ক-নর্তকীদের সে নিচ জাতি বলে মনে করে। যাক্‌গে, তাতে আমার পরোয়া করার কিছু নেই, আমি ভাজা নিয়ে খেলাম। দ্বিতীয়বার গ্রামে ঘোরাফেরা করার সময় আমার এক তরুণ ব্যাপারীর সঙ্গে দেখা হল। সে বেশ ভালো হিন্দি বলতে বলছিল। সে বেশ খাতির করে বসাল, চা খাওয়াল। আমি যখন তাকে আমার অসুবিধার কথা বললাম, তখন সে আমাকে উৎসাহিত করে বলল—এখানকার লোকেরা খুব রুক্ষ হয়, কিন্তু এখন আপনি প্রায় এসে গেছেন। এরপর আপনার আর কষ্ট হবে না। ঘোড়াতো আজকাল তিব্বতের দিকে চলে যায়, কিন্তু মুটে পাওয়া যাবে। এই গ্রাম আমার নয়, তবু আমি একটা মজুর ঠিক করে দেব। বিকেলে আমি আমার মালপত্র তুলিয়ে নিয়ে ঐ যুবকের থাকার জায়গায় চলে এলাম। জায়গাটা এমন যে এখানে যদি দুয়েকদিন থাকতেও হত তাহলেও খারাপ লাগত না।

পরদিন যুবক আমাকে এক নওজোয়ান মুটে যোগাড় করে দিল। সে জাতিতে লোহার যাকে পাহাড়ে নিচ জাতি বলে মনে করা হয়। তার পিঠে মালপত্র চাপিয়ে আমি সেই স্বাগত-শূন্য গ্রামকে ছেড়ে গেলাম। এখানকার গরীবদের মতো এই মুটে ও দুই তিন শীতে সিমলায় মজদুরি করে কাটিয়েছে, অতএব একথা বলা চলে যে সে দেশ দেখা লোক ছিল। সিন্ধুকে ছেড়ে আসার পর থেকেই রাস্তা খারাপ দেখছিলাম। তবু প্রথম জোত পর্যন্ত কোনো অসুবিধা ছিল না। দ্বিতীয় জোতের রাস্তাও একেবারে অসহ্য ছিল না, কিন্তু এখন রাস্তা অত্যন্ত খারাপ যদিও দেশটা অপেক্ষাকৃত গরম। আমরা একটা খাঁজের দিকে মোড় নিয়েছিলাম। আমার মনে হল, কোনো জলধারা পেরিয়ে যেতে হবে। কিন্তু হঠাৎ আমার সামনে অপর একটি ধারা এসে পড়ল। তিন চার শ'ফুট ওপর থেকে হাজার ফুট নিচে ৮০ ডিগ্রীর ঢালে—প্রায় খাড়া এক ধূলা ও ছোট ছোট পাথরের ধারা ধীরে ধীরে পড়ছিল। আমি তো এই সমস্যা নিয়ে বিচার বিবেচনা করতে লাগলাম, কিন্তু নওজোয়ান ধারার এক পারে পা রেখে অন্য পারে লাফিয়ে চলে গেল। ঐ সচল ধূলার ওপর পা রেখে আমার মনে হচ্ছিল যে আমি ঐ ধারার সঙ্গে হাজার ফুট নিচের গহ্বরে চলে যাব। নওজোয়ান বোঝাচ্ছিল—ভয় পাবেন না, হালকা ভাবে পা রেখে এক সেকেণ্ডও দেরি না করে দ্বিতীয় পাকে এই পারে রেখে দিন, কিন্তু আমার সমস্ত বিচারশক্তি এই নওজোয়ানের কথা ও তার ক্রিয়াত্মক উদাহরণের পক্ষে যাচ্ছিল না। প্রশ্ন ছিল আগে যাব, অথবা আবার সেই প্রধানেরই গ্রামে ফিরে যাব। শেষ পর্যন্ত সাহস করলাম। অতটা দ্রুততো আমি পা ওঠাতে পারিনি কিন্তু যখন অন্য পা ভালভাবে অন্য পারের কঠিনমাটির ওপর পড়ল, তখন ধড়ে প্রাণ এল।

দুপুরে আমরা রাস্তায় চা খেলাম। এখানে পাহাড়ী দৃশ্যও লদাখের মতোই। শুধু জায়গাটা কিছুটা গরম বলে মনে হত। ব্যবসায়ী যুবকের গ্রাম বেশ বড় ছিল। এখানে এখনো গমের খেত একেবারে সবুজ, তাই মনে হত যে আমরা এখনো অনেকটা উঁচুতেই আছি। আগের গ্রাম থেকে

এই গ্রামের স্ত্রী-পুরুষের পোশাক কিছুটা আলাদা, এখানকার বাড়িতে কাঠের ব্যবহার কিছুটা বেশী—যদিও ছু-মূর্তির চেয়ে রারঙ্গেও কাঠের ব্যবহার বেশী ছিল; এখানে সফেদা ও বিরী ছাড়াও হয়তো খুবানীর এক আধটা গাছ দেখেছিলাম।

ব্যবসায়ী যুবকের চিঠিতে কাজ হল আর পরের দিন সামনের গ্রামে পৌছনোর জন্য এখানে আমি অনায়াসেই একটা মুটে পেয়ে গেলাম। মুটেটা দুয়েক বিঘত কাঠ ও পাঁচ সাত হাত লম্বা লম্বা দড়ি সঙ্গে নিয়েছিল, আমি ভাবলাম হয়তো ফেরার সময় কিছু মালপত্র তাকে নিয়ে আসতে হবে। গোটা রাস্তাটা উৎরাই, কেবল উৎরাই। নিচে আমরা একটা নদীর তীরে পৌছলাম। নদীর গভীর গর্জন শোনা যাচ্ছিল। দেখলাম নদীর অন্য পারে যাওয়ার জন্য শুধু একটা এক ইঞ্চি মোটা লোহার তার যার দুটো মুখ নদীর দুই তীরে পাথরের চাঙ্গড়ে পুতে রাখা হয়েছে। মুটে মালপত্র মাটিতে রেখে দিল। তারের বরাবর গভীর রেখা কাটা কাঠের টুকরোকে তার ওপর রাখলো, এরপর দড়িকে কাঠের পিঠের ওপর বানানো গভীর রেখাগুলিতে জড়িয়ে নীচে দুটি ফাঁস ঝোলালো। পিঠের উপর মোট নিয়ে নিজের দুই ঠ্যাঙ্ দুই ফাঁসে জঙ্ঘা পর্যন্ত ঢুকিয়ে দিল, তারপর হাত দিয়ে তার টানতে টানতে সর সর করে এগোতে লাগল। নদী বেশ চওড়া। পাথরের ওপর দিয়ে দ্রুত প্রবহমান এই নদী গম্ভীর গর্জন ও বাঁধনহারা জলের রূপ ধরে বয়ে যাচ্ছিল। মুটে যাওয়ার সময় বলে গেল, সে মালপত্র অপরপারে রেখে আসছে, তখন আমাকেও নিয়ে যাবে।

আমি কখনো সেই ধ্বনিত বাঁধনহারা জলের দিকে তাকাচ্ছিলাম, কখনো আমার নজর পড়ছিল কয়েক হাত ওপরে ঝোলানো পাতলা তারের ওপর। ধূলি নদী পেরিয়ে আমার কিছুটা সাহস বেড়েছিল, কিন্তু এতটা বাড়েনি যাতে এই তারের উপর দিয়ে যাত্রা অনায়াস করে দিতে পারত। মুটে এপারে ফিরে এল, সে আমার জন্যও একই রকমের ফাঁস বানাল। তাতে ঠ্যাঙ ঢোকানোর সময় আমার হৃৎস্পন্দন অনেকটা বেড়ে গিয়েছিল। আর যখন আমার পা পাথরের চাঙড় থেকে আমাকে ধাক্কা দিয়ে ধারার উপর ঠেলে দিল, তখন ভয় একেবারে চলে গেল। মনে হচ্ছিল আমি স্প্রিঙের মতো তারের ওপর দোলনায় দুলছি। পরে পৌছে ইচ্ছে হল আবার একবার এই দোলনায় দুলে মজা করি, কিন্তু মুটের সময়ের খেয়ালও তো রাখা দরকার।

এখানে বেশ গরম মনে হচ্ছিল। নদী থেকে কিছুটা এগিয়ে খেত দেখলাম, যার ফসল কাটা হয়ে গিয়েছিল। উচ্চতার দিক থেকে দেখলে একই পাহাড়ে কোথাও গম কাটা হয় গেছে, কোথাও সবুজ গম তৈরী, কোথাও বা একেবারে কাঁচা সবুজ, এই দৃশ্য হিমালয়ে সাধারণ ব্যাপার, তাই দুই-তিন ঘণ্টার পরেই সবুজ গমের জায়গায় গোলায় তুলে রাখা শস্য দেখতে পাওয়াটা আমার কাছে আশ্চর্যের ছিল না। গ্রামের কাছে অনেক খুবানীর গাছ দেখলাম যাতে হলুদ খুবানী পেকে ঝুলছিল। গ্রাম বিশেষ দূর ছিল না, আর সেখানে পৌছে মুটে মালপত্র রেখে যখন নতুন লোক নিতে বলল, তখন সেখানকার লোকদের মধ্যে তাড়াহুড়া পড়ে গেল। আমি খুঁজে খুঁজে দুই গ্লাস মাঠা খেলাম—দুধের প্রতি আমার যেমন বিরক্তি, মাঠার প্রতি আমার তেমনি প্রেম। এবার মোট বওয়ার জন্য এক বুড়ীকে পেলাম।

কিছুটা চড়াই ছিল, কিন্তু রাস্তা কঠিন ছিল না। সম্ভবত আগস্ট কেটে গিয়েছিল, কোথাও বরফের নাম পর্যন্ত ছিল-না। সুম্‌নম-জোতের আগে শেষ গ্রাম পর্যন্ত পৌছতে পৌছতে মেঘে আকাশ ছেয়ে গিয়েছিল। গ্রাম ছোট কিন্তু কাঠের ব্যবহারে যথেষ্ট অকৃপণতা দেখা যাচ্ছিল, বাড়িঘর পরিচ্ছন্ন এবং অপেক্ষাকৃত ভাল ধরনের। গ্রামবাসীরা বেশির ভাগ সুম্‌নমের লোক, যারা,এতদিন যাদের দেখেছি তাদের থেকে বেশি পরিচ্ছন্ন ও সংস্কৃত। গ্রামের আশেপাশে খেতে

সবুজ গম ও গ্রিম (লংগা যব) তরঙ্গিত হচ্ছিল। রাত্রিতে কিছুটা বৃষ্টিও হয়েছিল। এখানেও সামনে যাওয়ার জন্য মুটে পেতে অসুবিধা হয়নি।

সুম্‌নম্—দ্বিতীয় চড়াই টের পেলাম না। কিছুদিন হেঁটে যেতে যেতে এখন হাঁটার অভ্যাসও হয়ে গিয়েছিল, এবং খালি হাত পা হাওয়ায় রাস্তার আনন্দটা পেতে লাগলাম। জোত পেরিয়ে উৎরাই এল, আর সেটাও সহজ ছিল। এ পর্যন্ত পায়জামা পরা নোংরা মোটা গোল চেহারা, চোখ ও গালের হাড় বেরিয়ে আসা মেয়েদের দেখে দেখে অনেক দিন কেটে গেছে, তাই যখন আমি প্রথম প্রথম সুম্‌নমের স্ত্রীলোকদের দেখলাম যারা জলের নালা মেরামত করছিল, যাদের কাঁধে কাঁটা দিয়ে আটকানো পশমী শাড়ি, টিকলো নাক, তন্বী ফর্সা শরীর, তখন তাদের দেখে মনে হল—আমি সৌন্দর্যের দেশে এসে গেছি। তাদের অসাধারণ মধুর কণ্ঠের গান শুনে সংস্কৃত সাহিত্যের কিন্নর কণ্ঠের প্রশংসা সঠিক বলে মনে হল। বস্তুত কনৌর কিন্নরেরই অপভ্রংশ। এদিকে আবার আমরা দেবদারু গাছ দেখতে পেলাম। যদিও এখনো তারা আকারে ততটা উঁচু নয়, তবু সবুজকে দেখার জন্য তৃষিত চোখের আজ অতিশয় তৃপ্তির অনুভূতি হতে লাগলো।

গ্রামের বাড়ি ঘরের ছাদ কাঠের পাটাতনের, যখন দেবদারু গাছের এমন প্রাচুর্য, তখন কাঠের ব্যবহারে কিপ্টেমির দরকার কি? খেতের সব ফসল কাটা হয়ে গেছে, আর গোলায় ফসলের স্তূপ দেখে বোঝা গেল যে এখানে ভাল চাষবাস হয়। অনেক খেতে গিয়েছিল, আর সম্ভবত সেইজন্যই নালা মেরামত হচ্ছিল। আমাকে বেশ বড়সড় আলো হাওয়া যুক্ত পরিচ্ছন্ন ঘরে থাকতে দেওয়া হল। মনে হল এখানকার সবাই খুব মিশুক আর আমি বিগত কয়েকদিনের কষ্ট ভুলে গেলাম। গৃহকর্ত্রী আমাকে খেতে বললেন। খেয়ে বুঝলাম এখানে রুটি, শাক, তরকারি ভাব্যা খাওয়ার রেওয়াজ। ফাফড়ের শাক ও গমের রুটি একেবারে আমাদের দেশের মতো তৈরি হয়েছিল, আর খেতেও খুব সুস্বাদু লাগল। গ্রামে উর্দু লিখতে ও পড়তে পারে এমন অনেক লোক ছিল, খোঁজ করে জানতে পারলাম যে একজনের কাছে লাহোরের কোনো উর্দু খবরের কাগজ—হয়তো 'প্রকাশ'—আসে। লেহ ছাড়ার পর খবরের কাগজ আমার চোখে পড়েনি, অতএব এই কাগজের চার-পাঁচ সপ্তাহের সব সংখ্যা নিয়ে তাঁর ওপর ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লাম। সংস্কৃতির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হয়তো মানুষের জিজ্ঞাসা বেড়ে যায়, অতএব এখানকার লোক কথাবার্তা বলতে আমার চেয়েও বেশী উৎসুক ছিল। কোথাও বেড়াতে যেতে এখানকার যে কোন নওজোয়ান পথপ্রদর্শক হতে প্রস্তুত ছিল। স্ত্রীলোকেরাও নবাগতদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে অথবা তাদের সাহায্য করতে পুরুষদের চেয়ে পেছিয়ে ছিল না। সুম্‌নমের লোকরা চাষবাস ছাড়া তিব্বতের সঙ্গে ব্যবসাও করে। মোলায়েম তিব্বতী পশম বোনা, গুদমা, পট্টবস্ত্র ও পশমীনার চাদর তৈরী করতে এখানকার স্ত্রীলোকেরা খুব দক্ষ—এই হল সুম্‌নম-এর মানুষের সুখকর অবস্থার কারণ।

যদিও জোতের এদিকের প্রকৃতি ও মানুষের আকৃতি ও বেশভূষায় সম্পূর্ণ আলাদা—এখানকার লোক জোতের অন্যপারের লোকদের জাট বলত এবং হেয় মনে করত—তথাপি লামা বৌদ্ধধর্মই এদের ধর্ম এবং সব ভাইয়ের সম্মিলিত বিয়েই (বহুপতি বিবাহ) এদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কয়েক বছর হল রাজা বহুপতিবিবাহ নিষিদ্ধ করেছেন। কিন্তু এখনো তা বন্ধ হয়নি। কনৌরে কনৌরিয়া যারা নিজেদের রাজপুত বলত—ছাড়া কোথাও কোথাও লোহারও দেখতে পাওয়া যায়, যাদের অস্পৃশ্য মনে করা হত। লোহাররা স্বর্ণকারেরও কাজ করে থাকে। আমি এক লোহারের বাড়ি গিয়েছিলাম, সে বড় সূক্ষ্মভাবে তার হাতুড়ি চালাচ্ছিল, আর যখন আমি গিয়ে তার পাশে বসলাম, তখন আমার প্রতি তার স্নেহ বেড়ে গেল—এক উঁচু জাতির মানুষের পক্ষে অস্পৃশ্যের পাশে বসাটা থোড়াই সাধারণ ব্যাপার।

আমার সঙ্গে যে নওজোয়ান গিয়েছিল, সে ছিল আর্যসমাজী (বুশহরের পাহাড়ে যত্রতত্র আর্যসমাজী দেখা যায়) তাই তার আপত্তি ছিল না।

সুম্‌নমে একাধিক দিন ছিলাম। সেখান থেকে এক শুদমা, এক পশমী শাড়ি (চাদর) এবং এক পশমীনার চাদর কিনলাম। কনমু যেতে এখান থেকে একটা সোজা রাস্তা আছে। তাতে সামনের জোত পার হতে হয়। কিন্তু পায়ে হেঁটে পাহাড়ের চড়াই পার হওয়ার উৎসাহ ছিল না আমার, যদিও হেমিস লামা লিপ্পের জ্যোতিষীর কাছে বিশেষভাবে চিঠি লিখে দিয়েছিলেন। অন্য রাস্তা সুম্‌নমের নদীর সঙ্গে নিচে গিয়ে শতদ্রুর পারে তিব্বত-হিন্দুস্থানের প্রধান সড়কের সঙ্গে মিশে গেছে। আমি 'বরস দিনে'র (লম্বা) রাস্তা পছন্দ করলাম। কনম্ পর্যন্ত যাওয়ার লোক পাওয়া গেল। উৎরাইয়ে খালি হাতে যাওয়া এবং তাও মেরামত করা রাস্তা, সে তো সুখের কথা। বৃষ্টির ভয়ে রাস্তায় এক গ্রামে কিছুক্ষণের জন্য থামতে হল। এখানে খুবানীর গাছ ছাড়া আপেল গাছ ও আঙ্গুর লতাও ছিল, কিন্তু এখনো ফল পাকেনি। এখানেই প্রথম এই দোকানদার দেখতে পেলাম। তার কাছে তেল, নুন, সিগারেট, দেশলাই ধরনের কিছু জিনিষ ছিল। সামনে নদীর ওপর এক পুল পেলাম। তার এই পার থেকে উপরের দিকে একটা রাস্তা চলে গিয়েছিল। এই রাস্তাই সিমলা থেকে যাওয়ার তিব্বত হিন্দুস্থান রোড। সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ভারত সরকার এই রাস্তার জন্য অনেক টাকা খরচ করে। এই পথে সব জায়গায় মজবুত পাকা অথবা লোহার পুল আছে, কিছুটা দূরে দূরে ডাক বাংলো আছে। সড়ক এতটা চওড়া যে কিছুটা বাড়ালে অথবা এই অবস্থায়ও এ দিয়ে বেবী অস্টিনের মতো গাড়ি যাতায়াত করতে পারে।

পুল থেকে কিছুটা এগিয়ে আমরা সাক্ষাৎ শতদ্রুর ডান তীরে, কিন্তু নদী থেকে অনেকটা উঁচুতে পৌঁছে গেলাম। আমরা যত এগিয়ে যাচ্ছিলাম, ততই দেবদারু গাছ উঁচু ও ঘন সবুজ হয়ে যাচ্ছিল। সটান সোজা দাঁড়ানো হাতের মতো নিজের ছড়ানো শাখা দিয়ে শিখরের দিকে ক্রমশ সরু হয়ে যাওয়া চিরহরিৎ বৃক্ষ দিয়ে ঢাকা হিমালয়কে যে দেখে নিয়েছে, সে তার চক্ষু সার্থক করেছে আর যে জায়গায় আমি এই গাছগুলিকে দেখেছিলাম সেই উপত্যকার এই মাহাত্ম্য আছে যে সারা হিমালয়ে এত লম্বা দেবদারু ক্ষেত্র কোথাও পাওয়া যায় না; অনেক জায়গায় এই ক্ষেত্র দশ, পনের ও বিশ মাইল পর্যন্তই বিস্তৃত হয়। কিন্তু এখানে তা সুম্‌নমের সামনে থেকে প্রায় সরাহনের কাছাকাছি চলে এসেছে। এই উপত্যকার মধ্যে শতদ্রু উপত্যকা-কে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের রাণী বলা উচিত।

সামনের সড়কের মেরামতের কাজে কিছু বল্‌তী মজদুর রত ছিল, সেখানেই এক নওজোয়ান সড়কের অধিকারীর সঙ্গে দেখা হল। তিনি আমার সফর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন এবং আমরা বন্ধুর মত....কনমের দিকে রওনা হলাম। নওজোয়ানের নাম ছিল বেলীরাম, সে সড়ক ইনস্‌পেকটর ছিল। সেই সময় তিব্বতের ইতিহাস ও তার ভাষা প্রভৃতির সঙ্গে আমার কোনো পরিচয় ছিল না। তাই বেলীরামের গ্রাম কনম্ ও তার লোচওয়া রিন্‌ছেন্‌জঙ্‌পোর মহত্বের ধারণা করতে পারিনি। হেমিসলামা বলেছিলেন যে কনম্-এ এক পুরনো মঠ আছে যার সঙ্গে সম্বন্ধ আছে একজন বড় লামা লো-ছেন-রিম্-পোর সঙ্গে। বেলীরামের বাড়িতে না থেকে আমি মঠে থাকাই পছন্দ করলাম, কেননা মঠকে আমি বড় মঠ মনে করেছিলাম এবং আমি তা দেখতে চেয়েছিলাম। গ্রামের ভেতর মঠ, আশেপাশের বাড়ি ঘর থেকে বিশেষ বড় নয়, তবে সাধারণ বাড়ির মতো নয়। সেখানে কন্‌জুরের পুস্তক রাখা ছিল। মঠে দুয়েকটি লোক ছিল, কিন্তু কোনো ভিক্ষু ছিল না। আমি পৌঁছনোর পর পাশের গলি থেকে রোশনচৌকীর সুরেলা আওয়াজ কানে এলো। দেখলাম, লাল কাপড় পড়ে কিছু ভিক্ষু ছাতুর বলিপিণ্ড জলে ভাসিয়ে দিতে

যাচ্ছে, হয়তো তারা কারো বাড়ির ভূত তাড়ানোর কাজে লেগেছিল। শ্রীনগরে যে বুট নিয়েছিলাম, তা এখন জবাব দিচ্ছিল, গ্রামের মুচির কাছে গিয়ে আমি তা মেরামত করালাম।

কনম্ বড় সুন্দর জায়গা, তার চারদিকে বিশাল দেবদারুর বন। কয়েকশ ফুট নিচে শতদ্রু—যাকে এখানকার লোক 'সমুদ্র' বলে—এর প্রবাহ্ বয়ে যায়, কিন্তু অনেকটা দূরে বলে তার গম্ভীর ধ্বনি গ্রামে শোনা যায় না। গ্রামের এক কোণে এক বিশাল বাড়ি দেখিয়ে বেলীরাম বলল, এই বাড়িতে হালে কয়েকজন ইংরেজী ও তিব্বতীর পণ্ডিত হয়ে গেছেন, কিন্তু তারা সবাই যৌবনেই মারা যান, এখন কয়েকটা বাচ্চা রয়ে গেছে।

সামনে মাল বওয়ার জন্য বেলীরামজী একজন অথবা দুজন স্ত্রীলোককে ঠিক করে দিল। এখন রাস্তার ধারের গ্রামে দোকান দেখছিলাম। ডাকবাংলোতে আমাকে থাকতে দিত না, কেননা তার জন্য আগেই শিমলা থেকে অনুমতি আনতে হত, কিন্তু দোকানে, মানুষের বাড়িতে এবং কোথাও কোথাও ধর্মশালায়ও জায়গা পাওয়া যেত। দেবদারুর ছায়ায় যেতে যেতে মনে হচ্ছিল আমি আমার প্রাণ ও আয়ু বৃদ্ধি করছি। রাস্তায় যেখানে সেখানে বিশ্রামের জন্য, জল খাওয়া অথবা গল্প করার জন্য মালবহনকারিণী স্ত্রীলোকেরা বসে যেত। সেই দিন অথবা তার পরদিন চিনী পৌঁচেছিলাম তা মনে নেই।

চিনী—চিনী শেষ ডাকঘর। এখানে বুশহর রাজ্যের তহশীলদার থাকে। এখানে অনেক দোকান, মিড্‌ল্ স্কুল, দেবীর মন্দির ও ডাকবাংলো আছে। বুশহর রাজ্যের বার্ষিক আয় তিন লাখের কাছাকাছি, কিন্তু রাজার সবচেয়ে বেশী আয় হত দেবদারুর জঙ্গল থেকে যা বছরে সতের আঠার লাখ বলে শোনা যায়। অরণ্য বিভাগ জায়গায় জায়গায় ডাকবাংলো, মুন্সীখানা আর মজুরদের জন্য দোকান তৈরী করেছে। বেলীরাম অরণ্য বিভাগের ডাকবাংলোর মুন্সীর নামে চিঠি লিখে দিয়েছিল। বাংলোতে পৌঁছনোর আগে দেখলাম রাস্তায় কিছু স্ত্রী-পুরুষ নাচছে। একদিকে ছয়-সাতজন স্ত্রীলোক হাতে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। অন্যদিকে দাঁড়িয়েছিল ছয়-সাতজন পুরুষ। মেয়েরা কোন গান গাইছিল। পাশে একটি লোক ঢোলক বাজিয়ে তাল দিচ্ছিল এবং তার তালে তালে পা উঠিয়ে পরস্পরের মুখোমুখি আসছে এবং আবার পেছনে সরে গিয়ে চন্দ্রাকার সারি তৈরী করছে। আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তাদের নাচ দেখলাম। তাদের অভিযোগ হল—যখন থেকে রাজা মদ বন্ধের হুকুম দিয়েছেন তখন থেকে নাচে আগের মতো রঙ জমছে না।

ডাকবাংলোতে অরণ্যের কন্‌জারভেটার একজন যুবক 'কাশ্মীরী' পণ্ডিত উঠেছিলেন। মনে নেই কিভাবে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল, তারপর তাঁরই আতিথ্য স্বীকার করতে হল। বাজার ও স্কুল দেখতে গেলাম, সেখানে মন্দিরে এক জটাধারী বৈষ্ণব সাধুর সঙ্গে দেখা হল। বেচারী মানস সরোবর যাচ্ছিলেন। কিন্তু দু-দিন ওপরে যাওয়ার পর যখন ছাতু ও ঘোল খাওয়ার মুখোমুখি হতে হল এবং সেই সঙ্গে মাংস, এঁটো-কাঁটা নিয়ে বিচার বিবেচনা থাকছে না দেখেই তিনি ধর্ম বাঁচিয়ে ফিরে এলেন। হতে পারে কঠিন রাস্তা দেখেও তিনি সাহস হারিয়ে ফেলেছিলেন। চিনীকে আমার আদর্শ গ্রীষ্মাবাস বলে মনে হল। চারদিকে দেবদারুর সুষমা, কম বৃষ্টি, আকাশ অধিকতর স্বচ্ছ, বাইরের জগৎ ও খবরের কাগজের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার জন্য পাশে ডাকঘর, সাধারণ পানভোজনের খাদ্যসামগ্রীর জন্য দোকান, খুবানী, আখরোট, আপেল ও অন্যান্য ফলের গাছ। সেহ্ ও খলচের মতো চিনীতেও মোরাভিয়ান মিশন কাজ করছিল। কিন্তু সেখানকার জার্মান পাদ্রী যুদ্ধের সময় চলে গিয়েছিলেন। মিশনের বাংলোতে আজকাল রাজার তরফ থেকে ডিসপেনসারি খোলা হয়েছে। বাগানের গুজবেরি আমিও খেতে পেয়েছিলাম।

রাজকীয় দপ্তরে যারা কেরানির কাজ করত তারা যে জাতেরই হোক না কেন এখানে তাদের

কায়স্থ বলা হয়। উর্দু ছাড়া অন্য আর একটা লিপিও এখানকার লোক ব্যবহার করত যা কাশ্মীরের শারদা অথবা পুরনো গুপ্তলিপির সঙ্গে বেশী মেলে। তহশীলদার সাহেব বাইরে গিয়েছিলেন, অতএব চিনী থেকে চলে যাওয়ার সময় তার সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়েছিল। বেশভূষায় শিক্ষিত সন্ন্যাসী দেখে তিনি আমাকে ফিরে গিয়ে আরো দু-চার দিন থাকার জন্য খুব আগ্রহ করতে লাগলেন, কিন্তু একবার রওনা হয়ে যাওয়ার পর ফিরে যেতে আমার ভাল লাগেনা এবং আবার তো সেই চড়াইয়ের দিকেই ফিরে যেতে হবে।

কতদিনে চিনী থেকে সরাহনে পৌছলাম, তা মনে নেই, কিন্তু রাস্তায় অরণ্য বিভাগের ::হকুমার কর্মচারীদের থেকে আমি অনেক সাহায্য পেলাম। আমি বেশীরভাগ সময় তাদের ওখানেই থাকতাম। কোনো কোনো গ্রামে সস্তা সিগারেটের বড় বড় বিজ্ঞাপন লাগানো ছিল, পাহাড়ী লোকেরা সিগারেট খাওয়ায় খুব বাহাদুর হয়। তাই সুদূর হিমালয়েও এমনি বড় বড় কাগজ সেঁটে দেওয়া অকারণ ছিল না।

স্পিতীর দিকে যে রাস্তা যাচ্ছিল তার পাশের পাকা পুল দিয়ে শতদ্রু পার হয়ে যখন আমি হালকা চড়াই পার হচ্ছিলাম, তখন দুয়েকজন ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীকে ওপরের দিকে যেতে দেখলাম। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম তারা সরাহনের দিক থেকে আসছে, আর যজমানীর জন্য যাচ্ছে। যখন কনৌরের লোকেরা নিজেদের রাজপুত বলতে শুরু করল, তখন তাদের পক্ষে ব্রাহ্মণদেরকে স্বীকার করে নেওয়া তারপর উঁচু-নিচু, ছোঁয়াছুঁয়ির বিচারের পরাকাষ্ঠায় পৌছে যাওয়াটা আবশ্যিক ছিল। আমি একে বৌদ্ধধর্ম ছেড়ে পতনের দিকে যাওয়া বলে মনে করতাম।

যেদিন আমার সরাহন পৌছনোর কথা ছিল, সেদিন অরণ্যবিভাগের এক যুবক কনৌরী কেরাণী আমার সঙ্গী হল। যুবককে ম্যাট্রিক পাস ও কথাবার্তায় বুদ্ধিমান মনে হল, নাম ছিল হয়তো প্রতাপসিংহ। অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের মতো এখানেও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে শুধু রাজার ও তাঁর কৃপাপাত্রদের। রাজ্যের অত্যাচার সম্পর্কে এক-আধটা লেখা লাহোরের উর্দু কাগজে বেরিয়েছিল। পদস্থ কর্মচারীদের এই যুবকের ওপর সন্দেহ হল, এবং তাকে জেলে দেওয়া হয়। সে যাতে অপরাধ স্বীকার করে তার জন্য অনেক চেষ্টা করা হয়, তাতে সফল না হওয়ায় এবং এই খবরও কাগজে বেরিয়ে যাওয়ায় যুবককে ছেড়ে দেওয়া হয়। প্রজার ওপর রাজার অত্যাচার সম্পর্কে সে অনেক কথা বলেছিল কিন্তু এতকাল পরে এখন আর তা কিছু মনে পড়ছে না। সরাহনের পাশের বাঁকের আগেই দেবদারুর মেখলা শেষ হয়ে গিয়েছিল, এবং তার স্থান নিয়েছিল অন্যান্য বড় বড় গাছ ও ঘন জঙ্গল। এদিকে গ্রামও অনেক ছিল।

সরাহনে অরণ্যবিভাগের ওভারসিয়ারের এখানে উঠেছিলাম, যাঁর জন্য কেউ আমার পরিচয়পত্র দিয়েছিল। সরাহন অনেকটা ঢালু জমির ওপর গড়ে ওঠা ছোট শহর নয়, বড়সড় গ্রাম, যেখানে রাজ্যের বাহ্যিক শোভা প্রদর্শনের জন্য ছিল রাজমহল, রাজোদ্যান এবং দুয়েকটা মন্দির। গরমের দিনে রাজাসাহেব রামপুর থেকে এখানে চলে আসেন। তৎকালীন মহারাজা ইংরেজ শাসকদের কৃপাপাত্র বলে গদীর মালিক বলে বিবেচিত হন, কিন্তু প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছিল অন্য এক রাজকুমার। অবিনয় ও স্বাধীন মনোভাবের জন্য যাকে রাজপদ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। অনেক বছর ধরে সে দুর্গম পাহাড়ে গিরিগুহায় ও জঙ্গলে লুকিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়েছিল, কিন্তু ইংরেজের বিরুদ্ধে মোকাবিলা সে কিভাবে করবে? এই রাজকুমারের অনেক কীর্তিগাথা এখনো জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত, জনসাধারণের চোখে নতুন রাজা বঞ্চক।

ওভারসিয়র সাহেব একদিন আমাকে রাজার কাছে নিয়ে গেলেন। তাঁর বয়স পঞ্চাশের বেশি। দেখতে ও কথাবার্তায় তাঁকে সাদাসিধা ও বিনয়ী মনে হল। সন্দেহ হল, এমন ভালমানুষ

লোকের পক্ষে প্রজাদের সঙ্গে এই ব্যবহার করা কিভাবে সম্ভব? কিন্তু দোষ তো প্রতিষ্ঠানের, একমাত্র অসাধারণ ব্যক্তিই তার উর্ধ্বে উঠতে পারে, আর ইংরেজ রেসিডেন্টের বক্র দৃষ্টির সামনে তা করাও সহজ নয়। বুশহরের মতো সীমান্তবর্তী রাজ্যে জনপ্রিয় রাজা থাকলে ব্রিটিশের পক্ষে তা আরো বেশী বিপজ্জনক। সরাহন থেকে রামপুর টেলিফোন লাগানো আছে। রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণেই এক পাগল সাধুর কুঠিয়া ছিল, যার সিদ্ধি সম্পর্কে নানা রকমের খবর শোনা যেত। তাঁর ওপর রাজাসাহেবের খুব শ্রদ্ধা ছিল। গালি দিতে এই পাগলের মুখে লাগাম ছিল না। রাজাকেও সে অনেক গালাগাল দিত, কিন্তু শাপের ভয়ে রাজাসাহেব সব কিছু হাসতে হাসতে শুনে যেতেন। রাজাসাহেবের তখন শুধু একটি ছেলে তিনি অল্প বিস্তর রাজকার্য করতেন। বলা হত যে পুরনো রাজকুমারকে বঞ্চিত করায় এবং তাঁকে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে মরতে বাধ্য করার পাপের এই পরিণাম, আর সেই কারণেই রাজবংশের একেবারে বৃদ্ধি নেই। অন্য এক ভদ্রলোক কয়েক বছর পরে এই বিষয়ে এরকম বলল। তিব্বতের লামা টোমো-গেশে-রিন্‌পো-ছে একবার কনৌর গিয়েছিলেন। তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার কথা জনতার কাছ থেকে রাজার কাছে পৌঁছয়। রাজা তাঁর পরিবারের ওপর ভূতের উপদ্রব দূর করার জন্য টোমে-গেশেকে খুব আদর-যত্ন করে ডেকে আনলেন। লামা তন্ত্র-মন্ত্রের ক্রিয়া কর্ম করলেন এবং তার শুভ পরিণাম রাজা দেখলেন, এবং লামার ওপর তার আস্থা খুব বেড়ে গেল। বিদায়ের সময় লামা কন্‌জুর, তন্‌জুরের এক এক গ্রন্থের নকল রাজপ্রাসাদে রাখার কথা বলেছিলেন। রাজা কয়েক হাজার টাকা খরচ করে তিব্বত থেকে এই দুটি বিশাল গ্রন্থ আনালেন। কিন্তু পরিণাম হল উল্টো। একটা ছাড়া অন্য সব রাজপুত্র মারা গেল, রাণীদেরও একই অবস্থা হল। ব্রাহ্মণেরা লামার প্রভাবে শংকিত ছিল, তারা এই সুযোগকে অনুকূল মনে করল। এবং সঙ্গে সঙ্গে বলতে শুরু করল—নাস্তিকের পুস্তক রাখায় দেবতারা রুষ্ট হয়ে গেছেন। রাজা কন্‌জুর তনজুরকে রাজপ্রাসাদ থেকে বার করে অন্য এক বাড়িতে রেখে দিলেন। আমি হয়তো সেই বাড়িতেই তা দেখেছিলাম।

রাজার বাগানে অনেক লাল লাল আপেল ফলে ছিল, কিন্তু এখনো পাকতে দেরি ছিল। সুম্‌নামে বৃষ্টি খুব কম হয়। কলম ও চিনীও মনসুমের ছিটেফোঁটাই পায়, কিন্তু সরাহন ও তার নিচের জায়গা মনসুমের এলাকায়। এইসময়ে (সেপ্টেম্বরে) খুব বৃষ্টি হচ্ছিল, আর কাশ্মীর থেকে কিনে আনা বরসাতীর উপকার আমি এবার পেলাম। বৃষ্টির জন্য বর্ষা নালাগুলো রাস্তার অনেক জায়গা ভেঙে দিয়েছিল। এরকম একটি ভাঙা জায়গায় দেখলাম, পা পিছলে এক মালবোঝাই খচ্চর রাস্তার নিচে নেমে বসে গেছে, আরো কিছুটা সামনের দিকে যদি পা হড়কে যেত তবে সে মালপত্র নিয়ে কয়েকশ' ফুট নিচের গর্তে পড়ে যেত। খচ্চর-ওয়ালা ভাড়া নিয়ে কোন ব্যবসায়ীর মাল শিমলা থেকে আনছিল। খচ্চরের দাম অনেক। বেচারা কাঁদছিল এবং খচ্চরকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিল। খচ্চর যখন উঠে বাইরে বেরিয়ে এল তখন তার মতো আমারও খুব আনন্দ হল। দুর্গম পাহাড়ী রাস্তায় চলতে খচ্চর শুধু মজবুতই নয় বড় সতর্কও থাকে, কিন্তু তাদেরও ভুল হয়েই যায়।

রামপুরে রাজার কর্মচারী এক ব্রাহ্মণের জন্য আমার কাছে পরিচয়পত্র ছিল। সরাহনের পাঞ্জাবী ওভারসিয়র তা দিয়েছিল। থাকার জন্য অসুবিধা হয়নি। এখানে নদীর (শতদ্রু) তীরে সাধুদের মঠ ছিল। সেখানেও থাকার ব্যবস্থা ছিল। আমি এক-দুদিন থেকে রাজধানী, রাজপ্রাসাদ, বাজার ইত্যাদি দেখলাম। ওপরের প্রকৃতির সৌন্দর্যের তুলনায় এই প্রদেশকে আমার দরিদ্র মনে হল। তবে এখন সর্বত্রই দোকানী ও বেনেদের আধিপত্য ছিল।

রাজ্যের সীমান্তের কাছে শিমলা জেলার রাস্তার ধারে এক গ্রাম পর্যন্ত মুটের ব্যবস্থা ব্রাহ্মণ

করে দিলেন, আর সেই গ্রামের এক মহাজনের কাছে একটা চিঠিও লিখে দিলেন। আমি তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রামপুর থেকে রওনা হলাম। সেইদিন নাকি তার পরদিন সেই গ্রামে পৌঁছলাম তা বলতে পারি না। রাস্তায় থাকার জন্য রাজার ধর্মশালা ছিল। রাজ্যের সব জায়গাই নতুন মানুষের সঙ্গে দেখা করার কোনো অসুবিধা হয়নি, কিন্তু এখানে এসে তা ষোলকলায় পূর্ণ হল। মহাজনের বাড়ি আম্বালা জেলায়, সে আশেপাশের সরল পাহাড়ীদের ঠকিয়ে অনেক সম্পত্তি করেছিল। কাগজ, নুন, তেলের ব্যবসা ছাড়া সে সুদেও টাকা খাটাত। গ্রাহককে নিজের কাছে টেনে আনার বিদ্যাও তার খুব ভালভাবেই জানা ছিল। তার জন্য তামাক হুঁকা সর্বদাই প্রস্তুত থাকত। চিঠি ও আমাকে দেখে তার মুখ ঝুলে পড়ল। সে বসতেও বলল না, আর আমাকে কোনো জবাব না দিয়ে ঘরের যুবতী স্ত্রীর সঙ্গে তার জন্য আনা কিন্তু পছন্দ না হওয়া জুতা নিয়ে কথা বলতে থাকল। মহাজন শিমলা থেকে জুতা আনিয়েছিল, স্ত্রীর তা পছন্দ হয়নি। আমার সঙ্গে রুক্ষ ব্যবহার করায় বিরক্ত হলাম, কিন্তু এই দেখে প্রসন্ন হলাম যে, এই কৃপণের ধনের সদ্ব্যবহার করার মতো স্ত্রী তার ঘরে আছে।

সঙ্গে যে লোকটি এসেছিল সে চলে যাওয়ার পর সে কর্কশভাবে বলল এখানে লোক পাওয়া খুব কঠিন। আমার খুব খারাপ লাগল যে, তার যদি এই জবাব দেওয়ার ছিল, তবে যে লোকটি এসেছিল সে থাকতে থাকতে কেন বলল না? আমি গ্রামের অন্য কোনো বাড়ির খোঁজে বেরোলাম, কিছু দূরেই আর একটি গরীব বেনে থাকত। সে থাকার জায়গা দিল এবং লোক খুঁজে দেওয়ার কথা দিল। হয়তো ফসল কাটার সময় ছিল অথবা সত্যিই লোক পাওয়া মুশকিল ছিল। এদিকে স্টোক্‌স সাহেব যে বেগার বন্ধ করার আন্দোলন করেছিলেন, তাতে বেগার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই আন্দোলনের কথা সহানুভূতির সঙ্গে পড়ার সময় আমি কি জানতাম যে, এর ফল একদিন আমাকে স্বয়ং ভোগ করতে হবে। এই জায়গা থেকে কোটদ্বার ৩-৪ মাইলের চড়াইয়ের পথ। কোটদ্বারে অনায়াসে কুলী পাওয়া যায়, একথা সবাই বলছিল। কিন্তু সমস্যা ছিল ওখানে পৌঁছানোর। শেষ পর্যন্ত শুধু ৩-৪ মাইলের জন্য সওয়া অথবা দেড় টাকা মজুরী দিয়ে একটা লোক ঠিক করলাম আর আমি সেই শতবার অভিশপ্ত গ্রাম ছেড়ে গেলাম।

চড়াইয়ের রাস্তা। চারদিকের পাহাড় ক্ষেতে ঢাকা। কোটদ্বারে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের তৈরী করা ধর্মশালাতে উঠলাম, এই শ্রেণীর ধর্মশালা থেকে এটা অনেক ভাল ও পরিচ্ছন্ন। এখান থেকে সর্বদাই শিমলার জন্য মুটে পাওয়া যেতে পারে, একথা শুনে আমি বেশ আশ্বস্ত হলাম। পাকা আপেলের খবর পেয়ে আমি এক বাগান থেকে দু-তিন সের আনালাম। পান ভোজন সেরে আমি স্টোক্‌স সাহেবের বাংলোয় গেলাম। পাহাড়ের পিঠে আপেল ও অন্যান্য ফলের গাছে ঢাকা এক বিস্তৃত জমির মধ্যে তাঁর বাংলো আর অন্য অনেকের ঘর ছিল। স্টোক্‌স তাঁর কুর্তা-ধুতি পরে খুব প্রসন্ন হয়ে আমার সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁর স্ত্রী ও এক তিন-চার বছরের বাচ্চা অসুস্থ—আমার সামনে তিনি বাচ্চাকে কোলে তুলে অন্য এক বিছানায় শোয়ালেন—এর জন্য তাঁর মনে অশান্তি হওয়া স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি আমার সঙ্গে খুব ভালভাবে কথাবার্তা বললেন। নিজের স্কুলের প্রধান শিক্ষক এক মাদ্রাজী তরুণকে, আমাকে সব জিনিস দেখানোর জন্য বলে দিলেন। তাঁর স্কুলের দালান পরিচ্ছন্ন, হাওয়াদার ও মজবুত। এখানে বালক-বালিকারা একসঙ্গে পড়ে। বেতন লাগে না।

মুটের মাথায় মালপত্র চাপিয়ে সেইদিন সন্ধ্যায়ই শিমলা পৌঁছে গেলাম। সেখানে কেউ পরিচিত ছিল না, অতএব প্রথম ধর্মশালায় উঠলাম। পরে দেখলাম এই ধর্মশালা সনাতন ধর্মসভার সঙ্গে যুক্ত আর তার অপরিচিত নিয়ম-উপনিয়ম থেকে বাঁচার জন্য আমি সেখান থেকে আর্য সমাজে চলে গেলাম। শিমলায় খুব ঘুরে বেড়ানোর পরিকল্পনা ছিল না। রাজনৈতিক

তাঁর এত সঙ্কুচিত ক্ষেত্রে কাজ করাটা আমার ভাল লাগত না—তার কারণ ছিল এই যে মনে মনে আমি তাঁকে প্রশংসা করতাম। কটয়ার সভায় বিরোধীপক্ষের কোন একজন আমার জাত-পাত নিয়ে বক্রোক্তি করেছিল, যার উত্তর সেখানেই দাঁড়িয়ে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দিলেন—আমি বেনারস যাওয়ার সময় এঁর বাড়িতে উঠেছিলাম, বেশ বড় প্রাসাদ আছে অত্যন্ত ধনী ব্রাহ্মণ পরিবার। ধনের অতিরঞ্জনের কথা আমি বুঝতে পারতাম, কিন্তু বড় প্রাসাদের ব্যাপারটা আমার বিশ্বাস হল না। আমার ধারণা ছিল এখনো আমার ভাইরা সেই বাড়িতেই থাকে, যা আমি ছেড়ে এসেছিলাম। ভোটের সভায় আমার পক্ষে বলাতে তার কথা আমি খণ্ডন করতে পারিনি কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমার এই ব্রাহ্মণের মিথ্যা কথাটা খারাপ লাগল; কিন্তু দু-তিন বছর পরে (১৯৩০-এর শেষ ভাগে) যাগেশের সঙ্গে দেখা হলে কথায় কথায় তিনি বললেন যে, আমার ভাইরা পুরোন বাড়ি ভেঙ্গে দেহাতের পক্ষে বেশ বড় বাড়ি বানিয়েছে।

ভোট শেষ হল। কটয়াতে জলেশ্বরবাবু বেশী ভোট পেলেন আর হয়তো ভোরেতেও। অধিকাংশ থানায়ই শ্রীনন্দনবাবু বেশী ভোট পেলেন, এবং তিনি প্রায় দ্বিগুণ ভোটে নির্বাচিত হলেন। দক্ষিণী সারনে নিরসুবাবু অনেক ভোটে জয়ী হলেন। কেন্দ্রীয় এ্যাসেম্বলীর জন্য আমার বন্ধু বাবুনারায়ণ প্রসাদ কংগ্রেস প্রার্থী ছিলেন, জেলা কংগ্রেসের একজন মুখ্য কর্মী হিসেবে তার জন্যও কাজ করতে হয়েছিল। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীও বিশ্রীভাবে হেরে যায়। নারায়ণবাবু সম্পর্কেও অনেকবার লোকেরা বলেছে যে, তিনি শ্রীনন্দনবাবুকে সমর্থন করেছেন, কিন্তু আমি তা ব্যক্তিগত দ্বেষ বলেই মনে করতাম। তবে উত্তর সারনে কংগ্রেস প্রার্থীকে তাঁর খোলাখুলি সমর্থন না করাটা আমার ভাল লাগেনি।

এই নির্বাচনের প্রয়োজনে সারণ জেলার বাইরেও আমাকে কাজ করতে হয়েছিল। দ্বারভাঙ্গার কংগ্রেস প্রার্থী পণ্ডিত শিবশংকর ঝা ও মোহন্ত ঈশ্বরগিরীর নির্বাচন ক্ষেত্রে আমি কয়েকটি ভাষণ দিলাম। কংগ্রেস প্রার্থী বাবু সত্যনারায়ণ সিংহের পক্ষে প্রচার করার জন্য আমি ও রাজেন্দ্রবাবু একসঙ্গে দল সিঙ্গসরায় পৌছলাম। ধর্মশালায় সভা হল। সারা উঠান লোকে কানায় কানায় ভরে গিয়েছিল। সভায় গেলামাল করার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এক বড় জমিদার বাবু মহেশ্বরপ্রসাদ নারায়ণ সিংহ নরহনের বাবু আর অনেক অনুগামীর সঙ্গে এসে পড়লেন। তাঁরা চটপট সভাপতি হিসেবে নরহনের বাবুর নাম প্রস্তাব করে দিলেন। রাজেন্দ্রবাবু বললেন ছেড়ে দাও, উনিই সভাপতি থাকুন। আমার বক্তৃতা রাজেন্দ্রবাবুর আগে অথবা পরে হয়েছিল, তা আমার মনে নেই। আমি ছাপরার বুলিতে বক্তৃতা শুরু করলাম। দু-মিনিটের মধ্যে কিষাণদের মাথা হেলতে দুলতে লাগল, তখন সভাপতি আপত্তি করলেন যে জনতা ছাপরার বুলি বোঝে না। তিনি হিন্দিতে বলার জন্য চাপ দিতে লাগলেন। আমি জনতাকে জিজ্ঞেস করলাম "যদি আপনারা আমার ভাষা না বুঝতে পারেন তবে আমি কি করব? উর্দু-ফারসীতে বলার চেষ্টা করব?" জনতা এক বাক্যে বলল—"না, আমরা আপনার ভাষা খুব ভাল বুঝতে পারছি। যাতে আমরা বুঝতে না পারি সেজন্য এই চালাকী করা হচ্ছে।" সভাপতি আর কি বলবেন। জনতা আমার সঙ্গে। আমি আমার বক্তৃতা চালিয়ে যেতে যেতে বললাম—"জমিদার আর কিষাণদের স্বার্থ এক নয়। কিষাণরা চিন্তা ভাবনা করলে জমিদাররা কোথায় থাকবে?" সভাপতি ও মহেশ্বরবাবু রাজেন্দ্রবাবুকে বললেন—"আপনি বলুন, যে ইনি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বলছেন। কেননা কংগ্রেসে জমিদারও আছে।" আমি বললাম "কংগ্রেসে কিষাণরা সংখ্যায় অনেক বেশী।" রাজেন্দ্রবাবু অন্যের বক্তৃতার মাঝখানে কথা বলতে অস্বীকার করলেন। সভাপতি আমার বক্তৃতার মধ্যে কথা বলতে চাইলেন, আমি জনতাকে বললাম "যদি আপনারা বলেন তো আমি বক্তৃতা বন্ধ করে দেব।" জনতার মধ্যে থেকে জোরে আওয়াজ উঠল—"না, আমরা আপনার

বক্তৃতা শুনতে চাই।" এসময় যদি সভাপতি আমাকে বলতে না দিতেন তাহলে প্রাঙ্গণে তিনি, মহেশ্বরবাবু ও তাঁদের পাঁচ-দশ জন অনুগামী থাকতেন এবং জনতা আমার সঙ্গে উঠে গিয়ে আলাদা আমার বক্তৃতা শুনত। আমার বক্তৃতায় জমিদার ও কিষাণদের পরস্পরবিরোধী স্বার্থ সম্পর্ক মানুষ এতটা সচেতন হল যে অন্য দলের বক্তৃতা জমলো না।

সেইদিন সন্ধ্যায় সমস্তীপুরে আমাদের বক্তৃতা হল। শহরে জনতা ছিল, কিন্তু এখানেও আমি ছাপরার বুলিতেই বক্তৃতা দিয়েছিলাম। তিরহুত মিউনিসিপালিটি থেকে রায়বাহাদুর দ্বারিকানাথ কংগ্রেস প্রার্থী ছিলেন। বক্তৃতার পর তিনি বললেন—"রাজেন্দ্রবাবু, আপনাদের বক্তৃতা বিদ্বানদের জন্য উপযুক্ত হতে পারে, কিন্তু ভোটারদের কথা যদি ধরা যায় তবে তারা রামউদার বাবার বক্তৃতাই বুঝতে পারে।"

সারা প্রদেশের নির্বাচনের ফল বেরোল। কাউন্সিলে কংগ্রেস পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠতা হল, কিন্তু যুক্তভাবে নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্যদের ধরলে কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হল না। পার্টির সদস্যদের প্রথম বৈঠকের দিন আমিও পাটনা গেলাম, আর কিষাণদের কল্যাণকর কিছু বিষয়ে আমি সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সই নিলাম। অনেকে সই দিলেন, আবার অনেকে বেশ কিছুটা দ্বিধার পর সই দিলেন। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে কিষাণের কল্যাণে অর্ধেকটা দূর যেতেও অনেক কংগ্রেসী প্রস্তুত নয়।

★ ★ ★ ★

সেই বছর (১৯২৬) কংগ্রেসের অধিবেশন গৌহাটিতে হওয়ার কথা ছিল। পাটনা থেকে আমি সুলতানগঞ্জ গেলাম। ধূপনাথের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলাম সে যেখান থেকেই একসঙ্গে গৌহাটি যাব। রামনরেশ সিংহের বড় ভাই বাবু দেওনারায়ণ সিংহ তখন বনৈলী রাজের তহশীলদার ছিলেন। এমনিতেই অতরসনের ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আমার যথেষ্ট পরিচয় ছিল, তাছাড়া এখনতো ধূপনাথও সেখানেই ছিলেন। ভাগলপুরে গঙ্গা পেরিয়ে আমরা ছোট লাইনের গাড়ি ধরলাম। আর একদিন সকালবেলা আমীনগাঁও পৌঁছলাম। ব্রহ্মপুত্রকে এই প্রথম দেখলাম। ডিসেম্বরের স্বচ্ছ জল গম্ভীর ব্রহ্মপুত্রকে আরো কালো বানিয়ে দিয়েছিল। অন্যপারে কিছুদূরে কংগ্রেসের ক্যাম্প ছিল। খদ্দর ডিপোর কার্যকর্তা আমাদের পরিচিত বন্ধু ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমরা প্রদর্শনীতে উঠলাম। স্থানটি দর্শনীয় এবং সবুজ বৃক্ষ ও ঝোপে আচ্ছাদিত পাশের কামাখ্যা পাহাড়কে বড় সুন্দর লাগছিল। ধূপনাথের সঙ্গে একাধিক বার সেখানে গেলাম। কামরূপ-কামাখ্যার জাদু সম্পর্কে ছেলেবেলা থেকে অনেক কথা শুনে এসেছি, কিন্তু এখন তা ছেলে ভোলানো গল্প। তবে এখানকার যুবতী মেয়েদের দেখে আমার বন্ধু ইন্দিরারমণজীর কথা মনে পড়েছিল। এদের চেহারায় মঙ্গোল মুখাকৃতির হাল্কা ছাপ ছিল। রঙও পাণ্ডুর। ইন্দিরারমণজী একবার ইতস্তত বেড়াতে বেড়াতে কামাখ্যা পাহাড়ে পৌঁছে গেলেন। সেখানে এক পাণ্ডা তাঁকে সস্নেহে নিজের বাড়িতে রাখল। কয়েকদিনেই তিনি বুঝতে পারলেন যে গৃহস্বামী তাঁকে নিজের যুবতী কন্যার প্রেমপাশে আবদ্ধ করতে চায়। তিনি চুপচাপ পালিয়ে এসে নিজের প্রাণ বাঁচালেন। তিনি এও বলেছিলেন এই কৌশলই কামরূপ-কামাখ্যার জাদু, একেই রূপক হিসেবে "মানুষকে ভেড়া বানিয়ে দেওয়া" বলা হয়। পাহাড়ের নির্মল হওয়ায় নির্দ্বিন্দ্ব

পান-ভোজনের ও স্বচ্ছন্দ বিচরণের ফলে এই যুবতীদের রূপ ও স্বাস্থ্য অবশ্যই শ্লাঘনীয় ছিল, কিন্তু রূপক হিসেবেও "ভেড়া বানানোর" কোনো ব্যাপার আমার চোখে পড়েনি। পাহাড়ের ওপরই আমি এক ধর্মপ্রাণ, ধর্মধ্বজী ক্রোড়পতি মহারাজের রক্ষিতার জন্য তৈরী একটা বাংলো দেখছিলাম, কিন্তু অনেক 'ঋষি' ও 'মহাত্মার' জীবন ভেতর থেকে দেখতে পাওয়ায় ও শোনায় এ আমার কাছে বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল না।

বরদরাজের সঙ্গে দেখা হয়নি অনেকদিন। আমি শুনেছিলাম সে আসামে থাকে । কেউ আমাকে একথাও বলেছিল যে তাঁর ওপর কামরূপ-কামাখ্যার জাদু লেগেছিল এবং তিনি নিজেকে কোনো সুন্দরীর কাছে বেচে দিয়েছেন। ছেলেবেলার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার জন্য খুব উৎসুক হয়ে ছিলাম। শহরের বৈরাগী মঠে গিয়ে আমি কয়েকবার জিজ্ঞাসাবাদ করলাম, কিন্তু তাঁর কোনো খবর পাইনি। বলদেওজীর সঙ্গে আমার মীরাটে দেখা হয়েছিল। তাঁর সহপাঠী হরিনাম দাসকে কলেজ জীবনে রুগ্ন শরীরের জন্য সঙ্গীরা ডাক্তার উপাধিতে ভূষিত করেছিল। নির্বাচনের সময়ে স্বামী ব্রহ্মচারী বিশ্বনাথ নামে স্বামী সত্যদেওজীর প্রাইভেট সেক্রেটারি হয়ে তিনি ছাপরা এসেছিলেন। এখানে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা হল।

রাজাপুরের (কটয়া থানা) মোহন্ত তাঁর এক উত্তরাধিকারী খুঁজে দেওয়ার ভার দিয়েছিলেন আমাকে। আমারও কুআড়ীতে এক যোগ্য কর্মীর প্রয়োজন ছিল, অতএব মোহন্তজীর অনুরোধ আমি স্বীকার করেছিলাম। ব্রহ্মচারী বিশ্বনাথের সঙ্গে যে পরিচয় শুরু হয়েছিল, তা এখন ঘনিষ্ঠতার রূপ নিয়েছিল। আমি যখন তাঁর কাছে এই দুটি প্রস্তাব করলাম, তখন তিনি তা পছন্দ করলেন। স্থির হল তিনি এখান থেকে আমার সঙ্গে ছাপরা যাবেন।

গৌহাটি কংগ্রেসের কোনো বিশেষ ছাপ আমার স্মৃতিতে নেই। অধিবেশনের সময় স্বামী শ্রদ্ধানন্দের হত্যার খবর এল। লোকজনের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। সাম্প্রদায়িকতা বড় অশান্তির মূলে—এই ধারণার দিকে আমি আরো কিছুটা এগিয়ে গেলাম। এই সময়ও আমি অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সদস্য ছিলাম, কিন্তু আলাপ-আলোচনায় আমার বিশেষ উৎসাহ ছিল না। কানপুর কংগ্রেস কাউন্সিলে প্রবেশ স্বীকার করে নিয়েছিল, অতএব কোনো বিশেষ বিষয়ে বিবাদও ছিল না।

স্টিমারে ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে আমীনগাঁওতে ট্রেনে বসলাম। আমরা কামরার ভেতরে কেবল ঢুকেছি। এমন সময় এক নওজোয়ানকে আমাদের সঙ্গে দেখলাম। আমার এক সঙ্গীর বুকে কাঁটার মতো কিছু ফুটেছে বলে মনে হল, দেখলাম তার পকেট কাটা গেছে। আমরা দেখলাম সেই যুবক বেপাত্তা হয়ে গেছে। অনেক জায়গায় খুঁজলাম। কিন্তু তাকে কোথায় পাওয়া যাবে? এই হাতসাফাইয়ের জন্য সেই পকেটমারকে তো পুরস্কার দেওয়া উচিত। ব্রহ্মচারী বিশ্বনাথজীর ও আমার টিকিটের ভাড়া দিলেন ধূপনাথজী।

ছাপরা পৌঁছে (১৯২৭ খ্রীঃ) সবচেয়ে যে জরুরী কাজ করার ছিল তা হল গান্ধীজীর সারন সফরের ব্যবস্থা করা। প্রকাশ্য জনসভার স্থানসমূহের মধ্যে একমাও ছিল। ব্যবস্থাপকদের মধ্যে আমি ছিলাম প্রধান, কিন্তু গান্ধীজীর সঙ্গে সঙ্গে থাকার ইচ্ছা আমার একেবারে ছিল না; যাঁকে লোক বড় মানুষ বলে মনে করে, তাঁকে ঘিরে একটা প্রভামণ্ডল থাকে, তার মধ্যে থাকলে আমার দম বন্ধ হয়ে যাবে বলে মনে হয়। জীরাদেইতে রাজেন্দ্রবাবু আমাকে গান্ধীজীর কাছে নিয়ে যান, সেইবার মাত্র দুয়েক মিনিট তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার হল। কাউন্সিল নির্বাচনের অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল, এবার ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের নির্বাচন হবে। এই নির্বাচনেও কংগ্রেস তার প্রার্থী দাঁড় করিয়েছিল। তিন বছর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান থেকে হক সাহেব সারন জেলাকে বিহার প্রদেশের মধ্যে শিক্ষায় সবচেয়ে বেশী এগিয়ে দিয়েছিলেন। আমরা চাইছিলাম

এবারও তিনি বোর্ডে যান ও চেয়ারম্যান হন, কিন্তু যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই সেই স্থান থেকেই তিনি দাঁড়াতে রাজী হয়েছিলেন। আমাদের বড় আপসোস হল যখন দেখলাম সেই স্থানে আর একজন গেলেন, ফলে হক্ সাহেব তাঁর নাম প্রত্যাহার করলেন। প্রকৃত অর্থেই হক্ সাহেব বড় মানুষ ছিলেন। তবু তাঁর প্রতি আমার খুব আকর্ষণ ছিল। তাঁর ব্যবহারে কথাবার্তায় এক ধরনের সরল অকৃত্রিমতা থাকত, যার প্রভাব আমার মতো মানুষের ওপর পড়তই। প্রথমবার হক্ সাহেবের বাড়িতে (ফরিদপুরে) আমি ১৯২২-এ গিয়েছিলাম। হক্ সাহেব সেখানে ছিলেন না, তাঁর বেগম সাহেবা চা খাইয়েছিলেন। চা-বিস্কুটে কোনো আপত্তি নেই—বাবু মথুরাপ্রসাদ একথা জেনে আমাকে বলেছিলেন যে আমি বৈষ্ণব হওয়ায় ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারে এখনো আমার সংকীর্ণতা আছে। তারপর হক্ সাহেবের সঙ্গে কয়েকবার দেখা হয়েছিল। দ্বিতীয়বার জেল থেকে ফেরার পর তো অনেকবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হত। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের প্রার্থী পদের জন্য বিশেষভাবে তাঁকে রাজী করাতে (২০ মার্চ ১৯২৭) ফরিদপুর গেলাম। তখন আমি জানতাম যে এই কর্পূরের মতো সাদা দাড়ি, এই ভব্য গৌরমুখমণ্ডল—যার ওপর বার্ধক্যের ছাপ শুধু তাঁর চুলে এঁকে দিয়েছে—এই সাদাসিধা কিন্তু মনোমুগ্ধকর কথা বলার ধরন আমি শেষবারের মতো দেখছি ও শুনছি। অন্যান্য কথাবার্তার পর আমিও আমার সঙ্গী বাবু রামানন্দ সিংহ (জেলা কংগ্রেসের সেক্রেটারী) শ্রোতা হয়ে গেলাম। হক্সাহেবের সামনে দুটো বড় বড় আলমারি 'স্পিরিচুয়ালিজম' ও দর্শনের ইংরেজী বইয়ে ঠাসা। অধিকাংশ বই-ই ছিল নতুন। তা বোঝা যাচ্ছিল বইয়ের লাল-হলুদ চামড়ার বাঁধাই থেকে। বইয়ের দিকে ইশারা করে তিনি আমাকে বললেন—'রামউদার, কি ঘুরে ঘুরে মরছ? এখানে এসে বসে যাও, এই সব বই পড়। অধ্যাত্মবাদ শূন্য কল্পনার বস্তু নয়। পরলোক ও মৃত্যুর পরেও আত্মার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষত সিদ্ধ হওয়ার বস্তু।.....ইউরোপের লোকের আত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎকার হচ্ছে।....আমাদের এখানে তেমন ভাল মাধ্যম পাওয়া যায় না।....ধর্ম নিয়ে ঝগড়া তারাই করে যারা এই ধরনের শিক্ষার মূলে ক্রিয়াত্মকভাবে প্রবেশ করতে চায় না।....।'

আমি কি উত্তর দিয়েছিলাম, মনে নেই। তখন স্পিরিচুয়ালিজমে আমার বিশ্বাস ছিল না। আমি এও জানতাম যে যখন থেকে তাঁর বড় ছেলে পাশের নদীতে সাঁতরাতে গিয়ে ডুবে যায়, তখন থেকে এই দিকে তিনি বিশেষভাবে দৃষ্টি দিয়েছিলেন। তৎকালীন রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে যাঁর প্রতি আমার অপার শ্রদ্ধা ছিল, তিনি হক্সাহেবই। অনেকবার ফরিদপুরে তাঁর কাছে থাকার ইচ্ছা হয়েছিল আমার, কিন্তু আমার সারা সময়টা কংগ্রেসের কাজেই লেগে যেত। লাসায় (?) আমি যখন তাঁর মৃত্যুর খবর পড়লাম, তখন সেই বাসনা অপূর্ণ থাকায় আমার বড় আপসোস হল। আমার ওপর হক্ সাহেবের ব্যক্তিত্বের কি প্রভাব পড়েছিল তার দৃষ্টান্ত আমার দুয়েকটা স্বপ্ন থেকে দিচ্ছি।—আমি চাইতাম, ছাপরায় একটা কলেজ খোলা হোক— সেইসময় রাজেন্দ্র কলেজের খেয়ালও কারো মাথায় আসেনি। ছাপরায় একটা বিস্তৃত হক্ হল হোক, যাতে হক্ সাহেবের মূর্তি থাকবে। তাঁর প্রিয় ফরিদপুরের বাগানে একটা স্থায়ী স্মারক উদ্যান, গ্রন্থাগার কৃষিবিদ্যালয়ে পরিণত করা হোক। তাঁর এক বিস্তৃত জীবনী লেখা হোক।

ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের নির্বাচনে অত্যন্ত তিক্ততা ছিল। প্রার্থী ও কেন্দ্রের সংখ্যা বেশী হওয়ায় এবার ঝগড়া আরো ব্যাপক হয়েছিল। আগের কাউন্সিল নির্বাচনে যা কিছু তিক্ত সংঘাত ছিল, তা ছিল উত্তর সারনে। কিন্তু এবার তো গোটা জেলায় আগুন লেগে গেল। একমাতে লক্ষ্মীনারায়ণ দাঁড়িয়েছিলেন। কংগ্রেসের জন্যই শুধু নয়, তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণেও তাঁর সাফল্যের জন্য চেষ্টা করা আমার পক্ষে জরুরী ছিল। নির্বাচনী সভা করার জন্য ৩০ মার্চ আমি পরসা পৌঁছই। বাজারে কিছু লোক জমা হয়ে গেল। লক্ষ্মীনারায়ণের প্রতিদ্বন্দ্বী বাবু শিবাজী

(রাজদেবপ্রসাদ নারায়ণ সিংহ) পরসার বড় জমিদার ছিলেন। তাঁর লোকজন এসে আমার বক্তৃতায় বাধা দিল। গালাগালি করতে শুরু করল। এই লোকজনের মধ্যে আমি দু-তিনজন এমন লোকও দেখলাম, যারা কংগ্রেসের কাজে যোগ দিত। প্রয়োজন হলে তারা সবাইয়ের আগে জেল ও মারপিট সহ্য করতেও প্রস্তুত থাকত। আমার 'আপন' লোকের এই চেষ্টায় আমার মনে বড় ধাক্কা লাগল। আমি ভাবলাম—কিন্তু এমনটা হচ্ছে কেন? শেষ পর্যন্ত আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম যে যদি বাবু শিবাজী গ্রামের বড় জমিদার না হতেন, তাহলে না মিলত ওদের এই রকম করার সংযোগ, না এই সব লোকেরা ভয়ে ও খোশামোদের জন্য এইরকম করতে বাধ্য হত। ১৯২৭-এর ৩০ মার্চ আমি পরসাকে শেষ বারের মতো দর্শন করলাম। সেই দিন রাত্রিতে আমি প্রতিজ্ঞা করলাম—যতদিন জমিদারী প্রথা থাকবে, ততদিন পরসায় আর পা রাখব না।

মহারাজগঞ্জ থানাতে কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধে অন্য এক প্রার্থী দাঁড়িয়েছিলেন। বাবু নারায়ণপ্রসাদ কংগ্রেস প্রার্থীর বিরোধী হয়ে সেই প্রার্থীর জন্য কাজ করছিলেন। এতে আমার আপসোস হওয়া স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু যখন এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে তিনি (৩ এপ্রিল) দেখা করতে এলেন তখন নির্বাচনের কথা হওয়ায় আমি তাঁকে কিছু কড়া কথা শুনিয়ে দিলাম। নির্বাচনতো শেষ হয়ে গেল, কিন্তু সেই কড়া কথা বলার জন্য আমার অনুশোচনা দিন দিন বাড়তে লাগল। এ আমার ভারি দোষ, কোন কাজই আমি অর্ধেক মন দিয়ে করতে পারি না। যা নিয়ে পড়ি তার ওপর আমার সবটা মন কেন্দ্রীভূত হয়ে যায়। নারায়ণবাবুর মতো ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলার সময় নিজের ওপর সংযম না রাখতে পারার এই ছিল কারণ। কোনো লোকের দোষ-গুণ দেখার সময় আমি সেই ব্যক্তির দৃষ্টিতেই তা দেখতে চাই, যাতে দোষ সবচেয়ে কম চোখে পড়ে। আমার এটা স্বাভাবিক দুর্বলতা, যে কোনো ব্যক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়ে যাওয়ার পর তাঁকে সুদে খাটানো মানসিক পুঁজি বলে মনে করে নিই, আর এই পুঁজিতে সামান্য আঘাত লাগলেও আমি অস্থির হয়ে উঠি। নারায়ণবাবুর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও স্নেহ এই ধরনের পুঁজি ছিল। তাঁকে আঘাতে করার জন্য আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারতাম না। আমার হৃদয়ে যে আগুন লেগেছিল তা তখন নিভল যখন ১৯২৯-এ আমি লাসা থেকে আমার এই ব্যবহারের জন্য চিঠি দিয়ে আমার অনুশোচনা ব্যক্ত করলাম এবং নারায়ণবাবুর সহৃদয়তাপূর্ণ চিঠি পেলাম।

বোর্ডের নির্বাচন শেষ হল। কংগ্রেস বিরোধী প্রার্থীদের বিজয় হল, আর সবচেয়ে শোচনীয় ব্যাপার হল এই যে বোর্ডের দল গঠিত হল ভূমিহার, রাজপুত, কায়স্থ প্রভৃতি জাতের নামে। এর চেয়ে অপ্রীতিকর ব্যাপার আমার পক্ষে আর কিছু ছিল না।

কংগ্রেসের সামনে কোনো নতুন কার্যক্রম ছিল না। আমার সাম্যবাদী বিচার 'বাইসবী সদী' লিখে রাখাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। তা প্রচারের জন্য সঙ্গী ও অনুকূল বাতাবরণ ছিল না। এদিকে বিশেষভাবে বৌদ্ধধর্ম অধ্যয়নের যে ইচ্ছা লদাখে জেগে উঠেছিল, এখন তার প্রচণ্ড তাগিদ বোধ করতে লাগলাম।

২২ ফেব্রুয়ারী সারনাথ গিয়ে আমি আমার ইচ্ছা ভিক্ষু শ্রীনিবাসজীকে বললাম। তিনি আমার ইচ্ছা সমর্থন করে বললেন—এখন ভাল সুযোগও আছে। লংকার বিদ্যালংকার বিহার এক সংস্কৃতের অধ্যাপক খুঁজছে, আপনি সেখানে চলে যান, খুব আনুকূল্য পাবেন।

* * *

ব্রহ্মচারী বিশ্বনাথ (ভদন্ত আনন্দ কৌশল্যায়ন) রাজাপুরে তিন মাসের বেশী ছিলেন। মোহন্তজী তাঁকে খুব স্নেহ করতেন, কিন্তু সেই দেহাতে বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সম্পূর্ণ অভাব ছিল। আমি দেখতাম, যে স্কুল সাব-ইন্‌স্‌পেক্‌টার চৌধুরীজী যখন রাজাপুরে আসতেন, তখন ব্রহ্মচারীজী কিছুটা খুশী হতেন, নয়তো তাঁর দিনকাটানো মুশ্‌কিল হয়ে যেত। একবার (১৯২৭-এর ৬-৮ ফেব্রুয়ারী) মোহন্দজীর হাতিতে আমরা দুজন বুদ্ধের নির্বাণ স্থান কসয়া দেখতে গেলাম। ভোর থেকে সামনে যাওয়ার পর হাতির রহস্য আমরা পুরোপুরি বুঝতে পারলাম। আমরা তার নাম দিলাম সময়-সংহারক যন্ত্র। কিন্তু মোহন্তজীর কাছে শুধু সেটাই ওই ধরনের যন্ত্র ছিল না। একদিন (৯ ফেব্রুয়ারী) রাজাপুর থেকে ছাপরা যাওয়ার কথা ছিল। খাওয়া-দাওয়ার পর আমি ভাবলাম, বলদের গাড়িতে শুয়ে থাকব এবং সকাল নাগাদ মীরগঞ্জে পৌঁছে যাব। রাত নটা নাগাদ গাড়ি রওনা হল। আমি তো ঘুমিয়ে পড়লাম। মাঝে মাঝে ঘুম ভাঙলে দেখতাম, গাড়ি চলছে। সকাল হওয়ার পর প্রশ্ন করে জানতে পারলাম যে সারা রাত্রিতে আমরা শুধু তিন মাইল চলেছি। আমি সেখানেই গাড়ি ছেড়ে পায়ে হেঁটে মীরগঞ্জের রাস্তা ধরলাম। প্রথম প্রথম মনমরা হয়ে থাকায় 'নতুন জায়গা, পরে মন লেগে যাবে', এই বলে আমি ব্রহ্মচারী বিশ্বনাথকে বোঝাতাম, কিন্তু শেষে আমিও দেখলাম যে এই বাতাবরণে তাঁর পক্ষে থাকা মুশ্‌কিল হবে, অতএব আমি তাঁর মঠ ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে একমত হলাম। ২ মার্চ আমার সঙ্গেই শিবনাথজীও একমা এলেন। ভবিষ্যতের প্রোগ্রামের জন্য আমি তাঁকে পরামর্শ দিলাম যে তিনি কাপড় গুলিতে হলুদ রঙ করে কমণ্ডলু নিয়ে কিছুদিন ভবঘুরের জীবন কাটান। একমা থেকে কাপড় রঙ করে তিনি তাঁর সাধু জীবন শুরু করলেন।

মে (২ মে) আসতে না আসতেই আমিও লংকা যাওয়া স্থির নিলাম।

পরিশিষ্ট

বিশ্বসাহিত্যের অনেক লেখকের মতো রাহুল সাংকৃত্যায়নকেও যেমন কারাবাস করতে হয়েছিল, তেমনি অনেক লেখকের মতো তিনিও কারাবন্দী মুহূর্তগুলিকে সৃষ্টিশীল করে তুলতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। কারবাস পর্বে লিখিত ও পরিশিষ্টে সংযোজিত তাঁর ডায়েরিটিও সেই অন্ধকার থেকে আলোর উদ্ভাস। ১৯২২-এর ১৭ মার্চ থেকে ৯ আগস্টের কয়েকটি দিনের বিক্ষিপ্ত কিছু ভাবনা এখানে উদ্ধৃত হয়েছে। লেখক স্বয়ং 'ডায়েরি সংস্কৃততে লেখা হয়েছে' বললেও, আসলে, ঘুঙুরের ভেতরে ক্ষুদ্র নুড়ির মতো তাতে আছে নানান ভাষার অনুরণন। আছে ফার্সি, আরবী ব্রজবুলি ইত্যাদি। এই বহুল ভাষার ব্যবহারকে ভাষার প্রতি রাহুলের ব্যুৎপত্তির প্রগাঢ় নিদর্শন হিসেবে না দেখে, ভাষা নিয়ে তাঁর চমৎকারিত্ব সৃষ্টির কৌশল হিসেবে দেখাই ভালো। এবং সেই চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করতে গিয়ে তিনি এখানে কাব্যাশ্রয়ীও হয়ে উঠেছেন, যা তাঁর সমগ্র সাহিত্য-জীবনে এক বিরল ঘটনা। এমন একটি দূরূহ জিনিসের পুরোপুরি ভাবান্তর হয়তো সম্ভব নয়। তবু, আমরা যতটা সম্ভব চেষ্টা করেছি পাঠককে তাঁর নৈকট্য দিতে, তাঁর ভাব-ভাবনার অংশীদার করে তুলতে।

পরিশিষ্ট

১· ১৯২২-এর ডায়েরী থেকে

১৯২২ খ্রীঃ প্রথম জেলযাত্রায় ১৩ ফেব্রুয়ারী থেকে ৯ অগাস্ট পর্যন্ত আমি বক্সার-*জেলে* ছিলাম। সেই সময় ডায়েরীতে আমি আমার কিছু ভালোমন্দ চিন্তা-ভাবনা এবং অনেক সাধারণ পদ্যরচনা নোট করেছিলাম। তার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি, যার থেকে তৎকালীন পরিস্থিতিতে জীবনযাত্রার খোঁজ সেই ব্যক্তির মুখ থেকে বোঝা যাবে।—এটা ঠিক, যে আমার সদৃশ উত্তরাধিকারীকে রেখে, সেই ব্যক্তি মারা গেছে। ডায়েরী সংস্কৃততে লেখা হয়েছে, ঠিক যেমন ছিল তেমনই তা লেখা হচ্ছে।—

১৭ মার্চ—"অস্মিন্নান্দোলননে মনাগপি সফলীভূতা জনতাহগ্রে ভীষ্মপ্রযত্নেহপি সংকুচিতমনস্কা ন ভবিষ্যতি।"

১৭ মার্চ—এই আন্দোলনে একটুও সফল হলে জনগণ পরবর্তী পর্যায়ে অনেক বেশি যত্ন নিতেও সংকুচিত হবে না।

২৮ মার্চ—"ধন্যা জৈত্রবনভূর্মিযত্র প্রভোস্তথাগতস্য চরণধূলিঃ পর্যাপতত্। ধন্যঃ কোহপ্যন্যশ্চ সৌরাষ্ট্রচন্দ্রো দ্বিতীয়ো বুদ্ধঃ পরহিতকামেন যেন সর্বস্বমর্পিতম্।"

২৮মার্চ—ক্ষেত্র বনভূমি ধন্য, যেখানে প্রভু তথাগতের চরণধূলি পড়েছিল। অন্য এক সৌরাষ্ট্রচন্দ্র দ্বিতীয় বুদ্ধও ধন্য, পরহিতকামনায় যিনি সর্বস্ব সমর্পণ করেছিলেন।

৩১ মার্চ—"উৎপত্তি-সংযমবিষয়েহবশ্যং চিন্তয়িতব্যম্। পৈতৃকরোগিণাং সন্তানোৎপত্তিক্রমো ন সাধুঃ। নাত্র সর্বথা ভৌতিকর্নির্বিন্ধপ্রকার এবাশ্রয়নীয়ঃ। স্ত্রীণাং কথমপি সন্তানোৎপত্তিশক্তিহরণং স্যাত্, পরং পুরুষাণাং কথং স্যাত্? যদি কৃতবন্ধ্যাসংসর্গ এবং তৈঃ কর্ত্তব্যঃ, তদা হীনচারিত্র্যং বিলাসবাহুল্যং বিষয়তৃষ্ণাবৃদ্ধিশ্চ স্যুঃ। মনসা সংযম্যেব সন্তাননিরোধস্সাধুঃ। পরন্ন সর্বে যোগিনো ভবিতুমর্হন্তত্যপি নিশ্চিতমিব। অত্রাবশ্যং কিমপি নির্বন্ধনম্।"

৩১ মার্চ—জন্মনিয়ন্ত্রণ বিষয়ে অবশ্যই চিন্তা করতে হবে। বাবার কাছ থেকে যাদের রোগ-সংক্রমণ হয়েছে তাদের সন্তান উৎপাদন করা ঠিক নয়।.এ ব্যাপারে সর্বদা একমাত্র লৌকিক উপায় গ্রহণ করা ঠিক নয়। স্ত্রীলোকদের সন্তান উৎপাদন শক্তি কোনোভাবে নষ্ট করা যেতে পারে কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে তা কিভাবে হবে? তারা যদি প্রজননশক্তি নেই এমন স্ত্রীলোকদের সংগেই শুধু সংসর্গ করে তবে চরিত্রহীনতা আর বিলাসবাহুল্যের প্রতি আসক্তি এবং বিষয়ভোগে তৃষ্ণা বাড়বে। তাই মনের সংযম দিয়েই সন্তান জন্মরোধ মঙ্গলকর। কিন্তু এটাও ঠিক যে সকলেই যোগী হতে পারবে না। এ ব্যাপারে কোন বিশেষ ব্যবস্থা প্রয়োজন।

৬ এপ্রিল—"১· সত্যাবকাশে ভদেব ক্ষেত্রং দ্বিতীয়র্ভুকৃতেপি সমৃদ্ধীকর্ত্তুং (শক্যম্)। ২· কৃষিপ্রাধান্যহানিরপি স্যাদস্য দেশস্য। ৩· কার্যবিরাম এব গীতাদিকলাভির্মনোবিনোদঃ। ৪· আলস্যপরিত্যাগবত্ জাত্যাভিমানহানিরপিস্যাত্। ৫· যন্ত্রাগারাণি রাষ্ট্রীয়ান্যপি ভবিতুং শক্যন্তে। ৬· কর্মকরাধিক্যং ব্যক্তিসেবাং বিনা, তেন কার্যসময়ন্যূনতা। ৭· যন্ত্রগৃহাদ্ দূরস্থেষু গৃহেষু যাতাযাতম্। ৮· যন্ত্রমুক্তপয়ঃপ্রক্ষালিতমূত্রনলিকাঃ। ৯· পুরীষোৎসর্গশ্চ বহিঃ

মৃত্তিকাপিধানপূর্বঃ। ১০· রুগ্নসেবা ত্বন্যা। ১১· পৃথক্, পৃথগ্ যন্ত্রগৃহঃ নদ-পরিসরে। ১২· স্ত্রীপুংসোঃ কার্যপার্থক্যম্। ১৩· বালবর্দ্ধনশিক্ষা রুগ্নসুশ্রূষাভোজনাদি স্ত্রীণাম্। ১৪· বহুপরিশ্রমসাধ্যং কার্য পুংসামেব।"

৬ এপ্রিল—(১) যেখানে সম্ভব সেখানে একই ক্ষেত্র দ্বিতীয় ঋতুর জন্যও সাজানো যেতে পারে।

(২) এ দেশের কৃষিপ্রাধান্যে ক্ষতিও হতে পারে।

(৩) শুধুমাত্র অবসর সময়েই গান ইত্যাদি দ্বারা মনোরঞ্জন।

(৪) আলসেমি ত্যাগ করার মতই জাত্যাভিমানহানিও হতে পারে।

(৫) যন্ত্রাগারগুলোর জাতীয়করণ করা যেতে পারে।

(৬) ব্যক্তি সেবা বর্জন করে শ্রমিকের সংখ্যা বাড়িয়ে কাজের সময় কমাতে হবে।

(৭) যন্ত্রগৃহ থেকে দূরে অবস্থিত বাড়ীগুলিতে যাতায়াত করতে হবে।

(৮) প্রস্রাবের নর্দমাগুলো উন্নত উপায়ে জল দিয়ে ধুতে হবে।

(৯) মলত্যাগ করতে হবে বাইরে এবং তা মাটি দিয়ে চাপা দিতে হবে।

(১০) রোগীদের সেবা হচ্ছে অন্যতম কাজ।

(১১) নদীতীরে আলাদা আলাদা যন্ত্রগৃহ।

(১২) মহিলা ও পুরুষদের কাজের পার্থক্য।

(১৩) শিশুপালন, শিক্ষাদান, রোগীর সেবা ইত্যাদি কাজ নারীদের করতে হবে।

(১৪) বেশি পরিশ্রমের কাজগুলো করতে হবে পুরুষদের।

১৬ এপ্রিল—"স্বপ্নেহপশ্যং—রুসবোলোভিকসেনা যুদ্ধানন্তরং কৃষ্ণপর্বতমুল্লংঘ্যা গতা। যত্র যত্র সেনা ব্রজিত জনাঃ সাহায্যপরা ভবন্তি। বিমানেন সূচনামপি যত্র তত্র নিক্ষপন্তি—ন বয়ং যুষ্মান্ শাসিতুমাগতাঃ পরৈঃ পীড়িতানাং ভবতামুদ্ধার এবাস্মাকং লক্ষ্যম্। সৈনিকাপেক্ষিতবিশেষাধিকারোহস্মদ্ধস্তে তু যাবচ্ছত্রুর্দেশে, অন্যত্ প্রবন্ধাদিকং ভবত্বেব তিষ্ঠতু ইতি। পঞ্চনদাদ্ বিদ্রাব্য শত্রুং ইন্দ্রপ্রস্থ অগতায়াং বাহিন্যাং লক্ষশঃ পঞ্চনদযোদ্ধারঃ স্বদেশসেনায়াং প্রবিশন্তিঃ। অন্যপ্রান্তীয়া অপি তূষ্ণীং ন কিমপি আঙ্গ্লেভ্যঃ সাহায্যং দাতুমুৎসুকাঃ। গতে ইন্দ্রপ্রস্থ আঙ্গ্লা উদ্‌ঘোষয়ন্তি—ভারতীয়া বান্ধবাঃ যুষ্মৎসেবাং সাহায্যং চোরীকৃত্য উপনিবেশ-স্বরাজ্যং দীয়তে, আয়াস্ত সংকটাপন্নে দেশে ধন-জনসাহায্যেন ইতি।"

১৬ এপ্রিল—স্বপ্নেও দেখতাম রুশ বলশেভিক সেনারা যুদ্ধের পর কৃষ্ণ পর্বত পেরিয়ে এসেছে। তারা যেখানেই যাচ্ছে সেখানকারই লোকজন তাদের সাহায্য করছে। বিমান থেকে এরকম ছাপানো কাগজও ফেলা হচ্ছে—আমরা তোমাদের শাসন করতে আসি নি। শত্রুর অত্যাচার থেকে তোমাদের উদ্ধার করাই আমাদের লক্ষ্য। দেশে যতদিন শত্রু থাকবে ততদিন সৈনিকের যা কাজ তা আমরা করব। অন্যান্য সব কাজ তোমরা কর। পঞ্চনদ থেকে শত্রুদের তাড়িয়ে সেনাবাহিনী ইন্দ্রপ্রস্থে পৌঁছলে পঞ্চনদের লক্ষ লক্ষ যোদ্ধারা স্বদেশের সেনাবাহিনীতে যোগদান করবে। অন্যরাও ইংরেজদের সাহায্য করতে চাইবে না। ইন্দ্রপ্রস্থ হাতছাড়া হলে ইংরেজ ঘোষণা করবে—হে ভারতীয় বন্ধুগণ। আপনাদের সাহায্যেই উপনিবেশ-স্বারাজ্য প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। দেশ সংকটাপন্ন, অর্থ এবং লোক নিয়ে আসুন।

২২ এপ্রিল—"কিংচিন্ন মেহস্তি ভগবন্! ত্বয়ি চাপণীয়ম্,
রিক্তাশয়ঃ সপদি তে চরণৌ বহামি।
দীনর্তিহন্! প্রভুবরস্য গুণান্ বিমৃশ্য,
প্রেমাস্পদেন নিচিতং হৃদয়ং মমাস্তু ॥ ১॥
মাতঃ! সদা বহসি মুঞ্চসি বৈভবং স্বং,
সন্তান এষ যদুবংশসমঃ প্রয়াতি।
হা হন্ত! পশ্য বিপদাবিকলাং পরং তে,
হ্যক্ষি প্রমীল্য শয়নাতুরতাং নটন্তি॥ ২॥

২২ এপ্রিল—হে ভগবান! আপনাকে দেবার মত আমার কিছুই নেই। দীন আমি আপনার চরণ বহন করছি। প্রেমাস্পদের প্রেমে আমার হৃদয় পূর্ণ হোক।

হে মাতা। তুমি নিজের বৈভব কখনো নিজে বহন করো, কখনো বা দান করো। তোমার সন্তানরা যদুবংশের মত আচরণ করছে। হায় হায় বিপদ দেখে ভয় পেয়ে তারা চোখ বুঁজে ঘুমোনোর ভান করছে।

২৩ এপ্রিল—"কীল হুবন্নাস মুহিব্বুল্-হৈবান্।
কুল্লো মন্ যহ্য বাদে মৌতেহী॥
তিলকল্ অকীলো সারা ফিজ্জমা।
বিল্ হুব্বে মথ্লক ব হক্॥"
"দরদিলম্ ইস্কে খুদা বহ্রে দুনী পৈদা শুদ্।
দিলেমন্ খিদমত্-ও হর্-এক্ আঁ বকৃফ শবদ্॥
হৈফ সদ-হৈফ জিন্দগানী তু।
জুজ নফ্স বেহু বসর্ আয়দ্ হেচ্॥
মালিক দর্-খল্ক শুদম্ বাজবেনবা।
হস্তিয়েমন্ বশবদ্ গৈর-বদল্॥
দর্ রহে ইস্ক্শ গর্ বেহ্ বকুনী।
বেঃ ববদ্ সম্র হয়াতক্ বদুনী॥"
"মন তু মনকো মতি কঁরে, মনকো মনকৌ তোরি।
হিয় বিচ হিতসৌ হেরি লে, নহি যামেঁ কছু খোরি॥
হা! থী হা! থী সব কহৈ, আঁ কুশ কাহু দৈন ন।
হাথী হাথী সব কহৈঁ, আংকুশ কাহু দৈন॥
জীতে মীতে কিত গয়ে, জীহাতে অব আঁহি।
জীতে জীতে হিত ধরহি, মীতে মীচ সকাহি॥
"মনমেঁ তো পৈনী ছুরী, জিহ্বা জিমি রসখানি।
নহি 'উদার' ফল লাভ হো, শুভ ইন মিত্রন পাহি॥
দিল খোলত খুলতা নহীঁ, খুলত খুলতরহি জাই।
কৃপাভঙ্গ জব ঈশকী, আপুহি তে খুলি জাই॥"

২৩ এপ্রিল—
"বলা হয়েছে তারাই মানুষ যারা জন্তু-জানোয়ারকে ভালবাসে।
প্রত্যেকেই মৃত্যুর পর আবার জীবনলাভ করবে॥
এতেই সমস্ত বুদ্ধি একত্রিত। ভালবাসাতেই সৃষ্ট ও সৃষ্টিকর্তা॥"

আমার অন্তরে খোদার ভালবাসা, যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।
আমার অন্তর তাদের প্রত্যেকের খিদমতে উৎসর্গিত॥
আফসোস, শত আফসোস তোমার জীবনের প্রতি।
যদি তা মানুষের কাজে না লাগে তবে তা বড়ই অকিঞ্চিৎকর॥
সৃষ্টির মধ্যে মালিক হওয়ার কোন মূল্যই নেই।
আমার অস্তিত্ব অপরিবর্তনীয় হয়ে পড়বে॥
ভালবাসার পথে যদি হায় হায় করো।
তোমার জীবন ফলহীন হবে॥
হে মন। তোমার বুদ্ধিকে মালার দানা করো আর বাসনার দানাকে ভেঙ্গে দাও
হৃদয়ের ভিতরে যা ভালো তাকে খুঁজে নাও, জীবনের এই হল মূল সত্য॥
হায়। ছিল সবাই বলে, তর্পণে কুশ কেউ দেয় না।
সবাই হাতী হাতীই বলে, অংকুশ কে দেখে॥
হৃদয়ের ভিতরে বন্ধু এলো কোথায়, মুখেই এখনও আছে।
জীবিত থাকতেই তার ভালোটুকু হৃদয়ে গ্রহণ করো, বন্ধু মরেও যেতে পারে॥
মনের ভিতর ধারালো ছুরি, জিভে মধুর খনি।
'উদার' বলে এমন বন্ধু পেলে ফল শুভ হয় না॥
মন খুলতে গেলে খোলে না, খুলতে খুলতে থেমে যায়।
ঈশ্বরের কৃপা পেলে, নিজেই খুলে যায়॥

২৪ এপ্রিল—দোষা দোষযুতা গতা, দিবা হিতং নাকারি।
অহিতহিতে জানাসি ন, কিং ত্বং প্রিয়। ভবিতাসি॥
জননী ভূমি প্রভু পিতা, ভ্রাতা সব জগ জান।
নতরু স্বর্গসম জগ সবৈ, নরক দুঃখকী খান॥
শ্রম করি থকি থকি কোউ মুবৈ,ভোগ ক'রে কোউ আন।
কো য়হ জগকো ন্যায় হ্যায়, করম বিনা ফলদান॥
রে ববুল! কো কাম তুব, থকিত পান্থ দুখ দেত।
হরি রসাল ভখ রস সদা, না ফল মীঠো হেত॥
কাঠ পাত ফল ছাল তউ, জনহিতসাধন মোর।
কাম বিগারন হিতহরন, তুব বিচ কেতো জোর॥
ধূলি মগকী ধন্য তু, সবকে চরণণ লাগু।
কবহুঁক তরুবর সির ধরে, সহনো ঈ বড় ভাগু॥
কারা কারা অব কঁহ্যা, সন্ত অঙ্ক হৈ তাসু।
জিনকে পদরজ পরসিকে, তীরথরাজ উজাস॥
বহুশ্রমতে শুভ্রা ভই, লোহা থালি পরন্তু।
নিজ সুভাব ছাড়ত নহী, বহুরি হোত মসিবন্ত॥

২৪ এপ্রিল—রাত ভাল কাটল না, দিনেও ভাল কিছু করলাম না। হে প্রিয়, মন্দের মধ্যেও কিভাবে ভাল হবে তা কি তুমি জান না?
তোমার ঘন আনন্দের সাগরে আমার হৃদয় ডুবে থাক। আমার হৃদয়ের কৃত্রিম জলধারাকে তোমার গঙ্গাজল প্লাবন গ্রাস করুক।
জননী ভূমি প্রভু পিতা, জগতের সবাইকে ভ্রাতা জান।

নতুবা স্বর্গসম জগৎ, নরক দুঃখের খনি হবে॥
কেউ পরিশ্রম করে মরে, ভোগ করে অন্য কেউ।
জগতের এ কেমন ন্যায়, কর্ম বিনা ফলদান॥
রে বাবলা! এ তোমার কেমন কাজ, শ্রান্ত পথিককে দুঃখ দাও।
হরি রসাল রস সর্বদা ভক্ষণ করেও তোমার ফল মিষ্টি হল না॥
কাঠ পাতা ফল ছাল তোমার জনহিতসাধন করে না।
কাজ নষ্টকারী হিতহরণ, তোমার কত জোর॥
ধূলি তুমিই ধন্য সবার চরণ স্পর্শ করো।
কখনো তরুবরকে মাথায় ধরো, বড় ভাগ্যে এই সহনশক্তি পাওয়া যায়॥
কারাগার এখন আর কারাগার কোথায়, সন্তদের কোল হয়েছে তা।
যাঁদের পদরক্ত স্পর্শ করে তীর্থরাজও ধন্য হয়॥
বহুশ্রমে শুভ্র হল লোহার থালা, কিন্তু
নিজের স্বভাব ছাড়ে না যে, বারবার মসিলিপ্ত হয়॥

২৫ এপ্রিল—"চন্দ্র-চমৎকৃত-শোভয়া,দাই লুমিনস্ ফেস।
মন চকোর তা মোহমেঁ, চুঁ মজনুঁ দরবেশ॥
নয়না নয় না জানহীঁ, তীখো তিনকো গৈল।
সয়না তে সয়না লরৈঁ, হিয়পর মেলত মৈল॥
হ্যায় নদী নহীঁ জলাদি, হ্যায় সমীর না সুবাস।
দুর্শবদ্ মগর বে-আব্, যৌবনে তথাসি তাত॥
তুঙ্গ ধবল হিমিগিরি শিখর, স্ফাটিক সরিতা মাল।
স্নেহতরঙ্গিত সিন্ধুপয়, জননী লালিত বাল॥
পীত রক্ত সিত কৃষ্ণ সব, সম প্রিয় তব শিশুজাত।
শীত-উষ্ণ নিম্নোন্নত, স্নেহময়ী তব গাত॥
চন্দ্র হাস ইচ্ছা জলধি, জ্বালাগিরি তব দ্বেষ।
ক্রমণ যত্ন তনুকম্প দুখ, হিতচিন্তনি তব বেষ।
আর্য অনার্য বিভেদ নহীঁ, নহীঁ বর্ণনকো ভূত।
দেশভেদভেদক কহাঁ, সব জননীকে পূত॥
অজ্ঞ সুজ্ঞ নির্বল সবল, সুন্দর অবর কুরূপ।
বন্ধু স্নেহমেঁ মস্ত হো, সজো সকল সুররূপ॥"

২৫ এপ্রিল—
উজ্জ্বল চন্দ্রের শোভাযুক্ত তোমার আলোকিত মুখ।
মন চকোর তার মোহে যেন পাগল দরবেশ॥
নয়ন কোন নীতি জানে না, তীক্ষ্ণ সংকীর্ণ পথ।
ইশারায় ইশারা চলে, হৃদয় হয় মলিন॥
না আছে নদী, না জলধি না সমীর না সুবাস।
দূরে সরে যায় তৃষ্ণা না মিটিয়েই, তবুও যৌবন থাকে॥
তুঙ্গ ধবল হিমগিরি শিখর স্ফটিক সরিতাগুলি
স্নেহতরঙ্গিত সিন্ধুজল, জননীলালিত শিশু
পীত রক্ত সিত কৃষ্ণ সব সমান প্রিয় তব শিশুজাত।

শীত-উষ্ণ নিম্নোন্নত, স্নেহময়ী তব গাত॥
চন্দ্র হ্রাস ইচ্ছা জলধি, জ্বালাগিরি তব দ্বেষ।
ক্রমণ যত্ন তনুকম্প দুখ, হিতচিন্তাই তব বেশ॥
আর্য অনার্য বিভেদ নয়, নয় বর্ণের ভূত।
দেশ ভেদাভেদ কোথায়, সব জননীর পূত॥
মূর্খ জ্ঞানী নির্বল সবল, সুন্দর আর কুরূপ।
বন্ধু স্নেহে মত্ত হয়ে, সাজো সবাই দেবরূপে॥

২৬ এপ্রিল—"দিলে বেকারকী য়হী আদত। ন পকড়তো হ্যায় য়হ কভী কামত॥
সৈর করতা হ্যায় আশমাঁ কী কভী। নূর নজমুল্-ফলক দিখাতা সভী॥
সদিয়োঁমেঁ পহুঁচতী জহাঁসে শুআও। হদ্দে-ইমকাঁ নহীঁ হ্যায় জিসকী রফাঅ॥
তেজ রফতার উসকী হ্যায় এ্যায়সী। দহুমেঁ তেজ হ্যায় ন শৈ ঐসী॥
ক্যা অজবকা হ্যায় রখতা ফর্রাটা। কোনা-কৌনেন পহুঁচে ধর্রাটা॥
ইবনে-আদমকে পাস য়হ দৌলত। হৈফ দারদ্ ন ইল্ম ঈ সৌলত্॥
দর খলক তাকতৈ দুধারী তেগ। যুজ করনা ন উনকো লা-তদ্রীগ্॥
তাকত্ উসকীমেঁ মোজজাত্ সভী। মক্ষ তাউত হো বিগড়তা জভী॥
নেক নেকীমেঁ করতা ইস্তেমাল। বদ বদী উসকেসে হুআ পামাল॥
উসকে হাথোঁ মেঁ সারী তাকত হ্যায়। উসকী বাতোমেঁ সারী বাবত্ হ্যায়॥
সখ্ত আহন্সা হ্যায় মোমসা হ্যায় নরম্। বর্ফসা সর্দ মিস্ল শমশ্ গরম্॥
জুজ্ খতা (মন্) ন জুর্ম-ও-বীনম্। মন্ নদানম্ কি চীস্ত রহ সিদকম্॥
দিল হ্যায় মুহতাজ তেরে হুক্মোঁকা। ন সজাবার তল্খ জখ্মোঁকা॥
সোচ কর লে তো হোবে পরলে পার। বরন তহকীক ডূবনা হ্যায় মঁঝার॥
ন য়হ সমঝো কি বহ হরীফ তেরা। গর্ শবদ্ বাজ বহু হুক্ম তুরা॥
তেরে তাবে কিয়া খুদানে উসে। দর্ অদাবত বয়াফ্তশ্ ন কসে॥
ক্যা করৈ চশ্মা এব-চশ্মীকো। দেনা দুশ্নাম্ হ্যায় অক্স্ উসকো॥
তু হী ফাহেল হ্যায় বহ হ্যায় ইক্ আলা। তুহী হ্যায় মাহ বহ ফকত্ হালা॥
ফেলে বদমে মুতীঅ হ্যায় জ্যায়সা। খৈর মাঁয় খৈরখাহ হ্যায় ঐসা॥
দিলকী বাতোঁকো সমঝকর ইয়ারো। বনো দিলদার তা ন তুম হারো॥
কৃপা ক্রীড়া তেরী প্রভু রহৈ সর্বস্ব মেরী।
রহৈ চিন্তা চিত্তে চির সখে স্নেহার্দ্র তেরী॥
ধনানন্দাব্ধৌ তে হৃদয়মামগ্নং ভবতু মে।
জলপ্লাবে গঙ্গা মম হৃদয়কুল্যাং গ্রসতু তে॥"

২৬ এপ্রিল—

বেকার মনের এটাই অভ্যাস। এ কখনও কিছু আঁকড়ে ধরে না॥
কখনও আকাশে ভ্রমণ করে। আকাশের সকল তারার জ্যোতি দেখায়॥
যেখান থেকে কয়েক শতাব্দীতে রশ্মি এসে পৌঁছয়।
যার সীমা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়॥
তার গতি এত বেশি যে সংসারে এত গতিমান আর কিছু নয়॥
আশ্চর্যরকম তার গতি। ইহকাল ও পরকালে তা পৌঁছয় খুব তাড়াতাড়ি॥
মানুষ জাতির কাছে এই সম্পদ।

আফসোস তার এর সম্যক জ্ঞান নেই॥
দুধারযুক্ত তলোয়ারের মত সৃষ্টিকর্তার শক্তি।
তার ব্যবহার বাঁধা-ধরার মধ্যে নেই॥
তার শক্তি দেখে সকলের আশ্চর্য হয়।
দেশে বিশৃঙ্খলা তখনই হয় যখন তা সীমার মধ্যে থাকে না॥
সৎলোক তা সৎকাজে ব্যবহার করে।
বদলোক তা ব্যবহার করে খারাপ কাজে॥
তার হাতেই সকল শক্তি।
তার কথাতেই সবকিছু হয়॥
একান্ত অহিংস এবং মোমের মত নরম।
বরফের মত শীতল আবার সূর্যের মত গরম॥
আমার দোষ ছাড়া আর কোন অপরাধ তো দেখিনা।
আমি জানি না যে সত্যের পথ কোনটি॥
মন তোমার আদেশপ্রার্থী। গভীর ক্ষতের শাস্তি ভোগ করার ক্ষমতা রাখে না॥
এইসব ভেবেই আমাকে পার করে দাও।
নতুবা মাঝনদীতে ডোবা ছাড়া কোন পথ নেই॥
একথা মনে কোর না যে সে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী।
যদিও সে তোমার কিছু আদেশ পালন করে না॥
খোদা তাকে তোমার অধীন করেছে।
শত্রুতাতে তার সঙ্গে কেউ এঁটে উঠতে পারবে না॥
এক জলাশয় আর এক জলাশয়ের কি ত্রুটি অনুসন্ধান করবে।
পৃথিবী তাকে অবশ্যই বিদ্রূপ করবে॥
তুমিই আসল কর্তা সে তো যন্ত্রমাত্র।
তুমি চন্দ্রমা সে তোমার আলোর বৃত্ত॥
খারাপ কাজে সে যেমন অনুগত।
ভালো ব্যাপারেও সে তেমনই শুভাকাঙ্খী॥
বন্ধুগণ মনের কথাগুলো বোঝার চেষ্টা করো।
সাহসী হও যাতে হেরে না যাও তুমি॥
তোমার কৃপার খেলা প্রভু আমার সর্বস্ব হোক।
হে স্নেহার্দ্র চিরসখা তোমার চিন্তা আমার হৃদয়ে থাকুক॥

২৭ এপ্রিল—"বহ্ গ্রীষ্মকী জলতী তপন সনসন সনকতী লূ চলৈ।
বে অরর-বিরহিত জংগলে নহি ওট জিনসে কুছ মিলৈ॥
রজ পত্র লেকর উষ্ণ বায়ু, ধুলিধূসর তন করৈ।
পরিতঃ হরিত সস্যালি গ্রীষ্মাক্রান্ত জল বিন সন্জ্বরৈ॥
পর্যাপ্ত জল পানীয় নহি সনানীয়কী ঔসি হি দশা।
অতি মূত্রগন্ধ অসহ্য জিসসে হ্যায় ভরী চারোঁ দিশা॥
অধিকারিয়োঁকে নাজকো জো থে ন পূর্ব উঠা সকে।
ক্ষুদ্রাধিকারীগণ য়হাঁ অব মুগ্ধ উনকো পা সকে॥
জিসকো সমঝতে থে সমুচ্চয় রত্নকা ভণ্ডার হ্যায়।

কহতে যথা হ্যায় সর্বজন ক্যায়সা নহী সংসার হ্যায়॥
হাঁ, পক্ষিগণ ভী ত্রাসসে ইস ঘর্মকে কুম্‌হলা রহে।
বিহ্বল (বিকলসে) লোক ভী নহি বেশ্মসে হাঁয় আ রহে॥
আধিক্য হ্যায় জ্বরপীড়িতোঁকা ডাক্টর নিশ্চিন্ত হাঁয়।
নহি পথ্যকা কুছ হ্যায় পতা কুনৈন কোরী কিন্তু হ্যায়॥
যদি সাগ আতা হ্যায় কভী নহী কোয়লেকা হ্যায় পতা।
জব লবণ আতা তো পুনঃ অব তেল হোতা লাপতা॥
ফুটী হুই চিমনী তথা দীপক বেচারা চুপ্প হ্যায়।
গৃহ ভস্মময় অথবা কভী অতিশয় ভভকতা পুষ্প হ্যায়॥
সদন্তাপযুত গৃহ হ্যায় অভী বাহর হুই কুছ শান্তি হ্যায়।
অব বন্দ করনেকে লিয়ে সরদারকা আহ্বান হ্যায়॥
এবমস্য বিধের্বাক্যং প্রত্যহং প্রতিবর্ত্ততে।
নিজসিদ্ধান্তমাশ্রিত্য জনতা নাতিবর্ত্ততে॥"

২৭ এপ্রিল—

সেই গ্রীষ্মের জ্বলন্ত তপন সনসন পাগলের মত লু চলে।
সেই নিরানন্দ জানলাগুলি যা আড়াল দিতে পারে না॥
ধুলো পাতা সহ উষ্ণ বায়ু, শরীর ধূলিধূসরিত করে।
চারদিকের সবুজ শস্য গ্রীষ্মাক্রান্ত জলহীন পোড়ে॥
পর্যাপ্ত পানীয় জল নেই,স্নানের জলেরও একই দশা॥
অতি মূত্রগন্ধ অসহ্য যাতে চারদিক ভরা॥
অধিকারিদের অহংকারকে আগে যারা সন্তুষ্ট করতে পারেনি।
সেই ক্ষুদ্রাধিকারিরা এখন মুগ্ধ হয়ে তাদের পেয়েছে॥
যাকে মনে করতাম সকল রত্নের ভাণ্ডার।
লোকে ঠিকই বলে সংসার তেমন নয়॥
হ্যাঁ পাখীরাও এই গরমে ত্রস্ত হয়ে ঝিমিয়ে পড়ছে।
অস্থির হয়ে মানুষ শরীরে কাপড়চোপড় রাখছে না॥
জ্বরপীড়িতদের আধিক্য তবু ডাক্তার নিশ্চিন্ত
পথ্যের কোন খোঁজ নেই শুধু কুইনিন আছে॥
যদি কখনও শাক আসে, কয়লার থাকে না খোঁজ
যদি লবণ আসে তো আবার তেল হয় গায়েব॥
ফাটা চিমনী আর লণ্ঠন বেচারা চুপ
গৃহ ভস্মময় অথবা কখনও অতিশয় ভক করে ওঠা আলো॥
সন্তাপযুক্ত গৃহ বাইরে এখন হয়েছে কিছু শান্তি।
এখনই বন্ধ করার জন্য সর্দারের এলো আহ্বান॥

২৮ এপ্রিল—"হৃদয়েশ! তব বিরহেহতিকাতর এষ একমনা জনঃ।
তাম্যতি তলে সীদতি শরীরে স্তম্ভমেতি তথা মনঃ॥
শুশ্রূম ন-ধন-ধন হে প্রভো! তে প্রেমপূর্ণ গুণাবলীম্।
অর্পিতমখিলমাত্মীয়মিথং পশ্য পুণ্য পদাবলীম্
মাধুর্যমাবিকসিতমুপরিতঃ ক্রৌর্যমবিদিতমাহিতঃ।

বিকসিতসরোজতলে যথাস্তে কণ্টককুলমন্তশ্ছিদম্॥
নিষ্করুণ! করুণাপূরতা নিস্পৃহ! ন তে স্পৃহয়ালুতা।
পাপাচ্যমানঃ পরহৃদং পরিপশ্য তে প্রশয়ালুতাম্॥
নিঘৃণ! ঘৃণা মে হৃদি সদা জাগর্তি তেহতিসুদুস্সহা।
অক্ষম! ক্ষমা ক্ব ত্বয়ি গিরা গৌরবধরো ন গুণৈস্সহ!
লাঘবসদন! গৌরবগরিম্না ব্যর্থমিহ বিখ্যায়সে।
ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রহৃদয়! মহাশয় এষ কিন্তু বিভাব্যসে॥
বিহ্বল-বিরহ-দগ্ধং জনং সন্ত্রাতুমস্তি ন তে মনঃ।
গুর্বী গুণৈর্বদ বীরুদেবং ক্বাবিশীর্য জহৌ মনঃ॥
নহি হৃদয়হারি ত্বদ্বচো বিশ্বাসজুষ্টং হে সখে।
অসকৃত্ পরীক্ষ্য কুতঃ পুনঃ হৃদয়েন তৎপ্রাপ্যঃ সখে॥
হৃতহৃদয়! হা! দগ্ধং স্বয়ং কিং ক্রূরকর্মাণং ব্রজেঃ।
মৃদুফলরসাস্বাদনমনা কণ্টকিতরুং ন মুধা যজেঃ॥
দত্তং সকৃদ্ধৃদয়ং পরাবর্ত্তিতুমহো নালং ত্বহম্।
দুর্বৃত্তিদুর্গুণপূর্ণতামপি হাতুমসি নালং স্বয়ম্॥"

২৮ এপ্রিল—হে হৃদয়েশ্বর! তোমার বিরহে তোমার একনিষ্ঠ ভক্ত এই ব্যক্তি খুবই কাতর। দুর্বল অন্তর, অবসন্ন শরীর, মন স্তব্ধ। হে প্রভু! আমি ধনজনের কথা ভাবি না। আমি শুধু তোমার প্রেমপূর্ণ গুণাবলী শ্রবণ করি। আর এভাবে তোমাকে সব কিছু সমর্পণ করেছি। (হে মন!) তুমি পুণ্যপদাবলী দর্শন কর।

বিকশিত পদ্মফুলের তলে যেমন কাঁটা থাকে তেমনি ওপরে মাধুর্য আর অন্তরে রয়েছে ক্রূরতা। হে নিষ্করুণ। পরিপূর্ণ করুণাতেও তুমি নিস্পৃহ। কোন বিষয়ে তোমার স্পৃহাও নাই। বার বার পরের হৃদয় এবং তোমার করুণাপ্রবণতা অবলোকন কর।

হে নির্দয়। তোমার প্রতি আমার দুঃসহ ঘৃণা জন্মাছে। হে অক্ষম, তোমার মধ্যে ক্ষমা কোথায়? তোমার গুণগান বাক্যে বর্ণনার অতীত। হে লঘুতার নিবাসস্থল, তুমি বৃথাই গৌরব-গরিমায় বিখ্যাত হয়েছে। হে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হৃদয়, তবু তুমি মহাশয় বলে গণ্য হয়েছ। বিহ্বল-বিরহদগ্ধ মানুষকে উদ্ধার করার কোন ইচ্ছা তোমার নাই।

হে সখা, তোমার কথা হৃদয়হারী বা বিশ্বাসযোগ্য নয়। কোথায় আবার তা পাওয়া যাবে?

হে হৃতহৃদয়! দগ্ধ ক্রূরকর্মাকে আর কেন অনুসরণ করছ? অম্লরসযুক্ত ফলের জন্য কাঁটাগাছকে শুধু শুধু উপাসনা করা ঠিক নয়।

একবার যে হৃদয় সমর্পণ করা হয়েছে তা ফিরিয়ে নিতে আমি অসমর্থ।
তুমিও তোমার দোষ ত্যাগ করতে সমর্থ নও।

৩০ এপ্রিল—"খিলে প্রসূন প্রসন্ন হৈ কূজত বিহগ ন থোর।
অন্য অভ্যুদয় দেখিকে, সন্ত হৃদয় সুখ শোর॥
জীর্ণপত্র ভূষা তজি, পহিরি হরিত নব বাস।
ত্যাগু পুনঃ সুখসম্পদা, য়াকো করত প্রকাস॥
বায়ুবেগ অতি ঘর্মতে, জগ বিহ্বল করি দেত।
শীতল শ্বস টট্টীন তে, গুণ-অবগুণ সঁগ হৈত॥
উপজি উপজি পুণি মরি গয়ো, চনা বিনা ঋতুকাল।

কাল পায় নির্বল সবল, জগ বিচ সবকো হাল॥
পুষ্পবাটিকা সাজতে, আল বাল খনি দীন।
অস্থির মনকে কারণে, সুখে তোয় বিহীন
বহুত ভয়ে বহুশক্তি নহিঁ, গল্ল একতা সুষ্ট।
মেরুভসকি মরুভূমি হৈ, তৃণতে রজ্জু পুষ্ট॥
জনসংগ জনসুখমেঁ পমে, মুনি মন হোত কলেস।
ব্যক্তিভেদ তে একহী, বস্তু কৃতান্ত গণেশ॥
জামেঁ কোউ চিত না ধরৈ, দুজো তজত পরান।
সবহি কুরূপ সুরূপ হ্যায়, মানস বিন্দু প্রমান॥
অনুভব তে পণ্ডিত কহৈ, একহি বস্তু বিভেদ।
ভাব সাঁচ হী দেখনো, শান্তি সোই সোই খেদ॥
জগত নিহোরা কা করী, অপুন নিহোরা সাঁচ।
খুশী ভইল জব আপনী, সব জগ আপন জাঁচ॥

৩০ এপ্রিল—

ফুল ফুটলো প্রসন্ন হয়ে পাখীরা খুব কলরব করে উঠলো।
অপরের আবির্ভাব দেখলে সন্তের হৃদয় সুখী হয়॥
জীর্ণপত্রের বেশ ত্যাগ করে,পরে সবুজ নব পরিধান।
সুখসম্পদ পাবে ত্যাগ করেই, তাই শিক্ষা দেয়॥
অতি গরমে বায়ুবেগ জগতকে বিহ্বল করে দেয়।
খসের পর্দা বায়ুকে শীতল করে, গুণ-অবগুণ সঙ্গতি নির্ভর হয়॥
অসময়ের ছোলা বারবার জন্মে আবার মরে গেল।
সবল-নির্বল হওয়া কালের উপর নির্ভর, জগতে সকলেরই এক অবস্থা॥
পুষ্পবাটিকা সাজাতে গিয়ে চারাগাছ সব উপড়ে দিল
অস্থির মনের জন্য জলবিহীন তা শুকিয়ে গেল॥
বেশি সংখ্যা হলেই বেশি শক্তি হয় না
মেরু ধ্বসে গিয়ে মরুভূমি হয়ে যায়, কিন্তু তৃণ একত্রে মজবুত রশি তৈরি করে॥
লোকসঙ্গতে মানুষ সুখে লীন হয়, কিন্তু মুনির মনে তাতে ক্লেশ হয়।
ব্যক্তিভেদে একই বস্তু কারো কাছে যম কারো কাছে গণেশ॥
একই জিনিষ কারো মনে ধরে না কেউ তার জন্য প্রাণ দেয়।
সবই কুরূপ আর সুরূপ, মনের উপর সব নির্ভর॥
অভিজ্ঞতা থেকে পণ্ডিত বলে, ভিন্ন ভিন্ন বস্তু আসলে একই।
সত্যি করে ভেবে দেখলে, যা শান্তি তাই খেদ॥
জগতের কাছে কৃপা প্রার্থনা করে কি কাজ নিজের কৃপাপ্রার্থনা করাই আসল।
নিজে খুশী হলে সমস্ত সংসারকে তেমন মনে হবে॥

১ মে—“গর সতাতা হ্যায় কোই তো জুল্মকো সহতা রহে।
জুল্মসহনেমে মজা হ্যায় জুল্ম করনে মেঁ নহীঁ॥
গর বহুত জীনা ভী হোবে তো ভী রাহত-কব্বকো।
হিল্মমেঁ মিলতী তুম্হেঁ জো জুল্মমেঁ মিলতী নহীঁ॥
দিলকী খ্বাহিশকে মুতাবিক জব কোই করতা নহীঁ।

হ্যায় মতানত টুট জাতী লুতফ ফির রহতা ন হ্যায়॥
বাহরী চীজোমেঁ হ্যায় না লুত্ফ হরগিজ এ জনাব!
লুত্ফ উসমেঁ ক্যা ভলা কি জো পসন্দে-দিল ন হ্যায়॥
রহ্‌ম জোহর হ্যায় বনী-আদমকা মিস্লে নূর নার।
হো তরস মস্‌অব্ অদু পর গো কি বহ মুশ্‌ফিক ন হ্যায়॥
হেচ হ্যায় দর নজ্রে অশ্‌রফ নেমতুজ্জন্নাত্ ভী।
খৈর খাদিমকে লিয়ে মখ্দূম্ কস্ মুনঅম্ ন হ্যায়॥
নজ্র হো কালিব অনাস্ হ্যায় য়হ ফরিস্তোঁকী দুআ।
খল্ক কী খিদমত মেঁ তো বেহতর ফর্‌জ ইসসে ন হ্যায়॥
দর্দ দিল হো ঔরকো পর আহ সদ্ ভরতা রহুঁ।
জিন্দগীকা য়হ মজা মকবূলতর কিসকো ন হ্যায়॥"
গৈরকী জলতী মেঁ কুদে জিস্ম উস্কী কী লিয়ে।
সর্দ হ্যায় আতিশ ব বাদে-সর্দ ফর্হতদেহ ন হ্যায়॥
খল্করা দর-হুব্ব বীনী হুব্বরা দর-খল্ক বীঁ।
গর্ তুঁ লজ্জত জীস্ত খ্বাহী হুব্বরা দর দিল নিহী॥
কাঁচ আঁচ বহুতৈ সহৈ, নির্মল তত তব সোয়।
কহ 'উদার' কিমি আঁচ বিন, মনমলশোধন হোয়॥
জামে জেতো শ্রম লগৈ, বাকো তেতো দাম।
মানিক মোল অমোল হ্যায়, গুঞ্জা লহৈ ন কাম॥
থির গুণ গুণিকো মোল বহু, অথির থোরহী পায়।
পীতল সুন্দর বরন কিমি, কঞ্চন ভাব বিকায়॥
খেত শ্বেত জিন কারণে, তিনকো করত ন খ্যাল।
জিনকে ধন পীবর ভয়ে, তিনহি বিনাসত ব্যাল॥
সূত বহুত সন্তান তে, পটহিত করত পুরান।
উপল গন্ধ বরিসান তে, স্বারথ হৃদয় জুরান॥"

১ মে—

যদি কেউ বিরক্ত করে তবে তোমার অত্যাচার সহ্য করা উচিত।
অত্যাচার সহ্য করায় যে আনন্দ তা অত্যাচার করার মধ্যে নেই॥
যদি বাঁচতে হয় তবে তা মনের শান্তির সঙ্গে হওয়া উচিত।
সহ্য করার মধ্যে তুমি তা পাবে অত্যাচারের মধ্যে তা পাওয়া যায় না॥
মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যদি কেউ কাজ করে তাহলে মানসিক শক্তি নষ্ট হয়ে যায়॥
তার মধ্যে কোন আনন্দ থাকে না॥
হে জনাব বাইরের চাকচিক্যে কোন আনন্দ নেই।
যাতে মনের সায় নেই তারমধ্যে তৃপ্তি অনুসন্ধান করা বৃথা॥
করুণা করা মানুষের এক বিরাট গুণ আগুনের শিখার মত।
অতএব ঘৃণ্য শত্রুকেও করুণা করা উচিত যদিও সে করুণার পাত্র নয়॥
আশরফের (কবির) কাছে স্বর্গের নিয়ামতগুলির কোন দাম নেই।
যাই হোক সেবকের কাছে যার সেবা সে করে তাঁর করুণার শেষ নেই॥
মানুষের মনের প্রতি যেন দৃষ্টি থাকে ফরিস্তাদের এটাই প্রার্থনা।

সৃষ্টির কাজে লাগা এর থেকে বড় কর্তব্য আর কিছু নেই॥
অপরের কষ্টে আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলি।
জীবনের এই স্বাদ কার কাছে গ্রহণীয় নয়॥
অপরের জন্য যে আগুনে ঝাঁপ দেয়।
তার কাছে আগুন এক শীতল পদার্থ আর তা সুখদায়ক॥
সৃষ্টিকে ভালবাসার মধ্যে দেখ, ভালবাসাকে সৃষ্টির মধ্যে দেখ।
যদি তুমি আস্বাদপ্রার্থী হও তবে ভালবাসাকে মনের মধ্যে দেখ॥

অনেক উত্তাপ সহ্য করার পরেই কাঁচ নির্মল হয়।
'উদার' বলে উত্তাপ ছাড়া মনের•ময়লা কি করে শোধন হয়॥
যে বস্তুর জন্য যত শ্রম লাগে, তার ততই দাম।
মাণিকের মূল্য অমূল্য, কুঁচের জন্য কোন শ্রম লাগে না॥
স্থির গুণ আছে যে গুণীর তার অনেক দাম, যে অস্থির তার থোড়াই।
পিতল সুন্দর বর্ণের কারণে কাঞ্চনমূল্যে বিক্রী হয়॥
যার কারণে খেত শুভ্র হয়েছে, তৃণ তার খেয়াল করে না।
যার ধনে মোটা হয়েছে সাপ তারই বিনাশ করে॥
বেশি ব্যবহার রেশমি বস্ত্রকে পুরনো করে ফেলে।
বর্ষাকালে ঘুঁটের গন্ধ স্বার্থীর হৃদয় জুড়োয়॥

৩ মে—"ন্যায় সহায়ক ঔর হৈ, জহাঁ মিলত হ্যায় ন্যায়।
ঝুটি টিঢোরা ন্যায়কা, তহাঁ পিটাবত ধায়॥
সব পন্থন মেঁ উপরো, ধর্মাড়ম্বর বেষ।
দূরহি ঢোল সুহাবনী, য়হী সিদ্ধ অবশেষ॥
ধর্ম দোহাই দেইকরি, লূটি খাত সংসার।
সব ঠগইকে জানতেউ, বনত ন নর হুসিয়ার॥"
"বহিস্তনবৃত্তোপাসকা লোকা নান্তরনিরীক্ষকাঃ। অধ্যাত্ম-বাদজেন কতি নু বঞ্চকা দৃশ্যন্ত। অধ্যাত্মময়া অপি জনা লোকমায়াপ্রলোভিতাঃ তদ্রাগাক্রান্তাশ্চ।"

৩ মে—
ন্যায় দাতা আর কেউ, যেখানে ন্যায় পাওয়া যায়।
মিথ্যে ন্যায় ঢাক পিটিয়ে বেড়ায়॥
সব পথের উপরে হল ধর্মাড়ম্বর বেশ।
শেষে এটাই প্রমাণিত হয় যে তা দূর থেকেই ভাল লাগে॥
ধর্মের দোহাই দিয়ে সংসারকে সবাই লুটে খায়।
ঠকার ব্যাপারটা সমস্ত জেনেও মানুষ হুঁশিয়ারি হচ্ছে না।'

মানুষ বাইরের চরিত্রের উপাসক তারা অন্তর দেখতে পায় না। অধ্যাত্মবাদের ছলে কত প্রবঞ্চক দেখা যায়। আধ্যাত্মিক মানুষরাও লোকমায়া দ্বারা প্রলোভিত ও তার আকর্ষণে আক্রান্ত হচ্ছে।

৪ মে—"ধর্মময়ং জগত্। অহো বঞ্চনা। যদি বঞ্চনাং প্রকাশয়েত্ কশ্চিত্, সর্বে তৎপৃষ্ঠলগ্নাঃ তৎপ্রতারণপরাঃ। তদনুসরণপরা এব তত্ত্বজ্ঞমান্যাঃ, মহানুভাবাঃ, যোগীশ্বরাঃ, বিদ্বদগ্রেসরাঃ, বিরাগাবতারাঃ, কাকবিষ্ঠাবৎপরিত্যক্ত সর্বপরিগ্রহাঃ, ব্রহ্মভূতাঃ,

সংন্যাসিপ্রবরা ইমে। হন্তঃনৈভ্যঃ পরে বঞ্চকাঃ, দুঃশীলা, লম্পটাঃ, অবিদ্যাগ্রস্তাঃ, রাগগ্রস্তাঃ, লিপ্তসর্ববিষয়াঃ, অজ্ঞানিনঃ স্যুঃ।"

৪ মে—ধর্মময় জগৎ! অহো বঞ্চনা? যদি কেউ বঞ্চনা প্রকাশ করে সকলে তার পিছনে লেগে তাকে প্রতারণা করবে। এদের অনুসরণকারীরাই বহুজনমান্য মহানুভব, যোগীশ্বর, বিদ্যায় অগ্রসর, বৈরাগ্যের অবতার, কাকবিষ্ঠার মত সকল সুখভোগ পরিত্যাগী, ব্রহ্মভূত, সন্ন্যাসী প্রবর। হায় এদের চেয়ে বড় প্রবঞ্চক আর নাই। দুঃশীল, লম্পট, মূর্খ, রাগী, সকল বিষয়ে লিপ্ত এবং নির্জ্ঞান মানুষও আর নাই।

৫ মে—"লোকাঃ! কিং বো ফলমেভিঃ পাষণ্ডৈঃ? পরস্পরং বঞ্চয়ন্তঃ কিং তম্মহত্বং…, যত্সাধনৈকপরা অবিগণয্য সর্বমন্যদ্ এবং সত্যপরাঙ্মুখাঃ। অহো! আত্মবঞ্চকাঃ…উপরি সুধালিপ্তপ্রাসাদা অন্তর্মলীমসা এব। সর্বেৎপি ব্যবহারো জগতি বঞ্চনয়া প্রচলিত।"

৫ মে—"হে লোকগণ, এই সমস্ত পাষণ্ডদের দিয়ে তোমাদের কি হবে? পরস্পর বঞ্চনার দ্বারাই কি তাঁদের মহত্ব? …, একমাত্র যার সাধনা পরায়ণ হয়ে এরা অন্য সমস্ত বিবেচনা বিসর্জন দিয়ে এইভাবে সত্যভ্রষ্ট হয়েছে। হায়, আত্মপ্রবঞ্চকগণ। ওপরে সুধালিপ্ত প্রাসাদের মত ভেতরে এরা মালিন্যময়। জগতে সমস্ত ব্যবহারই বঞ্চনা দিয়ে চলছে।"

১৭ মে—"সাম্যধর্মার্থ গ্রামে গ্রামে কৃষকসংঘাঃ, শ্রমজীবি সংঘাঃ স্থাপনীয়াঃ। সংগ্রথনং কাংগ্রেস ক্রমেণৈব স্যাত্। কাংগ্রেসসংস্থায়ামপি গচ্ছেয়ুঃ, কাংগ্রেসাভাবে তাদৃশ্যো মাণ্ডলিকপ্রান্তীয়সংস্থাঃ স্যুঃ। স্বরাজ্যস্থাপনানন্তরং যাবদ্বাহ্যশত্রুভয়ং তাবন্নাত্যপেক্ষা বৃহদান্দোলনস্য॥ সুধারেণৈব তাবৎ শ্রমজীবিনাং দশা সুধারণীয়া। স্বশাসনে পুষ্টে সম্যগ্ আন্দোলনং প্রচলেত্। ধর্মবর্ণভেদো ন মধ্যে স্যাদ্ ভিন্নতাকারণম্। ধনিকনির্ধনভেদ এব ভেদহেতুঃ। ধনিকান্ স্ববংশ্যানধুনাহনুব্রজন্তি নির্ধনাঃ। স্বভাবঃ পরিবর্তনীয়ঃ।…"

১৭ মে—"সাম্য ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য গ্রামে গ্রামে কৃষকসংঘ, শ্রমিক সংঘ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কংগ্রেসের অনুসারেই সংগঠন করতে হবে। কংগ্রেসের সংস্থাতেও যাবে, কংগ্রেসের অভাবে তার মত মাণ্ডলিক প্রান্তীয় সংস্থাগুলিও তৈরী হবে। স্বরাজ্য-প্রতিষ্ঠার জন্য যতদিন পর্যন্ত বাইরের শত্রুর ভয় থাকবে ততদিন বড় আন্দোলনের প্রয়োজন নেই। শ্রমজীবিদের অবস্থার উন্নতির দ্বারাই তাদের সুপরিবর্তন সাধন করতে হবে। স্বশাসন পুষ্ট হলে আন্দোলন সম্যকভাবে চলবে। ধর্ম ও বর্ণভেদ মাঝপথে বিভেদের কারণ হবে না। ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্যই বিভেদের কারণ। নির্ধনরা এখন স্ববংশজ ধনীদের আশ্রয় গ্রহণ করছে। স্বভাব পাল্টাতে হবে।

১৮ জুন—"শৈশবং ধন্যম্। আজন্মমধুরং শৈশবং কথং নাভূত্। বৃদ্ধানাং তত্কথাশ্রাবণম্।… শৈশবমেব কিং, যদ্ যত পরোক্ষং সর্ব মনোরমং তত্। শিক্ষাপ্রদাঃ কথাঃ কালান্তরে এবং বিস্মৃতাঃ স্যুঃ। অন্যা এব পুস্তকৈঃ প্রচার্যন্তে। স্বতঃ কালান্তরে প্রাচীনানাং বিনাশো ধ্রুবম্। সনঃ ভৌতিকসামগ্রীবিরচিতো ন (বেত্তি ন) বক্তুং সন্নদ্ধঃ। অসম্ভবকথা প্রচারে কো লাভঃ। বুদ্ধিহীনপ্রলাপে কিংসারে কিংসারইতি।…"

১৮ জুন—শৈশব ধন্য! এই মধুর শৈশব আজন্ম কেন থাকল না? বৃদ্ধদের সেই কথা শোনান উচিত। শুধু শৈশব কেন, যা যা পরোক্ষ তা সবই মনোরম। শিক্ষাপ্রদ কথা কালান্তরে এইভাবে বিস্মৃত হয়ে যায়। বইপত্রে অন্য কথাগুলিই প্রচারিত হয়। পরে নিজে থেকেই পুরনো বিষয়ের বিনাশ নিশ্চিত। মন ভৌতিক সামগ্রী রচিত কিনা তা বলবার জন্য আমি তৈরী হই নাই। অসম্ভব কথার প্রচারে কি লাভ? বুদ্ধিহীন প্রলাপে কি সারবস্তু আছে?

২০ জুন—"... লোকে বিচিত্রা মৌর্খপরম্পরাঃ। স্ত্রৈণাঃ কেচন স্বজঘন্যৈরাচরণৈব স্বর্গাগারলুণ্ঠনপরা কৃতার্থম্মন্যাঃ। ঘৃণিতক্রিয়াকলাপৈপেরন্যে নিঃশ্রেয়সমধিজিগাংসতে। আচারভ্রষ্টাঃ কুটিলহৃদয়াঃ সাম্প্রতং জনৈঃ পূজিতা অবতারপদবীং যাবদ্ভজমানাস্তিষ্ঠন্তি, (তথৈব) জীবনচরিতেষু প্রকাশ্যন্তে। কালান্তরে সমসাময়িকানামভাবে তে তথৈব স্বীকৃতাঃ স্যুঃ। ইদানীমেব যদা ইদৃক্ খ্যাতিঃ অগ্রে কো রোদ্ধুমলম্।"

২০ জুন—হায় জগতে বিচিত্র মূর্খতার পরম্পরা। কোনো কোনো স্ত্রৈণ নিজের জঘন্য আচরণের দ্বারাই স্বর্গের আগার লুঠ করতে ব্যস্ত আর তাতেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করছে। অন্য কেউ কেউ ঘৃণ্য কাজকর্মের দ্বারা অধর্মকে লাভ করতে চাইছে। আচারভ্রষ্ট, কুটিল হৃদয় লোকেরা সম্প্রতি পূজিত হচ্ছে আর অবতার পদবী পাচ্ছে। জীবন চরিতে তাদের এই সমস্ত বিষয় প্রকাশিত হচ্ছে। কালান্তরে আমার সাময়িক পত্রের অভাবে ঐ সবকথা সেই ভাবেই স্বীকৃতিলাভ করবে। এখনই যখন এরকম খ্যাতি তখন ভবিষ্যতে তাদের খ্যাতি কে রোধ করতে পারে?

২৯ জুন—"হন্ত কীদৃশং জীবনম্! ক্ষণে কটুমরীচিকা আস্বাদবতী প্রতীয়তে, ক্ষণে সুমিষ্টমোদকাঃ কটুতাঃ ব্রজন্তি। দিনং কদাচিদুল্লাসময়ঃ রজনী সুখরজনী, তত্পরিবর্তনেহপি ন ভবতি চিরম্। অহো নাস্তি বস্তু কিমপি স্বাদু নীরসং বা, নাস্তি কুরূপা সুরূপা বা কাচিত্ সতী, যামেব পতি রঞ্জিচ্ছেত্ সৈব রূপরাশিঃ। যত্ স্বমনোনুকূলং তদেব সমীচীনং বস্তু।"

২৯ জুন—হায়, জীবন এইরকমই। এখন কটুমরীচিকা সুস্বাদু বলে মনে হয়, আবার পরেই মিষ্টি মোদক মনে হয় কটু। কখনও দিন আনন্দময় রাতও সুখের। তার পরিবর্তন হলেও তা চিরস্থায়ী নয়। হায়, কোন জিনিষ এরকম নেই যা স্বরূপতঃ স্বাদু অথবা নীরস। কোনো সতী এমন নেই যে কুরূপা বা সুরূপা। যাকে পতি পছন্দ করে সেই রূপবতী বলে বিবেচিত হয়। যা নিজের মনের মত তাই সমীচীন বস্তু।

৩০ জুন—"(যান্ত্রিক) ব্যবসায়ঃ? সহস্রাণাং দারিদ্র্যক্রোড়গতানাং শ্রমজীবিনাং কো মহানুপ্রকারঃ সতি মহতি সুধারেহপি। ন সাম্প্রতং আঢ্যানাং ক্ষেত্রপানাংচোন্মূলনমভিপ্রেতং...। কথং তর্হি সঞ্জীবনম্? কলাবৃদ্ধৌ মহানুপকার আঢ্যানামৈব বাণিজ্যবৃদ্ধৌ বণিজাম্। শিল্পবৃদ্ধৌ ন শিল্পিনাং বরাকাণাম্।..."

৩০ জুন—"(যান্ত্রিক) ব্যবসা। হাজার হাজার গরীব শ্রমজীবিদের মহা কল্যাণ সাধনেও কি মহা উপকার হতে পারে? এখন ধনী জমিদারদের উচ্ছেদ অভিপ্রেত নয়। তাহলে কিভাবে উৎসাহিত করা যেতে পারে? ক্রমে বৃদ্ধি দ্বারা ধনীদেরই মহান উপকারে লাগরে এবং বাণিজ্যবৃদ্ধির দ্বারা বণিকদের মহান উপকার হবে। শিল্পবৃদ্ধিতে হতভাগ্য শিল্পীদের ভাগ্যবৃদ্ধি হয় না।..."

৫ জুলাই—"অভ্যাসায়ৈকান্তবাসোহপেক্ষতে কেষাংচিন্মাসানাম্। ন যুক্তমস্মাদৃশাং সর্বথা বসতিবাসঃ। জ্ঞানহানিঃ, আত্মহানিঃ স্বভাবহানিরিতি সর্বতো হান্যাধিক্যং লাভমাত্রা স্বল্পীয়সী। তথাপি জনহিতসাধনায় সর্বসহেন ময়া ভবিতব্যম্। ন কস্য রাগঃ ন কস্য দোষঃ। মদীয়ং সর্বস্বং অখিলজগত্যৈ। ন সাধনাপুষ্টির্ভবেদ্ যথা তথা পরিবর্ত্তিতব্যম্।"

৫ জুলাই—অভ্যাসের জন্য কয়েক মাস ধরে নির্জনবাস প্রয়োজন। আমাদের মত লোকের সর্বদা জনবসতির মধ্যে বাস করা ঠিক নয়। জ্ঞানহানি, আত্মহানি, স্বভাবহানি—এভাবে সবদিকেই ক্ষতিরই আধিক্য। লাভের যা তা অল্পই। তবু জনকল্যাণের জন্য আমাকে সব সহ্য করতে হবে। কারও অনুরাগ বা কারও দোষ নেই। অখিল জগতের কল্যাণের জন্য

আমারই সব দায়িত্ব। সাধনার ত্রুটি যাতে না হয় আমাকে সেভাবে গড়ে উঠতে হতে হবে।

১৪ জুলাই—"...জনহিতবিঘাতিকা যাঃ কা অপি সংস্থাঃ তাসাং ভূতলাদ্, অত্যন্তাভাব এব বরং জাতু তা ঈশ্বরবাদিন্যোহনীশ্বরবাদিন্যো বা স্যুঃ।"

১৪ জুলাই—জনহিত বিনাশকারী যে সব সংস্থা আছে সেগুলো ঈশ্বরবাদী অথবা নিরীশ্বরবাদী যাই হোক না কেন তাদের পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করাই উচিত।

২৭ জুলাই—"সাহিত্যে এব শুদ্ধহিন্দীভাষায়া অপেক্ষা। ইতিহাসাদি গ্রন্থানামেকৈব ভাষা। লিপিভেদস্তু তিষ্ঠতু তাবদ্। কালে স্বৈরং রাষ্ট্রীয়তোদয়েকিম্পি ভবিষ্যতি পরিবর্ত্তনম্। অন্যত্রাপি সাহিত্যভাষা ভিন্না ভবতি। এবং উভয়োর্র্দুহিন্দোঃ সাহিত্যাধ্যাপনপার্থক্যং স্যাত্, অন্যত্সর্ব একত্রৈব ভবিতুং শক্যতে। সর্বধর্মানুয়ানামেক স্মিন্ বিদ্যালয়েহধ্যয়নং সাধু।"

২৭ জুলাই—সাহিত্যেই শুদ্ধ হিন্দি ভাষার প্রয়োজন। ইতিহাস ইত্যাদির গ্রন্থগুলোরও একই ভাষা, লিপিভেদ এখন মুলতুবি থাক। পরে স্বাধীন হলে পরিবর্তন হবে। অন জায়গাতেও সাহিত্যের ভাষা ভিন্ন হয়ে থাকে। এভাবে উর্দু ও হিন্দিভাষার সাহিত্যের অধ্যাপনায় পার্থক্য থাকবে অন্য সব কিছু একত্র হতে পারে। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ছাত্রদের একই বিদ্যালয়ে পড়ার ব্যবস্থাই ভাল।

২৯ জুলাই—

"মান মিলতা হ্যায় অগর মান কী মানে ন কহী।
জিন্দগী হেচ হ্যায় জিস্‌কে লিয়ে জীতা হ্যায় ওহী॥
এক মর মরকে ভী মিট্টীমেঁ নহী মিল জাতা।
চমনমেঁ সৈকড়োঁ ফুলোঁকী শক্ল খিল জাতা॥
লুত্‌ফ দুনিয়া কী হবস্ হো ন তো লুত্‌ফ উসমেঁ হ্যায়।
বাগ তো বাগ রেগীস্থান মেঁ হর ফুল খিলে॥
দমবদম শক্ল শগল খব্ধ বদলতী হ্যায় মুদাম্।
গৈর অস্বাতমেঁ অস্বাতকে ফঁসনেকো ক্যা কাম॥
শোর শুনতে হ্যায় হম আলিম হৈঁ ব আজম হৈঁ মগর।
দিলমেঁ দেখা তো হ্যায় কোই নহী হমসে অহকর॥
চহ্‌কতী বুলবুলে ঔকুকতী কোয়ল হ্যায় কঁহা।
কৈসে ওয়াঁঠহরৈ দবিস্তান হ্যায় বীরান জহাঁ॥
কিসমেঁ লজ্জত হ্যায় নহী স্বাদ হ্যায় য়হ কিসমেঁ কহৈঁ।
জবকি হর চীজমেঁ হর দম ন বহ লজ্জত হী রহৈ॥
হ্যায় য়হ নফরতকে হটানেকো ন নফরত কাফী।
মর্জে দিলকে লিয়ে এক হুব্ব হ্যায় কাফী শাফী॥

২৯ জুলাই—

মান তখনই প্যাওয়া যায় যখন মানের জন্য কেউ ছোটে না।
যার কাছে জীবনের কোন মূল্য নেই সেই বেঁচে থাকে॥
কেউ মরেও মাটিতে মিশে যায় না।
বাগানে শত শত ফুলের রূপে তা ফুটে ওঠে॥
দুনিয়ায় আনন্দলাভ করার বাসনা যার মধ্যে নেই সেই

তা আস্বাদন করতে পারে।
বাগান তো বাগান, মরুভূমিতে ফুল ফোটে॥
ক্ষণে ক্ষণে সৃষ্টির রূপ বদলায় চিরকাল।
যেখানে কোন স্বর নেই সেখানে স্বরের কি দরকার॥
জোর চর্চা শুনি যে আমরা জ্ঞানী কিন্তু।
মনের ভিতর দেখলাম যে আমাদের থেকে অকিঞ্চিৎকর আর কেউ নেই॥
কূজনরত বুলবুল আর কুহুডাকা কোকিলেরা কোথায়।
যে বাগান শূন্য হয়ে গেছে সেখানে তারা কিভাবে থাকবে॥
কিসে আস্বাদন পাওয়া যায় আর কিসে নয় তা কি করে বলবো।
যখন কোন জিনিষেই আর স্বাদ অবশিষ্ট নেই॥
এই ঘৃণাকে দূর করার জন্য ঘৃণা যথেষ্ট নয়।
মনের রোগের জন্য ভালবাসাই হল যথেষ্ট ওষুধ॥

১ আগস্ট (১৯২২)—

"বিম্বাবিম্বোদকজনয়নে চন্দ্রাচক্রান্তহাসে।
পদ্মচ্ছদ্মোদ্ধৃতনিজকরে শিংশুপুষ্পাংগয়ষ্টে॥
বিশ্বংভৃতেহম্ব! হৃদি কলয়ে সুপ্রবালাধরোষ্ঠাম্।
পাদাম্ভোজাশ্রিতমধুকরাব্যূহবৈবর্ণ্যবৃত্তঃ॥"
"চূর্ণ করকে ক্ষোদ সম উত্তুঙ্গ গিরিকো ইস তরহ্।
ধূত করকে ধূলি সম বীভৎস নাটক খেলনা॥
সর্বমঙ্গলময়ি! নশা ইস রম্য (মৃদু) উদ্যানকো।
ক্যা কোঈ ইসমেঁ ছিপা হ্যায় ভব্য অন্য রহস্য ভী॥

(তিলক)—

"সাল হোতা হ্যায় তেরে জানেমেঁ। খয়াল তেরা হ্যায় দানা দাগেমেঁ॥
বীজ বোয়া থা জিসকা তু নে য়হাঁ। খূনসে সীচে থা জিসে তু যহাঁ॥
ফূল লগনে কা উস প ওয়ক্ত আয়া। নজরেঁ দৌড়ী ন তু নজর আয়া॥
জিন্দগী সে পঢ়ায়া থা জো সবক। কৌমকে দিল প হ্যায় জমা য়হ তবক॥
জাহিরোঁ নজরোঁ মেঁ ন গো তু হ্যায়। পর বহক সবকা দিলনশী তু হ্যায়॥
দিল য়হ কহতা হ্যায় দেখুঁ ফির উহ জমাল। হৈফ গো হ্যায় য়হ মিন্ অমূরে মহাল॥
তিলক ক্যা ফির ন তু অব আয়েগা। মুন্তজির নজরোঁমেঁ সমায়েগা॥"
"অব্দৌ জাতৌ হ্য ইব মনসি প্রত্যাত্যয়ত্বৎপ্রয়াণে।
আবর্তান্যং পদমু শুশুভে ত্বচ্চত্বাদধানাঃ॥
দৃষ্টৈবৃষ্টিঃ শিশুষু পততি কান্তি তে বিগ্রহার্হঃ।
হস্তাম্মাতে স্থিত ইত ইব প্রার্থয়ামঃ শরীরম্॥
আপাদ্য স্বায়ুরখিলরসৈঃ স্বক্ষিতেরুর্বরাত্বম্।
উপ্তং বীজং চ রুধিরপয়োবর্দ্ধিতঃ পাদপস্তে॥
কালে পুষ্পোদ্গম ইহ বিভো। দৃষ্টয়ত্বদ্দিশোকাঃ।
আমোদাত্বদ্বিরহবিধুরা ন প্রমোদাবহাঃ স্যুঃ॥
দিব্যাবাণী হৃদয়কুহরান্ পাবয়ন্তী সদা তে।

সৌম্যাচারাঃ সৃতিষু সকলান্ মাধবীং মাদয়ন্তে॥
নির্ভীকান্তে গমণসরণো সারথী সারথীনাম।
একৈকন্তে গুণ উপকৃতেস্‌সক্ষমো বাল সূরে॥
কুর্বন্তস্তে হিতযুতবচঃ পালনং প্রাঞ্জলান্তাঃ।
ধর্মেণৈবং জননি সিতপাদাম্বুজং সেবমানাঃ॥
ক্লেশাগ্লেষান্ বিবৃতহৃদয়া আদরাদাদদানাঃ।
শক্রশ্রীণাং মুখমসিতমাধায় চাগ্রে সরন্তি॥
বর্ষস্যৈকং স্মরণনটনা ত্বম্মতা স্যান্ন মন্যে।
আজন্মার্চ্য প্রণতিবিরহা স্বার্চনা স্বাদিতা তে॥
বাণী ভাণপ্রহিতনুতিতঃ পাণিমুকস্তবস্তে।
শ্রেয়ঃ সর্বাত্ সরলসুগমঃ কর্মযোগো যতস্তে॥
দোষাদোষে দনুজহৃদয়াহ্লাদকল্হারচন্দ্রঃ।
ক্ষীণাধীনাকুচিত জনতাপদ্মিনী পদ্মিনীশঃ॥
জ্বালামালাহহটবি নিশিভীঃ ভীষ্মনৃশ্বাপদানাম্।
লোকালোকস্তিলক! জগতো জীবনং জীবনং তে॥"

১ আগস্ট, ১৯২২—হে পদ্মপত্র নয়নে, চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রহাস্যপরায়ণে, পদ্মব্যাজে নিজকরকে যিনি উদ্ধৃত করেন, পুষ্পের ন্যায় কোমল অঙ্গ যষ্টি বিশিষ্টে বিশ্বভূতে,সুন্দর প্রবালের ন্যায় অধরোষ্ঠ সমন্বিতে, মাতঃ, তোমাকে হৃদয়ে চিন্তা করি। তোমার চরণ পদ্মাশ্রিত মধুকরের দ্বারা চরিত্র বিবর্ণ হয়েছে।

(তিলক)—

বছর হতে চলেছে তুমি চলে গেছ।
কিন্তু তোমার চিন্তা দানা দানায় আছে॥
যে বীজ তুমি এখানে বুনেছিলে।
যাকে এখানে তুমি রক্ত দিয়ে সিঞ্চন করেছিলে॥
ফুল ফোটার যখন সময় এল।
দৃষ্টি তোমায় খুঁজলো কোথাও পেল না॥
জীবন থেকে যে পাঠ তুমি পড়িয়েছিলে।
পুরো জাতির মনে তা গভীরভাবে বসে গিয়েছে॥
খোলাচোখে যদিও তোমার উপস্থিতি দেখা যায় না।
কিন্তু প্রত্যেকের মনে তুমি নিজের জায়গা করে নিয়েছ॥
মন তো বলে যে সেই সৌন্দর্য আবার চোখ মেলে দেখি।
কিন্তু হায় তা তো এক অসম্ভব ব্যাপার॥
তিলক তুমি কি আবার ফিরে আসবে না।
প্রতীক্ষারত দৃষ্টিতে আর কি প্রবেশ করবে না॥

তোমার মৃত্যুর দু-বছর সময়ের গতির কথা চিন্তা করে মনে হচ্ছে যে তা যেন গতকালের ঘটনা। আবর্তিতভাবে অন্যপদ স্থাপনার দ্বারা তোমার বাক্য শোভমান ছিল। শিশুদের প্রতি তোমার দৃষ্টির বৃষ্টি পড়ছে, কিন্তু তোমার পূজনীয় শরীর কোথায়? হায়, তোমার আত্মা তো এখানেই আছে বলে মনে হয় কিন্তু তোমার শরীরকে আমরা ফিরে পাবার জন্য প্রার্থনা করি। নিজের আয়ু দ্বারা প্রাপ্ত অখিল রস দিয়ে নিজের ভূমির উর্বরতা সাধন

করেছ। তুমি বীজও বপন করেছ এবং রুধিররূপ জল দিয়ে প্রকাণ্ড বৃক্ষও হয়েছ। হে ভগবান, যে বৃক্ষে যথাসময়ে ফুল ফুটেছে। তোমার প্রেরণায় প্রবর্তিত দৃষ্টি তোমার বিরহে কাতর হয়ে সেই ফুলগুলির অতি সুন্দর গন্ধকে আনন্দদায়ক রূপে গ্রহণ করতে পারছে না।

তোমার হৃদয় কুহর থেকে সর্বদা পবিত্রতা সম্পাদিনী দিব্যবাণী বিকশিত হচ্ছে। তোমার সৌম্য আচারযুক্ত মাধুরী যাওয়ার পথে সকলকে আনন্দিত করছে।

সারথীদেরও সারথী হয়ে মানুষ নির্ভীকভাবে তোমার গমনপথ অনুসরণ করে থাকে। তোমার উপকারের গুণগুলো আমরা একটা একটা করে গুণতে সমর্থ।

হে জননী, ধর্ম অনুযায়ী এইভাবে তোমার শুভ্রচরপদ্ম সেবাকারী আমরা অঞ্জলীবদ্ধ করে তোমার হিতযুক্ত বচনগুলি পালন করি।

কষ্টকে খোলা মনে স্বীকার করে শত্রুদের ঐশ্বর্যের পুরোভাগকে তুচ্ছ করে তোমার অনুসরণকারীরা আগে আগে যাচ্ছে।

একটা গোটা বছরের স্মরণরূপ নাট্য তোমার সম্মতি লাভ করছে না মনে হয়। তারা আজন্ম অর্চনীয় তোমার প্রতি প্রণতি বিরহিত ভাবে থেকে নিজের অর্চনাকেই আস্বাদ করছে।

ছলনাময় স্তুতির ফলে তোমার প্রতি স্তুতিবিধায়িনী বাণী স্তব্ধ হয়েছে। তোমার কর্মযোগ অন্য সব বিষয় থেকে বেশি বরণীয় এবং তা সরল ও সুগম।

হে লোকালোকপর্বতের তিলকসদৃশ যে তোমার জীবন, জগতের জীবন সদৃশ, জ্বালামালাযুক্ত অরণ্যে ভয়ংকর রাত্রে তুমি আপৎগুলিরও ভীতিপ্রদ, দোষ আর দোষহীনতার মধ্যে অবস্থিত দানবহৃদয়ের আহ্লাদরূপ কুমুদকুসুমের পক্ষে চন্দ্রস্বরূপ, ক্ষীণ এবং তোমার অধীন অনুগতজনরূপ পদ্মিনীর পক্ষে তুমি সূর্যস্বরূপ।

৪ আগস্ট—"...আজন্মনঃ কিলাধ্যয়নাধ্যাপনপর্যটনানি হি মে কার্যাণি...।"

৪ আগস্ট—আজন্ম অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও পর্যটনই আমার কাজ।

৮ আগস্ট—"...অস্মাভিঃ স্বকর্ত্তব্যমেবানুসর্ত্তব্যম্। প্রদানেন ন কচিত্ কেনচিত্ স্বাতন্ত্র্যমধিগতম্। জগতি স্বার্থান্ধা ধূর্ত্তা চাঙ্গলজাতিঃ, ন প্রসন্নতয়া কিমপি সুকৃত্যমনুতিষ্ঠতি। অমেরিকা স্বয়ং স্বতন্ত্রতামধ্যগাত্, আয়র্লৈণ্ডোঽপ্যেবম্।"

৮ আগস্ট—আমাদের নিজের কর্তব্যই অনুসরণ করতে হবে। প্রদানের দ্বারা কোথাও কেউ স্বাধীনতা লাভ করে নাই। জগতে স্বার্থান্ধ ও ধূর্ত হচ্ছে ব্রিটিশ জাতি। প্রসন্ন হয়ে কোন ভাল কাজ করবে না। আমেরিকা স্বয়ং স্বাধীনতা লাভ করেছিল এবং আয়ার্ল্যাণ্ডও সেভাবেই স্বাধীনতা পেয়েছিল।

৯ আগস্ট—

"জাতা হুঁ তেরী গোদমে মুহসিন বিদা।
এ জেল মেরে গোশয়ে-তস্কীন আব্বিদা॥
পাবন্দ থা আ তুঝমেঁ ম্যায় আজাদ হুয়া।
আজাদ ফরিস্মেথকী জগহ্-পাক বিদা॥
উল্মা ব রহীবোঁকে হুয়ে দর্স য়হাঁ।
মাজীকে ব হালকে সবকে হী বিদা॥
খস্রতকো ফরিস্তোকী য়হাঁ করতে হ্যায় মাত।
কম হ্যায় ন মগর কাটে ভী মহরূম হ্যায় বিদা॥

কুছ কম নঁহী ছুঃমাহ তেরী গোদ পলে।
দিল হোতা হ্যায় মুজতর ফিরাক তেরে বিদা॥
ঔরাকে কুতুব-দীন রহে তুঝমেঁ খুলে।
ঔরাক-খলক খালিকে-তালা ভী বিদা॥
কুল্ফতমেঁ তেরী থা ওয়হ হুলাবতকা মজা।
এহসাস হ্যায় হোতা নহী ইজহার বিদা॥
দীবার ব দর তেরে থে মহবুব অগর।
অহ্বাব হকীকী থে তেরে সজা বিদা॥
হোতা হুঁ জুদা পর ন হমেশা কী উমীদ। মিলনেকী
রিয়াজতমেঁ রহুঁগা হী বিদা॥
হ্যায় হক্কয়ে এরাফ অগর খুলন্দ নঁহী।
দোজখ ব অদন আতে নজর তুঝসে বিদা॥
"শয়ন ভোজন সাথ থা হোতা য়হাঁপর ইস তরহ্।
ভাই ভাই বালাপনমেঁ মাতৃক্রোড়ে জিস তরহ্॥
পঢ়নে লিখনেকে লিয়ে মানো সতীর্থ্য সমগ্র হী।
বৈঠে হ্যায় আচার্য ঋষিয়োঁকে চরণতলমেঁ সভী॥
যুগ গয়ে জিনকে সুদিব্য পবিত্র বিগ্রহ উঠ গয়ে।
উনকে অনুপম শাস্ত্রবিগ্রহ-দর্শসে দুখ মিট গয়ে॥
সাথ রহ জড়জন্তুকা ভী, প্রেমপথ হোতা প্রশস্ত।
ফির ন প্রেমাগার মানবহৃদয় কিঁউ হো প্রেম-মস্ত॥
সন্ত সন্ত বিয়োগ দুখ দারুণ সহৈ বুধজন কহৈ।
হম অসন্ত বিয়োগ-দুখ-গম্ভীর-ধারামেঁ বহৈ॥
চির-প্রতীক্ষিত কর্মপথ আহ্বান যদ্যপি কর রহা।
স্নেহবন্ধন বন্ধুগোঁকা মুক্ত পর নহী কর রহা॥
ইতনে দিন নিশ্চিন্ত হো থে প্রেমসে রহতে রহে।
হো প্রসন্ন বিপত্তিয়োঁকা সাথ থে সহতে রহে।॥
ইস নগরসে জানেবালে কো যদ্যপি দর্শন নহী।
পর ভবিষ্য স্বকর্মসে হোতা অনাশ্বাসন নহী॥
বন্ধুয়োঁ। আজন্ম য়হ মিলনা ন ভুলেগা কভী।
স্মরণ হোবেগা জভী স্বর্গীয় সুখ হোগা তভী॥
কর্মমেঁ জা অপনে অপনে লগ্ন হো জানা অগর।
ভুল জানা অপনে ইন লঘুপ্রেমিয়োঁকো ফির ন পর॥

৯ অগাস্ট—

তোমার কোল থেকে আজ বিদায় নিচ্ছি হে পরোপকারি, বিদায়।
হে কয়েদখানা, আমার আরামদায়ক ছোট্ট কোণটি বিদায়॥
তোমার ভিতর বন্দী ছিলাম আজ আমি স্বাধীন হলাম।
আজাদ ফরিস্তাদের পবিত্র স্থান বিদায়॥
জ্ঞানী ও সাধকদের এখানে দর্শন পেলাম।
অতীত ও বর্তমান সকলকে বিদায়॥

আচার-আচরণগুলো দেবদূতদেরও পরাজিত করে।
কিন্তু কাঁটাও সেখানে কিছু কম নয় বিদায়॥
কিছু কম নয় ছ'মাস তোমার কোলে পালিত হলাম।
তোমাকে ছেড়ে যেতে বিরহের বেদনা বাজে, বিদায়॥
বইএর পাতাগুলো তোমার এখানে খোলা থাকলো।
সৃষ্ট ও সৃষ্টিকর্তার পাতাগুলিও বিদায়॥
কষ্টের মধ্যেও মিষ্টতার আস্বাদ পাওয়া যেত।
মনের ভিতর যা অনুভব করেছি তা প্রকাশ করতে পারছি না, বিদায়॥
তোমার দেয়াল ও দরজা আমার কাছে ছিল প্রিয়।
তোমার এখানের সবুজ ক্ষেত্র আমার কাছে প্রকৃতই প্রিয় ছিল, বিদায়॥
তোমার থেকে আলাদা হতে যাচ্ছি কিন্তু আশা করি বরাবরের মত নয়।
তোমার সঙ্গে মিলিত হবার চর্চা চালিয়ে যাব, বিদায়॥
এতো বরাবরের থাকার জায়গা নয়।
নরক ও স্বর্গ এখান থেকেই দেখা যায়, বিদায়॥
এখানে এইভাবেই শয়ন-ভোজন সব একসঙ্গে হত।
ভাইভাই বাল্যে মাতৃক্রোড়ে যেভাবে থাকে॥
লেখাপড়ার জন্য যেন সকলেই সতীর্থ।
আচার্য ঋষিদের চরণতলে সকলেই বসে আছে॥
অনেক যুগ আগে যাঁরা সুদিব্য পবিত্র শরীর ত্যাগ করেছেন।
তাঁদের অনুপম শাস্ত্রবিগ্রহদর্শনে দুঃখ দূর হল॥
একসাথে থাকলে জড়জন্তুদেরও প্রেমপথ প্রশস্ত হয়।
তবে প্রেমাগার মানবহৃদয় কেন হবে না প্রেম পাগল॥
বুদ্ধিমানরা বলে সাধুরা দারুণ সাধু বিয়োগ-দুঃখকে সহ্য করে।
আমরা সাধারণ মানুষ বিয়োগ-দুঃখ গভীর ধারায় ভেসে যাই॥
চির-প্রতীক্ষিত কর্মপথ যদিও আহ্বান করছে।
বন্ধুদের স্নেহবন্ধন তবু মুক্ত করছে না॥
এতদিন ধরে নিশ্চিন্ত হয়ে আনন্দে দিন কাটিয়েছি
সব বিপদকে প্রসন্ন মনে একসঙ্গে সহ্য করেছি॥
এই শহর থেকে যারা চলে যায় তাদের যদিও দর্শন হয় না।
তবে ভবিষ্যতের স্বকর্মের জন্য আশ্বাসও হারাচ্ছি না॥
বন্ধুগণ! আজন্ম এই মিলিত হওয়াকে ভুলবো না।
যখনই স্মরণ হবে তখনই স্বর্গীয় সুখ পাবো॥
যদি যার যার কর্মক্ষেত্রে নিমগ্ন হয়ে যেতে হয়।
তবু নিজেদের এই লঘুপ্রেমীদের ভুলে যেও না॥'

২· সাংকৃত্যায়ন বংশ*

(সরযূপারীণ মলাঁও-শাখা)

(ক) বৈদিক কাল

উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণদের মধ্যে সরযূপারীণ অথবা সরওয়রিয়া ব্রাহ্মণদের এক বিশেষ স্থান আছে। এদের বসতি বেশীরভাগই ফৈজাবাদ, বেনারস ও গোরখপুরের কমিশনারিতে (বেনারস, মির্জাপুর, গাজীপুর, বালিয়া, জৌনপুর, আজমগড়, গোরখপুর, বস্তী, ফৈজাবাদ, গোন্ডা, বহরাইচ, প্রতাপগড়, সুলতানপুর জেলা) এবং বিহারের সারন, চম্পারন, শাহাবাদ জেলায়। এসব জেলাগুলির আশেপাশের জেলাতেও এদের সংখ্যা যথেষ্ট। এছাড়া এরা মধ্যপ্রদেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। এই প্রদেশে কাশী শহরের মতো সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র হওয়ায় এঁদের মধ্যে সংস্কৃতের গভীর পাণ্ডিত্য থাকা স্বাভাবিক। সেই সঙ্গে এঁদের সামাজিক সংকীর্ণতা এতটা বেশি যে তিন-চার বছর আগে সরযূপারীদের মধ্যে কোনো বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট ছিল না। সরওয়ারিয়া ব্রাহ্মণদের প্রধান ১৬টি গোত্রের মধ্যে একটি হল সাংকৃত্য গোত্র। গোরখপুর জেলার মলাঁও গ্রাম (গোরখপুর থেকে ১৪ মাইল দক্ষিণ অক্ষাংশ ২৬°/৩২′ উ, দেশান্তর ৮৩°/২৫′) এঁদের উৎস স্থান। তাই পদবীর সঙ্গে মিলিয়ে এঁদের মলাঁও-পাণ্ডেও বলা হয়ে থাকে।

ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, গৌতম, অত্রি, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি ও বশিষ্ঠ এই সাতজন বৈদিক ঋষি নামে বিখ্যাত।[১] ঋগ্বেদের দুটি সূক্তে (৯/৬৭, ১০/১৩৭) এই সাত[২] ঋষির সমান সংখ্যায় কিছু ঋক্ একত্রিত করা হয়েছে। প্রথম সূক্তে তিনটি তিনটি এবং দ্বিতীয়টিতে একটি একটি ঋক্ আছে। অন্য দুই জায়গায় সর্বপ্রথম ভরদ্বাজের ঋক্ আছে যা অভ্যর্হিতং পূর্ব (আগে পূজ্যকে) নিয়মানুসারে ভরদ্বাজের প্রাধান্য প্রমাণিত করে। ঋগ্বেদের ১০১৭ সূক্তের ৩৬টিরও বেশী[৩]

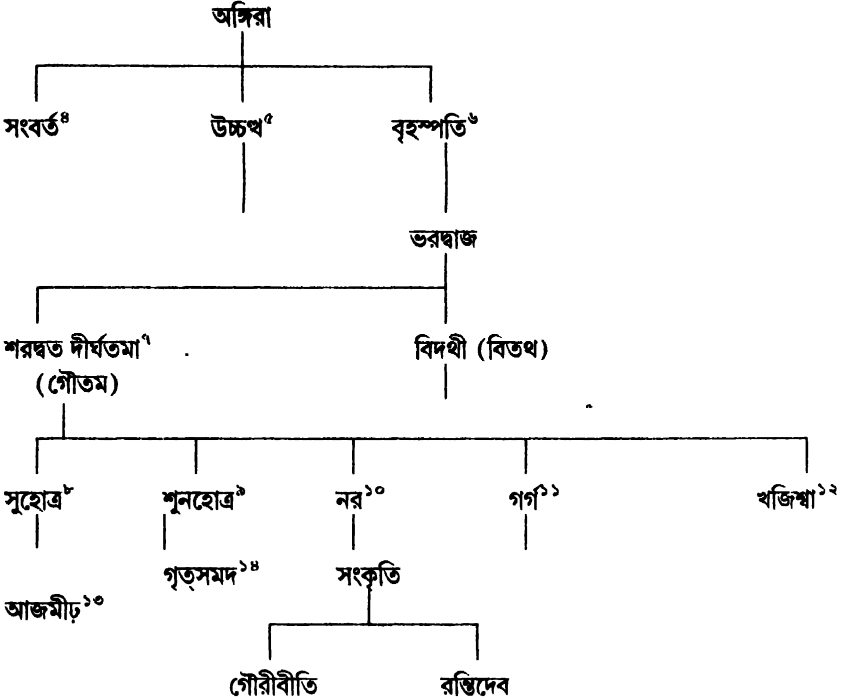
* ১৯৩৯-এ লিখিত

১ "বিশ্বামিত্রোহথ জমদগ্নির্ভরদ্বাজোহথ গোতমঃ।
অত্রির্বশিষ্ঠঃ কশ্যপ ইত্যেতে সপ্তর্ষয়ঃ॥ (বোধায়ন-সূত্র, প্রবরাধ্যায়)
বিশ্বামিত্রোহসিতঃ কনেবা দুর্বাসা ভৃগুরঙ্গিরা। বশিষ্ঠো বামদেবোহত্রিস্তথা সপ্তর্ষযোহমলাঃ॥ (অধ্যাত্মরামায়ণ, উত্তরকাণ্ড)
কোথাও কোথাও আটজন ঋষির উল্লেখ পাওয়া যায়—ভৃগু, অংগিরা, মরিচী, অত্রি, বশিষ্ঠ, পুলস্ত্য, পুলহ এবং ক্রতু (বায়ু-প্র· ১৯।৬৮-৯, মৎস্য-পু· ১৭১।২৮)

২ বাকী ছ'জন ঋষির মন্ত্র ঋক্-সংহিতাতে নিম্নপ্রকার পাওয়া যায়—
কাশ্যপ মারীচ ১।৯৯; ৮।২৯; ৯।৬৪।৪-৬; ৯।৯১; ৯২, ১১৩, ১১৪; ১০।১৩৭। ২॥ গৌতম রাহুগণ ১।৭৪-৯৩; ৯।৩১; ৯।৬৭।৭-৯; ১০।১৩৭।৩॥ অত্রি ভৌম ৫।২৭, ৩৭-৪৩, ৭৬, ৭৭, ৮৩-৮৬; ৯।৬৭।১০-১২; ৯।৮৬।৪১-৪৫; ১০।১৩৭। ৪॥ বিশ্বামিত্র গাথিন ৩।১-১২, ২৪, ২৫, ২৬ (১-৬, ৮, ৯), ২৭-৩২, ৩৩ (১-৩, ৫, ৭, ৯, ১১-১৩), ৩৪, ৩৫, ৩৬ (১-৯, ১১), ৩৭-৫৩, ৫৭-৬২; ৯।৬৭।১৩-১৫; ১০।১৩৭।৫; ১০।১৬৭। ৫॥ জমদগ্নি ভার্গব ৩।৬২।১৬-১৮;৮।১০১; ৯।৬২, ৬৫, ৬৭ (১৬-১৮), ১০।১১০, ১৩৭(৬), ১৬৭॥ বশিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি ৭।১-৩২, ৩৩ (১-৯), ৩৪-১০৪; ৯।৬৭ (১৯-৩২), ৯০, ৯৭ (১-৩); ১০।১৩৭।৭;

৩· ঋক্ ৬।১-১৪, ১৬-৩৩, ৩৭-৪৩; এবং ৯।৬৭ ও ১০।১৩৭-এর সপ্তমাংশে।
৪· সংবর্ত আঙ্গীরস ঋগ্ ১০।১৭২॥ ৫· উচথ্য আঙ্গীরস ঋগ্ ৯।৫০-৫২॥ ৬· বৃহস্পতি আঙ্গীরস ১০।৭১, ৭২॥ ৭· দীর্ঘতমা ঔচথ্য ঋগ্ ১।১৪০-১৬৪॥ ৮· সুহোত্র ভারদ্বাজ ৬।৩১, ৩২॥ ৯· শুনহোত্র ভারদ্বাজ ৬।৩৩, ৩৪॥ ১০· নর ভারদ্বাজ৬। ৩৫, ৩৬॥ ১১· গর্গ ভারদ্বাজ ৬।৪৭॥ ১২· ঋজিশ্বা ভারদ্বাজ ঋগ্ ৬।৪৯-৫২; ৯।৯৮, ১০৮।৬, ৭॥ ১৩· আজমীঢ় সৌহোত্র ঋগ্ ৪।৪৩, ৪৪॥ ১৪· গৃৎসমদ আঙ্গীরস শৌনহোত্র পশ্চাদ্ গৃৎসমদ ভার্গব শৌনক ঋগ্ ২।১-৩, ৮-৪৩; ৯।৮৬।৪৬-৪৮।

ভরদ্বাজ রচিত, এটাও ভরদ্বাজের বিশেষত্ব প্রকাশ করে। ভরদ্বাজ বংশবৃক্ষ এইরকম



কাত্যায়নকৃত ঋগ্বেদের সর্বানুক্রমে[১] বিতথ অথবা বিদথীর সুহোত্র প্রভৃতি পাঁচ পুত্র লেখা হয়েছে। কিন্তু মহাভারত[২] ইত্যাদিতে শুনহোত্র ছাড়া অবশিষ্ট চারজনকে বিতথের পৌত্র ও ভুবমন্যুর পুত্র বলা হয়েছে।

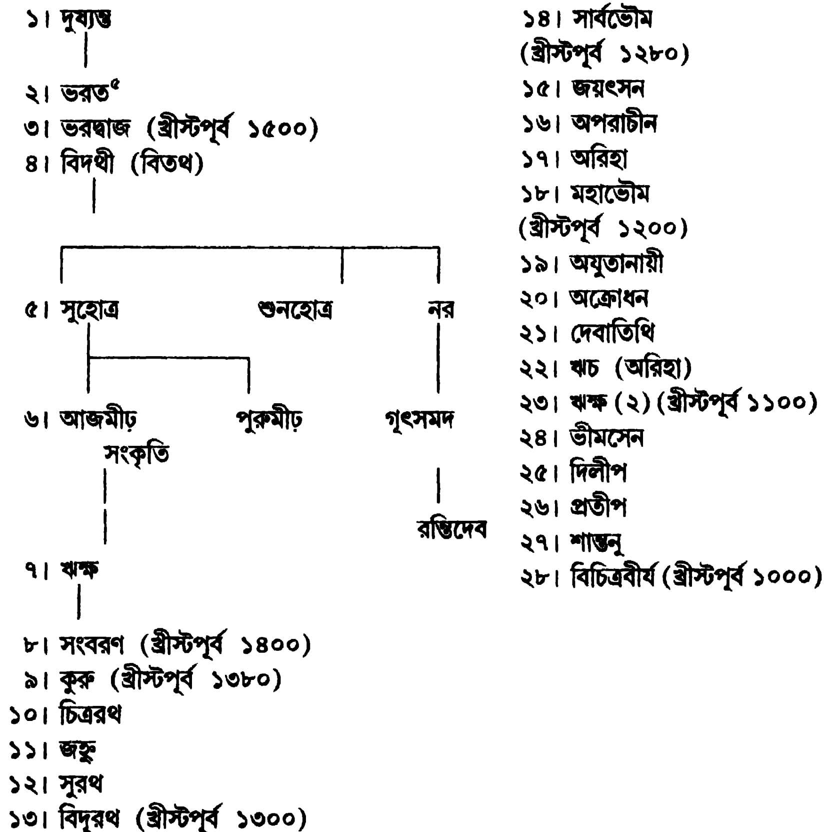
সংকৃতি ঋষির কাল—ভরদ্বাজের খুড়তুতো ভাই ও উচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা—যিনি পরে গৌতম নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন—দুষ্যন্তের পুত্র শাকুন্তলেয় ভরতের অভিষেক[৩] করিয়েছিলেন। সন্তানেরা মরে যাওয়ার পর ভরত দীর্ঘতমার প্রেরণায় ভরদ্বাজকে পোষ্য নিলেন। ভরদ্বাজ স্বয়ং

১· সর্বানুক্রম (কাত্যায়ন) ও বেদার্থদীপিকা (সায়ণ) ঋগ্ ৬।৫২

২· দায়াদো বিতথস্যাসীদ্ ভুবনমন্যুর্মহাযশাঃ।
মহাভূতোপমাঃ পুত্রাঃ চত্বারো ভুবমন্যবঃ॥
বৃহৎক্ষেত্রো মহাবীর্যো নরো গর্গশ্চ বীর্যমান।
নরস্য সংকৃতিঃ পুত্রস্তস্য পুত্রৌ মহৌজাসৌ॥
গুরুধী রন্তিদেবশ্চ সাংকৃত্যৌ তাবুভৌ স্মৃতৌ।
গর্গাঃসংকৃতয়ঃ কাপ্যাঃ ক্ষত্রোপতা দ্বিজাতয়ঃ॥
—(বায়ুপুরাণ ৯১। ১১৫; ব্রহ্মাণ্ড ৩।৬৬।৮৬;
মহাভারত ১২।২৩৪।৪৩৯৬ এর ভিত্তিতে)

৩· ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৮।২৩, ২১

সিংহাসনে আরোহণ না করে তাঁর পুত্র বিতথ অথবা বিদথীকে রাজ্যসিংহাসন দিয়েছিলেন[৪]। এভাবে ভরদ্বাজের সন্তান কালক্রমে ভরতের বংশ ও রাজ্যের উত্তরাধিকারী হল এবং সেই কারণেই মহাভারতে 'ভরদ্বাজো ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়োঽভবত্' (ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণদের থেকে ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি হয়েছে) লেখা হয়েছে। নিম্নলিখিত ভরদ্বাজের বংশবৃক্ষ থেকে বোঝা যাবে যে কৌরব-পাণ্ডব স্বয়ং ভরদ্বাজের পুত্র বিদথীর সন্তান ছিলেন এবং তাঁরই দ্বিতীয় পুত্র নর থেকে সংকৃতির জন্ম হয়েছে—



৪· 'উপনিন্যুর্ভরদ্বাজং পুত্রার্থ ভারতায় বৈ।
দায়াদোংহগীরসঃ সূনুরৌরসস্ত বৃহস্পতেঃ॥
ভরতস্তু ভরদ্বাজং পুত্রং প্রাপ্য বিভুব্রবীৎ।
প্রজায়াং সংহুতায়াং বৈ কৃতার্থোহম ত্বয়া বিভো॥
ততস্তু বিতথো নামভরদ্বাজাৎ সুতোঽভবৎ।
তস্মাৎ দিব্যো ভরদ্বাজো ব্রাহ্মণ্যাৎ ক্ষত্রিয়োঽভব্ৎ॥
ততোঽথ বিতথে জাতে ভরতঃ স দিবং যযৌ।
ভরদ্বাজো দিবং যাতো হ্যাভিষিচ্য সুতং ঋষিঃ॥'
—মহাভারত(১।৯৪।৩৭১০-৩)

৫· Choronology of Ancient India (S.N.Pradhan) pp. 79-80;

২৯। পাণ্ডু
৩০। অর্জুন
৩১। অভিমন্যু
৩২। পরীক্ষিৎ
৩৩। জনমেজয় (খ্রীস্টপূর্ব ৯০০)
৩৪। শতানীক
৩৫। অশ্বমেধদত্ত
৩৬। অধিসীম কৃষ্ণ
৩৭। নিচক্ষু
৩৮। উষ্ণ (ভূরি) (খ্রীস্টপূর্ব ৮০০)
৩৯। চিত্ররথ
৪০। শুচিরথ
৪১। বৃষ্ণিমান
৪২। সুষেণ
৪৩। সুনীথ[১] (খ্রীস্টপূর্ব ৭০০)
৪৪। নৃচক্ষু (ভিচক্ষু)
৪৫। সুখীবল
৪৬। পরিপ্লুত
৪৭। সুনয়
৪৮। মেধাবী (খ্রীস্টপূর্ব ৬০০)
৪৯। নৃপঞ্জয়
৫০। তিগ্ম
৫১। বৃহদ্রথ
৫২। বসুদামা
৫৩। শতানীক (খ্রীস্টপূর্ব ৫০০)
৫৪। উদয়ন (খ্রীস্টপূর্ব ৪৮০)

এই বংশাবলীতে[২] ভরদ্বাজ থেকে উদয়ন (বৎসরাজ) পর্যন্ত ৫৪ প্রজন্ম হয়। ডক্টর প্রধান প্রত্যেক প্রজন্মের জন্য ২৮ বছর রেখেছেন, কিন্তু আমার মতে সময়টা ধরা হয়েছে বিশেষত রাজাদের ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের সম্পর্কে, তাই প্রত্যেক প্রজন্মের জন্য কুড়ি বছর রাখলে ঠিক হবে। উদয়ন বৎসরাজ, খ্রীস্টপূর্ব ৪৮৭-তে বুদ্ধের নির্বাণের সময় জীবিত ছিল, আর তত বৃদ্ধ ছিল না। তাকে খ্রীস্টপূর্ব ৪৮০ ধরে নিলে ভরদ্বাজের সময় খ্রীস্টপূর্ব ১৫০০ ও সংস্কৃতির খ্রীস্টপূর্ব ১৪৪০ হবে।

পাঞ্চালের প্রতাপশালী রাজা দিবোদাসের ভরদ্বাজ ঋষির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল, অতএব ঋষি ঋগ্বেদে[৩], তাঁর কিছু ঋক্-এ দিবোদাসের প্রশংসা করেছেন। এক শংকর (শবর অথবা আর্যভিন্ন) রাজার ওপর দিবোদাসের বিজয়কে ইন্দ্রের ধন্যবাদ রূপে ঋষি এভাবে বর্ণনা করেছেন—

'হে ইন্দ্র! তুমি (শত্রু-নি,) বর্হণ, প্রশংসার যোগ্য, তুমি শত সহস্র (অসুর) শূরকে পরাস্ত করেছ, তুমি পাহাড় থেকে আগত দাস শম্বরকে মেরেছ এবং রক্ষার বিচিত্র কৌশলে দিবোদাসকে রক্ষা করেছ।'[১]

এই দিবোদাসের বোন[২] ছিলেন অহল্যা, যিনি দশরথ, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের সময়ের গৌতম ঋষির স্ত্রী ছিলেন। গৌতম ঋষি কে ছিলেন? ভরদ্বাজের মাতা মমতা ও কাকা উচথ্যের (উতথ্য)

১· Chronology of Ancient India (S.N. Pradhan) p. 256.
২· A.I.H.T. (Pargiter) p.112, A.I.H.T. (Pargiter) p. 112,
Chronology of Ancient India (S. N. Pradhan) pp. 7980, p. 259.
৩· ইয়মদদাদ্রভসমৃণচ্যুতং দিবোদাস বধ্র্যশ্বায় দাশুষে।
যা শাশ্বন্তমাচখাদাবসং পণিং তা তে দাত্রাণি তবিষা সরস্বতি॥
—ঋক ৬।২৬।২
১· ত্বং তদুক্থমিন্দ্র বর্হণা কঃ প্র যচ্ছতা সহস্রা শূর দর্ষি।
অব গিরেদাসং শম্বরং হন্ প্রাবো দিবোদাসং চিত্রাভিরূতী।
—ঋক্ (৬।২৬।৫)
২· বধ্র্যশ্বান্মিথুনং যজ্ঞে মেনকায়ামিতি শ্রুতিঃ।
দিবোদাসশ্চ রাজর্ষিরহল্যা চ যশস্বিনী॥
—বায়ুপুরাণ ৯৯।২০০ (মেলাও হরিবংশ ১।৩২।৭০; বিষ্ণুপুরাণ ৪।১৯।১৬)

পুত্র জন্মান্ধ দীর্ঘতমাই চোখ ফিরে পাওয়ার পর গৌতম নামে পরিচিত হয়েছিলেন[৩] এইপ্রকার ভরদ্বাজ বৈদিক কালের আরম্ভে জন্মেছিলেন, এবং ঋগ্বেদের রচনায় তাঁর যথেষ্ট হাত ছিল। ভরদ্বাজ থেকে চতুর্থ প্রজন্ম আজমীঢ়, পুরুমীঢ়, গৃৎসমদের পর বেদের ঋক্ রচনার কাজ অনেকটা সমাপ্ত হয়ে যায়।

যাঁরা ঋগ্বেদের মন্ত্র রচনা করেছেন, তাঁদের দিকে যখন তাকাই, তখন বুঝতে পারি, যে তখনকার আর্যদের মধ্যে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি জাতি আলাদা আলাদা সৃষ্টি হয়নি। ভরতবংশের উত্তরাধিকারী বিদথী ক্ষত্রিয় নৃপতি ছিলেন, এবং তাঁর পৌত্র আজমীঢ় সৌনহোত্র থেকে কুরু, উত্তর পাঞ্চাল, দক্ষিণ পাঞ্চালের রাজবংশের উৎপত্তি হয়। পুরাণ[৪] অনুসারে শুনহোত্রের তৃতীয় পুত্র গৃৎসমদের বংশজ শৌনক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ইত্যাদি বর্ণের প্রতিষ্ঠা করেন। ভরদ্বাজগোত্রীয়[৫] শৌনকের বংশবৃক্ষ ডক্টর প্রধান এই রকম দিয়েছেন[৬]

গৃৎসমদ (খ্রীস্টপূর্ব ১৪৪০)	তমঃ
সবেতা	প্রকাশ
বর্চা সাবেতস	বাগীন্দ্র
বিহব্য (ঋক্ ১।১২৮)	প্রমিতি
বিতস্ত্য (বিতত্য)	রুরু
সত্ত্য	শুনক
শিবন্তসন্তাঃ	শৌনক (পরীক্ষিৎ খ্রীস্টপূর্ব ৯২০)
শর্বাঃ	

শৌনকের সময় মহাভারতের কালের কাছাকাছি; সেই সময়ে পর্যন্ত বর্ণ-ব্যবস্থা—বিশেষত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বর্ণ-ব্যবস্থা ছিল না, এই বক্তব্য তো ব্যাস, ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর দৃষ্টান্ত থেকেও প্রমাণিত হয়।

নরঋষি (খ্রীস্টপূর্ব ১৪৬০)—রাজা বিদথী যাবিতথের পুত্র নর ঋগ্বেদের[১] ঋষিদের অন্যতম ছিলেন। ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলের ৩৫, ৩৬ সূক্তের দশটি ঋকের মধ্যে তিনি ইন্দ্রের বীরত্বের স্তুতি করেছেন এবং স্বীয় বংশধর ভরদ্বাজ ও আঙ্গিরসের জন্য বিশেষ করে গোধন প্রার্থনা করেছিলেন। 'সমুদ্রং ন সিন্ধবঃ' (সমুদ্রে নদী যেমন) ঋক অংশ থেকে বোঝা যায় যে নর অধিকাংশ সময় পাঞ্জাবেই ছিলেন। নদীবাচক সিন্ধু শব্দ কুরু-পাঞ্চাল অথবা কাশী-কোশলে বিস্তার লাভ করতে পারেনি। দর্দ-ভাষায় (গিলগিটের পাশে) তো আজও সব নদীকে সিন্ধু বলা হয়ে থাকে।

সংকৃতি (খ্রীস্টপূর্ব ১৪৪০)—সংকৃতি নরের মতো মন্ত্রকর্তার পুত্র ছিলেন এবং গৌরিবীতি (গুরুধী, গুরুবী)[২]র মতো মন্ত্রকর্তা ঋষি ও রন্তিদেবের মতো চক্রবর্তী রাজার পিতা ছিলেন। সংকৃতি সম্পর্কে আমরা এর চেয়ে বেশি জানি না।

৩· বায়ুপুরাণ ৯৯।২৬-৩৪, ৪৭-৯৭; ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ৩।৭৪।২৫-৩৪, ৪৭-১০০; মৎস্য ৪৮।২৩-২৯

৪· ব্রহ্মপুরাণ ২।৩২, ৩৩; বিষ্ণুপুরাণ ৪।৮।১; বায়ুপুরাণ ৯২।২, ৩, ৪, দেখ Chronology of Ancient India (Dr. S.N. Pradhan) p. 28.

৫· ঋক্ ৬।৩১, ৩২ (সুহোত্র); ৬।৩৩, ৩৪ (শুনহোত্র); বেদার্থদীপিকা (সায়ণ), ঋগ্ ৬।৫২ ও সর্বানুক্রম ঋগ্ ৬।৫২; 'য আঙ্গিরস, শৌন হোত্রোভূত্বা ভার্গব...কো অভবৎ স গৃৎসমদ:... স চ পূর্বমাঙ্গিরসকুলে শুনহোত্রস্য পুত্র সন্ যজ্ঞকালেহসুরৈগৃহীত ইন্দ্রেণ মোচিত।" (সায়ণ, ঋক ২।১)।

৬· Chronology. Ancient India, pp. 59-60.

১· ঋক ৫।২৯, ৯।১০৮ (১-২); ১০।৭৩, ৭৪

২· সরযূপারীণ-ব্রাহ্মণ-বংশাবলী, পৃ: ৮২তে "গৌরবীতি"।

গৌরিবীতি সাংস্কৃতি (খ্রীস্টপূর্ব ১৪২০)—ঋগ্বেদের মন্ত্রকর্তা ঋষি গৌরবীতি কে শাক্ত্য বলা হয়েছে, তাই ভ্রম হতে পারে যে এই গৌরবীতি হয়তো বশিষ্ঠ-শূন শক্তির পুত্র। কিন্তু বশিষ্ঠের বংশধর তো ইনি ছিলেন না। কেননা (১) এঁর রচিত এক সূক্ত (৫।২৯) মন্ত্রকে বশিষ্ঠের মণ্ডল (ঋক্ ৭)-এ না রেখে আত্রেয় অঙ্গিরস, মণ্ডল (ঋক্ ৫)-এ রাখা হয়েছে; (২) এঁর রচিত দুটি ঋক্ (৯।১০।১২) এমন সূক্তে রাখা হয়েছে, যার ঋষি উরু আঙ্গিরস ঋজিশ্বা ভরদ্বাজ, উর্ধ্বসদ্মা আঙ্গিরস, কৃত্যযশ আঙ্গিরস—সংকৃতি বংশের মতো আঙ্গিরস। (৩) এঁর দুটি সূক্ত (১০।৭৩, ৭৪) বৃহস্পতি আঙ্গিরসের দুটি সূক্তের (ঋক্ ১০।৭১, ৭২) পরে আসে; (৪) জৈমিনীয়, ব্রাহ্মণে[৩] সং(সাং)কৃতি গৌরবীতির উল্লেখ করেছে, এই গৌরবীতি শাক্য আর আসিত ধাম্য অসুরের কুমারী কন্যার গর্ভজাত। এর ফলে গৌরবীতির সম্পর্ক শবিত বশিষ্ঠের সঙ্গে না হয়ে সংকৃতির সঙ্গে স্থাপিত হয়ে যায়; (৫) স্বরচিত এক পদ্যতে (ঋক্) ঋষি তাঁর নামের সঙ্গে বংশের পূর্বজ ঋষিদের মধ্যে বৈদথিন (নর), ঋজিশ্বার উল্লেখ করেছেন।[৪] (৬) সংস্কৃতির পুত্র গৌরবীতির সম্পর্কে পর্জিট লিখছেন —'The other Sankriti's name is given as গুরুবীর্যঃ (বায়ুপুরাণ), গুরুধী (মৎস্যপুরাণ) গুরু (ভাগবত) and রুচিরধী (বিষ্ণুপুরাণ)। He is no doubt the same Rishi who is named among the Angirasas as গুরুবীত and গৌরবীতি and the correct name is গৌরিবীতি··· there was also a শক্তি among the Angirasas.'[৫] (৭) সাংকৃত্য মলাঁও পাণ্ডেদের তিন প্রবর[৬] আছে—অঙ্গিরা, সংকৃতি ও গৌরবীতি।

৩· জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ (III-197 caland-এর উদ্ধরণ, p. 269)

৪· স্তোমাসঃ ত্বা গৌরিবীতেঃ অবর্ধন্ নরন্ধয়ো বৈদথিনায় পিপ্রুম্।
আ ত্বাং ঋজিশ্বা সখ্যায় চক্রে পচন্ পক্তীঃ অপিবঃ সোমমস্য॥
—(ঋক্ ৫।২৯।১১)

৫· Ancient Indian Historical Tradition (F. E. Pargiter) p. 249.

৬· সরযূপারীণ-ব্রাহ্মণ-বংশোবলী (ডক্টর ইন্দ্রদেব প্রসাদ চতুর্বেদী, দ্বিতীয় সংস্করণ পৃঃ ৮২। এই বংশাবলীতে অন্য দুই স্থানে (পৃঃ ৯ ও ৩৪) ও "সর্বার্য্য পংক্তি-ব্রাহ্মণ-বৈভব" (পৃঃ ২৮) এ সাংকৃত্যদের পাঁচ প্রবর—কৃষ্ণাত্রেয়, অর্চনানস, শ্যাবা, সাংখ্যায়ন, সংকৃতি-লেখা হয়েছে, যা কিনা সাংকৃত্যদের ত্রিপ্রবরবিশিষ্ট সর্বজনীন পরম্পরাবিরোধী হওয়ায় ত্যাজ্য। কৃষ্ণাত্রেয়ের তিন প্রবর—বৃষণাত্রি, অর্চিমান, যাবাশ্য (কান্যকুব্জ ভাস্কর পৃঃ ১৭১) এবং আত্রেয়, আর্চনানস, শ্যাবশ্য (সর্বা পং· ব্রা· বৈভব পৃঃ ২৭ স· ব্রা· বংশোবলী পৃঃ ৯)-কে সাংকৃত্য প্রবরের সঙ্গে বলে মনে হয়। কান্যকুব্জের লিখিত পরম্পরায় সাংকৃত্যের তিন প্রবরের সংখ্যা (কান্যকুব্জভাস্কর পৃঃ ১৪—সাংকৃত, কিল, সাংখ্যায়ন; পৃঃ ১৭৫, সাংকৃত্যায়ন—চামন, মধ্যায়ন, মৌনস; এবং 'সরস্বতী' সম্পাদক পণ্ডিত দেবীদত্ত শুক্লের কৃপায় প্রাপ্ত মুদ্রিত সাংকৃত্য বংশবৃক্ষে-কিলায়ন, সাংখ্যায়ান, সাংকৃত)-তে তিন সংখ্যা তো ঠিক রাখা হয়েছে, কিন্তু নাম আলাদা। শুধু গোত্রের সম্বন্ধ ধরলে সাংকৃত্য ও সাংকৃত্যায়ন এখানে একই। গুণাখ্য সাংখ্যায়ন, জনমেজয় (খ্রীঃ পূঃ ৯০০) কালীন বৈশম্পায়নের শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য ও সমসাময়িক কহোল কৌষীতকি-এর শিষ্য ছিলেন (Chronology of Ancient India, Chart pp. 1-46-77) আর এইভাবে সে সংকৃতি (খ্রীঃ পূঃ ১৯৪০ এর অনেক পরে আসে, বৃক্ষে তাঁকে সংকৃতি পূর্বজা বানানো ভুল। সাংকৃত্যদের তিন প্রবর—অঙ্গিরা, সংস্কৃতি ও গৌরবীতিই সঠিক, যেমন—

"সংকৃতি পূতিমাষতণ্ডিশম্বূ শৈবগবানামাঙ্গিরস গৌরবীতি সাংকৃত্যেতি। শাক্ত্যো বা মূলং শাক্ত্য গৌরবীতি সাংকৃত্যেতি।" আশ্বলায়নসূত্র ৬।১২।৫ (Bapitist Mission Press? Calcutta)

"গোত্রপ্রবর নিবন্ধকদম্বক" (লক্ষ্মীবেংকটেশ্বর প্রেস, বোম্বাই ১৯২৭ খ্রীঃ)-তে সাংকৃত্য গোত্রের তিনটিই প্রবর পাওয়া যায়—

সংকৃতিপ্রবরাঃ আঙ্গিরস-গৌরুবীত-সাংকৃত্যেতি····আঙ্গিরস সাংকৃত্য গৌরুবীতেতি····শাক্ত গৌরুবীত-সাংকৃত্যেতি (পৃঃ ৪)। "সংকৃতি পূতিমাষ তাণ্ডি সাম্ব সৈপঠজানকি তৈরাধাতরব্য ঋষিভি-বারায়ণী সহিগাংগিলৌক্ষিতালাগা····আঙ্গিরস সাংকৃতগৌরিবীতেতি, অঙ্গিরাবোৎ সংকৃতি-বদ্ পুরু বীতবৎ। (পৃঃ ৮৩-৮৪, কাত্যায়নলৌগাক্ষিপ্রণীত-ভরদ্বাজ গোত্রকাণ্ডতঃ)।

বৈদিক ঋষি গৌরবীতি সংকৃত্য থেকেই মর্লাও-এর সাংকৃত্য শাখা বেরিয়েছে। গৌরবীতি রচিত ও ঋগ্বেদে সুরক্ষিত ৩৪টি ঋ-কে ২৬ ইন্দ্র, ৬ বসু ও ২ সোমের প্রশংসা আছে; বসু ও সোমের বর্ণনাতেও ঋষি ইন্দ্রেরই[৭] উল্লেখ করেছেন।

রন্তিদেব সাংকৃতি —(খ্রীস্টপূর্ব ১৪২০)—বিদথীর পরে সুহোত্র ও তাঁর জ্যেষ্ঠ সন্তান আজমীঢ়, ঋক্ষ ইত্যাদি পৌরব রাজ্যের প্রভু হয়েছিলেন। নর বৈদিক ঋষি ছিলেন, তিনি কোনো জায়গার রাজা ছিলেন কিনা তা জানা যায় না, একথা সংকৃতি সম্পর্কেও বলা চলে। কিন্তু রন্তিদেবকে আমরা প্রাক্-মহাভারতকালের ১৬ জন যশস্বী রাজা[৮]দের মধ্যে পাই। রন্তিদেবের রাজ্য চম্বলের (চর্মণ্বতী)[৯] তীরে ছিল। কালিদাসের টীকা রচনার সময় মল্লিনাথ লিখেছেন যে রন্তিদেবের রাজধানী দশপুর[১] ছিল। রন্তিদেব[২] সাংকৃতি তাঁর দান ও অতিথি সেবার জন্য খুব প্রসিদ্ধ ছিলেন। অতিথিদের ভোজনের জন্য তাঁর এখানে দৈনিক দুহাজার গরুর মাংস রান্না হত।[৩] তাছাড়া মহাভারতের অন্য জায়গায় একুশ হাজার[৪] ও বিশ হাজার একশ[৫] গরুর মাংসের কথা

"সংকৃতায়ঃ মলকাঃ পৌলসিভণ্ডিঃ শম্বুস্তৈবয় পরিভাবাস্তারকাদ্যা হারিগ্রীবাঃ পৈণায়াঃ শ্রৌতায়না আগ্রায়না আম্রাপয়ঃ পূতিমাষা ইত্যেতে সংকৃতয়ঃ। তেষাং ত্র্যার্ষেয়ঃ প্রবরো ভবতি আঙ্গিরস সাংকৃত্য গৌরুবীতেতি হোতা। গুরুবীতবৎ সংকৃতিবদঙ্গিরোবদিত্যধ্বর্যুঃ।" (পৃঃ ৫৫, বোধায়নোক্ত-কেবলাঙ্গিরস-প্রবরকাণ্ড) "আঙ্গিরস সাংকৃত্য গৌরুবীত ইতীমং প্রবরং সংকৃতীনাং আপস্তম্ব-বোধায়ন কাত্যায়ন-মৎস্যা আহুঃ আশ্বলায়নস্তু আঙ্গিরস গৌরুবীত সাংকৃত্য...." (পৃঃ ১৮৬-৮৭)

৭· পবস্য মধুমত্তম ইন্দ্রায় সোম ক্রতুবিৎ তমোমদঃ। মহিদ্যু ক্ষতমোমদঃ। যস্য তে পীত্বা বৃষভো বৃষায়তেহস্য পীতা স্বর্বিদঃ।"

৮· মহাভারত, দ্রোণপর্ব ৬৭ (ষোড়শরাজকীয়)। শান্তিপর্ব ২৯ (ষোড়শরাজকীয়)।
এই ষোল জন রাজা হল—

(১) মরুত আবীক্ষিত
(২) সুহোত্র আতিথিন
(৩) বৃহদ্রথ বীর (আংগ)
(৪) শিবি ঔশীনর
(৫) ভরত দৌষন্তি
(৬) রাম দাশরথি
(৭) ভগীরথ
(৮) দিলীপ ঐলবিল খট্বাগ
(৯) মান্ধাতা যৌবনাশ্ব
(১০) যযাতি নাহুষ
(১১) অম্বরীষ নাভাগি
(১২) শশবিন্দু চৈত্ররথ
(১৩) আমূর্তরয়স
(১৪) রন্তিদেব সাংকৃতি
(১৫) সগর ঐক্ষ্বাকু
(১৬) পৃথু বৈন্য

৯· চর্মণ্বতীং সমাসাদ্য নিয়তো নিয়তাশনঃ।
রন্তিদেবাভ্যনু জ্ঞাতমগ্নিষ্টোম ফলং লভেৎ।
মহাভারত, বনপর্ব ৮২।৫৪ (চিত্রসালা প্রেস, পুণা)

১· 'তামু তীর্থ ব্রজ পরিচিতভ্রূলতা-বিভ্রমাণাং
পক্ষোৎক্ষেপাদু পরি বিলসৎকৃষ্ণশারপ্রভাণাম্।
কুন্দক্ষেপানু গমধু—করশ্রীমু যামাত্মবিম্বম্।।
পাত্রীকুর্বন দশপুরবধূনেত্র কৌতূহলানাম্।। —মেঘদূত (১-৪৭)
"রন্তিদেবস্যদশপুরপর্তের্মহারাজস্য"—মল্লিনাথ টীকা

২· সাংকৃতে রন্তিদেবস্যস্বাশকত্যা দানতঃ মমঃ।
ব্রাহ্মণ্যঃ সত্যবাদী শিবেরৌশীনরৌ যথা॥ —বনপর্ব ২৯৪।১৭

৩· রাজ্ঞো মহানসে পূর্ব রন্তিদেবস্য বৈ দ্বিজ।
অহন্যহনি বধ্যেতে দ্বে সহস্রে গবাং তথা।।—বনপর্ব ২৯৪।১৭ ২০৮।৮,৯

৪· সাংকৃতে রন্তিদেবস্য যাং রাত্রিমতিথির্বসেৎ।
আলভ্যন্তে তদা গাবঃ সহস্রান্যে কবিংশতিঃ।। দ্রোণপর্ব ৬৭।১৬,১৭

৫· সাংকৃতে রন্তিদেবস্য যাং রাত্রিমবসন্ গৃহে।
আলভ্যন্ত শতং গাবঃ সহস্রাণি চ বিংশতি।। —শান্তিপর্ব ২৯।২৭

বলা হয়েছে। মাংসের খরচ এত হত যে সেই গরুর তাজা চামড়া যে রান্নাঘরে রাখা হত—তার জল থেকে একটা নদী বেরিয়েছিল, যাকে চর্মণ্বতী (বর্তমান চম্বল বলা হয়েছে।[৬] এই বিপুল পরিমাণ আমিষ ভোজনের পরও রাজার মণিকুণ্ডলধারী দুই শ হাজার (দু লাখ?) পাচক অতিথিদের কাছে প্রার্থনা করত[৭]—'মাংস কিছুটা কম আছে, আজ একটু ঝোল বেশি নিন।' মহারাজ (?) রন্তিদেব সাংকৃতি তাঁর ভাই গৌরবীতির মতো হয়তো মন্ত্রকর্তা ছিলেন না কিন্তু তিনি বেদাধ্যায়ী অবশ্যই ছিলেন এবং তিনি শত্রুদের বশীভূত করেছিলেন।[৮] তাঁর সমৃদ্ধি ছিল অতি মানবিক, আর রূপোর নয় সোনার মোহর (সুবর্ণনিষ্ক) দান করতেন তিনি। রন্তিদেব সাংকৃতি ইন্দ্রের কাছ থেকে বর নিয়েছিলেন—'আমার অনেক শস্য হোক, অতিথি আমার কাছে আসুক, আমার শ্রদ্ধা যেন কম না হয় এবং কারো কাছে আমাকে যেন হাত পাততে না হয়।'[৯]

৬· "নদী মহান্যনাদ্ যস্য প্রবৃত্তা চর্মরাশিতঃ।
তস্মাচ্চর্মণ্বতী পূর্বমগ্নিহোত্রেহভবৎ পুরা।" —দ্রোণ ৬৭।৫
"মহানদী চর্মরাশেরুৎক্লেদাৎ সংসৃজে যতঃ।
ততশ্চর্মণ্বতীত্যেবং বিখ্যাতা সা মহানদী।"—শান্তিপর্ব ২৯।২৩
"অতশ্চর্মণ্বতী রাজন্ গোচর্মভ্যঃ প্রবর্তিতা।"—অনুশাসনপর্ব ৬৬।৪৩
"আরাধ্যৈনং শরবণভবং দেবমুল্লঙ্ঘিতাধ্বা
সিদ্ধদ্বন্দ্বৈর্জলকণভয়াদ্ বীণিভির্মুক্তমার্গঃ।
ব্যালম্বেথাঃ সুরভিতনয়ালম্ভজাং মানয়িষ্যন্
স্রোতো মূর্ত্যা ভুবি পরিণতাং রন্তিদেবস্য কীর্তিম।।" ৪৫।। —মেঘদূত ২।৪৫
সুরভিতনয়ানাং গবামালম্ভেন সংজ্ঞপনেন জায়ত ইতি তথোক্তাম্। ভুবি লোকে স্রোতোমূর্ত্যা প্রবাহরূপেন পরিণতাং রূপ বিশেষ মাপন্নাং রন্তিদেবস্য দশপুরপতের্মহারজস্য কীর্তিম্। চর্মণ্বত্যাখ্যাং নদীমিত্যর্থঃ।...পুরা কিল রাজ্ঞো রন্তিদেবস্য গবালম্ভেষেকত্র সংভূতাদ্ রক্তনিষ্যন্দাচ্চর্মরাশেঃ কাচিন্নদী সস্যন্দে। সা চর্মণ্বতীত্যাখ্যায়ত ইতি।—মল্লিনাথী টীকা।
৭· "সমাসং দদতো হ্যন্নং রন্তিদেবস্য নিত্যশঃ।
অতুলা কীর্তির ভবন্নৃপস্য দ্বিজসত্তম।"—বনপূর্ব ২০৮।৯,১০
"সাংকৃতিং রন্তিদেবং চ মৃতং সৃঞ্জয় শুশ্রুম।
যস্য দ্বিশত সাহস্রা আসন্ সূদা মহাত্মনঃ ।।১।।
গৃহানভ্যাগতান্ বিপ্রানতিথীন্ পরিবেবকাঃ।
পক্কাপক্কং দিবারাত্রং বরান্নমমতোপমম্।।২।।
ন্যায়েনাধিগতং বিত্তং ব্রাহ্মনেভ্যো হ্যমন্যত।" দ্রোণপর্ব ৬৭
তত্র স্ম সূদাঃ ক্রোশন্তি সুমৃষ্টমণিকুণ্ডলা ।। ১৭।।
সূপং ভূমিষ্টমশ্নীধ্বং নাদ্য মাংসং যথা পুরা। দ্রোণপর্ব ৬৭।১৭; এবং শান্তিপর্ব ২৯।২৮
৮· বেদানধীত্য ধর্মেন যশ্চক্রে দ্বিষতোবর্শে ।।৪।।
ব্রাহ্মণেভ্যোহদদন্নিষ্কান্ সৌবর্ণান্ স প্রভাবতঃ।
তুভ্যং নিষ্কং তুভ্যং নিষ্কমিতি স্ম প্রভাষতে ।।৬।।
অত্রাস্য গাথা গায়ন্তি যে পুরাণবিদো জনাঃ।
রন্তিদেবস্য তাং দৃষ্ট্বা সমৃদ্ধিমতিমানুষীম্ ।।১৪।।
নৈতাদৃশং দৃষ্টপূর্ব কুবেরসদনেমপি।
ধনং চ পূর্বমানং নঃ কিং পুনর্মান জেষিতি ।।১৫।।
রন্তিদেবস্য যৎকিঞ্চিৎ সৌবর্ণম ভবৎ তদা ।।১৮।।
তৎ সর্বং বিততে যজ্ঞে ব্রাহ্মণেভ্যো হ্যমন্ত।' দ্রোণ পর্ব ৬৭
"নাসীৎ কিঞ্চিদসৌবর্ণ রন্তিদেবস্য ধীমতঃ।" শান্তিপর্ব ২৯।২৬
৯· রন্তিদেবং চ সাংকৃত্যং মৃতং সৃঞ্জয় শুশ্রুম।
সম্যগারাধ্য যঃ শক্রাদ্ বরং লেভে মহাতপাঃ ।।২০।।
অন্নং চ নো বহু ভবেদ্ অতিথিয়েশ্চ লভেমহি।
শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমৎ মা যাচিষ্ম কঞ্চন ।।২১।। —শান্তিপর্ব ২৯

সাংকৃত্য পারাশরী আচার্য (খ্রীস্টপূর্ব ৭০০?)—জনমেজয় পারিক্ষিতের (খ্রীস্টপূর্ব ৯০০?) সমকালীন বৈশম্পায়নের শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্যের আগে পারাশরী সম্প্রদায়ের এক নিবৃত্তিপ্রধান ধার্মিক আচার্য সাংকৃত্যের উল্লেখ বৃহদারণ্যক উপনিষদে (শতপথব্রাহ্মণ) পাওয়া যায়।[২]

সাংকৃতি পার্থরশ্ম (খ্রীস্টপূর্ব ৭০০)—জৈমিনীয় শাখার আর্ষেয়-ব্রাহ্মণে[৩] এই বৈদিক আচার্যের কথা জানা যায়। এই দুই আচার্যই যাজ্ঞবল্ক্যের (খ্রীস্টপূর্ব ৬৮০) আগে জন্মেছিলেন। দুজনেই উপনিষদ-জ্ঞানের প্রচারক ছিলেন।[৪]

(খ) বৌদ্ধকাল

কৃশ সাংকৃত্য (খ্রীস্টপূর্ব ৬০০)—বুদ্ধের কালের এবং তাঁর আগে ভারতের সব মহান বিচারকই শুধু উপনিষদ ও বেদের তত্ত্বজ্ঞানেরই প্রচারক ছিলেন না। রাজতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে সে সময়ে যেমন ভারতে অনেক অরাজক গণতন্ত্রও ছিল, তেমনি অনেক অধ্যাত্মজ্ঞান থেকে পরাঙ্মুখ অর্ধভৌতিকবাদী অথবা পুরোপুরি ভৌতিকবাদী আচার্যও ছিলেন। গৌতম বুদ্ধ ছিলেন প্রথম শ্রেণীর মতবাদের প্রবক্তা এবং কৃশ সাংকৃত্য অন্য শ্রেণীর। কৃশ সাংকৃত্যের ভৌতিকবাদ আজকালের বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের মতো ছিল না, আর বিজ্ঞানযুগের হাজার বছর আগে তা কি করেই বা সম্ভব? তবু কৃশ সাংকৃত্য আজীবক সম্প্রদায়ের প্রধান তিন আচার্য[৫]—নন্দ বাৎস্য, কৃশ সাংকৃত্য ও মক্খলি গোসাল—দের একজন। তাঁকে আজীবকদের 'শাস্তা' (উপদেষ্টা) বলা হয়েছে; আর তিনি গৌতম বুদ্ধের সমকালীন মক্খলি গোসালের আগে হয়েছিলেন, অতএব তাঁর সময় খ্রীস্টপূর্ব ৬০০-এর কাছাকাছি হবে। এই আজীবক আচার্য বেশির ভাগ সময় কাশী-কোশল, বজ্জী-মগধে ঘুরে বেড়াতেন। আর এই সব জায়গাতেই তাঁর প্রাধান্য ছিল। এইজন্য খুব সম্ভব প্রাচীন কাশী-কোশল ব্রাহ্মণের স্থান নিয়েছিল যে সরযূপারীণ ব্রাহ্মণ, তাঁদের সেই সাংকৃত্য বংশেই এই কৃশ সাংকৃত্যের জন্ম হয়েছিল।

সাংকৃত্য শ্রামণের (খ্রীস্টপূর্ব ৫০০)—শ্রাবস্তীতে গৌতম বুদ্ধের আশ্চর্যজনক শিষ্যদের মধ্যে শ্রামণের সাংকৃত্যের নাম পাওয়া যায়[৬]। খুব কম বয়সেই তাঁকে বুদ্ধের প্রতিপাদিত দর্শনের মর্মজ্ঞ মনে করা হত। শ্রাবস্তীর (কোশল, আধুনিক সহেট-মহেট, জেলা গোণ্ডা) লোক হওয়ায় আজ এঁর বংশ সরযূপারীণ সাংকৃত্যদের অন্তর্গত, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

সাংকৃত্য অর্থশাস্ত্রী (খ্রীস্টপূর্ব ৫০০?)—ঋগ্বেদী আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে এক 'শূলগও' প্রকরণ আছে, যাতে শূলে (লোহার সিক) ভাজা গরু মাংসের ধর্মীয় কৃত্যের শ্রৌত প্রক্রিয়া লেখা আছে। সে সময় গরুর চামড়া লোকেরা প্রায়শই ফেলে দিত, ফলে তা একেবারে বেকার হয়ে যেত। এর বিরুদ্ধে আচার্য শাম্বব্য কলম ধরেছিলেন এবং বলেছিলেন—'এই চামড়া থেকে জুতা ইত্যাদি উপভোগের সামগ্রী তৈরী করা উচিত।[৭] শাম্বব্য সাংকৃত্য গোত্রের এক শাখা।

২· শতপথ, ১৪।৫।৫।২০; ১৪।৭।৩।২৬; বৃহদারণ্যক (মাধ্যন্দিন শাখায়) ২।৫।২০; ৪।৫।২৬

৩·বৈদিকপদানুক্রমকোশ (বিশ্ববন্ধু শাস্ত্রী) উদ্ধৃত আর্ষেয় ব্রাহ্মণ ২।২০।৩ বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রায়

৪· নিচের শ্লোকে ভীষ্মকে সাংকৃতি প্রবর বলা হয়েছে, কিন্তু আমরা জানি তিনি সংকৃতির কাকা সুহোত্রের পুত্র আজমীঢ়ে পরম্পরায় ছিলেন—'বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রায় সাংকৃতি প্রবরায় চ। অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্ম বর্মণে" (তিথিতত্ত্ব, বাংলা বিশ্বকোষে উদ্ধৃত)।

৫· মজ্‌ঝিমনিকায় ২।৩।৬ (পৃঃ ৩০৪)

৬· বুদ্ধচর্যা (নামসূচী)।

৭· "ভোগং চর্মণা কুর্বোতেতি শাম্বব্যঃ।" (টীকায়) শাম্বব্য আচার্যঃ চর্মণা ... ভোগমুপানদাদি কুর্বোতেতি মন্যতে। আশ্ব ৪।৯।২৪

সাংকৃত্য বৈয়াকরণ (খ্রীস্টপূর্ব ৪০০)—তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যে[৮] সন্ধি নিয়ম সম্পর্কে কোনো সাংকৃত্য আচার্যের মত উদ্ধৃত করা হয়েছে; এঁর সময় ও কাল সম্পর্কে আমরা নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারি না। যদিও সরযূপারীণ সাংকৃত্য শুক্লযজুর্মাধ্যন্দিনীয় শাখার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, কিন্তু সন্ধি নিয়মে কৃষ্ণ শুক্লের কি পার্থক্য হতে পারে?

(গ) মধ্যকাল

সাংকৃত্যগোত্রী (১০৯৩ খ্রীস্টাব্দ)—কৃশ সাংকৃত্য ও শ্রামণের সাংকৃত্যের পর একরকম কাশী-কোশল অথবা আধুনিক সরযূপারীদের প্রদেশে প্রায় দেড় হাজার বছর পর্যন্ত কোনো সাংকৃত্যের খোঁজ পাওয়া যায় না। প্রথম গহড়বার-রাজা চন্দ্রদেব অথবা চন্দ্রাদিত্যদেব স্বীয় বাহুবলে কান্যকুব্জের বিশাল রাজ্য জয় করেছিলেন।[১] পূর্বদেশীয় হওয়ায় তাঁর কনৌজের চেয়ে কাশীর প্রতি কম ভালবাসা ছিল না, এইজন্যে গহড়বার রাজাকে কান্যকুব্জেশ্বরের মতো 'কাশীশ'[২] 'কাশীরাজা'ও বলা হত। কাশীকে বিদ্যাকেন্দ্র বানিয়েছিলেন চন্দ্রদেব। তিনি চন্দ্রাবতীর তাম্রপত্রে 'পঞ্চশত' ব্রাহ্মণকে কাঠেহলী পত্তলা করেছিলেন, যাঁদের মধ্যে ২২ জন সাংকৃত্যগোত্রীয়—

১। রাজপাল	(১৪)	৯। গাগ	(৪২)	১৭। নাল্টে	(২৭১)
২। মাহব	(১৫)	১০। যোগে	(৪৩)	১৮। নারায়ণ	(২৮১)
৩। কেশব	(১৭)	১১। মহেশ্বর	(৪৪)	১৯। ব্রহ্মর্ষি	(৩০০)
৪। আল্হণ	(২২)	১২। জানে	(৬৪)	২০। দেবশর্মা	(৩২৮)
৫। অমৃতধর	(২৩)	১৩। সলখু	(৮২)	২১। মহেশ্বর	(৩৬৪)
৬। বিঠু	(৩৭)	১৪। কডুআইচ	(৮৩)	২২। ছোটে	(৩৮৪)
৭। সাহু	(৪০)	১৫। গাল্হে	(১৬৬)		(২৭৯)
৮। ধরণীধর	(৪১)	১৬। তীতী	(২৭৮)		

এই তাম্রপত্র সংবৎ ১১৫০ (১০৯৩ খ্রীস্টাব্দ) আশ্বিন বদী ১৫ রবিবার লেখা হয়েছিল। সেই সময় পর্যন্ত চতুর্বেদী, ত্রিপাঠী, ত্রিবেদী, মিশ্র—এই চার পদবী প্রচলিত হয়েছিল বলে মনে হয়। বিশেষ ভাবে শিক্ষিত স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তির নামের সঙ্গে এই কটি পদবী যুক্ত হয়েছিল; যার থেকে বোঝা যায়, তখন পর্যন্ত এই সব পদবীর বিশেষ প্রচার হয়নি। ওপরে লেখা ২২জন সাংকৃত গোত্রীদের কারু নামের সঙ্গেই এইসব পদবী যুক্ত হয়নি; আল্হন, বিঠু, গাগ, জানে, সলখু, কডুআইচ, গাল্হে, তীতী, নাল্টে, ছোটে এই ধরনের সংস্কৃত-প্রাকৃত দুই এর বাইরের নাম থেকে বোঝা যায় যে এদের পরিবরে বিদ্যার—যা সেই সময়ে সংস্কৃত বিদ্যা ছিল— বিশেষ অভাব ছিল।

চক্রপাণি[৩] (১২১১ খ্রীস্টাব্দ)—ইনি মলাঁও সাংকৃত্য বংশের অত্যন্ত প্রতিভাশালী ব্যক্তি

৮· সাংস্কৃতস্যাকারম্ (তৈ· প্রা· ৮।২১)। এষ্টরায়ঃ এষ্টোরায়ঃ (তৈ· প্রা· ১।২।১১) বকারন্ত সাংকৃতস্য (তৈ· প্রা· ১০।২১)। বায় ইষ্টয়েবায়বিষ্টয়ে (তৈ· সংহিতা ২।২।১২)। অনাকারো হ্রস্বং সাংকৃতস্য (তৈ· প্রা· ১৬।১৬)। হবীংষি-হবিংষি (তৈ· সং-৫।৫।১)

১· "পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর পরমাহেশ্বর নিজভুর্জোপার্জিত শ্রীকান্যকুব্জাধিপত্য শ্রীমচ্চন্দ্রাদিত্যদেব।"
Chandravati Plates of Chandradeve, Epi. Ind. Vol. XIV, PP. 192-209.

২· 'কাশীরাজা' প্রাকৃত-পৈঙ্গল, Asiatic Soci. Bengal, P. 180.
'কাশীকা জয়চন্দ্র' INdian Historical Quaterly 1929, pp. 14-30.

৩· চতুর্দশ শতাব্দীর আগে এই নামের গ্রন্থকারের নামে নিচের গ্রন্থ পাওয়া যায় [Catalogus Catalogorum (Th-Aufrecht)]। চক্রপাণি-পদ্যাবলী। চক্রপাণি পণ্ডিত কালকৌমুদী-চম্পু। চক্রপাণি-জ্যোতির্জার্ণব। চক্রপাণি-বিজয়কল্পলতা।

ছিলেন। এঁর সম্পর্কে অনেক অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে—এঁর ধুতি আকাশে শুকোত ইত্যাদি। এঁর সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্য খুব কম পাওয়া যায়। এঁর সম্পর্কে পরে প্রাসঙ্গিকভাবে কিছু উল্লেখ করা হবে।

(ঘ) আধুনিক কাল

সাংকৃত্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণ উত্তর ভারতের প্রায় সব প্রধান বিভাগেই অর্থাৎ সরযূপারীণ, কান্যকুব্জ, সারস্বত প্রভৃতিতে পাওয়া যায়। কান্যকুব্জ (কনৌজ) যখন উত্তর ভারতের রাজধানী হল (খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর উত্তরার্ধ) তার আগে কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ, কান্যকুব্জ (কনৌজিয়া) অহীর, কান্যকুব্জ কান্দু প্রভৃতি ভেদ হওয়া সম্ভব ছিল না, এই ভেদ মৌখরীদের নায়কত্বে কান্যকুব্জ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরে হয়ে থাকবে। আমাদের পূর্ব সীমান্ত ছাপরা, আরাতে। সরযূপারীণরাও নিজেদের কনৌজিয়া বলে। ত্রিপাঠী, পাঠক পদবীগুলিও কনৌজিয়া ব্রাহ্মণদের মধ্যে সরবরিয়া কান্যকুব্জ কালে (ষষ্ঠ শতকের উত্তরার্ধ থেকে দ্বাদশ শতকের শেষ) প্রচলিত হয়। বুদ্ধের সময় (খ্রীস্টাব্দ পূঃ পঞ্চম—ষষ্ঠ শতকে) ব্রাহ্মণেরা নিজ নিজ জনপদের কারণে কোশলক, মাগধক ইত্যাদি নামে বিখ্যাত ছিলেন। সে সময় ব্রাহ্মণদের মধ্যে সহভোজ, অন্তর্বিবাহর কোনো প্রশ্নই ছিল না, কারণ তা তো ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে পর্যন্ত উচিত বলে মনে করা হত।[৪] কান্যকুব্জকালে কোশল, কাশী, ভর্গ (মির্জাপুর জেলা), কারুষ (শাহাবাদ জেলা) এবং মল্ল-শাক্য গণতন্ত্র (যা কোশলের প্রাধান্যের অন্তর্গত ছিল)-এর ব্রাহ্মণেরাই এক হয়ে পরে সরযূপারীণ ব্রাহ্মণরূপে আমাদের সামনে এসেছেন। আজকের সরযূপারীণদের প্রায় সকলেরই উৎসগ্রাম সরযূর উত্তরে এবং তার মধ্যেও প্রায় সবই গোরখপুর জেলার। সেই সময় সরযূ ও গঙ্গার দক্ষিণে ব্রাহ্মণ ছিল না, একথা মেনে নেওয়া কঠিন। মনে হয় গহড়বার-কালে যখন সরযূপারঅলাদের প্রাধান্য ও পঙ্‌ক্তিবদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন থেকেই অন্য জায়গার ব্রাহ্মণদেরও তাঁদের ভেতর গোত্র অনুসারে যোগ দিতে হয়েছিল।

সরযূপারীণদের মধ্যে সাংকৃত্যগোত্রীয়দের মূল স্থান ছিল মলাঁও, কান্যকুব্জে সাংকৃত্যদের মূল গ্রাম হল কৌশিকপুর ও পুরৈনিয়া—পরে জাজামউ (রূপনবংশজ তথা ঘনশ্যামবংশজ শুক্ল, ধনশ্যামবংশজ মিশ্র), গৌরা (রূপনবংশজ শুক্ল), কৌশিকপুর (ধনাবংশজ মিশ্র আর অবস্থী), বিজৌলী (ধনাবংশজ দুবে), চচেণ্ডী (ঘনশ্যামবংশজ মিশ্র), ইটাওয়া (ঘনশ্যামবংশজ মিশ্র)—কান্যকুব্জের সর্বমান্য পরম্পরা অনুসারে এঁরা কান্যকুব্জে সরযূপারীণ অথবা শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণদের পরে এসে যোগ দিয়েছিলেন।[৫] মনে হয় না শাকদ্বীপীয়দের থেকে তাঁদের আসা সম্ভব

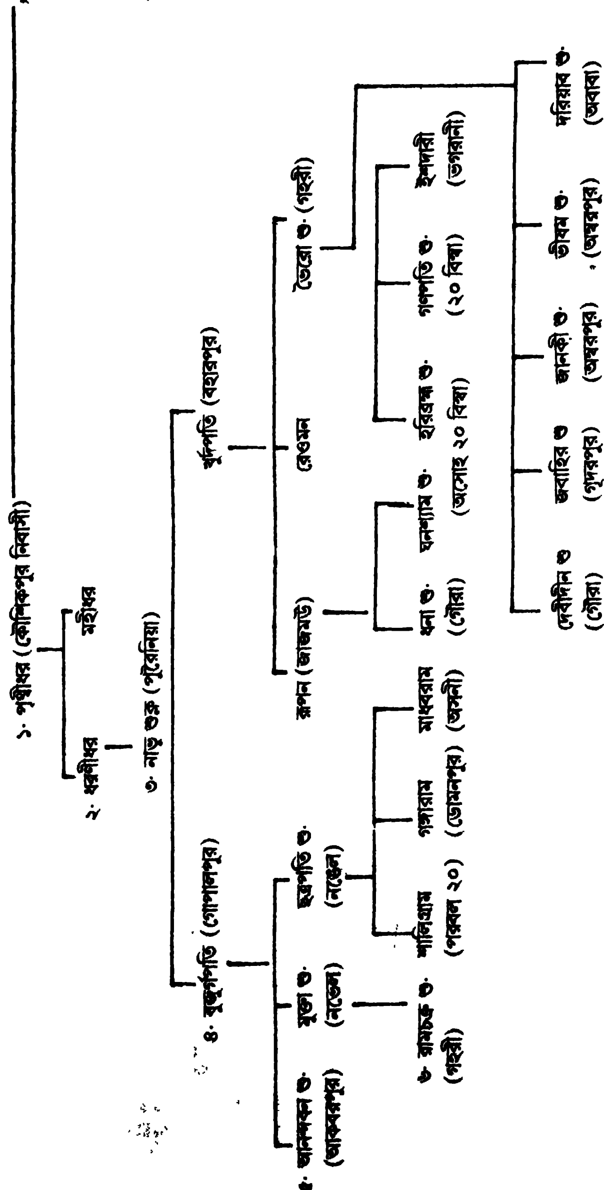
৪· দীঘনিকায়, অম্বঠ্‌ঠসুত্ত (বুদ্ধচর্যা পৃঃ ২১৫, ২১৬)

৫· 'সাংকৃত (সংকৃতি?)-জীর পুত্র জীবাস্থ (?) জী এই বংশে অনেক প্রজন্ম পরে পৃথ্বীধর নামে এক পুরুষ প্রসিদ্ধ হন। এঁদের কেউ সরবরিয়া ব্রাহ্মণ ও কেউ কেউ শাকলদ্বীপী ব্রাহ্মণ বলেছেন—আর একথা প্রায় সর্বজনগ্রাহ্য যে এঁরা কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ ছিলেন না। এঁরা বিবাহ সম্বন্ধ দ্বারা কান্যকুব্জ জাতির অন্তর্গত হন এবং বংশ, বিদ্যা ও সৎকর্ম দ্বারা এই জাতিতে প্রতিষ্ঠিত হন। পৃথ্বীধরের নিবাস ছিল কুরহর গ্রামে। তাঁকে কৌশিকপুরের রাজা ডাকেন এবং অবস্থ যজ্ঞ করেন। তখন থেকে পৃথ্বীধর কৌশিকপুরের অবস্থী বলে প্রসিদ্ধ হন। পৃথ্বীধরের দুই পুত্র মহীধর ধরণীধরও যাঁদের মধ্যে মহীধরকে কৌশিকপুরের শুক্ল ও ধরণীধরকে (ত্রিগুণায়ত) কৌশিকপুরের অবস্থী বলা হত। মহীধরের পুত্র নাভুজী। পৃথ্বীধর তাঁর পৌত্রকে মনীরাম বাজপেয়ীর কাছে শাস্ত্র পড়িয়েছিলেন। তখন মনীরাম বাজপেয়ী এঁকে ত্রিগুণায়ত পদবী দেন এবং পৃথ্বীধর অবস্থী ত্রিগুণায়ত কৌশিকীঅলা বলে পরিচিত হলেন। নাভুজী বিদ্যার্জন করে ব্যাকরণ ও ন্যায়শাস্ত্রে বিশেষ পারঙ্গম হন। তিনি গৌরবর্ণ ও সুশীলও ছিলেন। মনীরামজী তাঁকে বড় ভালবাসতেন। এঁরই মতো মনীরামজীর ভুবনেশ্বরী নাম্নী কন্যা পরমাসুন্দরী ও বিদুষী ছিল। তার যোগ্য বর খুঁজে বার করতে মনীরামজী নিতান্ত অসমর্থ হলেন। তাঁর স্ত্রীর অনুরোধ ছিল যে ভাবী জামাতাকে নাভুর মতো সর্বগুণালংকৃত হতে হবে। অবশেষে মনীরামজী তাঁর কন্যার বিয়ে দেন নাভুজীর সঙ্গে এবং তাঁকে শুক্ল

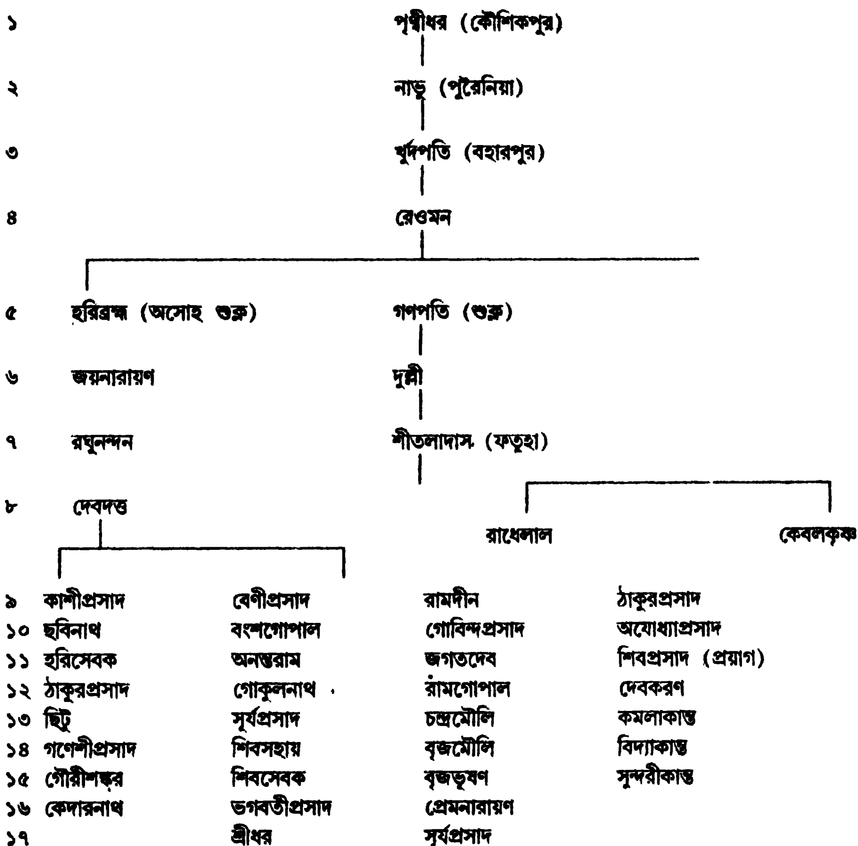
উপাধি দিয়ে পুরৈনিয়া গ্রামে নিজের কাছেই রাখেন। এভাবে নাভুর সন্তান শুক্ল নভেল পুরৈনিয়াতে প্রসিদ্ধ হন। কারু কারু মতে মনীরামজীর কন্যার নাম পূর্ণিমা ছিল। অতএব নাভু এবং পূর্ণিমার সন্তান নভেল পুরৈনিয়া বিখ্যাত হন।'

—(কান্যকুব্জভাস্কর, হাজারীলাল ত্রিপাঠীপ্রণীকৃত, পৃ· ৭৮-৭৯)

পণ্ডিত দেবীদত্ত শুক্ল দ্বারা প্রাপ্ত সাংকৃত্যাদের বংশবৃক্ষে নাভুজীকে পৃথ্বীধরের পুত্র বলে লেখা হয়েছে, তদনুসারে পুরনো অংশ এই রকম—



আজ থেকে এক প্রজন্ম আগে পর্যন্ত পৃথ্বীধরের পনের থেকে সতের প্রজন্ম কেটে গেছে (অহিরুদ্র ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দের আগে হয়তো উজাড় হয়ে যাওয়া মঁলাও থেকে পালিয়ে এসেছিলেন)—



গড়ে ১৬ প্রজন্ম ধরলে পৃথ্বীধরের সময় দাঁড়ায় ১৭ × ২৬ = ৪৪২ বর্ষ সন ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দ অর্থাৎ অহিরুদ্র ১৫৭৫-এর আগে।

অন্য ব্রাহ্মণদের মধ্যেও নিম্ন প্রকারে সাংকৃত্য গোত্র পাওয়া যায়। (জাতিভাস্কর, পণ্ডিত জ্বালাপ্রসাদ মিশ্র, শ্রীবেংকটেশ্বর প্রেস, বোম্বাই সংবত ১৯৮৩, পৃষ্ঠা ৭৬, ৮৯, ৯৫, ৯৮, ১০৯)—

পৃষ্ঠা ৭৬, মেডতবাল (গৌড়)

খলসিয়া	তিওয়াড়ী
সিহোরিয়া	পণ্ডয়া
হেরমদা	"
ধামণোদরিয়া	"
নম্রোস	"
বলায়তা	"
বণেয়লা	"
বেটলা	"
মেহলাণ	"
নলাড়া কাঠগোলা	"

পৃষ্ঠা ৮৯, (মহারাষ্ট্র)

গায়ধালী—৩ প্রবর

পৃষ্ঠা ৯৫ (ঔদীচ্য-সহস্র গুর্জর টোল)

ঋগুণ—যোশী ৩ প্রবর)

পৃষ্ঠা ১০৯ (কণ্ডোল ব্রাহ্মণ, গুজরাট?)

সাংকৃত

মেড়ত-নিবাসীদের মধ্যে সাংকৃত্য গোত্রের সঙ্গে অনেকের পদবীও পণ্ডয়া, পাণ্ডের সঙ্গে যার মিল রয়েছে।

ছিল, কেননা যুক্তপ্রান্তে ও বিহারে তাঁদের ভেতর এই গোত্র পাওয়া যায় না। সাংকৃত্যদের এসে কান্যকুব্জের সর্বশ্রেষ্ঠ ষট্‌কুলে সম্মিলিত হওয়া থেকে বোঝা যায় যে তাঁরা মলাঁও বংশের কোনো প্রতিষ্ঠিত কুল থেকে এবং সম্ভবত মলাঁও ধ্বংশের (পনের শতাব্দী) সময় এসেছিল।

চক্রপাণি বংশজ রাজেন্দ্র দত্তর ১২ প্রজন্মের নামটুকুই শুধু আমাদের জানা আছে। রাজমণি দত্তের[১] দুই ছেলের মধ্যে অম্বিকা দত্ত তো পাহাড়ীতে (এলাহাবাদ জেলা) থাকতেন।

রাজেন্দ্রদত্তের সময় মলাঁও এক সমৃদ্ধ গ্রাম ছিল। সময়টা ছিল সম্রাট আকবরের নিরুপদ্রব ও ন্যায়পরায়ণ শাসনকাল। মলাঁওর পাণ্ডেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি মলাঁওর বাইরে আশেপাশের প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। খুব সম্ভব মলাঁওর অতিরিক্ত আরো কিছু গ্রাম তাঁদের অধীন ছিল। বিদথী, সংকৃতি, রন্তিদেবের 'ক্ষত্রোপেত দ্বিজাতিত্ব' এখনো সেখান থেকে লুপ্ত হয়ে যায়নি। মলাঁওর এক কূয়া সম্পর্কে এই কাহিনী প্রচলিত ছিল যে তার জল খেলে মাতা বন্ধ্যাত্ব থেকে শুধু মুক্তিই পায় না, বরঞ্চ সে মল্ল (মল্লগ্রাম = মলগাঁও = মল্লাঁও) পুত্র প্রসব করে। রাপ্তীর ডান দিকে গোরখপুরের অনতিদূরে ডোমিনগড়[২] গ্রাম আজও আছে। সেই সময় তা এক ডোমকাটার রাজপুত রাজার রাজধানী ছিল। তৎকালীন রাজার রানীর কোনো সন্তান ছিল না। রানী বেনারস যাচ্ছিলেন। বেনারসের পথ এখনো গোরখপুর-বড়হলগঞ্জের পাকা সড়ক হিসেবে আছে। সন্ধ্যায় রানীর ডেরা পড়লো মলাঁও গ্রামে (উক্ত পাকা সড়কের এক মাইল পরে)। মলাঁও এর যে কূয়ার জল খেলে বীর প্রসবিনী হওয়া যায়, তার খবর পেলেন রানী।[৩] জল আনার জন্য রানী লোক পাঠালেন। জল পাওয়া তো দূরের কথা উলটে রানীকে বেশ অপমানিত হয়ে মলাঁও থেকে চলে যেতে হল। রানী বেনারস থেকে ডোমিনগড়ে ফিরে গেলেন। আর তিলকে তাল করে তাঁর অপমানের দুঃখভরা কাহিনী রাজাকে শোনালেন। রাজা রাগে জ্বলে উঠলেন। তিনি জল আনতে লোক পাঠালেন, না দেওয়ায় জোর করে জল আনার জন্য সৈনিক পাঠালেন, কিন্তু মলাঁওদের তরবারিতে তখনো মরচে ধরেনি। রাজার সৈনিকদের প্রচণ্ড পরাজয় হল। রাজা কয়েকবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তিনি সফল হতে পারলেন না।

রাজা খবর পেলেন যে ভাদ্রের শুক্লা (অনন্ত) চতুর্দশীতে মলাঁও-এর পাণ্ডেদের শস্ত্রপূজা হয়। সেই দিন তারা হাতিয়ার হাতে নেয় না এবং ব্রত পালন করে। রাজা সেই দিনের জন্য পুরো প্রস্তুত হলেন। আজকের মতো সেই সময়েও প্রাচীন অচিরবতী (রাপ্তী) মলাঁও-এর পাশ দিয়ে বইত।[৪] ডোমিনগড়ের সৈনিকেরা আগে থেকেই নৌকোয় এসে কিছু দূরে লুকিয়ে বসে ছিল। অনন্তব্রত পালনকারী মলাঁও-এর পাণ্ডে, যুবক-বৃদ্ধ সবাই অচিরবতী গঙ্গায় স্নান করতে গেলেন। তাঁদের কাছে হাতিয়ারের নামগন্ধও ছিল না, তাদের সেই দিন শত্রুর ভয় ছিল। রাজার সৈনিকেরা হঠাৎ সেই নিরস্ত্রদের ওপর লাফিয়ে পড়ে। তাদের একজনও প্রাণ বাঁচানের জন্য পালায়নি এবং সেখানেই এক এক করে কাটা পড়ে। রাপ্তীকে সাংকৃত্যদের রক্তে লাল করে সৈনিকেরা গ্রামে

১· পণ্ডিত রামনাথ পাণ্ডে আচার্য, ভ্যোরা, জিলা বস্তী (রঘুনাথ প্রিন্টিং প্রেস, বলরামপুর) দ্বারা সম্পাদিত বংশবৃক্ষে তারাদত্তকে চন্দ্রমৌলির পুত্র এবং অম্বিকাদত্তকে শুদর্শনাথের পুত্র বলে লেখা হয়েছে। আমি এখানে নাউর-দেউর-এর (শ্রীজ্বালাপ্রসাদ পাণ্ডে) বংশবৃক্ষকে ভিত্তি স্থানীয় হওয়ায় প্রামাণ্য বলে ধরে নিয়েছি।

· 'Tharu... Mansen was over thrown in the tenth century by the Domkatars. These people had their cheif stronghold at Domingarh near Gorakhpur.' (Gorakhpur Gazetteer, 1909 ed. p. 259).

৩· অন্য জনশ্রুতি অনুসারে, রাজা প্রথমে সেই কূয়োর জল চাইলেন কিন্তু অত্যন্ত তিরস্কারের সঙ্গে তাঁকে নিরাশ করা হয়।

· বর্তমান মলাঁও-এর তিনটি ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দুটো ধ্বংসাবশেষ রাপ্তীর জলেই নষ্ট হয়েছে বলে মনে হয়।

পৌছয়, সব বালক-বৃদ্ধ-যুবক পুরুষকে তরবারি দিয়ে কেটে ফেলে[৫], এবং মলাঁও-এর কূয়া তাদের লাশ দিয়ে ভরে ফেলে। তখন থেকেই মলাঁও-এর সাংকৃত্যাদের জন্য অনন্ত চতুর্দশী আর পরবের দিন রইল না; লোকে আজও না করে অনন্তব্রত, না 'অনন্ত' বাঁধে। (প্রথম কলকাতা যাত্রার সময় আমি রূপোর অনন্ত পরে এসেছিলাম যা বাড়ি ফেরার পরই খুলে ফেলতে হয়েছিল)।

এখানে আর একটি কথা মনে রাখতে হবে। মলাঁও থেকে ডোমিনগড় ছয় সাত ক্রোশের বেশী নয় এবং ঐ সময় ডোমিনগড়-রাজ মলাঁওদের প্রতিবেশী ছিল। সম্ভবত এই সংহারের পেছনে অধিকারের লড়াই কাজ করছিল।

অহিরুদ্র পাণ্ডে (১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দ)—দূরের স্বীয় (ভরদ্বাজ) বংশজ পরীক্ষিতের মতো অহিরুদ্র পাণ্ডে মাতৃগর্ভে ছিলেন, যখন মলাঁওদের এই ভীষণ সংহার হয়েছিল। রাজেন্দ্র দত্তের পত্নী তখন তাঁর মাতুলালয়ে প্রতাপগড় জেলায় ছিলেন। আর একটি পরম্পরা থেকে জানা যায়, যে তিনি ঘাতকদের হাত থেকে পাণ্ডে বংশের অঙ্কুরকে কাটানোর জন্য এক ধোপার বাড়িতে শরণ নিয়েছিলেন আর সেই জন্য অহিরুদ্রের সন্তানকে ধোবিয়াপট্টী বলা হয়; এই ব্যাপারটি বদনামের ভয়ে লুকিয়ে রাখা হল। কিন্তু এই ভ্রম মনে হয় সরযূপারীণদের ধোবিয়াপট্টী[১] বিভাগের (পট্টী) নামের জন্য, যার মধ্যে মলাঁও পাণ্ডে ছাড়া মণিকণ্ঠের তিওয়ারী ও বৃহদ্‌গ্রামের (সোহগৌরা) দুবেরাও আছে।

প্রতাপগড় জেলায় দাদুর বাড়িতে অহিরুদ্রের জন্ম হয়। সেখানেই প্রতিপালিত ও বড় হন। একবার ডোমিনগড়ের রাজার রানী (সেই রানী না অন্য কোনো রানী জানা যায় না) আসন্ন-প্রসবা ছিলেন। বেশ কিছু দিন ধরে মর্মান্তিক পীড়ায় পীড়িত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর প্রসব হয়নি। জ্যোতিষীরা বললেন, 'মলাঁও বংশের কাউকে প্রসন্ন না করলে নিরাপদ প্রসব হবে না। ব্রহ্মদোষ লেগেছে।' অনেক পরিশ্রম ও অনুসন্ধানের পর অহিরুদ্র পাণ্ডের খবর পাওয়া গেল। রাজা অনেক প্রার্থনা ও সৎকারপূর্বক তাঁকে ডেকে আনলেন, ভোজন করালেন এবং অভিশাপ থেকে মুক্তির বিনিময়ে তাঁকে নাউর-দেউর ও ডোমবার গ্রামগুলি দান করলেন।

অহিরুদ্র পাণ্ডে তাঁর পূর্বজদের গ্রামে পৌছলেন। বাড়িগুলি ভেঙে গিয়েছিল। সেখানে জঙ্গল হয়ে গিয়েছিল। সেখানে কোনো লোক ছিল না যে বলে দিতে পারত যে, তাঁর বংশের গ্রামের সীমা কতটা ছিল। সেখানেই তাঁবু খাটিয়ে তিনি প্রার্থনা করলেন, 'যদি আমার বংশের কোনো দেবতা থাকেন, তবে সীমা নির্ধারণে আমাকে সাহায্য করুন।' এর পর পরম্পরার কাহিনী

৫· জোমিনগড়ের রাজা এবং কূয়োর জলের গল্পের সাদৃশ্য পাওয়া যায় কুশীনগরের মল্ল ক্ষত্রিয় তথা কোসলরাজ প্রসেনজিৎ-এর প্রধান সেনাপতি বন্ধু কমলের স্ত্রীর ইচ্ছাপূরণের জন্য বৈশালীর গণতন্ত্রপন্থী লিচ্ছবীদের অভিষেক-পুষ্করিণীতে জবরদস্তি স্নান করানোর গল্পের (ধম্মদ-অট্‌ঠকথা ৪।৩; দেখ আমার 'বুদ্ধচর্যা,' পৃষ্ঠা ৪৭৩-৭৫)। মলাঁও-বংশের এই হত্যাকাণ্ডকে কোসলরাজ বিদূড়বের দ্বারা শাক্যবংশের সংহারের মতো মনে হয় (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৭৬)।

১· সরযূপারীণ ব্রাহ্মণদের ষোল অথবা ৩+১৩ কুল সবচেয়ে বেশি প্রতিষ্ঠিত বলে ধরা হয়, যা নিম্নলিখিত পাঁচ পট্টিতে ভাগ হয়েছে : 'তিন্নাথেঁই ঔর নিব্রাশৌ। সায়ন-পট্টী চরম প্রকাশো।। ইন চারোকে অরা বনায়। ধোবিয়া-পট্টী পরিধি লগায়।। সত্য নাহমেঁ করো সংযোগ। পণ্ডিত কহ পঙক্তিরথ সোয়।।'

—'সর্ব্বার্য-পঙ্‌ক্তি-ব্রাহ্মণ-বৈভব,' খণ্ড ১, পৃষ্ঠা-ড (পণ্ডিত নন্দকুমার শর্মা শুক্ল পিছৌরা, কুমারপ্রেস, গোরখপুর, (১৯২৮ খ্রীঃ)।

পরবর্তি পদে এই পট্টীগুলিকে এভাবে অন্তর্বিভাগ করা হয়েছে—

(১) তিন্নাথেঁই গৌ-গ-শা (২) পা-খো-পাণ্ডে নিরাশা।।

(৩) তীন চকারে চমরু। (৪) সায়ন পট্টী প-প-সা।।

(৫) পাঁচ পবর্গে ধোবিয়া।।—(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-ঢ)

বিবরণ এই রকম—

পল্লী	মূলগ্রাম	পদবী	গোত্র
১· তিয়াথেই	১· ভেড়ি	*শুক্ল	গর্গ (গার্গ্য)
	২· বইসী	* মিশ্র	গৌতম
	৩· গোরখপুর (গোরখী)	* ত্রিপাঠী (তিওয়ারী)	শাণ্ডিল্য (শ্রীমুখ)
২· নিরাশ	৪· সোনৌরা	পাঠক	ভরদ্বাজ
	৫· পাঠক	উপাধ্যায়	"
	৬· ত্রিফলা	*পাণ্ডেয় (পাণ্ডে)	কাশ্যপ
৩· চরম (চমরু)	৭· নওপুরা	চতুর্বেদী (চৌবে)	"
	৮· নাগচৌরী	*পাণ্ডেয় (পাণ্ডে)	বৎস (বাৎস্য)
	৯· ইটারি	*পাণ্ডেয় (পাণ্ডে)	সাবর্ণ্য
৪· সায়ন	১০· পরবা	দ্বিবেদী (দুবে)	কাশ্যপ
	১১· পডরহা	মিশ্র	পরাশর
	১২· সমদারি	দ্বিবেদী (দুবে)	বৎস (বাৎস্য)
৫· ধোবিয়া	১৩· মলাঁও	*পাণ্ডেয় (পাণ্ডে)	সাংকৃত্য
	১৪· মণিকণ্ঠ	ত্রিপাঠী (তিওয়ারী)	শাণ্ডিল্য
	১৫· বৃহদগ্রাম (সোহগৌরা)	*দ্বিবেদী (দুবে)	ভরদ্বাজ
৬· নাভি	১৬· পিণ্ডৌরা	শুক্ল (সত্য)	কৃষ্ণাত্রেয়

* চিহ্নাংকিত বংশে এখনো পঙ্‌ক্তিঅলা কুল আছে। এই কুলের (যাদের মধ্যে গর্গ, গৌতম, শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, বৎস, সবর্ণ, পরাশর, সংকৃতি ও কৃষ্ণঅত্রি এই দশ গোত্র এবং শুক্লা মিশ্র, তিওয়ারী, পাঠক, উপাধ্যায়, পাণ্ডে, চৌবে ও দুবে এই আট পদবী আছে) মধ্যে প্রধান দশ গোত্র এবং কৌডীরামের পাণ্ডে (কৌণ্ডিল্য) এবং পাণ্ডেপারের পাণ্ডে (অগস্ত্য)-কে নিয়ে বার গোত্রকে মহারাজ জয়চন্দ্র 'পঙ্‌ক্তি' হিসেবে গণ্য করেছিলেন (প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৭)। কৌণ্ডিল্য ও অগস্ত্য গোত্রীদের ষোল ঋত্বিজদের মধ্যে রাখা হয়নি, তাই এদের আধা-আধা গোনা হয়; এই প্রকারে কুলের সংখ্যা ১৭(১৮) হয়। মহারাজ জয়চন্দ্রের পরেও লোক পঙ্‌ক্তি হয়েছে, সিংহন জোরীর তিওয়ারী (ভার্গব), হরিণ এর তিওয়ারী (বাশিষ্ট) উপমন্যু-গোত্রী ওঝা, পিণ্ডীর তিওয়ারী (শাণ্ডিল্য), পয়াসীর মিশ্র (বাৎস্য) ইটিয়া পাণ্ডে (গার্গ্য), মলৈয়া পাণ্ডে (ভারদ্বাজ) এবং রাঢ়ী মিশ্র (ভারদ্বাজ) পরে পঙ্‌ক্তিতে মেলানো হয়েছে; এঁদের মধ্যে পয়াসী-মিশ্র (বাশিষ্ঠ) এবং ভার্গব তিওয়ারীদের মধ্যে এখনও 'পঙ্‌ক্তি' আছে।

পিণ্ডীর তিওয়ারীদের 'পঙ্‌ক্তি'তে নেওয়ার ব্যাপারে একটা গল্প আছে—গৌতম গোত্রীয় দিনমণির কোনো বংশধর গঙ্গাস্নান করতে এসেছিলেন। তিনি সেখানে ভীষণ রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েন। পিণ্ডীর কসের তিওয়ারীর স্ত্রী সুখা তাঁর খুব সেবা করেন। পরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য পঙ্‌ক্তি ব্রাহ্মণ সুখার সন্তানকে সুখাপতি নামে 'পঙ্‌ক্তি'তে নিয়ে নেন (প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৬, ১৯৭)।

রাঢ়ী-মিশ্রদের সরযূপারীণ ও পঙ্‌ক্তিবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে এই গল্প আছে—মলাঁও বংশী আচার্য মাধব বিজয়নগরের (?) গহড়বার কৃষ্ণদেবের (?) গুরু ছিলেন। তাঁর ওখানে এক বঙ্গীয় রাঢ়ী ব্রাহ্মণ শ্রীহরিহর মিশ্র উচ্চ কর্মচারী ছিলেন। কৃষ্ণদেবকে পরাস্ত করে আলাউদ্দীন খিলজী (?) তাঁর রাজ্য অধিকার করলেন। হরিহর মিশ্রকে গোরখপুরের চাক্‌লাদার (জেলার প্রধান অধিকারী) করা হল। আচার্য মাধবের সহায়তায় হরিহর মিশ্রকে সুরযূপারীণদের মধ্যে নিয়ে নেওয়া হল। মাধবের প্রেরণায় সব ব্রাহ্মণ হরিহর মিশ্রের সঙ্গে একত্র ভোজন করে, কিন্তু সিংহনজোরীর ভার্গব তিওয়ারীরা তা করতে অস্বীকার করল। তাই নিয়ে এই বিখ্যাত প্রবচন—'বড় বড় কৌর মধইয়া জেবেঁ ভার্গব রহেঁ উধারী'। পরে পঙ্‌ক্তিতে এসেছে এমন কুল সম্পর্কে এই প্রবচন আছে—

'তিন পাঁতি তো পাণ্ডে হীন। সিংহ-করৈলী-পয়সী-চীহ॥
তিন পাঁতি গঙ্গাপারীণ। হরিণ-মচৈয়া-তিবনী-কীহ॥'
(প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৫, ১৮৮)

হল—সেই সময় বর্তমানে সু-অরন্ধর নামে প্রসিদ্ধ স্থান থেকে এক বিকট শুওর বেরোল এবং সে ঘুরে ঘুরে গ্রামের সীমা প্রকাশ করে দিল। এই শুওরই মলাঁও বংশের কুলদেবতা মলকবীর[১] (মৈরেকবীর)।

অহিরুদ্র পাণ্ডের জন্ম আর মলাঁওদের হত্যাকাণ্ডের সময় জানার জন্য তখন থেকে এখন পর্যন্ত

সব একত্র করার পর নিম্নোল্লিখিত কুলও পঙ্‌ক্তিভুক্ত ধরা হল—

মূলগ্রাম	পদবী	গোত্র
১৭· কোডীরাম	পাণ্ডেয়	গোত্র
১৮· পাণ্ডেপার	পাণ্ডেয়-ত্রিপাঠী	কৌণ্ডিন্য
১৯· সিংহনজোরী	ত্রিবেদী (তিওয়ারী)	অগস্ত্য
২০· হরিনা (হরনহা)	ত্রিবেদী (তিওয়ারী)	ভার্গব*
২১· করৈলী	ওঝা	বাশিষ্ঠ*
২২· পয়াসী	মিশ্র*	উপমন্যু
২৩· পিণ্ডী	ত্রিপাঠী*	বৎস
২৪· মচৈয়া	পাণ্ডেয়	শাণ্ডিল্য (গর্দভী)
২৫· ইটিয়া	পাণ্ডেয়	ভারদ্বাজ
২৬· রাঢ়ী	মিশ্র	গার্গ্য
		কাশ্যপ

এই ২৬ কুল অথবা রাঢ়ীকে আলাদা করে এবং কৌণ্ডিন্য (১৭) ও অগস্ত্য (১৮)-কে আধা আধা গুনলে ২৪ কুল 'পঙ্‌ক্তি' (মৃষ্ট) বলা হত। তার অতিরিক্ত অবশিষ্ট সরযূপারীণ কুলকে 'জাতি' (মার্জনীয়) বলা হত। ওপরের ১২ গোত্রের অতিরিক্ত নিম্নোল্লিখিত গোত্রও সরযূপারীণ ব্রাহ্মণদের মধ্যে পাওয়া যায়—

মূলগ্রাম	পদবী	গোত্র
ধর্মপুরা	মিশ্র	কৌশিক (ঘৃত-)
ধমেরি	ত্রিপাঠী	বরতন্তু
তিলৌরা	দ্বিবেদী	কাণ্ব
পিপরাসী	চতুর্বেদী	কাত্যায়ন
ছপওয়া	দ্বিবেদী	মৌনস
	পাণ্ডেয়	মাণ্ডব্য
	ত্রিপাঠী	বন্ধুল
কল্পিত	চতুর্বেদী	অত্রি

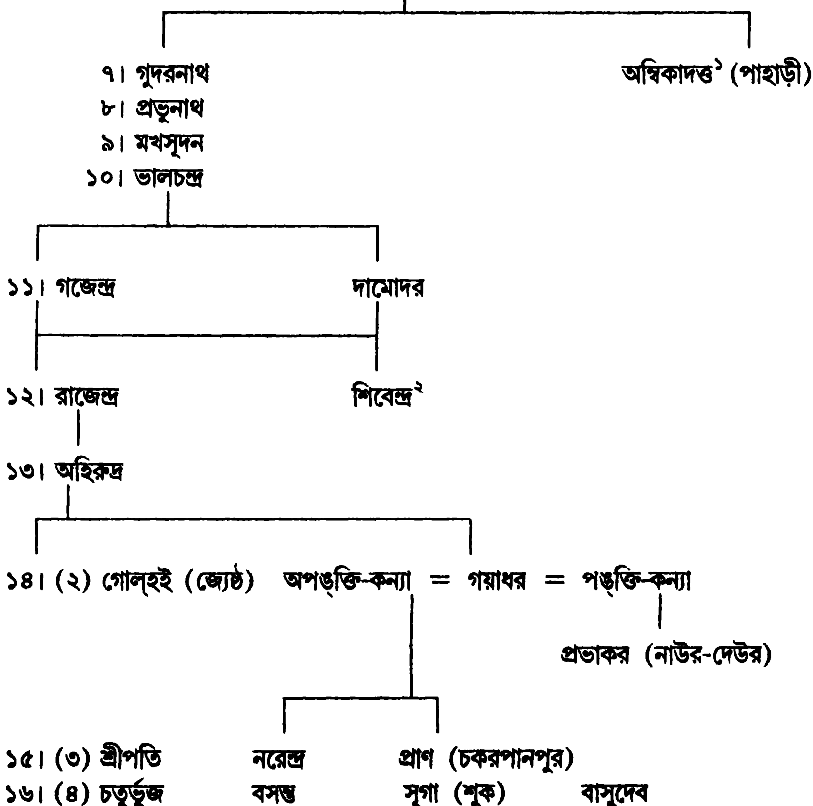
মহারাজ চন্দ্রদেবের উপরোক্ত তাম্রপত্রে নিম্নোল্লিখিত আরো গোত্র পাওয়া যায় যাদের সরযূপারীণ হওয়া উচিত—কপিষ্ঠল, শার্কর, শার্করাক্ষ, মন্য, শৌনক, জীবন্ত্যায়ন, ধৌম্য, সৌশ্রবস, কুৎস, গালব, দক্ষ, জাতুকর্ণ্য, গৌণ্য, পিপ্পলাদ, মৌন্য, যাস্ক, হারীত, মৌদ্‌গল্য, দর্ভ (দাল্‌ভ্য?) (E.Ind. Vol. XIV pp. 192-209), জাতুকর্ণ্য, বিষ্ণুবর্ধন, মুদ্‌গল, মৌনস, শৌনকেতু (?) যাস্ক, দাল্‌ভ্য, বাভ্রব্য গোত্র কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণদের মধ্যে পাওয়া যায়। (কান্যকুব্জভাস্কর পৃঃ ১৬)।

সরযূপারে এখনো ষোলটি উচ্চ কুলে পাঁচ পট্টীর পঙ্‌ক্তিরথ এঁকে পিছৌরা (চাদর) দান করার রেওয়াজ আছে। (সর্বার্য্য পঙ্‌ক্তি ব্রাহ্মণ বৈভব, পৃঃ ড,ঢ)।

১· শ্রাবণ শুক্লা সপ্তমীর দিন মিষ্টি ছাড়া ক্ষীর ও নোনতা কাঁচা রান্নায় মলকবীরের পূজা হয়। সেদিন ব্রাহ্মণ ভোজন গাওয়া ঘিয়ে ভাজা লুচিতে করানো হয়। আরও এক কুলদেবতার পূজাও বিশেষ মাহাত্ম্যপূর্ণ। প্রত্যেক পুত্র প্রসব, যজ্ঞোপবীত ও বিয়ের জন্য মলকবীরকে একটি শূকর-শাবক বলি দিতে হয়। তা সেই বছরে দেওয়া হয় যে বছর বাড়িতে কোনো মৃত্যু হয় না; মৃত্যুর অর্থ এই নয় যে সেই বছর পূজা বাদ পড়ল। বলি গুণে গুণে বিষম সংখ্যায় (১, ৩, ৫, ৭) দিতে হয়। সন্তান অনিষ্ট হওয়ার ভয়ে মলাঁও এর পাকা 'বৈষ্ণব' পরিবারও এই বলি বন্ধ করার সাহস করে না।

প্রজন্মকে ছাড়া আর অন্য উপায় নেই। এখানে আমরা এইরকম ছ'টি উদাহরণ দিচ্ছি—

১। চক্রপাণি
২। সিদ্ধেশ্বর
৩। মাতৃদত্ত
৪। রমাকান্ত
৫। চন্দ্রমৌলি
৬। রাজমণি



নাউর-দেউরঅলারা কয়েক বছর ধরে, শুওর বলি দেওয়া বন্ধ করে এখন তার পরিবর্তে সুপারি অথবা লাউ কাটে। কনৈলায় এই কুলদেবতার পূজা কিভাবে হয়, তা নিয়ে মলাঁও এর ব্যাপারে কোনো জ্ঞান না থাকায় আমার অনুজ রামধারী একটি চিঠিতে (নভেম্বর ১৯৩৯-এ) আমাকে লিখেছে—

'এখানে নরসিংহ ও মহাবীর কুলদেবতা। নরসিংহকে খদ্দরের কাপড়, ষষ্ঠীর চালের লাড্ডু, হনুমানজীর রোট···আর গোরিয়াডীহের পূজা হয়,··· শুওরের বাচ্চাও বলি দেয়।' নিশ্চয়ই কনৈলার (আমার বাবার গ্রাম) এই পূজাতে মলকবীরের পূজা আছে। কনৈলাবাসীরা অনন্তব্রত ও সুতোর ব্যবহার করে না।

বড় পরিবারে অশৌচের জন্য কখনো কখনো কয়েক বছরের মলকবীরের পূজা একসঙ্গে পড়ে। পূজার দিনের কয়েকদিন আগে দেয়ালে চালগুড়ির আলপনা দেওয়া হয় যাতে 'জিবতা-জিবতীর' (একাধিক মুণ্ডঅলা স্ত্রী-পুরুষ)

১৭। (৫) জয়রাম	হরিরাম		ভোজু	হেমানন্দ	
১৮। (৬) জীবনরাম	বিহারী		ইজহার	শিবদাস	
১৯। (৭) যজ্ঞমণি	কুলপতি		ইচ্ছা (কনৈলা)	রঘুনাথ	
২০।(৮) লোচনরাম	রঘুনাথ	ঘনশ্যাম	রামহিত	গৌরীদত্ত	বিষ্ণুদত্ত
২১।(৯) হরিলাল	শিবনাথ	দেবীদত্ত	রামসহায়	গঙ্গাদত্ত	গুরুপ্রসাদ
২২।(১০) বিশ্বেশ্বর	হিতরাম	রামপ্রসাদ	গোপাল	জয়গোপাল	যদুনাথ
২৩।(১১) জগতরাম	অযোধ্যাপ্রসাদ	হর্ষলাল	জানকী	কুমারদত্ত	চন্দ্রভূষণ
২৪।(১২) ঘাসীরাম	রামসেবক	নন্দ	গোবর্ধন	মুঞ্জেশ্বরপ্রসাদ	শূরসেনপ
২৫।(১৩) রমণরাম	বলিরাম	সূর্যনারায়ণ*	রাহুল	বলভদ্র	(সুরেশ)
২৬।(১৪) দুধনাথ	সত্যনারায়ণ	শিবপূজন	ইংগোর		(সুবেশ/৭
২৭।(১৫) বিশ্বেশ্বর	জগদীশনারায়ণ	শৈলেন্দ্র		রমাপতি	বছর)
২৮।(১৬) মুনা	শশবিন্দু (বালক)	শরৎকুমার	(৫ বছর)		(৭ বছর)
২৯।(১৭) রূপনারায়ণ					
৩০।(১৮)রামচন্দ্র					

* পণ্ডিত সূর্যনারায়ণের তিন ছেলে হলেন—মধুসূদন, শিবপূজন, দীপনারায়ণ। শ্রীদীপনারায়ণের দুটি যুবক ছেলে আছে—দিনেশকুমার ও নগেন্দ্রকুমার।

চক্রপাণির সময় থেকে আজ পর্যন্ত বেশী হলে ৩০ এবং কম হলে ২৪টি প্রজন্ম কেটে গেছে। সংকৃতির কালের বিষয়ে লিখতে গিয়ে আমি প্রতি প্রজন্মের জন্য ২০ বছর সময় ধরেছিলাম, যা রাজবংশীয় পুত্রের অতিরিক্ত অন্য কেউ উত্তরাধিকার হওয়ার ফলে প্রজন্ম বেড়ে যাওয়ায় সঠিক। চক্রপানির প্রজন্মগুলি সুনিশ্চিত। মলাঁও-এর পাঁচ প্রজন্মের কাল আমার নিজেরই জানা আছে। অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার সময় গোরখপুরের চাকলাদার শ্রীঅযোধ্যাপ্রসাদ পাণ্ডের জন্মপত্রিকা তাঁর প্রপপৌত্র শ্রীজগদীশনারায়ণের বাড়িতে আছে। তা থেকে তাঁর জন্মদিন 'বিক্রমাদিত্যস্য রাজ্যাদ্ গতসমাঃ॥ ১৮১১... শালিবাহনস্য ভূপতের্গতাঃ শকাব্দাঃ॥ ১৬৭৬.... বৈশাখ মাসে শুক্লপক্ষৈকাদশ্যাং ভৃগুবাসরে ঘটীপলে ৩॥ ১৮ উত্তরাফাল্গুনী নক্ষত্রে ঘটয়াদিঃ॥২৬॥ ৩০' লেখা আছে। তাঁর প্রপপৌত্র শ্রীজগদীশনারায়ণের জন্ম সংবৎ ১৯৫০-এ। অর্থাৎ—

১। অযোধ্যাপ্রসাদ জন্ম সংবৎ ১৮১১ (১৭৫৪ খ্রীঃ)
২। রামসেবক
৩। বলিরামসেবক
৪। সত্যনারায়ণসেবক
৫। জগদীশনারায়ণসেবক ১৯৫০ (১৮৯৩)

চিত্র আঁকা হয়। বলি হয় শ্রাবণের শুক্লা সপ্তমীর পরের মঙ্গলবার। প্রত্যেক বলির জন্য দুটি করে যবের পুরি (লুচি নয়, ডালের পরোটা) বানিয়ে চৌকাঠের বাইরে জোড়ায়-জোড়ায় সাজানো হয়। সেখানেই শূকর ছানাকে কাটা হয়। রক্ত দরজার পাশে মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়। অতএব মলাঁওয়ের সাংকৃত্য বংশের টোটেম্ ও বলি দুই-ই শূকর।

মলাঁও ও নাউর-দেউরে আরো একটা প্রথা আছে, যজ্ঞোপবীত হওয়ার আগের দিন বালককে কুমীর ঘরে কাঁচা রান্না খেতে হয়।

১· পণ্ডিত রামনাথ পাণ্ডে (ভোরা) দ্বারা প্রকাশিত বংশবৃক্ষে এখানে তারাদত্ত ও অম্বিকা দত্তকে গুদরনাথের পুত্র লিখেছে, আমি এখানে নাউর-দেউর (শ্রী জ্বালাপ্রসাদ পাণ্ডে)-এর বংশবৃক্ষের প্রামাণিকতা মেনে নিয়েছি।

২· সুনেন্দ্র—পণ্ডিত রামনাথের বংশবৃক্ষে।

এইভাবে পাঁচ প্রজন্মে ১৩৯ বছর হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রজন্মে ২৭·৮ বছর। ডক্টর সীতানাথ প্রধান তাঁর গ্রন্থে[১] ছয়টি ভারতীয় বংশের প্রজন্মের আলাদা আলাদা গড় দিয়েছেন ২৬ থেকে ২৯·৮ বছর পর্যন্ত। এতে ভট্টনারায়ণ থেকে রাম সমাদ্দার পর্যন্ত ২০ প্রজন্মের জন্য ৫২০ বছর নেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ প্রতি প্রজন্ম ২৬ বছর। উপরিলিখিত পাঁচটি উদাহরণে শূরসেনপ (৭ বছর ১৯৩৯) থেকে অহিরুদ্র পর্যন্ত ১২ প্রজন্ম, রামচন্দ্র থেকে ওই পর্যন্ত ১৮ প্রজন্ম হয়। এইভাবে—

ইচ্ছা পাণ্ডে (কনৈলা) ইগোর থেকে	৮×২৬=২০৮ বছর	১৭৩১ খ্রীঃ
প্রাণ পাণ্ডে (চকরাপানপুর) ইগোর থেকে	১২×২৬=৩১২ বছর	১৬২৭ খ্রীঃ
প্রভাকর পাণ্ডে (নাউর-দেউর) সুরেশ থেকে	১২×২৬=৩১২ বছর	১৩২৭ খ্রীঃ
অহিরুদ্র পাণ্ডে (মলাঁও)	১৪×২৬=৩৬৪ বছর	১৫৭৫ খ্রীঃ
চক্রপানি (মলাঁও) শরৎকুমার থেকে	২৮×২৬=৭২৮ বছর	১২১১ খ্রীঃ

চক্রপানি গহড়বার রাজবংশের শেষ সময়ে উপস্থিত ছিলেন। সম্ভবত তিনি গহড়বার রাজবংশ দ্বারা যখন সরযূপারীণদের পঙ্ক্তিবদ্ধ করেন, তখন তিনি মলাঁও এর প্রতিনিধি ছিলেন (যদি জনশ্রুতি অনুসারে এই পঙ্ক্তিবন্ধন মহারাজ জয়চন্দ্রের[২] তত্ত্বাবধানে হয়ে থাকে) আর হয়তো সেই জন্য তাঁর এত খ্যাতি শোনা যায়।

এইভাবে মলাঁও হত্যাকাণ্ড ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি হয়েছিল বলে মনে হয়।

অহিরুদ্রের সন্তান :

গোলহই পাণ্ডে (জ্যেষ্ঠ পুত্র ১৬০০ খ্রীঃ)—অহিরুদ্রের দুই পুত্র গয়াধর ও গোলহইর মধ্যে গোলহই জ্যেষ্ঠ ছিলেন। পিতার মতো তিনিও বিশেষ শিক্ষিত ছিলেন না বলেই মনে হয়। তাঁর সন্তানেরাও পরবর্তীকালে বিত্তে ও বিদ্যায় বিশেষ উন্নতি করতে পারেননি।

গয়াধর পাণ্ডে—ইনি কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। পঙ্‌ক্তি-নিয়মানুসারে পঙ্‌ক্তি কন্যার সঙ্গেই গয়াধরের বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাঁর যে পুত্র হয় তাঁর নাম প্রভাকর। এই নাম থেকে মনে হয় যে গয়াধর তাঁর পিতার চেয়ে কিছুটা বেশী শিক্ষিত ও সুসংস্কৃত ছিলেন। একবার তাঁর শোথ রোগ হয়েছিল। অনেক চিকিৎসাপত্র করা হল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। মীঠাবেলের কৌশিক দুবে বৈদ্য বলল, 'যদি আপনি আমার মেয়েকে বিয়ে করেন, তবে আমি আপনাকে সারিয়ে দেব।' 'পঙ্‌ক্তি' ভাঙার ভয়ে প্রথম গয়াধর অস্বীকার করলেন। রোগ অসাধ্য হয়ে উঠছে দেখে তিনি কাশী যাওয়া স্থির করলেন। কিন্তু এখন কাশীতে মরে মুক্তি লাভের চেয়েও তাঁর এই দুনিয়ায় বেঁচে থাকার বেশী বাসনা ছিল। ফলত মলাঁও থেকে বেরিয়ে কাশীর দিকে না গিয়ে মীঠাবেল-এ পৌঁছলেন। বৈদ্য পঙ্‌ক্তি জামাই পেতে খুব ইচ্ছুক ছিলেন। তিনি তাঁর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলেন, আর তাঁর চিকিৎসায় গয়াধর পণ্ডিত সুস্থও হয়ে গেলেন। সেই কন্যার একটি পুত্র হল, নাম নরেন্দ্র। মলাঁও পৈতৃক সূত্রে সম্পত্তি প্রাপ্তির আশা নেই দেখে দাদু নাতির জন্য এক গ্রাম দিয়ে দিলেন, তার নামে গ্রামের নাম হল নরেন্দ্রপুর। গয়াধর পণ্ডিত পরে সেখান থেকে কাশী চলে যান।

গয়াধর কনৈলাবাসীদের পূর্বজ—মলাঁও-এর এই শাখা সম্পর্কে রামধারী তার চিঠিতে জনশ্রুতিকে এইভাবে লিখেছে—

'শোনা যায় পণ্ডিত চক্রপাণিজী (?) মলাঁও থেকে কাশীতে শিক্ষালাভের জন্য গিয়েছিলেন।

১· Chronology of Ancient India pp. 170-74

২· চন্দ্রদেবের মহাদানে পঙ্‌ক্তিবদ্ধতা ১০৯৩ খ্রীঃ-এর কাছাকাছি হতে পারে।

তাঁর সেবার জন্য একটি নাপিত ও একটি যুবতীও গিয়েছিল। সেখান থেকে ফেরার সময় জাঠী... গ্রামে থেকে ছিলেন। ... সেখানে এক ভূমিহারের বাড়িতে ব্রতপালন করা হচ্ছিল।... তিনিও পৌছলেন।... সেখান থেকে দুর্গা পণ্ডিতের বাড়ি গেলেন। সেখানেই পণ্ডিত দুর্গাজীর মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হল। এ-থেকে ৫ ছেলে হল, যারা এখন রানীপুর, ঘডেরা, টাডী, দিলমনপুর, ডীহা, জালালপুর ইত্যাদি স্থানে ছড়িয়ে আছে।... প্রথম বিয়ের যে স্ত্রী মলাঁও-এ ছিলেন, তাঁর দুটি ছেলে হয়েছিল যাঁরা সেখানেই থেকে যান। আর যখন এই মলাঁও-এর স্ত্রী চক্রপানপুর এলেন, তখন তাঁর পাঁচ ছেলে হল। এই ছেলেদের থেকে চক্রপানপুর, কনৈলা, একবনা গ্রাম হয়েছে। চক্রপানপুর থেকে হিচ্ছা (ইচ্ছা) পাণ্ডে কনৈলায় এসে বাস করতে থাকেন।'

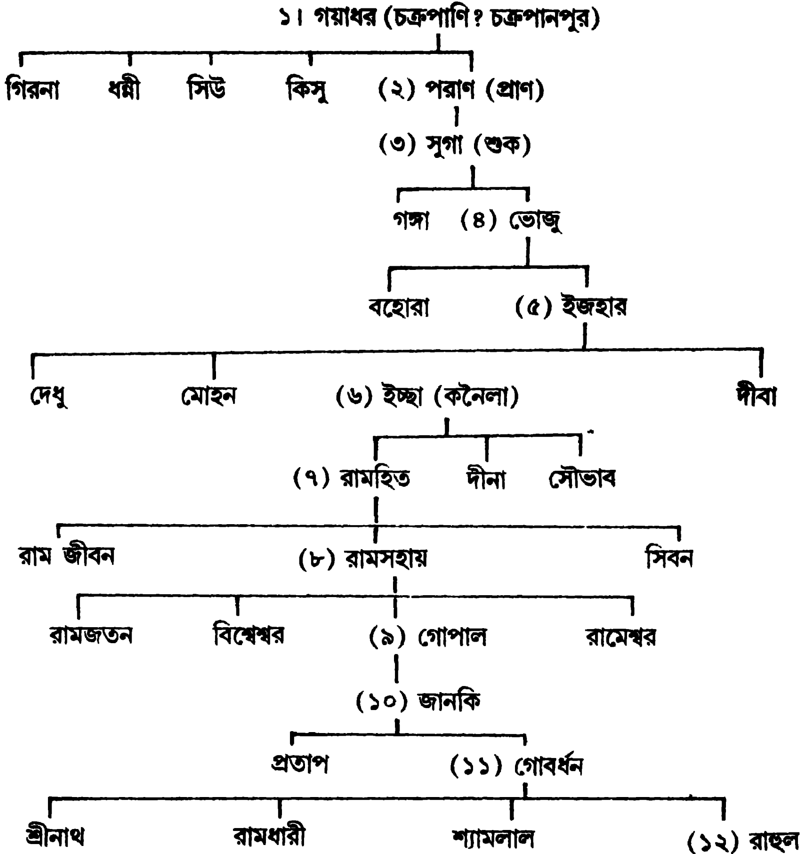
কনৈলার সঙ্গে মলাঁওদের পরম্পরা সম্পর্কে কিছু না জেনেও রামধারী(নভেম্বর ১৯৩৯ খ্রীঃ) এই বিবরণ দিয়েছিল। দুই জায়গার পরম্পরা মেলালে বোঝা যায় যে কনৈলাবাসীরা চক্রপানপুর (চক্রপাণিপুর) নাম দেখে ভুল করে গয়াধর পাণ্ডের বদলে অনেকদিন আগেকার পূর্বজ-এর নাম দেয়। শূকর বলি, অনন্ত চতুর্দশী বর্জন এবং এ পর্যন্ত কেটে যাওয়া প্রজন্মের সঙ্গে সঙ্গে গয়াধর পণ্ডিতের মীঠাবেল থেকে কাশী প্রস্থান, মলাঁও-এ তাঁর দুই সন্তান—এই সব বিষয়ে বিচার করলে সন্দেহ থাকে না যে, কনৈলায় যাকে চক্রপাণি বলা হয়েছে, সে আসলে চক্রপাণি বংশজ গয়াধর পাণ্ডেই। দুর্গা পণ্ডিত আজমগড় জেলার এই সুদূর দক্ষিণ অংশের বসিন্দা ছিলেন, তাই তাঁর কন্যা সেই সম্মানের পাত্রী হতে পারত না, যেমন সরযূপারের কন্যা ছিল—যতই সে মীঠাবেলের অপঙ্‌ক্তি কৌশিক দুবের কন্যা হোক না কেন। মলাঁও-এর পরম্পরা থেকে জানা যায় যে যখন তিনি প্রভাকরকে মলাঁও-এ ছেড়ে সেখান থেকে রওনা হয়েছিলেন, তখন গয়াধর পাণ্ডে বেশ প্রৌঢ় হয়ে গিয়েছিলেম। সেই সময় তার মীঠাবেলের স্ত্রী হয়তো অল্পবয়স্কা ছিল, অতএব গয়াধরের প্রাণ প্রভৃতি সন্তানেরা প্রভাকরের মাতার না হয়ে এই স্ত্রীর ছিল বলেই মনে হয়।

সরযূপারের স্ত্রীর সন্তান বলে চক্রপানপুর-কনৈলাবাসীরা নিজেদেরকে অন্যদের চেয়ে বেশি কুলীন বলে মনে করে। তাছাড়া কয়েক প্রজন্ম পর্যন্ত তো তাঁরা কন্যাদের বিয়ে সরযূপার গোরখপুর জেলাই দিতেন, এই ব্যাপারটা এখনো কোনো কোনো পরিবারে দেখ যায়।

গয়াধরের ষষ্ঠ প্রজন্মে ইচ্ছা পাণ্ডের জন্ম হয়। যখন তিনি চক্রপানপুর ছেড়ে কনৈলা আসেন, তখন কনৈলা এক জনশূন্য গ্রাম ছিল। কনৈলার পুরনো পুকুর, জায়গায় জায়গায় বেরিয়ে আসা কুয়া, পুরনো দুর্গ ও তার সৈয়দ এবং 'বড়ী' পুষ্করিণীতে এক জায়গায় পাওয়া বড় বড় ইট বলে দেয় যে কনৈলা একটা পুরনো জায়গা। ইচ্ছা পাণ্ডের সময় কনৈলাতে চুড়িঅলা ও ঢালাইঅলাদের বসতি নিশ্চয় ছিল,যাদের সন্তানেরা এখনো সেখানে আছে। ইচ্ছা পাণ্ডে পণ্ডিত ছিলেন না, আর আমি যতদূর শুনেছি তাঁর বংশে সরস্বতীর দিকে তাকানোর অপরাধ আমিই প্রথম করলাম। ১৭৩০-এর কাছাকাছি, যখন শেরশাহ থেকে ঔরঙজেব পর্যন্ত দৃঢ় শাসন বিশৃঙ্খল হয়ে যাওয়ায় দেশের চারদিকে অশান্তির দৌরাত্ম্য ছিল, সেই সময়ের পক্ষে পাণ্ডে উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কনৈলা দখল করে সেখানে তাঁর কাঁচা দুর্গ তৈরী করেন (চক্রপানপুরে তাঁর ভাগও তিনি ছাড়েননি, তাঁর বংশধরেরা আজও চক্রপানপুর-কনৈলার জমিদার-কৃষক)।

বিদথী, সংকৃতি, রন্তিদেব থেকে চলে আসা 'ক্ষত্রোপেতত্ব' মলাঁও থেকে কনৈলাও পৌছেছিল এবং কনৈলায় এখনো বেলহার বৈসোঁ ও ভদয়ার ঠাকুরদের সঙ্গে লড়াই করার অনেক কাহিনী প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। ছেলেবেলা থেকে আমার বংশ সম্পর্কে আমি শুধু বিশ্বেশ্বর পাণ্ডে, রামেশ্বর পাণ্ডের লাঠির কেরামতির কথাই শুনেছিলাম। এই পরিস্থিতিতে কনৈলার

যুবকদের বাহুবলের ওপর জোর দেওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। কনৈলার বংশবৃক্ষ এইরকম—



প্রভাকর-বংশজ (নাউর-দেউর)—মর্লাঁও এর ওপর জ্যেষ্ঠ পুত্র গোল্‌হই পাণ্ডের সন্তানের (আধুনিক পশ্চিমপট্টী, আগেকার পূর্বপট্টী[১]) অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। গোল্‌হই-এর সপ্তম প্রজন্মর রোপন পাণ্ডে পর্যন্ত পঙ্‌ক্তি ছিল। নরেন্দ্র অপঙ্‌ক্তি কন্যার পুত্র ছিলেন। অতএব পঙ্‌ক্তি থেকে পরিত্যক্ত বলে তাঁকে মনে করা হয়; কিন্তু প্রভাকর বংশ এখনো পঙ্‌ক্তি অথবা আধা পঙ্‌ক্তিতে আছে। সরযূপারীণ পঙ্‌ক্তি ব্রাহ্মণের সংখ্যা হ্রাস পেতে পেতে এখন মাত্র কয়েক হাজার ঘর অবশিষ্ট আছে। পঙ্‌ক্তি ব্রাহ্মণেরা নিজেদের মধ্যেই বিয়ে করে, পঙ্‌ক্তির বাইরের ব্রাহ্মণের সঙ্গে বিয়ে হলে ত্রুটিযুক্ত (ভঙ্গ) করে দেওয়া হয়। পঙ্‌ক্তি ব্রাহ্মণের সম্মান বেশি। প্রভাকর বংশজ নাউর-দেউরের সাংকৃত্যদেরই এমন কুল যাদের কন্যার বিয়ে হয় পঙ্‌ক্তির মধ্যেই। বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর কন্যা মাতা-পিতার হাতেরও কাঁচা রান্না খেতে পারে না। সাধারণ সরযূপারীণ ব্রাহ্মণের সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য এই বংশই প্রবেশ পথের কাজ

১· প্রথম দিকের মর্লাঁও বসতি আজকের বসতির দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত 'ডীহ'তে ছিল, সেখানে পূর্বদিকে জ্যেষ্ঠ পুত্রের সন্তানদের বাড়ি ছিল, তাই তাকে পূর্বপট্টী বলা হত। আজকের নতুন বসতিতে ব্যাপারটা উলটো হয়ে গেছে।

করে। কিন্তু নাউর-দেউরঅলারা পঙ্ক্তির কন্যা লাভের অধিকারী নয়।

নরেন্দ্র-বংশজ—নরেন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর মামাবাড়ির লোকেরা তাঁর ছেলেদের—উদ্ধব, মাধব, বসন্তদের—কাছ থেকে নরেন্দ্রপুর কেড়ে নেয়। এরপর ছেলেরা মলাঁও এসে নিজেদের অর্ধেক ভাগ জোর করে দখল করে নেয়। ফলে দুই পরিবারের মধ্যে শত্রুতা বেড়ে গেল। গোল্‌হই-পুত্র শ্রীপতির সন্তানেরা নরেন্দ্রের সন্তানদের জন্ম সম্পর্কে মিথ্যাকথা ছড়াতে শুরু করল; যার ফলে তাদের বিয়ে বন্ধ হয়ে গেল। অবশেষে শ্রীনগর রাজ্যের পূজ্য (সাংকৃত্যগোত্রীয়) সরয়ার তিওয়ারীর সহায়তায় ষোল কুলের পঞ্চায়েত বসল। পঞ্চায়েত দুই পক্ষের কথা শুনে "দিব্য" সাক্ষী দ্বারা এর ফয়সালা করতে বলল—অশ্বত্থ গাছের পাতা হাতে রেখে তাঁর ওপর আগুনে পোড়ানো লাল লোহার গোলা নিয়ে ২১ কদম হেঁটে যেতে হত। জ্যেষ্ঠ ভাই উদ্ধব এগিয়ে গিয়ে বলল—আমি জ্যেষ্ঠ, আমার অধিকার প্রথম। কথিত আছে, তিনি একুশের জায়গায় বেয়াল্লিশ কদম চলে গিয়েছিলেন। পঞ্চায়েত নরেন্দ্রের সন্তানদের জাতির অন্তর্গত বলে স্বীকার করে গোল্‌হইর সন্তানদের খুব ভর্ৎসনা করল। ধীরে ধীরে তাদের এমন ভাঙন ধরল যে যারা নরেন্দ্রের সন্তানদের বিয়ে বন্ধ করেছিল, তারাই প্রতাপগড়ের মতো জায়গায় বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিল।

মাধবের বংশজ নেত্রানন্দ অমেঠী (সুলতানপুর) এক প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক হয়েছিলেন।

বসন্তের পৌত্র বিহারী অত্যন্ত উদার ছিলেন, একবার খাজনার দু'শ টাকা বাকী পড়েছিল। পূর্বজদের জমি বাজেয়াপ্ত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তাঁর ছেলে কুলপতি বেনারসে তাঁর ধনাঢ্য শ্বশুরবাড়ি গেলেন। সেখানে বাসনভাড়া ছাড়া তিনি আরো দু'শ টাকা পেলেন। বাড়ি ফিরে আসার পথে সন্ধ্যায় সে নৈনিজোরে (জিলা-আজমগড়) থাকলেন। সেখানকার ভূস্বামীর দৈনিক হাতখরচের জন্য দু'শ টাকা দরকার হত। তাঁর কর্মচারী সেদিন অতটা টাকা আদায় করতে পারেনি। কুলপতি পাণ্ডে কর্মচারীদের ভীত, সন্ত্রস্ত দেখে নিজের দু'শ টাকা দিয়ে দেন। বাসন ভাড়া নিয়ে যখন তিনি সকালবেলা মলাঁও পৌঁছলেন, তখন দেখতে পেলেন বিহারী পাণ্ডে দাঁতন নিয়ে বসে আছেন। বললেন—ঠিক সময়ে এসেছ, আমার লোটা এক গরীবকে দিয়ে দিয়েছি, বাসন দাও, দাঁতন তো করি।"

পুত্রের উদারতার কথা জানতে পেরে রুষ্ট হলেন না, আরো প্রসন্ন হয়ে বললেন—অপরের ইজ্জত বাঁচানোই ধর্ম। অন্যদিকে নৈনীজোরে সকালবেলা যখন লোকজন কুলপতিকে খোঁজাখুঁজি করতে লাগল, তখন তিনি বিদায় নিয়ে চলে এসেছেন। তাদের প্রভু সপ্তম ধারের দুশো টাকা ছাড়া আরো পাঁচশো টাকাও বিদায় হিসেবে কুলপতিকে পাঠান। এখান থেকেই কুলপতির বংশের সমৃদ্ধির সূচনা হয়। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে পাঁচশো টাকার অনেক মূল্য ছিল। কুলপতি তাঁর ছেলে যোগমণিকে রাজবিদ্যা পড়ালেন, আর তিনি পড়াশোনা করতে করতেই তাঁর সময়ের গোরখপুর জেলার সবচেয়ে বড় রাজ্য রুদ্রপুরের (সতাসী) দেওয়ান নিযুক্ত হন। নদুয়া, কটয়া, ধনসড়ী, দেবকলী গ্রাম তাঁর জায়গীর ছিল। যোগমণির সন্তানেরা কেউ তেমন যোগ্য হয়নি, তাই তার ভাইপো মনসারাম (মনশ্যামের পুত্র) রুদ্রপুরের দেওয়ান হন। মনসারামের সময়ে রুদ্রপুরের রাজার বয়স আশি বছরের বেশী হয়ে গিয়েছিল। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র লাল সাহেব, অধীর হয়ে পড়লেন, বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রুর মতো তিনি পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা তুলে ধরেন। কথিত আছে, পিতাপুত্রের এই ঝগড়া বাড়তে বাড়তে রুদ্রপুরের সাতাশী ক্রোশ রাজ্যের প্রত্যেক বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে। প্রত্যেক বাড়িতে পিতা রাজার পক্ষে ছিল, আর পুত্র যুবক লালসাহেবের পক্ষে। লালের সাতশো সেপাই একদিন মনসারামকে ঘিরে ফেলে এবং লাল না পৌঁছে গেলে হয়তো মনসারামের জীবন চলে যেত। মনসারাম রাজাকে বোঝাতে থাকলেন, শেষ পর্যন্ত রাজা পুত্রের জন্য গদী ছেড়ে দিতে রাজী হলেন। এই খুশীতে বাপ বেটা দুজনই মনসারামকে ৫২টি

নিষ্কর গ্রাম দিতে চান। মনসারাম এই কথা বলে তা নিতে অস্বীকার করেন—যদি প্রত্যেক দেওয়ানকে এভাবে গ্রাম দান করা হতে থাকে, তবে চার প্রজন্মের পর রাজ্যের হাতে থাকবেটা কি? বিশেষ আগ্রহ করায় তিনি নৌআ-ডুমরী, গোধবল, জদ্দুপুর, তরওয়া ও ববমৌজা-পুরসৌলি গ্রাম গ্রহণ করতে রাজী হন। কুরুক্ষেত্রে গ্রহণের সময় বৃদ্ধ রাজা বিরৈচা তপ্পা মনসারামকে দান করতে চান,যা তিনি নিতে অস্বীকার করায় সোহগৌরার তিওয়ারীরা তা পায়।

গোরখপুর জেলা সেই সময় নবাব-উজির অযোধ্যার রাজ্যে ছিল। এই জেলার চাকলাদারির (জেলার প্রধান অধিকারীর পদ) জন্য নগদ এক লাখ টাকা জামানত দিতে হত। মনসারাম উন্নতি করতে করতে গোরখপুরের চাকলাদার হয়ে যান। শোভামণি উপাধ্যায় (পিপরা, তহশীল হাটা) তাঁর মুৎসুদ্দি ছিলেন। খাজনা জমা করতে তিনিই লখনৌ যেতেন। সেখানে টাকা জমা করতেন নিজের নামে এবং মনসারামের চাকলাদারির খাজনা বাকী থাকত। এভাবে যখন বকেয়া খাজনা এক লাখ হয়ে গেল, তখন তাঁর কাছ থেকে চাকলাদারি ছিনিয়ে নিয়ে মনসারামকে লখনৌ ধরে নিয়ে যাওয়া হল। কয়েকদিন ধরে তাঁকে প্রহার করা হল। এদিকে তাঁর ভাই ভবানীদত্ত টাকা সংগ্রহ করছিলেন। এরই মধ্যে মনসারামের ওপর হুকুম হল, যে এক সপ্তাহের মধ্যে যদি টাকা না পাওয়া যায় তবে তাঁকে গরুর টাটকা চামড়া গায়ে জড়াতে হবে। এই সময়সীমার দুদিন আগেই তিনি বিষ খেয়ে দেহত্যাগ করেন। ভবানীদত্ত টাকা নিয়ে বরাবাঁকী পৌঁছলেন। কিন্তু ভাইয়ের মৃত্যুর খবর শুনে দুঃখ সহ্য করতে না পারায় সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়, যে যেমন পারল তাঁর টাকা লুটে নিল।

মনসারামের টাকা নিজের নামে জমা করে শোভামণি উপাধ্যায় স্বয়ং চাকলাদার হলেন। এক লাখ টাকার বিনিময়ে মনসারামের বাড়ি থেকে স্ত্রীলোকদের নিয়ে এসো, এই বলে নবাব লক্ষ্ণৌ থেকে সৈনিক পাঠালেন। মনসারামের কাকার প্রপৌত্র অযোধ্যাপ্রসাদ[১] ও ত্রিভুবন দত্তের কাছে তা অসহ্য মনে হল। বাড়ির স্ত্রীলোকদের তাঁরা আত্মীয় স্বজনদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। মনসারামের চার ভাইয়েরই মৃত্যু হয়েছিল। এখন তাদের ভাইপো রামপ্রসাদ ও ফরিয়াদির বাচ্চা বেঁচেছিল। অযোধ্যা-প্রসাদ-ত্রিভুবন দত্ত লাখ টাকা ঋণ স্বীকার করে নিজেদের ফৌজের হাতে সমর্পণ করেন। দুই ভাইকেই ধরে লখনৌ নিয়ে গেল। তাঁদের ওপর বাঁশের বাখারির মার পড়ছিল, তবু তাঁদের এই পরিতৃপ্তি ছিল যে তাঁরা কুলের লজ্জা নিবারণে সফল হয়েছেন। অমেঠীর নেত্রানন্দের বংশধর এক জ্যোতিষী—যাঁকে গোঁসাইবাবা বলে লোকে স্মরণ করত—নিজবংশের এই দুই যুবকের দুঃখময় কাহিনী জানতে পারেন। তিনি নবাবের দরবারে যান এবং জ্যোতিষের এক অলৌকিক ক্রিয়া দেখান। নবাব অত্যন্ত প্রসন্ন হন। গোঁসাই বাবা তাঁর বংশের এই দুই যুবকের মুক্তি ভিক্ষা চান। নবাবের মাথা ব্যথা হলে পাঁচ কয়েদিকে ছেড়ে দেওয়ার নিয়ম ছিল। সেই উপলক্ষ্যে নৌআ-ডুমরীর বাসিন্দা নবাবের খাস খিদ্‌মদগারের চালাকিতে অযোধ্যাপ্রসাদরা দুই ভাই আগেই ছাড়া পেয়েছিলেন। অতএব নবাব যখন আবার কিছু দেবার জন্য আগ্রহ করতে লাগলেন, তখন গোঁসাইবাবা শুধু এইটুকু চাইলেন যে বাগানের জন্য যেন খাজনা না লাগে। জানি না এই বরদান সারা অযোধ্যা রাজ্যের জন্য ছিল, না শুধু গোরখপুর জেলার জন্য। গোঁসাইবাবাকে নবাব তার নিজের বাগানের আম পাঠিয়েছিলেন। অযোধ্যাপ্রসাদ-ত্রিভুবনদত্তও তার কিছু পেয়েছিলেন। তাঁরা আম খেয়ে আঁটি পুতে দেন।

অযোধ্যাপ্রসাদরা দুই ভাই এরকম শ্রীহীন, বৈভবহীন হয়ে মলাঁও ফিরে যেতে চাননি, আর তাঁরা লখনৌতেই পড়ে রইলেন। আম খেয়ে তাঁরা যে আঁটি পুঁতেছিলেন, তা গাছ হয়ে যখন ফল

১. জন্ম, বৈশাখ শুক্ল একাদশী ভৃগুবাসর ১৮১১ সংবৎ (অযোধ্যাপ্রসাদের জন্মপত্রিকা, শ্রীজগদীশ নারায়ণের কাছে আছে)।

দিল, তখন তাঁরা সেই আম নবাবকে ভেট দিলেন। নবাবের ভ্রম হল যে এই আম তাঁর বাগান থেকে চুরি করা হয়েছে, কেননা এমন আম আর অন্য কোনো বাগানে ছিলনা। দুই ভাইকে আবার ধরে আনা হল। জিগ্যেস করে জানা গেল যে তারা অত দিন থেকে লখনৌতেই পড়ে আছে, আর ভিখিরি হয়ে তাঁরা মর্লাও ফিরে যেতে চাননা। এরপর নবাব ১২শো টাকার মালগুজারী জমি লাখেরাজ করে লিখে দিলেন। কথিত আছে, অযোধ্যাপ্রসাদ এতে আর একটা শূন্য যোগ করে ১২ হাজার টাকা করিয়ে নিলেন, যা দিয়ে ৩৬ হাজার বিঘা জমি পাওয়া গেল। এই লাখেরাজ জমির মধ্যে অমিয়ার ইত্যাদি গ্রাম ছিল।

চাকলাদার শোভামণি উপাধ্যায়ের অত্যাচারে লোক হয়রান হয়ে গিয়েছিল। এব্যাপারে বিচার বিবেচনার জন্য ব্রাহ্মণ ও রাজপুতদের একটা গুপ্ত সভা হয়। স্থির হল শোভাকে একেবারে খতম না করে দিলে তার হাত থেকে মানুষের মুক্তি হবে না। খুটহনার সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয় বীরেন্দ্র সিংহ একটি শর্তে শোভাকে বধ করার দায়িত্ব নিতে রাজী হলেন, যে তাঁর যেন ব্রহ্মহত্যার দোষ না লাগে। ব্রাহ্মণেরা তার দায়িত্ব নিলেন। রাত্রিতে শোভামণির পুত্র বেণীদত্তের বেশে বীরেন্দ্র শোভামণির মহলে ঢুকলো। শত্রুকে ঘুম থেকে জাগালো। শোভা বললেন—"আমি তোমার গাই।" বীরেন্দ্র জবাব দিলেন—"আমি তোমার বাঘ"। তারপর তাঁর মাথা কেটে ব্রাহ্মণদের সভার সামনে উপস্থিত করলেন। সব ব্রাহ্মণ বীরেন্দ্র সিংহের হাত থেকে ছোলা নিয়ে খেলেন এবং তাঁকে ব্রহ্মহত্যার মহাপাতক থেকে মুক্ত করে দিলেন।

অযোধ্যাপ্রসাদ-ত্রিভুবন দত্ত আবার রুদ্রপুরে দেওয়ান হলেন এবং তাঁদের "শাহ্ আলম বাদশাহগাজী (র) জংগয়ার বফাদার সিপহসালার রুস্তমেগঞ্জ শুজাউদ্দৌলা রাহিয়া খাঁ অসফউদ্দৌলা··· ১১৯৫ (হিজরীতে)··· এতমাদুদ্দৌলা আসফজাহ, মদারুলমহাম, বজীরুলমালিক"[১] গোরখপুরের চাকলাদারী দিলেন। রুদ্রপুরের মহারাজ পহলবান সিংহ তাদের খুব স্নেহ করতেন। দরবারের অনেক লোক পাণ্ডে-বন্ধুদের অত্যন্ত ঈর্ষা করত। তারা ষড়যন্ত্র করে রাজার দেওয়ানকে বেলীপার, কৌড়ীরাম, ধসকা, কর্ণপুরা, দাঢ়া, কোনো, সেমরৌনা, ভিসওয়া গ্রাম পাইয়ে দেয়। এই সব গ্রামের মধ্যে বেলীপার, কৌড়ীরাম প্রথম থেকেই রুদ্রপুর বংশজ পাণ্ডেপারের বাবুরা 'জীবিকা' হিসেবে পেয়েছিলেন। তাঁরা দেওয়ানকে তাঁদের জীবিকা এই দুই গ্রামকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনেক মিনতি করলেন, কিন্তু দেওয়ান সাহেব তাতে কান দিলেন না, জোর করে গ্রামগুলি দখল করে নিলেন। জীবিকা চলে গেলে বেঁচে থাকা ভার, একথা ভেবে পাণ্ডেপারের বাবুরা প্রাণ বাজী রাখার প্রতিজ্ঞা করলেন। অযোধ্যাপ্রসাদ ও ত্রিভুবনদত্তের পরস্পরের প্রতি অসাধারণ ভালবাসা ছিল। দুই ভাই একে অন্যের থেকে আলাদা থাকতে পারতেন না। নবাবের কাছ থেকে দুই ভাইয়ের নামেই ফরমান[১] করিয়েছিলেন। দুজনে একই খাটিয়ায় ঘুমোতেন। পাণ্ডেপারের বাবুরা তক্কে তক্কে ছিলেন। গোরখপুরে নিজেদের বাড়িতে দুই ভাই যখন এক খাটিয়ায় ঘুমিয়েছিলেন, সেই সময় তাঁরা গিয়ে তাঁদের কেটে ফেলেন।

অযোধ্যাপ্রসাদ-ত্রিভুবন দত্ত সরকারী কাগজে মর্লাওকে নিজের নামে লিখিয়েছিলেন। জিগ্যেস করলে বলেছিলেন "কাগজে নাম না থাকলে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। মর্লাও যেমন আমরা আমরা লাখেরাজ পেয়েছিলাম, তেমনি আমার তরফ থেকে ভাইয়েরা লাখেরাজ পাবে।

অযোধ্যাপ্রসাদ ত্রিভুবনদত্তের মৃত্যু হল। লখনৌর নবাবের রাজ্যও উঠে গেল। রাজ্যভার নিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। জমির বন্দোবস্ত হতে লাগল। কোম্পানীর সরকার মর্লাও-এর ওপর খাজনা বসাতে লাগল। রামসেবক অনেক চেষ্টা চরিত্র করলেন। ৫০০্ টাকা ও ১০ কলসি ঘি

১· ১১৯৮ হিজরীতে লিখিত নবাবী ফরমান—যা দেওয়ান অযোধ্যাপ্রসাদ পাণ্ডের প্রপৌত্র শ্রীজগদীশনারায়ণ সেবকের কাছে আছে।

নিয়ে লাখেরাজ লিখে বন্দোবস্ত করে দিতে বড় অফিসার প্রস্তুত ছিলেন। রামসেবক খুড়তুতো ভাই হরিসেবককে (ত্রিভুবন দত্তের পুত্র) বললেন। তাঁর বুদ্ধি সর্বদাই বিপরীত হত। তিনি রাজী হলেন না। লাখেরাজ রইল না। মলাঁও-এর ওপর খাজনা বসল।

এখনো মলাঁও অযোধ্যা প্রসাদ ও ত্রিভুবনদত্তের ছেলেদের নামে থাকল। গ্রামের পাণ্ডেরা নিজেদের ভাগ অনুযায়ী জমি খাজনা না দিয়ে চাষ করত। হরিসেবক দুবৌলির ভূমিহার ব্রাহ্মণ সুবুদ্ধ রায়ের কাছ থেকে ৪০০০৲ টাকা ঋণ নিলেন। হরিসেবকের একই রকম অদ্ভুত চাল ছিল, তিনি ধার শোধ করবেন কেন সুবুদ্ধরায় এই ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে যদি পাণ্ডেজী এসে আমাকে গুরু মন্ত্র দেন, তবে তাঁকে এই টাকা আমি ভেট দেব। হরিসেবক যাননি। সুবুদ্ধরায়কে রোগে ধরল, যদি পাণ্ডেজী এসে দর্শন দেন, তাহলেও আমি টাকা ছেড়ে দেব। হরিসেবক তবুও গেলেন না। সুবুদ্ধ রায় মরার সময় বলে গেলেন—যদি মৃত্যুর পর পাণ্ডেজী খোঁজ খবর নিতে আসেন তাহলেও টাকা ছেড়ে দিও, নয়তো নালিশ করে টাকা উশুল করবে। হরিসেবক এখনও গেলেন না।

মহাজন নালিশ করে হরিসেবকের অর্দ্ধেক অংশ নিলাম করালেন। কটয়ার শ্রী উগ্রদত্ত ভৈরবদত্ত (দেওয়ান যোগমণি পাণ্ডের বংশধর) পূর্বজদের সম্পত্তি মনে করে তা কিনে নিলেন। গ্রামের অন্য লোকেরা এ নিয়ে লড়াই করতে পারল না, রামলাল ও মথুরা পাণ্ডে আগ্রা হাইকোর্ট পর্যন্ত লড়াই করছিলেন, আর আদালত থেকে তাঁদের নিজেদের ভাগ পেয়ে গেলেন। তাঁরা তাঁদের অর্ধেক ভাগ কটয়া—অলাদের দিয়ে অর্ধেক ভাগ নিজেদের নামে লেখালেন।

কুলপতি পাণ্ডের দ্বিতীয় পুত্র ঘনশ্যামের প্রপ্রপৌত্র খুব অধ্যবশায়ী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একটা খুব বড় জঙ্গল কিনলেন। তাঁর ছেলে শ্রী সূর্যনারায়ণ ঐশ্বর্য আরো বাড়ালেন, এবং কটয়া-অলাদের যে হিস্যা কিনে নেওয়া হয়েছিল, তাও ফিরিয়ে দিলেন।

ষোড়শ শতকের উত্তরার্ধের অহিরুদ্র পাণ্ডের সন্তান আজ শুধু মলাঁওয়েই একশ ঘরের বেশী হয়েছে তাই নয়, তাঁরা অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। বৈকুণ্ঠপুর (দেওরিয়া), পকর্ডিয়ার, ফর্দহা, ডাঙ্গীপার, ভিলৌরা, নাউরদেউর, কটয়া, নউয়া, নদুয়া, কসিয়ার, রুদ্রপুর ইত্যাদি গ্রাম সবই গোরখপুর জেলায়, যেখানে মলাঁও-এর সাংকৃত্য বংশধররা বাস করে। আজমগড়ে বিক্রমপুর (ঘোসী), চকরানপুর, কনৈলা, বড়ৌরা, টাড়ী, দিলনপুর, ডীহা, জলালপুর ইত্যাদি গ্রামেও তাঁদের পাওয়া যায়। পতুলকী আর বৃন্দাবন (প্রয়াগ), বিজয় মউ (প্রতাপ গড়), মথুরা শহর এবং আরো অনেক জায়গা আছে যেখানে অহিরুদ্র পাণ্ডের বংশধারা এখনো থাকেন। পাহাড়ী (প্রয়াগ) ইত্যাদি জায়গাগতে প্রথম দিকের পরম্পরার অনেক ঘর[১] আছে।

৩। রামশরণ পাঠক[২] (দাদু)

ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান শাসনের পতন শুরু হয়, কিন্তু এই ছিল সময় যখন মুঘলদের দৃঢ় শাসনের ফলস্বরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জনসংখ্যা নতুন নতুন গ্রাম ও বসতি পত্তন করতে শুরু করে। পাঠকজীর পূর্বজও এইভাবে আঠেরো শতকের প্রথম পাদে পন্দহা গ্রামে এসে বসবাস করতে শুরু করে। এসময়ে পন্দহার আশেপাশে ঘন জঙ্গল ছিল যাতে প্রচুর নেকড়ে বাঘ থাকত। পশ্চিমদিকে এক পুরনো বিশাল দীঘি ছিল। তাতে একটা ছোট দ্বীপ ছিল। হয়তো পাঠকের পূর্বজরাই এর নাম রেখেছিল মহামাই। এই দীঘির পশ্চিম তীরে বসই নামে ছোট গ্রাম ছিল, যেখানে খানদানী সৈয়দ, কারিগর, জোলা এবং মেহনতী কোইরী লোক থাকত যারা শাকসব্জী

১· সাংকৃত্য গোত্রী চৌবে আছে ভৌআপার, নগয়া, উনওয়ালী, দেউগর, সরসৈয়া, তেলিয়াডীহ ইত্যাদি জায়গায় এবং এই গোত্রের তিওয়ারী আছে বারীডিহ, বিসুহিয়া, নয়পুরা, সরয়াতে।

২· এখানে প্রদত্ত তারিখগুলি সন্দেহপূর্ণ

ফলাত। এখানকার অনেক ইট-চুনের গাথা কবর থেকে বোঝা যেত যে এই স্থান খুব সমৃদ্ধিশালী ছিল। পন্দহার উত্তর দিকেও পুরনো বসতির কিছু চিহ্ন ছিল। জিগোস করলে বলত—এখানে একসময় সিউরীরা থাকত যারা এই জায়গা থেকে উজাড় হয়ে দূর দেশে চলে যায়, এখনো তাদের বংশধরেরা কখনো কখনো দূর দেশ থেকে এসে রাত্রিতে সংকেত লিপির সাহায্যে তাদের পূর্বপুরুষের সঞ্চিত ধনরাশির খোঁজ-খবর করে।

সওয়া শো বছর আগে তাঁর প্রথম পূর্বপুরুষের পঞ্চম প্রজন্মে (১৮৪৪ খ্রীঃ) রামশরণ পাঠকের জন্ম হয়। তখন চারদিকেই ইংরেজের রাজ্য। পন্দহার এক ঘর ব্রাহ্মণ ১৭ ঘর হয়ে গিয়েছিল, তাদের সঙ্গে যে আহীর ও চামারেরা এসেছিল, তারাও অনেক ঘর হয়ে গিয়েছিল। যদিও এখন জঙ্গল কেটে অনেক চাষবাসের খেত করা হয়েছিল, তবু আশেপাশে যে জঙ্গল ছিল তাতে নেকড়ে বাঘ থাকতে পারত। তাঁর পিতার তিন পুত্রের মধ্যে (শিবনন্দন বড়, রামবরণ ছোট) রামশরণ পাঠক ছিলেন মেজ। তিন ভাইয়ের মধ্যে পাঠক ফর্সা কম ছিলেন, যদিও তাঁর রঙ গমের চেয়ে বেশী সাফ ছিল। তিনি ভাই-ই বিশালকায়। এঁদের মধ্যে পাঠকের শরীরের গঠন খুবই মজবুত ছিল। পাঠকের পিতার চাষবাসের জন্য যা প্রয়োজন, তার চেয়েও বেশী গরুমোষ ছিল। ছেলেবেলায় পাঠক তা চরানোর কাজ পেয়েছিলেন। ১২-১৩ বছর বয়সেই মা-বাবা তাঁর বিয়ে দিয়ে দেন। পাঠক গরু-মোষ চরানোতেই মশগুল হয়ে থাকতেন। ঘরে দুধ-ঘিয়ের প্রাচুর্য ছিল। যৌবনে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেহে শিরায়-উপশিরায় অসাধারণ শক্তির ঝলক দেখা দিতে লাগল। কুস্তীর দিকে ছেলের রুচি দেখে বাবা সেই সময়ের রেওয়াজ অনুযায়ী বর্ষায় কুস্তী-কসরত শেখানোর জন্য এক নট রেখেছিলেন। তিন মাসের পর সেই নটকে পুরস্কার হিসেবে একটা মোষ দেওয়া হল। পাঠক আরো কয়েকটা বর্ষা আখড়ায় কাটালেন।

* * *

পন্দহার কোনো লোক চাকরি করতে জেলার বাইরে গেছে বলে আমি জানি না। শুধু তাই নয়, আশেপাশের গ্রাম থেকেও হয়তো কদাচিৎ কেউ প্রদেশের বাইরে পা রেখে থাকবে। পাঠকের গোচারণের পাঠশালায় ভূ-পর্যটনের জ্ঞানভাণ্ডার খোলা থাকার কোনো সম্ভাবনা ছিল না; তবু কোনোখান থেকে পাঠকের গায়ে অবশ্যই হাওয়া লেগেছিল। পাঠকের ১৮ বছর বয়সেই তাঁর বাবা কোনো জায়গায় যে দেড়শো টাকা রেখেছিলেন, তা নিয়ে ১৮৬২-তে পাঠক তেমনি চম্পট দিয়েছিলেন, যেমন তাঁর টাকা নিয়ে ৪৬ বছর পরে পালিয়েছিল তাঁর নাতি। উত্তর প্রদেশের এই পূর্ব সীমান্ত থেকে সুদূর দক্ষিণ হায়দ্রাবাদে এখনো হয়তো রেলপথ হয়নি। বিদেশ যাই, ঘর ছাড়ার সময় হয়তো শুধু এই কথাই তাঁর মনে ছিল। গিয়ে হায়দ্রাবাদের জালনা শহরে ইংরেজ পলটনে চাকরি করবেন, এই রকম কোনো ভাবনাই তাঁর ছিল না। কিন্তু পথের সঙ্গীদের জন্যে আখেরে তিনি একদিন জালনা পৌঁছে গেলেন। সেখানে সেই সময় এক পূর্বী ফৌজ ছিল যাতে পাঠকের জেলার অনেক রাজপুত সেপাই ছিল; পলটনের সুবাদার-মেজর রামুসিংহও তার নিজের জেলারই ছিলেন।

পাঠকও আখড়ায় গেলেন। আজ কিছু বিশেষ জমজমাট ছিল। কুস্তী দেখার জন্য পলটনের অফিসাররাও চেয়ারে বসে ছিলেন। পাঠকও কুস্তী লড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তিনি লড়লেন সবচেয়ে জোয়ান লোকের সঙ্গে। ১৮-১৯ বছরের নবীন যুবকের তুলনায় সেই লোকটিকে খুব বেশী শক্তিশালী মনে হচ্ছিল। তাই লোকজনের সন্দেহ ছিল। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই পাঠক তাকে চিৎ করে দেয়। কর্নেল সাহেব লাফিয়ে গিয়ে যুবকের পিঠ চাপড়ে দেন। কিছু পুরস্কারও দেন। তার চেয়েও বড় কথা হল এই যে, কর্নেল সাহেব স্বয়ং সুবেদার-মেজরকে বলে

সেই দিনই পাঠককে ফৌজে ভর্তি করিয়ে দিলেন। পাঠক পুরস্কারের টাকা ও নিজের টাকা থেকে একশো টাকা সুবেদার-মেজরের হাতে দিয়ে বললেন—আমি আশরফির একটা কণ্ঠি পরতে চাই। সেই দিনই সেই টাকা জালনার মারোয়াড়ী শেঠের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল আর দু-তিন দিন পরেই সাত মোহরের একটা কণ্ঠি পাঠকের গলায় দেখা গেল।

পাঠক শরীরে যেমন বলবান ছিলেন, তাঁর টিপও তেমনি অব্যর্থ দেখা গেল। প্যারেডের নিয়মকানুন শিখে নেওয়ার পর সাহেব তাঁকে নিজের আর্দালি নিয়োগ করলেন। পলটনের অফিসারদের সর্বদা তেমন কিছু কাজ থাকে না। শীতে সাহেব বাহাদুর কখনো হায়দ্রাবাদের জঙ্গলে, কখনো মালওয়া ও নাগপুরের বনে শিকার করে বেড়াতেন। পাঠকও তাঁর সঙ্গে থাকতেন। সাহেব অনেক বাঘ মারতেন, পাঠকের মারা অনেক বাঘও সাহেবের নাম লেখা হত। তবে বাঘ মারার সরকারী পুরস্কার ও তার চামড়ার দাম এবং তার ওপর সাহেবের দেওয়া কিছু পুরস্কারও পাঠক পেতেন।

এইসব শিকার-যাত্রার কাহিনী বৃদ্ধ পাঠক অনেক রাত পর্যন্ত তাঁর সহানুভূতিশীল ধর্মপত্নীকে শোনাতেন। সেই সময় তাঁর পাশে বসা অথবা কোলে শোয়া তাঁর সাত-আট বছরের নীতি বিস্মিত হয়ে সেই কাহিনী শুনত। কামঠী, ধুলিয়া, অমরাবতী, নাসিকের ধারণা সেই সময়ে সেই বাচ্চার না হলেও পরে এই সব স্থান তাক ভূগোল ও মানচিত্র পড়তে খুব উৎসাহিত করেছিল। পাঠক বলতেন—ঐদিকে পাহাড়ে 'বিসকর্মা'র (বিশ্বকর্মা) হাতে তৈরী বড় বড় মহল আছে যা পাহাড় কেটে বানানো হয়েছে। বিসকর্মা তো তা বানিয়েছিলেন দেবতাদের জন্য, কিন্তু দেবতারা আসতে আসতে অসুররা সেখানে তাদের বাসস্থান বানিয়ে নিল। দেবতাদের খবর দিয়ে বিসকর্মা ফিরে এসে দেখেন যে চারদিকে বোতলের টুংটাং হচ্ছে। বিস্কর্মা শাপ দিলেন—যাও তোমরা সব পাথর হয়ে যাও। পাঠক বড় গম্ভীরভাবে স্ত্রীকে বলতেন—আজও সেই রাক্ষসগুলি হয় হাতে বোতল ধরে আছে অথবা তাথৈ তাথৈ নাচছে অথবা হাতে-মুখে ভঙ্গি করছে, দেখা যায়। দেখে বোঝাই যায় না যে তারা পাথর হয়ে গেছে।

পাঠক এভাবেই শীতে সাহেবের সঙ্গে শিকারে যেতেন, গরমে শিমলায় ও ঠাণ্ডা পাহাড়ে মৌজ করে থাকতেন। তাঁর চাকরির দশ বছর পেরিয়ে যায়। এরই মধ্যে তাঁর সাথী অনেকে তো তারই সুপারিশে—উন্নতি করে নায়ক ও জমাদার হয়ে যায়। কিন্তু নিজের উন্নতির কোনো ইচ্ছা ছিল না তাঁর এবং সাহেবও তা করতে চান নি।

বিগত সাত-আট বছরে এক আধটা চিঠি অবশ্যই দিতেন পাঠক, কিন্তু তাতে বাড়ি ফেরার কোনো উল্লেখও থাকত না। 'উড়ন্ত পাখিরা' তাঁর বাড়িতে খবর দিয়েছিল যে পাঠক সেখানেই স্ত্রী রেখেছে। বস্তুত তিনি তা করেছিলেনও। জালনাতে এমনও অনেক ঘর ছিল যেখানে পূরবিয়া সেপাইদের মারাঠী স্ত্রীজাত সন্তান ছিল। এমনি এক পরিবারের একটি স্ত্রীলোক তাঁর চিররক্ষিতা হয়ে গিয়েছিল। তার গর্ভে একটি ছেলেও হয়েছিল তাঁর । পাঠক তার জন্য বাড়িও তৈরী করে দিয়েছিলেন। হয়তো পাঠকের সেই পুত্র অথবা তার সন্তান এখনো জালনাতে আছে (যদি জালনার ইংরেজ ছাউনী উঠে যাওয়ায় তারা অন্যত্র না চলে গিয়ে থাকে)। আট-নয় বছর কেটে গেল। পাঠকের বাবা মারা গেলেন। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর ভাইদের ব্যবহার বিশেষ ভাল ছিল না। তাঁর স্ত্রী নিজের ভাইকে হায়দরাবাদ পাঠালেন। পাঠক স্বয়ং ফিরে গেলেন না কিন্তু শালার সঙ্গে স্ত্রীর জন্য কিছু টাকা পাঠালেন। শালা সেই টাকা তাঁর দুঃখিনী বোনকে দেওয়া পছন্দ করেনি।

৩-৪ বছর আরো কেটে যায়। এরই মধ্যে পাঠক দিল্লি দরবারও হয়ে আসেন। এখন তাঁর জীবনস্রোত এভাবেই কাটছিল। বলজোর ও দওয়ন-এই দুই রাজপুত নওজোয়ানের প্রতি তাঁর সহোদর ভাইয়ের চেয়েও বেশী ভালবাসা ছিল। সত্যকথা বললে বলতে হয় এসময় জালনা

তাঁর নিজের বাড়ির চেয়ে কম ছিল না। পন্দহার কথা তাঁর মনে পড়বে কেন? কিন্তু একদিন পাঠককে কেউ সুবেদার রম্মু সিংহের কথা শোনায়। সে কয়েক বছর আগে পেনসন নিয়ে বাড়ি চলে গিয়েছিল। রম্মুসিংহ যতদিন পলটনে কাজ করেছে ততদিন সে দুয়েকবার কিছুকালের জন্য বাড়ি গিয়েছিল অথবা হয়তো যায়ইনি। পেনসনের পরে এক বাক্সভর্তি আশরফি (মোহর) নিয়ে বাড়ি যায়। তাঁর স্ত্রী ততদিনে বুড়ী হয়ে গেছে। বুড়ো সুবেদার মেজর আশরফির বাক্স তার সামনে খুলে দেয়। তার ধারণা ছিল, এতে স্ত্রী খুব খুশী হবে। কিন্তু সে কত খুশী হয়েছিল তা বোঝা গেল যখন সুবেদার-মেজর জল চাওয়ায় এই উত্তর মিলল—'ঐ আশরফির কাছ থেকে নাও। তুমি তো সারাজীবন আশরফিই জন্মিয়েছে, জল দেওয়ার লোকতো জন্মাওনি।' বেচারা সুবেদারের যে কেমন লাগল তা তো জানা নেই; কিন্তু পাঠকের ওপর এই কথার বিশেষ প্রভাব পড়ল। তার ফলশ্রুতি হল এই যে কয়েকদিন পরেই কারো কথা না শুনে ফৌজ থেকে নাম কাটিয়ে তিনি বাড়ির উদ্দেশে রওনা হয়ে যান।

* * *

ঘরে ফিরে আসায় সবচেয়ে বেশী খুশী হওয়ার কথা ছিল পাঠকের স্ত্রীর (জগরানীর)। যদি তাঁর ভাইদের কাছে মাঝে মাঝে কিছু টাকা-পয়সা আসত, তবে নিঃসন্দেহে পাঠকের স্ত্রীর এতটা উপেক্ষা হত না। পাঠকের স্ত্রীর এক বড় গুণ ছিল এই যে তিনি ঝগড়াঝাঁটি পছন্দ করতেন না কিন্তু তারই ফলে তিনি অপরের প্রতিকূল আচরণ মনে রেখে দিতেন। কড়া কথা বলে এমন লোকদের ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায় যে তারা কারো দুর্ব্যবহারকে তৎক্ষণাৎ মুখ থেকে বের করে দিয়ে ভেতরে ও বাইরে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। পাঠকের স্ত্রী বেচারীর এই গুণ অথবা বদগুণ ছিল না, তিনি বার বছরের উপেক্ষা, বিদ্রুপ সব কিছু মনে রেখে দিয়েছিলেন। পাঠক আসার পর সেই লেখা একের পর এক খুলতে লাগল। তার ফল এই হল যে, অল্পকাল পরেই পাঠক ভাইদের থেকে আলাদা হয়ে যান।

এখন তিনি তাঁর ঘরকে নিজের রুচি অনুযায়ী বানাতে চাইলেন। প্রথম তিনি বাড়ির সামনে পাকা কূয়া এবং থাকার জন্য পাকা বাড়ি বানালেন। নিজের আঁখ অন্যের ঘানিতে পিষতে যাবেন তা পাঠকের ভাল লাগত না। অতএব তিনি চুনার গিয়ে একটা পাথরের ঘানি নিয়ে এলেন। ঘানিটা বাড়ির সামনেই পুঁতে তিনি কলুদের জন্য দুটো ঘরও তৈরী করিয়ে দিলেন। তাঁর কাছে পৈত্রিক চাষের জমি দু-বিঘার বেশি ছিল না। কিছুদিন পরে তাঁদের এক নিকট আত্মীয় (মহাবীর পাঠক) তিনভাইকে বললেন—'আমার টাকার দরকার। তোমরা আমার হিস্যার এতটা জমি নিয়ে নাও, নয়তো আমি অন্যকে বিক্রি করে দেব। তিনভাই মিলে খেত তো নিজের নামে লিখিয়ে নিলেন, কিন্তু ছোট ভাই দাম দিতে পারল না। পাঠক সেই জমিও নিয়ে নিলেন। এভাবে পাঠকের হাতে এখন পাঁচ বিঘার (তিন একর থেকে কিছু বেশি) মত জমি হয়ে গেল। ঘরে মাত্র দুটি প্রাণী। একটা ছেলে হল, কিন্তু অল্পকাল পরে সে মারা গেল। ১৮৭৬-এর কাছাকাছি পাঠকের এক মেয়ে কুলওয়ন্তরী জন্ম হল। কুলওয়ন্তী তাঁর শেষ ও একমাত্র জীবিত সন্তান। ঘরে তাঁর ছেলের মতো আহ্লাদে প্রতিপালিত হয়েছিল সে এবং তাই স্বাভাবিক ছিল। ৯-১০ বছর হওয়ার পর মেয়ের বিয়ে দেওয়া হল ১০ মাইল দূরে কনৈলা গ্রামে। মেয়ে বেশীর ভাগ বাপের বাড়িতেই থাকত, শ্বশুরবাড়ি যাওয়ারপর মায়ের লোক দু-সপ্তাহ পরপরই কিছু নিয়ে গিয়ে হাজির হত। ১৮৯৩-এ মেয়ের এক ছেলে হল। নাতির জন্ম হওয়ায় পাঠক ও পাঠকের স্ত্রী দুজনেরই অপার আনন্দ হল। নাতির (কেদারনাথ) যখন মার কাছ থেকে আলাদা থাকার বয়স হল, তখন সে দাদুর হয়ে গেল। এখন মেয়ের ওপর যে ভালবাসা ছিল তা বর্তালো নাতির ওপর, তার ফলে এখন বেশী সময় শ্বশুরবাড়ি থাকার অনুমতি পেল মেয়ে।

পাঠকের বড় ভাইয়ের পাঁচ ছেলে ও ছোট ভাইয়ের দুই ছেলে ছিল। যে সামান্য জমি ছিল

তাতে বড় ভাইয়ের বড় পরিবারের দিন কাটানো কঠিন ছিল। তারা দেখছিল, যে উত্তরাধিকার তাদের পাওয়ার কথা তার জন্য নাতিকে তৈরী করা হচ্ছে। এর পরিণাম হল এই যে দুই পরিবারে মন কষাকষি চলতে লাগল। মনে জ্বলন তো ছিলই, সামান্য সুযোগ পেতেই আগুন জ্বলে উঠত, কিছু গালিগালাজ হত এবং তারপর তিন-চার মাস দু-পক্ষেরই গাল ফুলে থাকত।

তিনি পলটনের সেপাই ছিলেন। তাই পাঠক নিজের হাতে কাজ করা পছন্দ করতেন না। ঘরে দুধ দেওয়ার একটা মোষ তিনি অবশ্যই রাখতেন। অনেক পশুপালনের সখ ছিল না তাঁর, শুধু দুটো বলদ ও একটা মোষ রাখতেন। দুধ ও মোষ ছাড়া তাঁর কাজ চলত না। আগে মাছ মাংসও খুব খেতে ভালবাসতেন; কিন্তু পরে বংশগুরু ও স্ত্রী বারবার বলায় বাধ্য হয়ে বেচারী একশো এগার নম্বর-অলা ধর্মের চেলা হয়ে যান। কাঠের একটি কণ্ঠি তাঁর গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হল আর পাঠককে তাঁর প্রিয় খাদ্য থেকে বঞ্চিত হতে হল। তবুও তাঁর নাতি যখন পান-ভোজন করতে শুরু করল তখন কণ্ঠিপরা বৈষ্ণব হয়ে কোথাও মাছ পাওয়া গেলে নাতির জন্য না এনে থাকতে পারতেন না। জ্যান্ত মাছ তো চার-চার পাঁচ-পাঁচ সের এনে বড় গামলায় জিইয়ে রাখতেন, যা নাতি বার করে করে ভাজত, রান্না করত। দাদু-দিদিমার রান্নার পদ্ধতি বলে দিতে এবং হলুদ মশলা বেঁটে দিতেও কোনো দ্বিধা থাকত না। -

পাঠকের অল্প জমিও তাঁর পরিমিত প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট ছিল। খেত থেকে শস্য ও মোষের দুধ-ঘি পেতেন তিনি। ঘরের কাজকর্মও খুব কম ছিল। বাইরের কাজ তাঁর চাষী অথবা অন্য কেউ করে দিত। ঘরের কাজ করত তাঁর স্ত্রী। ব্যাস, পাঠকের খাওয়া, ঘুমনো ও সবচেয়ে বড় কাজ ছিল আড্ডা দেওয়া। এ সময়ে পন্দহার কোনো বাগানে, ঘানি-ঘরে বা খামারে যদি আপনি পাঁচ-সাত জন লোকের মধ্যে একজন মোটা, সতেজ মধ্যবয়স্ক লোককে পায়ে ও কোমরে গামছা বেঁধে চেয়ারের মত হয়ে বসে কথা বলতে দেখতেন তবে ধরতে পারতেন তিনি পাঠক মহাশয়। যদিও তিনি বার-তের বছরে অনেক দেশ ও লোক দেখেছিলেন, তবু সেই সব কথা অত লোককে যদি রোজ দু-তিন ঘণ্টা করে বলা যায়, তবে তা কতদিন আর নতুন থাকতে পারে? ফলত কিছু শ্রোতা তো পাঠকের কথা শুরু হতেই বলে দিত—হ্যাঁ, এতো হিংগৌলী-ছাউনীর পালোয়ানের কথা। তাও পাঠক এমন লোক ছিলেন না যিনি শ্রোতার অনিচ্ছার জন্য তাঁর কথা বন্ধ করবেন।

পন্দহাতে সরস্বতীর কদর ছিল না। পাঠকের ছোট ভাইপো রামদীন প্রাইমারী পর্যন্ত পড়েছিলেন কিন্তু তাঁর নাতিই ছিল প্রথম লোক যে মিড্‌ল পাস করল। পাঠক নিজে লেখাপড়া না জানলেও বিদ্যা থেকে যে লাভ হয় তা জানতেন। অতএব নাতির বয়স যখন মাত্র পাঁচ বছর, তখন কাছাকাছি রানীকিসরাইয়ের স্কুলে তাকে পড়াশোনা করতে পাঠান। তিনি বলতেন—আর কিছু না হোক বসতে তো শিখবে। পাঠকের পিসতুতো ভাই সাব-জজ হয়ে মারা গিয়েছিলেন। সেই ধারণা থেকে তিনি তাঁর স্ত্রীকে বলতেন—আগে মিড্‌ল পাস করতে দাও—তারপর আমি একদিন গিয়ে পাদ্রী সাহেবকে এমন জঙ্গী সেলাম দেব যে ছেলেকে ইংরেজী স্কুলে ভর্তি করিয়ে তবে ছাড়ব। এ ব্যাপারে পাঠক আরো বড় বড় পরিকল্পনা করার উৎসাহ পেতেন এই জন্য যে তাঁর নাতি পাঠশালায় তার শ্রেণীতে বরাবর প্রথম হত।

* * *

পাঠক নাতিকে তার সুখের জন্যই এমন স্নেহে লালন-পালন করেছিলেন, কিন্তু এই ভালবাসা তাঁর জীবন সন্ধ্যাকে দুঃখের অন্ধকারে পূর্ণ করেছিল। বস্তুত, যদি পাঠকের মন নিজের মতো চলতে পারত, তাহলে তিনি তাঁর ভাইপোদেরকে শত্রু করে তুলতেন না। ভাইদের প্রতি তিনি সর্বদা স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করতেন। যখন পরিমণ্ডল একেবারে তিক্ত হয়ে যেত, তখনো

ওপরের স্তর থেকে কিছুটা ভেতরে পাঠকের হৃদয় ভাইদের জন্য স্নেহার্দ্র হয়ে থাকত। এই রকমও পরিস্থিতি কয়েকবার এলো, যখন এই তিন বৃদ্ধ ভাই ঝগড়ার তুফানের মধ্যে স্বচ্ছন্দে মিলিত হলে 'ভাইয়া' 'ভাইয়া' বলে ফুঁপিয়ে কাঁদতেন। তাহলে কি পাঠকের স্ত্রীর (জগরানী) দোষ দেওয়া চলে? তাঁর স্বভাবও খুব মধুর ছিল। শুধু দিন মজুর অতিথিই নয় রাত্রিতে আশ্রয় নিতে যেসব ভিখিরিরা তারাও তাঁর প্রশংসা করত। অতিথিদের খাওয়াতে তাঁর বড় আনন্দ হত। তিনি এমন মধুরভাষিণী ছিলেন যে একমাত্র তাঁর বড় জা ছাড়া (যার অন্য কারণ ছিল) অন্য কারুকে কখনো কড়া কথা বলেননি। তাঁর দয়ার উদাহরণও দিচ্ছি। এমনিতে পাঠকের ঘরে কুকুর-বেড়াল ছিল না। একবার একটা কুত্তী এসে বাইরের ঘরের এক কোণে বাচ্চা দেয়। আর যাবে কোথায়? পাঠকের স্ত্রীর ধরে নিলেন—এই প্রসুতির পরিচর্যার সমস্ত ভার তাঁর ওপর। কুত্তী প্রসূতির মতো খাওয়া-দাওয়া পেতে লাগল। এই দয়ার ফল ফলতে দেরি হল না। কুত্তী বাড়ির দরজার কর্ত্রী হয়ে গেল এবং এক বুড়ী ভিখিরিকে কামড়াল। একরকম বলা যায় যে, স্বামীর দু'ভাই ও তাঁদের পরিবারের কথা বাদ দিলে তিনি অজাতশত্রু ছিলেন।

তবে কি তাঁর বড়-ছোট জায়েরা অপরাধী ছিল? ছোট জাও পাঠকের ঘরের বিরোধ কোনো সময়েই বিশেষ ছিল না (তাঁদের কোনো আশাও ছিল না, তাঁরা কিছু পানওনি।) তবে বড় জা সেই শাশুড়ীদের একজন ছিলেন যিনি কড়া ব্যবহার না করেও বউদের নিজের শাসনে রাখতে পারতেন। তিনি খুব গম্ভীর ছিলেন। অশিক্ষিত, অল্পবিত্ত, বহু সন্তানবতী ও গ্রাম্য হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ব্যবস্থাপনার ও পরীক্ষা করে নেওয়ার গুণ ছিল। তাঁর মন উদার ছিল, এই গুণ তাঁর অবস্থার স্ত্রীলোকদের মধ্যে খুব কম পাওয়া যেত। তাঁর স্বামী—পাঠকের বড় ভাই শিবনন্দন পাঠক তো ছিলেন পুরোপুরি ধৃতরাষ্ট্র। ছেলেদের তাড়নায় ভাইদের সঙ্গে ঝগড়া করার সময় তিনি বড় দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে থাকতেন। পাঁচটি ছেলে। এত বড় পরিবারের এত সামান্য জমিতে জীবিকা নির্বাহ করা কঠিন ছিল। তাই সেয়ানা হয়েই দুই ছেলে (বাচ্চা ও জওয়াহর) কলকাতা গিয়ে পুলিশে ভর্তি হয়ে যায়। দু-চার বছরে তারা যখন ছুটিতে বাড়ি আসত, তখন কাকার ও নিজেদের বাড়ির মধ্যে কথাবার্তা না থাকলেও উপহার সামগ্রী নিয়ে কাকার (পাঠক) কাছে অবশ্যই যেত; উপহার সামনে রেখে কাকা-কাকীমাকে প্রণাম করত। একবার এক পুলিশ-ভাইপো যখন বাড়ি এল, তখন রুশ-জাপান যুদ্ধ চলছিল। বাড়ি এসে যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ডুবোজাহাজের ও অন্যান্য খবর—যা কিছু সে কলকাতায় শুনত, তারই বর্ণনা করতে লাগলো। সবচেয়ে ছোট ভাইপো রামদীন অসাধারণ ব্যবহার কুশলী ও প্রতিভাশালী ছিল। যদি সে লেখাপড়ার ভাল সুযোগ পেত, তবে এক বিশিষ্ট মানুষ হতে পারতো। পাঠকের নাতি অর্থাৎ নিজের ভাগ্নের প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল। সে-ই নিয়ে গিয়ে তাকে বিদ্যারম্ভ করিয়েছিল। যখন বাড়ি থাকতো তখন ভাগ্নেকে নানা কাজের কথা বলে উৎসাহিত করত। আপার প্রাইমারি পর্যন্ত পড়ে তাকে ডাকপিওনের চাকরি নিতে হয়েছিল, তাই জেলায় থাকলেও তাঁকে বরাবর বাইরেই থাকতে হত। বাকী দুই ভাইপোর নিজেদের স্বাধীন বোধশক্তি ছিল না। বস্তুত, যদি সেই অল্পস্বল্প জমি—যা সব তিক্ততার মূলে ছিল—তার কথা না ধরা হয়, তবে ভাইপোরা খারাপ ছিল না, খুব ভাল ছিল। আর ভাইপোদের বউরা? একজন ছিল পাঠকের শালার মেয়ে। আর অপরটি তাঁরই কথনানুসারে খুব শান্ত ও নিরীহ সবচেয়ে ছোট (রামদীনের) বউয়ের প্রশংসা করতে তো তিনি ক্লান্ত হতেন না। অবশিষ্ট দুই বেচারা ঘরের ভেতর চুপচাপ থাকার মানুষ ঝগড়া। ঝঞ্ঝাটের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না।

আর নাতি কেদারনাথ? সে তো বাচ্চা ছেলে। সে সব কিছুই শিশুর চোখে দেখত। তবু যদি তার সেই অনুভব—চৌদ্দ বছর বয়সে আগেকার অনুভবের কোনো মূল্য থেকে থাকে, তবে তাতে সব মামীমাকেই তার বড় মধুর মনে হত। ছোটমামীমার প্রতি তার অসাধারণ ভালবাসা

ছিল। স্কুল থেকে ফিরেই, দিদিমা কিছু খেতে দিতেই, সে ছোটমামীমার দরবারে হাজির হত। এই মামীর মন ছিল অত্যন্ত কোমল। তিনি সুন্দরী ছিলেন, পরিচ্ছন্ন ছিলেন, খুব তাড়াতাড়ি কথা বুঝতে পারতেন, আর ভাগ্নেকে খুশী করার জন্য মিষ্টি কথাও তিনি বলতে জানতেন। এলেই খাবার খেতে বল। জল খেতে বল আর তাছাড়া প্রাণ খুলে কথা বল। কোনো বালকের আর কি চাওয়ার থাকতে পারে? সত্যিসত্যিই যদি এই বালককে বলা হত, যে তুমি শুধু পৃথিবীর একটি মানুষকে পাবে, তাকে বেছে নাও এবং চিরদিনের জন্য নির্জন বনে চলে যাও, তবে সে এই ছোট মামীমাকেই বেছে নিত। একবার দুই ঘরের কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও সে ছোটমামীমার কাছে গিয়েছিল, আর যেতেই রুক্ষ শব্দে তাকে বলা হল—তুমি বউকে গালি দিয়েছ, খবরদার। এখন এদিকে আসবে না। এতে তার বালক হৃদয় টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। মামীমারও নিশ্চয়ই কম দুঃখ হয়নি, কারণ তারও ভাগ্নেকে সকাল-সন্ধ্যা না দেখলে শান্তি হত না। বালক কি করে জানবে যে আজকের দুনিয়া প্রেম ও সদ্ভাবের স্রোত বইয়ে দেবার জন্য নয়। কয়েক বছর পর আমার এই ভালবাসার মামীমার (দীপচাঁদের মা) মৃত্যু হয়।

মানুষের ভিতর আলাদা আলাদা ভাবে খুঁজলে কারুরই দোষ চোখে পড়তনা কিন্তু সমষ্টিগতভাবে ভয়ংকর তিক্ততা জন্মে যেত।

১৯০৫-এ পাঠকের মেয়ের (কুলওয়ন্তীর) মৃত্যু হয়। পাঠকের চার নাতি ছিল। ছোট তিন নাতি তাদের বাড়িতে থাকত। পাঠকের স্ত্রী ধরে বসলেন—নাতিদের নামে সব লেখাপড়া করে দেওয়া উচিত, জীবনের কি ভরসা। ১৯০৬-এ পাঠক তার সম্পত্তি নাতিদের নামে লিখে দিলেন।

যুদ্ধের ঘোষণা হয়ে গেল। কিন্তু প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধ লাগার আগেই বেচারী পাঠকের স্ত্রীর প্লেগে মৃত্যু হয়। নাতি এখন গ্রাম থেকে কিছু দূরে নিজামাবাদের মিড্‌ল স্কুলে পড়ত। সেখান থেকে নমাসে-ছমাসে আসত। আর যখন খুব ঝগড়াঝাঁটি বেধে গেল তখন সে আর আসত না। যাঁরা ঝগড়া করতেন তাঁদের মধ্যে একদিকে ছিলেন পাঠকের ভাইপোরা, অন্যদিকে পাঠক ও তাঁর জামাই। অনুকূল ও প্রতিকূল মানুষ সর্বত্রই জুটে যায়। এখানেও তাই হল। ভাইপোরা প্রথম তো দানকে অবৈধ ঘোষণা করার জন্য আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করল, কিন্তু তাঁরা জানতেন যে আইন তাঁদের বিরুদ্ধে। পরে তারা ফৌজদারি মোকদ্দমা ও মারপিট শুরু করল। ফৌজদারিতে তো যে পুলিশকে টাকা দেয়, সত্য মিথ্যা সাক্ষী দেয়, সেই জেতে। দুই পক্ষ থেকেই টাকা খরচ হতে লাগল। এক বছর ধরে ভয়ানক লড়াই হল। যতটা সম্পত্তি ছিল ততটাই ক্ষতি ও খরচ পাঠকের জামাইয়ের হল। ভাইপোদেরও তার চেয়ে কম খরচ হল না। দুপক্ষেরই ক্রমে হুঁশ হতে লাগল। জামাই সাহেবও (গোবর্ধন পাণ্ডে) বুঝতে পারলেন—লোভে পড়ে অন্য গ্রামে এসে আমার লোকসানই হবে। তাঁর নিজের ঘরের লেনদেন, চাষবাসের কাজ নষ্ট হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত মহাদেব পণ্ডিতকে মধ্যস্থ মানা হল। মধ্যস্থ নাতিকে এগার-বারশো টাকা পাইয়া দিলেন। জমি পেল ভাইপোরা।

ভাইপোরা তবু পাঠককে থেকে যেতে বলেছিলেন। কিন্তু পাঠকের ধারণা হয়েছিল যে ভাইপোরা কিছুকাল পরেই তাঁকে ব্যাঙ্গ করতে পারে। তথাপি তিনি তাঁর ছোট ভ্রাতৃবধূকে (ছোটমামীমা কৈলাশের মা) দেবী ভাবতে। সেই সঙ্গে পাঠকের মনে এই ভেবেও কম গ্লানি ছিল না, যে তাঁকে অপরিচিত মানুষের মধ্যে জীবনের শেষ সময় মেয়ের গ্রামে কাটাতে হবে যেখানে ধর্মভীরু লোকরা জল পর্যন্ত খেতে চান না। সাপের ছুঁচো গেলার অবস্থা। যদি পাঠক প্রথমেই এই পরিণামের কথা বুঝতে পারতেন, তাহলে তিনি ভাইপোদের তাঁর শত্রু বানাতেন না। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক্ একদিন পাঠক জামাইয়ের গ্রামে চলে গেলেন, সেই সঙ্গে যৌবনে যে পাথরের ঘানি এনেছিলেন, তা সঙ্গে নিয়ে গেলেন।

যদিও জামাই ও আত্মীয়দের কথা ধরলে বলা চলে যে তাঁদের ব্যবহার ভাল ছিল, তবু জায়গাটা পাঠকের প্রতিকূল ও অপরিচিত বলে মনে হত। এখনো তিনি তাঁর শিকার ও ভ্রমণের কাহিনী শোনাতেন, শোনার লোকও হত কিন্তু তা শুনিয়ে সেই আনন্দ আর পেতেন না। পাঠকের নিজের বাড়ি ছিল এক ছোট গ্রামে, কিন্তু সেখান থেকে এক মাইলের মধ্যে রানীকিসরাইয়ের ভাল বাজার ছিল। ফেরিউলী খটকিন ও কোইরীরা শাক-সব্জী নিয়ে আসা যাওয়া করত। এই ঝাড়খণ্ডের গ্রামে পান ভোজনের জিনিষের সুবিধা ছিল না। তার ওপর কন্যা ও স্ত্রী বিয়োগ তাঁর মনকে ক্লিষ্ট করে রাখত। এরপর আর একটি ঘটনা ঘটল যা তাঁর জীবনকে একেবারে নীরস করে দিল। প্রথম তো দাদুর বিচিত্র ভ্রমণের কাহিনী দ্বারা প্রভাবিত নাতি কেদারনাথ এক বছর ভবঘুরে হয়ে কাটিয়ে এল। তারপর মিডল পাস করার পর তার ওপর আরেক পাগলামি ভর করল। বলতে লাগল—ইংরেজী ম্লেচ্ছ ভাষা, আমি তো সংস্কৃত পড়ব, তাতেই স্বর্গ ও মোক্ষের পথ আছে। বাড়ির লোকেরা জেদ করায় সে একদিন চুপিচুপি পালিয়ে গেল। এই ব্যাপারটা পাঠকের কাছে অসহ্য ছিল। তাঁর সমস্ত ভালবাসা নাতির ওপর কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। নাতি বদ্রীনারায়ণের দিকে গেছে জানতে পেরে তিনিও সেদিকে রওনা হলেন, কিন্তু তার সঙ্গে দেখা হল না। পরে তিনি নাতিকে বেনারসে থেকে সংস্কৃত পড়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। কয়েক বছর সে বেনারসে থেকে সংস্কৃত পড়ল, কিন্তু এরই মধ্যে ১৯১২-তে পাঠক শুনলেন, যে নাতি সাধু হয়ে কোথায় চলে গেছে।

এখন পাঠক জীবনের অন্তিম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। তাঁর দেহ ও হাড় যেমন শক্ত ছিল এবং তিনি যেমন নীরোগ ছিলেন, তাতে তিনি আরো কিছুদিন বেঁচে থাকতে পারতেন; কিন্তু এখন আর তাঁর বেঁচে থাকার ইচ্ছা ছিল না। ১৯১৩-তে তাঁকে রোগে ধরে, বুঝতে পারলেন, এবার তাঁকে যেতে হবে। এসময় তাঁর একটাই ইচ্ছা ছিল, শেষ সময়ে একবার নাতিকে দেখে যাবেন। কিন্তু নাতি সে সময় ছিল দেড় হাজার মাইল দূরে মাদ্রাজে। সে জানতোও না আর যদি শুনতোও, তাহলে কে বলতে পারে সে বৃদ্ধ দাদুর আত্মার শান্তির জন্য তাঁর কাছে আসতে চাইত কিনা। রামশরণ পাঠক একদিন চলে গেলেন আর সেই প্রথাকে মনে করতে করতে যার দ্বারা ভাইয়েদের বঞ্চিত করে দূর গ্রামের আত্মীয়দের নিজের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করা যায়।

(৪) গোবর্ধন পাণ্ডে (পিতা)

গোবর্ধন পাণ্ডের নাম পূজারী ছিল না। কিন্তু যুবক বয়স থেকেই গ্রামের লোক তাঁকে এই নামে ডাকত।

১৮৭৫-এ পূজারীর জন্ম হয়েছিল খাঁটি দেহাতের এক অত্যন্ত ছোট গ্রাম কনৈলাতে। তাঁর গ্রাম থেকে অনেক ক্রোশ পর্যন্ত কাঁচা-পাকা সড়ক ছিল না, ডাকঘর ছিল আট মাইল দূরে আর বাজারও ততটাই দূর। পাঠশালা অথবা মাদ্রাসারও একই হাল ছিল।

পূজারী তাঁর পিতার জ্যেষ্ঠ সন্তান ছিলেন। শুধু নিজের গ্রামেই তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠা ছিল না আশেপাশের অনেক গ্রামেই তাঁকে ছাড়া পঞ্চায়েত হত না। সততা ও বিশাল হৃদয় ছিল তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি। পূজারীর পিতা জানকী পাণ্ডে এক বড় পরিবারের কর্তা ছিলেন। যদিও জানকীপাণ্ডে পিতার একমাত্র পুত্র ছিলেন। তবু নিজের তিন খুড়তুতো ভাই-এর সঙ্গে তাঁর সহোদর ভাইয়ের চেয়েও বেশী ভালবাসা ছিল। সবচেয়ে ছোট মহাদেব পাণ্ডেকে তো তিনি দূরের গ্রামে সংস্কৃত পড়তেও পাঠিয়েছিলেন। যদিও তার লেখাপড়া "সত্যনারায়ণ" ও "শীঘ্রবোধ"-এর বেশী এগোয়নি, তবু গ্রামে তাঁকে পণ্ডিত বলা হত, আর তিনি সেই গ্রামের হিসেবে পণ্ডিতই ছিলেন।

পূজারীর পিতার মৃত্যু হয় ৪৫-৪৬ বছর বয়সেই। সে সময় পূজারীর বয়স ১৫-র বেশী হয়নি। তাঁর ছোট এক ভাই প্রতাপ আর তিন বোন বরতা, শিওবরতা ও মহারানী ছিল, যাদের মধ্যে সবচেয়ে যে ছোট তার বয়স ৬-৭ বছরের বেশী ছিল না। প্রথা অনুযায়ী পিতা বড় ছেলে ও বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন ১০-১২ বছর বয়সে। পিতার মৃত্যুর সময় তিন খুড়তুতো কাকা (মথুরা, গোকুল, মহাদেব) একসঙ্গেই থাকতেন। তিনজনই ছিলেন ভালোমানুষ আর তাঁরা ভাইয়ের ভালবাসাপূর্ণ ব্যবহারে চিরকৃতজ্ঞ ছিলেন। তাদের পক্ষে সম্ভভ হলে তারা পূজারীর বাবার মৃত্যুর চিন্তাও তার মনে আসতে দিত না। কিন্তু পূজারীর মা লখপতী অন্য ধাতুতে গড়া ছিলেন। মিষ্টি কথা তো যেন তাঁর মুখে আসতই না। এক কথায় চার কথা শুনিয়ে দেওয়া তাঁর অভ্যাস ছিল। স্বামীর জীবদ্দশায় জিভের উপর কড়া শাসন ছিল; কিন্তু পরে কেউ বাধা দেবার ছিল না। তাঁর মন অত্যন্ত সংকীর্ণ ছিল। তিনি মনে মনে বিরক্ত হতেন—'চাষবাস ও টাকা পয়সার অর্ধেক অংশ আমার। দেওর ও তার ছেলেরা আমার টাকা পয়সা খেয়ে ফেলছে। সামান্য ব্যাপারেও খোঁটা দিয়ে দিতেন। তাঁর দেওর ও জায়েরা প্রথম খুব সম্ভ্রম করত কিন্তু পরে খিটিমিটিতে তাঁরা এমন জ্বালাতন হয়েগিয়েছিল যে তিন বছর কাটতে না কাটতেই তাদের আলাদা হয়ে যেতে হল।

* * *

পূজারীর মা এখন খুব প্রসন্ন ছিলেন। শুধু বাড়িরই নয় প্রত্যেক খেতেরও আধাআধি ভাগ করিয়েছিলেন তিনি। তাঁর বেশ কিছু জমি ছিল। কাজ করার জন্য কয়েক ঘর চামার ও ভর পেয়েছিলেন। কিন্তু এতে পূজারী খুশী হবেন কি করে? মাগের ঝগড়াটে স্বভাবের জন্য ১৫ বছর বয়সেই গোটা পরিবারের বোঝা এসে তাঁর কাঁধে পড়ল। কোথায় খাওয়া-দাওয়া আর খেলে বেড়ানোর সময় আর কোথায় এই দায়িত্ব! চাষবাস ও পরিবার সামাল দেওয়াই শুধু নয়, ছোট ভাই ও দুই বোনের বিয়ে দেওয়াও ছিল। ভাই-বন্ধুরা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সাহায্য করতে পারত না, কারণ পূজারীর মায়ের স্বভাব তাঁদের জানা ছিল। প্রবাদ ছিল—লখপতীর ব্যথায় কুকুরও দরজায় যেতে পারে না।

কনৈলার আশেপাশে পড়াশোনার কোনো ব্যবস্থা ছিল না, তা আগেই বলেছি। কিন্তু পিতার জীবদ্দশায়-পূজারীর বয়স তখন তের কিংবা চৌদ্দ-কোথা থেকে এক ভবঘুরে মুন্সীজী সেই ঝারখণ্ডের গ্রামে এসেপড়েছিলেন। যদিও অনেক প্রজন্ম আগেই সেই গ্রামের ব্রাহ্মণেরা বিদ্যার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন, তবু কিছু শ্রদ্ধা বাকী ছিল, আর মুন্সীজীর কাছে আধডজনের বেশি ছেলে পড়াশোনা শুরু করে দিল। দুয়েক সপ্তাহের পরেই অধিকাংশ ঘরে বসে গেল। দেড় মাসের মধ্যে মুন্সীজীও বুঝে গেলেন—'দিগম্বরের গ্রামে ধোপা থেকে কি করবে?' মুন্সীজীর চেলাদের মধ্যে পূজারীই একমাত্র যিনি শেষ পর্যন্ত টিকে ছিলেন। কেদো* দিয়ে পড়াশোনা করার প্রবাদ বিখ্যাত। কিন্তু পূজারী কোদো দেন নি। বলা হয়ে থাকে যে দক্ষিণা হিসেবে মুন্সীজী কিছু ধানই পেয়েছিলেন।

এভাবে পনের বছর বয়স, দেড় মাসের লেখাপড়া ও নিমের চেয়ে তেতো-জিভের মা—এই তিনটি উপকরণ নিয়ে পূজারী সংসার সামলানোর কাজে লেগে পরলেন।

* * *

পূজারী গোবর্ধন পাণ্ডে অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। বত্রিশ বছর বয়সে তাঁর যে জ্ঞান ছিল তা দেখে কেউ বলতে পারত না যে তিনি শুধু দেড়মাস পড়াশোনা করেছিলেন। তাঁর যে জ্ঞানের যখন আবশ্যকতা হত, তিনি তার পেছনে লেগে যেতেন এবং তা শিখে ছাড়তেন। কোথায় এবং কার কাছে শিখতেন তা জানি না। তিনি যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগই শুধু জানতেন না, তাছাড়াও

জানতেন মিশ্র, ত্রৈরাশিক, পঞ্চরাশিক অংক। এক সময় গ্রামে সরকারী জরিপ শুরু হয়েছিল। সেই সময় তিনি আমিনের পাশে বসে জরিপের হিসাবও শিখে নিয়েছিলেন।

পূজাপাঠে গোবর্ধন পাণ্ডের বড় শ্রদ্ধা ছিল, সেই জন্যই আঠার বছর বয়সেই লোক তাঁকে পূজারী বলতে থাকে। স্নান পূজা না করে তিনি জল স্পর্শও করতেন না। যদিও প্রথম দিকে তাঁর পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে ছিল শুধু হনুমান-চালিসা। তবু ধীরে ধীরে তার মধ্যে হনুমান-বাহুক, বিনয় পত্রিকা ও রামায়ণও এসে যায়। রামায়ণ পড়েছিলেন বহুবার এবং রামায়ণের জ্ঞানদীপকের মতো শ্লোকের যে অর্থ তিনি করতেন তা বিশেষ ভুল হত না। প্রত্যেক ধর্মভীরু ব্রাহ্মণেরই শুভাশুভ সময়ের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন ছিল। সারা গ্রামের ব্রাহ্মণের জন্যে সবশুদ্ধ শুধু এক ঘর যজমান ছিল। যদি যজমানী কিছু বেশী থাকত তবে হয়তো পূজারীর আরো কিছু পড়াশোনা করার সুযোগ হত। যখন তাঁর স্ত্রী (কুলওয়ন্তী) অসুখে পড়ল, তখন তিনি "রসরাজ মহোদধি"ও আনিয়ে নিয়েছিলেন, আর লোকে যদি তাঁকে অবিশুদ্ধ ঔষধীর ভয় না দেখাতো, তবে তিনি হয়তো নিজের তৈরী লৌহভস্ম দিয়ে স্ত্রীর চিকিৎসা করতেন। তখনো গ্রামে খবরের কাগজ পৌঁছয়নি, তবুও গ্রামে যে সব পুস্তক আসত তা পূজারী পড়ে বুঝতে পারতেন।

একদিকে পূজারী ছিলেন কট্টর পূজারী, অন্যদিকে নতুন বিষয় শেখার জন্য তাঁর মন একদম খোলা থাকত। পূজারীর গ্রামের ভেতর শুধু একটা কূয়া ছিল, যার লম্বা-চওড়া আকার ও ভাঙাচোরা অবস্থা দেখে লোকজন বলত এই কূয়া সত্যযুগের কাছাকাছি সময়ে তৈরী হয়েছে। এর একদিকের ইট আগেই ভেঙে গিয়েছিল। একদিন গোটা কূয়াটাই ভেঙে গেল। এরপর লোক-জনের দূরের কূয়া থেকে ভরে আনতে হত। এ সময়ে পূজারীর বয়স ছিল ত্রিশ-বত্রিশ বছর। তাঁর টাকাও ছিল। তিনি নিজের দরজার কাছে একটা কূয়া তৈরী করতে চাইলেন। তিনি মনে মনে কূয়ার একটা নক্সা ঠিক করে নিলেন—কূয়া এমন হতে হবে যার দেয়ালে কলসীর টক্কর লাগবে না; যদি নিচের চেয়ে কূয়ার ওপরের দিকটা সংকীর্ণ করে দেওয়া যায়, তাহলে তা হতে পারে। প্রচলিত সাইজের ইট ব্যবহার না করে তিনি যে সাইজের ইটের কথা ভেবেছিলেন, তার ছাঁচ বানালেন। তার মধ্যে কিছু ছিল দেড় ফুট লম্বা ও ৬-৭ ইঞ্চি চওড়া। গ্রামের বড় পুষ্করিণীর ইট দেখেই হয়তো তাঁর এত লম্বা ইট বানানোর সাহস হয়েছিল। সেই পুরনো যুগের মতো যদি ইন্ধনের প্রাচুর্য থাকত এবং তা সঠিকভাবে লাগানো হত, তবে হয়তো তা ভালভাবে পোড়ানো ইটই হত। কিন্তু পূজারী সেদিকে দৃষ্টি দেননি, এবং অনেক আধপোড়া হয়ে ভেঙে যায়। তা সত্ত্বেও তাঁর কাজটুকু চালানোর মত ইট পাওয়া গিয়েছিল। পূজারীর ডাকে তাঁর শ্বশুর কূয়া বাঁধানোর জন্য রাজমিস্ত্রি নিয়ে এলেন। ইটের বিচিত্র আকার দেখে শ্বশুর ও রাজমিস্ত্রি দুয়েরই মাথা ঘুরে গেল। তার ওপর কূয়া বাঁধানোর নিজস্ব পরিকল্পনা পেশ করলেন পূজারী। রাজমিস্ত্রি চেঁচিয়ে উঠল, "আরে! এ কি বলছো? কূয়ার মুখ ছোট করে দিলে তো ইটগুলো অল্পদিনের মধ্যেই সামনের দিকে পরে যাবে। পূজারী বললেন—তাহলে খিলানের ক্ষেত্রে তা হয় না কেন?"

যা হোক, পূজারীর আগ্রহ দেখে রাজমিস্ত্রি সেই রকমভাবেই কূয়া বাঁধাতে লাগল। কিছুটা বাঁধার আর মাটি বার করার পর কূয়ার ভেতর থেকে বালি বেরোতে লাগল। রাজমিস্ত্রি সব দোষ চাপিয়ে দিল নতুন পদ্ধতির মাথায় এবং ইট বার করে নিয়ে পুরনো পদ্ধতিতে কূয়া বাঁধাতে বলল। কিন্তু পূজারী কবে অন্যের কথা শুনেছেন। যখন কূয়া ঠিকভাবে তৈরী হয়ে গেল, তখন পাঠকজী বলতে লাগলেন—তৈরী তো হল কিন্তু এর চেহারা তো হয়েছে ছোট কুঁয়োর মতো। পুরনো পদ্ধতিতে বানানো হলে এটাকে একটা চমৎকার কূঁয়া বলে মনে হত।

পূজারী ছোট ভাইকে ভগ্নীপতি মহাদেব পণ্ডিতদের বাড়িতে (বছওয়ল) পড়াশোনা করতে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু সে শুধু এইটুকু পড়লো—"ওনামাসিধম, বাপ পড়ে না হম্"। দু-চার বার পালিয়ে আসার পর পূজারী বেশি জবরদস্তি করা ছেড়ে দেন। বোন দুটির ও ভাইয়ের বিয়ে দিয়ে দেন। এরপর দুভাই মিলে খুব পরিশ্রম করতেন। বাড়ি ঘরের ব্যবস্থাপনায় মা খুব দক্ষ ছিলেন। প্রত্যেক বছরই খরচপত্রের পর কিছু টাকা ও খাদ্যশস্য বাঁচতে লাগলো। পূজারী তা সুদে আর সওয়াই*-তে খাটাতে লাগলেন।

সুদ ও মূল-টাকার বিনিময়ে গ্রামের কিছু লোকের খেতও নিজের কাছে বন্ধক রাখতেন। যদিও ত্রিনিদাদ থেকে ফিরে আসা জয়পাল পাণ্ডের গ্রামে সবচেয়ে বেশী জমি ছিল, তবু অঘ্রাণ মাস কাটতে না কাটতেই তাঁর ঘরের শস্য ফুরিয়ে যেত এবং ধার করার ও শস্য কেনার প্রয়োজন হত। অতএব পূজারীই গ্রামে সবচেয়ে ধনী বলে গণ্য হতেন।

পূজারীর জীবন এখন সুখের জীবন। জুয়ার কারবারী ও ব্যবসায়ীদের মতো না হলেও পূজারীর ধন প্রতি বছরই বাড়ছিল। এপর্যন্ত তাঁর কাছারিতে যেতে হয়নি, কিন্তু এই সময়ে পূজারীর গ্রামে জরিপ হতে থাকে। এ পর্যন্ত খেত, বাগান, পতিত জমির হিসাব পাটোয়ারির কাছে থাকত, কিন্তু আমিন জরিপের সঙ্গে জমির অধিকার সম্পর্কেও জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল। এটাই তো পয়সা কামানোর সময়। যদি এদিকেরটা ওদিকে এবং ওদিকেরটা এদিকে না করে তবে আমীনকে আর কে পুঁছবে। তবে এই সময়ই আগেকার জরিপের অসাধুতাও ফাঁস হয়ে যেতে থাকে। আমি আগেই বলেছি, পূজারী খুব মেধাবী পুরুষ ছিলেন। গ্রামে যে আমিন এসেছিলেন তার কাছে গিয়ে তিনি কাগজপত্র দেখতে থাকেন। তাতে তিনি বুঝতে পারেন যে তাঁর আগেকার অনেক খেত অন্যের দখলে চলে গেছে। কিছু জমি নিয়ে আবার নতুন করে গোলমাল হয়েছে। পূজারী সেই সব মানুষের একজন ছিলেন যাঁরা মনে করেন—নিজের এক পয়সা যেতে দেবনা, অন্যের এক পয়সা নেবওনা। এবার বন্দোবস্ত ডেপুটির ক্যাম্প-এ এবং জেলা ও তহ্‌শীলদারের কাছারিতে ধরণা দেওয়া পূজারীর জন্য আবশ্যিক হয়ে পড়ল। যে পূজার নিয়মের জন্য তাঁর নাম পূজারী হয়েছিল, তা কি করে বাদ দেবেন? তাতে তো আরো কিছুটা বৃদ্ধিও হয়েছিল। যদি আগে শুধু একাদশী পালন করতেন, এখন তার সঙ্গে মাসে চারটা আলুনি রবিবার যোগ হয়েছিল। কাছারির কাজ তো ঘরের কাজের মতো নিজের আয়ত্তাধীন নয় এবং পূজা না করে পূজারী জলও খেতেন না। ফলত কখনো কখনো সূর্যাস্ত ও পূজারীর স্নান-পূজা একসঙ্গেই হত। তিনি গঙ্গাতীরে অথবা কাশীতে চুল কাটানোরও নিয়ম করেছিলেন, তাই তিনি দু-চার মাস পর্যন্ত চুলদাড়ি কাটাতে পারতেন না।

পূজারী ধার্মিক ও শ্রদ্ধাশীল মানুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁর শ্রদ্ধা অন্ধ ছিল না। সেই কারণেই গ্রামের সব লোক যখন লম্বা দাড়ি, বড় জটা, ছোট ল্যাঙ্গট ও সাদা বিভূতি মাখা লোক দেখলেই ষাষ্টাঙ্গে দণ্ডবত করা ধর্ম বলে মনে করত, তখন গুণ পরখ না করে তিনি এই ধরনের সাধুদের স্বাগত জানাতেন না। তবে তাঁর গ্রাম থেকে কিছুদূরে উমরপুরের এক নির্জনস্থানে এক বৃদ্ধ পরমহংস থাকতেন, যাঁর বয়সের ব্যাপারে বুড়ো বুড়ো লোকও কসম খেয়ে বলতেন যে সেয়ানা হওয়ার পর থেকে তারা পরমহংস বাবাকে এই রকমই দেখেছেন। একথাও বলা হত যে পরমহংস বাবা তাঁর জন্মভূমি (পোখরা) নেপাল থেকে বিদ্যার্জনের জন্য বেনারস এসেছিলেন, সেখানেই পরে বিবাদী হয়ে রাজঘাটের পাশে এক কুটিরে থাকতে শুরু করেন। যখন রাজঘাটে রেলপথ হল তখন ট্রেনের ঘর্ঘর শব্দে তাঁর ধ্যানের বিঘ্ন হতে লাগল, তখন মুফতে যে কাশী মুক্তি দেয় তা ছেড়ে এক ভক্তের সঙ্গে তিনি পূজারীর আশেপাশের অঞ্চলে চলে আসেন। পরমহংসজীর প্রতি খুব শ্রদ্ধা ছিল পূজারীর। চার পাঁচ দিন পর পর তাঁকে দর্শন করতে সেখানে চলে যেতেন।

পূজারীর সুখময় জীবনের সময় এখন শেষ হয়ে আসছিল। এই সময়ের মধ্যে তাঁর আর্থিক অবস্থাই শুধু ভাল হয়নি, তাঁর চার ছেলে ও এক মেয়েও হয়েছিল। পিতার মৃত্যুর পর বাড়ির কোনো লোকের মৃত্যুতে তাঁকে চোখের জল ফেলতে হয়নি। তিনি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন যে সংসারে মৃত্যু বলে কোনো জিনিষ আছে। এই সময় পূজারীর ধর্মপত্নী অসুস্থ হয়ে পড়লেন। পূজারীর সেই ঝাড়খণ্ডের গ্রামে বৈদ্য আসবে কোথা থেকে? ওঝা-টোঝাই সুলভ ছিল, কিন্তু পূজারী তাদের দু চক্ষে দেখতে পারতেন না। তাঁর মা এক-আধবার চুপিসাড়ে গিয়ে তাঁর ওঝা দেওরকে জিগ্যেস করেন আর সুহৃদয় ওঝা বলে দেন যে বিপত্তি বাধিয়েছে বাড়ির পাশের বাঁশঝাড়ের পেত্নী কিন্তু পূজারীর ভয়ে তার জন্য শান্তি স্বস্ত্যয়নও করা গেলে তো। পূজারী স্বয়ং তখন 'রসরাজ মহোদধির' পাতা ওলটাচ্ছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর স্ত্রীর ন্যাবা হয়েছে। তিনি নিজের এবং যমরাজের সহোদর অন্য এক বৈদ্যরও ওষুধপত্র দিয়েছিলেন; অন্যান্য আরো উপচার যা পেরেছেন, করেছন; কিন্তু কয়েকমাস রোগে ভুগে স্ত্রী চলে গেলেন। বাইরে কিছু প্রকাশ না করলেও পূজারীর খুব দুঃখ হল।

এসময় পূজারীর ত্রিশ বছরও পূর্ণ হয়নি। স্বচ্ছল লোকের বিয়ে দিতে সবাই প্রস্তুত। স্ত্রীর বাৎসরিক হতে না হতেই বিয়ে দিতে চায় এমন লোকেরা তাঁর চারদিকে ঘোরাফেরা করতে লাগল কিন্তু পূজারী স্পষ্ট বলে দিলেন—আমার পাঁচটি সন্তান আছে। বিয়ে করার ফল আমি পেয়ে গেছি। এখন আমি আর বিয়ে করব না।

পূজারীর এই শোক লঘু করতে আরো কিছু বিষয় সাহায্য করেছিল। সবচেয়ে বড় কথা হল তাঁর মনের দৃঢ়তা। সন্তানের ভালবাসাও তাঁকে সাহায্য করেছিল। তাঁর ভাইও তাঁর আজ্ঞানুবর্তী ছিল—এবং এত আজ্ঞানুবর্তী ছিল যে সেজন্য কখনো কখনো তাঁকে স্ত্রীর বিদ্রুপ শুনতে হত। ছেলেরা সেয়ানা হয়ে যাওয়ার পর পূজারীর আরো ভালো দিনের আশা ছিল।

* * *

পূজারীর ধর্মীয় ধ্যান-ধারণায় উদারতা ও দয়া সম্মিলিত ছিল।

এক দিনের কথা। তখন পূজারীর বয়স ২০-২১ বছরের বেশী ছিল না। তিনি একটা জায়গায় চুপচাপ বিষণ্ণ হয়ে বসেছিলেন। সাধারণ বিষাদ নয়, অত্যন্ত বিষাদ। কারণ ছিল এই পূজারীর পূর্বপুরুষ কয়েক প্রজন্ম আগে সরযূপার থেকে এসে এখানে বসবাস করতে থাকেন। এখনো তারা অন্তত মেয়ের বিয়ে দিতে চাইত সরযূপারে (গোরখপুর জেলায়)। তিনি তাঁর দুই ছোট বোনের জন্য বর খুঁজতে সরযূপার গিয়েছিলেন। লোকজন তাঁকে ভুল বোঝায় এবং এক বাড়ির দুই ছেলের সঙ্গে তিলক (আশীর্বাদ) হয়ে যায়। বাড়ি ফিরে এসে তিনি জানতে পারেন যে বরের বাড়ির লোকেদের কোন কারণে নীচ মনে করা হয়। তিনি তিলক ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলেন, তাতে বরের বাড়ির লোকেরা নানাভাবে ধমক দিতে থাকে। ভাই-বন্ধুরা সবাই পূজারীকে বোঝাতে লাগলেন। কিন্তু পূজারী কি করে তাঁর বোনদের কুজাতির ঘরে বিয়ে দেবেন? বেশী জোরাজোরি করায় তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—আমি দুই বোনকে গলায় বেঁধে জলে ডুবে মরব, তবু এই ঘরে বোনদের বিয়ে দেব না।

শেষ পর্যন্ত পূজারী এই বিয়ে দেননি।

অন্য জায়গার মতো পূজারীর গ্রামেও গরীব ব্যক্তিরা বিয়ে না করেই বুড়ো হয়ে যেত। গ্রামের এক ব্রাহ্মণের বয়স ত্রিশ বছরেরও বেশী হয়ে গিয়েছিল, আর তখনো তাঁর বিয়ে হয়নি, হওয়ার আশাও ছিল না। অন্য গ্রামে তাঁর আত্মীয়দের মধ্যে এক যুবতী বিধবা ছিলেন। দেওর বৌদির সম্পর্ক ছিল দুজনের। দৈনিক যাতায়াতের ফলে দুজনের ভালবাসাই শুধু হয়নি, বরঞ্চ তা লুকিয়ে না রেখে তিনি বৌদিকে এনে তাঁর ঘরেই রাখেন। প্রথম মনে হয়েছিল, তিনি অতিথি

হয়ে এসেছেন, কিন্তু পরে সব জানাজানি হয়ে গেল। এই ব্যাপারটা পূজারীর অসহ্য মনে হল, আর তিনি গায়ের জোরে বিধবাকে গ্রাম থেকে বার করে দেওয়ার জন্য গেলেন। লোকজন অনেক করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাঁকে নিয়ে আসে। বলছিলেন—গ্রামে এ ব্যাপারটা একটা অত্যন্ত খারাপ দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে, একে দেখে এই রোগ অন্যদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়বে।

এই ঘটনা থেকে পূজারীর সামাজিক অনুদারতা প্রমাণিত হবে, তা সত্ত্বেও বলা চলে যে পূজারীর যদি দুনিয়া সম্পর্কে আরো বেশী জানাশোনার সুযোগ হত, তাহলে তিনি তাঁর ধ্যান-ধারণা দ্রুত পালটেও ফেলতেন, বুঝতে পারলে তিনি কোনো বিষয়েই অনুচিত জিদ করতেন না।

পূজারীর তিন হালের চাষবাস ছিল, যার মধ্যে এক হাল চাষী ছিল চিনগী চামার। চানগী কোনো এক সময়ে কলকাতার কোনো এক সাহেবের সহিস ছিল। তার একটি ছিলে কলকতিয়া এবং তিনটি মেয়ে ছিল। বিয়ে দেওয়ার পর মেয়েদের তাদের শ্বশুরবাড়ি চলে গিয়েছিল, আর কিছুকাল পরে চিনগীর একমাত্র ছেলেও মরে যায়। পুত্র স্নেহ খুব বড় জিনিষ, কিন্তু এই মজদুর জাতির জন্য তো ছেলে বৃদ্ধ বয়সের বীমা হয়ে থাকে। খুশী হয়ে হোক অখুশীতে হোক ছেলেকে বৃদ্ধ মা-বাপের ভার নিতেই হয়। বুড়ো চিনগীর বড় অবলম্বন ছিলেন পূজারী। পুত্র শোক ও খিদে মেটানোর জন্য তিনি তাঁর প্রতি খুব নজর রাখতেন। তার জন্য পূজারীর মা এক এক দিন কথাও শুনিয়ে দিতেন। কিছুদিন রোগে ভুগে একদিন মেঘে ঢাকা মাঘের দিনে চিনগী চলে গেল। লোকজন আশ্চর্য হয়ে গেল যখন পূজারী বললেন—চিনগী ভগতকে দাহ করা হবে গঙ্গাতীরে (যা সেখান থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে ছিল)। লজ্জা-সংকোচ ও চাপের ফলে চিনগীর ভাই-বন্ধুরা সেই মেঘের মধ্যে মৃতদেহ নিয়ে যেতে রাজী হল। পূজারী সঙ্গে গিয়ে গঙ্গাতীরে চিনগীর শবদেহের দাহ ও অন্যান্য ক্রিয়াকর্মও করিয়েছিলেন। সবাই বলত—চিনগীর কাছে পূজারীর পূর্ব জন্মের ধার ছিল।

পূজারীর এক বলিষ্ঠ বলদ একদিন লড়তে লড়তে তাঁর তৈরী কূয়ায় পড়ে যায়। অনেক চেষ্টা করে তাকে জীবন্ত বার করে আনা হল, কিন্তু তার পেছনের একটা পা নষ্ট হয়ে গেল। খোঁড়া বলদ দিয়ে কোনো কাজ করানো মুশকিল। যাদের চাষবাস কম তারা অনেকবার বলল—বলদ আমাদের বেঁচে দিন। পূজারীর বক্তব্য ছিল—এই বলদকে বেচা যাবে না, কাজ করতেও দেওয়া যাবে না। যখন সুস্থ ও মজবুত ছিল, তখন ও আমাকে উপার্জন করে খাইয়েছে। কাজ করতে না পারলে কি বুড়ো মা-বাপকে বেঁচে দেওয়া হয়?

অল্প স্বল্প মহাজনী ছাড়া পূজারীর প্রধান পেশা ছিল চাষবাস। চাষবাসের ব্যাপারে কিষাণেরা কট্টর সনাতনপন্থী হয়ে থাকে। পূজারীর গ্রাম কনৈলা বাজার, স্টেশন, শহর সব কিছু থেকেই অনেকটা দূরে ছিল, তাই তাঁর গ্রামে চাষবাস সম্পর্কে নতুন কথা পৌছন কঠিন ছিল। কিন্তু লোকজন হাসি-ঠাট্টা করা সত্ত্বেও পূজারী ঘরের কাজের জন্য আলু, মূলা, গাজর ও কপি চাষ করতে শুরু করেছিলেন। একবার তিনি কোথাও লাল রঙের বড় আখ দেখে এসেছিলেন। তা নিয়ে এসে তিনি পাঁচ কাঠা খেতে বুনে দিয়েছিলেন। গ্রাম ও ঘরের লোকেরা বলাবলি করল—এই আঁখ কি আর ঘানিতে যাবে, এ তো লোকে দাঁত দিয়ে সাফ করে দেবে। আখের ভাল ফসল হল। কিন্তু লোকজনের কথাও ফলে গেল। মোটা নরম আখ লুকিয়ে চুরিয়ে অনেকেই দাঁত সাফ করল। কিন্তু তাতে এই লাভ হল যে পরের বছর আরো কিছু লোক এই আখের চাষ করল। তৃতীয় বছর পূজারী দেড় দুই একর জমিতে আখ বুনল। আখ এত বেশী হল যে বাড়ির লোকদের চিন্তা হল—এই আখ তো ভাগের পাথরের ঘানিতে আষাঢ় মাসের মধ্যেও শেষ হবে না। পূজারী প্রথম আশেপাশের পাথরের ঘানি কিনতে চাইলেন। তা না পাওয়াতে পূজারী বেনারসের কাছাকাছি পর্যন্ত হাওয়া খেয়ে এলেন। পূজারী কোনো বিষয়েরই দ্রুত

ফয়সলা করতে পারতেন না। তাই তাঁকে অনেকবার মিঠে কড়া কথাও শুনতে হয়েছে। পাঠকজী তো একে "জুড়রা-রোগ" (ঠাণ্ডার রোগ) বলতেন। দু-তিনবার খালি হাতে আসায় ও দু-তিন মাস কাজের সময় কেটে যাওয়ায় বাড়ির লোক তো আরো বিরক্ত হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত সপ্তাহ খানেক নিখোঁজ থেকে একদিন পূজারী বলদের ওপর লোহার ঘানি চাপিয়ে এসে গেলেন। গ্রামে অথবা সেই অঞ্চ পাড়া গাঁয়ে হয়তো এই প্রথম লোহার ঘানি এল। লোকেরা ভয় পাচ্ছিল, কল তো প্রায়ই বিগড়ে যায়; বিগড়ে গেলে মেরামত করবে কে? কিন্তু পূজারীর তা নিয়ে কোনো মাথাব্যথা ছিল না। ভাগ্যক্রমে খুব ভালো ঘানি পাওয়া গিয়েছিল। সেই বছরই তার দাম উঠে গেল। তিন চার বছর ব্যবহার করে ঘানির দামের এক চতুর্থাংশ কমে তিনি এটা বেচেও দেন।

পূজারী অনাড়ম্বর জীবনের পূজারী ছিলেন। তিনি এক নম্বর মার্কিনকে খুব পছন্দ করতেন। বলতেন, এই কাপড় খুব মজবুত হয়, ঠাণ্ডা ও গরম—এই দুয়েতেই কাজে লাগে; যে এই কাপড় গায়ে দেবে তাকে সৌখীনও বলা যাবে না, আবার দরিদ্রও বলা যাবে না। খদ্দরের যুগের কিছুদিন আগেই তিনি ইহজগৎ থেকে বিদায় নেন। নয়তো পূজারী খদ্দরের অনন্য ভক্ত হতেন।

ধূসর চুলঅলা, পূজারীর ফর্সা একমাত্র কন্যা রামপিয়ারীর, মায়ের মৃত্যুর এক-আধ বছর পরেই মৃত্যু হয়। বড় ছেলে মামারবাড়িতে পড়াশোনা করত। বাকী তিন ছেলেকে গ্রাম থেকে তিন মাইল দূরে মাদ্রাসায় পড়াশোনা করার জন্য ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল। পূজারী এখন ভবিষ্যতের সুখস্বপ্ন দেখছিলেন। এই সময় একটা ঘটনা ঘটে যা সেই স্বপ্নকে চুরমার করে দেয়। তাঁর বড় ছেলে কেদারনাথ—এখন তার বাবার গ্রামে বেশী যাতায়াত করত—বাবা ও বন্ধুবান্ধবদের দেখাদেখি সেও পরমহংস বাবার কুটিরে যেতে থাকে আর পরমহংসদেবের এক শিষ্য তার কানে বেদান্ত ও বৈরাগ্যের মন্ত্র দিতে থাকে। বৈরাগ্যশতক ও বিচার-সাগরের সঙ্গে সঙ্গে দেশান্তরের মনোরম ছবি আঁকতে থাকে তার সামনে। এর প্রভাব পড়াটা অবশ্যম্ভাবী ছিল। শেষ পর্যন্ত ছেলেও বাবার মতো পূজাপাঠ শুরু করল, ত্রিকাল সন্ধ্যা-স্নান ও একাহার আরম্ভ করল। পূজারীর এতে চিন্তা হয়নি, কিন্তু বাড়ির অন্যান্য সব লোক ষোল বছরের ছেলের এই ধরন-ধারণ দেখে আতঙ্কিত হচ্ছিল।

একদিন (খ্রীঃ ১৯১০) হঠাৎ ছেলেটা পালিয়ে গেল। যদিও এর আগেও দুবার পালিয়ে গিয়ে কয়েক মাস কলকাতায় থেকে এসেছে। কিন্তু তখন বৈরাগ্যের ভূত মাথায় সওয়ার হয়নি, তাই এতটা চিন্তা ছিল না। পূজারীর চিন্তা দূর হল যখন তিনি শুনলেন যে ছেলে ঘুরেফিরে বেনারস চলে এসেছে এবং সেখানে সংস্কৃত পড়ছে।পূজারী খুশী হয়ে সংস্কৃত পড়ার অনুমতি দিলেন, আর তাঁর আশা হল যে এখন আর সে তাঁর হাতের বাইরে যাবে না।

দুবছর কাটতে না কাটতেই তিনি শুনলেন—ছেলে বেনারস থেকে কোথায় চলে গেছে। কয়েক মাস পরে যখন তিনি জানতে পারলেন যে সে অন্য প্রদেশের (বিহার) এক মঠে সাধু হয়ে গেছে, তখন তিনি তাঁর ভগ্নীপতি মহাদেব পণ্ডিতকে নিয়ে সেখানে পৌছলেন। ছেলের অনুপস্থিতিতে তাঁরা মঠের মোহন্তকে এ বিষয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজী করিয়ে নিলেন যে তিনি একবার তাঁর শিষ্যকে বাড়ির লোকদের সঙ্গে দেখা করতে যেতে দেবেন। তাকে ফিরে আসতে দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তা মিথ্যা ছিল, তবু সাদাসিধা মোহন্তজী পণ্ডিতজীর মিষ্টি কথায় ভুলে গেলেন। বাড়ি চলে আসার পর ছেলের এই ব্যাপারটা বড় অরুচিকর মনে হয়েছিল, কিন্তু আর কোন উপায় ছিল না। ছেলেকে বাড়িতে নিয়ে আসা হল। এখন একদিকে ছেলের জন্য (পূজারীর স্বভাবের বিরুদ্ধে) শৌখিন কাপড় জামা ও পানটানের ব্যবস্থা করা হল; অন্যদিকে তার চলা ফেরার ওপর কড়া নজর রাখা হল। ছেলে একবার পালাল কিন্তু পূজারী তাকে স্টেশন থেকে ধরে আনলেন। এভাবে কাজ হবে না দেখে তার ওপর যাতে বিশ্বাস জন্মে

সেই ভাবে চলতে চাইল এবং তিন মাস ধরে সুযোগ খুঁজতে খুঁজতে একদিন সে এই বন্দীজীবন থেকে মুক্ত হল।

এতে পূজারীর কতটা দুঃখ হয়েছিল তা এ থেকেই বোঝা যাবে যে চিন্তায় চিন্তায় দুবছর যেতে না যেতেই তার এক ধরনের মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ দেখা গেল। ছেলে সেই সময়ে আগ্রায় পড়াশোনা করছিল। এক বন্ধু সব কিছু লিখে একবার বাবাকে দেখতে যেতে বলল। তাতে ছেলে ঘরে ফিরে এল। পূজারীর শুধু আনন্দ হল তাই নয়। এমনকি তাঁর মস্তিষ্কের উত্তাপ দূর করার জন্য শিরা খুলে রক্তমোক্ষণের লোক এল দেখে তিনি বললেন—কি করবে? এখন আমার শরীর ভাল হয়ে গেছে। এক সপ্তাহ পরে ছেলের ইচ্ছা অনুসারে তিনি তাকে যেতেও দিলেন।

★ ★ ★

দু-বছর আরো কেটে গেল। ছেলের কোনো খোঁজ খবর ছিল না। একদিন জানা গেল, সে বেনারস এসেছে। আবার জোর করে বাড়ি নিয়ে গিয়ে নজরবন্দীর সেই অস্ত্র প্রয়োগ করা হল। সে তার বন্ধুদের বলেছিল এবার পালাতে পারলে আর তোমরা আমাকে ধরতে পাবে না। শেষ পর্যন্ত মানুষের ছেলেকে কতদিন বেঁধে রাখা যায়? একদিন সে পালিয়ে যেতে সক্ষম হল। বেনারস থেকে সে বিন্ধ্যপর্বতের তলদেশে পৌছল। কিন্তু ছেলের এক বন্ধু পূজারীকে তা বলে দিল এবং তিনি সেখানে পৌছে গেলেন।

পূজারী সেই জাতীয় লোকদের একজন ছিলেন যারা দুঃস্থ বেদনাকেও হৃদয়ে এমন করে লুকিয়ে রাখতে পারে যাতে তার ছিটেফোঁটা চোখ পর্যন্তও আসতে না পারে। তবুও একবার ছেলেকে তিনি তাঁর হৃদয় খুলে দেখানোর চেষ্টা করলেন। 'না' বলে চেঁচামেচি শোনার সাহস না হওয়ায় ছেলে ওখানেই কোথাও থেকে তাঁকে প্রতীক্ষা করতে বলল। যদিও পূজারী ছেলের মানসিক অবস্থা বুঝতে শুরু করেছিলেন এবং কখনো কখনো চাইতেনও যে তাকে তার খেয়ালখুশী মতো থাকতে দেওয়া যাক, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুত্র স্নেহের পাল্লা ভারী হয়ে যেত।

তাঁর অর্ধোন্মাদ অবস্থা যারা জানত তাদের হৃদয়ে তাঁর জন্য সহানুভূতি না জন্মে পারত না। ছেলে যার অতিথি ছিল, তার মা পূজারীর অবৈতনিক গুপ্তচর ছিলেন। কয়েক সপ্তাহ পরে ছেলে যখন চুপচাপ এক্কা করে স্টেশনের দিকে পালিয়ে যাচ্ছিল, তখন পূজারীর খবর পেতে দেরি হয়নি;। দশ অথবা বার মাইল রাস্তা! এক্কা পৌছনোর কিছুক্ষণ পরে তিনিও স্টেশনে এসে পড়লেন। তাঁকে দৌড়েই হয়তো আসতে হয়েছিল। তিনি জানতেন যে একবার ট্রেনে চাপতে পারলে ছেলেকে পাওয়া অসম্ভব হবে। ট্রেন আসতে মাত্র পনের-বিশ মিনিট দেরী ছিল।

বাবাকে তার সঙ্গ ছেড়ে দেওয়ার জন্য ছেলে যখন তাকে বেশি কিছু বলতে চাইলো, তখন তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। স্টেশনের সব যাত্রী এক জোট হয়ে ছেলেকে তিরস্কার করতে লাগল। প্রাণ বাঁচানোর জন্য আবার তাকে বেনারস ফিরে আসতে হল। বেনারস এসে সে বুঝিয়ে বলে দিল—আপনি আমাকে ধরে রাখতে পারবেন না। আমার একেবারেই বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছা নেই। বাড়ি না যাওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছি আমি। আপনার জবরদস্তিতে আমার ধ্যেয়কে ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে মৃত্যুও আমার কাছে অধিকতর প্রিয়।

পূজারী হয়তো আগেই অনেক চিন্তা করেছিলেন। তিনি দ্রুত ও অত্যন্ত সংক্ষেপে বললেন—আচ্ছা, এখন থেকে আমি আর তোমাকে বাধা দেব না, কিন্তু আমিও আর ঘরে ফিরব না। এখানে এই কাশীতেই জীবন কাটিয়ে দেব।

এমন অনায়াসে মুক্তি পাবে ছেলে আশা করতে পারেনি। সে অন্য ট্রেনে চলে গেল।

অনেক মাস পরে বাড়ির লোকেরা পূজারীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাড়ি নিয়ে যায়। ঘর তাঁর এখন বিষের মতো লাগত। ধীরে ধীরে চিন্তা তাঁর দেহে ও মনে জাঁকিয়ে বসল। এই দুঃখময় চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় তিনি আরো চার বছর বেঁচে ছিলেন, ১৯২০-র জুন মাসে ছেলে তার বাল্যবন্ধু যাগেশের চিঠি পেল—মামার দেহাবসান হয়েছে। ছেলের চোখে জল এল না। চিঠিতে কি লিখেছে জিগ্যেস করায় সে যেভাবে তার বন্ধুদের খবরটা বলল, তাতে তারা বলে উঠল—তোমার হৃদয় কি পাথরের, বাবার মৃত্যুর কথা শুনেও তোমার দুঃখ হল না।

তারা যদি জানত যে ছেলের হৃদয়ের ভেতরে কি হচ্ছে তাহলে তারা এই কথা বলত না।

৫· চৌত্রিশ বছর পরে

চৌত্রিশ বছর কি হতে পারে, তার উপলব্ধি এর আগে কখনো হয়নি। গোণার মত কিছু ঘটনা ছিল, যাদের—চৌত্রিশ কেন তার চেয়ে বেশী বছরের ঘটনাও—আমি গুণে নিতে পারতাম। কিন্তু চৌত্রিশ বছরের সঠিক রূপ তখনই আমার কাছে ধারা দিল যখন আমি আমার জন্মগ্রাম পন্দহাতে—যা আমার দাদুরও গ্রাম ছিল—সেইসব চেহারা দেখলাম যাদের আমি আমার যৌবনের বসন্তে দেখেছিলাম। আর আজ? আমার তিন মামীদের মধ্যে একজন—সুরজবলী মামার স্ত্রীকেই ধরা যাক। ১৯০৯-এ আমি চলে যাই, তখন তিনি ২০-২২ বছরের সুন্দরী যুবতী। কিন্তু আজ তাঁর মুখে গঙ্গা যমুনার অসংখ্য নালা পথ কেটে নিয়েছে। তার উপর একটা চোখও নষ্ট হয়ে গেছে। আজ সেই সুন্দর চেহারার কোনো চিহ্ন নেই। আজ যারা পন্দহাবাসী তাদের মধ্যে আমার পরিচিত মুখ এক ডজনের বেশী হবে না, আর তাদের সকলেরই অবস্থা পাকা আমের মতো।

যদিও বেশীর ভাগ পরিচিত মুখ চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হয়েছে, তথাপি তাদের জায়গায় আমি অনেক যুবকের মুখ দেখেছি। আর তাদের মধ্যে অনেকের সঙ্গে আমার পরিচয়ও হয়েছে। এই সব নবপরিচিত মুখ দেখে আমার যে আনন্দ হল, তাই এই কথার ন্যায্যতা বুঝিয়ে দিল, যে নতুনের আবির্ভাবের জন্য পুরনোর স্থান ছেড়ে দেওয়া আবশ্যক।

আজমগড় জেলায় যাইনি সাতাশ বছর। পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হওয়ায় ১৯৪৩-এর ৯ এপ্রিলের পর আমার আজমগড় জেলায় যাওয়ার কোনো বাধা ছিল না। যদিও আমার বন্ধুদের মতো আমিও এই সময়ের প্রতীক্ষা করছিলাম, তবু অন্য কাজের চাপ দেখে আমার ধারণা হয়েছিল যে এই বছর যাওয়ার সময় হবে না। কিন্তু সময় পাওয়া গেল।

১২ এপ্রিলের রাত্রি একটায় সীওয়ান (ছাপরা) থেকে নাগার্জুন ও আমি ট্রেনে আজমগড় রওনা হলাম। বেলা একটায় মঊ-এর উত্তপ্ত ভূমিতে পা রাখার সময় এক ধরনের আনন্দ হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল কোনো দুর্লভ বস্তু থেকে আমি বঞ্চিত ছিলম এবং আজ আমি তা পেলাম। অন্য ট্রেনের যে কামরায় আমি উঠলাম, তাতে অনেক বলিষ্ঠ গ্রামীণ ভদ্রলোক বসেছিলেন। তাঁদের লম্বা চওড়া স্বাস্থ্যবান শরীর দেখে আমি গর্ববোধ করছিলাম। খোসমেজাজে তাঁরা যে-ভাষায় কথা বলছিলেন, সেই ভাষা আমি মাতৃস্তন্যের সঙ্গে শিখেছি। আমার দুঃখ হল, কারণ আমি এই ভাষা আর বলতে পারি না।

আজগড় জেলায় যে সাতদিন ছিলাম আমার বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে তাদের ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করে দেখলাম, কিন্তু আমার মুখ থেকে বেরিয়ে আসত ছাপরার বুলি।

আজমগড়ের তরুণ সাহিত্যিক শ্রী পরমেশ্বরীলাল গুপ্ত স্টেশনে ছিলেন, তাই শহরে ধর্মশালা খোঁজার প্রয়োজন হয়নি। আমার এই যাত্রা তীর্থযাত্রার মতো ছিল; আর শৈশবের স্মরণীয় সব স্থান দেখা এবং তাদের সঙ্গে নতুন করে পরিচিত হওয়ার কামনা ছিল আমার; তাই আমি সার্বজনীনভাবে কোনো সমাগম অথবা অভিনন্দনে শামিল হতে চাইনি। গুপ্তজী আমার মনের

ভাবকে মর্যাদা দিলেন এটা আনন্দের কথা।

যদিও আমার জন্ম গ্রাম পন্দহার আজমগড় শহর থেকে সাত মাইলের বেশী ছিল না, কিন্তু আমি শহরে গেছি খুব কম। সেখানকার তহশিলী স্কুল আমি দেখেছিলাম। এবার গিয়ে দেখলাম, তা অন্য জায়গায় চলে গেছে। দালান নতুন কিন্তু পুরনো দালানের শ্রীহীনতাকে বজায় রাখতে খুব চেষ্টা করা হয়েছে। শিবলী-মঞ্জিল আজমগড়ের একটি বিশেষ বস্তু। ইস্লামিক সংস্কৃতির মর্মজ্ঞ, আরবী-ফারসীতে মহাবিদ্বান অল্লামা শিবলী এক মহান প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁর লেখনী ও অধ্যয়ন-অধ্যাপনার দ্বারা দেশের সংস্কৃতির বিশেষ সেবা করেছিলেন। এ দেখে আমার বড় ভাল লাগল যে তাঁর কাজের বিস্তৃততর প্রচলন করে মৌলানা সুলেমান নদবী তাঁর গুরুর জীবন্ত স্মৃতিচিহ্ন বজায় রেখেছেন। শিবলী মঞ্জিলে অনেক বিদ্বান অত্যন্ত ত্যাগ ও তন্ময়তার সঙ্গে ঐস্লামিক গবেষণা ও গ্রন্থরচনায় ব্যাপৃত থাকেন। শিবলী মঞ্জিলের দার-উল-মুআরিফ উর্দু সাহিত্যকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করছে।

১৩ এপ্রিল সকাল আটটায় আমরা দুজন এক্কায় রানীকিসরাইয়ের উদ্দেশে রওনা হলাম। শহরের বাইরে বেরোতেই পুলিশ আমাদের এক্কাঅলার যে দুর্দশা করল, তা এক নতুন অভিজ্ঞতা—আজ পুলিশ সর্বশক্তিমান।

ছেলেবেলায় পাঁচ-ছয় বছর বয়সে পড়াশোনা করার জন্য যখন রানীকিসরাইয়ে পদার্পণ করেছিলাম, তখন পা ফেলতাম খুব ভয়ে ভয়ে। পন্দহা গ্রামের ছেলেদের পক্ষে রানীকিসরাই ছিল সম্ভ্রান্ত শহর। সেখানকার প্রত্যেক ব্যাপারই সম্ভ্রমের উদ্রেক করত। যখন রানীকিসরাইয়ের ছেলেরা 'পকড়না' (পাকড়ানো) বলত, তখন আমার ধারণা হত 'ধরনা' (ধরা) নয় 'পকড়নাই' নাগরিক শব্দ। যখন রানীকিসরাইয়ের পুরুষদের ধুতীর এক ভাগ ঠ্যাং-এর অর্ধেক পর্যন্ত রেখে অন্য ভাগ হাঁটু পর্যন্ত নামিয়ে দিত তখন আমার মনে হত, এই হল নাগরিক বেশ। পরে রানীকিসরাইয়ের নাগরিকতার প্রতি এই সম্ভ্রম আর ছিল না তবু আমাকে গঠন করায় রানীকিসরাইয়ের মাদ্রাসার ছয় বছরের বড় ভূমিকা ছিল।

রাস্তা ধরে একবার আমি সমস্ত বসতি এপার ওপার করলাম, কিন্তু কোন মুখই চিনতে পারলাম না। এক ব্যক্তি বেশ কিছু সময় দাঁড়িয়ে আমাকে দেখছিলেন। কিন্তু রাম নিরঞ্জন পণ্ডিত রানীকিসরাইয়ে থাকতে পারেন, একথা আমার মনে হয়নি। আমরা দুজনেই স্টেশনের দিকে মোড় নিলাম। রানীসাগরের দক্ষিণের ভিটের ওপর আমার সুপরিচিত হিন্দি মিড্‌ল ও প্রাইমারী স্কুল দেখলাম। ছুটি ছিল, তাই এখন নির্জন।

তারপর আমরা পুষ্করিণীর উত্তরের ভিটেতে গেলাম। মহাবীরজীর সেই মন্দির এখনো ছিল, আর সেই সঙ্গে মহাবীরজীর সেনা বাঁদরের সংখ্যাও কম ছিল না। কুয়াটাও ছিল এবং কুয়ার জলে আজও সেই রকম দুর্গন্ধ যেমন ছেলেবেলায় এক মাসের জন্য হয়ে যেত। সেখানে যে দুজন সাধু ছিলেন, তাঁদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলাম। গেরুয়াধারী পক্‌ড়বাবা (বলদেবদাস) আমার দিকে বিশেষভাবে তাকাতে লাগলেন এবং দুচারটা কথাও হয়তো বলতে পেরেছিলাম, তিনি হঠাৎ প্রশ্ন করলেন—আপনি রাহুলজী নন তো। পক্কড়াবাবাও সেই সময়ে রানীকিসরাইয়ের স্কুলে পড়তেন, তখন আমি তাঁর দুই শ্রেণী নিচে পড়তাম। এখন আমার পরিচিতদের খবর পাওয়া সহজ ছিল, কিন্তু আমার পরিচিতদের অধিকাংশই জীবন শেষ করে ফেলেছে। মহাবীরজীর মন্দিরের পাশে এক বটগাছের গোড়ায় এক খণ্ডিত মূর্তি ছিল—গুপ্তকালীন মূর্তি লুকিয়ে থাকতে পারে না।

পক্কড়াবাবার সঙ্গে এখন আমরা যেখানে এলাম সেখানে এক সময় আমাদের পুরনো মাদ্রাসা ছিল। মধ্যিখানে দালান, তিনদিকে বারান্দা, একদিকে দুটো ঘর মাদ্রাসার সেই ছবি এখনো আমার স্মৃতিপটে আঁকা। প্রত্যেক শীতে চুনকাম করা উজ্জ্বল দেয়াল আজও আমার

চোখে ভাসছিল। চারদিকে দেয়াল-ঘেরা কম্পাউন্ডে লাগানো গাঁদা ফুলের সুগন্ধ আজও যেন আমার নাকে আসছিল, কিন্তু এখন এই জায়গা দেখে আমার মন খরাপ হয়ে গেল। এখন সেখানে মাদ্রাসার কোনো চিহ্ন ছিল না। সেখানে ছিল অড়ুসা ও অন্য কিছু কাঁটা-অলা চারাগাছ। লোকজন এই জায়গাটাকে খোলা পায়খানা হিসেবে ব্যবহার করছিল। তবে আমার পরিচিত তেঁতুল গাছ তখনো এক-আধটা ছিল।

বাজারে দ্বারিকা প্রসাদ, রামনিরঞ্জন পণ্ডিত এবং আরো কিছু বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল। তাঁরা স্নেহভরা স্বাগত জানালেন।

রাণীকীসরাই থেকে পন্দহা এক মাইলের বেশী দূর নয়। রোদের মধ্যে আমরা যেতে চাইনি কিন্তু আমাদের আসার খবর পন্দহাতে আগেই পৌছে গিয়েছিল। আমরা রওনা হওয়ায় আগেই রামদীন কাকার ছেলে কৈলাশ এসেও গেলেন।

মাদ্রাসায় আসার আমাদের দুটো রাস্তা ছিল, যাদের সঙ্গে ছেলেবেলায় শোনা গল্পের ছয়মাস ও এক বছরের রাস্তার তুলনা করতাম। যদিও দুটোর মধ্যে কোনটা ছয়মাসের ও কোনটা এক বছরের তা আমি কখনো ঠিক করে উঠতে পারিনি। আমার কাছে দুইই ছিল কঠিন রাস্তা। একটার ওপর ঠুটো অশ্বত্থ ছিল এবং ঠুটো বাবার এমনই প্রতাপ ছিল যে ফল ও তরকারি বেচতে যেত যেসব স্ত্রী-পুরুষ তারা কিছু ভোগ না দিয়ে আগে যেত না। অন্য রাস্তায় বসতি থেকে দূরে নিম গাছে ঢাকা বালদত্ত রায়ের পুকুর ছিল; যেখান দিয়ে দুপুর বেলাও ভালয় ভালয় পেরিয়ে যাওয়া কঠিন ছিল। সেখানে এক নয়, হাজার ভূত জ্যৈষ্ঠের দুপুরে নাচত। এই দুই জায়গার বাবার কাছেই দিদিমাকে নাতির জন্য প্রার্থনা করতে দেখে আমার বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল, যে এই স্থান ভারী বিপজ্জনক। আমি উর্দুর ছাত্র ছিলাম কিন্তু বাবার ভয় এত ভীষণ ছিল যে "ভূত পিশাচ নিকট নহি আরে। মহাবীর জব নাম শুনাবে" (ভূত প্রেত কাছে আসবে না মহাবীর যখন নাম শোনাবে)-এর মহিমা শুনে সম্পূর্ণ হনুমান-চালীসা মুখস্ত করে ফেলেছিলাম।

আমরা বালদত্তের পুকুরের রাস্তায় গেলাম। পাশের পতিত জমি ও জঙ্গল এখন খেত হয়ে গেছে। অনেক বছর থেকে ভূতেরা পুকুরের নৃত্য-মহোৎসব করা বন্ধ করে দিয়েছে। মানুষের মন থেকে তাদের ভয় চলে গেছে। ঠুটো বাবার অবস্থা তো আরো খারাপ। কাঁচা সড়কের কিনারে একটা সরু ডাল ও দু-চারটে পাতাঅলা এই লম্বা অশ্বত্থকে অনেক দূর পর্যন্ত বৃক্ষ বনস্পতিবিহীন প্রান্তরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রাতে যে কোনো একলা পথিকের ভয় হওয়া স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু অনেক বছর কেটে গেছে, পাকা রাস্তা হয়েছে, তার ধারে উঁচু গাছের সারি উঠে দাঁড়িয়েছে। অশ্বত্থ এই গাছের সারির মধ্যে হারিয়ে গেছে, যার ফলে ঠুটো বাবার প্রভাবের ওপর বড় আঘাত লেগেছে। আর এখন তো সেই গাছই কেটে ফেলা হয়েছে। নতুন প্রজন্মের জন্য ঠুটো বাবার অস্তিত্ব মুছে গেছে।

পন্দহায় ঢুকেই প্রথম যে পরিচিত বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা হল তিনি লৌহ দাদু। অশ্রু গদ্‌গদ্‌ কণ্ঠে 'কুলওয়ন্তীর ছেলে কেদার' বলে গলা জড়িয়ে ধরাটা আমার স্থৈর্যের ওপর অতিশয় আঘাত করার জন্য যথেষ্ট ছিল।

চোখ শুকনো ও কণ্ঠস্বর ঠিক রাখার জন্য আমাকে বেশ চেষ্টা করতে হল। আমার সামনে দিয়ে শৈশবের প্রিয়জনদের মূর্তিগুলো পার হতে লাগলো। আমার দাদুরা তিন ভাই ছিলেন। আমার দাদুর একমাত্র সন্তান ছিলেন আমার মা। বাকী দুই ছোট বড়-ভাইয়ের দুটি ও পাঁচটি ছেলে ছিল। সাত মামার মধ্যে এখন শুধু জওয়াহর মামা বেঁচেছিলেন। আমার শৈশবে তিনি কলকাতায় পুলিসের সেপাই ছিলেন আর যখন এক-আধ মাসের ছুটিতে আসতেন, তখন তিনি তাজা লেওয়াশুদ্ধ ডাব নিয়ে আসতেন। এখন তিনি পেনসন পান, চোখে দেখেন না। তাঁর মুখ তাঁর বাবা ও তাঁর দুই ভাইয়ের মতো। বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের মতো সাদা দাড়ি নয় বরং দাদুদের

সঙ্গে মেলে সেই মুখ ও বাজখাঁই গলা শেষ পর্যন্ত আমার চোখ ভিজিয়ে ছাড়লো। রানীকিসরাইয়ে কিছুটা কষ্ট হয়েছিল, তবু আমি ধৈর্যের পরীক্ষায় পাস করে গিয়েছিলাম, কিন্তু পন্দহা আমাকে পরাজিত করেছিল। কুলওয়ন্তীর ছেলে, রামশরণ পাঠকের ন্যাতি কেদারনাথকে দেখতে গ্রামের লোক আসতে লাগল। আমার তিন মামীই যাঁরা সকলেই এখন বিধবা আর তিনজনেরই পুত্র পৌত্র আছে—তাঁদের ভাগ্নেকে দেখতে এলেন। তখন তাঁদের চোখের জলে ধোয়া মুখ দেখে আমার সেই ভালবাসার মামীমার—রামদীন মামার প্রথম স্ত্রীর কথা বারবার মনে পড়ছিল। তাঁর স্নেহ আমার শৈশবের বহুমূল্য স্মৃতিগুলির অন্যতম।

তের বছর ধরে আমি রাতদিন পন্দহার গলি ঘুপচি, ডোবা পুকুর দেখেছি, আর তারপরও তিন বছর পর্যন্ত আমার সঙ্গে পন্দহার সম্পর্ক ছিল। গ্রামের পুরনো সব জিনিষ দেখতে বেরোলাম। সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা হল এই যে, আমার মনে হল পুরনো কূয়া, খাল, পুকুর এইসব কিছুর মধ্যে ব্যবধান কমে শুধু এক-তৃতীয়াংশ থেকে গেছে। তাহলে কি ধরিত্রী সত্যিসত্যি ছোট হয়ে গেছে অথবা ছেলেবেলায় ছোটখাট শরীর ছিল বলে এই ব্যবধানকে বড় মনে হত? গ্রামের অল্প কয়েক ঘরই হয়তো তাদের পুরনো দেয়ালের উপর ছিল, দরজার দিক ও উঠানের বিস্তারেরও পরিবর্তন হয়েছে। আমি সেই বাড়ির উঠান ও তার পাশের ঘর দেখতে গেলাম যেখানে আমার মা এখন থেকে পঞ্চাশ বছর আগে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে জন্ম দিয়েছিলেন। কিন্তু আজ সেই ঘরের কোনো চিহ্নও নেই। উঠান, কয়েকটা ঘর, বাইরের দরজা, ঘানি ও বৈঠকখানার জায়গায় চারদিকে দেয়াল ঘেরা একটা খোলা উঠান আছে। তবে সেই চালাঘরের কিছুটা এখনো নতুন টালিতে ছাওয়া আছে, যা আমার প্রসূতিগৃহের কাজ করেছিল। দাদুর কূয়া এখনো আছে, আর একথা শুনে আমার আনন্দ হল যে আজও এই কূয়ার জল আগের মতোই মিষ্টি।

অনেক রাত পর্যন্ত গ্রামের যুবা বৃদ্ধরা নানা বিষয়ে প্রশ্ন করতে থাকল, আর চৌত্রিশ বছর পরে রামশরণ পাঠকের যে নাতি ঘরে ফিরে এসেছে তার অথবা হিন্দি লেখক রাহুল সাংকৃত্যায়নের খবর পেয়ে আশেপাশের গ্রামের লোকও আসতে থাকল।

১৪ এপ্রিল আমি পন্দহার আরো স্মরণীয় স্থান ও দেবতাদের দেখার সুযোগ পেলাম। হাতমুখ ধুতে আমরা গ্রামের উত্তর দিকে গেলাম। দেখলাম, বনওয়ারী মাইয়ের পাশের ঝোপ সাফ হয়ে গেছে আর সেখানে জওয়াহর মামার লাগানো মহুয়া গাছ দাঁড়িয়ে আছে। বনওয়ারী মাইয়ের মঠ দেখে মন হল যে সারা বছরে পথ ভুলেই এখন কেউ পূজা ভোগ দেয়। এখানে একটা খণ্ডিত মূর্তি থাকত। লোকজন বলল, কিছুকাল আগে মাই অন্তর্ধান হয়ে গেছেন। গ্রামের এই পুরনো দেবস্থানে কতবার খণ্ডিত কিন্তু শিল্পকলাপূর্ণ প্রাচীন মূর্তি দেখা যায়, বনওয়ারী মাইয়ের মূর্তিও এই ধরনের মূর্তি হয়ে থাকবে এবং তাকে কোনো কলারসিক অথবা পয়সালোভী মানুষ অন্তর্ধান করিয়ে দিয়ে থাকবে, তাতে সন্দেহ নেই।

রাত্রিতে রামনবমী ছিল, কিন্তু ছেলেবেলায় রামনবমী থেকেও বেশী শুনতে পেতাম তার অন্য নাম—বড়কা বসিয়ৌড়া। আমার মামী (কৈলাশের মা) বিশেষ ভাবে জলখাবার তৈরী করার জন্য যাচ্ছিলেন, কিন্তু 'বসিয়ৌড়া'র নাম শুনে আমি অন্য খাবার কেন পছন্দ করতে যাব? আস্ত অড়হরের ডাল (হলুদ ছাড়া), ডাল ভরা পরোটা গুলগুলা* ও লাল ভাত ছেলেবেলার পরিচিত খাদ্য ছিল; আজও তা খেতে আমার খুব আনন্দ হচ্ছিল। সারাদিন আমার গ্রামের ও আশেপাশের গ্রাম থেকে লোক আসতে থাকল, তাদের মধ্যে রাণীকীসরাইয়ের সহপাঠী জগেশ্বর (ঝিলমিট) ও বাঁকীপুরের বাবু সরযূসিংহও ছিলেন। এদের দেখেছিলাম ষোল-সতের বছর

* একধরনের মিষ্টি।

বয়সে। এখন তাঁদের চুল সাদা হয়ে গেছে, আর বাবু সরযূসিংহ এখন কয়েকটি পৌত্রের ঠাকুর্দা।

বিকেলে গ্রামের বিভিন্ন পাড়া আবার চষে বেড়ালাম। এই চৌত্রিশ বছরে দেবতাদের মাহাত্ম্য অবশ্য অনেক কমে গেছে। যে মহামাইয়ের স্থানে পূজা দিতে যাওয়া নবদম্পতির কাছে অনিবার্য ছিল, আজ তার কাছাকাছি জায়গা মলমূত্র ত্যাগ করার ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে, আর গাছের গোড়ায় পাঁচ সাতটা সিন্দুরের দাগ, মনে হচ্ছিল সত্যযুগে লাগানো হয়েছে। আগে বিয়েতে, পুত্রের জন্ম হলে গুণে গুণে গ্রাম দেবতাকে শূকর ছানা বলি দেওয়া হত। আমার মামাতো ভাই—দীপচন্দ ও কৈলাশ—হিসাব করাতে জানা গেল যে তাদের বাড়ির নামে এক ডজনেরও বেশী শূকর ছানা বাকী পড়েছে। হনুমতবীর ও অনারবীরকে কেউ আর ভয় পায় না, যেমন আজ এখানে বড় বুড়োকে ভয় পাননা। জওয়াহর মামা বলছিলেন—আমি সারা জীবন কর্তব্য পালন করে গেলাম। তিনি একথাও শোনালেন যে কিভাবে সেবকের উপেক্ষায় ক্রুদ্ধ হয়ে কয়েকবছর আগে অনারবীর বাবা গাড়িতে জোতা বলদকে পেছন থেকে চেপে ঝুলিয়ে দিয়েছিল, বলদগুলোর ফাঁসিতে ঝোলার মতো অবস্থা হয়েছিল। যাহোক্ কোনোভাবে দড়ি কেটে বলদগুলোর প্রাণ বাঁচানো হয়েছিল। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হল এই যে এ সব দেখেও নতুন প্রজন্ম দেবতাদের ভজন-পূজন করতে প্রস্তুত ছিল না।

পন্দহার সীমানায় একটি ছোট বসতি বসই। বাদশাহী জমানায় এখানকার সৈয়দদের বৈভবের সূর্য মধ্যগগনে ছিল। তাঁরা তাঁদের খাজনা সোজা লক্ষ্ণৌ-এ পাঠাতেন। আজ তাঁদের বাড়ির চিহ্ন নেই। কয়েকটি সৈয়দ ছেলে আমার সঙ্গে রানীকিসরাইয়ে পড়তে যেত। তাদের সঙ্গে আমি অনেকবার তাদের বাড়ি গেছি। ইটের ঘর ভেঙে পড়ছিল, কিন্তু তবু তাদের মধ্যে কয়েকটি দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের উঠানে খাটিয়ায় বসে বিত্তশালী বংশের সন্তানেরা—সৈয়দদের স্ত্রীরা আমাকেও নিজের সন্তানের মতো সস্নেহে স্বাগত জানাতেন। আজ বসইয়ে সেই বংশের আর কেউ বেঁচে নেই। বাড়ির একটা ইটও চোখে পড়ল না। বাড়ির পেছনদিকের ডালিম ও আতাগাছেরও কোনো চিহ্ন নেই, যাদের প্রতি ছেলেবেলায় আমার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। পুরনো সৈয়দদের ইট-চুনের কবর ছিল। শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে আমি কোইরীদের বাড়ির দিকে গেলাম। এখন আর শাক সব্জীর তেতো খেতে নেই, তত বাড়িও নেই। আমার ছেলেবেলার সহপাঠী হীরার বাড়িতে কেউ আর বেঁচে নেই। বসইয়ে বেশ কয়েক ঘর জোলা আছে, কিন্তু কাপড় বোনার জায়গায় তারা শনের সুতুলি পাকাচ্ছিল—অনেকে তো কাপড় বোনা ভুলেই গেছে।

ফেরার সময় ছেলেবেলার সহপাঠী রাজদেও পাঠকের সঙ্গে দেখা হল। তার সব চুল শণের মতো সাদা হয়ে গেছে। তিনি বালকদের খেলা—চিরভী-ডাণ্ডীর নিমন্ত্রণ জানালেন। একবার মনে হল—হায়, যদি আমরা আবার বার-তের বছরের ছেলে হয়ে যেতে পারতমা কিন্তু পরের দুই প্রজন্ম কোথায় থাকতো? সতমীর বাড়িরও কোনো চিহ্ন নেই। সতমীর চার ছেলে কিভাবে ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে দারিদ্র্যের ভোগে যায়, তা আমার এক কাহিনীতে আমি লিখেছি। সতমীর সবচেয়ে ছোট ছেলে সন্তু আজও কোথাও বেঁচে আছে।

পন্দহা যাওয়ার আগে অল্প কিছু নাম ও মুখ আমার পরিচিত বলে মনে হত, কিন্তু সেখানকার নতুন ও পুরনো চেহারা, ভূমি বাতাবরণে ঘুরে, শ্বাস নিতেই মূর্তি আবার জাগ্রত হতে থাকল এবং সতের আঠারোর চেয়ে বেশী বয়সী যাদের আমি আগে দেখেছিলাম, তাদের চিনতে আমার অসুবিধা হল না।

১৬ এপ্রিল আমরা নিজামাবাদ গেলাম। এখানকার স্কুল থেকে আমি ১৯০৯-এ উর্দু মিড্‌ল পাস করেছিলাম। পুরনো মিড্‌ল স্কুলের জায়গাই শুধু নয়, তার ভিত্তির ওপর আপার প্রাইমারি স্কুলের ইমারত হয়েছে। মিড্‌ল স্কুল আজকাল শহর থেকে পশ্চিমে চলে গেছে। দুটি স্কুলেরই শিক্ষকদের মধ্যে কেউ আমার পরিচিত বেরল না। টৌসের ঘাট তার পাশের ছোট শিবালয় ও

নানকশাহী সঙ্গতে কোনো পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হল না। হ্যাঁ, ঘাটে দুয়েকটা পানের দোকান নতুন বলে মনে হল। খবর পেয়ে গিয়েছিলাম যে আমার পুরনো শিক্ষক সীতারাম শ্রোত্রিয় তাঁর বাড়িতেই আছেন। তাঁর বাড়ি শহরের ভেতরের সঙ্গতের পাশে। এই সঙ্গতও আগের অবস্থাতেই আছে। তবে একটা পার্থক্য নিশ্চয়ই চোখে পড়ে, তা হল: বাইরের ছাদের ভেতরও কেউ পা রাখলেই লোকদের মাথা জোর করে ঢেকে দেওয়া হচ্ছিল। পণ্ডিত সীতারাম শ্রোত্রিয় 'হরিঔধ'জীর শিষ্য—স্কুলে ও সাহিত্যে এই দুইয়েই। আমাকে দেখে তিনি খুশী হলেন। নাগার্জুনজী তাঁর কবিতা—জাতিগৌরব গঙ্গদত্ত—শোনালেন, তারপর শ্রোত্রিয়জীও তাঁর কিছু কবিতা শোনালেন।

নিজামাবাদে আমরা সেই কুমোরদের বাড়িও গিয়েছিলাম যারা খিলজী শাসনকালে দেবগিরি থেকে এসে এখানে বসবাস করতে থাকে। তাদের তৈরী মাটির বাসন সারা দুনিয়ায় প্রসিদ্ধ। অন্যান্য কুমোরদের সঙ্গে এদের আত্মীয়তা ছিল কিন্তু নিজেদের কলা তারা অন্য কুমোরকুলে যেতে দিতে চাইত না; সেজন্য নিজের মেয়েদেরও পর্যন্ত তারা এই কলা শেখাত না। যুদ্ধের আগে তাদের বানানো লাখ লাখ টাকার বাসন—চায়ের সেট, ফুলের তোড়া ইত্যাদি—দেশ বিদেশে যেত, কিন্তু আজ তাদের অবস্থা পড়ে গেছে। আজ এই ঝিনকারীঅলা কুমোরদের সংখ্যা এক ডজনের বেশী হবে না।

ফেরার মসয় পন্দহার সীমান্তে সেই সব খেত দেখলমা যেখানে কয়েক বছর আগে নীলগাই (ঘোড়রোজ) শিকার করা নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দেবাসুর সংগ্রাম শুরু হয়ে গিয়েছিল। সংগ্রামের পর এখন শান্তি বিরাজ করছে। হিন্দুরা হায় হায় করছিল—'পাঁচ-দশ বছর আগে এখানে দুচারটা নীলগাই দেখা যেত, সেখানে আজ তাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে পঞ্চাশ, আর তারা চাষবাসের ভীষণ ক্ষতি করছে। আমি বললাম—নীলগাই ছাগল ও হরিণের জাত, এদের কান, চোখ, লেজ তাদের মতোই হয়, তাদের মতো এদেরও নাদ হয়। তারা আমাকে আরো জানিয়েছিল যে ছাগলের মতো এরাও একাধিক বাচ্চা দেয়। এত সব জানা সত্ত্বেও এদের গরু বানিয়ে এদের জন্য ধর্মযুদ্ধ করতে সবাই প্রস্তুত।

১৩ এপ্রিলই রানীকিসরাই পৌঁছনোর পর কেউ আমার পিতৃগ্রাম কনৈলায় খবর দিয়ে দিয়েছিল। আজমগড়ের জন্য আমার হাতে শুধু সাতদিন ছিল। এত কম সময় থাকায় কনৈলাকে আমি আমার প্রোগ্রামের মধ্যে রাখতে চাইনি। আমার দুই মামাতো ভাই দীপচন্দ ও কৈলাশ—বারবার কনৈলায় খবর দিতে আগ্রহ দেখিয়েছিল, কিন্তু আমি অস্বীকার করায় তারা চুপ করে ছিল। দ্বিতীয় দিন—১৪ এপ্রিল দুপুরে দেখি আমার ছোটভাই শ্যামলাল সাইকেলে পন্দহা চলে এসেছে। আমি কিছুটা আশ্চর্য হলাম—কে খবর দিল? মনে হচ্ছে চৌত্রিশ বছর পরে ফিরে আসা মানুষের খবর লোকের কাছে খুব আকর্ষণীয় হয়; তাই আমার আসার খবর রানীকিসরাই-এর সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। রানীকিসরাইয়ে কনৈলার চুড়িহারদের আত্মীয় ছিল। সেখান থেকে কোনো লোক কনৈলা যায় এবং আমার আসার খবর দশ মাইল দূরে পৌঁছে যায়। ভাই তার বাড়ি ও গ্রামের তরফ থেকে সেখানে যাওয়ার জন্য জোরাজুরি করতে লাগল, কিন্তু আমি কনৈলাকে পরের যাত্রার জন্য রেখে দেবার কথা বলে যেতে অস্বীকার করলাম। শ্যামলাল সেই দিনই ফিরে গেলেন।

১৬ এপ্রিল বিকেলে দিন থাকতে থাকতেই কনৈলার লোকজন দলে দলে আসতে লাগল। পাঁচ-ছয় জন করে তারা রাত দশটা পর্যন্ত আসতে থাকল। তাদের সংখ্যা ত্রিশের উপর পৌঁছে গেল আর তাদের মধ্যে বেশ কয়েকটি জাতের প্রতিনিধি ছিল। গ্রামের বুড়ো কাকা রঘুনাথ ও দাদা (আজা) সুখদেও পাণ্ডেকেও দশ-এগার মাইল পথ পেরিয়ে আসতে দেখে আমার স্থির সিদ্ধান্ত কিছুটা টলে গেল। কনৈলা থেকে আসতে যিনি সবচেয়ে বেশী অক্ষম তিনি ছিলেন

আমার রামদত্ত কাকা, কিন্তু তিনি আমাকে দেখতে কতটা উৎসুক তার খবর আগেও এক আধবার পেয়েছিলাম। আমার আত্মীয় অনেক বৃদ্ধের দর্শন থেকেই আমি বঞ্চিত হয়ে ছিলাম। সংস্কৃত-এর আমার প্রথম গুরু ও পিসামশাই মহাদেব পণ্ডিত (বছওয়ল) কয়েকবার আমাকে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করে খবর পাঠিয়েছেন, কিন্তু আমি যেতে পারিনি, দু-তিন বছর আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। আমার জন্মের সময় যিনি সম্মিলিত পরিবারের ঠাকুরমা ছিলেন তিনি মাত্র এগার দিন আগে মারা গেছেন আর সেই দিনই আমাদের বংশজ তাঁর শ্রাদ্ধ করে এসেছেন। আমি আরো কিছু বৃদ্ধের দর্শন থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে চাইনি, তাই আমার গ্রামের নাতি ও আমার সমবয়স্ক অঘোর বাবা রঘুনাথ যখন আমাকে কনৈলা যেতে বললেন, তখন আমি রাজী হয়ে গেলাম।

গরমের দুপুরে রওনা হওয়াটা আরামের ব্যাপার নয়, অতএব আমরা স্থির করলাম প্রত্যুষে রওনা হব। হাতিকে তৈরি করে আনতে কিছুটা দেরি হতে লাগলো, আমরা পায়ে হেঁটেই যাত্রা করলাম। দেড় মাইল এগিয়ে যাওয়ার পর হাতি আমাদের ধরতে পারলো। প্রথমদিকে রঘুনাথ বাবার সঙ্গে নাগার্জুনও হাতিতে বসেছিল, কিন্তু আমাদের দুজনের শরীররই এমন "হালকা" ছিল যে নাগার্জুনের বুঝতে দেরি হয়নি যে হাতিতে যাওয়ার চেয়ে পায়ে হাঁটা তার পক্ষে অনেক বেশী আরামদায়ক হবে। সেই দিন দুপুর পর্যন্ত আকাশ ছিল মেঘে ঢাকা। রঘুনাথ কাকা আমার পুণ্য-প্রতাপের দোহাই দিচ্ছিলেন। কনৈলা থেকে দুই মাইল আগে ডীহা পৌঁছনোর পর বেশি বৃষ্টি হতে শুরু করল, তবে সেখানে হাতমুখ ধোয়া ও জল খাবার খাওয়ার কথাও ছিল।

ডীহার আপার প্রাইমারি স্কুলে আজ (১৭ এপ্রিল) ছুটি ছিল, তাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক আমার সহপাঠী পণ্ডিত শ্যামনারায়ণ পাণ্ডের উপস্থিত ছিলেন না। বিগত কিছু বছরে শিক্ষার অনেক প্রসার হয়েছে, তা জায়গায় জায়গায় নতুন মিডল ও অন্য ধরনের স্কুলের প্রতিষ্ঠা থেকে বোঝা যাচ্ছিল। রানীকিসরাইয়ে যখন আমি পড়তে গিয়েছিলাম, তখন সেখানে একটা ছোটমতো প্রাইমারি স্কুল ছিল, কিন্তু এখন সেখানে মিডল স্কুল হয়েছে। এখন সেখানে মিডল স্কুল হয়েছে। ডীহাতে আগেও মাদ্রাসা ছিল, কিন্তু এখন এখানে পড়ান তিনজন শিক্ষক। আমি রবাবর দাদুর সঙ্গে পন্দহায় থেকেছি, তাই আমি লেখাপড়া করেছি রানীকিসরাই ও নিজামাবাদে। কিন্তু কনৈলার ছেলেদের কাছাকাছি ছিল ডীহার স্কুল। এখন তো কনৈলাতেই আপার প্রাইমারি স্কুল হয়ে গেছে। কনৈলা থেকে দুই আড়াই মাইল দূরে ধরওয়ারাতে মিডল স্কুল আছে। ত্রিশ-বত্রিশ বছর আগে মিডল পাস ছেলে বিরল ছিল কিন্তু এখন এক এক গ্রামে তাদের বেশি সংখ্যায় দেখা যায়। পন্দহায় কুবের দাদুর ছেলে ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়ে চাষবাস করছে দেখে আমি অবশ্যই কিছুটা খুশী হয়েছিলাম, কিন্তু চাষবাসের কাজে যদি বিদ্যার ব্যবহার না হয়, তবে লেখাপড়ার সবটাই ব্যর্থ হয়ে যায়। শিক্ষিত ব্যক্তিকে বিজ্ঞানকে কোনো উপায়ে চাষবাসে ব্যবহার করতে দেখা যায় না। গ্রামে শিক্ষাপ্রসারের বড় ফল যদি কিছু হয়ে থাকে তবে তা হল এই যে, মামলা-মকদ্দমা বেড়ে গেছে, জমি ও ভূসম্পত্তি নিয়ে জাল-ফেরেববাজী বেশী হচ্ছে। এতে বিদ্যার কীর্তি উজ্জ্বল হয়নি।

কনৈলা গ্রামের পশ্চিম দিকের কুটিরে—যেখানে প্রাইমারি স্কুল আছে—পুরনো বাড়ি ভেঙে গেছে এবং সেখানে কয়েকটা ঘর ও বড় গাছ চোখে পড়ল। লম্বা সময়কে গাছের সাহায্যে অনায়াসে নির্ধারণ করা যায়।

এখন আমরা গ্রামের বাইরেই ছিলাম, ইতিমধ্যেই ছেলেদের পলটন তাদের জন্মজাত নেতাদের সঙ্গে আমাদের স্বাগত জানানোর জন্য এসে গেল—একে স্বাগত জানানো ও তামাশা দেখা দুইই বলা যেতে পারে। তাদের মধ্যে পাঁচ থেকে বার বছর পর্যন্ত বয়সের ছেলেরা ছিল।

গ্রামের কাছাকাছি ঊষর জমির একলা কূয়ার কাছে পৌঁছে আমরা হাতি থেকে নেমে গেলাম। আমার ছেলেবেলায়ও এই কূয়া এই নির্জন ঊষর জমিতে ছিল। গ্রামের বেশীর ভাগ লোক এখান থেকেই খাওয়ার জল নিয়ে যেত। এই অসুবিধা দূর করার প্রথম চেষ্টা করেছিলেন আমার বাবা, তাঁর বাড়ির দরজায় কূয়া তৈরী করে। আজ তো গ্রামের ভেতর কয়েকটা কূয়া তৈরী হয়েছে। এই ঊষর জমির কূয়ার আশেপাশে ডজন খানেক ঘরের বসতি হয়েছে যাদের মধ্যে চুড়িহার ও দর্জিদের ঘরই বেশী। আমারই বয়সী, কিন্তু সম্পর্কে কাকা রজবলীর (রজবয়েলী) চিবুকে ঝুলন্ত দাড়ি সাদা হয়ে গিয়েছে। এক সময়ের মুমূর্ষু চুড়িহার ও দর্জিপরিবার আজ সম্পন্ন, এ দেখে আমার খুব আনন্দ হল। চলে যাওয়ার সময় দু-তিন ঘর বাদ দিলে কনৈলার অন্য সবাইকে আমি দরিদ্র দেখে গিয়েছিলাম। কিন্তু এখন প্রত্যেকেরই অবস্থা ফিরেছে। ঐ সময় গ্রামের দুই তৃতীয়াংশ বেশি ছিল ঊষর জমি, এখন সেই ঊষর জমিতে লোকেরা অনেক খেত বানিয়েছে। আগের খেতেও লোকেরা এখন অনেক বেশী পরিশ্রম করে। সেচের জন্য অনেক নতুন পাকা কূয়া তৈরী হয়েছে; মকদ্দমাও অপেক্ষাকৃত কম হয়। কনৈলার সমৃদ্ধির কারণ হল এই। আমার অনুপস্থিতির সময় যে দুই প্রজন্ম এসেছে তাদের সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে পতিত গ্রামের ব্রাহ্মণ (জমিদার)-দের সঙ্গে যতদূর সম্বন্ধ; হয়তো আরো এক প্রজন্ম পতিত জমিকে খেতে পরিণত করতে পারবে। গ্রামের ঘরবাড়ির আয়তন ও আকার দুয়েরই পরিবর্তন হয়েছে। আগের চেয়ে এখনকার বাড়ি বেশী সুন্দর পরিচ্ছন্ন ও বিস্তৃত; এই কারণে অনেক পরিবারকে গ্রামের ভেতরের জায়গা ছেড়ে পুব দিকে যেতে হয়েছে। সাতাশ বছর আগে শেষবার আমি তিন চার দিনের জন্য কনৈলা গিয়েছিলাম। সেই সময়ের বাড়িঘরের চিত্র এখনো আমার স্মৃতিপটে আঁকা ছিল, কিন্তু এখন কোনো বাড়ি চিনতে হলে আমাকে জিগ্যেস করতে হবে। গ্রামে পৌঁছতেই আবাল বৃদ্ধ নরনারী তাদের হাড়-মাংসে তৈরী শরীরের কেদারনাথের চারদিকে এসে দাঁড়িয়ে গেল। বংশী কাকার সজল চোখ দেখতেই তার পায়ে আমার হাত চলে গেল। গ্রামের সবচেয়ে বৃদ্ধা স্ত্রীলোক যমুনা আজীর (আর্যা, ঠাকুরমা) জিভ এখনো আগের মতোই বেগে চলেছে। কিন্তু এখন তার শরীর খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে, চোখেও ভাল দেখতে পান না। গ্রামের মাঝখানে পাথরের পুরনো ঘানি এখনো তার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু হাসুলা, খুরপী, কাটারি ঘষে ঘষে লোকে তার কিনারায় অনেক গর্ত করে ফেলেছে। আমাদের পুরানপন্থী নেতা যাই বলুন না কেন, কনৈলা গ্রামের লোকদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস এই, যে লোহার ঘানিকে হটিয়ে পাথরের ঘানির যুগে আর ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়।

এগারটা নাগাদ কনৈলায় পৌঁছলাম আর সেখানে মাত্র চার ঘণ্টা থাকার কথা। অতএব প্রত্যেক মিনিট ভালভাবে ব্যবহার করার প্রয়োজন ছিল। আমার ভাইদের মধ্যে শ্যামলাল ও রামধারী বাড়িতেই ছিল। সবচেয়ে ছোট শ্রীনাথ দিল্লীতে লোকজনকে রসগোল্লা খাওয়াচ্ছে। সাতাশ বছর আগে যাঁদের বয়স চৌদ্দ-পনের বছর হয়ে গিয়েছিল শুধু চিনতে আমি পারতাম আর এমন মুখ খুব কম ছিল। আমার চেয়ে কিছুটা বয়সে বড় দুখনাথ ভাইয়ার ভুরুও সাদা হতে শুরু করেছে। রামদত্ত কাকার শরীরে হাড় ও চামড়া ছাড়া আর যা দেখা যাচ্ছিল তা হল তাঁকে এক জায়গায় বেঁধে রাখা ধমনীগুলি।

স্নান করতে যাওয়ার সময় আমার জন্মের পর পৃথক হয়ে যাওয়া বন্ধুদের বাড়ি দেখলাম। বংশী কাকা আর তাঁর ভাই আমার সমবয়স্ক কিস্‌না (কিষ্ণা) কাকার বাড়ি পুরনো জায়গা থেকে অনেক দূরে সরিয়ে তৈরী করা হয়েছে। বাগানের প্রান্তে অবস্থিত যে একলা অশ্বত্থকে সবাই ভূতের গড় বলে মনে করত, তা এখন বসতির ভেতরে এসে গেছে। আর ভূত? মানুষের ভিড়ে বেচারা ভূত কি করে সেইভাবে থাকতে পারে? আমি এক জায়গায় বসেছিলাম, যে মানুষের

বসতি হয়ে যাওয়ার পর ভূতদের ছেলেপিলে নিয়ে পালিয়ে যাওয়া জরুরি হয়ে পড়ে। কেউ জিগ্যেস করেছিল—"কেন"?

"মানুষেরা ছেলেরা ঢিল-ডাণ্ডা ছুঁড়ে মারে। ভূত ও তাদের বাচ্চাদের তো দেখা যায় না, ফলে তাদের মধ্যেও অন্ধ, কানা ও ল্যাংড়ার সংখ্যা বেড়ে যেতে থাকে। অতএব ভূত-ভূতনীদের জায়গা ছেড়ে যেতে হয়।"

আমার কিছু ভাইদের মতো অনেক পাঠকের এই মন্তব্য পছন্দ হবে না। কিন্তু ভূত-পেত্নী অনেক জায়গা ছেড়ে চলে গেছে, এ বিষয়ে সেখানে সবাই একমত ছিল।

পুরনো·কনৈলার বসতিতে সবুজ পাতার জন্য চোখ তৃষ্ণার্ত হয়ে থাকত, আজ কারু দরজায় কিন্তু পাকুড় গাছ, কারু দরজায় নিম। গরমে গাছের ছায়া কি সুখপ্রদ ও মধুর হয়। তবে, এ দেখে দুঃখ হল যে কনৈলার বাগান অনেকটা উজাড় হয়ে গেছে। আর মানুষের নতুন আমের চারা লাগানোর শখ নেই।

স্নানের পর আমি গ্রামের লোকদের বাড়িঘর দেখতে বেরোলাম, সঙ্গের পরিষদ ঠেকানো সম্ভব ছিল না। চামার টৌলার পর, ব্রাহ্মণ, আহীর, কাহার, চুড়িহার, দর্জি, গড়েরিয়াদের বাড়িঘর দেখে তাদের সঙ্গে পরিচয় করতে করতে, প্রায় সারা গ্রাম ঘুরে এলাম। পত্রহীন বটগাছের নিচে উপবিষ্ট বুদ্ধকে দেখে শাক্যের রক্তপিপাসু কোশলরাজ বিদুডভ জিগ্যেস করেছিলেন—পাশেই আমার রাজ্যের সীমানার ভেতরে ঘন ছায়াঅলা বটগাছ আছে। ভগবান তার নিচে কেন বসেন না?"

বুদ্ধ উত্তর দিলেন, "বন্ধুদের ছায়া শীতল হয়, এই বটগাছ শাক্যভূমির।"

আহার্য প্রস্তুত ছিল। আহারের জন্য শ্যামলাল আমাদের দুজনকে তার বাড়িতে নিয়ে গেল। সাতাশ বছর আগের বাড়ির তুলনায় এ তো প্রাসাদের মত মনে হচ্ছিল। তার মত তিনটি উঠান এর ভিতরের উঠানে ধরে যাবে। উঠান পূব থেকে পশ্চিমে লম্বা, ফলে অনেক বেশী সময় ধরে রোদ পাওয়া যায়। নালার মুখ দক্ষিণ দিকে খুলতে দেখে গ্রামের বৃদ্ধ ব্যক্তিরা শংকিত হয়েছিলেন, কিন্তু নালার উপযুক্ত জমি সেই দিকেই ছিল। শ্যামলাল সাহস দেখিয়েছিল এবং নালা সেই দিকেই খুলে দিয়েছিল। আমার এই দেখে ভাল লাগল যে আমার সহোদরও রক্ষণশীলতাকে ঘা দেওয়ার কিছুটা সাহস রাখে।

আহার শেষ হল। আমি উঠতেই যাচ্ছিলাম এমন সময় কাপড়ে ঢাকা একটি মূর্তি, আমার পায়ে পড়ে কাঁদতে শুরু করতে চাইল। আমি তৎক্ষণাৎ যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। যাইহোক, কান্না বন্ধ হয়ে গেল। কে কাঁদছিল বলতে পারি না, আমাকে জানানোও হল না। বাড়ির লোকেরা শৈশবে আমার নাম নিয়ে যে বিয়ে দিয়েছিল, বাড়ির সঙ্গে তাকেও আমি তিন দশক আগে ছেড়ে গিয়েছিলাম। উঠানে অনেক স্ত্রীলোক জমা হয়েছিল, যাদের মধ্যে যমুনা আজী ছাড়া আমি আর কাউকেই চিনতাম না।

আশেপাশের গ্রামে খবর চলে গিয়েছিল, আর বেলা তিনটা নাগাদ অনেক লোক সেখানে জমা হয়ে গিয়েছিল। জন-সমাবেশ সভার রূপ এবং আমাকে কিছু বলতে অনুরোধ করা হল। আমি গ্রামের সমৃদ্ধিতে আনন্দ প্রকাশ করলাম। আর আজকের পরিস্থিতিতে অন্ন, বস্ত্র ও আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে বললাম।

আজ রাত্রিতে আমার বছওয়ল-এ পিসামশাইয়ের বাড়িতে থাকার কথা। আমার ছেলেবেলার বন্ধু যাগেশ দত্ত পন্দহাতে এসে গিয়েছিলেন। তার আগ্রহ আমি ঠেলে দিতে পারিনি। ভরদের দুই টোলা পেরিয়ে যখন আমি এগিয়ে গেলাম তখন নাগার্জুনজী ঢিবি দেখে খবর দিলেন যে

সেখানে সুস্পষ্ট কিছু ভাঙাচোরা মূর্তি আছে। ছেলেবেলায় আমিও এই সব মূর্তি দেখে থাকব; কিন্তু সেই সময় তাদের কথা শোনার কান ছিল না আমার। সেখানে গিয়ে দেখলাম তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের (বজ্রযান) এক ভয়ংকর দেবতা (বজ্র ভৈরব)। এর ছোট কিন্তু সুন্দর মূর্তির দুটি খণ্ড পড়ে আছে, আগুনের শিখার মত তরঙ্গিত কেশ এবং গোল গোল চোখঅলা মুণ্ড একদিকে পড়ে ছিল এবং কোমর থেকে নিচের দিকটা আর এক খণ্ডে। দশ দশ শত বছর আগে কনৈলাতেও সেই দেবতাদের পূজা হত যাদের আমি তিব্বতে অনেক মন্দিরে দেখেছিলাম। আজ কনৈলাবাসী আর এখানকার পুরনো নিবাসী রাজভররা জানে না যে তাদের পূর্ব পুরুষ অনেক বছর আগে এই দেবতাদের পূজা করত, যারা হিমালয়ের জন্য অন্য পারে এখনো জীবিত। কনৈলার পুরনো খেতের নিচে পুরনো বসতির ধ্বংসাবশেষ লুকিয়ে আছে। সেখানে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের ইট পাওয়া যায়। জানা যায় যে খিলজী শাসনকালে এখানে এক প্রশাসক থাকতেন, যাঁর পুরনো দুর্গের এক ভাগ এখনো টিলার কাছে দেখতে পাওয়া যায়। সম্ভবত সেই সময়েই এই সব দেবতাদের কোতল করা হয়। সাতাশ বছর আগে রাজভরেরা শুয়োর পালত, কিন্তু এখন সারা জেলায় এবং আশেপাশের অন্য জেলায়ও এরা শুয়োর পালন একেবারে ছেড়ে দিয়েছে। সমাজে তাদের স্থান এখন আগের চেয়ে কিছুটা উঁচু হয়েছে সে খবর আমি জানতাম না, কিন্তু এতে তারা জীবিকার একটা উপায় থেকে অবশ্য বঞ্চিত হয়েছে। শুয়োরী একবারে বিশটা বাচ্চা দেয়, আর বছরে তিনবার। পুষ্টিকর আহার ও টাকা পয়সা রোজগারের এটা একটা ভাল উপায় ছিল। কিন্তু সবচেয়ে বেশী অসুবিধা হয়েছিল গ্রামের দেবতাদের। কয়েক বছর ধরে তাঁরা শুকর ছানার একটা টুকরাও চিবোতে পাননি।

বছওয়ল কনৈলা থেকে দুই আড়াই মাইলের বেশী দূর নয়। মাঝখানে মংগই (মার্গবতী) নামে ছোট নদী পড়ে। গরমে এই নদীর বেশীর ভাগই শুকিয়ে যায়, তাই জায়গায় জায়গায় বাঁধ বেঁধে জলকে আটকানো হয়, অতএব এর পোখরই নামই বেশী সার্থক। মংগই সোজা গঙ্গায় গিয়ে পড়েছে, বর্ষায় এতে এতো জল থাকে যে ছোটখাটো নৌকো সিসওয়া (শিংশপা) গ্রাম ও তার আগেও চলে যেত। সেই সময় নদীই ছিল বেশীর ভাগ বাণিজ্যের পথ।

আমরা সিসওয়ার বাঁধা বাঁধ পেরিয়ে মংগই পার হলাম। এখান থেকে কনৈলার জনমণ্ডলী ফিরে গেল। নদীর ওপারে সিসওয়া বা শিংশপা গ্রামের কয়েক মাইল বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ আছে। সর্বত্র যে ইট পাওয়া যায় তা বলে দেয় যে শিংশপা গ্রামে এক সমৃদ্ধ বসতি ছিল। শিংশপা গ্রামের নামে কোনো নিগম কাশী জনপদে ছিল, বইগুলিতে আর তো তার খোঁজ পাওয়া যায় না, কিন্তু ইট ও বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ যে সাক্ষ্য দেয় তা অস্বীকার করা চলে না। আজকালের গ্রামীণ পণ্ডিত সিসওয়াকে শিশুপালের রাজধানী বলে থাকেন। শিশুপাল চেদির (পূর্ব বুন্দেলখণ্ড) রাজা ছিল। এই সমস্যার সমাধান করার কষ্ট তাঁরা কেন করবেন? তাছাড়া তিনি সিন্ধুরাজ 'জয়দ্রথ'কেও এক জায়গায় খুঁজে বার করেছেন, জয়দ্রথের জায়গায় পাঁচ ছয়টি বড় বড় খণ্ডিত মূর্তি আছে, এই খবর আমি পরে পেয়েছিলাম তাই এই মূর্তিগুলি দেখা হয়নি। তবে যাগেশ আমাকে সিসওয়ায় পাওয়া দুটো তামার পয়সা দিয়েছিল। অক্ষরগুলি ক্ষয়ে গিয়েছিল, কিন্তু একদিকের চেহারা কোনো শক রাজার বলে মনে হয়েছিল। পরদিন আজমগড় পৌঁছনোর পর বুঝতে পারলাম দুটো সিক্কা কুষাণ রাজা কণিষ্কের হতে পারে যাদের মধ্যে একটার এক পিঠে বায়ু দেবতা ও অন্যটির পিঠে মিত্র দেবতার মূর্তি আছে। শ্রী পরমেশ্বরীলাল গুপ্তের পুরনো মুদ্রা জমানোর ও চেনার খুব শখ আছে। তিনি আজমগড় জেলায় পাওয়া কয়েক সের কুষাণ মুদ্রা জমা করেছেন। দু হাজার বছর আগে কণিষ্কের কোনো উচ্চপদস্থ কর্মচারী শিংশপা গ্রামে থাকতো। সেই সময়ে সিসওয়ার আজকের জনশূন্য টিলাগুলোতে বণিক ও

শিল্পীদের অনেক চমৎকার ঘরবাড়ি ছিল, দেশ বিদেশের পণ্য দ্রব্যে সাজানো দোকান-অলা পথ ছিল; জায়গায় জায়গায় এরকম কত দেবালয় ছিল, যাদের দেবতারা এখন বিস্মৃত। মংগইয়ের বাণিজ্যের পথ এই জলীয় রাজপথই মংগইয়ের সমস্ত সমৃদ্ধির কারণ। এই পথের জায়গা নতুন পথ নিয়েছে আর শিংশপা গ্রাম ধীরে ধীরে সিসওয়ার নির্জন টিলায় পরিণত হয়েছে। সিসওয়ার গর্ভে তার ইতিহাস জানানোর অনেক সামগ্রী লুকিয়ে আছে, যা কোনো না কোন সময়ে নিশ্চয়ই কথা বলবে। কয়েক মিনিটে এই ধ্বংস পেরিয়ে যাওয়ার সময় যা দেখেছিলাম তাই সংক্ষেপে লিখলাম।

সন্ধ্যা নাগাদ বছওয়ল পৌঁছলাম। যাগেশ বহু বছর আমার যৌবনের অভিযানে সঙ্গী থেকেছেন। তিনি জাতীয় কর্মী। যদিও তিনি আমার পিসীমার জায়ের ছেলে, তবু ছেলেবেলা থেকেই বছওয়ল-এ তাঁর সঙ্গে আমার সব থেকে বেশি ভালবাসা ছিল। ত্রিশ বছর আগে একবার আমাদের দুজনকে কুর্তা পরে রুটি খেতে দেখে তাঁর মা কেঁদেছিলেন। আজ তাঁর পুত্রকে আমার ও নাগার্জুনের মতো 'সর্বভুক'-এর সঙ্গে বসে ডালভাত খেতে দেখে তাঁর স্বর্গীয় আত্মা নিশ্চয়ই ছটফট করছিল। তবে কনৈলার সরপঞ্চ শ্যামলালও আমাদের সঙ্গে বসে খাচ্ছেন, তা দেখে তিনি নিশ্চয়ই আশ্বস্ত হয়ে থাকবেন।

পরদিন কিছুটা রাত থাকতেই আমি ও নাগার্জুন হাতিতে চড়ে রওনা হয়ে গেলাম। চণ্ডেশ্বরে এক্কা নিয়ে দশটা নাগাদ (১৮ এপ্রিল) আজমগড় পৌঁছলাম। কানে শুনে অনেক লোক দেখা করতে এল। আজমগড়ের কবি 'শৈদা' ও 'চন্দ্র' তাঁদের কিছু রচনা শোনালেন, 'যাত্রী' নাগার্জুনও তাঁর রচনা শুনিয়ে জনমণ্ডলীর মনোরঞ্জন করলেন। ১৯শে এপ্রিল সাত দিন থাকার পর সকাল দশটার ট্রেন ধরলাম এবং দুটো নাগাদ আমরা আজমগড় জেলার বাইরে চলে এলাম।